আধুনিক মুসলিম বিশ্ব:

তুরস্ক-ইরান-আফগানিস্তান

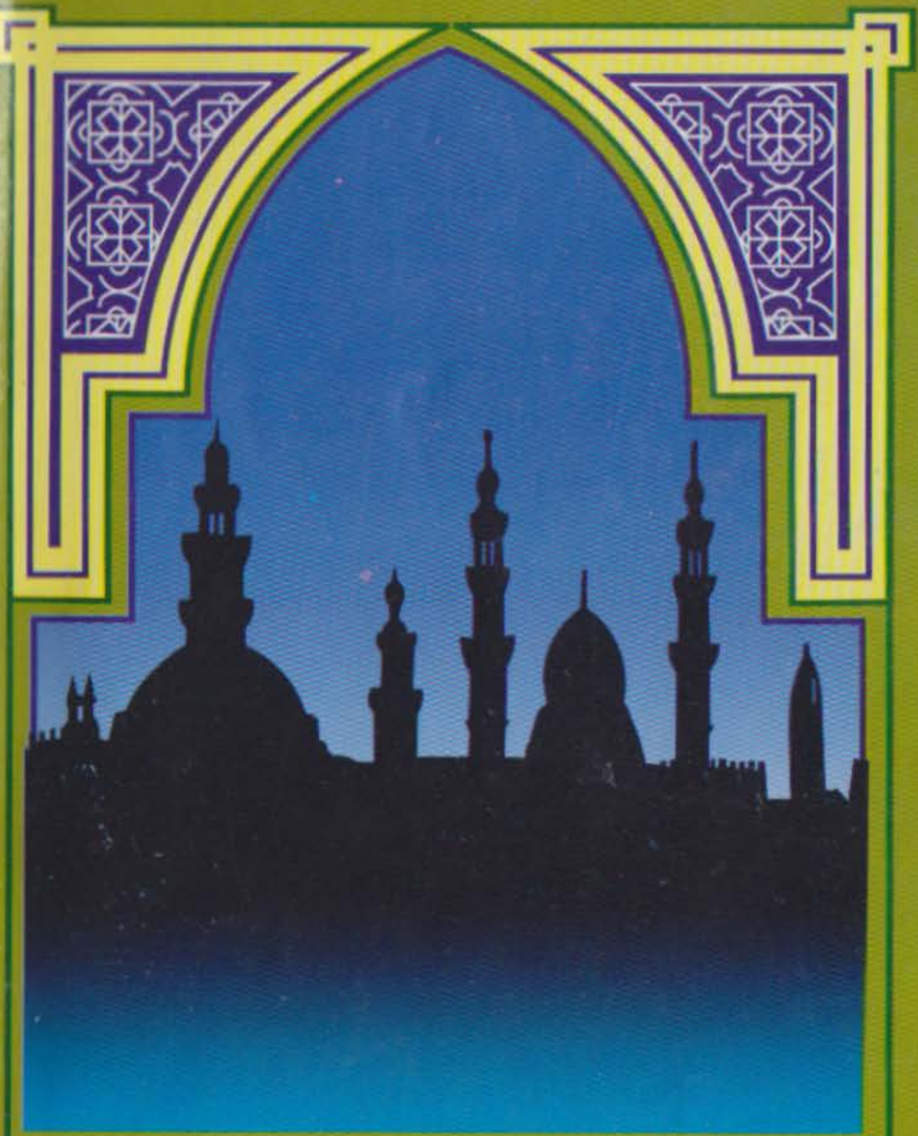

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

আধুনিক মুসলিম বিশ্ব

তুরস্ক ● ইরান ● আফগানিস্তান
● মিশর ● আরব রাষ্ট্রসমূহ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির শেষ পর্ব স্নাতকোত্তরের পাঠসূচির আলোকে রচিত

আধুনিক মুসলিম বিশ্ব

তুরস্ক ● ইরান ● আফগানিস্তান ● মিশর ● আরব রাষ্ট্রসমূহ

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

এম. এ. (ঢাকা) পি. এইচ. ডি. (লন্ডন)

বি. সি. এস. (শিক্ষা) অব:

অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। সাবেক সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

নভেল পাবলিশিং হাউস

২/৩ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০০৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন, ২০০৮
তৃতীয় সংস্করণ : আগস্ট, ২০১০
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১২

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক : তরিকউল্লাহ (তরুণ), নভেল পাবলিশিং হাউস, ২/৩ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; ফোন : ৯৫১১৩২৯, ৭১৭৩৩৯২, ০১৭১৫৩৬২২২৬, ০১৭১১৬৭০৭৬০
বর্ণবিন্যাস : নূর নবী (বাবর), ফোন : ০১৮২৯৮৫২৬৭৭, ০১৬৭৫৪৯৩৬৩২
মুদ্রণ : আল-মদীনা প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা; প্রচ্ছদ : এম. হারুন।

মূল্য ঃ তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

ISBN : 984-70205-0026-1

Adhunik Muslim Viswa : Turkey, Iran, Afghanistan, Egypt and Arab States by Prof Dr. Syed Mahmudul Hasan, Published by Novel Publishing House, 2/3 Paridus Road, Banglabazar, Dhaka-1100, Phone : 7116082, 7173392, 01715362226, 01711670760, Price : 350.00 Taka Only.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, বিশিষ্ট গবেষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
ড. মোহাম্মদ ইসহাকের প্রতি
উৎসর্গিকৃত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

শিক্ষা অজ্ঞতা, কূপমন্ডুকতা, হীনমন্যতা ও বৈরী মনোভাব দূর করে মহৎ জীবন গড়ার পাথেয় তৈরি করে দেয়। শিক্ষার আলো আসে বই থেকে। এ কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লেখকগণ রচনা করে গেছেন বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ, যা দ্বারা সমাজ, সংস্কৃতি ও মানবজীবন উন্নততর হয়েছে। মহান আল্লাহতায়ালার অশেষ কৃপায় আমি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে সৃজনশীল গ্রন্থাবলীর পাশাপাশি প্রায় ৬৫টি (সর্বমোট) ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়ক পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হই, যার বেশির ভাগই উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের উপযোগী। এ সমস্ত গ্রন্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নভেল পাবলিশিং হাউস কর্তৃক মে, ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম "মুসলিম শিল্পকলা ও স্থাপত্য" শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের পর উক্ত প্রকাশনা সংস্থা ২০০৬ সালের বই মেলায় প্রামাণ্য গ্রন্থ "আরব জাতীর ইতিহাস" বের করে। তাদের উৎসাহ ও আগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মাস্টার্স পাঠসূচির অন্তর্ভুক্ত "আধুনিক মুসলিম বিশ্ব : তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান, মিশর ও আরব রাষ্ট্রসমূহ" শীর্ষক গ্রন্থটি রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করি। এই রচনায় অনুপ্রেরণা আসে মূলত মধ্যপ্রাচ্যের মত তেল সমৃদ্ধ দেশসমূহকে নিয়ে পরাশক্তিদের প্রভাব বলয় সৃষ্টির অশুভ তৎপরতার কারণে। বলাই বাহুল্য যে, অটোমান সাম্রাজ্য ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তৃত ছিল এবং এই বিশাল দেশ ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে নিকট প্রাচ্য বা বর্তমান তুরস্কে সীমাবদ্ধ হল তা ইতিহাস স্বাক্ষ দেয়। তুরস্ক "Sick man of Europe" পরিণত হয়। এর মূলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের জীঘাংসামূলক আচরণ এবং স্বাক্ষী প্রাচ্য দেশীয় সমস্যা ও বলকান যুদ্ধ। তুরস্কের অবিংসবাদী নেতা কামাল আতাতুর্ক অটমান সালতানাতই নয় খিলাফতকে উচ্ছেদ করে তুরস্ককে একটি আধুনিক প্রগতিশীল ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ধাচে গড়ে তোলেন। মুসলিম সভ্যতায় তুরস্কের অবদান অপরিসীম। অনুরূপভাবে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ইরানের ইতিহাস সংঘাতপূর্ণ। ইরানে আধিপত্য বিস্তারে রুশ-ইঙ্গ দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে। এর মূল কারণ তেল বা কালো তরল সোনা (black liquid gold)। ইরানের ইতিহাসে প্রথম রেজাশাহ পাহলভী কর্তৃক পাহলভী বংশ প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগের সূচনা করে। রেজা শাহের পাশ্চাত্যকরণ নীতি কার্যকরী না হলেও মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা থেকে ইরান অনেকটা মুক্তি পায়। তার পুত্র দ্বিতীয় রেজা শাহ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে "শ্বেত বিপ্লব" প্রচলিত করেন। কিন্তু তিনি তা বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হন। ইরানের জাতীয় সম্পদ তেলকে জাতীয়করণ করে যিনি

www.pathagar.com

অমর হয়ে রয়েছিল তিনি ড. মোহাম্মদ মোসাদ্দেক। কিন্তু ইরানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দল এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে ড. মোসাদ্দেক পদচ্যুত হন। পরবর্তীকালে গোঁড়া মোল্লা শ্রেণীর নেতা আয়াতউল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর শাহ বিরোধী আন্দোলনে শাহ গদীচ্যুতই হলেন না নির্বাসিত হলেন। ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কট্টরপন্থী শিয়া মোল্লাদের একচ্ছত্র বিজয় হিসেবে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তান বহুদিন ইঙ্গ-রুশ প্রভাবাধীনে থাকায় রাজনৈতিক পরিবেশ কলুষিত হয়ে পড়ে। সর্বশেষ বাদশাহ জহির শাহ গদীচ্যুত হয়ে বর্তমানে ইতালীতে নির্বাসিত। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে রাশিয়া আফগানিস্তানে সমরাভিযান করে কাবুল দখল করে এবং তাদের তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করে। আফগানিস্তান থেকে রুশ বাহিনীর অপসারণের কাহিনী নির্ভিক মুজাহিদদের দ্বারা পরিচালিত একটি বীর গাঁথা রুশ-বাহিনীর অপসারণে রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে গোত্রীয় কলহ শুরু হয়, যা আফগানিস্তানের ইতিহাসে একটি রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত অধ্যায়। এর অবসান হয় তালেবানদের অভ্যুত্থানে। মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে সমগ্র আফগানিস্তানের ৯০% তালেবানগণ দখল করে কিন্তু নারী জাতির প্রতি অবমাননা, উৎপীড়ন ও কট্টর শরিয়তি আইনের প্রয়োগে তারা অতি শীঘ্র জনপ্রিয়তা হারায়। এর মধ্যে আরব বংশোদ্ভূত আল-কায়দার নেতা ওসামা বিন লাদেন তালেবানদের সমর্থন দিলে পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ২০০১ সনের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন, টাওয়ার ধ্বংস প্রাপ্ত হলে এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগনের হামলার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ আল-কায়দা নেতাকে দোষারোপ করে তাকে উৎখাত করার চেষ্টা করেন। এর ফলে আফগানিস্তানে তালেবানদের যারা উসামাকে আশ্রয় দিয়েছিল, ধ্বংস করার জন্য মার্কিন বোমারু বিমানগুলো কার্পেট বোমিং শুরু করে। অল্প দিনের মধ্যে তালেবান সরকারের পতন হয় এবং মোল্লা ওমর অন্তর্ধান করেন। যৌথ বাহিনী আফগানিস্তানে একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করে, যার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই।

"আধুনিক মুসলিম বিশ্ব ঃ তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান, মিশর ও আরব রাষ্ট্রসমূহ" গ্রন্থটি সম্ভবত একমাত্র গ্রন্থ এক সাথে উল্লিখিত মুসলিম দেশের তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের আলোচনা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় সংবর্ধিত সংস্করণে আধুনিক মিশর ও আরব রাষ্ট্রসমূহের (ইরাক, জর্দান, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, লেবানন, সাউদী আরব, সুদান, প্যালেস্টাইন সংযোজন কাজ হলো। শিক্ষার্থী ছাড়াও সাধারণ পাঠকের কাছে সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলী উপভোগ্য হবে বলে আমি মনে করি।

গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আমি নভেল পাবলিশিং হাউসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা

জুন, ২০০৮ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

www.pathagar.com

ভূমিকা

শিক্ষা অজ্ঞতা, কূপমন্ডুকতা, হীনমন্যতা ও বৈরী মনোভাব দূর করে মহৎ জীবন গড়ার পাথেয় তৈরি করে দেয়। শিক্ষার আলো আসে বই থেকে। এ কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লেখকগণ রচনা করে গেছেন বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ, যা দ্বারা সমাজ, সংস্কৃতি ও মানবজীবন উন্নততর হয়েছে। মহান আল্লাহতায়ালার অশেষ কৃপায় আমি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে সৃজনশীল গ্রন্থাবলীর পাশাপাশি প্রায় ৬৫টি (সর্বমোট) ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়ক পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হই, যার বেশির ভাগই উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের উপযোগী। এ সমস্ত গ্রন্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নভেল পাবলিশিং হাউস কর্তৃক মে, ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম "মুসলিম শিল্পকলা ও স্থাপত্য" শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের পর উক্ত প্রকাশনা সংস্থা ২০০৬ সালের বই মেলায় প্রামাণ্য গ্রন্থ "আরব জাতীর ইতিহাস" বের করে। তাদের উৎসাহ ও আগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মাস্টার্স পাঠসূচির অন্তর্ভুক্ত "আধুনিক মুসলিম বিশ্ব ঃ তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান" শীর্ষক গ্রন্থটি রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করি। এই রচনায় অনুপ্রেরণা আসে মূলত মধ্যপ্রাচ্যের মত তেল সমৃদ্ধ দেশসমূহকে নিয়ে পরাশক্তিদের প্রভাব বলয় সৃষ্টির অশুভ তৎপরতার কারণে। বলাই বাহুল্য যে, অটোমান সাম্রাজ্য ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তৃত ছিল এবং এই বিশাল দেশ উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে নিকট প্রাচ্য বা বর্তমান তুরস্কে সীমাবদ্ধ হল তা ইতিহাস স্বাক্ষ দেয়। তুরস্ক "Sick man of Europe" পরিণত হয়। এর মূলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের জীঘাংসামূলক আচরণ এবং স্বাক্ষী প্রাচ্য দেশীয় সমস্যা ও বলকান যুদ্ধ। তুরস্কের অবিংসবাদী নেতা কামাল আতাতুর্ক অটমান সালতানাতই নয় খিলাফতকে উচ্ছেদ করে তুরস্ককে একটি আধুনিক প্রগতিশীল ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ধাচে গড়ে তোলেন। মুসলিম সভ্যতায় তুরস্কের অবদান অপরিসীম। অনুরূপভাবে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ইরানের ইতিহাস সংঘাতপূর্ণ। ইরানে আধিপত্য বিস্তারে রুশ-ইঙ্গ দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে। এর মূল কারণ তেল বা কালো তরল সোনা (black liquid gold)। ইরানের ইতিহাসে প্রথম রেজাশাহ্ পাহলভী কর্তৃক পাহলভী বংশ প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগের সূচনা করে। রেজা শাহের পাশ্চাত্যকরণ নীতি কার্যকরী না হলেও মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা থেকে ইরান অনেকটা মুক্তি পায়। তার পুত্র দ্বিতীয় রেজা শাহ্ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে "শ্বেত বিপ্লব" প্রচলিত করেন। কিন্তু তিনি তা

www.pathagar.com

বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হন। ইরানের জাতীয় সম্পদ তেলকে জাতীয়করণ করে যিনি অমর হয়ে রয়েছিল তিনি ড. মোহাম্মদ মোসাদ্দেক। কিন্তু ইরানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দল এমন এক পর্যায়ে পৌছায় যে ড. মোসাদ্দেক পদচ্যুত হন। পরবর্তীকালে গোঁড়া মোল্লা শ্রেণীর নেতা আয়াতউল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর শাহ বিরোধী আন্দোলনে শাহ গদীচুতই হলেন না নির্বাসিত হলেন। ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কট্টরপন্থী শিয়া মোল্লাদের একচ্ছত্র বিজয় হিসেবে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তান বহুদিন ইঙ্গ-রুশ প্রভাবাধীনে থাকায় রাজনৈতিক পরিবেশ কলুষিত হয়ে পড়ে। সর্বশেষ বাদশাহ জহির শাহ গদীচ্যুত হয়ে বর্তমানে ইতালীতে নির্বাসিত। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে রাশিয়া আফগানিস্তানে সমরাভিযান করে কাবুল দখল করে এবং তাদের তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করে। আফগানিস্তান থেকে রুশ বাহিনীর অপসারণের কাহিনী নির্ভিক মুজাহিদদের দ্বারা পরিচালিত একটি বীর গাঁথা রুশ-বাহিনীর অপসারণে রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে গোত্রীয় কলহ শুরু হয়, যা আফগানিস্তানের ইতিহাসে একটি রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত অধ্যায়। এর অবসান হয় তালেবানদের অভ্যুত্থানে। মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে সমগ্র আফগানিস্তানের ৯০% তালেবানগণ দখল করে কিন্তু নারী জাতির প্রতি অবমাননা, উৎপীড়ন ও কট্টর শরিয়তি আইনের প্রয়োগে তারা অতি শীঘ্র জনপ্রিয়তা হারায়। এর মধ্যে আরব বংশোদ্ভূত আল-কায়দার নেতা ওসামা বিন লাদেন তালেবানদের সমর্থন দিলে পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ২০০১ সনের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন, টাওয়ার ধ্বংস প্রাপ্ত হলে এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগনের হামলার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ আল-কায়দা নেতাকে দোষারোপ করে তাকে উৎখাত করার চেষ্টা করেন। এর ফলে আফগানিস্তানে তালেবানদের যারা উসামাকে আশ্রয় দিয়েছিল, ধ্বংস করার জন্য মার্কিন বোমারু বিমানগুলো কার্পেট বোমিং শুরু করে। অল্প দিনের মধ্যে তালেবান সরকারের পতন হয় এবং মোল্লা ওমর অন্তর্ধান করেন। যৌথ বাহিনী আফগানিস্তানে একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করে, যার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই।

"আধুনিক মুসলিম বিশ্ব ঃ তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান" গ্রন্থটি সম্ভবত একমাত্র গ্রন্থ। এক সাথে উল্লিখিত পাশাপাশি তিনটি মুসলিম দেশের তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের আলোচনা পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থী ছাড়াও সাধারণ পাঠকের কাছে সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলী উপভোগ্য হবে বলে আমি মনে করি।

গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আমি নভেল পাবলিশিং হাউসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা

সেপ্টেম্বর, ২০০৬ — সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

www.pathagar.com

প্রকাশকের অভিমত

আমরা সংঘাতপূর্ণ পৃথিবীতে বাস করছি– এই সংঘাত মূলত স্বার্থান্বেষী মহলের সৃষ্টি। এক শ্রেণীর সুবিধাভোগকারী পরাশক্তি big power rivalry দ্বারা তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের আধিপত্যের প্রভাব বলয় সৃষ্টি করে আসছে। মুসলিম বিশ্ব তাদের আগ্রাসন নীতিতে ভীত ও সন্ত্রস্ত। রুশ ভাল্লুকের ছায়ায় যেমন ইংরেজ সরকার আতঙ্কিত তেমনি আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী সরকার তেলকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসন চালাতে দ্বিধা করছে না। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তান পরাশক্তির কবলে ছিল। এ সমস্ত দেশে কামাল আতাতুর্ক (তুরস্ক), রেজাশাহ পাহলভী (ইরান) এবং আমীর দোস্ত মোহাম্মদের (আফগানিস্তান) মত মহানায়কের আবির্ভাবে স্বাধীনতা সংরক্ষণই সম্ভব হয়নি; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়। অবশ্য ইরানে একসময় পাহলভী বংশের দ্বিতীয় রেজা শাহের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনী। অনুরূপভাবে আফগানিস্তান রুশ বাহিনীর দখলে গেলে প্রতিরোধ গড়ে উঠে এবং তারা বিতাড়িত হয়। কিন্তু গৃহযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে তালেবানদের আবির্ভাব ঘটে মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে। তাকে সহায়তা দেন আল-কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেন। তালেবানদের উৎপীড়ন ও গোড়াপন্থী নীতি তাদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এর ফলে ওসামাকে উৎখাতের অজুহাতে আমেরিকাসহ জোট বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। যাহোক, উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তান এবং দ্বিতীয় সংবর্ধিত সংস্করণে আধুনিক মিশর ও আরব রাষ্ট্রসমূহের (ইরাক, জর্দান, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, লেবানন, সাউদী আরব, সুদান, প্যালেস্টাইন সংযোজন কাজ হলো। প্রবীন ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুন হাসান অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

নভেল পাবলিশিং হাউস থেকে ইতিপূর্বে তার দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, একটি "মুসলিম শিল্পকলা ও স্থাপত্য" এবং অপরটি হচ্ছে "আরব জাতীর ইতিহাস"। পূর্বের গ্রন্থ দুটি পাঠক মহলে যেভাবে সমাদৃত হয়েছে আমরা আশা করি বর্তমান গ্রন্থটি "আধুনিক মুসলিম বিশ্ব ঃ তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তান" এবং আধুনিক মিশর ও আরব রাষ্ট্রসমূহের (ইরাক, জর্দান, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, লেবানন, সাউদী আরব, সুদান, প্যালেষ্টাইন) একইভাবে শিক্ষার্থী এবং সাধারণ পাঠকদের চাহিদা পূরণ করবে। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থটি তিনটি আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রের এক খণ্ডে প্রকাশিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ। মুদ্রণ ত্রুটি থাকলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

প্রকাশক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব ঃ তুরস্ক

প্রথম অধ্যায়	ঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে তুরস্ক	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ সংস্কার আন্দোলন ঃ তৃতীয় সেলিম ও দ্বিতীয় মাহমুদ	৩২
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা (১৮১৫–৭৮ খ্রি.)	৪৫
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ তানজিমাত আন্দোলন	৬৯
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ নব্য-তুর্কী আন্দোলন	৭৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ	৮৯
সপ্তম অধ্যায়	ঃ বলকান যুদ্ধ	৯৪
অষ্টম অধ্যায়	ঃ প্রথম মহাসমর ও তুরস্কের অবস্থান	১০২
নবম অধ্যায়	ঃ সেভার্স এবং লুসেনের চুক্তি	১১৪
দশম অধ্যায়	ঃ তুর্কী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন	১২১
একাদশ অধ্যায়	ঃ কামাল আতাতুর্ক এবং কামালবাদ	১২৮
দ্বাদশ অধ্যায়	ঃ তুর্কী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও কামালের অবদান	১৩৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ঃ তুরস্কে রাজনৈতিক দলসমূহ	১৫৭
চতুর্দশ অধ্যায়	ঃ কামালোত্তর তুরস্ক	১৬২
পঞ্চদশ অধ্যায়	ঃ ১৯৬০ সনের তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থান	১৬৭

দ্বিতীয় পর্ব ঃ ইরান

প্রথম অধ্যায়	ঃ আফসারী ও জান্দ বংশের শাসন	১৭৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ কাজার বংশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৮০
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ ইরানে 'বাবী' আন্দোলন	১৯১
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্যের সাংবিধানিক আন্দোলন	১৯৬
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ ১৯০৭ সনের ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন	২০৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ পারস্যের অর্থনৈতিক পুর্নগঠনে মরগান সুস্তারের অবদান	২১১
সপ্তম অধ্যায়	ঃ ইরান ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	২১৭
অষ্টম অধ্যায়	ঃ ১৯২১ সালের রুশ-পারস্য চুক্তি	২২০
নবম অধ্যায়	ঃ রেজা খানের অভ্যুত্থান এবং পাহ্লভী বংশ	২২৬
দশম অধ্যায়	ঃ ইরানে তেল জাতীয়করণ ও ড. মোসাদ্দেকের অবদান	২৪৭

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়	ঃ দ্বিতীয় রেজা শাহ্ পাহ্লভী এবং শ্বেত বিপ্লব	২৬১
দ্বাদশ অধ্যায়	ঃ পাহ্লভী বংশের পতন এবং ইসলামী বিপ্লব	২৭০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ঃ বিপ্লবোত্তর ইরানের পররাষ্ট্র নীতি এবং ইরান-ইরাক যুদ্ধ	২৮০

তৃতীয় পর্ব ঃ আফগানিস্তান

প্রথম অধ্যায়	ঃ আফগানিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বিংশ শতাব্দী	২৯১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ আমীর দোস্ত মুহম্মদ ও প্রথম আফগান যুদ্ধ	৩০৩
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ আমীর মুহম্মদ শের আলী ও দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ	৩০৯
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ আমীর আবদুর রহমানের রাজত্বকাল	৩১৪
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ আমীর আমানুল্লাহ ও তাঁর সংস্কারসমূহ	৩২০
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ বাদশাহ্ নাদির শাহের অভ্যুত্থান	৩৩১
সপ্তম অধ্যায়	ঃ বাদশাহ্ জহির শাহের শাসন	৩৩৯
অষ্টম অধ্যায়	ঃ সরদার দাউদ খানের শাসন	৩৪৩
নবম অধ্যায়	ঃ তালেবান সরকার ও মার্কিন আগ্রাসন (১৯৯৬-২০০১)	৩৪৬

চতুর্থ পর্ব ঃ আধুনিক মিশর ও আরব রাষ্ট্রসমূহ

প্রথম অধ্যায়	ঃ আধুনিক মিশর	৩৭৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ আরব রাষ্ট্রসমূহ	৪৫২
	১. সিরিয়া : সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	৪৫২
	২. সুদান-মিশর যুগ্ম শাসন (Condominium)	৪৫৯
	৩. মরক্কোর স্বাধীনতা আন্দোলন	৪৬৫
	৪. আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন	৪৭৫
	৫. সাউদী আরব : আব্দুল আজীজ ইবনে সাউদ	৪৮৬
	৬. আধুনিক ইরাক : সাদ্দাম হোসেন	৪৯৭
	৭. তিউনিসিয়া	৫০৭
	৮. লিবিয়া	৫১৭
	৯. লেবানন	৫২৫
	১০. প্যালেস্টাইন	৫২৯
	১১. ট্রান্সজর্দান	৫৩২
গ্রন্থ তালিকা		৫৩৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম পর্ব

তুরস্ক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে তুরস্ক

সোলায়মান-উত্তর যুগ

"সুলতান সোলায়মান ছিলেন প্রথম দশজন অটোমান সুলতানদের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।"-এভারসলের এই উক্তিটি যথার্থ, কারণ সুলতান মহামতি সোলায়মানের পর থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। এই পতনের মূলে বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক কারণ ছিল; প্রথমত, সোলায়মানের অধিকাংশ উত্তরাধিকারী ছিলেন অকর্মণ্য, অযোগ্য, বিলাসপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রস্ত। সোলায়মানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী 'নেশাগ্রস্ত সেলিম' (Salim the Sot) নামে পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, অটোমানগণ ইউরেশীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ রাজ্যের অধিপতি হন; কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সক্ষম হননি। এ কারণে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অসন্তোষের ফলে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তৃতীয়ত, ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেসাঁ ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ফলে ইউরোপে যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয় তার সাথে সমান তালে চলতে পারে নি বলে অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ইউরোপের প্রতিরোধ গড়ে উঠে। প্রাইস যথার্থই বলেন, "মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণে ইউরোপের সঙ্গে তুরস্ক তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে পারেনি।" এর ফলে তুরস্কে নানাবিধ সংস্কার সাধিত হলেও ইউরোপে যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা হয় তা একদিকে যেমন খ্রিস্টান ইউরোপীয়দের নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-ভাবনার দিকে উৎসাহিত করে, অপরদিকে বিধিবদ্ধ আইন-কানুনের ফলে তুরস্কে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়নি। চতুর্থত, এলান বুলক বলেন, "সোলায়মানের পর ইউরোপ ও অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। মনে হয় যে, মহান তুর্কী আন্দোলনের তৎপরতা ইউরোপে স্তিমিত হয়ে যায়, তারপর আর অগ্রসর হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপে যুদ্ধবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হলে অটোমানদের তুলনায় ইউরোপীয়গণ অধিকতর পারদর্শী হয়ে উঠে। এর ফলে জলে ও স্থলে তুর্কীদের প্রাধান্য ক্ষীণ হয়ে পড়ে। পঞ্চমত, সোলায়মানের পর তুর্কী সামরিক বাহিনীর শক্তি লোপ পেতে থাকে। তুর্কী নৌবহর বিভিন্ন রাজ্য জয়ে সহায়তা করে, এমনকি কনস্টান্টিনোপল দখলেও, কিন্তু মূলত ভেনিসীয় ও স্পেনীশ জাতির মত তুর্কিগণ সমুদ্রাভিযানে অনভ্যস্ত ছিল এবং তারা একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনে ব্যর্থ হয়। এ কারণে সোলায়মানের মৃত্যুর পর ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে লেপানটোর (Lepanto) যুদ্ধে তাদের পরাজয় ঘটে। অটোমানদের নৌবহর পুনর্গঠিত হলেও ভূমধ্যসাগরে মাল্টা ও ইতালীতে তাদের নৌ-

www.pathagar.com

অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এর ফলে, প্রাইসের ভাষায়, "তুর্কী নৌশক্তি পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।" স্থলবাহিনীও পূর্বের ক্ষিপ্রতা হারিয়ে ফেলে। এ কারণে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে হাফসবুর্গ বাহিনী সেন্ট গডহার্থ-এর রণক্ষেত্রে তুর্কী বাহিনীকে পরাজিত করে। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে কারা মোস্তফার নেতৃত্বে পরিচালিত সমরাভিযানে ষাট দিন অবরোধ করেও ভিয়েনা দখলে তুর্কিগণ ব্যর্থ হয়। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে কার্লোইটিজের সন্ধি (Treaty of Karlowitz) অনুযায়ী অস্ট্রিয়া সমগ্র হাঙ্গেরী লাভ করে এবং পোল্যান্ড, রাশিয়া ও ভেনিস পতনোন্মুখ অটোমান সাম্রাজ্যের অঞ্চলসমূহ দখল করতে থাকে। ষষ্ঠত, অটোমান সাম্রাজ্য একক জাতি দ্বারা গঠিত ছিলনা। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন জাতি, ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের প্রায় ২৫ হতে ৩০ লক্ষ লোকের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল অটোমান সাম্রাজ্য ছিল একটি সঙ্কর রাষ্ট্র। এর ফলে সাম্রাজ্যের ঐক্য, সংহতি ও স্থিতিশীলতা ব্যাহত হয়। সপ্তমত, রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি স্থগিত হলে সেনাবাহিনী বিশেষ করে জেনিসারী বাহিনীর মধ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং তারা যুদ্ধলব্ধ ধনরত্ন ও দাস-দাসী থেকে বঞ্চিত হয়ে বিবাহ করে নাগরিক জীবনযাপন করতে থাকে। এর ফলে দ্বিতীয় মুহম্মদ, সেলিম ও সোলায়মানের রাজত্বকালে অটোমান সেনাবাহিনীর যে সুখ্যাতি ছিল তা লোপ পায়। সেনাবাহিনীর দুর্বলতা পক্ষান্তরে রাজ্যের স্থিতিশীলতাকে ক্ষুণ্ন করে। অষ্টমত, সোলায়মানের পরে একশ্রেণীর দুর্বল রাজকর্মচারী বিশেষভাবে উজীরবর্গ এবং হেরেমের প্রভাবশালী সুলতানাগণ রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। এর নজীর পাওয়া যায় দ্বিতীয় সেলিমের রাজত্বকালে; মুহম্মদ সুকোল্লী ও কুপ্রিলি উজীরদের হাতেই ছিল রাজ্যশাসনের দায়িত্ব। নবমত, অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, সমগ্র অটোমান রাজ্যে কৃষিকার্য ও শিল্পের অনগ্রসরতা ও মধ্যযুগীয় ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। দশমত, তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনে অস্ট্রিয়ার মত রাশিয়াও সম্প্রসারণ দ্বারা আগ্রাসন নীতি চরিতার্থ করে। এর ফলে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয় এবং তুরস্ক "ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি" ('Sickman of Europ') নামে অভিহিত হয়।

দ্বিতীয় সেলিম (১৫৬৬-৭৪ খ্রি)

সোলায়মানের মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় পুত্র দ্বিতীয় সেলিম নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'নেশাগ্রস্ত সেলিম' (Salim the Sot) নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন, কারণ তিনি অত্যধিক মদ্যপায়ী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। পূর্বসূরিদের মত সেলিমের ব্যক্তিগত সাহস, প্রশাসনিক যোগ্যতা ও রণনৈপুণ্য ছিল না। এ কারণে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রধান উজীর সুকোল্লীর উপর। সোলায়মানের মৃত্যুর পর অটোমান সাম্রাজ্যে যে পতনের সূচনা হয় তা রোধ করবার প্রয়াস পান সুকোল্লী। তিনি রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সুলতান সেলিম তার হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন। সুকোল্লী রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রাখানে অভিযান করে ব্যর্থ হন। তার নির্দেশে তিউনিসিয়ায়ও একটি অভিযান প্রেরিত হয়। তুর্কিগণ তিউনিস জয় করলেও তারা বেশিদিন তিউনিস দখলে

www.pathagar.com

রাখতে পারেনি। ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী নৌবাহিনী ভেনিস প্রজাতন্ত্রের অধীনে সাইপ্রাস দ্বীপটি দখল করে। এর ফলে স্পেন, পোপ, সেভয়ের ডিউক, পারামার যুবরাজ ও মাল্টার খ্রিস্টান নাইটগণ একটি তুর্কী-বিরোধী মৈত্রীচুক্তি করে এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান চালায়। ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে লেপান্টোর যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তির নিকট তুর্কী নৌবহর বিধ্বস্ত হয়। এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে সুকোল্লী নৌ-অধ্যক্ষ উলুজের (Ouloud) নেতৃত্বে খ্রিস্টান শক্তির বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন এবং ভেনিসীয়দের সন্ধিচুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করেন। আট বৎসর রাজত্ব করে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সেলিম মৃত্যুবরণ করেন।

তৃতীয় মুরাদ (১৫৭৪-৯৫ খ্রি)

দ্বিতীয় সেলিমের উত্তরাধিকারী তার পুত্র তৃতীয় মুরাদ ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতালাভ করেন। তৃতীয় মুরাদও অযোগ্য, অকর্মণ্য ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তিনিও তার পিতার মত প্রভাবশালী প্রধানমন্ত্রী সুকোল্লীর প্রভাবাধীন ছিলেন। তার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা পারস্য সাম্রাজ্যের তুরস্ক আক্রমণ। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে পারস্য তুরস্ক আক্রমণ করে। উজীর সুকোল্লী মোস্তফা পাশার নেতৃত্বে এশিয়া মাইনর ও পারস্যে অভিযান প্রেরণ করেন। পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে পারস্য বাহিনী পরাজিত হয়। জর্জিয়া, আযারবাইজান, তাব্রিজ, লুরিস্তান তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সঙ্গে পারস্যের সন্ধি হয়। সাইপ্রাস, জর্জিয়া, তিউনিসিয়া, ইয়েমেন, ক্রীট অধিকৃত হলে ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের পর অটোমান সাম্রাজ্যের সীমানা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় এবং এই সম্প্রসারণে সুকোল্লীর অবদান অনস্বীকার্য। সুকোল্লীর মৃত্যুর পর অপদার্থ সুলতান তৃতীয় মুরাদ সুলতানা বুফো (Sultana Buffo) নামক একজন প্রভাবশালী ভেনিসীয় হেরেম মহিলার দ্বারা পরিচালিত হন। মুরাদ মদ্যপান ও হেরেমের বিলাস-বাসনে কালাতিপাত করেন। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় মুরাদ ইহলোক ত্যাগ করেন।

পরবর্তী সুলতানগণ

তৃতীয় মুরাদের পুত্র তৃতীয় মুহম্মদ ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। তিনি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তার উনিশটি ভ্রাতাকে হত্যা করেন। তিনি সম্পূর্ণ অযোগ্য ও বিলাসপ্রিয় শাসক ছিলেন এবং হেরেমের প্রভাবশালী মহিলাদের প্রভাবাধীন ছিলেন। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রথম আহম্মদ তুর্কী সুলতান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। চৌদ্দ বছর রাজত্ব করে ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার ভ্রাতা মোস্তফা। মোস্তফা উন্মাদ ছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দ্বিতীয় ওসমানকে সিংহাসনে বসান হয়। চার বছরের শাসনকালে তিনি জেনিসারীদের বিরাগভাজন হন এবং তারা তাকে পদচ্যুত ও হত্যা করে। ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় উন্মাদগ্রস্ত সুলতান মোস্তফা সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাকে অপসারণ করা হয় এবং দ্বিতীয় ওসমানের প্রথম পুত্র চতুর্থ মুরাদ তার স্থলাভিষিক্ত হন।

www.pathagar.com

চতুর্থ মুরাদ ও তার উত্তরাধিকারিগণ (১৬২৩-৪০ খ্রি)

১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে বার বছর বয়সে চতুর্থ মুরাদ ক্ষমতালাভ করেন। অপরিণত বয়স্ক থাকায় তিনি তার মাতা সুলতানা ভালিদের তত্ত্বাবধানে রাজত্ব পরিচালনা শুরু করেন। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তিনি স্বহস্তে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি যুদ্ধাভিযান ও প্রশাসনকার্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি অটোমানদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য স্বয়ং পারস্যে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং পারস্যের নিকট থেকে বাগদাদ ও বসরা পুনরুদ্ধার করেন। আঠার বছর রাজত্ব করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার উত্তরাধিকারী ছিলেন তার ভ্রাতা প্রথম ইব্রাহিম। ইব্রাহিম ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অযোগ্য শাসক ছিলেন। ফলে তার উজীর কারা মোস্তফা ক্ষমতা হস্তগত করেন। ক্ষমতালিপ্সার জন্য কারা মোস্তফার বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ ও বিদ্রোহ শুরু হয় এবং তিনি নিহত হন। আট বছর রাজত্বের পর ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে প্রথম ইব্রাহিম নিহত হন এবং তার স্থলে তার পুত্র চতুর্থ মুহম্মদ ক্ষমতার অধিকারী হলেন। তুরস্কের ইতিহাসের শেষভাগে ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দে সোলায়মানের মৃত্যুর পর থেকে ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সুকোল্লী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তার মৃত্যুর পর থেকে ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হেরেমের মহিলাগণ রাজকার্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।

কুপ্রিলি উজীরবর্গ

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অটোমান সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতি হতে থাকে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সুলতানদের অযোগ্যতা, সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ, দুর্নীতিপূর্ণ প্রশাসন, হেরেমের প্রভাব প্রভৃতি কারণে তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে তখন চতুর্থ মুহম্মদের রাজত্বকালে কুপ্রিলি উজীরবর্গের অভ্যুদয়ে এই পতন সাময়িকভাবে রোধ হয়। ১৬৫৬ থেকে ১৭০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছেচল্লিশ বছর আলবেনীয় কুপ্রিলি পরিবারের চারিজন প্রভাবশালী সদস্য অটোমান সাম্রাজ্যে অসামান্য অবদান রাখেন। এ পরিবারের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা সদস্য ছিলেন মুহম্মদ কুপ্রিলি। তিনি আলবেনিয়ার অধিবাসী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে এশিয়া মাইনরের আমাসিয়া অঞ্চলের কুপ্রিলি শহরে বসতি স্থাপন করেন। অতি সামান্য অবস্থা থেকে মুহম্মদ কুপ্রিলি স্বীয় মেধা ও যোগ্যতাবলে দামেস্ক, ত্রিপলী এবং জেরুজালেমের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। সত্তর বছর বয়সে সুলতানা ভালিদের পরামর্শমত ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে তাকে প্রধান উজীরের পদে বহাল করা হয়। চতুর্থ মুহম্মদের রাজত্বকালে মুহম্মদ কুপ্রিলি অসামান্য ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম প্রশাসনকে কলুষমুক্ত করবার মানসে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী, অসৎ বিচারপতি, অযোগ্য সেনাধ্যক্ষ এবং বিদ্রোহী সৈন্যদের হত্যার আদেশ দেন। যারা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তারাও এই হত্যালীলা থেকে বাদ পড়েনি। এরূপ কঠোর নীতি অবলম্বনের ফলে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা স্থাপিত হয় এবং সেনাবাহিনী পুনরায় সুশৃঙ্খল ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠে। তিনি বলিষ্ঠ হস্তে এশিয়া মাইনর ও অপরাপর স্থানের বিদ্রোহ দমন করেন। তুর্কী নৌবাহিনীকে পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করা হয়। মুহম্মদ কুপ্রিলির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পুনরায় তুর্কী নৌবহর এজিয়ান সাগরে প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হয়। ভেনিসের

www.pathagar.com

সঙ্গে যুদ্ধে তুর্কিগণ সাফল্য অর্জন করে। লেমনস এবং টেনেডস দ্বীপদ্বয় তুরস্ক পুনরায় উদ্ধার করে। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পাঁচ বছর তিনি অসীম দক্ষতা ও অসামান্য মেধার সঙ্গে রাজ্যশাসন করেন।

মুহম্মদ কুপ্রিলির মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র আহম্মদ কুপ্রিলি রাজমাতা সুলতানা ভালিদের অনুকম্পায় সর্বময় প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভ করেন। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে আহম্মদ কুপ্রিলি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তুর্কী ঐতিহাসিকদের মতে, "তিনি অটোমান সাম্রাজ্যের রাজনীতিবিদদের দীর্ঘ তালিকায় সুকোল্লী ব্যতীত সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা ছিলেন"। প্রধান উজীরের পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এ কারণে তার দীর্ঘ পনের বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। তিনি ইসলামের আইনকানুন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করতেন। কিন্তু অমুসলমান সম্প্রদায়ের উপর কোনরূপ অত্যাচার করতেন না। পক্ষান্তরে তার শাসনামলে সর্বজাতির পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা বজায় ছিল। তিনি খ্রিস্টান প্রজাদের গীর্জা নির্মাণ ও সংস্কারের প্রতি নিষেধাজ্ঞা বিলোপ করেন, রায়তদের আর্থিক উন্নতি বিধানকল্পে করের হার লাঘব করেন। ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তার শাসন ছিল খুব উদার ও জনপ্রিয়।

আহম্মদ কুপ্রিলি খ্রিস্টান ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য এবং তেইশটি কামানসহ অস্ট্রিয়ার দিকে অগ্রসর হন। দানিয়ূব অতিক্রম করে নেইহাউসেল (Neuhausel) অধিকার করেন। কিন্তু পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেন্ট গথহার্ডের সন্নিকটে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর সম্মিলিত বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। এই যুদ্ধে প্রায় দশ হাজার তুর্কী সৈন্য নিহত হয়। এই যুদ্ধের তাৎপর্য অপরিসীম। কারণ এর ফলে খ্রিস্টান ইউরোপ শুধু ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মোহাকের যুদ্ধে তুর্কীদের হস্তে পরাজয়ের গ্লানি মোচনই করল না, বরং তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হল। তুরস্ক ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ভাস্কার (Vascar)-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এবং এটি ছিল মোটামুটি সিলভাটোরোকের চুক্তির পুনরাবৃত্তি। এ সন্ধির শর্তানুযায়ী টানসিলভানিয়া থেকে তুর্কী ও অস্ট্রীয় সৈন্য অপসৃত হল এবং সেরিভাম ও নেউহাউসেল ব্যতীত অস্ট্রিয়ার সমগ্র অঞ্চল তুরস্ককে ছেড়ে দিতে হল।

১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে আহম্মদ কান্দিয়ায় যুদ্ধাভিযান করেন এবং তিন বছর অবরোধ করে রাখেন। ভেনিসীয়দের বিরোধিতা সত্ত্বেও দ্বীপটি তুরস্কের দখলে আসে এবং ভেনিসীয় প্রজাতন্ত্র তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ক্রীট অধিকৃত হলে তুর্কীদের সেন্ট গথহার্ড যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি মুছে যায়। আহম্মদ ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ডে সমরাভিযান করেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ইউক্রেনের শাসকদের পোলিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহায্য দান করা। পোল্যান্ডের রাজা রাশিয়ার জারের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে সমরপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তুরস্ক ক্যামিনিক (Kaminic) দখল করে এবং পোল্যান্ডের রাজা পরাজিত হয়ে বুকাকের সন্ধি (Treaty of Bucacs) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এ সন্ধির শর্তানুযায়ী ইউক্রেন, পোডোলিয়া ও

www.pathagar.com

ক্যামিনিক তুরস্কের অধীনে আসে। কিন্তু পরে পোলগণ এ সন্ধি অমান্য করে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধ বার বছর স্থায়ী হয়। ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে ককজিমে (Choczim) এবং ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে লেমবার্গে (Lemberg) তুর্কীবাহিনী পোলদের হাতে পরাজয় বরণ করে। কিন্তু ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে আহম্মদ কুপ্রিলি ইব্রাহিম পাশার নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করে পোলদের বিধ্বস্ত করেন, এর ফলে সমগ্র পেডোলিয়া তুরস্কের আয়ত্তে আসে। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত জুরাওনার সন্ধি (Treaty of Zurawna) অনুযায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শেষবারের মত পোলগণ তুর্কীদের হস্তে ইউক্রেণ, পেডোলিয়া ও ক্যামিনিক অর্পণ করতে বাধ্য হয়।

১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে আহম্মদ কুপ্রিলির মৃত্যুর পর সুলতান চতুর্থ মুহম্মদ স্বীয় জামাতা কারা মোস্তফাকে উজীর নিযুক্ত করেন। আহম্মদ ছিলেন উদার, বিচক্ষণ ও মেধাসম্পন্ন কিন্তু মোস্তফা ছিলেন উগ্রপন্থী, উচ্চাভিলাসী ও হিংস্র প্রকৃতির। কারা মোস্তফা দানিয়ূব অতিক্রম করে ইউক্রেনে অভিযান করেন। এর ফলে পোল এবং রুশদের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। এই শত্রুতা ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল এবং পরিশেষে তুরস্ক বিপর্যয়ের ফলে রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া রাজা লিওপোল্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ লুইয়ের মধ্যে শত্রুতার সুযোগে কারা মোস্তফা অস্ট্রিয়ায় অভিযান করেন। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সৈন্যসহ দানিয়ূব অতিক্রম করে ভিয়েনা অবরোধ করেন। এই সময় অস্ট্রিয় সম্রাটের মাত্র পঁচিশ হাজার সৈন্য ছিল এবং দুর্গটিও অরক্ষিত ছিল। প্রথম অবরোধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে পোলদের আগমনের পূর্বেই ভিয়েনা কারা মোস্তফার হস্তগত হত, কিন্তু তিনি দূরবর্তী দুর্গসমূহ অধিকারে অধিক সময় ব্যয় করায় তার এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার কারা মোস্তফা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ভিয়েনা দখল করতে সক্ষম হন নি। পোলদের আগমনে অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী হয় এবং কারা মোস্তফা দুর্গ অবরোধে বিলম্ব করাতে তিনি খ্রিস্টান বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। ভিয়েনা দুর্গ অবরোধের ব্যর্থতা ইউরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট তুরস্কের সামরিক অক্ষমতা ও দুর্বলতা প্রকাশ পায়; অপরদিকে খ্রিস্টান ইউরোপের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এভারসলে বলেন, "এই বিপর্যয় অটোমান সাম্রাজ্যের জন্য মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এটি শেষবারের মত তুর্কী সামরিক রাষ্ট্রের মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে। দুশত বছর যাবৎ মধ্য-ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের অটোমান আক্রমণের যে ভীতি ছিল তা অপসারিত হল।" কারা মোস্তফা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন, কিন্তু সুলতানের নির্দেশে তিনি ধৃত ও নিহত হন।

কারা মোস্তফার মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করেন আহম্মদ কুপ্রিলির ভ্রাতা মোস্তফা কুপ্রিলি। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান চতুর্থ মুহম্মদ অযোগ্যতার অভিযোগে সিংহাসনচ্যুত হন এবং তার ভ্রাতা দ্বিতীয় সোলায়মান ক্ষমতালাভ করেন। দ্বিতীয় সোলায়মান মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করে ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে হাঙ্গেরীতে একটি তুর্কী বাহিনী প্রেরিত হয় এবং হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস চালান হয়। কিন্তু সমগ্র বলকান উপদ্বীপে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। দ্বিতীয় সোলায়মানের দুর্বলতার সুযোগে খ্রিস্টানগণ ইকলাও দুর্গ, বেলগ্রেড, বসনিয়া, নীস,

www.pathagar.com

ইউক্রেন প্রভৃতি অধিকার করে। গ্রীস ও আলবেনিয়া ভেনিসীয়গণ দখল করে এবং ভেনিস, পোপ, মাল্টার নাইট এবং তাসকেনীর ডিউকের সম্মিলিত তৎপরতায় ভূমধ্যসাগর থেকে তুর্কী বাহিনীর প্রভুত্ব বিলুপ্ত হয়। এ সময় তুর্কী প্রধান উজীর মোস্তফা কুপ্রিলি প্রশাসনিক সংস্কার দ্বারা রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েমের প্রয়াস পান। খ্রিস্টানদের প্রতি তিনি উদারনীতি পোষণ করেন। এ কারণে তিনি 'ধার্মিক কুপ্রিলি' (Kuprili the Virtuous) নামে পরিচিত ছিলেন। মোস্তফা মাত্র দুই বছর উজির ছিলেন এবং ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রীয়দের সঙ্গে সংঘটিত স্টানকামার (Stankamar) যুদ্ধে নিহত হন। দ্বিতীয় সোলায়মানের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় আহম্মদ ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সুলতানরূপে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। রাজ্য শাসনে তাঁর কোন যোগ্যতা ছিল না এবং হেরেমে আরাম-আয়েসে তিনি কালাতিপাত করতেন। দ্বিতীয় আহম্মদের রাজত্বকালে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। রণক্ষেত্রে তুর্কীদের শক্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। দ্বিতীয় আহম্মদ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং চতুর্থ মুহম্মদের পুত্র দ্বিতীয় মুস্তফা সিংহাসন লাভ করেন। ক্ষমতায় সমাসীন থেকে তিনি কঠোর হস্তে শাসন করতে থাকেন এবং তুর্কীদের পরাজয়ের গ্লানি মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি তার পূর্ববর্তী সুলতানদের অপেক্ষা যোগ্যতর ছিলেন। খ্রিস্টানদের নিকট পরাজয়ে তুর্কী মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলে দ্বিতীয় মুস্তফা একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে বেলগ্রেড থেকে তেমেসভারে (Temesvare) গমন করেন। অস্ট্রীয়দের পরাজিত করে তিনি কতিপয় দুর্গ দখল করেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে জয়মাল্য দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী বছর ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে মুস্তফার হাঙ্গেরী অভিযান ব্যর্থ হয়। জেন্টা (Zenta) রণক্ষেত্রে অস্ট্রীয় ও তুর্কী বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এবং সুলতান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এ যুদ্ধে অসংখ্য সেনাধ্যক্ষ, প্রধান উজীর, জেনিসারী বাহিনীর তিরিশজন পাশা ও অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়। এ যুদ্ধে তুর্কী সামরিক শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এ সামরিক বিপর্যয়ে বিচলিত হয়ে সুলতান হোসেন কুপ্রিলি নামে আহম্মদ কুপ্রিলির এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রধান উজীর পদে নিযুক্ত করেন। হোসেন কুপ্রিলি পরিবারের চতুর্থ উজীর ছিলেন। হোসেন অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ভিয়েনায় প্রথম অবরোধের পর তুর্কিগণ নয়বার পরাজয় বরণ করে এবং নয়টি সুরক্ষিত বৃহৎ দুর্গ হস্তচ্যুত হয়। এমতাবস্থায় তিনি গ্রেট ব্রিটেন ও হল্যাণ্ডের মধ্যস্থতায় অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ১৬৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত এই চুক্তিটি কার্লোইটিজের সন্ধি (Treaty of Carlowtiz) নামে পরিচিত। এ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় একটি শান্তি কংগ্রেসে এবং রাশিয়া সর্বপ্রথমে এই সভায় যোগদান করে।

সন্ধির শর্তানুযায়ী অস্ট্রিয়া ট্রানসিলভানিয়া এবং শ্লোভেনিয়া লাভ করে। এ ছাড়া মারেশ নদীর উত্তর এবং হীস নদীর পশ্চিমে হাঙ্গেরীর অঞ্চলসমূহও অস্ট্রিয়াকে প্রদান করা হয়। এর ফলে হাঙ্গেরীতে তুর্কী সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পায়। অস্ট্রীয় সম্রাটকে হাঙ্গেরী এবং ট্রানসিলভানিয়ার জন্য কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ভেনিস প্রজাতন্ত্র মেরিয়া এবং আলবেনিয়া লাভ করে কিন্তু করিন্থের উত্তরাঞ্চল তুর্কীগণ ছাড়তে বাধ্য হয়। জাভা দ্বীপের জন্য ভেনিসকে কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পোল্যান্ড পেডোলিয়া দখল করে। রাশিয়া আজফ (Azoff) এবং আজফের উত্তরাঞ্চল

www.pathagar.com

লাভ কর। এভারসলে বলেন, "কার্লো্ইটিজের সন্ধি ইউরোপের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।" এর ফলে সর্বপ্রথম স্থির হয় অটোমান তুরস্কের মর্যাদা ইউরোপের অপরাপর শক্তিবর্গ বিবেচনা করবে।

হোসেন কুপ্রিলি মাত্র তিন বছর প্রধান উজীর ছিলেন এবং ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সর্বশেষ কুপ্রিলি পরিবারের সদস্য ছিলেন উজীর নোমান কুপ্রিলি। ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজকীয় পদমর্যাদা লাভ করেন কিন্তু তার পূর্বসূরিদের মত তিনি দক্ষ ও যোগ্য শাসক ছিলেন না।

হোসেন কুপ্রিলির মৃত্যুর পর সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর ভ্রাতা তৃতীয় আহম্মদ ক্ষমতা লাভ করেন। ত্রিশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে তৃতীয় আহম্মদ ১৭০৩ হতে ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাতাইশ বছর রাজত্ব করেন। এ সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি মন্ত্রী অথবা হেরেমের মহিলাদের প্রভাবমুক্ত ছিলেন। বিশেষ কোন মন্ত্রীর হাতে শাসনক্ষমতা যাতে কুক্ষিগত হতে না পারে সেজন্য তিনি প্রথম পনের বছরে বারজন প্রধান উজীর নিযুক্ত করেন। সুলতান আহম্মদ যোদ্ধা ছিলেন না, ফলে অটোমান সাম্রাজ্যের বহু অঞ্চল খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায়। আজফ শহর এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল রুশ সাম্রাজ্য দ্বারা অধিকৃত হয়। হাঙ্গেরীর কিয়দংশ ও সার্বিয়া, ওয়ালাচিয়া সুলতানের হস্তচ্যুত হয়, এমনকি পারস্যের অধিকৃত অঞ্চল ভাগ-বাঁটোয়ারা করবার জন্য রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সমঝোতা হয়। রুশ-তুরস্ক শত্রুতার সূত্রপাত হয় ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে। রাশিয়ার জার মহান পিটার ক্রিমিয়া দখলের অভিলাষে সমরপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সুলতান আহম্মদ পিটারের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে প্রধান উজীর বালতাদজী মুহম্মদ পাশার নেতৃত্বে প্রুথ নদীর অপর পারে মোলদাভিয়াতে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। রুশ বাহিনীর সঙ্গে তুর্কী বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে এবং পিটার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। পিটার তুর্কী সৈন্যদের দ্বারা বন্দী হন এবং রাণী ক্যাথারিন কয়েক সহস্র রুবল ক্ষতিপূরণ দিয়ে তুর্কী প্রধানমন্ত্রীর হাত হতে পিটারকে উদ্ধার করেন। রাশিয়া ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সঙ্গে প্রুথের অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এর ফলে তুরস্ক আজফ ফিরে পেলেও সুলতান তা নাকচ করেন। কিন্তু দুই বছর পরে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রুথের চুক্তিকে পুনরায় বলবৎ করা হয়। সুলতান আহম্মদ ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসের বিরুদ্ধে একটি নৌ-বাহিনী প্রেরণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মেরিয়া পুনর্দখল করা। প্রধানমন্ত্রী দামাদ পাশার নেতৃত্বে নৌ-বহর প্রেরিত হয় এবং করিস্থ তুরস্কের অধিকারে আসে। এরপর তুর্কী বাহিনী দুই দলে বিভক্ত হয়ে মদন করণ ও নাভার্যাতানা দখল করে। ভেনিসের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তুর্কিগণ বথয়্য ও আওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভেনিসিয়ানদের বহিষ্কার করতে চাইলে অস্ট্রীয় সম্রাট হস্তক্ষেপ করেন। এর ফলে ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী বাহিনী দামাদ পাশার নেতৃত্বে বেলগ্রেডে উপস্থিত হয় এবং পরে পিটার ওয়ারদিনের দিকে অগ্রসর হয়। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও দামাদ পাশা পরাজিত ও নিহত হন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার পুনরায় যুদ্ধ বাধে এবং প্রিন্স ইউয়ানের নেতৃত্বে অস্ট্রীয়বাহিনী তুর্কীদের পরাজিত করে বেলগ্রেড দখল করে। কিন্তু বাইশ বছর পরে বেলগ্রেড থেকে অস্ট্রীয়দের পুনরায় বহিষ্কার করে তুর্কিগণ শহরটি অধিকার করে।

www.pathagar.com

অস্ট্রিয়া-তুরস্কের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় ইংল্যাণ্ড এবং হল্যাণ্ডের মধ্যস্থতায়। কার্লোইটিজের সন্ধির পূর্বে যেমন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, অনুরূপ একটি বৈঠক বসে প্যাসারোভিচে। ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত এ চুক্তি মোতাবেক মোরিয়া তুরস্কের অধিকারে থাকে এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাট হাঙ্গেরী, সার্বিয়া, ওয়ালাচিয়া ও রুমানিয়ার কিয়দংশ লাভ করেন। পিটার ওয়ারদিন এবং বেলগ্রেডের যুদ্ধে তুর্কী বাহিনীর পরাজয়ে অটোমান সামরিক ক্ষমতার দুর্বলতা প্রতীয়মান হয়। বলা বাহুল্য হাঙ্গেরী, সার্বিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঞ্চল তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও সমাজ, ধর্ম ও কৃষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিল। এ কারণে এ সমস্ত অঞ্চল একত্রীভূত হতে পারেনি এবং তুর্কী বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী শাসনের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়।

সুলতান আহম্মদের রাজত্বের শেষভাগে তুরস্কের সঙ্গে পারস্যের সংঘর্ষ বাধে। সাফাভী বংশের রাজত্বকালের শেষদিকে শাহ হোসেন আফগান মাহমুদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য তুরস্ক এবং রাশিয়ার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। পিটার কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলে সুলতান আহম্মদ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেন। এর ফলে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে একটি চুক্তি হয়। এতে উত্তর পারস্যের অঞ্চল উভয়ের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করবার অভিসন্ধি ছিল। এই চুক্তি মোতাবেক তুরস্ক পারস্যের জর্জিয়া, এরিভান, তাব্রিজ, বাকু অঞ্চল এবং রাশিয়া শীভাস ও অপরাপর অঞ্চল লাভ করবে। তুরস্ক অভিযান পরিচালনা করে তাব্রিজ, হামাদান ও এরিভান অধিকার করে। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে জেনিসারী বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষনা করলে সুলতান আহম্মদ সিংহাসন ত্যাগ করেন।

সুলতান আহম্মদের স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও দ্বিতীয় মুস্তফার পুত্র প্রথম মাহমুদ। মাহমুদের রাজত্বকালে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল রাশিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ। তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার অপমানজনক চুক্তির গ্লানি মোচনের জন্য রুশ জারিনা অ্যান তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনায় উৎসাহ দান করেন শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ মার্শাল মুনিচ্ (Munich)। কিন্তু রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বৃদ্ধ খোজা রণক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুনিচ আজফ দখল করে ক্রিমিয়ায় অভিযান করলে তুর্কী সুলতান বিচলিত হন। রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড শঙ্কিত হয়ে উঠে, কারণ ভূমধ্যসাগরে রুশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যাহত হবে। এ কারণে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড রুশবিরোধী নীতি অবলম্বন করে তুরস্ককে সমর্থন করে। ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া রুমানিয়া ও সাইবেরিয়ায় অভিযান করে। কিন্তু অভিযান সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। অস্ট্রীয়দের শত্রুতা নির্মূল করবার জন্য সুলতান মাহমুদ যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করেন। তিনি সেমেনদিয়া ও ওরশোভা দখল করে বেলগ্রেডে অস্ট্রীয় বাহিনীর মোকাবেলা করেন। অপরদিকে রুশ সেনাপতি মুনিচ্ ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে পেডোলিয়ায় সমরাভিযান করেন এবং এর ফলে পোল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতায় তিনি হস্তক্ষেপ করেন। মুনিচ্ মোলদাভিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে খোজিমে (Khoczim) তুর্কী বাহিনীকে পরাস্ত করেন। সুলতান প্রথম মাহমুদ প্রধান উজীর আলী মোহাম্মদের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পাঠান এবং

www.pathagar.com

ক্রোটযকীর (Krotzke) যুদ্ধে তুর্কী বাহিনী অস্ট্রীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে। অস্ট্রীয়-বাহিনীর পরাজয়ে অটোমান তুরস্কের সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্যান্স ও রাশিয়ার মধ্যস্থতায় তুরস্কের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার যে সন্ধি হয় তা বেলগ্রেডের সন্ধি (Treaty of Belgrade) নামে পরিচিত। এ সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়া মোলদাভিয়া, ক্রিমিয়া এবং ইউক্রেন অঞ্চল তুরস্ককে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের তীরে একখণ্ড ভূমি লাভ করলেও কৃষ্ণসাগর ও আরব সাগরে রুশ নৌবহরের তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। প্যাসারোভিচ এবং বেলগ্রেড চুক্তি দুটি তুরস্কের অনুকূলে ছিল। বেলগ্রেড চুক্তির শর্তাবলি রাশিয়ার জন্য ছিল অপমানজনক এবং সে কারণে এটি লঙ্ঘন করবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন রুশ জারিনা অ্যান।

১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান প্রথম মাহমুদের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা তৃতীয় ওসমান ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেন। তিনি কুঁজবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হলে তার ভ্রাতা তৃতীয় মোস্তফা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার আমলে রাশিয়ার জরিনা ক্যাথারিন তুরস্ক আক্রমণ করেন। রাশিয়া প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি করে তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নীতি চরিতার্থ করবার প্রয়াস পায়। বেলগ্রেড চুক্তি লঙ্ঘন করে রাশিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে তুরস্ক ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উভয় পক্ষে বহুদিন সংঘর্ষ চলে; কিন্তু কোন দিকেই জয়-পরাজয় নিশ্চিত হয় নি। জলে ও স্থলে রুশ-তুরস্ক সংঘর্ষ ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশেষে কুসুক কাইনারজির (Kutchuk Kainarji) সন্ধি অনুযায়ী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়া ক্রিমিয়া, মোলদাভিয়া, ওয়ালাচিয়া ও বেসারাবিয়া তুরস্ককে ছেড়ে দেয়। তাতারদের স্বাধিকার মেনে নেয়া হয়। রাশিয়া কের্চ (Kerch), ইয়েনিকেল (Yenikale), আজফ এবং কিনবান অধিকার করে। এর ফলে পরবর্তীকালে ক্রিমিয়া অঞ্চলে রাশিয়ার পক্ষে তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নীতি পরিচালনা করা সম্ভব হয়। এ সন্ধি মোতাবেক তুরস্কে খ্রিস্টান (গ্রীক চার্চ) প্রজাদের উপর রাশিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত হয় রাশিয়ার উপর। কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগরে রুশ জাহাজ চলাচলের অনুমতি লাভ করে কিন্তু দার্দানেলিস এবং বসফোরাসে রুশ নৌবহরের তৎপরতা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ এ সন্ধিতে পাওয়া যায় না। এই চুক্তিতে পোল্যাণ্ডের ভাগ্য সম্বন্ধে কিছু নির্ধারিত হয় নি। অটোমান তুরস্ককে তিনি বছরে চল্লিশ লক্ষ্য রুবল প্রদান করবার শর্ত আরোপিত হয়। এভারসলে যথার্থই বলেন, ঐতিহাসিকগণ দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে যে, "কুচুক কাইনারজির সন্ধি, তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধিকতর অধঃপতনের সুচনা করে।"

সুলতান তৃতীয় মোস্তফার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র প্রথম আবদুল হামিদ। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে আবদুল হামিদ সিংহাসনে উপবেশন করে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রাজত্ব করেন। কিন্তু তের বছর শাসন করবার পর পুনরায় তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার সংঘর্ষ বাধে। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের মূল উৎস ছিল ক্রিমিয়া। ক্রিমিয়া তুরস্কের একটি কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ ছিল। কিন্তু কুচুক কাইনারজির সন্ধি মোতাবেক একজন তাতার

www.pathagar.com

খানের নেতৃত্বে এটি স্বাধীন হয় এবং রাশিয়ার অধিকারে চলে যায়। জারিনা এ অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করলে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তুরস্কের সঙ্গে সংঘর্ষের উপক্রম হয়। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সঙ্গে রাাশিয়ার পুনরায় যে সন্ধি হয় তার ফলে ক্রিমিয়া রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু রাশিয়ার আক্রমণাত্মক নীতি প্রতিফলিত হয় ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একটি তুরস্কবিরোধী মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনে। তুর্কী অধ্যুষিত অঞ্চলে রাশিয়া বিদ্রোহের উস্কানি দেয়। রুশ আগ্রাসন নীতির মোকাবেলা করবার জন্য সুলতান আবদুল হামিদ ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে একটি সুপরিকল্পিত সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবদুল হামিদ তুরস্কে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রয়াস পান। কিন্তু রুশ-অস্ট্রিয়ার আগ্রাসন নীতির ফলে তুরস্ককে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। নৌধ্যক্ষ হাসানের নেতৃত্বে কিলবার্নে তুর্কী নৌবহর রুশ নৌবাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরিত তুর্কী বাহিনী শত্রু পক্ষের ব্যূহ ভেদ করে যুদ্ধে জয়লাভ করে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আবদুল হামিদ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় সেলিম সুলতান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সুশাসক ও প্রজাবৎসল সুলতান হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তার রাজত্বকালে অস্ট্রিয়া সার্বিয়া, মোলদাভিয়া ও রুমানিয়া আক্রমণ করে। তুর্কী বাহিনী প্রধান উজীর হাসানের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলে কিন্তু শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া বেলগ্রেড ও সামেন্দ্রিয়া অধিকার করলে তুর্কী সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হতে থাকে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে তুরস্কের সিস্টোভার সন্ধি হয় এবং এর ফলে অস্ট্রিয়া তুরস্ককে ওরশোভা ও ক্রোটিয়া জেলা ব্যতীত অধিকৃত অঞ্চলসমূহ ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হয়। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে রাজ্য সম্প্রসারণ ও ভূমধ্যসাগরে সামুদ্রিক পথ লাভের আশায় আক্রমণাত্মক নীতি পোষণ করেন। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সখ্যতা থাকা সত্ত্বেও হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড এবং প্রুশিয়ার বিরোধিতায় ক্যাথারিনের প্রাচ্যনীতি কার্যকর হয়নি। জারিনা কনস্টান্টিনোপল দখল করে পুনরায় গ্রীক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন এবং গ্রীকদের তুরস্কের অধীনতা থেকে মুক্তির প্রয়াস পান। রুশ-তুরস্কের মধ্যে বাবাটাগের (Babatagh) যুদ্ধে তুর্কী বাহিনী ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। কৃষ্ণসাগরের পূর্ব প্রান্ত থেকে তুর্কীদের বিতাড়িত করা হয়। বিজয়োল্লাসে ক্যাথারিন পোল্যাণ্ড অভিযানের মনস্থ করেন। রাশিয়া বুলগেরিয়া, মোলদাভিয়া, ওয়ালাচিয়া এবং কুবান প্রদেশ দখল করে। অতঃপর অপরাপর ইউরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের ফলে ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে জেসীর সন্ধি সম্পাদিত হয়। এ সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়ার নতুন সীমানা নির্ধারিত হয় ডেনিস্টার নদীর প্রান্ত থেকে এবং এ নদীর পশ্চিমাঞ্চলের এলাকাগুলি তুরস্ককে প্রত্যর্পণ করা হয়। ক্রিমিয়া শুধু রাশিয়ার একটি প্রদেশেই পরিণত হল না বরং কৃষ্ণসাগরে রুশ ভল্লুকের ছায়া ঘনীভূত হতে থাকে।

সুলতান তৃতীয় সেলিম রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায়ের জন্য কতিপয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করেন। কেন্দ্রীয় শাসনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সাম্রাজ্যকে প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করা হয়। সেনাবাহিনীর অসন্তোষ দূরীভূত করবার জন্য জেনিসারীদের পুনর্গঠন করেন। তিনি

www.pathagar.com

সামন্তপ্রথার বিলোপ সাধন করেন। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান তৃতীয় সেলিম সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন।

তৃতীয় সেলিমের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র চতুর্থ মোস্তফা সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু অযোগ্য ও অপদার্থ মোস্তফা (১৮০৭-০৮) এক বছরের অধিক রাজ্য শাসন করতে পারেননি। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে দ্বিতীয় মাহমুদকে সিংহাসনে বসান হয়। তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের যুগে দ্বিতীয় মাহমুদ ছিলেন শ্রেষ্ঠ সুলতান এবং তিনি তাঁর কার্যকলাপ ও সংস্কার প্রবর্তনে মহামতি সোলায়মানকে অনুকরণ করেন। কিন্তু তার রাজত্ব ছিল অত্যন্ত গোলযোগপূর্ণ। আভ্যন্তরীণ কোন্দল, জেনিসারী বাহিনীর স্বেচ্ছাচারিতা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণে তুরস্ক এক মহা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। জাসিয়ার গভর্নর আলী পাশা স্বাধীনতা ঘোষণা করে থাসালী, গ্রীস এবং আয়ওনিয়ান দ্বীপগুলো জয়ের হুমকি দেন। ইউক্রেন, একরে, মিসর, আরব দেশের প্রাদেশিক গভর্নরগণ বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনভাবে শাসনভার পরিচালনা করতে থাকেন। এ ছাড়া মোলদাভিয়া, গ্রীস, সার্বিয়া ও ওয়ালাচিয়ায় বহুকাল যাবৎ কুশাসনের ফলে প্রজাদের মধ্যে আন্দোলনের দাবানল জ্বলতে থাকে। এ বিশৃঙ্খল ও অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে রাজ্যের মেরুদণ্ড জেনিসারী বাহিনীর স্বেচ্ছাচারিতা ও বর্বরতা তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে। এহেন বিপদেও মাহমুদ ধৈর্য্য হারাননি এবং দীর্ঘ একত্রিশ বছর রাজত্ব করে তুরস্ক সাম্রাজ্যের সকল গৃহযুদ্ধ দমন করেন। তিনি আরব দেশের ওয়াহাবীদের নিরস্ত্র করে পবিত্র মক্কা ও মদিনা শহর অধিকার করেন। তাঁর রাজত্বকালে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃত মিসর মোহাম্মদ আলী পাশার নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করে।

দ্বিতীয় মাহমুদের রাজত্বকালে তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার সংঘর্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে টিলসিটের সন্ধি অনুযায়ী ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন এবং রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার সমগ্র ইউরোপকে দ্বিখণ্ডিত করবার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয় যে, বিজয় লাভের পর নেপোলিয়ন মধ্য-ইউরোপ ও ল্যাটিন জাতি এবং আলেকজাণ্ডার বর্তমান তুরস্ক অধিকৃত প্রাচীন গ্রীক সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন। নেপোলিয়নের আগ্রাসন রোধের জন্য ইংল্যাণ্ড রাশিয়াকে সমর্থন এবং তুরস্কের বিরোধিতা করে রাশিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্রিটিশ দূত আরবুথনট (Arbuthnot) সুলতান তৃতীয় সেলিমকে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের আহ্বান জানান। কিন্তু সুলতান এতে অস্বীকৃতি জানালে ব্রিটিশ নৌধ্যক্ষ ডাকওয়ার্থ (Duckworth) ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে দার্দানেলিসে প্রবেশ করেন এবং নৌবহরসহ মার্মরা সাগর থেকে কনস্টান্টিনোপলে কামানের গোলা বর্ষণের হুমকি দেন। কিন্তু ব্রিটিশ নৌবহর তুর্কী নৌবহরের নিকট পর্যুদস্ত হয়। ইত্যবসরে ব্রিটেন তুরস্কবিরোধী পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন করে রুশ প্রভাব রোধের জন্য সুলতানকে সমর্থন দান করে। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন ও তুরস্কের মধ্যে সম্পাদিত দার্দানেলিসের সন্ধি অনুযায়ী ব্রিটেন তুরস্কের অখণ্ডত্ব ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সাহায্য দানে স্বীকৃত হয়। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে টিলসিটের সন্ধি অনুযায়ী সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ থাকলেও ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে দানিয়ুব অতিক্রম করে রুশ বাহিনী সিলিসট্রিয়া (Silestria) দখল

www.pathagar.com

করে; কিন্তু রুস্তচাকের (Rustchuck) যুদ্ধে তারা তুর্কী বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। এ সময় নেপোলিয়ন রাশিয়ায় অভিযান করলে জার ফ্রান্সের সঙ্গে সকল মিত্রতা ছিন্ন করে তুরস্কের বন্ধুত্ব কামনা করেন। উভয় দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সন্ধি হয়। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত বুখারেস্টের এই সন্ধি মোতাবেক তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে সীমানা নির্ধারিত হয় প্রুথ নদী। সমগ্র ওয়ালাচিয়া এবং মোলদাভিয়ার বৃহদংশ তুরস্ক লাভ করে। বেসারাবিয়া এবং মোলদাভিয়ার কিয়দংশ রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক ও প্রথিতযশা সংস্কারক ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম সেনাবাহিনী সংস্কারে মনোনিবেশ। করেন। প্রথম মুরাদ কর্তৃক সৃষ্ট জেনিসারী বাহিনী রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তাদের নির্মূল করবার সঙ্কল্প করেন। তাদের হত্যা করা হয় এবং তুর্কী ইতিহাস থেকে বীরোত্তম জেনিসারীদের–যারা নির্মমভাবে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ত্রাসের সৃষ্টি করে–ধ্বংস করা হয়। তাদের স্থলে সুলতান পঁয়তাল্লিশ হাজার সদস্যবিশিষ্ট গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। এদের রণনৈপুণ্যে তুর্কীর সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি শাসনকে কেন্দ্রীকরণ করেন এবং সামরিক জায়গীর প্রথার স্থলে সৈন্যদের রাজকোষ থেকে নিয়মিত হারে বেতন দেন। বিনা বিচারে দোষীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তিনি প্রজাদের ক্ষমতা হ্রাস করেন এবং 'কনফিসকেশন' রহিত করেন। বিশাল ওয়াকফ সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে আনা হয়। তিনি সর্বপ্রথম পাগড়ীর পরিবর্তে ফেজ পরিধান বাধ্যতামূলক করেন। তিনি ইউরোপীয় কায়দায় পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করতেন। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় ছিল। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুরস্কের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী ইউরোপীয় শক্তির দুরভিসন্ধির ফলে তুরস্ক আন্তর্জাতিক দাবা খেলার গুটিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুল মজিদ তুরস্কের সুলতানরূপে অধিষ্ঠিত হন। তার আমলেই তুরস্কের অবস্থা চরম শোচনীয় আকার ধারণ করে। রাশিয়ার জার নিকোলাস ব্রিটেনের সহায়তা কামনা করে ব্রিটিশ দূত স্যার হ্যামিলটন সাইমুরকে বলেন "আমাদের হাতে একজন রুগ্ন ব্যক্তি আছেন–অত্যন্ত রুগ্ন রোগাক্লিষ্ট ব্যক্তি" ("We have in our hands a Sickman, a very Sickman")। ইউরোপের এই রুগ্ন ব্যক্তির সুযোগে বৃহৎ শক্তিবর্গ প্রাচ্যদেশীয় সমস্যায় আত্মনিয়োগ করে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংস্কার আন্দোলন ঃ
তৃতীয় সেলিম ও দ্বিতীয় মাহমুদ

ভূমিকা ঃ মহাশক্তিশালী তুর্কী সাম্রাজ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ক্রমশঃ দুর্বল ও ক্ষমতাহীন হতে থাকে। অস্ট্রিয়ার হাফসবুর্গ রাজারা তুরস্কের কাছ থেকে হাঙ্গেরী ছিনিয়ে নেয় এবং রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের উত্তরাঞ্চল থেকে তুর্কীদের বিতাড়িত করে ক্রিমিয়া দখল করলে তুর্কী সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত কুচুক-কাইনারজির (Treaty of Kutuchuk Kainarji) চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে তুরস্কের কাছ থেকে বুখারেস্টের চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া বেসারাবিয়া গ্রাস করে। এই চুক্তি অনুযায়ী তুরস্কের গ্রীক খ্রিস্টান গীর্জার প্রজাদের উপর রাশিয়ার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি রুশ নৌ-বহরের অবাধ গতিবিধি স্বীকৃতি পায়।

কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগর ঃ কুচুক কাইনারজির সন্ধি বিভিন্ন শর্তাবলীর দিক থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, এভারসলের ভাষায় "এই চুক্তি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধিকতর অধঃপতন সূচনা করে।" তুর্কী সুলতান প্রথম আবদুল হামিদের (১৭৭৩-৮৯) রাজত্বকালে তুরস্কের যে রাজনৈতিক বিপর্যয় শুরু হয় তার পরিণতি ছিল ভয়াবহ। রুশ আগ্রাসন নীতির মোকাবেলা করার জন্য আবদুল হামিদ ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে একটি সুপরিকল্পিত সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি তুরস্কের শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রয়াস পান। ফিলিপ প্রাইস বলেন, "পশ্চিম ইউরোপ ও রাশিয়ার নিকট উপর্যুপরি পরাজয়ের ফলে তুর্কীরা প্রথম উপলব্ধি করে যে তাদের মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার অবসান হতে যাচ্ছে এবং যদি অটমান সাম্রাজ্য পুনর্জীবিত না হয় তাহলে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সামান্য হলেও সংস্কার প্রবর্তনের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়।" এই বোধোদয় হয় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে যখন সুলতান আবদুল হামিদ রুশ জারিনা (সাম্রাজ্ঞী) ক্যাথারীনের সাথে অপমানজনক কুচুক কাইনারজির সন্ধি সম্পাদন করেন। অতঃপর ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আবদুল হামিদ সেনাবাহিনী সংস্কারের জন্য সর্বপ্রথম ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ এবং দক্ষ কারিগরদের সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী তৃতীয় সেলিমকে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায়ের নিমিত্ত সেনাবাহিনীর সংস্কারের প্রেরণা দেন। উল্লেখ্য যে, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব যে তুর্কী সংস্কার আন্দোলনে পড়েছিল তা অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

তৃতীয় সেলিমের (১৭৮৯–১৮০৭) সংস্কার

পটপ্রেক্ষিত ঃ ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের সুলতান আবদুল হামিদ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় সেলিম সুলতান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সুশাসক ও প্রজারঞ্জক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তৃতীয় সেলিম তুর্কী সাম্রাজ্যের সংস্করণের সম্মুখীন হন। হাঙ্গেরী, ট্রানসালভানিয়া, ক্রিমিয়া এবং কৃষ্ণসাগর ও আরব সাগরের উত্তরে তুর্কী প্রভুত্ব অবলুপ্ত হলেও তৃতীয় সেলিম পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁর রাজ্য রুমানিয়া, বসনিয়া, সিলিস্ট্রিয়া, জেজার (গ্রীসের অংশ) ক্রীট, আনাতোলিয়া, মিশর, বাগদাদ, ইরান, সিরিয়া, আরজেরুম, সিভার্স, সিনদিব, জিদ্দা, আলেপ্পো, কারামানিয়া, দিয়ারবকর, আদানা, তেব্রেজন্দ, মসুল, তারা বুলুস, আল বিস্তান, ফার্স, সার্জরুল ও ভান–এই ছাব্বিশটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই ছাব্বিশটি প্রদেশ বা 'আয়ালেত' ১৬৩ টি বিভাগ বা 'লিভা'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তুর্কী শাসন দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল এবং সুলতান তাঁর সামরিক বিপর্যয়ের মূলে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে দায়ী করেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে প্রধান প্রশাসকের মর্যাদা পূর্ণ পদ লাভ করতে হলে দরবারের পদস্থ কর্মচারী ও সুলতানদের পরামর্শদাতাদের প্রচুর উপঢৌকন দিতে হত। পুনঃনিয়োগের ক্ষেত্রেও অবাধ দুর্নীতি ছিল। প্রাদেশিক গভর্নর বা পাশা যুদ্ধে সুলতানদের ভূমিকা পালন করতেন। তিনি বিত্তবান আর্মেনিয়ান অথবা গ্রীক মহাজনের নিকট টাকা ধার করতেন। রাজস্ব ব্যবস্থা দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করে সুলতান বিলাস ব্যাসনে কালাতিপাত করতেন। কর আদায়কারিগণ নির্মম অত্যাচার করে রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত। পাশার অধীনে ছিল বে এবং আগা। তারা পাশার মতই স্বেচ্ছাচারী এবং দুর্নীতিবাজ ছিল। এম. আবদুল কাদির বলেন, "অনেক জায়গীরদার দেবেহ উপাধি গ্রহণ করে ফ্রান্স ও জার্মানীর ব্যারন ও নাইটদের ন্যায় প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে দেন।" জমিদারী ওয়াকফ প্রদানের ফলে সুলতানের রাজস্ব হ্রাস পায় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তুর্কী সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও ক্ষয়িষ্ণুতার মূল কারণ ছিল সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্বল সেনা প্রশাসন। রাশিয়ার হাতে তুর্কী বাহিনীর পরাজয়ের মূলে প্রধান কারণ ছিল উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বেতনভুক সেনাবাহিনীর অভাব। তৃতীয় সেলিম ক্ষমতা লাভ করে উপলব্ধি করেন যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত, সামরিক অভিযান পরিচালনা এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসনের জন্য উপযুক্ত সামরিক বাহিনী তুরস্কের ছিল না। তুরস্কের বেতনভোগী সৈন্যদিগকে 'কাপিকুলি' ও অবৈতনিক সৈন্যদের 'তোপ্রাকুলি' বলা হত।

বেতনভোগী সৈন্যদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল জেনিসেরী (Janissaries)। সরকারি নথিপত্রে জেনিসেরীদের সংখ্যা লক্ষাধিক হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। তারা কাল্পনিকনাম রেজিস্ট্রিভুক্ত করে অর্থ আত্মসাৎ করত। উপরন্তু, তারা নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। কারণ শান্তির সময় তারা

www.pathagar.com

ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারত। ফলে এই সুবিধাভোগকারী দল তুর্কী সাম্রাজ্যে সকল প্রকার সংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিল।

সেনাবাহিনীর মত নৌবাহিনীর অবস্থাও ছিল খুব শোচনীয়। নিয়মিত সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা অনিয়মিত বাহিনী অধিক থাকায় যুদ্ধ পরিচালনায় শৃঙ্খলা থাকত না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা লুটতরাজে ব্যস্ত থাকত। সামরিক অনুশীলনী ও প্রশিক্ষণ না থাকায় তারা অদক্ষ বাহিনীতে পরিনত হয়। তৃতীয় সেলিম উদারমনা ছিলেন এবং সংস্কার প্রবর্তনের মানসে তিনি রাজ্যের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত জেসীর সন্ধির পর সামরিক বাহিনীর সংস্কারের জন্য সেলিম সচেষ্ট হলেন। ইতিপূর্বে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যারণ দ্যা টট (Baron de Tott) নামে একজন ফরাসী সৈনিকের সহায়তায় ইস্তাম্বুলে নৌবাহিনী প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুলটি পরবর্তীকালে তৃতীয় সেলিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সামরিক প্রশিক্ষণ স্কুলের মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বার্নার্ড লুইসের ভাষায়, "In the following year the naval school of mathematics was expanded and developed and provided the model for the military engineering, medical and other schools set up by Selim and his successors"। ১৭৮১ থেকে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইস্তাম্বুল পরিদর্শনকারী ইতালীর পর্যটক তোদেরীনীর ভাষা অনুযায়ী এ সব শিক্ষায়াতনে ইউরোপীয় মানচিত্র, যন্ত্রপাতি, গ্রন্থাবলী ব্যবহৃত হয়। সেলিম তার সচিব ইসহাক বে-র মাধ্যমে ফরাসী সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর প্রতিষ্টিত শিক্ষায়াতনের জন্য প্যারিস থেকে প্রশিক্ষক সংগ্রহ করেন। বলাই বাহুল্য যে, রুশ-ব্রিটিশ অপেক্ষা তুর্কী সাম্রাজ্যে ফরাসী প্রভাব ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং এই প্রভাবের মূলে ছিলেন ব্রুনী (Broune), রুফী (Ruffin) এবং সিবাসটিয়ানী (Sebastioni)। সেলিম ফরাসী বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন এবং তিনিই প্রথম তুর্কী সুলতান যিনি পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম-অধিকার নীতি (equality of sexes) প্রচলন করেন। এই নীতির বিরুদ্ধে গোঁড়া তুর্কী ওলেমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং সংস্কার আন্দোলনে তারা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কারণ সুবিধাভোগকারী সম্প্রদায় তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এতদসত্ত্বেও সুলতান তাঁর পিতা তৃতীয় মুস্তাফা কর্তৃক প্রদত্ত 'ওসিয়তনামা' (উপদেশনামা) মোতাবেক সংস্কার প্রবর্তনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন।

'নিযাম-ই-জাদিদ'

সুলতান তৃতীয় সেলিম সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন করে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন ফরমান (New order) বা 'নিযাম-ই জাদিদ' ঘোষণা করেন। এই নতুন আইন প্রবর্তনের মূলে ছিল ক্ষয়িষ্ণু ও ক্রমশঃ দুর্বল তুর্কী সাম্রাজ্যেকে রক্ষার জন্য সামরিক সংস্কার প্রবর্তন। সেলিমের 'নিযাম-ই জাদিদের' মূল উদ্দেশ্য ছিল ।

সেনাবাহিনীর সংস্কারের মূল লক্ষ্যে পৌছবার জন্য তৃতীয় সেলিম সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজান। নতুন ব্যবস্থানুযায়ী সেনাবাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। (ক)

www.pathagar.com

নিয়মিত এবং (খ) অনিয়মিত। নিয়মিত বাহিনীকে বলা হত 'কাপিকুলী' এবং অনিয়মিত বাহিনী 'তোপ্রাকুলী' নামে অভিহিত হয়। গোলন্দাজ, আদ্রিয়ানোপল ও কনস্টান্টিনোপলের বাগান রক্ষক সৈন্য এবং পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পদাতিক বাহিনীকে বলা হত 'সিপাহী' এবং অশ্বারোহিদের বলা হত 'সিলাহদার'। সুলতানের নির্দেশে প্রাদেশিক শাসনকর্তা পাশাদের অধীনে এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী সদা প্রস্তুত থাকত। এই বাহিনীকে বলা হত 'সিরাতকুলী'। নিয়মিত বাহিনী ছাড়াও এক ধরনের অনিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলা হয়। জরুরী অবস্থায় যুদ্ধ করার জন্য 'মীর-ই-আসকারী' নামে একদল অনিয়মিত সেনাবাহিনী সুলতানের আদেশে গঠন করা হয়। এছাড়া 'গুলুল্লাস' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তোলা হয়। সুলতান সেলিম জেনিসারী ও পুরাতন সেনাবাহিনীতে প্রাণসঞ্চার করার জন্য নিযাম-ই-জাদিদের আওতায় সেনাবাহিনী সংস্কার করেন। কিন্তু কুচক্রী ও স্বার্থান্বেষী জেনিসারীগণ সুলতানের এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাননি। সেনাবাহিনীর সংস্কারে তৃতীয় সেলিম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে জায়গীরদার প্রথা বিলুপ্ত করে বেতনভুক্ত নিয়মিত বাহিনী গঠন করা। প্রাদেশিক শাসক বা পাশাদেব ক্ষমতা সীমিত করা এবং সেনাবাহিনীর স্বার্থে রাজস্ব বিভাগের পুর্নবিন্যাস।

১. জায়গীরদার প্রথার বিলোপ সাধন ঃ দুর্নীতিপূর্ণ জায়গীরদার প্রথা সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে তোলে। এ কারণে সেলিম অনিয়মিত বাহিনীর পরিবর্তে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, বেতনভুক্ত ও নিয়মিত বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২. পাশার ক্ষমতা হ্রাস ঃ জায়গীর প্রথা উপর নির্ভরশীল পাশালিক দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজন সহায়তা দানে ব্যর্থ হয়। এই কারণে সেলিম পাশাদের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য তিন বছরের চুক্তির ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ করেন।

৩. রাজস্ব আদায়ের নিয়মানুবর্তিতা ঃ সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল রাখার জন্য নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাজকোষ যথার্থ রাজস্ব আদায় হোতনা। এ কারণে রাজস্ব ব্যবস্থা পুনঃগঠন দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়াস পান তৃতীয় সেলিম।

৪. কেন্দ্রীয় রাজকোষাগার ঃ রাজস্ব সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তৃতীয় সেলিম একটি কেন্দ্রীয় রাজকোষাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভূমি সংস্কারে মনোযোগ দেন এবং সে সাথে জায়গীরদারী বিলুপ্ত করে সামন্ত প্রভূদের ক্ষমতা হ্রাস করেন। এক শ্রেণীর জায়গীরদার বংশানুক্রমিকভাবে ভূমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে জমি ভোগ দখল করছিল এবং এর ফলে নিরন্ন প্রজাগণ শোষিত হয়। এ ছাড়া মধ্যস্বত্বভোগী এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহলও প্রজাদের শোষণ ও নির্যাতন করে আসছিল। এই ঘৃণ্য প্রথার ফলে প্রজাসাধারণের স্বত্বাধিকার স্বীকৃতিই পেলনা, রাজস্বের আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। নূতন ব্যবস্থানুযায়ী 'জিয়ামত' ও 'তিমার'গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারে আনা হয় তৃতীয় সেলিম প্রজাদের সরাসরি রাজকোষে কর জমা দানের ব্যবস্থা হয়। কায়েমী স্বার্থবাদী জমিদার শ্রেণী তাদের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে সুলতানের বিরোধীতায় লিপ্ত হল।

www.pathagar.com

৫. সেনাবাহিনীর সংস্কার ঃ 'নিয়াম-ই-জাদিদ' মূলত মান্ধাত্বাআমলের জেনিসারী নামে সেনাবাহিনীর সংস্কারের উপলক্ষ্যে জারিকৃত ফরমান। সফিজউদ্দীন জোয়ারদার তার 'মধ্যপ্রাচ্যে (দ্বিতীয় খণ্ড)' বলেন, "সেনাবাহিনীর সংস্কারই সেলিমের সংস্কারমূলক কার্যাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে তুরস্ক বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং আধুনিক পোশাক ও সরঞ্জাম দিয়ে আধুনিকরণের চেষ্টা করেন তৃতীয় সেলিম। কিন্তু জেনিসারী বাহিনীর বিরোধিতা এবং বিদেশী কায়দায় সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণে উলামাদের প্রদত্ত ফতোয়ার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সেনাবাহিনীর সংস্কার করা সম্ভবপর হয়নি। এতদসত্ত্বেও তুরস্কের জন্য আধুনিক সমরবিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনে তৃতীয় সেলিম গোপনে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের পরিসমাপ্তিকে তুরস্কের বিপর্যয় এই পদক্ষেপকে ত্বরান্বিত করে। ১৭৯১ সনে প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ পাশাকে একটি নূতন সেনাবাহিনী গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। রাজধানী আস্কারার উপকণ্ঠে একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৬ সনে তুরস্কে নব নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূত আলবেরা দূবে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কিছু পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং কিছুসংখ্যক গোলন্দাজ সুলতানকে উপহার দেন। সেনাবাহিনীর সংস্কারের ফলে সৈন্যরা আধুনিক সমর পোশাক ব্যবহার, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহার করতে থাকে। ওমর পাশা নামে এক অভিজাত তুর্কী সেনাপতিকে সেনাবাহিনীর সার্বিক উন্নতির জন্য নিয়োগ দান করা হয়। তিনি ছয়শত সৈন্যকে আধুনিক সমরবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেন। পরবর্তীকালে নবগঠিত এই বাহিনী 'নিজাম-ই-জাদীদ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

'নিজাম-ই-জাদীদ' নামে পরিচিত এই নবগঠিত তুর্কী বাহিনী সংস্কৃতিমনা শায়খ-উল-ইসলামের অনুমোদন লাভ করে। এই বাহিনী ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠে। নূতন ব্যবস্থানুযায়ী সৈন্যবাহিনীতে নিয়মিত ও অনিয়মিত নামে দু'টি বিভাগ ছিল। নিয়মিত বাহিনীকে বলা হত 'কাপিকুলী' এবং অনিয়মিত বাহিনীকে বলা হত 'তোপ্রাকুলী'। গোলন্দাজ, আদ্রিয়ানোপল ও কনস্টন্টিনোপলের বাগান রক্ষক সৈন্য এবং পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের মধ্যে পদাতিক বাহিনীকে বলা হত 'সিপাহী' এবং অশ্বারোহী বাহিনীকে বলা হত 'সিলাহদার'। সুলতান প্রাদেশিক শাসক বা পাশাদের অধীনেও 'সিরাতকুলী' নামে একদল সৈন্য রাখার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া সুলতান জরুরি অবস্থায় যুদ্ধ করবার জন্য মীর-ই-আসকারী নামে একদল অনিয়মিত সৈন্যবাহিনী এবং 'গুলুল্লাস' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তোলেন। ১৮০৭ সনে নূতন ধারায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সংখ্যা ২৫,০০০ এ পৌঁছে। নবগঠিত বাহিনীর বিরুদ্ধে জেনিসারী বাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল এবং তা ১৮০৭ সনেই হিংসাত্মক রূপে আত্মপ্রকাশ পায়। সুলতান সেলিমের সমর্থক শায়খ-উল-ইসলাম ১৮০৮ সনে মৃত্যুবরণ করলে সেলিম তার সংস্কারের প্রতি সমর্থন হারান। নিযাম-ই-জাদীদ নামে তৃতীয় সেলিম যে সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। কট্টরপন্থী রক্ষণশীল নূতন শায়খ-উল-ইসলামের উস্কানি, জেনিসারীদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ

www.pathagar.com

এবং কিছুসংখ্যক সরকারি কর্মচারিদের ষড়যন্ত্রে ১৮০৭ সনের ২১ মে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রতীভূ জেনিসারী বাহিনী বিদ্রোহ করে। ধ্বংস, লুটতরাজ, নির্বিচারে হত্যার মাধ্যমে তারা সংস্কারমনা তৃতীয় সেলিমকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং তার স্থলে চতুর্থ মুস্তাফাকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেয়। সাইয়িদ মুস্তাফা, মাহমুদ রাইফ ও নূতন ব্যবস্থার অন্যান্য সমর্থকদের হত্যা ও সুলতান সেলিমকে বন্দী করা হয়। রুশচুক পাশা ও বাইরাকদার মুস্তাফা-পাশা সেনাবাহিনী নিয়ে রাজধানীতে আসেন এবং সুলতান সেলিমকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন কিন্তু নূতন সুলতান চতুর্থ মুস্তাফার আদেশে সেলিমকে হত্যা করা হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মুস্তাফা পাশা নূতন সুলতান চতুর্থ মুস্তাফাকে গ্রেফতার করে তার স্থানে তার ভাই দ্বিতীয় মাহমুদকে সিংহাসনে বসতে সাহায্য করেন।

প্রশাসনিক সংস্কার ঃ তৃতীয় সেলিম তুরস্ক রাজ্যের অধঃপতনকে রোধ করার জন্য প্রশাসনিক সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। প্রত্যেক বিভাগে কিছু না কিছু সংস্কার করার জন্য সেলিম 'ইরাদ-ই- জাদীদ' নামে একটি কেন্দ্রীয় কোষাগার প্রতিষ্ঠা করেন। দখলদারী বন্ধ করে পাশাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সে সমস্ত অর্থ রাজকোষে জমা দেয়া হয়। তিনি মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করেন। নিকৃষ্ট ধাতু দিয়ে তৈরি মুদ্রা বাতিল করে উৎকৃষ্ট ধাতুতে প্রস্তুত মুদ্রা প্রচলন করেন। কিন্তু রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের জন্য নিকৃষ্ট ধাতুর মুদ্রা বাজারে থেকে যায়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করা যায়নি।

তৃতীয় সেলিম বর্হিবাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য একটি বাণিজ্য বহর গঠন করেন। কিন্তু গ্রীক বাণিজ্য জাহাজের আধিপত্য থাকায় তুরস্কের বহিঃবাণিজ্য ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। সেলিমই ইউরোপের বিভিন্ন শহরে প্রথম তুরস্কের দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ও মাদ্রিদে তুরস্কের দূতাবাস স্থাপিত হয়। সুলতান তৃতীয় সেলিমের সময়ে তুরস্কে এক দল বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব হয়। তাদের চিন্তাধারা ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো। এ সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেন প্রকৌশলী, স্কুলের শিক্ষক চেলেবী মুস্তাফা রশীদ ও সাঈদ মুস্তাফা। সাঈদ মুস্তাফা একটি গ্রন্থে তার মত প্রকাশ করেন যে, ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ না হলে তুরস্কের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

সুলতান তৃতীয় সেলিম শিক্ষা-দীক্ষার সংস্কার ও সম্প্রসারণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন দ্বারা শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধন ছিল তার মূল লক্ষ্য। তুরস্ককে আধুনিকিকরণ করতে হলে পাশ্চাত্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এ কথা উপলব্ধি করে মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক শিক্ষা প্রচলন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবহারিক ও আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষায় তুর্কীদের শিক্ষিত করার প্রয়াস পান তৃতীয় সেলিম। তাঁর উদ্যোগে সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শিক্ষা সম্প্রসারের জন্য আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র আমদানী করেন এবং এ সমস্ত প্রেস থেকে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শুধু তাই নয় ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলি তুর্কী ভাষায় অনুদিত হতে

www.pathagar.com

থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সুলতান তরুণ বুদ্ধিদীপ্ত তুর্কীদের বিদেশে বৃত্তি দিয়ে পাঠান। তারা লণ্ডন, ভিয়েনা, প্যারিস ও বার্লিনে গিয়ে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি, সমরনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অটম্যান সাম্রাজ্যে যখন অধঃপতন শুরু হয় তখন তৃতীয় সেলিম বৈপ্লবিক সংস্কার প্রবর্তন করে পতনকে রোধ করেন।

দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮০৮–১৮৩৯)

সুলতান তৃতীয় সেলিমের মৃত্যুর পর ১৮০৭ সালে সাময়িকভাবে চতুর্থ মুস্তাফা তুরস্কের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু বিদ্রোহী বাইরাকদার মুস্তাফা পাশা ইস্তাম্বুল দখল করে সুলতান মুস্তাফাকে বন্দী করেন। তাঁর স্থলে তার ভাই দ্বিতীয় মাহমুদকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তৃতীয় সেলিমের মত দ্বিতীয় মাহমুদও সংস্কার দ্বারা পতনোম্মুখ তুর্কী সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য প্রয়াস পান। তৃতীয় সেলিমের সংস্কারের ধারাকে অব্যহত রাখার জন্য দ্বিতীয় মাহমুদ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার রাজত্বকালে গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাজনৈতিক সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় মাহমুদ বিভিন্ন সংস্কারাবলির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর সংস্কারধারা প্রধানত চারটি ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

(ক) সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা দখল করার জন্য জেনিসারী বাহিনীর সর্বশেষ প্রয়াস এবং প্রথম মুরাদ (১৩৫৯–৮৯) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বাহিনীর দীর্ঘ প্রায় চারশত বছর পর ১৮২৬ সালে দ্বিতীয় মাহমুদ কর্তৃক বিলুপ্তি।

(খ) কেন্দ্রীয় প্রশাসনের শিথিলতা এবং কয়েকটি প্রদেশে স্বায়ত্ব শাসন ও স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে ডেরেবেগদের প্রচেষ্টা।

(গ) তুর্কী সমাজ, শিক্ষা, প্রশাসন, সমরনীতি, অর্থনীতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব। এর ফলে জাতীয়তাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার।

(ঘ) শিল্প বিপ্লব, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পশ্চিমা শক্তিবর্গের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন।

একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, সামরিক বাহিনী, বিশেষ করে জেনিসারীদের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য প্রবর্তীত সংস্কারসমূহ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সুলতান তৃতীয় সেলিম নিহত হন। এতদসত্ত্বেও দ্বিতীয় মাহমুদ সংস্কারের ধারা অব্যাহত রাখেন। তিনি সেলিমের নিজাম-ই-জাদিদ নীতি অব্যহত রাখেন। তিনি এই প্রকল্পটি জেনিসারী বাহিনীর কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য ঘোষণা দেন যে, যারা শুধু বাহিনীর পরিচয়পত্র দেখিয়ে মাসিক বেতন ভাতা গ্রহণ করে তাদের পরিচয়পত্র রাষ্ট্র ক্রয় করবে এবং যারা নব-গঠিত আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনা-বাহিনীতে যোগদান করবে তাদের বর্ধিত হারে বেতন দেয়া হবে। উচ্ছৃঙ্খল ও ক্ষমতালোভী জেনিসারী বাহিনী সংস্কারবিরোধী ছিল। ১৮০৯ সনে তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করলে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ 'নিজাম-ই জাদিদ' সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করেন। দীর্ঘ সতেরো বছর ক্ষমতালোভী ও সুবিধাভোগী জেনিসারী ও দুর্নীতিপরায়ণ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সমগ্র দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মাহমুদের শাসনকালকে সংস্কারের যুগ বলা হয় এ কারণে যে তৃতীয় সেলিমের সময় থেকে সংস্কারের যে ধারা প্রবর্তিত হয় তা অব্যাহত থাকে। এ সময়ে তুর্কী বুদ্ধিজীবী-চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারকগণ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন এবং তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তারা হচ্ছেন মুস্তাফা সামী ও সাদিক রিফাত। মুস্তাফা সামী ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করেন বিশেষ করে লন্ডন, রোম, বার্লিন, ফ্রাংকফুট, ব্রাসেলস, প্যারিস। দেশে ফিরে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা একটি গ্রন্থে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির নাম 'আভারূপা বিসালেসি'। এছাড়া মুস্তাফা সামী ইউরোপের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রচারের জন্য 'তাক্ভিম-ই-ভিকারী' নামে একটি পত্রিকা সম্পদনা করতে থাকেন। তিনিই প্রথম স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ভালবাসাকে, যা 'হুবব-ই-মামলিকাত ওয়া-মিল্লাত' নামে পরিচিত, প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আদর্শ বলে প্রচার করেন। মুস্তফা সামী ছাড়াও অষ্ট্রিয়ায় নিযুক্ত তুর্কী রাষ্ট্রদূত সাদিক রিফাত তার বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণাবলি-যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, শিক্ষার স্বাধীনতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রচার করতে থাকেন।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ গ্রীক বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে তুর্কী অধ্যুসিত গ্রীস স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর মূল কারণ জেনাসারী বাহিনীর ব্যর্থতা। এ কারণে তিনি পুনরায় সেনাবাহিনীর সংস্কারে উদ্যোগী হন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী উলেমা চক্র ও সুবিধাভোগী জেনিসারী প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করে। জেনিসারী বাহিনী প্রকাশ্যে বিদ্রোহী করলে নবগঠিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধুনিক তুর্কী বাহিনীর সাহায্যে রাজধানীতে অসংখ্য জেনিসারীকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ১৮২৬ সনের ১৫ জুন তারিখে। প্রদেশে অবস্থানরত অসংখ্য জেনিসারী বাহিনীর সদস্যকেও উৎখাত করা হয়। এর ফলে প্রথম মুরাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাড়ে চারশত বছরের জেনিসারী বাহিনী বিলুপ্ত হয়। সুলতান সামরিক বাহিনীকে আধুনিকীকরণের জন্য প্রুশীয় সেনানায়কদের সহায়তায় রাজধানীতে ১৮৩৪ সনে একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে জেনিসারী বাহিনীর সেনাপতি বা আগাদের দৌর্দণ্ডপ্রতাপ বিলুপ্ত হয় এবং কেন্দ্র ও প্রদেশে সুলতানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধ্বংসযজ্ঞে উলেমা শ্রেণীর সমর্থন ছিল। জেনিসারী বাহিনী অবলুপ্ত হলে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ এক ফরমান জারী করেন নতুন বাহিনী গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। এই ফরমান 'আসকার-ই-মানসুরী-ই-মুহম্মদীয়া' নামে পরিচিত ছিল। সেই সাথে জেনিসারী বাহিনীর ধর্মীয় সমর্থক গোষ্ঠী বা বেকতাসীসও (bektasis) বিলুপ্ত করা হয়। এভাবে প্রথম মুরাদ (১৩৫৯-৮৯) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জেনিসারী বাহিনী দ্বিতীয় মাহমুদ কর্তৃক ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

সংস্কারের ধারা ঃ সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের রাজত্বকালে বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থাকায় সংস্কারের ধারা ব্যাহত হয়। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ, ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী নৌ-বাহিনীর নাভারিনোতে পরাজয়, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মিশরে তুর্কী সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত মুহম্মদ আলী পাশার বিদ্রোহ এবং পরিশেষে

www.pathagar.com

রাশিয়ার সঙ্গে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ঘৃণ্য উনকাইর স্কেলেসির সন্ধি সম্পাদনে তুর্কী সাম্রাজ্যের মর্যাদা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এতদসত্ত্বেও দ্বিতীয় মাহমুদ তাঁর পিতা ও চাচাত ভাই কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কারসমূহ সুদূরপ্রসারী করেন। তিনি ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে জেনিসারী বাহিনী ধ্বংসের পর থেকে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুলতান বিভিন্ন প্রকারের সংস্কার প্রবর্তন করেন। এই সমস্ত সংস্কারমূলক নীতিমালা পরবর্তীকালে তুরস্কে গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ছিল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে তানজিমাত ও নব্য তুর্কী আন্দোলন মূলতঃ তৃতীয় সেলিম এবং দ্বিতীয় মাহমুদ কর্তৃক সংস্কারসমূহের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়। পুরাতন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থার পরিবর্তে তুরস্কের আধুনিকীকরণের যুগ শুরু হয়। দ্বিতীয় মাহমুদ কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কারসমূহ ছিল বিভিন্নমুখী।

১. **শিক্ষা** ঃ সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ তুর্কী সাম্রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের সকল ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন এবং সাম্রাজ্যে অসংখ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ১৫০ জন শিক্ষার্থীকে ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে প্রেরণ করেন। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে রুশদীয়া স্কুল নামে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুলতান আহমদ ও সুলায়মানিয়া সমজিদে এই স্কুল পরিচালিত হয়।

২. **সামরিক প্রশিক্ষণ** ঃ সুলতান রাজধানীতে একটি সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে সেনাবাহিনীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সামরিক অফিসারদের বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। স্থল ও নৌবাহিনীর সদস্যদের আধুনিক ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্রে প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে পাঠান হয়। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় শিক্ষায় দীক্ষিত এই সামরিক বাহিনীর সদস্য তুরস্কের আধুনিককালে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই সামরিক স্কুল দু'ধরনের ছিল– প্রথমটি রাজকীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় বা 'মুসিকা-ই-হুমায়ুন মকতবী' যেখানে বাদকদল সঙ্গতি শিক্ষা লাভ করত। এই স্কুলের প্রশিক্ষক ছিলেন দনিজেটি পাশা (Donizetti Pasa)। দ্বিতীয়টির নাম ছিল সামরিক বিজ্ঞান স্কুল বা 'মকতব-ই-উলুম-ই-হারবিয়া' ১৮৩১-৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই দুটি স্কুল ফরাসী সামরিক একাডেমীর মডেলে সৃষ্টি করা হয়।

৩. **চিকিৎসা শিক্ষা** ঃ সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইস্তাম্বুলে একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সামরিক বাহিনীর চিকিৎসার জন্য মূলত এই স্কুল স্থাপিত হয়। ভেষজ শাস্ত্রে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা ছিল এবং সুলায়মানিয়া মাদ্রাসার মেডিকেল শাখায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ জনসাধারণের চিকিৎসা করতেন। তুর্কী ও ফরাসী ভাষায় শিক্ষাদান করা হত এবং বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশ করা হত।

৪. **প্রশাসনিক ব্যবস্থা** ঃ দ্বিতীয় মাহমুদের শাসনামলে তুর্কী প্রশাসনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি সমগ্র দেশকে কয়েকটি প্রদেশ বা 'আয়লেত'-এ এবং প্রদেশগুলিকে বিভাগে বা 'লিভা'-তে বিভক্ত করে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন।

www.pathagar.com

বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনের সর্বময় দায়িত্ব বহন করতেন সুলতান। তিনিই ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস এবং প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করতেন। জেনিসারী বাহিনী বিলুপ্ত হলে তিনি নতুন বাহিনী গঠন করেন। প্রদেশের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মত প্রদেশেও একটি কার্যকরী প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। মন্ত্রী পরিষদের প্রধান ছিলেন উজীর বা, Grand Vizier। বিভিন্ন দফতরের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত হতেন। এসব মন্ত্রীদের সুলতান কর্তৃক নির্ধারিত কায়দা কানুন মানতে হত এবং বিশেষ ধরনের পোশাক (ফ্রেক) পরিধান করতে হত। সুলতান মাহমুদ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কতিপয় নতুন প্রথা প্রবর্তন করেন। যেমন– প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি কর্মচারীদের বিদেশে প্রশিক্ষণ; সামরিক, ওয়াকফ এবং ধর্মবিষয়ক দফতর বা মুফতীর বিভাগ চালু করা হয়। এভাবে তিনি 'কায়হা' (Kayha) এবং 'রায়স এফেন্দী' (Reis Effendi) নামে দুটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করে বেসামরিক এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গঠন করেন। এভাবে রাজস্ব, পুলিশ, স্বরাষ্ট্র প্রভৃতি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পশ্চিমা প্রভাবে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের বিদেশী ভাষা শিক্ষা লাভ করতে হত। ইউরোপীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তুর্কী দোভাষী বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ইউরোপে তুর্কী দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপীয় ভাষায় অভিজ্ঞ রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হত। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে এ ধরনের অনেক দূতাবাসে যেসব কর্মকর্তা কর্মরত ছিলেন তাদের মধ্যে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে মোস্তফা রশিদ পাশা, ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনায় আলী পাশা, ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে ফুয়াদ পাশা নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে এ বুদ্ধিজীবী তানজিমাত আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। গ্রান্ড ভিজির বা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য সুলতান পরামর্শ সভা সৃষ্টি করেন, যেমন প্রিভি কাউন্সিল বা মন্ত্রণা পরিষদ ('মজলিস-ই-হাস')। এই মজলিসের সভাপতি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অনুরূপভাবে সুলতান আরও দুটি পরামর্শ কমিটি স্থাপন করেন, যেমন সামরিক বিষয়ক পরামর্শ সভা বা 'মজলিস-ই-দার' বা 'সুরা-ইয়া-আসকারী' এবং বিচার বিভাগের জন্য 'মজলিস-ই-ওয়ালা-আহকাম-ই-আদলিয়া'। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, গণপূর্ত বিভাগের জন্যও পরামর্শ কমিটি গঠন করা হয়।

৫. রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয়করণের জন্য দুটি বলিষ্ঠ প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমত তিনিই তুর্কী সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম লোক গণনার প্রথা প্রচলন করেন। ফলে সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত কর আদায় ব্যবস্থা প্রচলিত হতে পারে। এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত করার জন্য সুলতান লোকগণনাকারী নিয়োগ করেন এবং লোকগণনা যেহেতু বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে যোগদানের (Conscription) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল সেহেতু কেবলমাত্র আনাতোলিয়া ও রুমেলিয়ার পুরুষদের গণনা করা হয়। মহিলা ও শিশুদের গণনা করার প্রয়োজন হয়নি। উলেমাদের বিরোধিতা মোকাবেলার জন্য তাদের গণনাকারীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে ভূমির সার্ভে বা জরিপ। এই ব্যবস্থার মূলে ছিল প্রকৃত জমিদারদের তালিকাভুক্ত করে তাদের কাছ থেকে কর

www.pathagar.com

আদায়ের যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ। জায়গীর প্রথা বা 'তিমার' (timars), যা সাধারণভাবে সামরিক জমিবন্টন (fief) নামে পরিচিত, রহিত করে সুলতান সৈন্যদের নিয়মিত বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে জায়গীর প্রথা বিলুপ্ত করে তিনি একদিকে যেমন রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে অন্যদিকে তেমনি ভূমির উপর নির্ভরশীল পুরাতন জেনিসারী বাহিনীর পরিবর্তে বেতনভুক নতুন সামরিক (অশ্বারোহী) বাহিনী গঠনে সমর্থ হন। এভাবে আনাতোলিয়ার ১৫০০টি এবং রুমানিয়ার ১০০০টি ভূমি ব্যবস্থা বা 'তিমার' বিলুপ্ত হলে তুরস্কে সামন্ত প্রথার অবসান হয়। এসব জমি সরকারি দখলে আসে এবং তা কৃষকদের মধ্যে নির্দিষ্ট করের বিনিময়ে বণ্টন করা হয়।

রাজস্ব ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পূর্বে অপরাধীর নির্বাসিত বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলে তাদের ভূ-সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করতেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা পাশার এ ক্ষেত্রে অনেক ক্ষমতা ছিল। সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ এই ঘৃণ্য প্রথা রহিত করেন এবং ভূমির মালিকের মৃত্যু হলে তার সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারিগণ ভোগ করার সুবিধা লাভ করেন। জিওফ্রে লুইস বলেন, "সরকারি কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিকদের ভূমি বাজেয়াপ্ত করে সরকারি খাজনা পূর্ণ করার প্রাচীন প্রথা তিরোহিত হয়।" কর আদায়ের নিয়ম কানুন প্রবর্তিত হয়। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি এক ফরমান জারি করে সুলতান ভূ-স্বামীদের প্রজাদের কাছ থেকে কোন প্রকার অবৈধ কর আদায় নিষিদ্ধ করে দেন। কর বছরে দু'বারের অধিক আদায় করা যেত না। সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বহু খ্রিস্টান-ইহুদি জিজিয়া কর দিত। যে সমস্ত গ্রীক খ্রিস্টান তুর্কী বাহিনীতে যোগদান করে তাদের জিজিয়া কর দিতে হত না। সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পেনসন প্রদান রাজস্ব বিভাগের অন্যতম কর্তব্য ছিল। খাস জমি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্কুল, বাজার, বাগান ওয়াকফ দেওয়া হত এবং মুতাওয়াল্লী এবং তার সহকর্মীগণ নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করতেন। এ ক্ষেত্রে প্রধান মুফতী বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। কাজিও এ দায়িত্ব পালন করতেন। সুলতান 'ইকফ' (Evkaf) নামে একটি নতুন দফতর প্রতিষ্ঠা করে ওয়াকফ সম্পত্তি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করেন। যদি ওয়াকফ সম্পত্তি বণ্টন ও কর আদায়ে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারিগণ অংশ গ্রহণ করত, তবু একথা বলা যায় যে, সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদকে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হিসাবে গণ্য করা হয়। বার্নার্ড লুইস বলেন, "Mahmud, it would seem, was not only Peter the Great but also the Henry of Turkey."

৬. বিচার বিভাগ ঃ পূর্বে পাশা অপরাধীদের নির্বাসিত অথবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারতেন। কিন্তু সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ বিচার বিভাগের সুষ্ঠু বিন্যাস করেন। বিচার বিভাগের কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রধান কাযীর উপর। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তুরস্কের সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন মোস্তফা রশিদ পাশা (১৮০০-৫৮)। সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ প্রবর্তিত আইন বিষয়ক সংস্কার পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবদুল মজিদ ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুদূরপ্রসারী করেন। মাহমুদের রাজত্বকালে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও খ্রিস্টানদের প্রতি উদার নীতি পোষণ করা হয়। তিনি ইস্তাম্বুলে গ্রীক ধর্মযাজককে বসবাসের অনুমতি দেন। তিনি অহেতুক জিজিয়া কর বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করেন।

www.pathagar.com

প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্তন করে মূলতঃ তিনি দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের তানজিমাত যুগের সূচনা করেন।

৭. যাতায়াত ঃ সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুলতান ছিলেন। তিনি যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সড়ক নির্মাণ করেন এবং এর ফলে ডাক ব্যবস্থা সুদূরপ্রসারী হয়। সমগ্র রাজ্যে ডাক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং তুরস্কের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন শহরের মধ্যে ডাক ব্যবস্থা চালু ছিল। এছাড়া সংবাদ আহরণ ও বিতরণের জন্য সুলতান ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের তুর্কী ভাষায় প্রথম একটি পত্রিকা বা গেজেট প্রকাশ করেন। "তাকভিম-ই ভেকায়ী" (Takvim-i-Vekay) নামীয় এই তুর্কী সরকারি গেজেট প্রকাশিত হয় এবং চার্লস হোয়াইটের ভাষায়, "এই পত্রিকায় সরকারি নিয়োগ, বিচারের রায় এবং সুলতানের কার্যকলাপের বর্ণনা সীমাবদ্ধ ছিল।" ডাক বিভাগের সম্প্রসারণে এই গেজেট রাজ্যের সর্বত্র বিতরণ করা সম্ভবপর হয়। পরবর্তীকালে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে টেলিগ্রাফ এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে রেলপথ প্রবর্তিত হয়।

৮. সামাজিক সংস্কার ঃ সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ তুর্কী সাম্রাজ্যে বিবিধ সংস্কার সাধন করেন। তিনি সর্বপ্রথম পাগড়ীর পরিবর্তে উত্তর আফ্রিকার ফেজ নগরীর নামানুসারে প্রচলিত 'ফেজ টুপি' পরিধানের জন্য ফরমান জারী করেন। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ ইউরোপীয় ধরনের ছিল। তৃতীয় সেলিমের সময় যে সামরিক পোশাক প্রচলিত ছিল, তা 'সুবারা' (Subara) নামে প্রচলিত ছিল। ফ্রক, ড্রিল কোট, বক্ষাবরণ (vest) ও বুট এই পোশাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু তৃতীয় মাহমুদ ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে পোশাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত একটি নতুন আইন জারী করেন এবং ফেজ পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়, যাতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রিতি বজায় থাকে।

সমালোচনা ঃ সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদকে তাঁর সংস্কারের জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে এবং রাশিয়ার জার মহান পিটার এবং ইংল্যাণ্ডের অষ্টম হেনরীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লা জোঙ্কুইবি, হেনরী লুক এবং বার্নার্ড লুইস দ্বিতীয় মাহমুদকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কারক হিসেবে চিহ্নিত করলেও সুষ্ঠু বিচার বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হবে যে, এগুলি ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং ইউরোপীয় ধাঁচে মধ্যযুগীয় তুর্কী সমাজে সংস্কার প্রবর্তন করে তিনি জনগণ ও স্বার্থান্বেষী মহলের বিরোধিতার যেরূপ গভীর জ্ঞান ছিল মাহমুদের তা ছিল না; তিনি শুধু এগুলির বাহ্যিক চাকচিক্যে আকৃষ্ট হন।" প্রথমত তিনি পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রহণ করলেও তার প্রতিফলন করতে ব্যর্থ হন। ইহুদী-খ্রিস্টান সম্প্রদায় ছাড়াও মুসলিম পাশা-আগা, ভূস্বামী শ্রেণী তাঁর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। জেনিসারী বাহিনী ধ্বংসের ফলে তুর্কী সামরিক শক্তি হ্রাস পায়। তিনি মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো বিভিন্ন ধরনের সংস্কার দ্বারা ধ্বংস করলেও নব্য তুরস্কের ভিত্তিস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। তিনি ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় প্রতিকৃতি অঙ্কিত মুদ্রা ছাপালে রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং এই বিদ্রোহ দমন করতে ৪০০০ সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী ম্যাটারনিক মাহমুদকে রাতারাতি ইউরোপীয়করণের নীতি পরিহার করে তুর্কী থাকতে উপদেশ দেন। এ. জে. ভান বলেন, "দেশপ্রেম ও সংস্কারের উত্তেজনায় তিনি ভুলে যান যে, যে কোন ইউরোপীয় দেশ অপেক্ষা তুরস্কের অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মৌলক পার্থক্যের দরুন উভয় জাতির

www.pathagar.com

মিলন সম্ভবপর নয়।" সংস্কার সুদূরপ্রসারী হয়নি। বার্নাড লুইসের ভাষায়, "In European writings on the nineteenth century Turkish reforms, it has become a commonplace that the reforms were still born." হেনরী উইলিয়াম মন্তব্য করেন যে, মাহমুদের সংস্কার প্রচেষ্টা গর্ভস্রাবের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হয় এবং যে অরাজকতা, নৈরাজ্য রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে এই হতভাগ্য দেশের ইতিহাসে দুর্ভাগের কালো সুতার ন্যায় বিধে থাকে, তার জীবাণুও সঙ্গে নিয়ে আসে।"

পরিশেষে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, দ্বিতীয় মাহমুদের সংস্কারসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিফল ছিল না কারণ শুধুমাত্র সংস্কারের ধারা প্রবর্তিত করে তিনি আধুনিকীকরণের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণই করেননি, তানজিমাত ও নব্য-তুর্কী আন্দোলনের পুরোধাদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষা দানের সুযোগও তিনি করে দেন। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তৃতীয় সেলিম কর্তৃক জারীকৃত 'নিযাম-ই-জাদিদ' পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মাহমুদের ফরমান 'হাত্তি-ই-শরীফ' (১৮২৬) এবং আবদুল মজিদের (১৮৩৯) 'হাত্তি-ই-শরীফ-গুলহানে'র উত্তরসুরী ছিল।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা (১৮১৫-৭৮ খ্রি.)

প্রাচ্য অথবা নিকট-প্রাচ্য সমস্যা কি?

চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পরাক্রমশালী অটমান তুর্কিরা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। অটমান সুলতানগণ ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে বলকান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, আরব, মিশর এবং আফ্রিকার উত্তর উপকূল অঞ্চলে প্রভূত্ব বিস্তার করেন। এশিয়াবাসী তুর্কিরা ভূমধ্যসাগরীয় এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রিস, হাঙ্গেরি, বেসারাবিয়া, বসনিয়া, আলবেনিয়া, মন্টেনিগ্রো এবং হার্জেগোভিনা প্রভৃতি বলকান উপদ্বীপের অঞ্চলসমূহ অধিকার করে তাঁরা ভূমধ্যসাগরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃষ্ণসাগর, এজিয়ান সাগর, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ক্রিট, সাইপ্রাস, রোড্স, মিশর, ত্রিপলি, তিউনিস এবং আলজিরিয়া অধিকৃত হলে অটমান সাম্রাজ্য ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকায় বিস্তৃত লাভ করে। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে বিজয়ী অপ্রতিদ্বন্দ্বী তুরস্ক সৈন্যবাহিনী ভিয়েনা অবরোধ করে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের আক্রমণ বিফল হয়। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত Karlowitz চুক্তি ছিল "অটমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ" (the first dismemberment of the Ottoman Empire)। দুশো বছর ধরে এর অধঃপতন চলতে থাকে এবং পরিশেষে বলকান ও উত্তর আফ্রিকা থেকে অটমান সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। এ কারণে মিলার বলেন, "ইউরোপ থেকে তুরস্ক সাম্রাজ্য ক্রমশ বিলুপ্তির ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা পূর্ণ করার সমস্যাকেই প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা বলে।"

মহাপরাক্রমশালী অটমান সাম্রাজ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে দুর্বল এবং ক্ষমতাহীন হতে থাকে। অস্ট্রিয়ার হাফসবুর্গ রাজারা তুরস্কের কাছ থেকে হাঙ্গেরিকে ছিনিয়ে নিলে এবং রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের উত্তরাঞ্চল থেকে তুর্কিদের বিতাড়িত করে ক্রিমিয়া দখল করলে অটমান সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত কুসুক-কাইনারজির সন্ধি (Treaty of Kutchuk-Kainardji) অনুযায়ী রাশিয়া কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে : তুরস্ককে মোলদাভিয়া (Moldavia) এবং ওয়ালাচিয়া (Wallachia) প্রদান করে; তুরস্কের নিকট থেকে বুখারেস্টের চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া বেসারাবিয়া গ্রাস করে। রাশিয়া ক্রমশ বলকান দ্বীপে স্বীয় আধিপত্য সম্প্রসারিত করে অটমান সাম্রাজ্যের গ্রিক গোঁড়া খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের (Greek Orthodox Church) রক্ষক এবং গ্রিক গির্জা এবং স্লাভজাতীয় গুরু ও নিয়ন্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য যে, বলকান উপদ্বীপের জনগণ বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা, জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠানে বিভক্ত ছিল। এই অঞ্চলের অধিবাসী–গ্রিক, স্লাভ, রুমানিয়া,

www.pathagar.com

আলবেনিয়া, সার্বিয়া, বসনিয়া, তুরস্ক-অধিকৃত ইউরোপে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও তুর্কিরা এই অঞ্চলে খ্রিস্টানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ড চালাত এবং বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত অধিবাসীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টাকে ব্যাহত করত। রাশিয়ার গোঁড়া গির্জার (Orthodox Church) সঙ্গে বলকান উপদ্বীপের অধিবাসীর গ্রিক গোঁড়া গির্জার যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় জার তুরস্কের অত্যাচার এবং নৃশংসতা থেকে তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তুরস্ককে কেন্দ্র করে ইউরোপে যে রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় তাই প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা বলে পরিচিত। রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে এবং সাহায্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে নির্যাতিত বলকানবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলনকেই সাধারণত প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা বলা হয়ে থাকে। তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া অটমান সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অঞ্চলগুলো গ্রাস করে সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়ন করতে তৎপর হয়। অটমান সাম্রাজ্যের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি এরূপ অস্তাচলের পথে গিয়েছিল যে, তুরস্কের সুলতানকে 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' (Sickman of Europe) বলে আখ্যা দেয়া হয়। রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতিতে শঙ্কিত হয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়া এর তীব্র বিরোধিতা করে। এর ফলে বলকান উপদ্বীপ একটি আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরিশেষে সংঘর্ষের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং একে ইউরোপের 'মারাত্মক অঞ্চল' (Dangerous Zone) বলে অভিহিত করা হয়।

সমস্যার কারণ ঃ তুরস্ক-আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে বলকানবাসীদের স্বাধনিতালাভের চেষ্টাই প্রাথমিকভাবে প্রাচ্যদেশীয় সমস্যার মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এরূপ জটিল আকার ধারণ করে যে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই মারাত্মক অঞ্চল থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত হয় ঃ

১. তুরস্ক সরকারের (Porte) বিরুদ্ধে বলকান উপদ্বীপের জনগণের অসংখ্য অভিযোগ এবং অসন্তোষ।

২. ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্রের বিস্তৃতির ফলে বলকানবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধের উন্মেষ হয় এবং বৈদেশিক তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে চারটি খ্রিস্টান বলকান জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়–সার্বস (Serbs), বুলগার (Bulgars), রুমানিয়াবাসী (Rumanians) এবং গ্রিক (Greeks)।

৩. ধর্মীয় পার্থক্যের জন্য গ্রিক গোঁড়া খ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায় তুর্কির মুসলিম শাসকদের ঘৃণা করত। এর জন্য তারা রাশিয়ার সহায়তায় ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং স্বকীয়তা লাভের চেষ্টা করে।

৪. তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্ষমতাহ্রাসের ফলে সুলতানের পক্ষে সুষ্ঠু, স্থায়ী এবং জনকল্যাণকর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভবপর ছিল না। অত্যাচার, নিপীড়ন এবং নির্মম হত্যালীলার ফলে বলকানে তুরস্কের আধিপত্য ধ্বংস করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Petrograd)-এ। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক এথেন্স অধিকার করলে মিত্রবাহিনী লন্ডন চুক্তি (Treaty of London) অনুযায়ী সুলতানকে সন্ধিশর্ত মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দেয়। স্থির হল যে, সুলতানের অধীনে গ্রিসের স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। কিন্তু সুলতান এই ঘৃণ্য শর্ত মানতে রাজি না হলে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত নাভারিনের নৌযুদ্ধে (Naval Battle of Navarino) তুরস্কের নৌবহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়।

ফলাফল ঃ ক্যানিংয়ের মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী ওয়েলিংটন-এর শাসনে ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন হয়। তিনি নাভারিনের তুরস্কের বিপর্যয়কে 'অসুবিধাজনক ঘটনা' (Untoward event) বলে অভিহিত করে সুলতানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। গ্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনের মঞ্চ থেকে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স বিদায় গ্রহণ করলে কেবলমাত্র রাশিয়াই তাদের সাহায্যদান করে। অতঃপর জার নিকোলাস মোরিয়া থেকে তুর্কিদের বিতাড়িত করে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। রাশিয়ান নৌবহর দার্দানেলিস প্রণালীতে প্রবেশ করে তুর্কীবাহিনীকে পরাস্ত করে এবং ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আড্রিয়ানোপল-এর সন্ধি (The Treaty of Adrianople) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই সন্ধি মোতাবেক তুরস্ক গ্রিসের স্বাধীনতা স্বীকার করল এবং মোলদাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়াকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানে বাধ্য হল। রাশিয়া বলকান উপদ্বীপের গ্রিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করল এবং কৃষ্ণসাগর এবং দার্দানেলিস প্রণালীতে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করল। এই সন্ধির ফলে কূটনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে রাশিয়া প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা সমাধানে বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত লণ্ডন কনভেনশনে (The London Convention) ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া গ্রিক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতিদান করে। ফলে, গ্রিক স্বাধীনতা বাস্তবায়িত এবং নিশ্চিত হল। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে গ্রিসের স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে মনে করা হয়; কারণ, এটি ভিয়েনা কংগ্রেসের নীতি জার আলেকজান্ডারের 'পবিত্র চুক্তি' এবং মেটারনিকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে প্রচণ্ড আঘাত হানে। গ্রিসের স্বাধীনতার ফলে গণআন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শ সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হলে ইউরোপের অপরাপর পরাধীন রাষ্ট্রসমূহে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়। আড্রিয়ানোপলের সন্ধি রাশিয়ার ক্ষমতা এবং প্রভাব সম্প্রসারিত করে এবং নিকট-প্রাচ্যে এটি একটি ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে, সুলতান মোহাম্মদ আলি পাশার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং নাভারিনের নৌযুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে অটমান সাম্রাজ্য দুর্বল এবং পঙ্গু হয়ে পড়ল। 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' অধিকতর দুর্বল এবং রুগ্ন হয়ে পড়ল। গ্রিকবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের (Self-determination) অধিকারলাভে প্রাচ্যদেশীয় সমস্যার প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সিরিয়া সমস্যা (The Syrian Question) (১৮৩০-৪১ খ্রি.)

কারণ ঃ ইউরোপীয় বৃহৎশক্তিবর্গের পরস্পরবিরোধী মনোভাব প্রাচ্যদেশীয় সমস্যাকে জটিল করে তোলে। রাশিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ধ্বংস

www.pathagar.com

করে কনস্টান্টিনোপল অধিকার করা এবং নিকট-প্রাচ্যে রাজ্য সম্প্রসারণ দ্বারা ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসে রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতির প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডত্ব বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করেন। দানিয়ুব এবং আড্রিয়াটিক অঞ্চলে প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখার এবং প্যান-স্লাভ আন্দোলনকে নির্মূল করার জন্য অস্ট্রিয়া রাশিয়ার প্রাচ্যনীতির বিরোধীতা করে। ধর্মীয় এবং বাণিজ্যিক কারণে জার্মানি এবং ফ্রান্স প্রাচ্যদেশীয় সমস্যায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মানি তুরস্কের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে বাগদাদ-বার্লিন রেলপথ নির্মাণ করে।

ঘটনা ঃ গ্রিস বিজয়ের গৌরব অর্জন করে মিশরের মোহাম্মদ আলি পাশা তুর্কি সুলতানের বিরুদ্ধে বেদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি মিশরের প্রকৃত শাসকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুরস্কের অধীনতাকে অস্বীকার করতে থাকেন এবং দুর্বল ও পঙ্গু অটমান সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন উপলব্ধি করে তিনি আরব এবং সিরিয়ার প্রভুত্ব সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। তিনি সৈন্যবাহিনী এবং নৌবহরের উন্নতিসাধন করেন। সুলতানের অনুরোধে মোরিয়া এবং গ্রিস দখল করে মোহাম্মদ আলি পুরস্কারস্বরূপ ক্রিট দ্বীপ লাভ করেন। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি সিরিয়া দাবি করেন। সুলতান সিরিয়া অর্পণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে মোহাম্মদ আলি তাঁর পুত্র ইব্রাহিম পাশাকে বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। দামেস্ক এবং একরে অধিকৃত হওয়ার পর মিশরীয় বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের দিকে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

অটমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ মিশরের মোহাম্মদ আলি পাশা সিরিয়া দখল করে নিলে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ প্রমাদ গুনলেন। উপায়ন্তর না দেখে তিনি রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হলে সুলতান বাধ্য হয়ে রাশিয়ার দ্বারস্থ হন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বার্থরক্ষার্থে রাশিয়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসফোরাসে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। তুরস্কের ব্যাপারে রাশিয়ার হস্তক্ষেপে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়া বিচলিত হয়ে উঠল। ইংল্যান্ড তুরস্কের অখণ্ডত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল, অপরদিকে ফ্রান্স মোহাম্মদ আলিকে 'আশ্রিত ব্যক্তি' (Protege) বলে মনে করত। রাশিয়ার প্রাচ্য-পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়া তুর্কি সুলতানকে সিরিয়া এবং আদানা মিশরের পাশাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। কূটনৈতিক কৌশলে একটি মারাত্মক সংঘর্ষ থেকে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ পরিত্রাণ লাভ করল।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া তুরস্ক থেকে সেন্য অপসারণ করার পূর্বে সুলতানের সঙ্গে উনকাইর স্কেলিসির চুক্তি (Treaty of Unkiar Skelessi) সম্পাদন করে। আট বছরের মেয়াদ-সম্বলিত এই চুক্তি প্রতিরক্ষামূলক ছিল। এই চুক্তির ফলে প্রকৃতপক্ষে তুরস্কে রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রাধান্য বৃদ্ধি পায় এবং সামরিক হস্তক্ষেপকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। এই চুক্তি মোতাবেক রাশিয়া ইউরোপীয় কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে সুলতান দার্দানেলিস প্রণালী দিয়ে অপরাপর দেশের নৌবহরের যাতায়াত বন্ধ

www.pathagar.com

করে দিতে পারবে; অবশ্য রাশিয়ার নৌবহরের অবাধ গতিবিধি বজায় থাকবে এবং দার্দানেলিস থেকে ভূমধ্যসাগরে যাতায়াতে কোনোপ্রকার বাধা থাকবে না। এর ফলে তুরস্ক রাশিয়ার প্রটেক্টরেটে পরিণত হল।

আক্রমণাত্মক ভূমধ্যসাগরীয় নীতির ফলে তুরস্কে রাশিয়ার প্রাধান্য বিস্তারলাভ করে। তুরস্কের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাশিয়ার হস্তক্ষেপে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স শঙ্কিত হয়ে উঠল। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সুলতান মিশরের পাশার নিকট থেকে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তুর্কি সুলতানের সঙ্গে মোহাম্মদ আলির বিরোধ নির্মূল করার জন্য রাশিয়া, ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া এবং ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করে। মোহাম্মদ আলিকে মিশরের পাশা বলে ঘোষনা করা হল কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি সিরিয়ার অংশবিশেষ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলে ইংল্যান্ড আলেকজান্দ্রিয়ায় নৌবহর প্রেরণ করে। ফলে, মোহাম্মদ আলি ইউরোপীয় শক্তির নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন।

ফলাফল ঃ সিরিয়া-সমস্যা সমাধানে ইউরোপীয় চতুঃশক্তি (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং তুরস্ক) একটি সম্মেলন আহ্বান করে। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত লন্ডন কনভেনশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, দার্দানেলিস এবং বসফোরাসে কোনো দেশের নৌবহর প্রবেশের অধিকার থাকবে না; মোহাম্মদ আলি উত্তরাধিকারসূত্রে মিশরের পাশা বলে স্বীকৃতি পেলেন এবং এর পরিবর্তে আরব এবং সিরিয়ায় তাঁর কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না; এর ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হল। লন্ডন কনভেনশন উনকাইর স্কেলিসি সন্ধিকে উচ্ছেদ করে রাশিয়ার প্রভুত্বকে খর্ব করে; এই চুক্তি পামারস্টোনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বিজয় বলে স্বীকৃত হয়। তুরস্কে রাশিয়ার প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে ইংল্যান্ডের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। "চতুঃশক্তির সন্ধি একদিকে যেমন ফ্রান্সকে প্রতিঘাত করে, অপরদিকে তেমন রাশিয়ার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।"

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (The Crimean War) (১৮৫৪-৫৬ খ্রি)

কারণ ঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ প্রাচ্যদেশীয় সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং ইউরোপীয় ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন কনভেনশনে সিরিয়া-সমস্যা সমাধানের পর ইউরোপে নিরস্ত্রীকরণ এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু হিংসাত্মক মনোভাবের ফলে প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা পুনরায় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রকট আকার ধারণ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি করে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বৃহৎশক্তির মধ্যে প্রথম মহাসমরের সূচনা করে। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে উপলক্ষ করে ইউরোপে যুদ্ধের দাবানল প্রজ্বলিত করে। ধর্মীয় কলহ, স্বার্থান্বেষী মনোভাব, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

১. জারের আক্রমণাত্মক নীতি (Expansionist policy of the Czar) ঃ জার প্রথম আলেকজান্ডারে (১৮০১-২৫) পর প্রথম নিকোলাস (১৮২৫-৫৫) সিংহাসনে আরোহণপূর্বক প্রতিক্রিয়াশীল নীতি প্রবর্তন করে গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদের সমস্ত উৎসের মূলোৎপাটন করেন এবং দুর্বল তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে

www.pathagar.com

সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন। গ্রিক স্বাধীনতা যুদ্ধে জার আলেকজান্ডার তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন; কিন্তু নিকোলাস চিরাচরিত বৈদেশিক নীতির আমূল পরিবর্তন করে অটমান সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বজায় রেখে সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা চরিতার্থ করতে চেষ্টা করেন। নিকোলাসকে উদ্দেশ্য করে ইংল্যান্ডের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া বলেন যে, "একটি ব্যক্তি এবং তাঁর ভৃত্যদের স্বার্থপরতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার" ফলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জার নিকোলাস প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যে প্রাচ্যদেশীয় সমস্যার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। প্রথমত, রাজনৈতিক; দ্বিতীয়ত, ধর্মীয়। উল্লেখ্য যে, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত আড্রিয়ানোপলের সন্ধি অনুযায়ী বলকান উপদ্বীপে রাশিয়ার প্রাধান্য এবং সম্মান বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রভুত্ব স্বীকৃত হলে নিকট-প্রাচ্যে (Near East) জারের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত উনকাইর স্কেলিসির সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়ার প্রভুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। পামারস্টোন পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন নিকট-প্রাচ্যে রুশ প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে এবং ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে উনকাইর স্কেলিসির সন্ধি বাতিল করা হয়। অতঃপর ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস লন্ডনে গমন করে ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাবারডিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই বৈঠকে জার প্রস্তাব করেন যে, 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তির' সাম্রাজ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করে ইংল্যান্ড এবং রাশিয়ার মধ্যে ভাগ-বণ্টন করা হোক। ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে জার বিশেষ উৎসাহ ও সমর্থনলাভে ব্যর্থ হলে রাশিয়ার ঘৃণ্য পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল। অবশ্য নিকোলাস ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বারের মতো তাঁর তুরস্ক ধ্বংস পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সেন্ট পিটারসবুর্গের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার হ্যামিলটন সাইমোরের সঙ্গে একটি আলোচনায় মিলিত হন। জার ব্রিটিশ দূতকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন যে, ইউরোপীয় স্বার্থে স্বল্পকালের জন্য কনস্টান্টিনোপল অধিকার করা রাশিয়ার বিশেষ প্রয়োজন। তিনি অবশ্য অঙ্গীকার করেন যে, বসফোরাসে অপর কোনো ইউরোপীয় শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবেন না এবং তুরস্কের অখণ্ডত্ব বজায় রেখে ইতালির ম্যাজিনি এবং হাঙ্গেরির কসুথকে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ থেকে বিরত রাখা হবে। বিনিময়ে ইংল্যান্ড তুরস্ক, মিশর এবং ক্রিট দখল করবে। এবারেও নিকোলাসের সঙ্গে কোনোপ্রকার সন্ধিতে আবদ্ধ হতে ইংল্যান্ড অস্বীকার করে। তুরস্ককে উপলক্ষ করে রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'ভূমধ্যসাগরে একটি প্রবেশপথ' উন্মুক্ত করা।

ধর্মীয় কারণ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত কুসুক-কাইনারজির সন্ধি (Treaty of Kutchuk-Kainardji) অনুযায়ী জার তুরস্ক-অধিকৃত বলকান উপদ্বীপের গ্রিক-খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ল্যাটিন খ্রিস্টানদের সঙ্গে গ্রিক খ্রিস্টানদের বিরোধ উপস্থিত হলে জার প্রথম নিকোলাস গ্রিক ধর্মযাজকদের পক্ষ সমর্থন করেন। অপরদিকে ফ্রান্স ল্যাটিন ধর্মযাজকদের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। ফ্রান্স এবং রাশিয়া তুরস্কের সুলতানকে তাঁদের দাবি মেনে নেবার জন্য চাপ দিতে থাকেন। ব্রিটিশ সরকারের বৈরী মনোভাব এবং ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নীতিতে শঙ্কিত হয়ে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস প্রিন্স মেনস্কিকভকে

www.pathagar.com

(Prince Menschikoff) কনস্টানিনোপল-এ প্রেরণ করে সুলতানের নিকট থেকে খ্রিস্টানদের রক্ষনাবেক্ষণের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের ব্রিটিশ দূত লর্ড স্ট্রাটফোর্ড দ্য রেডক্লিফ (Startford de Redcliff)-এর পরামর্শ অনুযায়ী সুলতান রাশিয়ার তুর্কি সাম্রাজ্যের গ্রিক খ্রিস্টানদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তির দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য পবিত্র স্থানসমূহ সম্বন্ধে রাশিয়ার জারকে সুলতান সন্তোষজনক জবাব প্রদান করেন। তুরস্কের গ্রিক খ্রিস্টানদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে নিকোলাস তাঁর দূতকে কনস্টান্টিনোপল থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রদান করে কূটনৈতিক আলোচনা স্থগিত রাখলেন এবং ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে মোলদাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়ায় রুশ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন।

২. ফ্রান্সের স্বার্থ (The French Interest) ঃ প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা উদ্ভাবনে রাশিয়ার মতো ফ্রান্সও দায়ী ছিল। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত চুক্তি ক্যাপিটুলেশন সন্ধি (Treaty of Capitulation) মোতাবেক তুরস্কের ল্যাটিন খ্রিস্টানদের অভিভাবকত্ব ফ্রান্সের উপর ন্যস্ত হয়। উপরন্তু, নিকটবর্তী জেরুজালেমে ল্যাটিন খ্রিস্টানদের পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ফ্রান্সের উপর অর্পিত হল। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের ফলে ল্যাটিন খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের কর্তৃত্ব জেরুজালেমে হ্রাস পেলে গ্রিক খ্রিস্টানগণ পবিত্র স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার বলপূর্বক গ্রহণ করে। গ্রিক খ্রিস্টানদের অভিভাবক রাশিয়ার জার প্রাচ্যে ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়নের ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব খর্ব করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাশিয়া এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতদ্বয় তুর্কি সুলতানকে সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক দুটি খ্রিস্টান ধর্ম সম্প্রদায় পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অভিভাবকত্বকে কেন্দ্র করে বিবাদ এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান রাশিয়ার দাবি অগ্রাহ্য করে ফ্রান্সের অধিকারকে স্বীকার করলে জার নিকোলাস প্রিন্স মেনস্কিকভকে (Prince Menschikoff) কনস্টান্টিনোপল-এ পাঠান। গোপন বৈঠকে তুরস্কের মন্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রিন্স মেনস্কিকভ রাশিয়াকে অভিভাকত্ব প্রদানের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। ইংল্যান্ডের লর্ড ক্লারেনডন বলেন, "আত্মসম্মান এবং স্বাধীনচেতা কোনো রাজা প্রিন্স মেনস্কিকভের প্রস্তাবকে সমর্থন এবং অসঙ্গত চুক্তি দ্বারা অপর কোনো শক্তিশালী নৃপতির রাজ্যের অন্তর্গত কিছুসংখ্যক স্বধর্মাবলম্বী ব্যক্তির উপর যত গুপ্তভাবেই হোক না কেন রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার জাহির করতে পারেন নি।" ইংল্যান্ডের বিরোধিতায় রাশিয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হল। ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ন জনসাধারণকে তাঁর বৈদেশিক নীতি দ্বারা চমৎকৃত (dazzle) করার উদ্দেশ্যে এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করে সহানুভূতিলাভের আশায় প্রাচ্যদেশীয় সমস্যায় জড়িত হন। তিনি মনে করতেন যে, গ্রিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের তুরস্ক-অধিকৃত বলকান উপদ্বীপ এবং খ্রিস্টানদের পবিত্র স্থানসমূহে কর্তৃত্ব বিনষ্ট করতে পারলে ফ্রান্সের জাতীয় মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। নিকোলাসের সঙ্গে নেপোলিয়নের শত্রুতার ফলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্স তুরস্কের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

www.pathagar.com

৩. ব্রিটেনের হস্তক্ষেপ (Interference of England) : রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতিকে ব্যাহত করার প্রয়াসে ইংল্যান্ড তুরস্কের স্বাধীনতা এবং অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে রাশিয়ার রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রভাবের ফলে ইংল্যান্ড শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কুসুক-কাইনারজির সন্ধি এবং আড্রিয়ানোপল চুক্তি অনুযায়ী বলকান দ্বীপে রাশিয়ার কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। সিরিয়া-সমস্যা সমাধানে ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগে লন্ডন কনভেনশন অনুযঅয়ী রাশিয়ার প্রভাব খর্ব করেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস সেন্ট পিটার্সবুর্গের রাষ্ট্রদূত স্যার হ্যামিলটন সাইমোরের সঙ্গে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করার পরিকল্পনা করেন; কিন্তু ব্রিটেনের নিষ্ক্রিয় মনোভাবে রাশিয়া নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস লন্ডনে গিয়ে অ্যাবারডিনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন এবং ইউরোপের 'রুগ্ন ব্যক্তির' সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেন। ইংল্যান্ডের বিরোধিতায় এবং কূটনৈতিক দক্ষতায় রাশিয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হর। লর্ড স্ট্রাটফোর্ড দ্য রেডক্লিফের বিচক্ষণতা ও প্ররোচনায় সুলতান রাশিয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে, রাশিয়ার অভিভাবকত্ব তুরস্ক সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বকে বিনষ্ট করবে।

যুদ্ধ বা ঘটনা : রাশিয়ার অবারিত আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি, সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা এবং তুরস্কের বিনিময়ে প্রাচ্যে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রভাব সৃষ্টি করার চেষ্টায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপীয় বৃহৎশক্তিসমূহ রাশিয়ার এহেন সম্প্রসারণ নীতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ভিয়েনায় একটি সম্মেলন আহ্বান করে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এবং প্রুশিয়ার প্রতিনিধিগণ রাশিয়া এবং তুরস্কের নিকট যুদ্ধ এড়ানোর জন্য একটি মীমাংসামূলক প্রস্তাব প্রেরণ করেন। ভিয়েনা নোট (Vienna Note) নামে পরিচিত এই প্রস্তাবটিতে কুসুক-কাইনারজি এবং আড্রিয়ানোপল-এর সন্ধিকে সমর্থন করে তুর্কি সাম্রাজ্যেল খ্রিস্টান প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাশিয়া মোলদাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া (১৮৫৩) অধিকার করলে যে জটিল এবং উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাকে প্রশমন করার চেষ্টা করা হয় এই ভিয়েনা নোটে। রাশিয়াকে প্রদত্ত নোটে উল্লিখিত শব্দ রক্ষণাবেক্ষণকে "জারের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ" (Protection by the Czar)—এই ব্যাখ্যা দিয়ে নিকোলাস এটি গ্রহণ করেন; অপরপক্ষে, তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ রেডক্লিফ-এর প্ররোচনায় একে "তুরস্ক সাম্রাজ্য দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ" (Protection by the Porte) বলে ব্যাখ্যা করেন। কূটনৈতিক কৌশলে রেডক্লিফ জারকে একদিকে প্রস্তাব গ্রহণ করতে, অপরদিকে সুলতানকে বাতিল করতে চাপ প্রয়োগ করেন।

তুরস্কের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে ভিয়েনা নোট পরিহার করে রাশিয়াকে তুরস্কের অধিকৃত অঞ্চল মোলদাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া ছেড়ে দেবার জন্য রেডক্লিফ সুলতানের উপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেন। জার এটি অস্বীকার করলে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সিনোপ (Sinope)-এর নৌযুদ্ধে তুরস্কের নৌবহর রাশিয়ার বিশাল নৌবাহিনীর নিকট পরাজিত হলে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স সন্ত্রস্ত হয়ে তুরস্কের সাহায্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করল। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং

www.pathagar.com

তুরস্ক রাশিয়াকে মোলদাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া পরিত্যাগ করার জন্য চরমপত্র প্রদান করে। কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স জারের সম্প্রসারণ নীতিতে সামরিক শক্তি প্রয়োগের চেষ্টায় বাধাদান করে। ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে এবং এ ব্যাপারে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সাহায্য এবং সহানুভূতিলাভের আশায় সার্ডিনিয়া-পাইডমন্ট ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগদান করে। মন্ত্রী ক্যাভুর পনেরো হাজার ইতালীয় সৈন্য ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করে ইতালীয় সমস্যায় মিত্রশক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে জার নিকোলাস তুর্কিবাহিনীর অসীম তেজস্বিতা এবং প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রামের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে সিলিসট্রিয়ার প্রান্তর থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। উপরন্তু, অস্ট্রিয়ার শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব এবং মিত্রশক্তির তুরস্ককে সক্রিয় সাহায্যদানের ফলে মোলদাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া অঞ্চল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলে দানিয়ুব অঞ্চল থেকে রুশবাহিনী অপসারিত হলে সেখানে মিত্রশক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত লন্ডন কনভেনশনের শর্তকে খণ্ডন করে ইঙ্গ-ফরাসি নৌবহর দার্দানেলিসে প্রবেশ করে। রাশিয়ার আক্রমণাত্মক অভিযানকে প্রতিহত করার জন্য মিত্রবাহিনী সিবাস্তোপোলের দিকে অগ্রসর হয়। আল্মা-এর যুদ্ধে (The Battle of Alma) রুশবাহিনীকে পরাজিত করে মিত্রবাহিনী সিবাস্তোপোল অবরোধ করে। রুশবাহিনী সিবাস্তোপোলকে রক্ষা করার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করে; কিন্তু শক্তিশালী মিত্রবাহিনীর নিকট বেলেক্লেভা (Balaclava) এবং ইনকারমেন (Inkermann)-এর পরপর দুটি যুদ্ধে রাশিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ব্রিটিশ ক্ষুদ্রবাহিনী (Charge of the Light Brigade)-এর বীরত্বপূর্ণ এবং মরণপণ আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে দুটি আকর্ষণীয় চরিত্রের আবির্ভাব হয়; প্রথমত, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল (Florence Nightingale) নাম্নী একজন ইংরেজ তরুণী আর্তের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে আহত এবং পীড়িত সৈনিকদের সুস্থ করার চেষ্টা করেন। 'প্রদীপবাহী মহিলা' (The Lady with the Lamp) আখ্যায়িত এই প্রখ্যাত সেবিকা সর্বপ্রথম একটি স্বেচ্ছাসেবিকা দল (nursing) গঠন করেন। এর ফলে আহত ব্রিটিশ সৈন্যদের মৃত্যুর হার শতকরা ৪৪ থেকে ২ জনে হ্রাস পায়। এর প্রধান কৃতিত্ব ছিল নাইটিঙ্গেলের। দ্বিতীয়ত, সিবাস্তোপোল রক্ষার জন্য রুশ সেনাধ্যক্ষ কর্নেল টডলেবেন (Colonel Todleban) যে অসীম বীরত্ব এবং যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করেন তা ইউরোপের ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। এতদ্‌সত্ত্বেও মিত্রবাহিনী দীর্ঘ এক বছর সংগ্রাম করে সিবাস্তোপোল দখল করে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সিবাস্তোপোলের পতনে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হয়।

প্যারিস সন্ধি (The Treaty of Paris)

প্যারিস সন্ধি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যু এবং ইংল্যান্ডে অ্যাবারডিনের স্থলে পামারস্টোনের প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ যুদ্ধবিরতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস

www.pathagar.com

কংগ্রেসে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ অবসান করার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, তুর্কি, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া এবং পাইডমন্ট একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী কৃষ্ণসাগরকে 'নিরপেক্ষ এলাকা' (neutral zone) বলে ঘোষণা করা হয় এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে রাশিয়া অথবা অপর কোনো দেশ এর তীরবর্তী স্থানে অস্ত্রাগার নির্মাণ কিংবা এর জলপথে যুদ্ধজাহাজ চলাচল করতে পারবে না। ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তুরস্কের সার্বভৌমত্ব ও স্থায়িত্বকে স্বীকৃতিদান করে এবং এর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়। তুরস্কের ঐক্য এবং সংহতি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি লাভ করে সুলতান ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের সদস্য হওয়ার মর্যাদা পান। সুলতান তুরস্ক সাম্রাজ্যের খ্রিস্টান প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং সকলপ্রকার ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার অঙ্গীকার করেন। জারের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তিকে হ্রাস করার উদ্দেশ্যে তুরস্কের গ্রিক খ্রিস্টানদের রক্ষণাবেক্ষণের (Protectorate) অধিকার থেকে রাশিয়াকে বঞ্চিত করা হয়। উপরন্তু, রাশিয়া মোলাদাভিয়াকে বেসারাবিয়া প্রদান করতে বাধ্য হয়। এর ফলে দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে রাশিয়ার সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। রাশিয়া ওয়ালচিয়ার উপর প্রোটেক্টরেট এবং অধিকার প্রত্যাহার করলে তুরস্কের অধীনে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলাফল

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ ফলাফল ছিল বিবিধ। এ. জে. পি. টেইলর বলেন, "একদিক দিয়ে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল এবং এর সঙ্গত কারণ ছিল। নিকোলাস, নেপোলিয়ন অথবা ব্রিটিশ সরকার সংঘর্ষ বাধবার পর আত্মসম্মান রক্ষার্থে পশ্চাদ্‌গমন করতে পারেননি। রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য নিকোলাস অভীষ্ট-সাধনের উপযোগী একটি তুরস্ক চান। স্বদেশে স্বীয় পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন সফলতা কামনা করেন। পূর্ব ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার স্বাধীন তুরস্ক কায়েম রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। কিন্তু কেউই সুষ্ঠু আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেননি। এমনকি তৃতীয় নেপোলিয়ন গোলযোগকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেও ঘটনাচক্রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রকৃতপক্ষে, রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ক খণ্ডবিখণ্ড করার ব্রিটিশ ভীতি পশ্চিমা শক্তিবর্গ কর্তৃক কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার নিরাপত্তা বিনষ্টের মতোই অসঙ্গত এবং ভিত্তিহীন ছিল। পারস্পরিক আক্রমণ অপেক্ষা পারস্পরিক ভীতি এবং আশঙ্কার ফলেই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মোটের উপর এই যুদ্ধ নিরর্থক ছিল না। এর মূলে ছিল ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী ঘটনাবলী। ইতালিতে অস্ট্রিয়ার বিজয় এবং হাঙ্গেরিতে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের ফলে ব্রিটিশ জনমত রাশিয়ার প্রতিকূলে ছিল। প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা অপেক্ষা ইউরোপের জন্যই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়; পশ্চিমা শক্তিবর্গের স্বার্থেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে এটি পরিচালিত হয়; তুরস্কের অনুকূলে নয়।"

তুরস্কের স্বার্থে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, কারণ ইউরোপীয় বৃহৎশক্তি একটি নতুন রাজনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই নতুন ইউরোপীয় ভারসাম্য থেকে রাশিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করাই ছিল ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের প্রধান উদ্দেশ্য। জার আলেকজান্ডারের 'পবিত্র চুক্তি' বিধ্বস্ত হলে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন এবং রাশিয়াকে বহিষ্কার

www.pathagar.com

করে নতুন ইউরোপীয় শক্তিসমবায় সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। রাশিয়া এবং প্রুশিয়ার ক্ষমতাহ্রাস করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সার্ডিনিয়া এবং তুরস্ক নতুন শক্তিজোট গঠন করে।

প্রাচ্যে রাশিয়ার অপরিমিত রাজ্যলিপ্সা ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তুরস্কের গ্রিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর রাশিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের (Protectorate) অধিকার বিলুপ্ত হল; কৃষ্ণসাগর এবং দানিয়ুব অঞ্চলে এর আধিপত্য তিরোহিত হল; রাশিয়ার অধীনস্থ মোলদাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করলে তুরস্ক এবং রাশিয়ার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

"রাশিয়াকে দমন করে রুগ্ন ব্যক্তিকে পুনরায় দণ্ডায়মান করা হল।" (Russia was checked and the sickman was set on his legs again.) সম্মান এবং প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে তুরস্ক ইউরোপীয় সমবায়ের সদস্যপদ লাভ করল। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডত্ব এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হল। রাশিয়ার কোপদৃষ্টি থেকে রক্ষা পেয়ে তুরস্ক নবজীবন লাভ করল এবং স্বীয় রাজ্যে খ্রিস্টান প্রজাদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হল।

সিটন ওয়ার্টসন বলেন, "উন্নতমানের বিচারবুদ্ধি-বহির্ভূত কোনো মিথ্যা সংবাদে প্ররোচিত এবং আগ্রহী জনমত যদি কখনও যুদ্ধ সৃষ্টি করে থাকে, তা হলে সেটা হচ্ছে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ।" অন্য কথায় জনগণকে বিভ্রান্ত করে কূটনৈতিক কৌশলে একটি অনাবশ্যক সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়। এই যুদ্ধের মূলে প্রধানত স্ট্রাটফোর্ড দ্য রেডক্লিফের রাজনৈতিক অসাধুতা এবং কূটনৈতিক ভোজবাজি (political jugglery) দায়ী। রাশিয়ার প্রতি ইংল্যান্ডের অবিমিশ্র ঘৃণ্য এবং বিদ্বেষের ফলে যে অসংখ্য লোকক্ষয় হয় তার তুলনায় ফলাফল ছিল খুবই নগণ্য এবং ক্ষণস্থায়ী। এ কারণে একে "উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত যুদ্ধ" (It was most senseless war of the mineteenth century) বলে অভিহিত করা হয়। ইংল্যান্ড কৃষ্ণসাগরকে একটি রুশ হ্রদে রূপান্তরিত করতে বাধাপ্রদান করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ রাশিয়ার প্রভাবকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলাফল ছিল খুবই নগণ্য; কারণ, প্যারিস চুক্তির শর্তাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়নি। পরোক্ষ ফলাফল বিচার করলে এই যুদ্ধ ইউরোপের স্বাধীনতা এবং জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ প্রাচ্যদেশীয় সমস্যার একটি প্রয়োজনীয় পরিচ্ছেদ এবং উনবিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অগ্রদূত। কেটেল্‌বে একে 'জলোচ্ছ্বাস'-এর সাথে (watershed) তুলনা করেন। নিপীড়িত ইউরোপীয় জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহাকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল ক্রিমিয়া যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী পরোক্ষ ফলাফল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মিত্রবাহিনীতে যোগদানের ফলে ক্যাভুরের দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সর্বপ্রথম প্রতীয়মান হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ইতালির স্বাধীনতা আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক সমস্যারূপে প্রমাণিত করা এবং ইউরোপীয় বৃহৎশক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে একে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্যাভুরের ইতালির একত্রীকরণ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন।

www.pathagar.com

ফ্রান্সের সাহায্য ব্যতীত ইতালি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারত না। এ কারণে বলা হয়, "ক্রিমিয়ার কাদা থেকে নতুন ইতালি এবং পরোক্ষভাবে জার্মানির জন্ম হয়।" (Out of the mud of Crimea, a new Italy was made and less obviously, a new Germany.)

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার বন্ধুত্ব এবং মৈত্রীসম্পর্কে ফাটল ধরে। উল্লেখযোগ্য যে, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বন্ধুত্ব মেটারনিকের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান অঙ্গ ছিল এবং এর জন্যই ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া হাঙ্গেরির বিদ্রোহ দমন করার জন্য অস্ট্রিয়াকে সহায়তা করে। কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার 'বৈরীভাবাপন্ন নিরপেক্ষতা' (hostile neutrality)-তে ক্ষুব্ধ হয়ে রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে প্রুশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে। প্রুশিয়ার 'বন্ধুত্বমূলক নিরপেক্ষতায়' (friendly neutrality) আস্থাভাজন হয়ে রাশিয়া তার সাথে মৈত্রীজোট গড়ে তুলতে চেষ্টা করে এবং ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে পোলিশ বিদ্রোহ দমনে প্রুশিয়াকে সাহায্য করে। জার্মান একত্রীকরণের প্রধান প্রতিবন্ধক অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে বহিষ্কার করার চেষ্টা রাশিয়ার নিরপেক্ষতায় সফলকাম হয়। এটি বিসমার্কের অপূর্ব কূটনৈতিক মেধার পরিচায়ক। ফলে, পরোক্ষভাবে জার্মান স্বাধীনতা আন্দোলনের সফলতা ক্রিমিয়ার যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক মৈত্রীজোটের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ সংস্কারের পথ সুগম করে। প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রাশিয়ার রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। ভূমি-ক্রীতদাসদের (Serfs) মুক্তিদান সমাজসংস্কারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল। ইউরোপ ভূখণ্ডে রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলে জার মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করে ব্রিটিশ ভারতে প্রভাববিস্তারের প্রয়াস পান।

সমালোচনা (criticism) ঃ সমালোচকের দৃষ্টিতে, "সামরিক অনভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক নিষ্ফলতার অবাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সর্বকালের জন্য অম্লান হয়ে থাকবে।" বিনা প্রয়োজনে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং এর পরিচালনা ও সমাপ্তিতে দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার অভাব প্রমাণিত হয়। প্যারিস চুক্তি প্রাচ্যদেশীয় সমস্যাবলী সমাধানের পরিবর্তে ইউরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে এরূপ জটিল এবং ঘোলাটে করে তোলে যে, পরবর্তীকালে এটাই ১৯১১-১৩ খ্রিস্টাব্দের বলকান যুদ্ধ এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম মহাসমরের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্যারিস চুক্তির শর্তাবলী বিভিন্ন উপায় ও কারণে লঙ্ঘিত হয়।

ক. রুশ এবং অস্ট্রিয়ার দীর্ঘদিনব্যাপী বন্ধুত্বে ফাটল ধরে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য অস্ট্রো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকে। ফলে, জার্মান স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হয়।

খ. রাশিয়া প্যারিস চুক্তির শর্তাবলীকে তুচ্ছ করে অটমান সাম্রাজ্যের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বেসারাবিয়ার কিয়দংশ বলপূর্বক দখল করে। কৃষ্ণসাগরের নিরপেক্ষতাকে ভঙ্গ করে প্রুশিয়ার প্ররোচনায় রাশিয়া ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে রুশ নৌবহর প্রতিষ্ঠা করে।

www.pathagar.com

গ. তুর্কিশক্তিকে হীন এবং পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ক্রিটবাসীদের তুরস্ক সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে প্ররোচিত করেন।

ঘ. ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ শুরু হলে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জার বুলগেরীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করেন।

ঙ. প্যারিস চুক্তির শর্তানুযায়ী মোলাদাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া দুটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু এই দুই রাষ্ট্রের জনগণ একই জাতি ও ভাষার অন্তগৃত থাকায় তাদের মধ্যে জাতীযতাবাদী স্পৃহার উন্মেষ হয় এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই দুই রাষ্ট্র রুমানিয়া নামে একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং তুরস্ক এই নবগঠিত রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তৃতীয় নেপোলিয়নের উদার মনোভাব এবং প্ররোচনার ফলে ইউরোপীয় মিত্রশক্তি কর্তৃক রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃতিলাভ করে।

চ. ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ার সহায়তায় সার্বিয়া ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক-অধিকৃত অঞ্চলসমূহ পুনর্দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

ছ. প্যারিস চুক্তির শর্তাবলী ভঙ্গ করে তুর্কি সুলতান খ্রিস্টান প্রজাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করতে থাকেন। তুর্কির অভ্যন্তরীণ গোলযোগে স্থানীয় শাসনকর্তাগণ বলকান উপদ্বীপের খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বিলোপ করে মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় উৎপীড়ন এবং অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাতে থাকেন। এর ফলে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

জ. বলকান উপদ্বীপের উৎপীড়িত খ্রিস্টান স্লাভজাতি তুরস্কের আধিপত্যকে বিনষ্ট করার জন্য যে আন্দোলন পরিচালনা করে তা প্যান-স্লাভিজম (Pan-Slavism) নামে পরিচিত।

ঝ. ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে তুর্কি জাতীয়তাবাদ আন্দোলন শুরু হয় এবং সুলতান সংবিধান প্রণয়নে বাধ্য হন।

চুক্তির শর্তাবলী ভঙ্গের ফলে ইউরোপীয় রাজনীতি একটি আন্তর্জাতিক বৈষম্য এবং বিরোধে রূপান্তরিত হয়। এর জন্যই স্যার রবার্ট মরিস ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে "সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রয়োজনে সংঘটিত একটি আধুনিক যুদ্ধ" (The only perfectly useless modern war that has been waged.) বলে বর্ণনা করেন।

রুশ-তুর্কি যুদ্ধ (Russo-Turkish War) (১৮৭৭-৭৮ খ্রি)

কারণ ঃ প্যারিস চুক্তির শর্তাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলে প্রাচ্যদেশীয় সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু শর্তভঙ্গের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এই সমস্যার চতুর্থ পর্যায়ের অবতারণা হয়। গ্রান্ট এবং টেমপারলে বলেন, "উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাসে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ একটি অদ্ভুত আসন দখল করে আছে ... বিজয়ীগণ এই সংঘর্ষের ফলে বিশেষ কিছুই সুবিধা লাভ করতে পারেনি। তুরস্কের অখণ্ডত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। রাশিয়ার অভিযানকে স্থায়ীভাবে প্রতিহত করা যায়নি। ক্রিমিয়া যুদ্ধ-বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী ফলাফলগুলোকে লঙ্ঘন করার ফলে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম মহাসমরে অসংখ্য জীবন এবং অগণিত অর্থ ব্যয় করতে হয়।"

www.pathagar.com

প্রাচ্যদেশীয় সমস্যাবলীর চতুর্থ পর্যায় বলকান উপদ্বীপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। তুরস্ক সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রিস, সার্বিয়া, রুমানিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে কারা জর্জ (Kara George)-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সার্বগণ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয় এবং তুরস্ক-অধিকৃত অঞ্চলসমূহ মুক্ত করে সার্বিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কারাজর্জিভিচদের (Karageorgevitch) অপসারিত করে অবরোনোভিচ (Obronovich) বংশ সিংহাসন দখল করলে সার্বিয়ার পররাষ্ট্রনীতি অস্ট্রিয়াবিরোধী এবং রুশমুখী হয়ে ওঠে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর মোলদাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া একত্রিত হয়ে রুমানিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার কউযা (Alexander Couza) 'রুমানিয়ার প্রিন্স' উপাধি গ্রহণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। কউযাকে পদচ্যুত করে প্রথম চার্লস ক্ষমতালাভ করেন। চার্লস রুমানিয়া গির্জাকে কনস্টান্টিনোপলের গ্রিক প্রধান ধর্মাজকের আওতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। তুরস্ক সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত হলে মন্টিনিগ্রোয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কেবলমাত্র বুলগেরিয়াই তুর্কি সুলতানের কর্তৃত্বাধীনে ছিল।

বুলগার স্বাধীনতা আন্দোলন সংঘটিত হয় একজন ধর্মযাজকের নেতৃত্বে। কনস্টান্টিনোপলের গ্রিক আর্চ বিশপের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিলাভ করার অভিপ্রায়ে বুলগারগণ একটি স্বতন্ত্র জাতির ধর্মীয় সংস্থা গঠন করে। জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বুলগারগণ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভঙ্গ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে; কিন্তু তুরস্কের সুলতান বিদ্রোহীদের কঠোর হাতে দমন করেন। অসংখ্য দেশপ্রেমিক বুলগারদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বুলগার আন্দোলন ভয়াবহ আকার ধারণ করলে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ আন্দ্রেসি নোট (Andrassy Note)-এ সুলতানকে সংস্কারমূলক পন্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ করে। সুলতানের প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে বুরগারগণ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে সুলতানের আধিপত্যকে খর্ব করার চেষ্টা করে। তুরস্ক-অধিকৃত বলকান অঞ্চলে রাজনৈতিক অরাজকতা, প্রশাসনিক অব্যবস্থা, দুর্নীতি, অত্যাচারমূলক পন্থাবলীর ফলে খ্রিস্টান প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

হার্জেগোভিনা Herzegovina) বুলগেরিয়াকে অনুসরণ করে বলকান উপদ্বীপে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের চেষ্টা করে। শাসনকর্তার অমানুষিক অত্যাচার এবং পীড়নাত্মক করভারে অতিষ্ঠ হয়ে হার্জেগোভিনার কৃষকশ্রেণী ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এর ফলে সমগ্র বলকান উপদ্বীপে, বিশেষ করে বসনিয়া, সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। স্বধর্মাবলম্বীদের সাহায্যদানে রাশিয়া আগ্রহ প্রকাশ করে কিন্তু ক্রিমিয়া যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের স্মৃতি অম্লান থাকায় জার অস্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়ার সহায়তায় বার্লিন মেমোরেন্ডাম (The Berlin Memorandum) জারি করেন। এই মেমোরেন্ডামে সুলতানকে সুযোগ-সুবিধা প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করা হয়। ইংল্যান্ডের নির্লিপ্ত মনোভাবের জন্য সুলতান অঙ্গীকার পালনে আগ্রহী ছিলেন না।

www.pathagar.com

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বলকান উপদ্বীপ তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে; বিশেষ করে মন্টিনিগ্রো এবং সার্বিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সুদূরপ্রসারী করার চেষ্টা করে। অনিয়মিত তুর্কিবাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা এবং জিঘাংসা মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়ে রক্তপাতের মাধ্যমে বুলগার বিদ্রোহ দমন করার প্রয়াস পায়। ইউরোপের ইতিহাসে 'বুলগার নৃশংসতা' (Bulgarian atrocities) সমগ্র বিশ্বে একটি আতঙ্ক এবং ভীতির সঞ্চার করে। তুরস্কের বর্বরোচিত কার্যকলাপে ইংল্যান্ডেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গ্লাডস্টোন বলকান থেকে তুর্কিদের তল্পিতল্পাসহ (bag and baggage) বহিষ্কারের জন্য জনমত গঠন করতে থাকেন। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করায় গ্লাডস্টোনের মতের কোনোপ্রকার গুরুত্ব রইল না; তিনি একে 'কফি হাউসের বুদ্বুদ' বলে আখ্যায়িত করেন। অবশ্য তিনি পরে উপলব্ধি করেন যে, রাজনৈতিক বুদ্বুদ (political bubble) অগ্ন্যুৎগারের রূপ গ্রহণ করতেও পারে।

প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা সমাধানে ইংল্যান্ড বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করায় রাশিয়া তুরস্কের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী গ্রিকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় সাহায্য প্রদান করতে থাকে। তুরস্কে খ্রিস্টান প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে রাশিয়া বলকান উপদ্বীপে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব এবং অখণ্ডত্ব নিশ্চিত করাকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির প্রধান ভিত্তি বলে ঘোষণা করেন। তাঁর উদ্যোগ কনস্টান্টিনোপল-এ পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি বৈঠক আহ্বান করা হল। কিন্তু দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের উদারনীতির ফলে বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাহত হল। তিনি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে একটি উদারনৈতিক সংবিধান প্রণয়ন করে সাম্রাজ্যে শান্তি এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ বরকান উপদ্বীপের বসনিয়া, হার্জেগোভিনা ও বুলগেরিয়াকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য সুলতানকে চাপ দিলে তিনি বলেন যে, যেহেতু তুরস্ক উদারপন্থী এবং সংস্কারমূলক কার্যকলাপকে অগ্রাধিকার দিয়েছে সেহেতু প্রজাদের উপর তাঁর আধিপত্য তিরোহিত করা চলবে না।

যুদ্ধ ঃ কনস্টান্টিনোপল-এর বৈঠক নিষ্ফল হওয়ার পর সুলতানের নিকট থেকে তুরস্কের উদারনীতি এবং নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ স্পষ্ট অঙ্গীকার দাবি করে। সুলতান এতে অস্বীকৃতি জানালে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে এবং সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। রুশ সৈন্য দানিয়ুব অতিক্রম করে তুরস্ক অভিমুখে অগ্রসর হলে বীর যোদ্ধা ওসমান পাশার নেতৃত্বে তুর্কিবাহিনী প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্লেভনা (Plevna)-র প্রান্তরে রুশ আক্রমণ প্রতিহত হয় কিন্তু রাশিয়ার সেনাধ্যক্ষ টডলেবেনের যুদ্ধ পরিচালনায় রাশিয়া প্লেভনা দখল করে এবং বলকান গিরিপথ হয়ে রুশ সৈন্য ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে। আদ্রিয়ানোপল দখল করে রুশ সৈন্য কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ইত্যবসরে তুরস্ক যুদ্ধবিরতিকল্পে সন্ধির প্রস্তাব করে এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত সান-স্টিফানোর সন্ধি (The Treaty of San Stefano) অনুযায়ী রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

www.pathagar.com

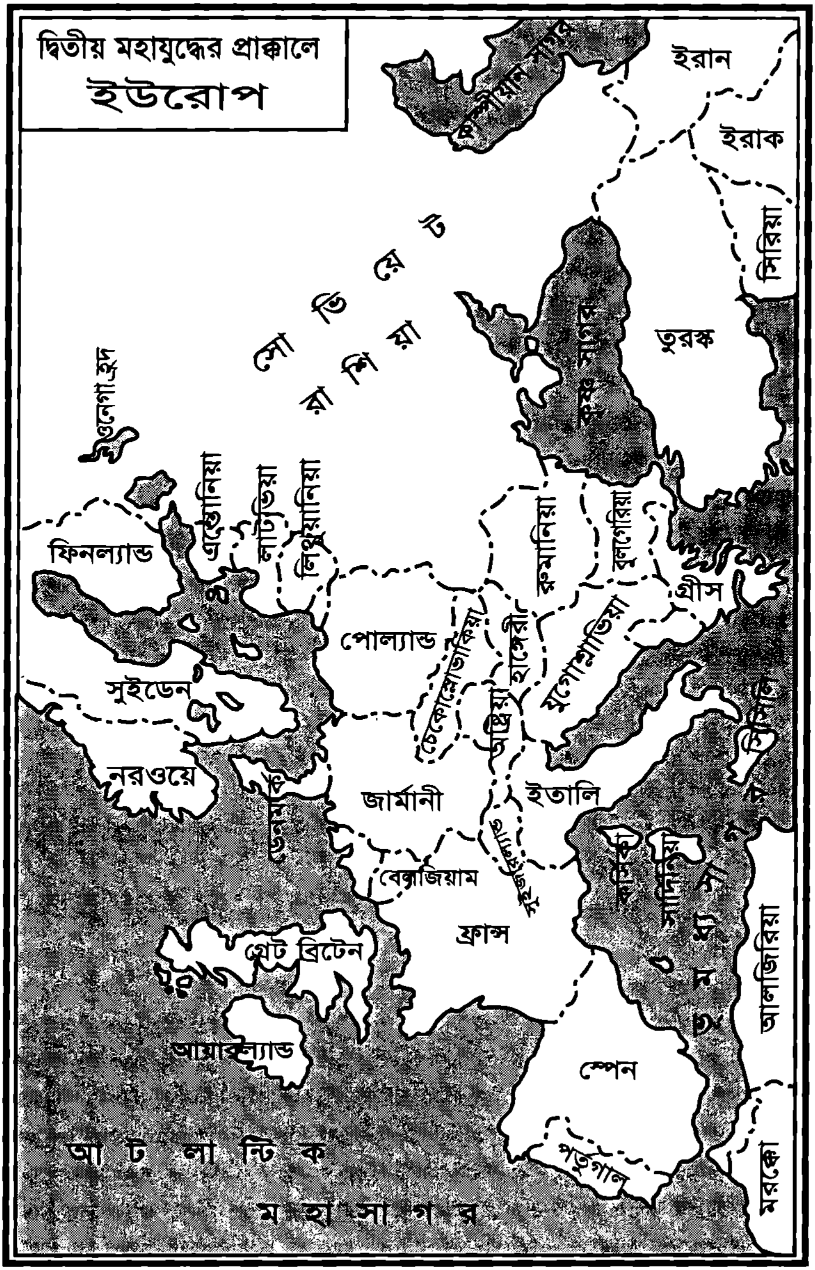

চিত্র ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপ

www.pathagar.com

সান-স্টিফানোর সন্ধি (The Treaty of San-Stefano) ঃ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক এবং রাশিয়ার স্বাক্ষরিত সান-স্টিফানোর চুক্তি অনুযায়ী সুলতান রুমানিয়া, সার্বিয়া এবং মন্টিনিগ্রোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতিদান করেন। রুমানিয়া রাশিয়াকে বেসারাবিয়া অর্পণ করলে বৃহৎ বুলগেরিয়া (Great Bulgaria) নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত করদরাজ্য সৃষ্টি করা হয়। এই নবগঠিত রাষ্ট্রটি বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, মেসিডোনিয়া এবং বেসারাবিয়া নিয়ে গঠিত ছিল এবং দানিয়ুব কৃষ্ণসাগর, এজিয়ান সাগর এবং আলবেনিয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনায় সংস্কার প্রবর্তন করে রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার যুগ্ম রক্ষণাবেক্ষণে তাদের রাখা হল।

বিজয়ের গৌরবস্বরূপ রাশিয়া আর্মেনিয়ার অংশবিশেষ, কারস্ (Kars), বটুম (Botoum), বায়াজিদ (Bayazid) ও ডবরুজার পরিবর্তে রুমানিয়ার নিকট থেকে বেসারবিয়া লাভ করল। সান-স্টিফানোর সন্ধি তুরস্কের সুলতানকে শক্তিহীন করে তাঁর রাজ্যকে কনস্টান্টিনোপল ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এবং আলবেনিয়ায় সীমাবদ্ধ করল।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, সান-স্টিফানোর সন্ধিশর্তগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবসান হত। একদিকে এটি যেমন রাশিয়ার কূটনৈতিক বিজয় এবং প্যারিস চুক্তির (১৮৫৬) প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা, অপরদিকে এটি তুরস্কের পক্ষে অপমানকর ছিল। তুরস্কের পতনে স্লাভ জাতির উত্থানই ছিল এই ঘৃণিত সন্ধির মূল উদ্দেশ্য। প্যারিস চুক্তি মোতাবেক কৃষ্ণসাগরে কোনো দেশের যুদ্ধজাহাজের প্রবেশাধিকার ছিল না; কিন্তু সান-স্টিফানোর সন্ধি অনুযায়ী কৃষ্ণসাগরের বসফোরাস প্রণালী এবং দার্দানেলিস বাণিজ্যিক জাহাজের যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করা হল।

সমালোচনা ঃ সান-স্টিফানোর সন্ধি ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে এক তীব্র রাজনৈতিক অসন্তোষ এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি বলকানে রাশিয়ার প্রভাববিস্তারে শঙ্কিত হয়ে সান-স্টিফানোর চুক্তিকে অযৌক্তিক বলে প্রতিবাদ করেন। তুরস্ককে কুক্ষিগত করায়ই রাশিয়ার প্রতি ইংল্যান্ডের বিদ্বেষ প্রকট আকার ধারণ করল। এজিয়ান সাগরে প্রভাব বিস্তার করে বলকান দ্বীপে প্রভুত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়া রাশিয়ার একনায়কত্বের বিরোধিতা করে। ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়া একজোটে সান-স্টিফানোর চুক্তি সম্পাদনকে অসঙ্গত বলে অভিহিত করে। অস্ট্রিয়া, সার্বিয়া এবং গ্রিস 'বৃহৎ বুলগেরিয়া' সৃষ্টিতে ক্ষুব্ধ হয়। বেসারাবিয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হলে রুমানিয়া রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতে থাকে। ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়া সান-স্টিফানো সন্ধির পরিবর্তন এবং অনুমোদনের জন্য রাশিয়াকে একটি ইউরোপীয় কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান জানায়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তির শর্তাবলী সান-স্টিফানোর চুক্তি দ্বারা বাতিল হওয়ার উপক্রম হলে বার্লিনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এই বৈঠকে যোগদান করতে ইতস্তত করলে ইংল্যান্ড যুদ্ধঘোষণার হুমকি প্রদান করে। নিহিলিষ্ট (Nihilist) আন্দোলন রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি জটিল করে তুললে জার ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কূটনৈতিক চাপকে উপেক্ষা করতে পারেননি। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বিসমার্কের সভাপতিত্বে বার্লিনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বার্লিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সান-স্টিফানোর সন্ধি বাতিল ঘোষিত হয়।

www.pathagar.com

বার্লিন চুক্তি (The Treaty of Berlin)

শর্তাবলী ঃ 'ন্যায়পরায়ণ দালাল' (honest broker) বিসমার্কের সভাপতিত্বে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের বৈঠকে বলকান উপদ্বীপের সমস্যাবলী সমাধান করার চেষ্টায় সান-স্টিফানোর চুক্তি বাতিল করা হয়। এই চুক্তির সিদ্ধান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো নিচে প্রদত্ত হল ঃ

১. সর্বসম্মতিক্রমে বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হল, পূর্ব রুমেলিয়াকে তুরস্কের অংশ বলে স্বীকার করা হয় এবং এখানে একজন খ্রিস্টান শাসনকর্তার অধীনে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বুলগেরিয়ার প্রধান অংশটি এবং মেসিডোনিয়ায় তুরস্ক সুলতানের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য স্বায়ত্তশাসন প্রচলন করা হয়। রাশিয়া বাযাজিদ অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে কারস্, বাটুম এবং আরদাহান (Ardahan) স্বীয় দখলে রাখল। বুলগেরিয়া তুরস্কের করদরাজ্যে পরিণত হল এবং নির্বাচিত শাসনকর্তাকে সুলতানের অনুমোদন এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সমর্থন লাভ করতে হত। ইউরোপের কোনো রাজপরিবারের সদস্য বুলগেরিয়ার শাসনকর্তা নির্বাচিত হতে পারবেন না স্থির হল।

২. অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি হার্জেগোভিনা এবং বসনিয়ায় প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং তুরস্কের পক্ষে সার্বিয়া প্রদেশসমূহের শাসনকার্য পরিচালনা করে। নভি-বাজারে অস্ট্রিয়া বাণিজ্যিক এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা সাম্রাজ্যভুক্ত করে।

৩. গুপ্ত ইঙ্গ-তুরস্ক চুক্তির ফলে সাইপ্রাসে ইংল্যান্ডের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এশিয়া মাইনরে রাশিয়ার সামরিক অভিযানকে ব্যাহত করা এবং ব্রিটিশ সামুদ্রিক বাণিজ্যকে অব্যাহত রাখার জন্য সুয়েজ খালকে তত্ত্বাবধান করা। ব্রিটেন আর্মেনিয়ায় নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় এবং সুলতান এই অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

৪. সার্বিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতিদান করা হয়। নভি-বাজারে অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সার্বিয়ার সার্বভৌমত্বে আঘাত লাগে।

৫. মন্টিনিগ্রোর স্বাধীনতা ইউরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং এটি আড্রিয়াটিকের একটি সমুদ্রবন্দর লাভ করে।

৬. রাশিয়াকে বেসারাবিয়া প্রদান করতে বাধ্য হলেও রুমানিয়া স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে এবং বেসারাবিয়ার ক্ষতিপূরণে বুলগেরিয়ার নিকট থেকে ডবরুজা (Dobrudja) লাভ করে। ইহুদিদের রাজনৈতিক সমতা প্রদানে রুমানিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হল।

৭. বার্লিন চুক্তি মোতাবেক গ্রিস কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করলে সুলতানের অনমনীয় মনোভাবের জন্য ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তার ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারিত হয়নি।

www.pathagar.com

৮. তুরস্কের সুলতান খ্রিস্টান প্রজাদের সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানে আগ্রহী হলেন। তিনি থাসালি (Thessaly), মেসিডোনিয়া এবং আলবেনিয়ায় সংস্কার প্রবর্তন করে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

৯. ফ্রান্স তিউনিস অধিকার করার চেষ্টা করে। ইতালি ত্রিপলি এবং আলবেনিয়ায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। জার্মানি বার্লিন চুক্তিতে কোনোপ্রকার দাবিদাওয়া পেশ না করার ফলে সুলতানের শুভেচ্ছা অর্জন করে।

চিত্র : বলকান রাষ্ট্রসমূহ (১৮১৫-৭৮)

সমালোচনা : ঐতিহাসিকদের মতে, সান-স্টিফানোর চুক্তি (১৮৭৮) প্যারিস সন্ধির (১৮৫৬) যেরূপ পরিপন্থী ছিল বার্লিন চুক্তিও (১৮৭৮) সান-স্টিফানোর চুক্তির অনুরূপ পরিপন্থী ছিল। টেইলরের মতে, "বার্লিন কংগ্রেস ইউরোপের ইতিহাসে একটি জলোচ্ছ্বাস। এর পূর্বে ত্রিশ বছর কাল সংঘর্ষ এবং আলোড়ন হয়েছিল এবং এর পরে

www.pathagar.com

চৌত্রিশ বছর কাল শান্তি বজায় ছিল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ইউরোপীয় সীমারেখার পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য দুটি নিরর্থক এবং নগণ্য সংঘর্ষ ব্যতীত ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে একটি গুলিও বর্ষিত হয়নি।"

সমালোচকদের সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় বার্লিন কংগ্রেস ছিল বিধিপ্রণয়নকারী একটি আদালত মাত্র। বার্লিন চুক্তি সান-স্টিফানোর সন্ধিকে বাতিল করলেও প্রকৃতপক্ষে এটি দেশীয় সমস্যাগুলো সমাধান করতে সক্ষম হয়নি। প্রধান উদ্যোগী ছিল ইংল্যান্ড। ডিজরেলি 'সম্মানের সাথে শান্তি' (peace with honour) স্থাপনের কৃতিত্ব দাবি করলেও আসলে লর্ড সল্‌সবেরির মতে, 'ইংল্যান্ড অযথা অর্থব্যয় করেছে' (put money on the wrong horse)। নিরপেক্ষ বিচারে প্রাচ্যদেশীয় সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে বার্লিন চুক্তি প্রথমে বলকান যুদ্ধ (১৯১২-১৩) এবং পরিশেষে প্রথম মহাসমর (১৯১৪-১৯)-এর পূর্বাভাষ মাত্র। বার্লিন চুক্তির শর্তাবলী পালন অপেক্ষা লঙ্ঘনেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

১. বার্লিন চুক্তি বলকান উপদ্বীপের জনসাধারণের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করে। বৃহৎ বুলগেরিয়াকে খণ্ডবিখণ্ড করে রাশিয়ার আধিপত্যকে খর্ব করা হয় এবং পূর্ব রুমেলিয়া এবং মেসিডোনিয়াকে তুরস্কের কর্তৃত্বাধীনে রেখে আড্রিয়ানোপল এবং কনস্টান্টিনোপল-এ রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করা হয়। ফলে, বিভক্ত বুলগেবিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করতে পারেনি।

২. প্যারিস চুক্তির ফলে রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মৈত্রীতে যে ফাটল ধরে বার্লিন সন্ধিতে তা আরও সুদূরপ্রসারী হয়ে ইউরোপীয় শক্তিজোটের রদবদল করে। রুমেলিয়া এবং সার্বিয়ার স্বার্থরক্ষার্থে অস্ট্রিয়া সচেষ্ট ছিল। জার্মান-অস্ট্রিয়া জোটসৃষ্টি বার্লিন চুক্তির অন্যতম ফলাফল।

৩. ডিজরেলির মতে, ইংল্যান্ড বার্লিন চুক্তিতে সম্মানের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি; কারণ, প্রকৃতপক্ষে এটি ইউরোপে শান্তিস্থাপন করতে এবং ব্রিটেনের সম্মান বৃদ্ধি করতে পারেনি। বার্লিন চুক্তির ফলে রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতি ইউরোপে ব্যাহত হলে রুশ ভাল্লুকের ছায়া মধ্য-এশিয়া এবং ব্রিটিশ-ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পড়তে থাকে। অপরদিকে, ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং ইঙ্গ-ফরাসি মৈত্রীজোট দৃঢ় হয়। লর্ড সলস্‌বেরির মতে, বার্লিন কংগ্রেসে গ্রেট ব্রিটেন 'ভুল ঘোড়াকে' (wrong horse) সমর্থন করে। সাইপ্রাস অধিকার করে ব্রিটেন বিশেষ কোনো সামরিক সুবিধা লাভ করতে পারেনি। আর্মেনিয়ায় ব্রিটেনের নৈতিক রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে নৃশংসভাবে আর্মেনিয়ানদের নিধন করা হয়। তুরস্কের সুলতানকে সংস্কারমূলক কার্যকলাপের জন্য চাপ প্রদান করেও কোনো ফল হয়নি।

৪. রাশিয়া সার্বিয়াকে সমর্থন না করায় সার্বিয়া বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে সার্বিয়া অস্ট্রিয়ার সঙ্গে গুপ্ত সন্ধিশর্তে আবদ্ধ হয়।

৫. বার্লিন চুক্তি মোতাবেক মন্টিনিগ্রোর স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও অস্ট্রিয়ার সম্প্রসারণ নীতির ফলে প্যান-স্লাভ (Pan-Slav) আন্দোলন পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। অস্ট্রিয়া বসনিয়া,

www.pathagar.com

হার্জেগোভিনা এবং নভি-বাজার দখল করলে সার্বিয়া, বসনিয়া এবং মন্টিনিগ্রোর একত্রীকরণ ব্যাহত হয়। অস্ট্রিয়া "বলকানের প্রহরী হয়ে এই উপদ্বীপের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।"

৬. রাশিয়াকে দক্ষিণ বেসারাবিয়া প্রদান করতে বাধ্য হলে রুমানিয়া বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং রাশিয়ার পরিবর্তে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও রুমানিয়া ইহুদিদের কোনোপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার দিতে অস্বীকার করে।

৭. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে গ্রিক সৈন্যবাহিনী থাসালি (Thessaly) আক্রমণ করলে বৃহৎশক্তিবর্গ তাদের নিবৃত্ত করে। ফলে, প্যারিস চুক্তিতে গ্রিস কোনো সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারেনি। অনুরূপভাবে, রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে পুনরায় থাসালি অবরোধ করলে গ্রিকদের প্রত্যাগমন করতে বাধ্য করা হয় এবং সান-স্টিফানো অথবা বার্লিন চুক্তিতে গ্রিসকে কোনো অঞ্চলই প্রদান করা হয়নি। ডিজরেলি বলেন, "গ্রিসের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সুতরাং তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।" যাহোক, গ্লাডস্টোন প্রধানমন্ত্রী হয়ে সুলতানকে ইপিরাস (Epirus)-এর এক-তৃতীয়াংশ এবং থাসালির বৃহদংশ গ্রিসকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন।

৮. বার্লিন চুক্তি অনুযায়ী সুলতান তুরস্ক-অধিকৃত বলকান উপদ্বীপে সংস্কারের যে প্রতিশ্রুতি দেন তা পালন করেননি। ব্রিটেনের প্রতি সুলতান আস্থাহীন হয়ে পড়লে তিনি জার্মানির সহযোগিতা এবং মৈত্রী কামনা করেন। সংস্কার প্রবর্তন করতে দ্বিধা করায় মেসিডোনিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক এবং গ্রিসের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। তুরস্কে 'নব্য-তুর্কি আন্দোলন' (Young Turks Movement) শুরু হলে তার প্রভাব বলকান উপদ্বীপের পরাধীন জাতিসমূহের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে।

ফলাফল ঃ বার্লিন চুক্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হল যে, রাষ্ট্রের একক হস্তক্ষেপে ইউরোপীয় সমস্যাবলী সমাধান করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকবে এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং যুগ্ম-ব্যবস্থা দ্বারা বিদ্বেষ, সংঘর্ষ এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ রোধ করবে। প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা সমাধান অপেক্ষা বৃহৎশক্তির স্বার্থরক্ষাই ছিল বার্লিন কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য। বৃহৎশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আকাঙ্ক্ষা এবং পারস্পরিক ঈর্ষাপরায়ণতার বেদিমূলে নিপীড়িত জনসাধারণের জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেয়া হয়। ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করে বলা যায় যে, তুরস্কের অখণ্ডত্ব রক্ষা করতে ব্রিটিশ কূটনীতিবিদগণ অসমর্থ হন; কারণ, বার্লিন চুক্তি তুরস্কের পতনকে এবং রাশিয়ার আক্রমণাত্মক নীতিকে ব্যাহত করতে পারেনি। Pan-Hellenic আন্দোলন নিষ্ফল হলেও গ্রিক স্বাধীনতা বাস্তবরূপ লাভ করে। Pan-Slavism বলকান উপদ্বীপের সমস্যাবলী সমাধান করতে না পারলেও এটি জাতীযতাবাদী আদর্শে উপদ্বীপবাসীদের উদ্বুদ্ধ করে। গ্রিস অথবা তুরস্ক সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রুমানিয়া এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সার্বিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ফার্ডিন্যান্ডকে বুলগেরিয়ার জার বলে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস মন্টিনিগ্রোর নৃপতির মর্যাদা লাভ করলেন।

www.pathagar.com

থমসনের মতে, "বার্লিন কংগ্রেসে গৃহীত ব্যবস্থার অসাধারণ ফলাফল এই ছিল যে, এটি প্রত্যেক শক্তিকে অসন্তুষ্ট এবং পূর্বাপেক্ষা উদ্বিগ্ন করে তোলে।" বিসমার্কের নিরপেক্ষ 'দালালিতে' রাশিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ফলে, প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের দাবি প্রকট হয়ে ওঠে। রাশিয়ার প্রুশিয়াবিরোধী প্রচারণার ফলে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মৈত্রী স্থাপন করেন। নিকট প্রাচ্যের রাজনীতিতে জার্মানীর আবির্ভাবের ফলে ইউরোপীয় শক্তিজোটের (Power grouping) রদবদল হল। সেটন ওয়াটসন বলেন, "১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের প্রকৃত গুরুত্ব ছিল বিসমার্কের আনড্রেসিকে সহকর্মী এবং ডিজরেলিকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ না করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে নিজ আয়ত্তাধীনে এনে সেখানে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।" ঐতিহাসিকদের মতে বার্লিন কংগ্রেসে ডিজরেলির অনুসৃত নীতির ফলে ১৯১২-১৩ খ্রিস্টাব্দে বলকান যুদ্ধ এবং প্রথম মহাসমর সংঘটিত হয়। মেসিডোনিয়ার সমস্যাকে উপলক্ষ করে বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হলে ইউরোপীয় বৃহৎশক্তি দুটি প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বিসমার্ক অস্ট্রিয়া-প্রুশিয়া মৈত্রীস্থাপন করার জন্য 'দ্বিশক্তি চুক্তি' (Dual Alliance) সম্পাদন করেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ইতালী এই মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে এটি 'ত্রিশক্তি চুক্তি' (Triple Alliance) নামে পরিচিত হল। অপরদিকে, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে 'ত্রি-শক্তি চুক্তির' বিরোধী 'ত্রিশক্তি ঐক্যসূত্র' (Triple Entente) গঠন করে। এর ফলে বার্লিন চুক্তির নিষ্ফলতায় বলকান যুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

তানজিমাত আন্দোলন

প্রথম আব্দুল মজিদ (১৮৩৯-৬১)

আন্দোলনের পূর্বাবস্থা ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্কের তানজিমাত অর্থাৎ সংস্কার আন্দোলন শুরু হবার পশ্চাতে বিশেষ কতকগুলো কারণ ছিল। বলা বাহুল্য যে, অটমান তুরস্কের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক অবস্থা সাম্রাজ্যের পতনকে যখন ত্বরান্বিত করার উপক্রম করে, তখন তানজিমাত আন্দোলন সাময়িকভাবে এই পতনকে রোধ করবার প্রয়াস পায়।

১. তুরস্ক একটি Polyglot nation ঃ হিট্টি বলেন, "অটমান সাম্রাজ্য রোমান এবং আব্বাসীয়দের মত বৈশিষ্ট্য ও সংগঠনের দিক হতে মূলতঃ সামরিক এবং বংশভিত্তিক ছিল।" খলিফা-সুলতানগণ প্রজাদের মঙ্গর অপেক্ষা রাষ্ট্রের তথা নিজেদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি অধিক নজর দিতেন। অটমান সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতি, ধর্মাবলম্বী, বর্ণ, গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। এই কারণে একে Polyglot nation বলা হয়। সোলায়মানের রাজত্বকালে পশ্চিমে তিউনিসিয়া হতে পূর্বে পারস্য, উত্তরে হাঙ্গেরী ও ক্রিমিয়া হতে দক্ষিণে হেজাজ ও ইয়েমেন পর্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

২. তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ঃ এই বিস্তীর্ণ তুর্কী অঞ্চলে সিরীয়, আরব, গ্রীক, আলবেনীয়, মিসরীয়, বার্বার, কুর্দ, আর্মেনীয়, শ্লাভ, ইরাকীরা বসবাস করত। এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, মূল্যবোধ সমস্ত কিছুই ছিল পৃথক। প্রকৃতপক্ষে তুর্কীগণ অটমান সাম্রাজ্যে ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসকবর্গ মাত্র। এমনকি আন্তঃসম্প্রদায় বিবাহের ফলে তুর্কীদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের জাতির সংমিশ্রণ ঘটে। এ ছাড়া বহু খ্রিস্টানকে ধর্মান্তরিক করে সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেমন জেনিসারী। এর ফলে প্রজাদের মধ্যে উৎপীড়ন শুরু হয় এবং তুর্কী সুলতান ও গভর্নরদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ দানা বাঁধতে থাকে।

৩. সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা হ্রাস ঃ অটমান সাম্রাজ্যের অধঃপতনের মূলে ছিল সামরিক বাহিনীর অযোগ্যতা ও অদক্ষতা। সামরিক ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গঠিত ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ ব্যাপৃত তুর্কী সাম্রাজ্য বেশিদিন টিকতে পারেনি। সামরিক বিপর্যয়ে তুর্কীগণ ক্রমশ শক্তিহীন হতে থাকে। এর প্রধান কারণ ছিল সামরিক বাহিনীর অব্যবস্থা।

৪. ঘৃণিত কুচুক কাইনারজীর সন্ধির কুফল ঃ কনস্টান্টিনোপলের পতনের অন্যতম প্রধান ফলাফল ছিল পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত। এ ছাড়া ভৌগোলিক আবিষ্কার ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ফলে ইউরোপে স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধিত

www.pathagar.com

হয়। কিন্তু তুরস্ক আধুনিক যুগে অবস্থান করেও মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন ছিল। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার জারিনা ক্যাথারিনের নিকট তুরস্কের পরাজয় এবং ঘৃণিত কুচুক-কাইনারজীর সন্ধির ফলে তুর্কী জাতি অপমাণিত বোধ করে এবং সেই সময় হতে সেনাবাহিনী ও সরকারের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনে তুরস্ক সচেতন হয়ে ওঠে।

৫. ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ঃ ইউরোপীয় শক্তিবর্গের আগ্রাসন নীতি ও 'প্রভাব বলয়' (spheres of influence) দখলের প্রবণতার ফলে তুরস্কের সার্বভৌম ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারে প্রয়াস পায়। মিলার যথার্থ বলেন, "ইউরোপ হতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্রমশঃ বিলুপ্তির ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা পূর্ণ করবার সমস্যাকেই প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা বলা হয়।" এ সমস্ত কারণে পাশ্চাত্যের ভাবধারার প্রভাবে তুরস্কে একটি সংস্কারমূলক অর্থাৎ তানজিমাত আন্দোলনের সূচনা হয়।

সংস্কার আন্দোলনের সূচনা ঃ তুরস্কে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন প্রথম আবদুল হামিদ। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক রাশিয়ার সঙ্গে ঘৃণ্য কুচুক-কাইনারজীর সন্ধি স্বাক্ষরিত করে এবং এই বছরে সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথম আবদুল হামিদ অভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর সংস্কারের জন্য ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করেন। আবদুল হামিদের সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী তৃতীয় সেলিম ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি পিতার নীতি অনুসরণ করে প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। প্রাইস বলেন, "তুর্কী ইতিহাসে তিনি প্রথম নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের নীতি ঘোষণা করেন।" সেলিম ফরাসী বিপ্লবের শুরুতে রাজত্ব আরম্ভ করেন এবং এটা খুব স্বাভাবিক যে, তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব-বোধে অনুপ্রাণিত হন। নেপোলিয়নের সাময়িক মিসর দখলের ফলে অটমান সাম্রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে ফরাসী গণতন্ত্রের আদর্শ অনুপ্রবেশ করে। বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সেলিম অটমান প্রশাসনের দুর্নীতি ও কলুষতাকে নির্মূল করার প্রয়াস পান। সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করা হয়। গণতন্ত্রের মুলমন্ত্র প্রজাদের মধ্যে সঞ্চালিত হতে থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সুলতান সেলিমকে উলেমা সম্প্রদায় 'কাফের' বলে অভিসম্পাত দেয় এবং জেনিসারী ও উলেমা শ্রেণীর বিরোধিতায় সেলিমের সংস্কার আন্দোলন ব্যাহত হয়। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে তাকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করা হলেও তার আমলে সংস্কার আন্দোলনের যে সূচনা হয় তা অব্যাহত থাকে। এভারসলে বলেন, "সংস্কারের শত্রুবর্গ তাকে হত্যা করলেও তিনি যে আদর্শের প্রবর্তন করেন, তা ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি।" তৃতীয় সেলিমের মৃত্যুর পর চতুর্থ মোস্তফা সিংহাসনে বসেন কিন্তু তাকে পদচ্যুত করে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় মাহমুদকে সিংহাসনে বসান হয়। মাহমুদের রাজত্বকালে তুরস্কে সংস্কার আন্দোলন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। তিনি প্রকৃতপক্ষে সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন। তার ফরাসী মাতার প্রভাবে তিনি ফরাসী গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। রাজনৈতিক অনাচার, বর্বরতা ও সুলতানের উত্থান ও

www.pathagar.com

পতনের জন্য দায়ী স্বেচ্ছাচারী ও ক্ষমতালিপ্সু জেনিসারী বাহিনীকে তিনি সমূলে উৎখাত করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, তার সংস্কার আন্দোলনে প্রধান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে জেনেসারী বাহিনী। গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮২১) এবং সার্বিয়ার বিদ্রোহ দেখা দিলে তার সংস্কার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়; কারণ তুরস্ককে এই বিদ্রোহ দমন ও গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত থাকতে হয়। এতদসত্ত্বেও মাহমুদ আগা ও পাশাদের স্বৈরাচার বন্ধ করবার প্রয়াস পান এবং খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি উদারনীতি পোষণ করেন; এমন কি কনস্টান্টিনোপলে একজন গ্রীক ধর্মযাজককে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। অহেতুক জিজিয়া কর বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করা হয়। মাহমুদ সংবিধানের সংস্কার না করেও যে তানজিমাত আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও প্রজাদের অসন্তোষ দূরীকরণ দ্বারা দ্বিতীয় মাহমুদ প্রকৃতপক্ষে আবদুল হামিদের তানজিমাত যুগের সূচনা করেন।

তানজিমাতের সংজ্ঞা ঃ ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান প্রথম আবদুল মজিদ তুরস্কে যে সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন মূলতঃ তাকেই তানজিমাত (Tanzimat) বলা হয়। তানজিমাত এর অর্থ সংস্কার (Reform), পুনর্গঠন (Reorganization) এবং নীতিমালা (Regulation)। মধ্যযুগীয় আর্ত সমাজ ব্যবস্থা থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে তানজিমাত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বার্নাড লুইস বলেন যে, রশীদ পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে মহান সংস্কারের নীতিমালা (edict) প্রবর্তিত হয় তাকে তানজিমাত বলা হয়।

প্রথম আবদুল মজিদ (১৮৩৯-৬১) ঃ দ্বিতীয় মাহমুদের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র প্রথম আবদুল মজিদ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। নতুন সুলতান মাত্র ষোল বছর বয়স্ক হলেও বয়সের তুলনায় তার আগ্রহ, ধীশক্তি ও চিন্তাশীলতা অধিক ছিল। তিনি পিতার বিশ্বস্ত বন্ধুর পরামর্শদাতা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও তুর্কী রাষ্ট্রদূতের পদমর্যাদা সম্পন্ন রশীদ পাশাকে প্রধান উজীরের পদে নিয়োগ করেন। পিতার মতাদর্শে অনুপ্রাণিত আবদুল মজিদ তার সংস্কার আন্দোলনকে কার্যকরী ও সুদূরপ্রসারী করার জন্য প্রগতিবাদী ও সংস্কৃতিমনা কতিপয় মন্ত্রী ও সভাসদদের সাহায্য লাভ করেন। এই উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আলী পাশা, ফুয়াদ পাশা ও রশীদ পাশা। বার্নার্ড লুইস যথার্থই বলেন যে, সংস্কৃতিবাদী আবদুল মজিদ তার মাতা ওয়ালিদা সুলতান বেগম-ই-আলম কর্তৃক অনুপ্রাণিত হন। এই বিদূষী মহিলা তরুণ সুলতান এবং সমগ্র সাম্রাজ্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেন তার বিচক্ষণতার দ্বারা। আবদুল মজিদের রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল 'হাত্তি-ই-শরিফ গুলহান' বা সংস্কারমূলক নীতিমালার প্রবর্তন। ১৯৩৯ সালের ৩রা নভেম্বর এই রাজকীয় অনুশাসন (Noble rescript of the Rose Chamber) জারি করা হয়। সিংহাসনারোহণের মাত্র চার মাস পরে রশীদ পাশার পরামর্শে সুলতান প্রাসাদের গোলাব কক্ষে বা গুলহানে মহাড়ম্বরে এক বিরাট দরবার অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও বৈদেশিক দূতদের দাওয়াত দেন। সেখানে সুলতান শায়খুল ইসলাম ও মুফতীদের অনুমোদন গ্রহণ করে

www.pathagar.com

যে ফরমান জারি করেন তাই তুরস্কের ইতিহাসে 'খাত্ত-ই-শরীফ' বা পবিত্র রাজাজ্ঞা নামে পরিচিতি। সাধারণভাবে এই ডিক্রিই 'তানজিমাত' নামে অধিক সমাদৃত। আবদুল মজিদের সংস্কার আন্দোলন বা 'তানজিমাতের' মূলে তিনটি রাজকীয় ফরমান বিশেষভাবে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

১. 'খাত্তি-ই-শরিফ-গুলহান', ১৮৩৯

২. 'খাত্তি হুমায়ূন' (Imperial Rescript), ১৮৪০

৩. 'খাত্তি হুমায়ূন' ১৮৫৬

তানজিমাতের বৈশিষ্ট্য ঃ তুরস্কের স্বরতন্ত্র, স্বৈচ্ছাতন্ত্র ও একনায়কত্বের স্থলে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্য যে আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শুরু হয় প্রকৃতপক্ষে তাকেই তানজিমাত বলা হয়। এর মূলমন্ত্র ঘোষিত হয় রাজকীয় ফরমানসমূহে (১৮৩৯-৫৬)। সংস্কারবাদী অর্থাৎ তানজিমাতীগণ এই ফরমানের মাধ্যমে তুরস্কে নিম্নবর্ণিত সংস্কারসমূহ প্রবর্তন করার প্রয়াসী হয়।

১. জান-মালের নিরাপত্তা ঃ 'তানজিমাতে'র অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যে বসবাসকারী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান। এ প্রসঙ্গে বার্নাড লুইস বলেন, "The security of life, honour and property of the subject" অর্থাৎ সকল বসবাসকারীর জীবনের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সম্পদের সংরক্ষণ রাজকীয় ফরমানে উল্লেখ ছিল।

২. সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা ঃ 'তানজিমাতে'র দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে ঐক্য, সাম্য, মৈত্রী ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রজাদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় নিশ্চয়তা দান। এভারসলের মতে, "এই ফরমান ধর্ম ও বর্ণের উপর ভিত্তি করে সুলতানের প্রজাদের মধ্যে যে বৈষম্য এবং বিচ্ছিন্নতা বিরাজমান ছিল তা দূরীকরণ।" বার্নার্ড লুইস বলেন, "equality of all persons of all religions in the application of these laws" অর্থাৎ 'খাত্তি শরিফ' ও 'হুমায়ূনের' প্রয়োগে সকল ধর্মাবলম্বীর লোকদের সমান অধিকার লাভ।"

৩. ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ এই ফরমান খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দানের নিশ্চয়তা দেয় এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ইতিপূর্বে খ্রিস্টান সম্প্রদায় 'দার-উল-হরব'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং দার-উল-ইসলামের সাথে প্রচণ্ড বিভেদ ছিল। কিন্তু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ গ্রীক ধর্মযাজকের ইস্তাম্বুলে গীর্জা নির্মাণ এবং উপাসনার সুযোগ লাভ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বার্নাড লুইসের মতে, "The laws and traditions of Islam, the policy and practice of the Ottoman Empire agreed in prescribing tolerance and protection for the non-Muslim subjects of the state and in granting them a large measure of autonomy in their internal communal affair."

৪. আইনের সংস্কার ঃ সুলতান আবদুল মজিদ সকল প্রথাকে আইনের দৃষ্টিতে সমানভাবে দেখার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের রাজকীয় ফরমনে

www.pathagar.com

সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থায় যে উল্লেখ ছিল তা ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের "খাত্তি হুমায়ূনের" ফরমানে সুদূরপ্রসারী হয়। সুবিচার ও নিরপেক্ষ বিচার (fair and public trial of persons accused of crimes) মুসলমানদের আইন প্রণয়নের যে একচেটিয়া অধিকার ছিল ফরমানের মাধ্যমে তা তিরোহিত হয় এবং আবদুল মজিদ বিচার বিভাগের সংস্কারের জন্য যে কাউন্সিল স্থাপন করেন তা 'মজলিস-ই-আহকাম-ই-আদলিয়া' (council of judicial ordinances) নামে পরিচিত ছিল। এই কাউন্সিল সুলতানের অনুমোদন সাপেক্ষে আইন প্রণয়ন করতে পারত।

৫. যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ ঃ সুলতান আব্দুল মজিদ প্রজাদের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য এই মর্মে নির্দেশ দেন যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষার ভিত্তিতে সরকারি চাকুরি দেওয়া হবে না, কেবলমাত্র যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সরকারি পদে নিযুক্ত করা হবে। অমুসলমান সম্প্রদায়ের অসন্তোষ দূরীকরণে এরূপ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ পূর্বে গ্রহণ করা হয়নি।

৬. বিচার বিভাগের সংস্কার ঃ 'তানজিমাত' আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিচার বিভাগের সংস্কার। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে বিনা বিচারে কোন ব্যক্তিকে আটক বা অন্তরীণ করা যাবে না। নির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতিত কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা বিনা বিচারে দণ্ডাদেশ দেওয়া যাবে না। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অমুসলিম সম্প্রদায়কে নির্যাতন থেকে রক্ষা করা এবং এর মূল ভিত্তি ছিল আইনের দৃষ্টিতে তুর্কী সাম্রাজ্যের সকল প্রজার সম-অধিকার (equality of all Ottoman subjcets before the law)। এই আইন কার্যকরী করার জন্য বিধিবদ্ধ আইন (legal code) প্রণীত হয় এবং এই আইনে ১৪টি অনুচ্ছেদ ছিল।

৭. খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা ঃ 'তানজিমাত' আন্দোলন তুর্কী সাম্রাজ্যের সকল স্তরের জনগণকে প্রভাবান্বিত করে। বিশেষ করে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকে এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী ধর্মযাজকগণ সরকারের তহবিল থেকে নির্দিষ্ট হারে বেতন পেতেন।

৮. খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা ঃ সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ এবং তার সুযোগ্য পুত্র আবদুল মজিদ 'নিয়াম-ই-জাদিদ' এবং তানজিমাতের প্রবর্তন দ্বারা সামাজিক বিভেদ, বৈষম্য ও অনাচার দূরীকরণের প্রয়াস পান। বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্যে বসবাসকারী খ্রিস্টান সম্প্রদায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা লাভ করলেও শরিয়তের বিপরীতে 'কানুন' প্রবর্তিত করে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। খ্রিস্টান সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে তাদের ঘর-বাড়ি, গীর্জা, হাসপাতাল, স্কুল ও সমাধিস্থল নির্মাণ ও সংস্কার করার অধিকার লাভ করে।

৯. রাষ্ট্রীয় ব্যাংক স্থাপন ঃ ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের রাজকীয় ফরমানে উল্লেখ ছিল যে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে। বলা হয় যে, "সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য টাকার মূল্য স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহ ও লগ্নি বিশেষ প্রয়োজন।" এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্রথমত,

www.pathagar.com

একটি কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সংস্থা বা খাজনা (Treasury) এবং দ্বিতীয়ত, সুষ্ঠু মুদ্রাব্যবস্থা প্রয়োজন। সুলতান আবদুল মজিদ ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয় ব্যাংকের অনুকরণে সর্বপ্রথম একটি তুর্কী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। সরকার এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় পনেরো বছর যাবৎ প্রতি বছর ৩০ মিলিয়ন পিয়াস্তা প্রদানের অঙ্গীকার করে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার স্থলে কাগজের নোট চালু করা হয়। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রাচীন মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তে ইউরোপীয় মুদ্রামানের সঙ্গে সমতা রক্ষার জন্য নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

১০. প্রশাসনিক সংস্কার ঃ 'তানজিমাত আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রশাসনিক সংস্কার। মন্ত্রীবর্গ, উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠিত হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে 'খাত্তি হুমায়ূনের' ফরমান অনুযায়ী রশীদ পাশা ফরাসী প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাস করেন। বিভিন্ন দফতর সৃষ্টি করে বেতনভুক রাজকর্মচারী নিযুক্ত করা হয় এবং সুলতানের একচ্ছত্র ও স্বৈরাচারী ক্ষমতা হ্রাস পেলে প্রশাসনিক কাউন্সিল প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে থাকে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন অসংলগ্ন পাশাদের পরিচালিত শাসনব্যবস্থা ও কর আদায় ব্যবস্থার বিলোপ সাধন (to replace the loose-knit quasi-feudal association of Pashas and tax farmers of earlier times)। গভর্নরদের (পাশা-আগা) স্বৈরাচারী শাসন থেকে প্রজাদের রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে সুদৃঢ় করা হয়।

১১. বাণিজ্যিক কোড ঃ সুলতান আবদুল মজিদের সংস্কার বহুমুখী ছিল। তিনি ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের জন্য রশীদ পাশাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং বাণিজ্যিক কোড (Commercial code) জারি করা হয়। ফিলিপ প্রাইস বলেন, "The Tanzimat reforms laid down a commercial code and a new criminal law was drawn up, based in the code of Napoleon". উল্লেখ্য যে, শারিয়া আদালতের পাশাপাশি সর্বপ্রথম ইউরোপীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুলতান বাণিজ্যিক কোড জারি করেন। তুর্কী সংস্কার আন্দোলনে এভাবে ফরাসী প্রভাব প্রতিফলিত হয়। ইতিপূর্বে শরিয়তের বাইরেও সামাজিক সংস্কারের বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে, শিক্ষা, প্রশাসনিক, বিচার ক্ষেত্রে, কিন্তু এই বাণিজ্যিক কোড এক নতুন গিন্তের সূচনা করে। বার্নাড লুইসের ভাষায়, "It was, however a radical departure from previous Ottoman practice and the harbinger of a complete legal and social revolution". বাণিজ্যিক কোডের পাশাপাশি সামুদ্রিক কোডও (maritime code) প্রবর্তিত হয়।

১২. দণ্ডবিধি আইন ঃ আব্দুল মজিদ বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক কোড ব্যতীত বিচার বিভাগের পুনর্বিন্যাসের জন্য দণ্ডবিধি আইন জারি করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এবং ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বারের মত দণ্ডবিধি আইন প্রবর্তিত হয়। প্রশাসন থেকে বিচার ব্যবস্থাকে পৃথক ও স্বাধীন করে আইনের প্রতি (Rule of law) শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত এবং আধুনিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এই দণ্ডবিধি (Penal code)

www.pathagar.com

বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল। প্রয়োজনে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের দ্বারা গঠিত ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। সাক্ষীগণ তাদের স্ব স্ব ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ করতে পারত। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন প্রণীত হলে প্রাচীন তুর্কী (ওসমানলী) স্বৈরতন্ত্র হ্রাস পায়।

১৩. কর-ব্যবস্থার বিন্যাস ঃ ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভূমি সংস্কার আইন জারি হয় এবং সামন্ত প্রথা বিলুপ্ত করে কর আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় মাহমুদ পূর্বেই 'তিমার' বা 'সামরিক ভূস্বত্ব' (military fief) ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন এবং এর স্থলে ভূমি জরিপ ও বন্টন করে কর আদায়ের ব্যবস্থা চালু করা হয়। জায়গীরদার প্রথা বিলুপ্ত করে নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করা হত। জায়গীরদার প্রথা বিলোপ করে নির্দিষ্ট হারে কর আদায়ের প্রবর্তন নিঃসন্দেহে রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত করে। বার্নাড লুইসের ভাষায়, "Lease holders and tax-farmers acquired freehold ownership, with full rights of disposal and succession, confirmed by the possession of documents issued by the Survey Department."

১৪. শিক্ষা সংস্কার ঃ ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত 'খাত্তি হুমায়ূন' অনুযায়ী সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন। এই কমিটিতে আলী এফেন্দী এবং ফুয়াদ এফেন্দী সদস্য ছিলেন। এই কমিটির রিপোর্ট অনুসারি তুর্কী সাম্রাজ্যে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং জনশিক্ষা কাউন্সিল গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয় এবং সে জন্যে কার্যকরি ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে জনশিক্ষা দফতর প্রতিষ্ঠিত হয়, যা মাধ্যমিক স্কুল বা রুশদিয়া (Rusdiya) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার বিন্যাসের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ করে শিক্ষার আলো দানের জন্যই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল বিন্যাস করা হয়।

১৫. জেল সংস্কার ঃ আবদুল মজিদ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুলতান ছিলেন এবং তিনি জেল সংস্কার এবং দাসত্ব প্রথা বিলোপ করেন। অপরাধপ্রবণতা রোধ করার ব্যবস্থা করা হয়।

১৬. স্বায়ত্বশাসন ঃ পাশ্চাত্যের অনুকরণে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনের বন্দোবস্ত ফরমানে (খাত্তি হুমায়ূন) ছিল। কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল করে স্থানীয় সরকার গঠন প্রশাসনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে।

ফলাফল

প্রথমত, প্রাইসের মতে, "এই ফরমানগুলি তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রগতির বাধাস্বরূপ মুসলিম শরীয়তের প্রচণ্ড চাপ আস্তে আস্তে লাঘব করে।" উল্লেখ্য যে, শরিয়তে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয়নি এবং শরিয়ত আদালত নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম নির্বাহ করত কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় ভাবধারার উপর ভিত্তি করে ফৌজদারী এবং বাণিজ্যিক আইন প্রবর্তিত হয়। তানজিমাত আন্দোলনের প্রধান ফলাফল ছিল মনস্তাত্ত্বিক। এই আন্দোলন প্রথমত বৈদেশিক প্রভাবের কার্যকারিতাকে প্রাধান্য দেয়;

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতা দূর হয়। প্রাইস বলেন, "After the promulgation of the Tanzimat reforms, the idea began to be accepted by the Moslems of Turkey that Christians and Jews had equal rights with them."

প্রাইস বলেন, তানজিমাত সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক ঃ তুরস্কের সুলতানদের স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারের স্থলে একটি উদার প্রজামঙ্গলকর এবং সংস্কার প্রবণ সরকার গঠনে শুধু তুর্কী জাতিই নয়, অমুসলমানদের মধ্যেও স্বস্তি ফিরে আসে।

তৃতীয়ত, 'তানজিমাত' উদার নীতির দ্বারা উৎঘাটন করে এবং পরবর্তীকালে বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কতিপয় নব্য-তুর্কী বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নব্য-তুর্কী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলন সুলতানের প্রাসাদ থেকে জারিকৃত ফরমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। প্রত্যক্ষভাবে তুর্কী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সংস্কার আন্দোলনে সামিল হয়। এতদসত্ত্বেও বলা যায় যে, আবদুল মজিদ কর্তৃক ঘোষিত 'খাত্তি শরিফ' এবং 'খাত্তি হুমায়ূন'কে তুরস্কের ইতিহাসে 'ম্যাগনা কার্টা' (Magna Carta) বলে অভিহিত করা যায়। এই সংস্কার আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনকে রোধ করে। যদি এই আন্দোলন কার্যকরি হত তাহলে তুরস্কের প্রগতি ও উন্নতি শীর্ষে পৌছত।

ব্যর্থতা

মহৎ উদ্দেশ্য ও মহৎ আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য সুলতান আবদুল মজিদ দুটি ফরমান জারি করে 'তানজিমাত' আন্দোলনের সূচনা করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে 'তানজিমাত' আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

প্রথমত, কতিপয় শর্ত এবং আদর্শ বাস্তবায়ন করা হলেও বেশির ভাগ সংস্কার প্রকল্প কার্যকর করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, মাহমুদের মত আবদুল মজিদ অবিচল সংকল্প এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন না; এর ফলে 'তানজিমাত' আন্দোলনকে সুদূরপ্রসারী করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। প্রতীচ্যের ঐতিহাসিকগণ এই কারণে বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্য করেন যে, 'তানজিমাত' এবং 'খাত্তি হুমায়ূন' window dressing' ব্যতীত কিছুই ছিল না।

তৃতীয়ত, সংস্কার মুসলমান এবং অমুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। গোঁড়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ খ্রিস্টানদের প্রতি এহেন মহানুভবতা ও সহিষ্ণুতায় সুলতানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। বস্তুতপক্ষে 'দার-উল-ইসলাম' এবং গোঁড়াপন্থী মুসলমানগণ ঘোর বিরোধিতা করে। তারা খ্রিস্টান প্রজাদের রাজনৈতিক এবং আইনানুগ অধিকার দানেরও বিরুদ্ধাচরণ করে। উপরন্তু, সংস্কারের ফলে শরীয়ত-এর খেলাফ হবার সম্ভাবনায় তারা সর্বদা শঙ্কিত ছিল।

চতুর্থত, মাহমুদ এবং আবদুল মজিদ (ফরাসী মাতার গর্ভজাত সন্তান) পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু মোল্লাগণ তুর্কী সাম্রাজ্যে অনৈসলামিক প্রভাব প্রবর্তনকে 'বিদআত' মনে করতেন। এই কারণে ধর্মীয় গোষ্ঠী 'তানজিমাতে'র বিরোধিতা করে।

www.pathagar.com

পঞ্চমত, সংস্কার আন্দোলন অমুসলমান সম্প্রদায়কে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও দায়িত্বের অধিকার দান করলেও বাস্তবে এটা সম্ভবপর হয়নি। এ কারণে মুসলমানগণ বা শাসকগোষ্ঠী খ্রিস্টানদের অর্থাৎ শাসিতদের সঙ্গে সমান অধিকার লাভে আগ্রহী ছিল না। উপরন্তু, খ্রিস্টানদের মধ্যে তুরস্কের মুসলমানদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার কোন প্রয়াস দেখা যায় নি। তারা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। খ্রিস্টান প্রজাগণ নাগরিক অধিকার লাভে সন্তুষ্ট ছিল না। বস্তুত, ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সহায়তা ও অনুপ্রেরণায় তারা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করে, যেমন–গ্রীক স্বাধীনতা আন্দোলন। এই কারণে প্রাইস বলেন, "তাদের অনেকের নিকট (খ্রিস্টান সম্প্রদায়) সংস্কারসমূহ অটমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার প্রতীক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে, যার ফলে এর পতন এবং বিভিন্ন স্বাধীন খ্রিস্টান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।"

ষষ্ঠত, 'তানজিমাত' আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ খ্রিস্টান অধ্যুষিত তুরস্ক সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদী মতবাদের প্রসারতা। এই প্রসঙ্গে খালিদা এদিব বলেন, "ফরাসী বিপ্লব রাষ্ট্রীয়-জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র প্রচার করে।" 'তানজিমাতগণ' গণতন্ত্র বিস্তারের প্রয়াস পান। মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রতিধ্বনি তাদের মধ্যে অনুরণিত হতে থাকে। অটমান সাম্রাজ্যের খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী মতবাদ গ্রহণ করে। 'তানজিমাত'গণ কখনোও উপলব্ধি করেনি অথবা স্বীকার করেনি যে এই ধরনের উগ্র এবং বিচ্ছিন্নতামূলক মতবাদ সত্য হতে পারে এবং এর কুশাসনের প্রতিকৃতি হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সংস্কারের মাধ্যমে জনদরদী সরকার এবং গণতান্ত্রিক নীতি প্রবর্তন ও প্রচারের ফলে সাম্রাজ্যের অমুসলমান প্রজাদের মধ্য হতে জাতীয়তাবাদী মনোভাব দুলীভূত হবে।

সপ্তমত, তুরস্কের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের অহেতুক ও অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ, রাশিয়ার আগ্রাসন নীতি ও গ্রীক-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর তার প্রভাব সুলতান ও সভাসদবর্গকে সর্বদা বিচলিত করত। এই কারণে এভারসলে ১৮৩৯ হতে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কী ইতিহাসের সময়কালকে 'এলচিসদের (রাষ্ট্রদূতবর্গ) রাজত্ব' বলে অভিহিত করেন। এই সময়েই প্রাচ্যদেশীয় সমস্যার উদ্ভব হয় এবং এতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে তুরস্কের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংঘর্ষ বাঁধে। তুরস্কের প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে কূটনৈতিক এবং পরে সাক্ষাৎ সমর বাঁধে। উপরন্তু, তুর্কী সরকারের সঙ্গে খ্রিস্টান প্রজাগণ সহযোগিতা না করে খ্রিস্টান ব্যক্তিবর্গ বিশেষভাবে রাশিয়ার উস্কানিতে বিদ্রোহ ঘোষনাই করেনি বরং তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সকল প্রকার উত্তেজনামূলক কার্যকলাপে ব্যস্ত ছিল। যখন তুর্কীগণ 'তানজিমাতে' ক্রস এবং ক্রিসেন্টের মধ্যে একটি সম্মিলিত জাতি সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর তখন খ্রিস্টানগণ একে তুর্কী নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার উপায় হিসেবে গণ্য করে।

সবদিক দিয়ে বিচার করে প্রাইস মন্তব্য করেন যে, "The Tanzimat was still born, it stopped at the doorsteps of the Sublime Porte. প্রফেসর' 'শ দম্পতির (এস. জি কা এবং ই. কে. শ) ভাষায়, "অটমান সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

সংস্কার কাজ ছিল এক জটিল প্রক্রিয়া। প্রতিটি সমাধান সৃষ্টি করেছিল নতুন নতুন সমস্রা। কতিপয় কারণের জন্য শ্লথ হয়ে আসছিল নতুন আইন ও তার ব্যবহারের প্রয়োগ।" তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে ঃ

প্রথমত, সাম্রাজ্যটি ছিল বিশালকায়, তাতে ছিল বিভিন্নমুখী সমাজ এবং তুলনামূলকভাবে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়ত, সংস্কারপন্থিগণের অনভিজ্ঞতা এর তুলনামূলকভাবে অনুন্নত সাম্রাজ্যের ও তার লোকজনদের স্বার্থের মূলে ছিল স্বার্থের অনুকূলে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের লোভ, যা অতীত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একটানা অর্থনৈতিক সমস্যাকে স্থায়ী ও গভীর করে তুলেছিল।

তৃতীয়ত, তানজিমাতে উদ্ভূত পরিণতিতে উদ্বুদ্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবী এবং যে কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অন্তর্নিহিত, অবিলম্বিত ও আপসকামিতা ছাড়াই যথাসম্ভব দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে আধুনিকীকরণের জন্য নৈতৃবর্গের বাসনার মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধেছিল।

চতুর্থত, রাশিয়াও কিছুটা কম পরিমাণ হলেও অন্যান্য পশ্চিমা শক্তিগুলো দ্বারা চালিত ও প্ররোচিত তুর্কী সংখ্যালঘিষ্ঠদের মধ্যকার জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলি সাম্রাজ্য থেকে স্বশাসন অথবা স্বাধীনতার দাবী তুলেছিল এবং অটমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ও ইউরোপ আমেরিকায় মুসলিম বিরোধী প্ররোচনার নাটক করে যাচ্ছিল।

বৃহৎ শক্তিসমূহ ইউরোপীয় শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার মানসে অটমান সাম্রাজ্যকে ভেঙে দিয়ে কিংবা বিভক্ত করা থেকে বিরত থাকলেও নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে তুর্কী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে আসছিল। অটমান সাম্রাজ্যবাদীরা যদিও এসব এবং অন্যান্য চ্যালেঞ্জের যথাসম্ভব মোকাবেলায় নিজেদের কার্যক্রমকে পুনর্বিন্যস্ত করে আসছিল তবু শত্রু প্রদত্ত তুলনামূলকভাবে সামান্য সময়ের মধ্যে এসব সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সামর্থের অভাব ছিল তাদের।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

নব্য-তুর্কী আন্দোলন

পটভূমি ঃ 'তানজিমাত আন্দোলনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও এর সংস্কারমূলক ও গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ তুর্কীদের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করে তার ফলেই পরবর্তী পর্যায়ে নব্য-তুর্কী আন্দোলন (Young Turks movement) শুরু হয়। মূলতঃ বার্নাড লুইসের ভাষায়, "The Tanzimat was less a reform than a manoeuvre intended to accomplish a political rather than a legal or social purpose". বস্তুতঃ নব্য-তুর্কী আন্দোলনকারী সেই সব ইউরোপীয় সমালোচকদের সমর্থন করেন যারা তানজিমাতকে পশ্চিমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য একটি window dressing মাত্র, যা রাজদরবারে (Sublime Porte) বাহিরে প্রবেশ করেনি। একথা সত্য যে, তানজিমাতের ব্যর্থতায় রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হয় এবং প্রাচ্যদেশীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে তুরস্ককে ক্রিমিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। এ কারণে প্রাইস বলেন, "তুরস্ক কূটনীতিবিদদের তানজিমাতের সংস্কারসমূহকে কার্যকর করবার পরিবর্তে সাম্রাজ্যে প্রতিরক্ষায় অধিকতর মনোনিবেশ করতে হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তুরস্ক ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের সাহায্য লাভ করে টিকে থাকলেও 'রুগ্নব্যক্তি' রুগ্নই থেকে যায় এবং পক্ষান্তরে বলকান ও খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। অটমান সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও নৈরাজ্য বিরাজ করে। উদারতা ও প্রজামঙ্গলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আবদুল মজিদ 'তানজিমাত' বাস্তবায়ন করতে পারেননি এবং তার প্রবর্তীত দু'টি সংস্কার 'খাত্তি শরীফ' এবং 'খাত্তি হুমায়ূন' জারি করেন, যা নির্লক্ষপত্র বা dead letter-এ পরিণত হয়। এতদসত্ত্বেও 'তানজিমাত' এর মতাদর্শ তুরস্কের বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদারমনা এক শ্রেণীর প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এসব চিন্তানায়কদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নব্য-তুর্কী আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই নির্ভীক, উদারপন্থ ও সংস্কারমনা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মোহাম্মদ বে, নামিক কামাল, নুরু বে এবং মিদহাত পাশা।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আবদুল মজিদ মৃত্যুবরণ করলে তার ভাই আবদুল আজীজ সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর দীর্ঘ পনের বছরের (১৮৬১-৭৬) রাজত্বকালে নব্য-তুর্কী আন্দোলনের সূচনা হয়। বার্নাড লুইসের মতে, আবদুল মজিদের উত্তরাধিকারী আবদুল আজীজ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন "capricious and violent, obstinate and irascible" অর্থাৎ "খামখেয়ালী, চরমপন্থী, একগুঁয়ে এবং বদমেজাজী।' তিনি সংস্কারকদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার প্রয়াস পান। এতদসত্ত্বেও তুরস্কের প্রগতিবাদী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের অবদান অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

সংস্কারকবৃন্দ ঃ তুরস্কের ইতিহাসে প্রগতিবাদী ও সংস্কারপন্থী আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে। তুর্কী ভাষায় 'হুররীয়াত' (Hurriyet) অর্থাৎ স্বাধীনতা এবং এ শব্দটি আরবী 'হুররীয়া' (Hurriyya) থেকে উদ্ভূত। এই শব্দের নিগূঢ় অর্থ হচ্ছে সামাজিক, আইন বিষয়ক স্বাধীনতা এবং দাসত্বের পরিবর্তে নাগরিক স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধা লাভ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তুরস্কের ইতিহাসে হুররীয়াত একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এই সংস্কার আন্দোলনে পাশ্চাত্য প্রভাব অনুপ্রবেশ ঘটে এবং যাদের মাধ্যমে এই সংস্কার আন্দোলন সুদূরপ্রসারী হয় তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নামিক কামাল এবং মিদহাত পাশা।

নামিক কামাল ঃ নামিক কামাল ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা একজন স্বনামধন্য জোর্তিবিদ ছিলেন এবং মাতা আলবেনিয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। নামিক কামাল আরবী, ফার্সী ও ফরাসী ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। অতি অল্প বয়সে তিনি তুর্কী সরকারের দায়িত্বশীল পদে সমাসীন হন। তিনি প্রখ্যাত তুর্কী বুদ্ধিজীবী ইব্রাহিম সিনাসী (Sinasi) দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং সিনাসী কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী 'তাসবীর-ই-ইফকার' (Tasvir-i-Efkar) এর সম্পাদনা শুরু করেন। কিন্তু সরকার বিরোধী প্রবন্ধের জন্য তিনি বিরাগভাজন হন এবং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে আত্মগোপন করেন। ১৮৬৭ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত ভেনিস, প্যারিস ও লণ্ডনে অবস্থান করে সাংবাদিকতা করে তুর্কী সংস্কার আন্দোলনে প্রেরণা দেন। 'ওয়াতান' (Vatan) নামক এক নাটক প্রয়োজনা করলে তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আবদুল আজিজ পদচ্যুত হলে তিনি ইস্তাম্বুল ফিরে আসেন এবং সংবিধান প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করেন। সুলতান আবদুল হামিদের রাজত্বে তাকে বিতাড়িত হতে হয়। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নামিক কামাল সম্বন্ধে বার্নাড লুইস বলেন যে, 'তিনি মূলত' দুটি আদর্শের পুরোধা ছিলেন– স্বাধীনতা এবং পিতৃভূমি (apostle of two ideas—freedom and fatherland)। তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হলেও তুর্কী সংস্কার আন্দোলনে ইসলামী ঐতিহ্য ও প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি তার প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা এবং বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে তার এই দুটি মূল্যবান আদর্শের ব্যাখ্যা তুর্কী মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করেন। জার্মান পিতৃভূমির আদর্শে তিনি তুর্কী পিতৃভূমির মতবাদ তুরস্কবাসীদের প্রেরণা দেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যঘেঁষা ছিলেন না। তিনিই প্রথম মানবাধিকার এবং সংসদীয় সরকারের (human rights and parliamentary government) প্রবক্তা ছিলেন। সংসদীয় সরকারের আদর্শ ১৯০৯ সালে নব্য-তুর্কী আন্দোলনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এই আন্দোলনের সুচনা হয় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে আবদুল আজীজের নৈরাজ্যপূর্ণ রাজত্বকালে যখন কতিপয় তুর্কী যুবক ইস্তাম্বুলে নব্য-তুর্কী সমিতি (Society of New Ottomans) নামে একটি সংঘঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রাণ পুরুষ ছিলেন দেশপ্রেমিক নামিক কামাল। (Prime mover)

www.pathagar.com

মিদহাত পাশা ঃ নব্য-তুর্কী আন্দোলনে মিদহাত পাশার অবদান অনস্বীকার্য। সংস্কার আন্দোলনের (তানজিমাত) ব্যর্থতা তুর্কীদের মনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং সংস্কার আন্দোলনকে সুনিশ্চিত করবার জন্য তুরস্কের কতিপয় বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রেরণা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের পথ সুগম হয়। এই সাংবিধানিক আন্দোলনের পথিকৃত ছিলেন পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মিদহাত পাশা। নামিক কামাল এবং জিয়া পাশার (১৮২৫-৮০) পাশাপাশি মিদহাত পাশার ঐকান্তিক চেষ্টায় এই সংবিধানিক আন্দোলন কার্যকরী হয়। মিদহাত ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হাজী আলী এফেন্দি কসচুকের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বাল্যকালে পিতার কাছে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে কর্ম জীবন শুরু করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাষ্ট্রীয় মহাপরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রধান সচিবের পদমর্যাদায় উন্নীত হন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী (উজীর) রশীদ পাশার মৃত্যু হলে সুলতান আবদুল মজিদ আলী পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। আলী পাশা মিদহাত পাশাকে ইউরোপের বিভিন্ন শহর–প্যারিস, ব্রাসেলস, লন্ডন ও ভিয়েনায় প্রেরণ করে পাশ্চাত্য সরকারের অবকাঠামো ও কার্য পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাকে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয় এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি উপলব্ধি করেন যে, পতনোন্মুখ তুর্কী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে হলে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক মতাদর্শে তুরস্কের রাজনৈতিক ও সংবিধানিক পরিবর্তন আনা বিশেষ প্রয়োজন। মিদহাত পাশা প্রথমে প্রাদেশিক প্রশাসন সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তাকে নব-গঠিত দানিয়ুবের একটি প্রদেশের (Vilayet) শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মাহমুদ নাদিম পাশার স্থলে সুলতান আবদুল আজীজ মিদহাত পাশাকে প্রধানমন্ত্রী (Grand Vizier) নিযুক্ত করেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের আন্দোলন জোরদার করার জন্য তিনি একটি গোপন দল গঠন করেন। এই দলের প্রধান লক্ষ্য ছিল তুরস্কের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং একটি জাতীয় পরিষদ গঠন করা। কিন্তু স্বৈরাচারী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ সুলতান আবদুল আজীজ সংস্কারবিরোধী হয়ে পড়েন এবং সংস্কারপন্থিগণ তাকে তুরস্কের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক মনে করেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে একটি রক্তপাতহীন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মন্ত্রী পরিষদ পরিবর্তিত হল এবং মিদহাত পাশা মুফতি শেখ-উল্-ইসলাম হাসান হাযেরুল্লাহ্ এফেন্দীর নিকট থেকে একটি ফতোয়া লাভ করে ঘোষণা করেন যে, অকর্মণ্য ও অমিতচারী সুলতান আবদুল আজীজকে সিংহাসনচ্যুত করা হউক। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে আবদুল আজীজের স্থলে যুবরাজ পঞ্চম মুরাদকে সিংহাসন বসান হয়। মুরাদের মস্তিষ্কবিকৃত থাকায় তাকে পদচ্যুত করে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয় তার ভাই দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে (১৮৭৬-১৯০৯)। উল্লেখ্য যে, আবদুল হামিদের রাজত্বকালে নব্য-তুর্কী আন্দোলন শুরু হয়।

www.pathagar.com

সংবিধানিক সংস্কার ঃ ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ সুলতান হিসেবে অভিষিক্ত হলে তিনি আলী পাশার অবসরপ্রাপ্তিতে মিদহাত পাশাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। সুলতান নব্য-তুর্কীদের প্রদত্ত সংস্কারসমূহের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার করেন। এ প্রসেঙ্গ উল্লেখযোগ্য যে, মিদহাত পাশা নব্য-তুর্কী আন্দোলনের পথিকৃত ছিলেন। এভারসলে বলেন, "সাংবিধানিক সংস্কার প্রবর্তনে মিদহাত পাশার ঐকান্তিক এবং একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা আধুনিক তুরস্কের রাজনৈতিক বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।" নিঃসন্দেহে তাকে নব্য তুরস্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কারক বলা যেতে পারে। মিদহাত পাশা ও অপরাপর বুদ্ধিজীবীর প্রচেষ্টায় আবদুল হামিদ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে একটি সংবিধান এবং জাতীয় পরিষদ গঠনের ফরমান জারি করতে বাধ্য হন।

তুর্কী সংবিধান ঃ ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর একটি রাজকীয় ফরমান বলে তুরস্কের সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত একটি জাতীয় পরিষদ গঠন এবং এর সংবিধান প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এই ফরমানে ১২৯টি পরিচ্ছেদ (article) ছিল এবং নিম্নবর্ণিত সংস্কার ও বিধান প্রবর্তিত হয় ঃ

তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতান রাজ্যের ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ের প্রধান; তুর্কী জাতীয় ভাষা; ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম; প্রধান উজীর ও মুফতি নিয়োগে সুলতানের ক্ষমতা; অনাস্থা জ্ঞাপনে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ; প্রতিনিধিবর্গের সম্মানার্থে গঠিত পরিষদ (Chamber of Deputies) এবং সিনেট গঠন, গোপন এবং পরোক্ষ ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন; শাসনতন্ত্র অকস্মাৎ বাতিল ঘোষণা করা অযৌক্তিক।

প্রতিক্রিয়া ও সংবিধান বাতিল ঃ এই সংবিধানের আওতা মোতাবেক আবদুল হামিদ একটি পার্লামেন্ট গঠন করেন; কনস্টান্টিনোপলে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের উদ্দেশ্যে তিনি ভাষণ দেন। সন্দেহপ্রবণ আবদুল হামিদের উদারতা ও মহানুভবতা ছিল খুবই সাময়িক, কারণ তিনি গণতন্ত্রকে অরাজকতার মূল উৎস মনে করতেন এবং পাশ্চাত্যকরণকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তিনি খিলাফতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়াস পান এবং সংবিধানের মূল শর্তাবলীতে তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার সূত্র থেকে যায়; যেমন নির্বাচন ছিল পরোক্ষ এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা ছিল সুলতানের। উপরন্তু, প্রাচ্যদেশীয় সমস্যার ফলে বুলগেরিয়ার নৃশংসতাকে কেন্দ্র করে বলকানে খ্রিস্টানদের বিদ্রোহ, রুশ-ব্রিটিশ কূটনৈতিক তুরস্ক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান আবদুল হামিদ সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন ও অনির্দিষ্টকালের জন্য পার্লামেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। মিদহাত পাশার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয় এবং তাকে পদচ্যুত করা হয়। এর ফলে সংবিধান ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মিদহাত পাশাকে নির্বাসিত ও পরবর্তী পর্যায়ে হত্যা করা হয় এবং সুলতান নব্য তুরস্ক আন্দোলনকে সমূলে উৎপাটিত করবার চেষ্টা করেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে যে পার্লামেন্ট আহ্বান করা হয় তা বাতিল ঘোষিত হবার পর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তা আর বসেনি। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে বার্লিন চুক্তি মোতাবেক তুরস্ককে যে অপমান সহ্য করতে হয় তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে আবদুল হামিদ পুনরায় স্বৈরাচারী শাসন

www.pathagar.com

শুরু করেন। অসংখ্য নব্য-তুর্কীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও কারাগারে নিক্ষেপ ও তাদের প্রকাশিত পত্রিকা ও সাময়িকীসমূহ বাতিল ঘোষণা করা হয়। তার দমন ও স্বেচ্ছাচারী নীতিতে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে নব্য তুর্কী সংবিধান ও সংস্কারপন্থীদের দেশ ত্যাগ করে ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদেশে তারা নব্য-তুর্কী আন্দোলনের সমর্থনে জনমত গঠন করে।

কমিটি অব ইউনিয়ন এণ্ড প্রগ্রেস ঃ সুলতান আবদুল হামিদের প্রতিক্রিয়াশীল দমননীতির ফলে যে সকল প্রগতিবাদী নব্য-তুর্কী বুদ্ধিজীবী প্যারিসে আশ্রয় গ্রহণ করেন তারা 'কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস' নামে সেখানে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। 'তানজিমাত' অথবা নব্য-তুর্কী আন্দোলন এরূপে তুর্কী বিপ্লবে রূপান্তরিত হতে থাকে। নব্য-তুর্কী শরণার্থিগণ জেনেভা ও অন্যান্য শহরে অনুরূপ কমিটি গঠন করে গণতন্ত্র সংবিধানের অনুকূলে জনমত গঠন করতে থাকে। নব্য-তুর্কী সম্প্রদায় মেসিডোনিয়ার স্যালোনিকায় একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে। প্রথমে এই কমিটিতে কেবলমাত্র মুসলমানগণ যোগ দিতে পারত, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ এই কমিটির সদস্যভুক্ত হয়। এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে তুরস্কের সকল অধিবাসীদের গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে পুনরায় সংবিধান প্রবর্তন ও জাতীয় পরিষদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা। এই কেন্দ্রীয় কমিটিতে কতিপয় প্রভাবশালী সংগঠক ও বিপ্লবী ছিলেন, যেমন আহমদ রেজা, নিয়াজী বেগ, এনভার বেগ প্রমুখ।

নব্য-তুর্কী বিপ্লব ঃ

নিয়াজী ও এনভার ঃ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে নব্য-তুর্কী বিপ্লবের সূচনা হয় এবং এর সুত্রপাত হয় মেসিডোনিয়ার স্যালোনিকা শহরে। তুরস্কের অভ্যন্তরে ও বাহিরে গণতন্ত্র ও সংবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হয় তা ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে স্যালোনিকায় সংঘবদ্ধ হয়ে একটি কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় সংহতি ও প্রগতি সংঘে পরিণত হয়। এই কেন্দ্রীয় কমিটির প্রভাবশালী নেতা ছিলেন আহমদ রেজা। তিনি পরবর্তী পর্যায়ে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসেও তুর্কী বিপ্লবে ইউরোপীয় সমর্থন লাভের জন্য এই সংঘের একটি শাখা স্থাপন করেন। আহমদ রেজা ব্যতীত নব্য-তুর্কী বিপ্লবে নিয়াজী বেগ ও এনভার বেগের অবদান অনস্বীকার্য। নিয়াজী ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধে তুর্কী বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেন এবং তুর্কীদের কুশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। নিয়াজী পরে আত্মগোপন করলে তুর্কী বিপ্লবের দায়িত্ব এনভারের উপর ন্যস্ত হয়। নিয়াজী স্যালোনিকায় প্রত্যাবর্তন করে এনভারের সঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে মিদহাত পাশার সাংবিধানিক আন্দোলনকে জোরদার করার প্রয়াস পান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিপ্লবীগণ মেসিডোনিয়ায় অবস্থিত তুর্কী বাহিনী বিশেষ করে তৃতীয় আর্মি কোরের সমর্থন লাভ করে। এর ফলে সেনাবাহিনী তুর্কী সরকারের কুশাসন ও স্বেচ্ছাচারিতা সম্বন্ধেই অবহিত হল না, বরং বিপ্লবাত্মক ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হল। বিপ্লবী এবং সেনাবাহিনীর সদস্যগণ উপলব্ধি করেন যে, পতনোন্মুখ অটমান সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় ছিল মিদহাত পাশার সাংবিধানিক আন্দোলনকে জোরদার করে

www.pathagar.com

প্রশাসনিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা কায়েম করা। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুলাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সেনাবাহিনী স্যালোনিকা থেকে কনস্ট্যান্টিনোপলে অভিযান করে সুলতানকে সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাধ্য করবে। এই পর্যায়ে বিপ্লবীগণ আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করতে মনস্থ করেননি। সুলতানের আলবেনীয় দেহরক্ষিগণও বিপ্লবীদের সমর্থন করেন। তুর্কী বাহিনীর এবং স্বীয় দেহরক্ষী বাহিনীর বিরোধিতায় বিচলিত হয়ে সুলতান আবদুল হামিদ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবীদের দাবী মেনে নেন এবং ২৪শে আগস্ট পুনরায় সংবিধান প্রবর্তন করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রক্তপাতহীন এই বিপ্লব তুরস্কের ইতিহাসে 'নব্য-তুর্কী বিপ্লব' নামে পরিচিত এবং প্রকৃত অর্থে এই সময় হতে আধুনিক তুরস্কের সূচনা হয়।

নতুন সংবিধান প্রবর্তন ঃ ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে যে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া হয় সুলতান পুনরায় তা কনস্টান্টিনোপলে আহ্বান করলেন। দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রিপরিষদকে পদচ্যুত করে 'কমিটি অব ইউনিয়ন এণ্ড প্রগ্রেস'-এর পরামর্শমত একটি নতুন মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করা হয়। গুপ্তচর বৃত্তির বিলোপ সাধন করা হয়। পুনরায় পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পার্লামেন্টে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সদস্য নির্বাচিত হয় এবং এতে ৩০ জন খ্রিস্টান ও ইহুদী সদস্যও ছিল। উপরন্তু, নতুন মন্ত্রিসভায় খ্রিস্টান ও ইহুদী জাতিভুক্ত সদস্য ছিল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর নবনির্বাচিত পার্লামেন্টের অধিবেশনে সুলতান ভাষণ দেন এবং এর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্যও তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। সুলতান সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন।

প্রতিবিপ্লব ঃ রক্তপাতহীন নব্য-তুরস্কের বিপ্লব (Young Turks bloodless Revolution) আপাতদৃষ্টিতে সাফল্যমণ্ডিত হলেও কিছুদিনের মধ্যে স্বার্থান্বেষী মহল সুলতান হামিদের প্ররোচনায় প্রতি বিপ্লবের সূচনা করে।

১. সুলতানের বিরোধিতা ঃ বাহ্যিক সমর্থন ও অনুমোদন দান করলেও সুলতান মনেপ্রাণে সংবিধানে আস্থা রাখেন নি এবং পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তার দেহরক্ষী আলবেনীয় বাহিনীকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করেন। স্যালোনিকায় আলবেনীয় দেহরক্ষী দল 'কমিটি অব ইউনিয়ন এণ্ড প্রগ্রেস'-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তুর্কী সেনাবাহিনীর অসন্তোষ দূর করার জন্য সুলতান রাজকোষ হতে প্রচুর অনুদান দেন।

২. হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঃ গুপ্তচর বৃত্তি নিরসনের ফলে গুপ্তচরেরা বেকার হয়ে পড়ে এবং এর ফলে তার রাজ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। নবগঠিত মন্ত্রিসভা ব্যয় সংকোচনের জন্য অপ্রয়োজনীয় দফতরসমূহ তুলে দেওয়ায় অনেক সরকারি কর্মচারী কর্মচ্যুত হন। গুপ্তচর এবং সরকারি কর্মচারীদের একটি গোষ্ঠী তুর্কী সরকারের বিরুদ্ধে কনস্টান্টিনোপলে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করতে থাকে। স্বার্থান্বেষী মৌলভীগণ সংবিধানকে শরীয়তের পরিপন্থী বলে ফতোয়া দিতে থাকে।

www.pathagar.com

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল প্রতিবিপ্লবের নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে সংবিধান ও পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বার্থান্বেষী চক্রের সমর্থনে তারা নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য, 'কমিটি অব ইউনিয়ন এণ্ড প্রগ্রেস'-এর সদস্য, নবনির্বাচিত পার্লামেন্টের সদস্যদের আত্মগোপন করতে বাধ্য করেন। আবদুল হামিদ প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও গোঁড়াপন্থীদের সমর্থন করেননি, কারণ যদি করতেন তা হলে তাঁর অনুগত সেনাবাহিনীর সাহায্যে অতি সহজে তুর্কী-বিপ্লবকে নিশ্চিত করে স্বৈরতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। যাহোক প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণে আদানা, আলেপ্পো, নেরসনা প্রভৃতি স্থানে নব্য-তুর্কীগণ নিহত হন। সাংবিধানিক সঙ্কট যখন চরম আকার ধারণ করে তখন নব্য-তুর্কী কমিটি স্যালোনিকায় মিলিত হয় এবং প্রতিবিপ্লবকে সমূলে ধ্বংস করতে দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহন করেন। তারা তৃতীয় আর্মি কোরের কমান্ডার মাহমুদ শেফকাত পাশার সাহায্যে প্রার্থনা করে। শেফকাত পাশা সংবিধানে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে তার বাহিনীসহ কনস্টান্টিনোপলে অভিযান করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল প্রতিবিপ্লবীদের প্রতিরোধ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করা হয় এবং শেফকাত রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহ দখল করেন। প্রতিবিপ্লব দমন করবার পর নব্য-তুর্কী বিপ্লবীগণ জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান করেন। নিরঙ্কুশ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল আবদুল হামিদ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে স্যালোনিকায় নির্বাসিত হন। আবদুল হামিদের স্থলে তার ভ্রাতা পঞ্চম মোহাম্মদ সুলতানরূপে (১৯০৯-১৯১৮) শপথ গ্রহন করেন।

তুর্কী বিপ্লবের অবদান ঃ আবদুল হামিদের পতনের পর সমগ্র তুরস্কের শাসনভার ন্যস্ত হল নব্য-তুর্কীদল অথবা 'কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস'-এর উপর। প্রাইস যথার্থই বলেন, "প্রথমবারের মত কনস্টান্টিনোপলে নব্য-তুর্কীদল পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে একটি নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এই বিপ্লব ছিল রাজনৈতিক অর্থাৎ নব্য গোষ্ঠী এবং একটি ক্ষমতাসীন নতুন দল গঠন।" নব্য-তুর্কী বিপ্লব প্রকারান্তরে মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে অটমান সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করে। এরা সর্বপ্রথম একটি সংবিধান ও নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে। এভারসলে বলেন, "তাদের গভীর আগ্রহ, স্বদেশপ্রেম, সততা এবং আত্মত্যাগ আধুনিক তুরস্কের ইতিহাসে একটি স্বর্ণযুগের সূচনা করে। তারা জনগণের জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক মূলমন্ত্রের উদ্ভাবন ঘটায় এবং যুদ্ধোত্তর নেতৃবৃন্দকে এই সমস্ত ভাবধারায় প্রভাবান্বিত করে পুরাতন সামাজিক এবং রাজনৈতিক ধ্বংসস্তূপ হতে একটি নতুন জাতি গঠনের দুরূহ কর্তব্যকে সহজতর করে।"

তুর্কী বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ ঃ ১৯০৯ হতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ প্রথম মহাসমরের সমাপ্তি পর্যন্ত তুর্কী বিপ্লবীগণ তুরস্কের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এই নয় বছর তারা বিভিন্ন ধরনের সংস্কার প্রবর্তন করলেও ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তারা ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং ষষ্ঠ মোহাম্মদ (১৯১৮-২২) তুরস্কের সর্বশেষ সুলতানরূপে সিংহাসনে উপবেশন করেন। তুর্কী-বিপ্লবের ব্যর্থতার মূলে কতিপয় কারণ ছিল ঃ

www.pathagar.com

১. ষড়যন্ত্রমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল কার্যাবলি ঃ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আবদুল হামিদ যখন সর্বপ্রথম সংবিধান প্রবর্তন এবং জাতীয় পরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করেন, তখন নব্য-তুর্কী বিপ্লবীগণও গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। এই কারণে তারা রাজপ্রাসাদে সুলতানের কার্যপ্রণালী পরিবর্তনের জন্য তাদের সদস্য এবং পার্লামেন্টে তিনটি সৈন্যদল মোতায়েন করে। প্রতিবিপ্লবীদের ধ্বংস করলেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উত্তরণে তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ সুলতান, পাশা, অভিজাত সম্প্রদায় এবং স্বার্থান্বেষী মহলের প্রতিক্রিয়াশীর মনোভাব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল হামিদ সাংবিধানিক শাসন প্রবর্তন করলেও তিনি মনেপ্রাণে নব্য-তুর্কীদের বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপকে ঘৃণা করতেন। এমনকি জাতীয় পরিষদের সভাপতি কেয়ামল পাশা (Kiamal Pasha) এবং প্রধান উজীর হিলমী পাশা প্রকাশ্যে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেও ষড়যন্ত্রমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের দ্বারা তুর্কী বিপ্লবকে ব্যাহত করবার প্রয়াস পান।

২. তুর্কী সাম্রাজ্যের রক্ষণশীলতা ঃ পাশ্চাত্য ভাবধারা বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ কতিপয় নব্য-তুর্কী বিপ্লবীর পক্ষে শত শত বছরের পুরাতন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত অটমান সাম্রাজ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন করা সম্ভবপর হয়নি। একটি নতুন দল, সংবিধান এবং জাতীয় পরিষদ সৃষ্টি হয় মাত্র; কিন্তু প্রাইসের ভাষায়, "যখন অটমান সাম্রাজ্যের সার্বিক কাঠামো পরিবর্তনের অর্থাৎ সামাজিক এবং আইন সংক্রান্ত কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গঠিত রাষ্ট্রের পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠে, তখন নব্য-তুর্কীগণ ইতস্ততঃ করেন।"

৩. মোল্লাদের বিরোধিতা ঃ তুর্কী-বিপ্লবের শত্রু ছিল রক্ষনশীল দল এবং মোল্লাগোষ্ঠী। পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তুর্কী-বিপ্লবকে মোল্লাগণ শরীয়তের পরিপন্থী মনে করতেন এবং নব্য-তুর্কীগণের শরীয়ত খণ্ডন করবার মত সৎসাহস ছিল না। অন্য কথায়, সুলতান এবং মুফতি শেখ-উল-ইসলামের কর্তৃত্ব ও প্রভাব ছিল অপরিসীম। ফলে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কার্যকর হয়নি।

৪. বহুজাতিক ও ভাষাভাষী তুর্কী সাম্রাজ্যে বিভেদ ঃ সংবিধানে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সমান নাগরিক অধিকার ও ভ্রাতৃত্ববোধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায় জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতির দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এর ফলে তুর্কীগণ তুর্কী, বুলগারগণ বুলগারই রয়ে যায়। বহু শতাব্দী ধরে যে খ্রিস্টান সম্প্রদায় স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য অটমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাদের পক্ষে সংবিধানের মূলমন্ত্রে একটি সংঘবদ্ধ তুর্কী জাতিতে পরিণত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। এছাড়া বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্যে বিভিন্ন উপজাতির বসবাস ছিল এবং তারা ছিল নিরক্ষর। এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং রাজনৈতিক চেতনাবোধের সঞ্চার হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পার্লামেন্ট থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন 'মিল্লাত ব্যবস্থা' (Millet system) রহিত করা সম্ভব হয়নি। কারণ এর মাধ্যমে খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে ধর্মীয়

www.pathagar.com

স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। খ্রিস্টানদের পৃথক ধর্মীয় আদালত ছিল এবং তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মুসলমানদের থেকে পৃথক ছিল। এর ফলে বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যে তুর্কী, গ্রীক, বুলগার, সার্ব, ওয়ালাচিয়ান, বসনিয়া, মন্টিনিগ্রো ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির বসবাস থাকায় তা ছিল একটি Polyglot বহুজাতিক রাষ্ট্র। খ্রিস্টান ছাড়াও ইহুদীদের বসবাস ছিল এই সাম্রাজ্যে। এহেন, রাষ্ট্র বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতির বিপরীতমুখী ভাবধারা তুর্কী ঐক্যের পরিপন্থী ছিল।

৫. পরস্পর বিরোধী মতবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঃ নব্য-তুর্কীগণ পাশ্চাত্য ভাবধারা ও সামাজিক রীতিনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং শরীয়তের পরিপন্থী কার্যকলাপে নিয়োজিত হয়, যেমন– মদ্যপান, ফেজ পরিহার ইত্যাদি। এর ফলে প্রাচীন মুল্যবোধে আস্থাবান বয়োবৃদ্ধ তুর্কীগণ অনৈসলামিক কার্যকলাপকে বরদাশ্‌ত করতে পারেনি। ১৯০৯ হতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নব্য-তুর্কীগণ তুরস্কের আধুনিকীকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে সত্য যেমন– নির্বাচন প্রথা, অবাধ নির্বাচন, সার্বজনীন সামরিক সার্ভিস প্রভৃতি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তুরস্ককে সাম্রাজ্যের পরিবর্তে রাষ্ট্রে রূপান্তর করতে আগ্রহী ছিল না। এই কারণে একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ তুরস্ক রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মেসিডোনিয়াবাসী স্বাধিকার এবং খ্রিস্টান গভর্নর দাবী করলে তা অস্বীকার করা হয়। সম্ভবত নব্য-তুর্কী বিপ্লবীগণ সংস্কারমূলক আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী রূপ প্রদানের মাত্রাধিক উৎসাহে তাদের কর্মপন্থাকে সুষ্ঠুরূপে কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়। তাদের মতবাদের ভিত্তি ছিল বিশ্ব ইসলামবাদ (Pan-Islamism), বিশ্ব তুর্কীবাদ (Pan-Turkianism) এবং বিশ্ব অটমানবাদ (Pan-Ottomanism)। কিন্তু এ তিনটি ভাবধারা ছিল পরস্পরবিরোধী। ১৯০৮ হতে ১৯১৮ পর্যন্ত এই অল্পসময়কালে নব্য-তুর্কীদের বলকান যুদ্ধ ও প্রথম মহাসমরের বিভীষিকার সম্মুখীন হতে হয়। যদি তুরস্ক ইউরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত না হত অথবা ইউরোপীয় শক্তি দাবার গুটির মত তুরস্ককে ব্যবহার না করত তা হলে বিপ্লব সফল হত। ইউরোপীয় শক্তির স্বার্থপরতার ফলেই বলকান জটিলতা ও যুদ্ধের সূচনা হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত বুখারেস্ট চুক্তির ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য কনস্টান্টিনোপল এবং আড্রিয়ানোপলে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। বলকান জটিলতা হতে প্রথম মহাসমর সংঘটিত হয় এবং ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও রাশিয়া ত্রি-শক্তি আঁতাতে (Triple Entente) ত্রিপলীতে জার্মানীর সপক্ষে তুরস্ক প্রথম মহাসমরে যোগদান করে। যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের শুধু মর্যাদাহানিই হল না, নব্য-তুর্কী বিপ্লবীদের পতনও হল। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চম মোহাম্মদের ক্ষমতাচ্যুতির ফলে তার স্থলে সুলতানের পদে অধিষ্ঠিত হলেন তার ভ্রাতা ষষ্ঠ মোহাম্মদ। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা উপলব্ধি করে জ্যানেট জ্যাকস বলেন, "সফলকাম হতে হলে নব্য-তুর্কী বিপ্লবের দশ বছরের (১৯০৮-১৮) শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তদস্থলে তা বার বছরের আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়।"

www.pathagar.com

তুর্কী বিপ্লবের ফলে দুটি পরস্পরবিরোধী দলের সৃষ্টি হয়, প্রথমটি এনভার পাশার নেতৃত্বে বিশ্ব-ইসলামীপন্থী (Pan-Islamists) এবং অপরটি জাতীয়তাবাদী দল (Nationalists)। হামিদা এদিব খলিফার নেতৃত্বে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্ব-ইসলামবাদের মতবাদ প্রচার দ্বারা ঐক্য-স্থাপন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থী দলের অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা তুর্কী-বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেয়। এভারসলে যথার্থই বলেন যে, পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক আদর্শে প্রভাবান্বিত হলেও নব্য-তুর্কীগণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। আবেগপ্রবণ তরুণ তুর্কী সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র পরিচালনার কোন যোগ্যতাই ছিল না–যার ফলে অটমান সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তারা অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী কিয়ামল পাশাকে পদচ্যুত করে প্রশাসনিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এর প্রতিবাদে শেখ-উল-ইসলাম জামালউদ্দীনও পদত্যাগ করেন। নব্য-তুর্কীগণ শাসনের সাফল্যের জন্য তাদের জনপ্রিয়তার উপর অধিক নির্ভরশীল ছিল কিন্তু সরকারবিরোধী স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল দলকে নির্মূল করবার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

৬. সরকার বিরোধী ক্ষোভ ঃ প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে বিভিন্ন বিভাগ হতে অপ্রয়োজনীয় কর্মচারীদের কর্মচ্যুতির কারণে সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সৃষ্টি হয়। তাদের ক্ষোভ ও স্বার্থপরতার ফলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে।

নব্য তুর্কী আন্দোলন নিঃসন্দেহে আধুনিক তুরস্ক রাষ্ট্রের গঠনে সহায়ক ছিল।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় আবদুল হামিদ

দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সিংহাসনারোহন ঃ ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে নব্য-তুর্কী সম্প্রদায় পঞ্চম মুরাদকে পদচ্যুত করে তার ভাই দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে তুরস্কের সিংহাসনে বসান। এই পট পরিবর্তনের প্রধান ভূমিকা পালন করেন মিদহাত পাশা। ক্ষমতালাভ করে আবদুল হামিদ মিদহাত পাশাকে প্রধান উজীর নিযুক্ত করেন এবং ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর সংবিধান জারি করেন। এই সংবিধান প্রণয়নে মিদহাত পাশা, নামিক কামাল এবং জিয়া পাশা অংশগ্রহণ করেন। আবদুল হামিদ তার সমসাময়িক কোন রাজা অপেক্ষাই নিকৃষ্ট ছিলেন না। বরং তিনি নিঃসন্দেহে তুরস্কের যোগ্যতম সুলতানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ("In Sultan Abdul Hamid Turkey unquestionably possesses one of the ablest rulers who have ever occupied the throne of the Ottoman empire") তবে মানসিক যোগ্যতা, বিপুল কর্মশক্তি এবং নিরলস উদ্যম ভিন্ন অবস্থায় দেশে পরম উপকার সাধন করতে পারত। কিন্তু রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে তুরস্কের বিপর্যয়, বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা এবং নব্য-তুর্কী আন্দোলনজনিত নীতির অভ্যন্তরীণ গোলযোগ (turmoil) আবদুল হামিদের রাজত্বকালকে এক কলুষিত অধ্যায়ে পরিণত করে এবং তিনি নিজেও সেই পরিস্থিতির শিকার হন।

সংবিধান বাতিল ঃ সুলতান আবদুল হামিদ বিচক্ষণ সুলতান হলেও তিনি ছিলেন প্রকটভাবে সন্দেহভাজনশীল। তিনি কারও প্রতি আস্থা রাখতে পারতেন না। তার চাচা সুলতান আবদুল আজিজের পদচ্যুতি ও আত্মহত্যা আবদুল হামিদের মনে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তিনি তার উদারনীতির বাহ্যিক খোলস পরিত্যাগ করে ক্রমশঃ একচ্ছত্র আধিপত্যের (absolute monarch) ভূমিকা পালন করেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান প্রণীত হলেও তিনি এই সংবিধান এমন একটি অণুচ্ছেদে সংযোজন করেন যার ফলে তিনি যে কোন সময়ে এই সংবিধান এবং জাতীয় পরিষদ (National Assembly) বাতিল করতে পারতেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোষণা করলে তিনি অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বন্ধ করে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রয়াস পান। তার চাচার অস্বাভাবিক মৃত্যু ও রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের সূচনায় তিনি তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং সিংহাসন রক্ষার জন্য গুপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করেন (Pathological anxiety for his person and his throne)। তিনি ক্রমশঃ স্বৈরাচারী নীতি (unadulterated despotism) অবলম্বন করতে থাকেন যা তার দীর্ঘ ৩০ বছরের রাজত্বকালে অব্যাহত ছিল। প্রথমে তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ ও নিম্ন পরিষদ সম্বলিত সংসদ গঠন করলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তা ১৮৭৮

www.pathagar.com

খ্রিস্টাব্দে বাতিল ঘোষণা করেন। প্রধান উজীর মিদহাত পাশাকে বিতাড়িত ও হত্যা করা হয়। তার স্বৈরাচারী শাসনে নব্য-তুর্কীগণ ভীত ও সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েন এবং কমপক্ষে আশি হাজার তুর্কী বিতাড়িত হয়। সুলতান আবদুল হামিদ নব্য-তুর্কীদের বৈদেশিক প্রভাব ও পাশ্চাত্য রীতি নীতি ঘৃণা করতেন এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের অনুপ্রবেশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। উল্লেখ্য যে, বাতিল ঘোষিত সংসদ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে আর বসেনি। দমন নীতির ফলে অসংখ্য নব্য-তুর্কীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সাময়িক পত্র বাতিল ঘোষিত হয়। ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডে বিতাড়িত নব্য-তুর্কীগণ তাদের আন্দোলনের সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করতে থাকেন।

পটপ্রেক্ষিত ঃ রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া তুরস্কের জন্য ছিল মারাত্মক এবং এর ফলশ্রুতিতে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। পতনোন্মুখ তুর্কী সাম্রাজ্যের ঐক্য বজায়ের জন্য পাশ্চাত্য রীতিনীতি ও শাসন প্রণালীর বিপরীতে বিশ্ব-ইসলামবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন যাতে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত তুরস্ক সাম্রাজ্যের ঐক্য বজায়ের জন্য পাশ্চাত্যের রীতিনীতি ও শাসন প্রণালীর বিপরীতে বিশ্ব ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়। বিশ্ব-ইসলামাবাদের ধারণার ধারক ও বাহক সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী হওয়া সত্ত্বেও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে নামিক কামালই প্রথম বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তুর্কীগণ বিশাল আরব ভূখণ্ডের মালিক ছিল এবং বিভিন্ন জাতি, গোত্র, ভাষা-ভাষী বর্ণ, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে যে বিশ্ব-ইসলামবাদ তাতে তার বদ্ধমূল ধারণা জন্মে। তিনি বার্নাড লুইসের ভাষায়, "assured himself with thoughts of Islamic brotherhood and allegiance to the Caliphate" সামগ্রিকভাবে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের অধঃপতন সূচিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্যের অবসান হয়; মধ্য-এশিয়ার সমরকন্দ রাশিয়ার দখলে চলে যায় ১৮৬৮ সালে এবং এর ফলে মধ্য-এশিয়ায় মুসলিম প্রতিপত্তির অবসান হয়। ১৮৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে বৃটেন মিশর এবং ফ্রান্স তিউনিসিয়া দখল করে। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষে যখন খিলাফত আন্দোলন সূচিত হয় পরবর্তী বিংশ শতাব্দীতে তখনি ইসলামের ঐক্য এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সুসংহত করবার জন্য বিশ্ব-ইসলামবাদের ধ্যান-ধারণা দানা বাঁধতে থাকে। নামিক কামালের এই ধারণা ছিল সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক নয়। "The way of uniting the people of Islam must be sought not in political aims or doctrinal disputes but in the presence of preachers in the pages of books" বিশ্ব-ইসলামবাদের ধ্যান-ধারণা মূলত ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে জারীকৃত সংবিধানে সংযোজিত রয়েছে। সেখানে তুর্কী বা উসমানলী বংশের জন্য একটি উচ্চ মানের ইসলামিক খেলাফতের (high Islamic caliphate for the house of Usman) উল্লেখ আছে। সুলতান আবদুল হামিদ তুর্কী সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বিশ্ব-ইসলামবাদকে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত করেন। নামিক

www.pathagar.com

কামাল এবং আবদুল হামিদের বিশ্ব-ইসলাম মতবাদের মধ্যে প্রভেদ ছিল এই যে পূর্বোক্ত ব্যক্তি বিশ্ব-ইসলামবাদকে সংস্কৃতি ও অরাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন, কিন্তু আবদুল হামিদ তার রাজনৈতিক মতলব হাসিলের জন্য এটি প্রয়োগ করেন।

প্যান-ইসলামী মতবাদ ঃ প্যান-ইসলামী মতাদর্শের মুল ভিত্তি ছিল একই খলিফার অধীনে সমগ্র মুসলিম জাহানকে একতাবদ্ধ করা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আব্বাসীয় বংশের পতনের পর মুসলিম সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ে এবং এই বিচ্ছিন্নতার কারনে উনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রই ইউরোপীয় শক্তির আওতাধীনে আসে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাসে বহু মুসলিম রাষ্ট্র পতিত হয়। প্যান-ইসলামী চিন্তাধারা তুরস্কে নব্য-তুর্কীদের মধ্যে বিশেষ করে নামিক কামাল প্রমুখের মধ্যে উন্মেষ হয়। নিজ সাম্রাজ্যে অতুর্কী বিশেষ করে বিশাল আরব বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠীর আনুগত্য লাভের জন্য সুলতান আবদুল হামিদ এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। আবুল হামিদের রাজত্বে আলেপ্পোর শেখ আবুল হুদা ছিলেন একজন প্যান-ইসলামী আদর্শবাদী। তিনি ওয়াহাবী মতবাদের বিরোধী ছিলেন। তার মতবাদ ছিল–একমাত্র খিলাফতের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে একতাবদ্ধ করা যেতে পারে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, খিলাফত একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এবং আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম। বিশ্বাসীগণ (খলিফা) ন্যায় করলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে এবং অন্যায় করলে ধৈর্য ধারণ করবে। কিন্তু আবুল হুদার প্যান-ইসলামী আদর্শ কেবলমাত্র আবদুল হামিদের রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বৈদেশিক হামলা থেকে তুরস্ককে রক্ষা করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

সৈয়দ জামালউদ্দীন আল-আফগানী (১৮৩৯-৯৭ খ্রি.) ঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যান-ইসলামবাদের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান প্রতিভূ ছিলেন সৈয়দ জামালউদ্দীন আল-আফগানী। তার জীবন ছিল ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ। তার জন্ম হয় পারস্যে, যদিও তিনি নিজেকে আফগান বা আফগানিস্তানের অধিবাসী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি মতবাদে শিয়া হলেও নিজেকে সুন্নী হিসেবে পরিচয় দিতেন। তার মধ্যে পরস্পরবিরোধী গুণাবলীর সমাবেশ দেখা যায়। অনেকের মতে, তিনি পারস্যের বিপ্লবের পুরোধা ছিলেন। কিন্তু একথাও স্পষ্ট যে, তিনি শাসনতন্ত্রবাদী নন। তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ভ্রমণ করে এমন একজন শক্তিধর ও প্রভাবশালী শাসকের সন্ধান লাভের চেষ্টা করেন যার মাধ্যমে ইসলামকে পুনর্জীবিত এবং একগ্রন্থীভুক্ত করা যেতে পারে। তার লেখনী ছিল খুবই প্রখর এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। আফগানী ইরানে আসাদাবাদী নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই যোগ্য, প্রতিভাশালী এবং নিরলস আন্দোলনকারী। তিনি ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা দর্শনশাস্ত্রকে অধিক প্রাধান্য দিতেন। তার রাজ্যনীতি বাস্তব কর্মপন্থার উপর নির্ভরশীল ছিল, কারণ তিনি খলিফার যুগকে ইসলামের সর্বাপেক্ষা আদর্শ যুগ বলে মনে করতেন, যদিও ওয়াহাবীদের গোঁড়া মতবাদে তিনি আস্থাবান ছিলেন না। তিনি যুক্তিবাদ ও আধুনিকতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এই কারণে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ

www.pathagar.com

যথা বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও বিদ্যুতের ন্যায় আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোরআনের আয়াতে বর্ণিত রয়েছে– এ কথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি যুক্তি দ্বারা সকল বাণীর মর্ম উপলব্ধি করবার তাগিদ দেন এবং ইসলামকে ধর্মীয় ঐক্যের দ্বারা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার মনে করতেন। তিনি প্রায়শঃ বলতেন ইসলামের একজন মার্টিন লুথারের (সংস্কারক) প্রয়োজন এবং সম্ভবত তিনি নিজেকেই এই বিরল প্রতিভার ধারক বলে মনে করতেন। বিশ্ব-ইসলামবাদী আফগানী পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি ইসলামের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আশা পোষন করতেন যে ইরানের শাহ তুরস্কের সুলতানকে খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দিবেন এবং বিনিময়ে সুলতান পারস্যের স্বাধীনতা মেনে নেবেন। তিনি তুরস্ক অধিকৃত শিয়াদের পবিত্র স্থানসমূহ যেমন কারবালা, নজফ পারস্যকে ফেরত দানের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। মুসলিম বিশ্বকে একতাবদ্ধ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্য তিনি ইস্তাম্বুলে একটি মহাসম্মেলন আহ্বানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ নীতিকে ধুলিসাৎ করা। পারস্যের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের জন্য শাহ আফগানীকে ১৮৯১ সালে পারস্য থেকে বিতাড়িত করেন। উল্লেখ্য, তিনি শিয়া ছিলেন এবং তার একজন শিয়া অনুসারীর হাতে ১৮৯৬ সালে নাসিরউদ্দীন শাহ নিহত হন।

সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী শিয়া হলেও মুসলিম জাহানকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য আফগানী নাম ধারণ করে নিজেকে সুন্নী হিসেবে পরিচয় দিতেন। বিশ্ব-ইসলামবাদের মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ইসলামের একতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এর বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতার জন্য তিনি কিছুকালের জন্য ব্রিটিশদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি প্যারিস, লণ্ডন এবং পিটার্সবার্গে গমন করেন– উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ শক্তিবর্গের সাহায্যে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা। তিনি মিশরের খেদিভ, ইরানের শাহ এবং তুরস্কের সুলতানের নিকট গমন করে তার মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে তার মতবাদ তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদের নিকট হৃদয়গ্রাহী হয়, কারণ তুরস্ক সাম্রাজ্য অ-তুর্কী ভাষাভাষীদের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। আফগানী আবদুল হামিদের দরবারের আতিথ্য গ্রহন করেন। কিছুদিন পর সেখানে তিনি সুলতানের কোপানলে পড়েন, কারণ তিনি ওসমানী বংশ (Turkism) অপেক্ষা বিশ্ব-ইসলামবাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। এই কারণে গৃহবন্দী হিসেবে ১৮৯৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আফগানীকে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে ইসলামী প্রতিক্রিয়ার প্রতিভূ (The apostle of the Islamic reaction against the West) বলা হয়ে থাকে। তার মতবাদের মূল ভিত্তি ছিল দুটি– প্রথমত, পশ্চিমা আগ্রাসন নীতির প্রতিবন্ধকতার জন্য মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ঐক্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামকে রক্ষা করা, দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য প্রভাবে ইসলামের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করা। জামালউদ্দীন সার্বজনীন মুসলিম রাষ্ট্র থেকেই ইউরোপীয়দের বিতাড়িত করে পাশ্চাত্য প্রভাব নির্মূল করে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সার্বজনীন ইসলামী রাষ্ট্র

www.pathagar.com

একজন খলিফার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবে। তুরস্কে বসবাসকারী জামালউদ্দীন কর্তৃক প্রচারিত এই মতবাদ সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ গ্রহণ করেন। বিশ্ব-ইসলামবাদ মতবাদ প্রচারের দ্বারা তিনি একদিকে স্বদেশে যেমন সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদী, উদার রাজনীতিবিদদের দমন করার প্রয়াস পান অন্যদিকে দেশের বাইরে মুসলিম গোষ্ঠীদের তিনি ইসলামের ছত্রছায়ায় এনে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

বিশ্ব-ইসলামবাদের বিফলতা ঃ দ্বিতীয় আবদুল হামিদ সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী প্রচারিত বিশ্ব-ইসলামবাদ মতবাদকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে পতনোন্মুখ তুর্কী সাম্রাজ্যকে রক্ষার প্রয়াস পান। তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই তিনি এই মতবাদকে রাজ্যে সকল প্রকার গণতান্ত্রিক, সংবিধানিক, উদারপন্থী কার্যকলাপকে নির্মূল করে একচ্ছত্র একনায়কত্ব এবং স্বৈরাচারী শাসন (absolutism) প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব-ইসলামবাদ প্রচারে ব্রতী হন। তিনি সাময়িকভাবে সফলতা লাভ করেন। বার্নাড লুইসের মতে, সুলতানের অনুচর ও দুতেরা আলজিরিয়া, মিশর, ভারতবর্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র কায়েমের মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে তুরস্কের সুলতানের নেতৃত্বে খিলাফতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি মুসলিম বিশ্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হয়। এমন কি বিশ্ব-ইসলামবাদের মতবাদেপুষ্ট ভারতবর্ষের মুহম্মদ আলী ও শওকত আলী খিলাফত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ইসলামের অতীত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করে মুসলিম জাহানকে একতাবদ্ধ করবার যে প্রয়াস জামালউদ্দীন পান তা ১৯০৮ সালের নব্য-তুরস্ক আন্দোলনের ফলে ব্যাহত হয়। এমন কি সুলতান আবদুল হামিদ নব্য-তুর্কী বিপ্লবীদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম জাহান বিশ্ব-ইসলামবাদে (Pan-Islamism) এবং বিশ্ব-তুর্কীবাদে (Pan-Ottomanism) বিভক্ত হয়ে পড়ে। তুরস্ক অধিকৃত সকল আরব রাষ্ট্র তুরস্কের অধিপত্যবাদকে ভীতির চোখে দেখত। লরেন্স অব অ্যারাবিয়ার মত ব্রিটিশ প্ররোচকগণ বিশ্ব-ইসলামবাদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা শুরু করেন। বিশ্ব-ইসলামবাদ তুরস্ক সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণের একটি শ্লোগানে পরিণত হয়ে পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য ভারত উপ-মহাদেশে খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্ব ইসলামবাদের ধারণা স্বল্পকালের জন্য কার্যকরী হয়। যাহোক, বিশ্ব-ইসলামবাদ বিফলে পরিণত হলে স্যালোনিকায় 'ঐক্য ও উন্নয়ন সমিতি' (Society for union and progress) সুলতানকে ১৯০৮ সালের বাতিলকৃত সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য চাপ দেয়। নব্য-তুর্কী আন্দোলনের ফলে সুলতান সিংহাসনচ্যুত হয়ে বিতাড়িত হন। "এত অল্প রক্তপাতে এতদপেক্ষা অধিকতর সফলতার সাথে কখনও কোন রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয়নি"—বলেন এভেরসলে। ("Never was revolution effected with so little bloodshed and with more complete success"—Eversley)

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

বলকান যুদ্ধ

পটপ্রেক্ষিত ঃ প্রাচ্যদেশীয় সমস্যার ফলশ্রুতিতে অটোমান সাম্রাজ্যের শক্তি-সামর্থ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্বল হতে থাকে এবং এর ফলে তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত বলকান উপদ্বীপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ স্বাধিকার ও স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে তুর্কী বিরোধী আন্দোলন ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ছিল গ্রীস, সার্বিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, মন্টিনিগ্রো। উপরন্তু, বলকান অঞ্চলে তুর্কী অধীনতার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং ম্যাসিডোনিয়া, পোল্যাণ্ড, ক্রীট এবং বাল্টিক প্রদেশসমূহ জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষ হয়। বলকান রাষ্ট্রসমূহের তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন ও যুদ্ধে, লিপ্ত হবার মূলে বিভিন্ন কারণ ছিল।

প্রথমত, তুরস্কের অধঃপতন ঃ বার্নাড লুইস বলেন যে, "অটোমান সাম্রাজ্য প্রথম শতাব্দী থেকেই মূলতঃ ছিল একটি বলকান ও আনাতোলিয় শক্তি।" এই বলকান অঞ্চলে তুর্কী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়াবাসী তুর্কীগণ ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রভুত্ব কায়েম করে। তুর্কী সুলতানগণ বসিনিয়া, আলবেনিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, মন্টিনিগ্রো, বেসারাবিয়া ও হারজেগোভিনা প্রভৃতি বলকান উপদ্বীপের অঞ্চল অধিকার করে একটি বিশাল ভূমধ্যসাগরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বলকান উপদ্বীপে তুর্কী মুসলিম আধিপত্য ক্ষুণ্ন করার যে প্রচেষ্টা সংঘবদ্ধ খ্রিস্টান ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ চালায় তার ফলেই গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং পরিশেষে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের পরিণাম তুরস্কের জন্য ছিল ভয়াবহ। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তুরস্কের সুলতানকে 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তিতে'ই পরিণত করেনি, তুরস্ককে ইউরোপ থেকে 'তল্পিতল্পা'সহ (bag and baggage) বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করে।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় শক্তির ষড়যন্ত্র ঃ ক্ষয়িষ্ণু তুর্কী সাম্রাজ্যের অবস্থা বিবেচনা করে স্বার্থান্বেষী ইউরোপীয় শক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তুর্কীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতিতে শঙ্কিত হয়ে এবং রুশ ভাল্লুকের ছায়া ক্রমশঃ বলকান উপদ্বীপে বৃদ্ধি পেতে থাকলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়া এর তীব্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধকতার ফলে বলকান উপদ্বীপ একটি আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরিশেষে সংঘর্ষের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং এটি ইউরোপে 'মারাত্মক অঞ্চল' (dangerous zone)-এ পরিনত হয়।

তৃতীয়ত, বলকান উপদ্বীপের গণজাগরণ ঃ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত বার্লিন-চুক্তি অটমান সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে না পারলেও বলকান উপদ্বীপের জনসাধারণের মধ্যে

www.pathagar.com

প্যান-শ্লাভ (Pan-Slavism) আন্দোলন জোরদার হয়। এই 'প্যান-শ্লাভ' আন্দোলনের হোতা ছিল রাশিয়া এবং জাতি ও ধর্ম ভিত্তিক এই আন্দোলন সমগ্র বলকান উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। রুশ আক্রমণাত্মক নীতির মূলেই ছিল এই জাতিগত (ethnic) কারণ।

চতুর্থত, উগ্র তুর্কী জাতীয়তাবাদ ঃ বলকান সমস্যার রাজনৈতিক জটিলতার মূল কারণ ছিল 'তানজিমাত' উত্তর তুর্কীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত উগ্র তুর্কী জাতীয়তাবাদী মনোভাব। মহাজন বলেন যে, ১৯১২-১৩ খ্রিস্টাব্দের বলকান যুদ্ধ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের নব্য-তুর্কী বিপ্লবের ফলশ্রুতি। যেহেতু নব্য তুর্কীগণ তুরস্কের অধীনে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের তুর্কীকরণ এবং গণহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করে (বুলগেরিয়া হত্যাকাণ্ড) সেহেতু বলকান উপদ্বীপের দ্বিধাবিভক্ত ও পরস্পর স্বার্থবিরোধী রাষ্ট্রসমূহ তুরস্কের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। পতনোন্মুখ তুর্কী সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলে একটি তুর্কী সমিতি (Turk derneg) স্থাপিত হয়। এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল তুর্কীদের ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, নৃতত্ত্ব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল্যায়ন করে তুর্কী জাতীয়তাবাদকে পুনরুজ্জীবিত করা। ধর্ম অথবা রাজবংশের স্থলে তুর্কী জাতির উপর ভিত্তি করে এই গণ চেতনা সৃষ্টি করা হয় যাতে তিনটি মহাদেশ (ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা) ব্যাপী বিশাল অটমান সাম্রাজ্য সুসংহত ও সংঘবদ্ধ থাকে। লুইসের ভাষায়, "The Ottoman reaction to Balkan separatism, Tartar revolt against Russian pan-slavism, the response of Turkish and Tartar intellectuals to the new ideas and examples set by European nationalisms, the nourishment of Turkish pride by Turcological discovery—all these, at a time of Ottoman defeat (Crimea and Russo-Turkish war) and Muslim abasement combined to encourage the growth of Turkism of the new political movement (New Turks) based, not on a dynasty, a faith or a state but on a people—the Turkish people in its vast territories, extending from 'Europe to the Pacific.")

পঞ্চমত, বলকান জটিলতা (Balkan tangle) ঃ বলকান উপদ্বীপের অধিবাসীদের তুরস্ককরণ নীতি (Policy of Turkification) বলকান অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্রিস্টান রাষ্ট্রসমূহকে একতাবদ্ধ হতে সহায়তা করে। ঐতিহাসিক, জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও বলকান রাষ্ট্রসমূহ একটি লীগ গঠন করে, যা বলকান লীগ (Balkan League) নামে পরিচিত ছিল। বলকান জটিলতা থেকেই বলকান লীগের আবির্ভাব এবং এর পূর্বসূত্র হিসেবে লক্ষ্য করা গেছে যে, বুলগেরিয়া পূর্ব রুমানিয়ার সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রুমানিয়া রাষ্ট্র গঠন করে এবং সার্বিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বৃহৎ সার্বিয়া গঠন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর দ্বৈত রাজ্যের (Dual monarchy) প্রতি হুমকি স্বরূপ ছিল এবং তা অস্ট্রিয়ার এজিয়ান সাগরে সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রীস মেসিডোনিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে তুরস্কের

www.pathagar.com

সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এজিয়ান সাগরে আধিপত্য নিয়ে রাশিয়া এবং জার্মানীর মধ্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। বলকান উপদ্বীপে ইতালির প্রধান লক্ষ্য ছিল ইতালিদের বাসভূমি ট্রিয়েস্ট এবং ট্রেনটিনো অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। ১৯১১-১২ খ্রিস্টাব্দের তুরস্ক ও ইতালি যখন ট্রিপলিকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন বলকান রাষ্ট্রসমূহ একটি লীগ গঠন করে। তুরস্কের দমন নীতি ও স্বৈরাচারী নীতির ফলে আর্মেনীয়দের হত্যাকাণ্ড (Armenian massacre)। যাতে কমপক্ষে ৫০,০০০ আর্মেনীয় খ্রিস্টান মৃত্যবরণ করে এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান রাষ্ট্রসমূহকে একতাবদ্ধ হতে সহায়তা করে। এই জটিলতার সুযোগে বুলগেরিয়ার প্রিন্স ফার্ডিন্যাণ্ড ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে 'বুলগেরিয়ার জার' উপাধি ধারণ করেন। উপরন্তু, অস্ট্রিয়া বার্লিন চুক্তি ভঙ্গ করে তুরস্কের প্রদেশ বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা দখল করে। অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপে বলকান উপদ্বীপের প্রভাব বলয় থেকে রাশিয়া সরে পড়তে থাকে। অপরদিকে জার্মানী অস্ট্রিয়ার সম্প্রসারণবাদকে সমর্থন করে। বসনিয়ায় অস্ট্রিয়ার সশস্ত্র হস্তক্ষেপে ইংল্যান্ডে রাশিয়া এবং ফ্রান্স তীব্র প্রতিবাদ করে। বসনিয়া সংকট বিপরীতমুখী দুটি সামরিক শিবিরকে শক্তিশালী করে। এর ফলে বলকান জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং পরিশেষে বলকান যুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়।

প্রথম বলকান যুদ্ধ, ১৯১২ ঃ

অস্ট্রিয়া এবং ইতালির তুরস্ক অধিকৃত অঞ্চলে বলপূর্বক আক্রমণের ফলে বলকান উপদ্বীপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। অস্ট্রিয়া বসনিয়া এবং ইতালি লিবিয়া দখল করলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। সার্বিয়ায় রাশিয়ার হস্তক্ষেপের মূলে ছিল প্যান-শ্লাভ আন্দোলনকে সমর্থন করা, বলকান উপদ্বীপে অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপ বন্ধ করা এবং তুরস্ককরণ নীতিতে বাধা প্রদান করা। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে গ্রীক রাজনীতিবিদ ও প্রধানমন্ত্রী ভিনিজোলস (Venizolos) গ্রীস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া ও মন্টিনিগ্রোর সমন্বয়ে একট বলকান লীগ গঠন করেন। এই লীগের উদ্দেশ্য ছিল বলকান উপদ্বীপে তুরস্কের আধিপত্য নির্মূল করা এবং মেসিডোনিয়ার খ্রিস্টানদের জন্য তুরস্কের সুলতানের নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ করে স্বায়ত্ত্বশাসন দাবী করা। সুলতান দাবী পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানালে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বলকান লীগ সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস ও মন্টিনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৮ই অক্টোবর প্রথম বলকান যুদ্ধ শুরু হয় একতরফাভাবে মন্টিনিগ্রোর যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে। ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত টের পেয়ে তুর্কী সুলতান পূর্বেই থ্রেসে সৈন্য সমাবেশ করেন। কয়েকটি খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ বাঁধে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিজয় সাফল্যে খ্রিস্টান বাহিনী উৎসাহিত হয়। ক্রমশঃ ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে বলকান উপদ্বীপের লীগ অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ গ্রীক, বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। খণ্ডযুদ্ধে সাফল্য লাভ করে বলকান রাষ্ট্রসংঘ তুর্কী সুলতানের নিকট স্বায়ত্তশাসন ও শাসন সংস্কার সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর চাপ সৃষ্টি করে। সুলতান দাবী দাওয়া প্রদানে অস্বীকার করলে বলকান লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সুলতান পঞ্চম মুহম্মদের শাসনামলে সংঘটিত

www.pathagar.com

প্রথম বলকান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুলতান উপদ্বীপের বিদ্রোহী রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে মাত্র চার লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। অপরদিকে বলকান লীগের সৈন্যসংখ্যা ছিল সাত লক্ষ। কাজেই তুরস্কের সামরিক বিপর্যয় ছিল অবধারিত। অতি সহজেই সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর সেনাবাহিনী নবী বাজার দখল করে। মূল মন্টিনিগ্রো বাহিনী প্ল্যাভা ইজেক ও গুসিঞ্জ জেলা অধিকার করে স্কুটারি অবরোধ করে। সার্বিয়ার যুবরাজ আলেকজান্ডার দু'দিন যুদ্ধ করে কুমানোভোতে জেরিক পাশাকে পরাজিত করেন। ৩১শে অক্টোবর রাজা পিটার সার্বিয়ার প্রাচীন রাজধানী উসকুভেতে প্রবেশ করেন। ১৮ই নভেম্বর তুর্কী বাহিনীর মনাস্তিরে হেরে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ১০,০০০ সৈন্য খ্রিস্টানদের হাতে বন্দী হয়। এদিকে একদল সার্ব সৈন্য আলবেনিয়ার পর্বতমালা অতিক্রম করে সমুদ্র বন্দর দখল করে। উত্তর বলকানের মত দক্ষিণাঞ্চলে তুর্কী বাহিনীও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ২২শে অক্টোবর হাসান পাশা সাবান্দোপরাস গ্রীস যুবরাজ কনস্টান্টিনের নিকট পরাজয় বরণ করেন। গ্রীক ক্রীট, স্যালোনিকা ও মেসিডোনিয়া দখল করে। গ্রীক নৌ বহরের প্রতিবন্ধকতার তুর্কী নৌবাহিনী বলকানে অভিযান করতে পারেনি।

উপর্যুপরি তুর্কী বিপর্যয়ে বলকান রাষ্ট্রসংঘ নতুন উদ্দীপনা ও প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধাভিযান পরিচালিত করতে থাকে। সর্বাধিক আক্রমণ পরিচালিত করে বুলগারগণ। তুর্কী বাহিনী ১,৮০,০০০ সৈন্য সমাবেশ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেও বিশাল ও সুশৃঙ্খল বুলগার বাহিনীর প্রচণ্ড এবং সংঘবদ্ধ আক্রমণে তুর্কী বাহিনী বিধ্বস্ত হতে থাকে। পোপোড, সাভাড, বাদকো, মিটিভ নামীয় সুদক্ষ বুরগার সেনাপতিগণ বুলগেরিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে গুরুত্বপূর্ণ মোস্তফা পাশা রেলপথ অধিকার করেন। চার দিন যুদ্ধ চলার পর নাজিম পাশার অধিনায়কত্বে তুর্কী বাহিনী ভিসা ও লুলি দ্বারা পরিচালিত বুলগার বাহিনী কর্তৃক পর্যুদস্ত হয়। বুলগারদের সঙ্গে যুদ্ধে তুর্কী সামরিক বাহিনী বিধ্বস্ত হয় এবং সামরিক দিক থেকে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হলে তুর্কী সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। মুসলিম নিধন যজ্ঞও শুরু হয় এবং বুলগারগণ থ্রেসে আগমন করে। ক্রমশঃ বুলগারগণ গুরুত্বপূর্ণ চাতালজা সীমান্তরেখায় উপনীত হয়। ক্রমশঃ থ্রেস ও এপিরাস থেকে তুর্কী বাহিনী বিতাড়িত হয় এবং ইউরোপীয় তুরস্কের সমগ্র অঞ্চল বলকান লীগের অধীনস্ত হয়। এভাবে বুলগারগণ কনস্টানটিনোপলের মাত্র ২৫ মাইলের মধ্যে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়। চাতালজার প্রাচীর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কৃষ্ণসাগর থেকে মার্মোরা সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর কনস্টাটিনোপলের সীমান্ত রক্ষাকারী প্রাচীর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রথম বলকান যুদ্ধে তুর্কী বাহিনীর পরাজয় বরণ করে। এই পরাজয় তুর্কী সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের উপর ছিল হুমকী স্বরূপ। এই বিপর্যয় সম্বন্ধে ক্রফোর্ড প্রাইস বলেন, "জগতের সামরিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী পৃষ্ঠাগুলি এই যুদ্ধপ্রিয় জাতির বীরত্বকাহিনীতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এরা যে ঘৃণিত সার্ব ও বুলগারদেরকে এভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারে, এমন অধঃপতন অনেকটা অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। গ্রীকরা এই যুদ্ধে ব্যবস্থা রণনৈপুণ্য, এমনকি ব্যক্তিগত সাহসেও তুর্কীদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়।"

www.pathagar.com

লণ্ডন বৈঠক, ১৯১২-১৩ ঃ প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসানে বলকান উপদ্বীপ তুরস্কের হাতছাড়া হয়ে যায়। এমন কি এড্রিয়ানোপল, জেনিনা ও স্কুটারীও বলকান লীগের আওতায় চলে যায়। যাহোক, বলকান জটিলতা নিরসনের জন্য বিবদমান পাঁচটি জাতির প্রতিনিধিগণ ১৮১২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর লণ্ডনে এক বৈঠকে মিলিত হয়। স্যার এডওয়ার্ড গ্রের সভাপতিত্বে প্রধান শক্তিবর্গের দূতদের এক পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূলতঃ ইউরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ সমাপ্ত হয় এবং লণ্ডনের বৈঠকের শর্তানুযায়ী তুরস্ক এড্রিয়ানোপল বা ইস্তাম্বুল ব্যতীত ইউরোপের সমস্ত অঞ্চল থেকে বঞ্চিত হয়। ১৯১৩ সালের ৩০শে মে লণ্ডন বৈঠক (London Conference) এ সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. বুলগেরিয়া কর্তৃক অধিকৃত (১৯১৩, ২৬শে মার্চ) এড্রিয়ানোপল তুরস্ককে ছেড়ে দিতে হবে। এর ফলে ইস্তাম্বুল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে থাকবে।
২. এজিয়ান সাগরের ইনস থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত উত্তর দক্ষিণে একটি সীমান্ত রেখা টানা হবে এবং পূর্বের এই তুরস্কের দখলকৃত অঞ্চল রাষ্ট্রসংঘ লাভ করবে।
৩. আলবেনিয়া তুরস্কের অধীনে থাকবে এবং এর ভবিষ্যৎ শক্তিবর্গ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। মূলত, আলবেনিয়ায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কায়েম হয়।
৪. গ্রীস ক্রীট, স্যালোনিকা ও দক্ষিণ মেসিডোনিয়া লাভ করবে।
৫. বুলগেরিয়া থ্রেস ও এজিয়ান উপকূলের কিয়দংশ লাভ করবে।

এই আঞ্চলিক বিভাগের ফলে বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায় এবং কেবলমাত্র ইস্তাম্বুল ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি তুরস্ক সুলতানের অধিকারে থাকে।

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ, ১৯১৩

লন্ডন বৈঠকের মাধ্যমে প্রথম বলকান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলেও বলকান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। তুরস্কের হৃত অঞ্চলসমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করে বলকান সংঘর্ষের রাষ্ট্রসমূহ ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বিরোধের সম্মুখীন হয়। বুলগেরিয়া, গ্রীস, সার্বিয়া ও রুমানিয়া আঞ্চলিক বন্টনকে কেন্দ্র করে কোন্দল ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আলবেনিয়া স্বাধীনতা লাভ করে অস্ট্রিয়া ও ইতালির চাপে। স্বাধীন আলবেনিয়া সৃষ্টির ফলে সার্বিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যাহত হয়। কারণ ভূমিবেষ্টিত সার্বিয়ার আড্রিয়াটিক সাগরের কূলে যাবার কোন পথ ছিল না। সার্বিয়া এই কারণে আলবেনিয়ার কিয়দংশ দখল করার প্রয়াস পায়। অপরদিকে বৃহৎ সার্বিয়া গঠন এবং প্যান-শ্লাভ আন্দোলনে বিচলিত হয়ে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সার্বিয়ার সম্প্রসারণ নীতিতে বাধা প্রদান করে এবং সার্বিয়ার অখণ্ডত্ব বজায়ের চেষ্টা করে। রাশিয়ার সহায়তায় সার্বিয়া অস্ট্রিয়ার এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার প্রয়াস পায়। মুলতঃ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও সার্বিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ নিহিত ছিল। সার্বিয়া আড্রিয়াটিক সাগর তীরে একটি বন্দর দখল করার চেষ্টা করলে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালি বাধা প্রদান করে। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের মূলে প্রধান কারণ ছিল অস্ট্রিয়া এবং

www.pathagar.com

জার্মানির সহায়তায় সার্বিয়ায় বুলগেরিয়ার সমুদ্রপথ লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। যার ফলে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ শুরু হয়। মহাজনের ভাষায়, "It was Bulgars, whose war party had lost all sense of proportion, all sense of the rights of her former allies that began new struggle." বুলগেরিয়া ১৯১৩ সালের জুন মাসে গ্রীস এবং সার্বিয়া আক্রমণ করে। রুমানিয়া বুলগেরিয়ার উক্ত-পূর্বাঞ্চলের এক খণ্ড অঞ্চল দাবী করে কিন্তু বুলগেরিয়া এই দাবী অস্বীকার করলে রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ মাত্র কয়েকদিন স্থায়ী হয়। এই যুদ্ধের সুযোগে তুরস্ক হৃত রাজ্য উদ্ধারের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। বুলগেরিয়া মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর নিকট পরাজিত হয়।

বুখারেষ্টের চুক্তি, ১৯১৩ ঃ আগ্রাসনের নীতি অবলম্বন করে বুলগেরিয়া যুদ্ধে পরাস্তই হল না তাকে চতুর্দিক থেকে শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত হলে অপমানকর সন্ধি শর্তের সম্মুখীন হতে হল। একাদিক্রমে বুলগেরিয়াকে পাঁচটি বলকান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় গ্রীস, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, তুরস্ক, রুমানিয়া। এমতাবস্থায় ১৯১৩ সালের ১০ই আগস্ট বুলগেরিয়া চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হয়। এই চুক্তির শর্তাবলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. গ্রীস বুলগেরিয়া অধিকৃত অঞ্চল মেসিডোনিয়ার কিয়দংশ লাভ করবে। এছাড়া ক্রীট, সেমস ও অন্যান্য দ্বীপ ব্যতীত সেরেস ও বলকান উপদ্বীপের আর্থিক কেন্দ্র কাভানা ও স্যালোনকা বন্দর পায়।

২. রুমানিয়া বুলগেরিয়ার নিকট থেকে সিলিষ্ট্রিয়া ও দাব্রিজ জেলা ফিরে পায়।

৩. লন্ডন বৈঠকের শর্তানুযায়ী বুলগেরিয়া যে অঞ্চল লাভ করে বুখারেষ্টের চুক্তি মোতাবেক তা হস্তচ্যুত হয়। অবশ্য বুলগেরিয়া থ্রেসের একাংশ, মেসিডোনিয়ার একটি ক্ষুদ্রাংশ ও ডিডিআগাজ বন্দরসহ ইজিয়ান সাগর তটের কিছু সংকীর্ণ ভূখণ্ড লাভ করে।

৪. সার্বিয়া নবী বাজার সঞ্জকের একাংশ এবং উত্তর ও মধ্য মেসিডোনিয়া প্রাপ্ত হল।

৫. আলবেনিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

৬. মেসিডোনিয়া খ্রিস্টানদের দখলে চলে গেলে শত সহস্র মুসলমান কৃষক দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

৭. শক্তিপুঞ্জ আর্মেনিয়ার খ্রিস্টানদের জন্য প্রচুর সংস্কার আদায় করলেন। বৈদেশিক কর্মচারীদের অধীনে সেখানে একটি বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত দেশীয় শান্তিবাহিনী গড়ে ওঠে।

৮. বুলগেরিয়া ও তুরস্কের মধ্য কনস্টানটিনোপলের (সেপ্টেম্বর ২৯) একটি এবং গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে এথেন্সে আর একটি পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে যোগ দিয়ে তুরস্ক বিশেষ সুবিধা লাভ করে। ডেমেটিকা, কার্কে কিলিস ও আড্রিয়ানোপল তুরস্কের দখল আসে।

www.pathagar.com

বলকান যুদ্ধের ফলাফল ঃ পরপর দুটি বলকান যুদ্ধের ফলাফল বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, একই ঘটনা বলকান উপদ্বীপেই নয় বরং সমগ্র ইউরোপীয় রাজনৈতিক সঙ্কটজনক করে তোলে। এই যুদ্ধে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তুরস্ক। ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে–

১. তুরস্ক সাম্রাজ্য বলকান যুদ্ধের অবসানে এবং লণ্ডন ও বুখারেষ্ট চুক্তির শর্তানুযায়ী আড্রিয়ানোপল এবং ইস্তাম্বুলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। এতদিন ইউরোপে তুর্কী (Turkey in Europe) নামে যে তুর্কী অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল তা থেকে সুলতান বঞ্চিত হলেন। যুদ্ধের পূর্বে ইউরোপে তুরস্কের লোকসংখ্যা ছিল ৬১,৩০,২০০ এবং তুরস্ক অধিকৃত অঞ্চলের পরিমাপ ছিল ৬৫,৩৫০ বর্গমাইল। যুদ্ধের অবসানে তুরস্ক অধিকৃত সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়াল ৪২,৩৯,২০০। ফলে অবশিষ্ট জনসংখ্যা রইল ১,৭১,০০০। অধিকৃত অঞ্চল হারানোর ফলে ইউরোপীয় ভূখন্ডে তুরস্কের অধিকৃত এলাকা দাঁড়াল মাত্র ৮৮২ বর্গমাইলে অর্থাৎ আড্রিয়ানোপল (ইস্তাম্বুল সহ) ছাড়া ইউরোপীয় ভূখণ্ডে তুরস্কের কোন আধিপত্য থাকল না। এভাবেই ইউরোপে দোর্দণ্ডপ্রতাপ অটমান সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

২. এই যুদ্ধের ফলে সর্বাধিক লাভবান হয় গ্রীস। অধিকৃত অঞ্চল লাভ করে গ্রীসের জনসংখ্যা ২৬,৬৬,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৩,৬৩,০০০ তে। অধিকৃত অঞ্চলের পরিমাপ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,০১৪ বর্গমাইল থেকে দাঁড়ায় ৪১,৯৩৩-তে।

৩. অনুরূপভাবে সার্বিয়ার জনসংখ্যা ও অধিকৃত অঞ্চলের পরিমাপও বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা ৩০,০০,০০০ থেকে ৪০,৫০,০০০ তে দাঁড়াল এবং এলাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ১৮,৬৫০ থেকে ৩৩,৮৯১ বর্গমাইলে।

৪. রুমানিয়াও বলকান যুদ্ধে লাভবান হয়। তার জনসংখ্যা ২,৮৬,০০০-তে বৃদ্ধি পায় এবং বুলগেরিয়ার নিকট থেকে ২,৬৮৭ বর্গমাইল অঞ্চল লাভ করে।

৫. মন্টিনিগ্রোর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ২,৫০,০০০ থেকে ৪,৮০,০০০ এবং তার এলাকা ৩,৪৭৪ থেকে ৫,৬০৩ বর্গমাইলে পৌঁছাল।

৬. সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হল বুলগেরিয়া। কারণ বুখারেষ্ট চুক্তির শর্তাবলী ছিল বুলগেরিয়ার স্বার্থবিরোধী। বুলগেরিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল মাত্র ১,২৫,৪৯০ এবং এলাকা লাভ করে ৯,৬৬৩ বর্গমাইল। ফলে বুলগেরিয়া এই যুদ্ধের গ্লানি মুছতে পারেনি।

৭. আলবেনিয়া দখল এবং বসনিয়া-হারজেগোভিনার সার্ফদের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়া পরবর্তী পর্যায়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

৮. বলকান সঙ্কট অস্ট্রিয়া-রুশ শত্রুতাকে সুদূরপ্রসারী করে। অস্ট্রিয়া জার্মানীর সমর্থনে ও সহায়তায় গ্রীক ও সার্ফদের স্বার্থের পরিপন্থী সম্প্রসারণ নীতিকে সুদৃঢ় করে এবং স্যালোনিকা দখলের প্রচেষ্টা চালায়। অপরদিকে রুশ সমর্থনে প্যান-শ্লাভ আন্দোলন সার্ভিয়া, মন্টিনিগ্রো এবং বুলগেরিয়ার সার্ফ অধ্যুষিত অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়।

৯. বলকান যুদ্ধ ইঙ্গ-জার্মানী বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে জটিলতর করে।

www.pathagar.com

১০. বলকান পরিস্থিতিতে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে, ত্রি-শক্তির (Triple Alliance) স্বাক্ষরদানকারী জার্মানী, ইতালি ও অস্ট্রিয়া প্রতিপক্ষ ত্রি-শক্তি আঁতাত (Triple Entente) এর স্বাক্ষরদানকারী ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রথম মহাসমরে অবতীর্ণ হয়। এই কারণেই বলা হয়েছে যে, বলকান জটিলতা থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। আস্ট্রো-জার্মান শিবির বুলগেরিয়াকে সমর্থন করায় সমস্যা ভয়াবহ্ আকার ধারণ করে। অস্ট্রিয়ার সাথে সার্বিয়ার বিরোধ এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। অস্ট্রিয়ার অধীনস্থ্ সার্ফদের স্বাধীনতা লাভের জন্য সার্বিয়া একটি সন্ত্রাসবাদী গোপন সমিতি গঠন করে। এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর একজন সদস্য অস্ট্রিয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চ ডিউক ফ্রান্সিস ফাণ্ডিন্যাণ্ড তার স্ত্রীসহ্ বসনিয়ার রাজধানী সেরায়েভো আগমন করলে আর্চ ডিউক ও তার পত্নীকে গুলি করে হত্যা করা হয় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জুন। সার্বিয়াকে দায়ী করে অস্ট্রিয়া চরমপত্র প্রেরণ করে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জবাব দাবী করে। কিন্তু সার্বিয়ার উত্তরে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ২৮শে জুলাই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা হয়।

Grant and Temperly বলেন, "No single event influenced the outbreak of War in 1914 more than the Balkan War of 1912-13".

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম মহাসমর ও তুরস্কের অবস্থান

পটপ্রেক্ষিত ঃ পৃথিবীর প্রথম মহাসমর একটি যুগসন্ধিক্ষণকারী ঘটনা। ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ যুগ বলে অভিহিত করা হয়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ ব্যতীত অপর কোন যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসকে কলুষিত করেনি। আপাতঃ দৃষ্টিতে শান্তি বজায় থাকলেও ইউরোপীয় দেশগুলি ক্রমশঃ স্বার্থবিরোধী এবং আত্মঘাতী সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এই কারণে এই যুগকে বলা হয় "শান্তির অন্তরালে সামরিক প্রস্তুতির যুগ" (Age of Armed Peace) 'শান্তির আড়ালে ক্ষতিগ্রস্ত জাতিগুলি স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস পায়। বৃহৎ শক্তিবর্গ মিত্ররাষ্ট্রের পোষণ দ্বারা রাজনৈতিক, সামরিক ও আর্থিক সুযোগ লাভের চেষ্টা করে এবং সমরাস্ত্রে সজ্জিত হতে থাকে। পরস্পর সন্দেহ, ভীতি, দ্বন্দ্ব ও স্বার্থান্বেষী তৎপরতার ফলে ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ দুটি পৃথক রাষ্ট্র-জোট (Grouping of powers)-এর বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯০৫ হতে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপীয় ভূখণ্ডে পর পর কয়েকটি সঙ্কটের উদ্ভব হয় এবং এর ফলে প্রথম মহাসমর ত্বরান্বিত হয়।

সমরের কারণ ঃ প্রথম মহাসমর বিভিন্ন কারণে সংঘটিত হয় এবং এই কারণগুলি বিভিন্নমুখী-সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক অসন্তোষ ও দ্বন্দ্ব হতে উদ্ভূত।

১. **জাতীয়তাবাদী নীতি ঃ** ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম অবদান ছিল জাতীয়তাবাদ। এই নীতি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেসে উপেক্ষিত হলেও পরবর্তীকালে ১৮৪৮ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে ইতালি, জার্মানি, গ্রীস, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু ১৮৭১ হতে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ পরাধীনতার গ্লানি মোচনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে থাকে। মেসিডোনিয়ায় বুলগার ও গ্রীকগণ তুরস্কের আধিপত্য খর্ব করবার প্রচেষ্টা চালায়। চেক, সার্ব এবং ক্রোট (Croats) অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর দ্বৈত চুক্তির (Dual Alliance) বিরোধিতা করে। কারণ এটা তাদের জাতীয়তাবাদী স্পৃহায় কুঠারাঘাত স্বরূপ ছিল। বহির্বিশ্বে ইউরোপের সম্প্রসারণ এবং উপনিবেশ স্থাপনে বৃহৎ শক্তিবর্গ অসীম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং এর ফলে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়।

আলসেস লরেন ঃ ফ্রান্স জার্মানী সংঘাত ঃ সিডান যুদ্ধের পর জার্মানী ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের নিকট হতে আলসেস-লরেন বলপূর্বক দখল করে। নিরাপত্তার জন্য ও অধিকাংশ অধিবাসী জার্মান থাকায় এই অঞ্চল জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়; কিন্তু এই দুই স্থানের জনসাধারণ বহুদিন ফরাসী শাসনাধীনে থাকায় নিজেদের ফরাসী জাতিভুক্ত বলে মনে করত। এর ফলে ফ্রান্স এবং জার্মানীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত আরম্ভ হল।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক কারণও ছিল প্রকট। কারণ, ফরাসীবাসী লরেনের বিখ্যাত লৌহখনিগুলি হাতছাড়া করতে প্রস্তুত ছিল না।

ট্রেনটিনো ও ট্রিয়েস্ট ঃ ইতালি-অস্ট্রিয়া সংঘাত ঃ ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় সত্য; কিন্তু ট্রেনটিনো (Trentino) এবং ট্রিয়েস্ট (Trieste) অঞ্চল তখনও ইতালির বহির্ভূত ছিল। ইতালির অধিবাসীর সংখ্যা এই অঞ্চলে সর্বাধক থাকা সত্ত্বেও এটি অস্ট্রিয়ার শাসনে ছিল। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারা ইতালি এই দুটি স্থান দখলেও বদ্ধপরিকর ছিল। তারা এই অঞ্চলকে বলত Italia Irredenta (Unredeemed Italy)। এ ছাড়া আড্রিয়াটিক সাগরের দখল নিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ইতালির সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়।

বসনিয়া ও হারজেগোভিনা

১. অস্ট্রিয়া-সার্বিয়া সংঘাত ঃ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত বার্লিন চুক্তি দ্বারা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী শ্লাভ অধ্যুষিত দুটি বলকান প্রদেশ বসনিয়া ও হারজেগোভিনার উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। এর ফলে দুই অঞ্চলের অধিবাসিগণ অস্ট্রিয়ার আধিপত্য খর্ব করে সার্বিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির দাবী জানায় এবং অস্ট্রিয়া-সার্বিয়া সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। বলকান উপদ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্পৃহা প্রকট আকার ধারণ করে এবং এর ফলেই প্যান-শ্লাভিজম এর উৎপত্তি হয়। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য গঠন জাতীয়তাবাদী মতবাদের প্রতি কুঠারাঘাতস্বরূপ ছিল। পোল, চেকোশ্লোভাক, রুমানীয় রাজ্য সম্রাট যোসেফ ফ্রান্সিসের জনপ্রিয়তার জন্য টিকে থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পরও জাতীয়তাবাদের স্পৃহা সুদূরপ্রসারী হয়। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রথম মহাসমরের মূলে ছিল বলকান দ্বীপের সমস্যাবলী।

২. অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য। বহির্বিশ্বে ইউরোপের সম্প্রসারণ এবং উপনিবেশ স্থাপনের তীব্র প্রতিযোগিতা বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও স্বার্থ সংঘাতের সূত্রপাত করে। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে এশিয়া ও অস্ট্রিয়ায় পণ্যের বাজার সৃষ্টি, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং অর্থনৈতিক লেনদেন করবার প্রয়াস পায়। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী রাশিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করে। বৃটেন অধিকৃত অঞ্চল জার্মানী দখল করবার চেষ্টা করলে উভয় দেশের মধ্যে স্বার্থ সংঘাত দেখা দেয়। এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাই প্রথম মহাযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

৩. উগ্র জাতীয়তাবোধ ঃ অর্থনৈতিক সাফল্য এবং রাজনৈতিক সম্প্রসারণ নীতির ফলে ইউরোপীয় বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জার্মানীতে এই ধরনের উগ্র জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পায়। অসাধারণ কূটনৈতিক শঠতা এবং রাজনৈতিক দক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বিসমার্ক জার্মানীকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। জার্মান ঐতিহাসিক হেনরিক ফনট্রিটস্কি (Heinrick Von Treitschke) এবং

www.pathagar.com

হাউস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন (Houston Stewart Chamberlain), জেনারেল ফ্রেডারিক ফন বার্নহার্ড (Freidrich Von Bernhard) প্রমুখ জার্মান মনীষী জার্মান উগ্র জাতীয়তাবোধে ইন্ধন যোগান। জার্মান পিতৃভূমি (Vaterland) সকল দেশের শ্রেষ্ঠ জার্মানদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীকালে এটি সমরতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে।

৪. **সমরতন্ত্র ঃ** অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ হতে উদ্ভূত সমরতন্ত্রের আবির্ভাবে বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হয়। উগ্র জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিক সমঝোতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি; বরং এর প্রভাব সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমরকালকে "শান্তির অন্তরালে সামরিক প্রস্তুতির যুগ" (Age of Armed Peace) বলা হয়। কারণ, এই সময়ে প্রত্যেক বৃহৎ শক্তি সমরাস্ত্রে সজ্জিত হতে থাকে। জার্মান জাতির উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ সমরতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করে এবং এর ফলে অপরাপর ইউরোপীয় শক্তি সমরের প্রস্তুতি ও সমরাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। বিসমার্কের সৃষ্টি নতুন জার্মান সাম্রাজ্য কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের রাজত্বে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। কাইজার বিসমার্কের নীতির পরিবর্তন করেন। তিনি স্বীকার করতেন না যে, জার্মানী একটি 'পরিতৃপ্ত জাতি' (Satiated Nation) এবং মধ্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ, যেমন–জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বলকান, রাষ্ট্রসমূহ ও তুরস্ক নিয়ে একটি মধ্য-ইউরোপীয় রাষ্ট্র সংঘ (Mittel Europe) গঠনের পরিকল্পনা করেন। তার বিশ্ব রাজনীতি (Welt Politik), বিশ্ব জার্মানবাদ (Pan-Germanism) এবং সমরতন্ত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল। বিসমার্কের সাবধানি নীতি পরিত্যাগ করে কাইজার জার্মানীকে তথা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলেন। জার্মান চিন্তাবিদদের লেখনী উগ্র সমরতন্ত্রে ইন্ধন জোগায় এবং জার্মানীকে স্থল ও নৌবাহিনী গঠনে উৎসাহ প্রদান করে। জার্মানদের ভাষায় যুদ্ধ "কেবলমাত্র জৈবিক আইনই নয়, বরং একটি নৈতিক দায়িত্ব" (Not only a biological law, but a moral obligation) ছিল। বিশ্ব সাম্রাজ্য (Welt Politik) স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর কাইজার আন্তর্জাতিক সঙ্কটকে ত্বরান্বিত করেন। জার্মানীকে একটি নৌ-শক্তিতে পরিণত করলে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

৫. **মৈত্রী নীতি ঃ দ্বি-শক্তি চুক্তি ঃ** মৈত্রী নীতি জার্মান চ্যান্সেলার বিসমার্কের মস্তিষ্কপ্রসূত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিশ্ব শতাব্দীর প্রারম্ভে অনুসৃত এবং মৈত্রী নীতি ইউরোপীয় শক্তিসমূহকে পরস্পর বিরোধী সংঘাতমূলক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত করে। ১৮৭১ থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপীয় রাজনীতিতে জার্মানী একাধিপত্য বিস্তার করলে সক্ষম হয়। ফ্রান্সকে ইউরোপীয় রাজনীতি হতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিসমার্ক সর্বপ্রথম ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রি-সম্রাটের মৈত্রী চুক্তিতে (Three Emperor's League on Drei-Kaiser Bund) জার্মানী, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়াকে আবদ্ধ করেন। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের পর সম্পাদিত বার্লিন চুক্তির (১৮৭৮ খ্রিঃ)

www.pathagar.com

ফলে রাশিয়ার সাথে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার শত্রুতা আরম্ভ হয় এবং রাশিয়া ত্রি-সম্রাটের মৈত্রী চুক্তি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বলকান উপদ্বীপের সমস্যাকে কেন্দ্র করে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সঙ্গে রাশিয়ার সংঘাত শুরু হয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিরোধিতায় জার্মানী অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বি-শক্তি চুক্তি (Dual Alliance) উপাদন করে। প্রতিরক্ষামূলক এই চুক্তি বিসমার্কের কূটনীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং এটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবার পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। গুচের মতে, "উচ্চমার্গের রাজনীতিতে বার্লিন চুক্তির অভূতপূর্ব ফলাফল ছিল জার্মানী থেকে রাশিয়ার বিচ্ছিন্নতা।" রাশিয়ার অসন্তুষ্টির মূলে ছিল বলকানে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তারে অস্ট্রিয়ার বিরোধিতা, বিসমার্কের বৈরীভাব এবং ইংল্যাণ্ডের অস্ট্রিয়াকে সমর্থন প্রভৃতি। এর ফলে অস্ট্রো-জার্মান দ্বি-শক্তির চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফে (Fay) বলেন, "অস্ট্রো-জার্মানী মৈত্রী চুক্তি মধ্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলিকে একত্রীভূত করে এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে এর অবসানের পূর্ব পর্যন্ত এটি জার্মান নীতির মূল ভিত্তি ছিল।" (The Austro-German Alliance consolidated the central empires and became henceforth until their collapse in November 1918, the very foundation-rock of German policy.)

ত্রি-শক্তি চুক্তি ঃ বিসমার্ক জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে ইতালিকে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রো-জার্মান মৈত্রী-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করলে দ্বি-শক্তির চুক্তি ত্রি-শক্তির চুক্তিতে (Triple Alliance) রূপান্তরিত হয়। আলসেস্ লরেন হতে দৃষ্টি এড়িয়ে উত্তর আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে বিসমার্ক ফ্রান্সকে উৎসাহ প্রদান করতে থাকেন। কারণ তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকার ফরাসী অভিযান ইতালির স্বার্থে আঘাত হানা এবং এর ফলে ইতালির দ্বি-শক্তির মৈত্রী জোটে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স তিউনিসিয়া দখল করলে ইতালি প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণ করে অস্ট্রো-জার্মান চুক্তিতে যোগদান করে। এর ফলে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে দ্বি-শক্তির চুক্তি ত্রি-শক্তিতে (Triple Alliance) পরিণত হয়। রাশিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্পাদিত এই প্রতিরক্ষামূলক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করলে ইতালি এবং ইতালি ফ্রান্স কর্তৃক আক্রান্ত হলে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাহায্য করবে। ফ্রান্স ও রাশিয়া যৌথভাবে আক্রমণ করলে চুক্তি স্বাক্ষরদাতাদের একজন অপরজনকে সাহায্য দান করবে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ত্রি-শক্তির চুক্তি বলবৎ ছিল। কিন্তু ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ইতালি এ থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করায় এই চুক্তি ভেঙ্গে যায়।

রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি ঃ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন-কংগ্রেসের পর 'ত্রি-সম্রাটের মৈত্রী-চুক্তির অবসান হলে বিসমার্ক ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করার অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। ফ্রান্স যাতে রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারে এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ না করে সেজন্য তিনি রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন। ১৮৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দে বুলগেরিয়ার সঙ্কটে রুশ-জার্মানী মৈত্রী পুনর্জীবিত করা সম্ভব হয় এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিসমার্ক রাশিয়ার সঙ্গে 'রি-ইনসিওরেন্স

www.pathagar.com

চুক্তি' (Re-Insurance Treaty) সম্পাদন করেন। রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এর ফলে বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে জার্মানী রাশিয়ার নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করবে এরূপ মনে করা হল। বলা হয়ে থাকে যে, রুশ-জার্মানবন্ধুত্ব অস্ট্রো-রুশ যুদ্ধ এবং ফ্রাঙ্কো-রুশ মৈত্রী চুক্তির পরিপন্থী ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ফ্রাঙ্কো-রুশ মৈত্রী স্থাপনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেনি। রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি ১৮৮৭ হতে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র চার বছর বলবৎ ছিল।

কূটনৈতিক দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও বিসমার্ক অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সঙ্গে একই সঙ্গে শান্তি রক্ষা করতে সক্ষম হননি। তিনি ফ্রান্সকে ইউরোপ হতে বিচ্ছিন্ন করতে প্রয়াস পান; কিন্তু প্রকৃত অর্থে ফ্রান্সকে কূটনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি। বিসমার্কের পদত্যাগের পর জার্মান সম্রাট রি-ইনসিওরেন্স চুক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি। অপরদিকে বুলগার সঙ্কট রাশিয়াকে ক্রমশঃ ফ্রান্সের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে। ইতালি ও প্রুশিয়া হতে বিতাড়িত হয়ে অস্ট্রিয়া ইজিয়ান সাগরে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা করে; ট্রিয়েস্ট ও ট্রিনটিনোকে উপলক্ষ করে ইতালির সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সমস্ত সঙ্কট এবং সংঘর্ষের ফলে 'ত্রি-শক্তির চুক্তিতে' ভাঙ্গন ধরলেও ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে এটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। কারণ এই সমস্ত রাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার ত্রি-শক্তি আঁতাত (Triple Entente) নামে একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনে জার্মানী শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

বিকল্প মৈত্রী চুক্তি ঃ

দ্বি-শক্তির চুক্তি ঃ "ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মৈত্রী চুক্তি এবং বিকল্প মৈত্রী-চুক্তির ভীতি ও সন্দেহের ফলে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।" (Fear and suspision of alliances and counter-alliances of European power caused the World War of 1914) ত্রি-শক্তি চুক্তি' ফলে পশ্চিমে ফ্রান্স এবং পূর্ব রাশিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মধ্য-ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মৈত্রী জোটে শঙ্কিত হয়ে স্বভাবত ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রতিরক্ষামূলক চুক্তির দিকে ঝুকে পড়ে। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ামের সামরিক এবং বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ নীতি একদিকে জার্মানীকে প্রথম শ্রেণীর বিশ্ব-শক্তিতে পরিণত করে এবং ত্রি-শক্তি মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদনে প্ররোচিত করে; অপরদিকে, জার্মানীর সম্প্রসারণবাদ এবং সমরাস্ত্র নীতি জার্মান-বিরোধী মৈত্রী চুক্তি স্থাপনে সহায়তা করেন। বিসমার্কের পতনের পর রাশিয়া রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি ভঙ্গ করে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হবার আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে জার্মান-বিচ্ছিন্নতাবাদ নীতির আওতা হতে নিষ্কৃতি পেয়ে ফ্রান্স ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তির সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং ত্রি-শক্তি মৈত্রী চুক্তির বিকল্প ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রুশ-ফ্রান্স দ্বি-শক্তির চুক্তি সম্পন্ন করে। দ্বি-শক্তি চুক্তি ইউরোপীয় শক্তির ভারসাম্য সাময়িকভাবে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। এটি জার্মানীর আক্রমণাত্মক স্পৃহাকে প্রশমিত করে।

www.pathagar.com

আঁতাত কর্ডিয়াল ঃ ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর ইংল্যান্ড বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি (Policy of Isolation) অনুসরণ করে। ফাসোদা ঘটনা ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করে। কিন্তু ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে থিওফাইল ডেলক্যাসি (Theophile Delcasse) নামে একজন জার্মান-বিরোধী ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হলে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সখ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ড জার্মানীর নৌ-শক্তি বৃদ্ধিতে এবং রুশ-ফ্রান্স দ্বি-শক্তি চুক্তি সম্পাদন শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের নিরাপত্তা ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার দরুন বিঘ্নিত হয়। বোয়ার যুদ্ধে ইংল্যান্ড ইউরোপ হতে বিচ্ছিন্ন থাকার অসুবিধা উপলব্ধি করে এবং জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে; কিন্তু জার্মানীর বৈরী মনোভাবে ইংল্যান্ড-জার্মান সখ্যতা স্থাপন সম্ভবপর হয়নি। বিচ্ছিন্ন অবস্থার নিরসনকল্পে ইংল্যান্ড সর্বপ্রথম একটি এশীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এর ফলে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপানী নৌ-বহর মিত্র শক্তির সাহায্যার্থে ব্যবহৃত হয়। জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক এবং নৌ-শক্তি বৃদ্ধির নীতিতে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ইংল্যান্ড ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে পড়ে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মানীর কীল খাল খনন সম্পন্ন হলে উত্তর সাগরের বাল্টিক উপসাগরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে জার্মানীর নৌবাহিনী আইন প্রণয়ন দ্বারা নৌ-শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রতি ছিল হুমকিস্বরূপ। অতঃপর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড আঁতাত কার্ডিয়াল-এ (Entente Cordiale) স্বাক্ষর দান করে। এটি ইঙ্গ-ফরাসী সংঘাত এবং শত্রুতার অবসান ঘটায়। এই মিত্রতা মোতাবেক ফ্রান্স মিশরে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃত্ব স্বীকার করে, অপরদিকে মরক্কোতে ফ্রান্সের আধিপত্য ইংল্যান্ড মেনে নিল। প্রকৃত অর্থে আঁতাত কার্ডিয়াল একটি চুক্তি ছিল না; বরং ইউরোপীয় দুটি প্রথম শ্রেণীর শক্তির দ্বারা মিত্রতা ও সখ্যতা স্থাপনে এটি সহায়ক ছিল। ১৯০৪-৫ খ্রিস্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ে ফ্রান্স রুশ-ফ্রান্স দ্বি-শক্তি চুক্তির পরিবর্তে ইংল্যান্ডের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এর ফলেই আঁতাত কার্ডিয়ালের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে ইউরোপীয় মিত্র গ্রহণের ব্যাকুলতায় ইংল্যান্ডে ফ্রান্সের সাথে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে এই আঁতাতে আবদ্ধ হয়। সামরিক চুক্তি না হলেও বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ঘটনাবলীর চাপে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স সংঘবদ্ধভাবে ত্রি-শক্তি চুক্তির বিরোধী একট সংঘ গঠন করে।

ত্রি-শক্তি আঁতাত ঃ ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত ইউরোপীয় কূটনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর প্রধান কারণ ছিল এই যে, পরবর্তীকালে রাশিয়া ইংল্যান্ডের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে মৈত্রী স্থাপনে ব্যগ্র হয়ে পড়ে। জাপানের নিকট পরাজয় রাশিয়াকে জাপানের মিত্র ইংল্যান্ডের প্রতি আকৃষ্ট করে। অপরদিকে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ডেলকেসি রুশ ইংল্যান্ড সখ্যতা স্থাপনের প্রচেষ্টা করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, ইঙ্গ-রুশ যুদ্ধ হলে ফ্রান্সের অবস্থা সঙ্কটময় হয়ে পড়বে কারন, একদিকে ফ্রান্স রাশিয়ার সহিত রুশ-ফ্রান্স দ্বি-শক্তি চুক্তি, অপরদিকে ইংল্যান্ডের সঙ্গে আঁতাত কর্ডিয়াল স্থাপন করে। মধ্যপ্রাচ্যে জার্মানীর সম্প্রসারণ নীতি, নৌবহর নির্মাণ, কীল খাল খনন এবং বার্লিন-

www.pathagar.com

বাগদাদ রেলপথ স্থাপনে ইংল্যান্ড রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী হয়ে পড়ে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন (Anglo-French Convention) স্থাপিত হলে ইংল্যান্ডের সঙ্গে রাশিয়ার সমস্ত বিরোধ মিটে যায়। ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের 'আঁতাত কর্ডিয়াল', ইংল্যান্ডের সঙ্গে রাশিয়ার ইঙ্গ-রুশ আঁতাত এবং রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের দ্বি-শক্তি চুক্তি' স্থাপন পক্ষান্তরে এই তিনটি জার্মান বিরোধী ইউরোপীয় শক্তিকে একতাবদ্ধ করে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রি-শক্তি আঁতাত (Triple Entente) নামে এক মৈত্রী স্থাপিত হয়ভোবে জার্মানীর উদ্যোগে সৃষ্ট জার্মান-অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও ইতালির ত্রি-শক্তি আঁতাত গঠিত হয়। এই মৈত্রী চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোন দেশে মৈত্রী চুক্তির আওতাভুক্ত অপর কোন রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে মিত্র রাষ্ট্র সামরিক সাহায্য দান করবে। এরূপে প্রথম মহাসমরের পূর্বে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শিবিরে ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলি বিভক্ত হয়ে পড়ে। সিমট বলেন, "১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে যে ত্রি-শক্তি চুক্তি এবং ত্রি-শক্তি আঁতাত পাশাপাশি অবস্থান করে, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তা মুখোমুখি অবস্থান করল।" (In 1907 the Triple Alliance and the Triple Entente had stood side by side; in 1914 they stood face to face.)

৬. গোপন কূটনীতি : ইউরোপ দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত হলে পরস্পর ঈর্ষা, সন্দেহ ও সংঘাত বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং এর ইন্ধন জোগাতে লাগল গোপন কূটনীতি। আন্তর্জাতিক আইন এবং নীতিমালা উপেক্ষা করে মিথ্যা প্রচারণা এবং উত্তেজনা বৃদ্ধি করে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবেশকে কলুষিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে সামরিক ও নৌবাহিনী সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের কেবিনেটকে এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টকে জ্ঞাত করান হয়নি। সন্দেহের ধূম্রজালে তখন ইউরোপ একটি বারুদের স্তূপের উপর অবস্থান করছিল।

৭. জনমত বিভ্রান্তি : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ জনমত বিভ্রান্তকারী, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অসাধু প্রচারযন্ত্র। অপর দেশের পরিস্থিতি বিকৃতভাবে প্রকাশ করে উগ্র জাতীয়তাবোধের উন্মেষ করে এক শ্রেণীর সংবাদপত্র। উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ পরিস্থিতিকে শুধু জটিলই করেনি, বরং যুদ্ধের উন্মাদনার সৃষ্টি করে। ইংল্যান্ড ও জার্মানীর ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতাকে এভাবে দুই দেশের সংবাদ পত্রগুলি সংকীর্ণ, স্বার্থপর জনমত ও মনোভাব স্ফীত করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবার ফলে দুই দেশের সম্পর্কের ক্রমশঃ অবনতি হতে থাকে এবং পরিশেষে তা তিক্ততায় পরিণত হয়।

৮. আন্তর্জাতিক সংকট : প্রথম মহাসমরের মূলে ছিল আন্তর্জাতিক সঙ্কট। ১৯০৭ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রি-শক্তি চুক্তির সঙ্গে ত্রি-শক্তি আঁতাতের সংঘর্ষ দেখা দেয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালির 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার 'ত্রি-শক্তি আঁতাত' অপেক্ষা শক্তিশালী। কিন্তু ইতালি 'ত্রি-শক্তি চুক্তি'র

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে পৃথকভাবে মৈত্রী স্থাপন করে। অপরদিকে মিত্রশক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক বজায় থাকে। এ ছাড়া একই চুক্তিতে আবদ্ধ ইতালি ও অস্ট্রিয়া বলকান সমস্যা ও আড্রিয়াটিকে সম্প্রসারণ, ট্রিয়েস্ট ও ট্রেনটিনো প্রভৃতিকে উপলক্ষ করে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এভাবে ত্রি-শক্তি চুক্তির কার্যকারিতা অবলুপ্ত হতে থাকে। ইতালি জার্মানির প্রতিও সন্তুষ্ট ছিল না; কারণ, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত আলজেসিরাস বৈঠকে ইতালি জার্মানির প্রতিও সন্তুষ্ট ছিল না; কারণ, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত আলজেসিরাস বৈঠকে ইতালি জার্মানির বিরুদ্ধে এবং ফ্রান্সের সমর্থনে ভোট দান করে। পরিশেষে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ইতালি ত্রি-শক্তি চুক্তি হতে বিচ্যুত হয়। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, মিত্রশক্তিবর্গ পারস্পরিক সংঘাত ও দ্বন্দ্বের নিরসন করে 'ত্রি-শক্তি আঁতাতকে' 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' অপেক্ষা শক্তিশালী করে। ইংল্যান্ড যুদ্ধের জন্য ও দেশরক্ষার্থে Expeditionary Force ও Territorial Army গঠন করে। একদিকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স, অপরদিকে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সামরিক ও নৌবাহিনীর কর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা মৈত্রী শক্তির একতা এবং সামরিক সমঝোতার সূচনা করে।

মরক্কো সঙ্কট ঃ কূটনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেসব সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তা থেকেই পরবর্তীকালে বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। আঁতাত কর্ডিয়াল অনুযায়ী ইংল্যান্ড কর্তৃক ফ্রান্সের মরক্কোয় আধিপত্য স্বীকৃত হলেও জার্মানী এর চরম বিরোধিতা করে। মরক্কোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের হস্তক্ষেপে ফ্রান্স বিচলিত হয়ে পড়ে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আলজেসিরাস কনভেনশনে (Convention of Algeciras) মরক্কো স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করে, কিন্তু জার্মানীর বিরোধিতা সত্ত্বেও ফ্রান্স মরক্কোয় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করবার অধিকার লাভ করে। মরক্কো সঙ্কটের ফলে একদিকে যেমন ইংল্যান্ড এবং জার্মানীর শত্রুতা বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে মৈত্রী শক্তি (ইংল্যান্ড, ফ্যান্স, রাশিয়া এবং পরবর্তীকালে ইতালি) একতাবদ্ধ হয়।

আগাদির সঙ্কট ঃ মরক্কোর সুলতান অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসনের জন্য ফরাসী বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফরাসী বাহিনীর মরক্কোয় উপস্থিতিতে জার্মানী বিচলিত হয়ে পড়ে এবং হেগ ট্রাইবুনালে (Hague Tribunal) আফ্রিকায় ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের বিচার দাবী করে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-জার্মান কনভেনশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ফ্রান্স মরক্কোয় অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ (Economic penetration) করতে পারবে। কিন্তু সুলতানকে সাহায্য করবার জন্য ফরাসী বাহিনীর মরক্কো আগমনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রকাশ পেলে জার্মানী আগাদির বন্দরে প্যান্থার (Panther) নামে একটি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করে। জার্মানী প্রতিবাদ করে বলে যে, ফ্রান্স আলজেরিয়াস কনভেনশন-এর শর্ত ভঙ্গ করেছে। বৃহৎ শক্তিবর্গ জার্মানীকে ফ্রাঙ্কো-জার্মান কনভেনশন মেনে নেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে এবং মরক্কো ফরাসী আশ্রিত রাজ্যে (Protectorate) পরিণত হয়। অবশ্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ জার্মানীকে কঙ্গোর কিয়দংশ প্রদান করা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এটি জার্মানীর পরাজয় বলা হয়ে থাকে, অপরদিকে আগাদির সঙ্কটের ফলে ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি সুসংঘবদ্ধ হয়।

www.pathagar.com

ত্রিপলি সঙ্কট : ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের একটি প্রদেশ ত্রিপলি ইতালি কর্তৃক অধিকৃত হলে ত্রিপলি সঙ্কটের সূত্রপাত হয়। তুরস্ক ইতালিকে ত্রিপলি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। ত্রিপলির যুদ্ধের ফলাফল ছিল বিবিধ– (ক) ইতালি জয়লাভ করলে তার পক্ষে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বপ্রসারণ করা সম্ভবপর হয়; (খ) জার্মান বাণিজ্যিক এলাকা ত্রিপলিতে ইতালির হস্তক্ষেপে ত্রি-শক্তি চুক্তিতে ভাঙ্গন দেখা দেয়, (গ) ত্রিপলি সঙ্কট, 'ত্রি-শক্তি আঁতাতকে জোরদার করে; (ঘ) এটি ইতালিকে মৈত্রী বাহিনীর দিকে আকৃষ্ট করে; (ঙ) ত্রিপলি যুদ্ধ ১৯১২-১৩ খ্রিস্টাব্দের বলকান যুদ্ধের সুচনা করে।

বলকান জটিলতা : বলকান জটিলতা থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রাচ্যদেশীয় সমস্যার ফলস্বরূপ অটমান সাম্রাজ্য ক্ষণি ও দুর্বল হয়ে পড়লে গ্রীস, সার্বিয়া, রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্টিত হয়। অপরদিকে বলকান অঞ্চলে তুর্কী অধীনতার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। মেসিডোনিয়া, পোল্যাণ্ড, বাল্টিক প্রদেশসমূহ, ক্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত বার্লিন চুক্তি অটমান সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে না পারলেও বলকান উপদ্বীপের জনসাধারণের মধ্যে প্যানশ্লাভ আন্দোলন জোরদার হয়। রাশিয়ার আক্রমণাত্মক নীতি প্রশমিত হয়নি। উপরন্তু, বলকান উপদ্বীপের রাজনীতিতে জার্মানীর আবির্ভাব পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। বুলগেরিয়া পূর্ব রুমানিয়ার সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রুমানিয়া রাষ্ট্র গঠন করে এবং সার্বিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বৃহৎ সার্বিয়া গঠনে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরর দ্বৈত রাজ্যের (Dual Monarchy) প্রতি হুমকিস্বরূপ ছিল এবং এটি অস্ট্রিয়ার এজিয়ান সাগরে সম্প্রসারণবাদের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রীস মেসিডোনিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এজিয়ান সাগরে আধিপত্য নিয়ে রাশিয়া এবং জার্মানীর মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। বলকান উপদ্বীপে ইতালির প্রধান লক্ষ্য ছিল ইতালিয়দের বাসভূমি ট্রিয়েস্ট এবং ট্রেনটিনো অস্ট্রিয়ার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া। দ্বিতীয় আবদুল হামিদের রাজত্বকালে আর্মেনীয়দের হত্যাকাণ্ড (Armenian massacre) তুরস্ক সরকারের স্বৈরাচারী নীতির আত্মপ্রকাশ মাত্র।

নব্য-তুর্কীদের আন্দোলন : বলকান জটিলতা যখন চরমে পৌঁছল তখন দ্বিতীয় আবদুল হামিদের রাজত্বকালে নব্য-তুর্কীদের আন্দোলন শুরু (Young Turks Movement) হয়। ১৯০৮-৯ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তরুণ-তুর্কীদের দ্বারা গঠিত একটি সংস্কারমূলক সংগঠন দর গঠিত হয়। জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত 'নব্য-তুর্কীদের আন্দোলন' তুর্কী সুলতানের নিকট সংবিধান এবং পার্লামেন্টের দাবী জানায়। সুলতান আবদুল হামিদ সংবিধান প্রণয়নে বাধ্য হন এবং একটি পার্লামেন্ট গঠন করা হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ সংবিধানের বিরোধিতা করলে নব্য-তুরস্ক সম্প্রদায় কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং তদীয় ভ্রাতা পঞ্চম মোহাম্মদকে অটমান সুলতানরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। নব্য-তুর্কীদের আন্দোলনের ফলে স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদী শাসনের সূত্রপাত

www.pathagar.com

হয়। এই আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বলকান উপদ্বীপের অধিবাসীদের তুরস্ককরণ (Policy of Turkification)।

বসনিয়া সংকট ঃ নব্য-তুর্কীদের আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে প্রিন্স ফার্ডিন্যান্ড ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বুলগেরিয়ার জার উপাধি গ্রহণ করে এবং অস্ট্রিয়া বার্লিন চুক্তি ভঙ্গ করে তুরস্কের প্রদেশ বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা দখল করে। অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপ এই অঞ্চলে রাশিয়ার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়; অপরদিকে জার্মানী অস্ট্রিয়ার সম্প্রসারণ নীতিকে সমর্থন করে। বসনিয়ায় অস্ট্রিয়ার সশস্ত্র হস্তক্ষেপে ইংল্যান্ড, রাশিয়া এবং ফ্রান্স তীব্র প্রতিবাদ করে। বসনিয়া সংকট বিপরীতমুখী দুটি সামরিক শিবিরকে শক্তিশালী করে। এর ফলেই বলকান যুদ্ধ এবং পরিবেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়।

ব্লাক হ্যান্ড ঃ বলকান উপদ্বীপের জটিলতা থেকেই প্রথম মহাসমর শুরু হয়। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্বিয়ার বিরোধ এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। "ব্লাক হ্যান্ড" (Black Hand) নামে অস্ট্রিয়া বিরোধী সার্বিয়ার একটি সন্ত্রাসবাদী গোপন সমিতির একজন সদস্য অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চ ডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যান্ড ও তার স্ত্রী সোফিয়াকে বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে হত্যা করে। ফলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে চরম পত্রে প্রদত্ত বিভিন্ন দাবী প্রত্যাখ্যাত হলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সার্বিয়া অস্ট্রিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হলে রাশিয়া সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠায়। এটাকে জার্মানী অস্ট্রিয়াকে সমর্থন দেয়। রুশ জার্মান সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ায় ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড এই বিশ্ব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী একটি রক্তক্ষয়ী ও ভয়াবহ যুদ্ধের রণ দামামা বেজে ওঠে।

প্রথম মহাসমরে তুরস্কের যোগদানের কারণ ঃ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহাসমর ঘোষিত হলে তুরস্ক নিরপেক্ষ নীতি গ্রহন করে। কিন্তু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক নিরাপত্তাবোধের অভাব, অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রভৃতি কারণে তুরস্ক মহাসমরে জার্মানীর পক্ষে যোগদানের মূলে কতিপয় কারণ ছিল ঃ

১. জোট প্রথার কুফল ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সমগ্র বিশ্ব দুটি সশস্ত্র ক্যাম্পে বিভক্ত হয়ে যায়; একটি 'ত্রি-শক্তি আঁতাত' (Triple Entente) অপরটি 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' (Triple Alliance), প্রথমটিকে ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং পরবর্তী পর্যায়ে জাপান, ইতালি, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি। অপরটিতে জার্মান, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও পরবর্তী পর্যায়ে তুরস্ক যোগদান করে। প্রথম মহাসমর আরম্ভ হলে তুরস্কের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দিক হতে অসম্ভব ছিল।

২. আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা ঃ তুরস্ক অধিকৃত বলকান উপদ্বীপ হতে যুদ্ধের সূচনা হয় এবং যে সমস্ত অঞ্চল যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে তার অধিকাংশই ছিল তুরস্কের অধিকৃত পূর্ব ইউরোপ, মধ্য এবং নিকট এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা। সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তুরস্ক যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয়। এভারসলে যথার্থই বলেন, "উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রাজনীতিতে যে তুরস্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং আরব উপদ্বীপ,

www.pathagar.com

উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব ইউরোপের কিয়দংশের বিশাল অঞ্চলে সার্বভৌমত্ব কায়েম ছিল তার পক্ষে সংঘাতের বাইরে থাকা সম্ভবপর ছিল না।”

৩. অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর পতন ঃ অটমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে তুর্কী সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। স্বৈরাচারী একনায়কত্ব, প্রশাসনিক অরাজকতা, অর্থনৈতিক সংকট তুর্কী সাম্রাজ্যকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। নব্য-তুর্কী বিপ্লবীদের পক্ষে এই অবশ্যম্ভাবী পতন রোধ করা সম্ভবপর হয়নি। উপরন্তু, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও জাতির সমন্বয়ে গঠিত তুর্কী সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে গ্রীক, সার্ব ও বুলগারগণ স্বাধিকার আন্দোলন শুরু করে স্বভাবত এর ফলে তুরস্কের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং গত্যন্তর না দেখে তুরস্ককে এক পক্ষে যোগদান করতে হয়।

৪. মধ্য ও উগ্রপন্থী ঃ প্রথম মহাসমরের প্রাক্কালে নব্য-তুর্কী সম্প্রদায় দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে; প্রথমটি মধ্যপন্থী এবং দ্বিতীয়টি উগ্রপন্থী। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ একদল নব্য-তুর্কী বিরোধের মধ্যে লিপ্ত না হয়ে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষে বিরোধ নিষ্পত্তি করে তুরস্ককে আধুনিকীকরণের প্রয়াস পান। এরা পশ্চিমা শক্তিবর্গের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রেখে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনে প্রয়াসী হন। অপরদিকে উগ্রপন্থীদল মনে করত যে, জার্মানের পক্ষে যোগদান করলে তুরস্ক পুনর্জীবন লাভ করবে। এই শেষোক্ত দলের অধিনায়ক ছিলেন এনভার পাশা। তিনি নব্য-তুর্কী বিপ্লবের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন এবং স্যালোনিকার ‘কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস’ এর সদস্য হতে কালক্রমে বার্লিনে তুর্কী মিলিটারী এটাচীর পদে অধিষ্ঠিত হন। উগ্রপন্থী দলের প্রভাবশালী নেতা এনভার জার্মানীতে থাকাকালীন জার্মানীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীকালে যুদ্ধমন্ত্রীর পদে সমাসীন থাকাকালে তিনি জার্মানীর সঙ্গে তুরস্কের মৈত্রী স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জার্মানীতে সামরিক শিক্ষা লাভ করেন এবং এই কারণে জার্মানীর সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাফল্যে আকৃষ্ট হন। তার ধারণা জন্মে যে, জার্মানীর পক্ষ গ্রহণ করলে তুরস্কের আধুনিকীকরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে। জার্মানীর পক্ষে তুরস্কের যুদ্ধে যোগদানের মূলে নানাবিধ কারণ ছিল। বলা বাহুল্য যে, বিসমার্ক এবং জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম ব্রিটেনের প্রভাব হ্রাস করে তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে মধ্য-এশিয়ায় জার্মান প্রাধান্য বৃদ্ধির প্রয়াস পান। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে মার্মরা সাগরের এশিয়া অঞ্চলে প্রথম ব্রিটিশ কোম্পানিকে প্রদত্ত রেলপথ নির্মাণের চুক্তি পরবর্তী পর্যায়ে জার্মান ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। এর ফলে জার্মান বাণিজ্যিক জাহাজসমূহ ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর এবং পারস্য উপসাগরে তৎপর হয়ে ওঠে; উপরন্তু, তুরস্কের বেতার স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করে জার্মান প্রকৌশলীগণ। তুর্কী বাহিনীর সংগঠনে এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে জার্মানীর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। প্যান-জার্মানীজমের বিপরীত প্যান-তুরানিয়ানিজমকে কার্যকর করবার প্রয়াস পান এনভার পাশা। এনভার পাশার জার্মান প্রীতি তুরস্কের সঙ্গে জার্মানীকে একত্রীকরণ করে এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে তুরস্কের জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যুদ্ধমন্ত্রী এনভার পাশার যে সামরিক চুক্তি হয় তার ফলে জার্মানীর পক্ষে তুরস্ক প্রথম মহাসমরে যোগদান করে।

৫. মিত্রশক্তির ঘৃণ্য চক্রান্ত ঃ পারস্যদেশীয় সমস্যা সমাধানে তুরস্ক ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের সহায়তা লাভ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে তুরস্কের শত্রুবর্গের সঙ্গে কূটনৈতিক প্রয়োজনে ব্রিটেন ও ফ্রান্স 'ত্রি শক্তি আঁতাত'-এ স্বাক্ষর করে। তুরস্ক সর্বদা রুশ ভল্লুকের অশুভ ছায়া বিস্তারে শঙ্কিত থাকত এবং তুর্কী-রুশ সংঘর্ষের ফলে উভয় দেশের মধ্যে সদ্ভাব বিনষ্ট হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে তুরস্ক ঘৃণা করত এবং এই কারণে তুর্কীগণ প্রথম মহাসমরে 'ত্রি-শক্তি আঁতাতে' যোগদান না করে ত্রি-শক্তি মৈত্রীকে সমর্থন এবং সক্রিয় সহযোগিতা করে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন তাদের পররাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন পূর্বক তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে সম্প্রসারণ নীতির অনুসরণই করেনি বরং নব্য-তুর্কী বিপ্লবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তারা তুর্কীর আধুনিকীকরণ ও একত্রীকরণ এবং 'ক্যাপিটুলেশন' পদ্ধতির বিরোধিতা করে। উপরন্তু, পশ্চিমা মিত্রপক্ষ তুরস্ক হতে জার্মান সামরিক উপদেষ্টাদের বহিষ্কার এবং দুটো জার্মান যুদ্ধজাহাজ হস্তান্তরের দাবী তুরস্ক সরকারকে জানালে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এনভার পাশা সন্দেহ করেন যে, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়া একটি গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর দ্বারা তুরস্ককে ভাগ বাঁটোয়ারা করবার জন্য একটি ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

তিনটি ঘটনা তুর্কীদের পাশ্চাত্য মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য করে ঃ

প্রথমত, মিত্রপক্ষ অন্যায়ভাবে গোয়েবেন এবং ব্রেসলো নামে দুটো জার্মান যুদ্ধজাহাজ হস্তান্তর করতে বললে তুরস্কের সার্বভৌমত্বে আঘাত লাগে।

দ্বিতীয়ত, মেসার্স আর্মস্ট্রং কর্তৃক তুরস্কের জন্য নির্মিত দুটো জাহাজ (Cruiser) ব্রিটিশ নৌ-দফতর আটক করলে তুরস্ক সরকার প্রতিবাদ করে। এই ঘটনায় ব্রিটেন ও তুরস্কের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

তৃতীয়ত, ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে যুবরাজ হোসেন মিশরের সুলতান হিসেবে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। তুরস্কের অধিকৃত অঞ্চল হিসেবে মিশরের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা অটমান সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানে এবং সম্ভবত নব্য-তুর্কী ও ব্রিটেনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এসব কারণে তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে প্রথম মহাসমরে যোগদান করে।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

সেভার্স এবং লুসেনের চুক্তি

পটপ্রেক্ষিত ঃ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে বিজয়ী মিত্রবাহিনী (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া) কর্তৃক গৃহীত শান্তি চুক্তিতে (Covenant) জার্মানী স্বাক্ষর দান করে। প্যারিসের অদূরে ভার্সাই প্রাসাদে এই চুক্তি সম্পাদিত হলে এটি ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Versailles) নামে অভিহিত হয়। ১৫টি খণ্ডে ৪০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত ভার্সাই এর চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের পুনর্গঠন করবার একটি আন্তর্জাতিক সাফল্যজনক প্রচেস্টা বলে ধারণা করা হয়। জার্মানীর পক্ষে যে সমস্ত রাষ্ট্র প্রথম মহাসমরে মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে যোগদান করে মিত্রপক্ষ তাদের সাথে পৃথক পৃথক চুক্তি সম্পাদিত করে। তুরস্ক জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করলে অপরাপর পরাজিত ও বিধ্বস্ত রাষ্ট্রের মত তাকেও খণ্ড-বিখণ্ড করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা করা হয়। ভার্সাই চুক্তির উদ্যোক্তারা জার্মানীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। লয়েড জর্জের পরামর্শদাতারা তাঁকে বললেন, "তুরস্ককে ছেড়ে দিন। ওটা আপনিই ভেঙ্গে পড়বে; তখন তার খণ্ডগুলি ভাগ করে নিব।" যুদ্ধকালে তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ মৃত্যুবরণ করলে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তার ভাই মাহমুদ (পঞ্চম) সিংহাসনে উপবেশন করেন। উল্লেখ্য যে, জার্মানীর পক্ষে তুরস্কের যোগদানের মূলে নব্য-তুর্কী সংগঠন জড়িত ছিল। পঞ্চম মাহমুদের রাজত্বকালে 'ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস' সমিতি সংবিধানের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং এনভার ও তলাতের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে। মাহমুদ সেভকেত পাশা নতুন সরকার গঠন করেন এবং এই সরকার বা মন্ত্রীসভা দৃশ্যতঃ ছিল "জার্মান ঘেঁষা" (a distinct German colouring)। তুরস্কের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য একজন ব্যক্তিকে দায়ী করা হলে নিশ্চিতভাবে এনভার পাশার নাম উল্লেখ করতে হয়। একজন দুর্ধর্ষ ও সাহসী সেনাবাহিনীর ক্যাপটেন থেকে তিনি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনে 'সামরিক এটাচীর' পদে উন্নীত হন। জার্মানীতে অবস্থানকালে তিনি উন্নতমানের জার্মান সামরিক শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বলকান যুদ্ধের বিপর্যয়েও তুর্কী বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ম্লান হয়নি, একথা এনভার মনে করতেন। এনভার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তুর্কী সমর মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তুরস্ক কেন্দ্রীয় শক্তিকে (অস্ট্রিয়া, জার্মানী, ইতালি) সমর্থন দান করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর তুরস্ক প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে। যুদ্ধে তুরস্ক বিপর্যস্ত হলে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ১লা নভেম্বর এনভার পাশা জার্মানীতে পলায়ন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় তুরস্কে মোস্তফা কামাল পাশা নামক একজন জাতীয়তাবাদী নেতা ও সেনানায়কের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি পতনোন্মুখ তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বৈদেশিক আগ্রাসন

www.pathagar.com

থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু ত্রি-শক্তির আঁতাতের (Triple Entente) নিকট ত্রি-শক্তির চুক্তির (Triple Alliance) পরাজয়ে তুরস্কের রাজনৈতিক বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সান রেমোতে প্রথম মিত্রশক্তির বৈঠক বসে। পরবর্তীকালে প্যারিসের সন্নিকটে সেভার্সে (Severes)-এ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই আগস্ট মিত্র পক্ষের সঙ্গে তুরস্কের সুলতানের চুক্তি সম্পাদিত হয়।

সেভার্সের চুক্তির শর্তাবলী ঃ একথা নিঃসন্দেহে ও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, সেভার্সের চুক্তি তুরস্কের জন্য ছিল মারাত্মকভাবে হানিকর। বিজয়ী মিত্রপক্ষ তুরস্ককে টুকরো টুকরো করে তার সার্বভৌমত্বে আঘাত হানে। এই চুক্তির শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. সেভার্সের চুক্তি মোতাবেক তুরস্কের ভৌগোলিক এলাকা সীমিত হয়ে পড়ে এবং লোকসংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের তুরস্কের আয়তন ছিল ৬,১৩,৫০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা দুই কোটি। মিত্রশক্তি তা কমিয়ে দিলে পরিমাপ দাঁড়ায় ১,৭৫,০০০ বর্গমাইলে এবং জনসংখ্যা মাত্র ৮০ লক্ষে।

২. এই সন্ধি মোতাবেক মিসর, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপলিটানিয়া, মরক্কো, তিউনিস প্রভৃতি স্থানের উপর তুরস্ক অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করার পরিবর্তে তুরস্ক আরও সঙ্কুচিত হয়ে আড্রিয়ানোপল ও আনাতোলিয়ায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৩. দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে তুরস্ক যে অংশটুকু বলকান রাষ্ট্র সংঘের নিকট থেকে উদ্ধার করে তা গ্রীসকে দিতে বাধ্য হয়। স্মার্না ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনর সাময়িকভাবে গ্রীসের আধিপত্যাধীনে রাখা হয়। গ্রীস ভূমধ্যসাগরের ও এজিয়ান সাগরের কতিপয় দ্বীপাঞ্চল লাভ করে। ফলে, তুরস্কের সীমা চাতালজা প্রাচীর পর্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ইস্তাম্বুলের পশ্চাদ্বিবাস্থ ও দেরেকস হ্রদের চতুরপাশ্ববর্তী কয়েক মাইল এলাকায় তুর্কী আধিপত্য বজায় থাকে।

৪. তুর্কীগণ হেজাজসহ সমস্ত অ-তুর্কী আরব অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তুরস্কের আধিপত্য বিলুপ্ত হলে হেজাজ ব্রিটেনের তত্ত্বাবধানে চলে যায়।

৫. প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়ার উপর থেকে তুর্কী অধিকার বিলুপ্ত হলে তা বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের আওতাভুক্ত হয়।

৬. সিরিয়াকে ফরাসী ম্যাণ্ডেটভুক্ত অঞ্চলে পরিণত করা হয়। দক্ষিণ আনাতোলিয়া ও আদানাসহ সিলিসিয়া ফরাসীদের দখলে যায়।

৭. ইতালী রোড্স ও দার্দানেলিস দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। পরে অবশ্য দার্দানেলিস ও বসফোরাস প্রণালীকে আন্তর্জাতিকীকরণ (Internationalise) করা হয়।

৮. মিশর ও সুদানকে ইংরেজদের এবং তিউনিস ও মরক্কোকে ফরাসীদের আশ্রিত রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

৯. ভান, বিতলিস, আর্জেরুম ও ত্রেব্রজন্দ বেলায়েত নিয়ে একটি স্বাধীন আর্মেনীয় রাষ্ট্র গঠন করা হয় এবং তুরস্ক আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

১০. আর্মেনিয়ার দক্ষিণস্থ ও ইউফ্রেতিস নদীর পশ্চিম দিকস্থ কুর্দ প্রধান জেলাগুলি নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত কুর্দ রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তুর্কী সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী ষষ্ঠ মুহম্মদ (১৯১৮-২২) সেভার্সের ঘৃণ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর দানে বাধ্য হন। যদিও মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে জাতীয় পরিষদের জাতীয়তাবাদী দল জাতীয় পরিষদে এই সন্ধি অনুমোদনে বাধা প্রদান করে।

প্রতিক্রিয়া (১৯২০-২৩) ঃ এম. আবদুল কাদের যথার্থই বলেন, "সেভার্সের সন্ধি পাশ্চাত্যের উৎকট সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষা নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত।" স্পষ্টতঃ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অধিকার রক্ষার অজুহাতে মহাযুদ্ধ বাধে। প্রেসিডেন্ট উইলসন তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার স্বীকার করে নেন। এর পরেও জগতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকগণ যখন শক্তি সাম্যের (Balance of Power) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মিত্র শক্তিকে পুরস্কার দানে ও জগতে শান্তি স্থাপনে ব্যস্ত, তখনও তাদের মাথায় সাম্রাজ্যবাদ ঘুরপাক খাচ্ছিল। এর জন্যই লন্ডন, সান রেমো ও সেভার্সে মিত্রশক্তির প্রতিনিধিরা ধরাশায়ী রোগীকে বিকলাঙ্গ করার ব্যবস্থা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, তুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দরগুলি অধিকার করে তারা তার সর্বাপেক্ষা কর্মঠ ও কার্যকর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিরও ছেদন করার নির্দেশ দান করেন। বানার্ড লুইস বলেন, "The Treaty of Severes was very harsh and would have left Turkey helpless and mutilated, a shadow state living in the sufferance of the powers and peoples who were annexing her richest province. It was far more severe than that imposed on a defeated Germany and was received in Turkey with a national day of mourning."

১৯২০ থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল তুরস্কের ইতিহাসে এক যুগ সন্ধিক্ষণের সৃষ্টি করেছে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত সেভার্সের চুক্তি এবং এই চুক্তি লঙ্ঘনে সম্পাদিত ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ল্যুসেনের চুক্তির মধ্যবর্তী সময়কালে তুরস্কের ইতিহাসে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের মত এক ক্ষনজন্মা রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়, যিনি তুরস্কের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব বজায়ের প্রয়াস পান। তুরস্কের পশ্চিম প্রান্তে যখন ইস্তাম্বুলের সুলতানগণ অপমানকর চুক্তিতে ঘৃণিত ও ধিকৃত রুগ্নব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছেন, তখন পূর্বাঞ্চল আনাতোলিয়ায় কামাল পাশা তাঁর অবস্থান দৃঢ় করতে ব্যস্ত থাকেন। প্রথমে তিনি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে পদাতিক বাহিনীর ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন, পরে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলের সামরিক একাডেমীতে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এই কলেজ (Harbiye) সুলতান বিরোধী কার্যকলাপের অন্যতম প্রদান কেন্দ্র ছিল। তিনি নব্য-তুর্কীদের কীর্তি সম্বন্ধে অবহিত হন এবং মনে মনে যুদ্ধে তাদের অংশ গ্রহণের পদক্ষেপকে নিন্দা করেন। তিনি ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী

www.pathagar.com

তুর্কী নেতা। কয়েকমাস বন্দী থাকার পর তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং দামেস্কে অবস্থিত পঞ্চম বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকার বিরোধী গুপ্ত দল গঠন করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেজর পদে উন্নতি লাভ করে মেসিডোনিয়ায় বদলী হন। এ সময়ে তিনি 'কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস'-এ সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। নব্য-তুর্কীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দিলে তিনি রাজনীতি ত্যাগ করেন। কিছুকাল ইউরোপে অবস্থান করে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং তাঁকে ১৯তম ডিভিশনের সেনানায়ক নিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিতে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঁর কলাকৌশলে রাজধানী ইস্তাম্বুল রক্ষা পায়। পুরস্কার স্বরূপ তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে দিয়ারবকরে একটি পুরো তুর্কী ফৌজের সামরিক দায়িত্ব লাভ করেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমরাভিযান করে তিনি বিতলিস (Bitlis) এবং মুসা (Mus) পুনরুদ্ধার করেন। সিরিয়া এবং ককেসাসে সামরিক বিজয় লাভ করে তিনি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম ডিভিশনের সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই বাহিনী 'ইয়েলদ্রিম' বা 'দ্রুত বাহিনী' নামে পরিচিত ছিল। ইতিমধ্যে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে প্রথম মহাসমরে যোগদান করে বিপর্যস্ত হলে প্রথমে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মুদরসের সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য যে, সকল তুর্কী জেনারেলের মধ্যে একমাত্র কামালই এ বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন। সুলতান অপমানকর চুক্তি স্বাক্ষর করলেন এবং জাতীয় বিপর্যয়ের জন্য তুর্কী জাতীয়তাবাদীদের দোষরোপ করলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতি মোস্তফা কামাল ইস্তাম্বুল ত্যাগ করে আনাতোলিয়ায় আত্মগোপন করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে "সোসাইটি ফর দি ডিফেন্স অব রাইটস" (Mudafaai Hukuk) অর্থাৎ "অধিকার সংরক্ষণ সমিতি" গঠন করেন। সুলতান বিরোধী এই প্রতিরোধ সমিতি খুবই কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। সুলতান অবশ্য কামালের রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত না হয়েই তাঁকে নবম ডিভিশনে 'ইনসপেক্টর জেনারেল' নিযুক্ত করেন। তিনি আনোতোলিয়ায় সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলেন। ইত্যবসরে সেভার্সের চুক্তির ফলে তুরস্ক একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং ইউরোপীয় ভূখণ্ডে তার সীমানা সীমিত হয়ে পড়ে। সেভার্সের চুক্তি ছিল তুরস্কের জন্য অপমানকর– যদিও এর শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিফলিত হয়নি। এ সময়ে আনাতোলিয়ায় এক নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। বার্নাড লুইস বলেন, "while the Allies were imposing their terms on the docile government of the Sultans, a new Turkish state was emerging in Anatolia" আনতোলিয়ায় অবস্থান করে কামাল গুপ্তভাষায় (cypher) অন্যান্য সামরিক ইউনিটকে বিভিন্ন নির্দেশমালা প্রেরণ করতে থাকেন। তিনি প্রচার করেন যে, দেশের অখণ্ডত্ব বজায়ের জন্য জরাজীর্ণ খিলাফত ও সালতানাতের কেন্দ্রীয় কাঠামো ভেঙ্গে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত। কামালের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ইস্তাম্বুল পৌঁছলে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি সামরিক পদ থেকে ইস্তফা দেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সমিতির একটি বৈঠক ইরযেরুমে অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনি সভাপতি

www.pathagar.com

নির্বাচিত হন। এভাবে সমগ্র আনাতোলিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী কামালিষ্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। অল্প দিনের মধ্যে জাতীয় পরিষদ জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব দাবী করে এবং জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করে।

জাতীয় পরিষদে কামালিষ্ট দলের সঙ্গে সুলতানের অনুগত সদস্যদের বিরোধ বাধে। কিন্তু তাদের বিরোধিতা ছিল ক্ষনস্থায়ী। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল 'গ্রাণ্ড এসেমব্লীর' সভায় কামালকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। এই সভায় জাতীয় পরিষদকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করা হয় এবং সুলতান-খলিফাকে অপসারণের দাবী করা হয়। সেভার্সের চুক্তির পর তুরস্কের রাজনৈতিক বিপর্যয় ও স্বাধীনতা বিপন্ন হতে থাকে। তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীক বাহিনী বিজয়ের সফলতা অর্জন করলেও তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। তুর্কী-গ্রীক সংঘর্ষ সংঘটিত হয় তিন স্তরে ১৯২০, ১৯২১ এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে।

প্রথম স্তর, ১৯২০ ঃ প্রথম সংঘর্ষে স্বল্প-সংখ্য অবিন্যস্ত তুর্কী বাহিনী বিশাল, সুসংহত ও রণসম্ভারে সজ্জিত গ্রীক বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করে। গ্রীক বাহিনী ক্রমশ আনাতোলিয়া ও রুমেলিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। মিত্র শক্তির বিজয়ে তুরস্কের উপর ঘৃণ্য সেভার্সের চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এই চুক্তিকে (১০ই আগস্ট, ১৯২০) তুরস্কের জন্য 'মৃত্যু ঘন্টা' (death-warrant) বলা হয়েছে। প্রাইসের ভাষায়, "More it would, if implemented, have meant the end of Turkey itself." সৌভাগ্যবশতঃ সেভার্সের চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি।

দ্বিতীয় স্তর, ১৯২১ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রীক সমরাভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কামাল পাশা এবং তাঁর চিফ অব স্টাফ কর্নেল ইসমত গ্রীক বাহিনীকে ইনোনুতে (Inonu) বিধ্বস্ত করেন। ইনোনু নাম থেকে ইসমত ইনোনু উপাধি লাভ করেন। আনাতোলিয়া থেকে গ্রীকদের বুরসায় বিতাড়িত করা হয়। জুলাই মাসে গ্রীকগণ পুনরায় তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযান করে সাকরয়া নদীর তীরে অবস্থান গ্রহণ করে। ইত্যবসরে কামাল সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব লাভ করে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট গ্রীক বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। কামালের সামরিক সাফল্যে গ্রাণ্ড ন্যাশনাল, আসেমব্লী তাঁকে গাজী খেতাব প্রদান করে এবং তিনি মার্শালের পদে উন্নীত হন।

তৃতীয় স্তর, ১৯২২ ঃ মোস্তফা কামালের বিজয় এবং জাতীয়তাবাদী (কামালিষ্ট) দলের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তৃতীয় বারের মত ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে গ্রীস যুদ্ধাভিযান করলে কামাল স্বয়ং সেনা পরিচালনা করে তাদের বিধ্বস্ত করেন। প্রথমে তিনি স্মার্নায় গমন করেন এবং গ্রীকদের পরাজিত করে সমগ্র ইজমির দখল করেন। এভাবে গ্রীকদের সমগ্র আনতোলিয়া থেকে বিতাড়িত করা হয়। কামাল সমগ্র পূর্ব তুরস্কে অভিযান চালিয়ে মিত্রপক্ষের মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এর ফলে তাকে দার্দানেলিসে গমন করতে হয়। তুর্কী বাহিনীর অভিযানে ফরাসী ও ইতালি বাহিনী অবরোধ তুলে নেয়; কিন্তু সাময়িকভাবে ব্রিটিশ নৌবহর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

পরিশেষে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই অক্টোবর মুদায়নায় তুর্কীদের সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর চুক্তি হয়। সেভার্সের সন্ধির পর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ল্যুসেনে একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এদিকে গ্রীকদের এশিয়া মাইনর থেকে বিতাড়িত করে তুর্কী জাতীয় পরিষদ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর খিলাফত উচ্ছেদ করে একটি প্রজাতন্ত্র কায়েমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ষষ্ঠ মুহম্মদকে পদচ্যুত করে নির্বাসন দেওয়া হলে সালতানাতের পতন হয়।

ল্যুসেনের চুক্তি, জুলাই, ১৯২৩ ঃ প্রথম মহাসমরের পরিসমাপ্তিতে তুরস্কের সঙ্গে মিত্রশক্তির দ্বিতীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। সর্বপথম বৈঠক বসে ল্যুসেনে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২০শে নভেম্বর। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড কার্জন ইংল্যাণ্ডের, মুসোলিনী ইতালির, পয়ঙ্কাবি ফ্রান্সের এবং ইসমত পাশা (ইনোনু) তুরস্কের প্রতিনিধিত্ব করেন। ইসমত ইনোনুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং কূটনৈতিক দক্ষতার ফলে মিত্রশক্তি অন্যায়ভাবে কোন প্রকার শর্ত তুরস্কের উপর চাপাতে ব্যর্থ হয়। ফলে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ল্যুসেন বৈঠক বিফলে পরিণত হয়। দীর্ঘকালের আলোনার ফলে এবং ইসমাত ইনোনুর অটল সংকল্প ও দৃঢ় চিত্ততায় মিত্রবাহিনীর অবশেষে ২৪শে জুলাই পুনরায় বৈঠকে যোগদান করতে সম্মত হয়। এর ফলে তুর্কী তার সমস্ত দাবী আদায়ে সমর্থ হয় এবং সেভার্সের চুক্তির ফলে তুরস্ক যে গ্লানির সম্মুখীন হয় তা থেকে অব্যাহতি লাভ করে। ল্যুসেনের চুক্তিতে স্বাক্ষরদাতা দেশগুলি হচ্ছে ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইতালি, রুমানিয়া, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, জাপান, গ্রীস ও তুরস্ক। ল্যুসেন চুক্তির শর্তাবলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. সেভার্সের চুক্তিতে তুরস্ককে সঙ্কুচিত করে আনাতোলিয়া ও দার্দানেলিসে সীমাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু ল্যুসেনের চুক্তি মোতাবেক তুরস্কের ভৌগোলিক সীমারেখা পুনঃনির্ধারিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা তুরস্ক ম্যারিৎসা (Maritsa) নদীর তীর পর্যন্ত থ্রেসের সকল স্থান ও আড্রিয়ানোপল লাভ করে। গ্রীক সীমানা ম্যারিৎসা নদীর তীর পর্যন্ত নির্ধারিত হয়।

২. তুরস্ক ম্যারিৎসা নদীর পশ্চিম পাড়ে আড্রিয়ানোপল-কনস্টানিটিনোপল রেলপথের জন্য একটি অংশ (enclave) লাভ করে। এটি গ্রীস তুরস্ককে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে।

৩. গ্রীস ও তুরস্কে বসবাসকারী গ্রীক ও তুর্কী সম্প্রদায়কে স্বীয় দেশে প্রত্যর্পণ করা হবে। কেবলমাত্র কনস্টানটিনোপলের গ্রীকদের এবং পশ্চিম থেসের তুর্কীদের অপসরণ করা যাবে না। অধিবাসী বিনিময়ের ফল এশিয়া মাইনর থেকে ১৩,৫০,০০০ গ্রীক গ্রীসে এবং মেসিডোনিয়া থেকে ৪৩,২০০ তুর্কী মুসলমান আনাতোরিয়ায় চলে আসে। এটি বাধ্যতামূলক বাসিন্দা বদল এবং যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে যন্ত্রণাদায়ক সংখ্যাগরিষ্ঠ সমস্যার চির অবসান ঘটে। এতে তুরস্কে সর্বপ্রথম জাতি, ভাষা ও ধর্মগত ঐক্য আসে। মিল্লাত অর্থাৎ তুরস্কের অমুসলমান সম্প্রদায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

www.pathagar.com

৪. সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, শান্তি ও যুদ্ধের সময় বসফোরাস ও দার্দানেলিস সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুপক্ষীয় জাহাজ এই দুই প্রণালী ব্যবহার করতে পারবে না। দার্দানেলিসকে আন্তর্জাতিককরণ (Internationalised) করা হয়।

৫. এজিয়ান সাগরস্থ ইমব্রস (Imbros), টেনেড্স (Tenedos) ও র‍্যাবিট দ্বীপপুঞ্জ (Rabbit Islands) তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অপরাপর দ্বীপগুলি গ্রীস ও ইতালিকে দেওয়া হয়।

৬. ক্যাপিচ্যুলেশন প্রথা রহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই প্রথা অনুযায়ী বিদেশী খ্রিস্টান সম্প্রদায় তুরস্কের আইন না মেনে তাদের নিজস্ব অনুশাসন মানত। তারা তুরস্ক সরকারকে কোন প্রকার কর দিত না এবং রাষ্ট্রের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ করত। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে মহামতি সোলায়মান সর্বপ্রথম ফরাসীদের এই ক্যাপিচুলেশন প্রদান করেন।

৭. ল্যুসেনের চুক্তি অনুযায়ী লিবিয়া, সুদান, প্যালেস্টাইন, ইরাক, সিরিয়া ও আরব রাজ্যসমূহের উপর তুর্কী আধিপত্য প্রত্যাহার করা হয়।

৮. সাইপ্রাস ব্রিটেনের দখলে চলে যায়।

৯. তুরস্ককে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ থেকে রেহাই দেওয়া হয়।

ফলাফল ঃ একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, প্রথম মহাসমরে মিত্রপক্ষের সমর্থনে তুরস্ক যোগদান করে সেভার্সের মত যে ঘৃণ্য ও অপমানকর চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হয় তা বহুলাংশে সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয় ল্যুসেনের চুক্তিতে। এটা অনেকটা ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার পাওয়া একটি নতুন জাতি। এই কারণে প্রাইস বলেন, "The Ottoman Empire was dead but a new Turkish nation had been internationally recognised in control of all the truly Turkish lands in Asia Minor and of a small part of South-east Europe together with the historic capitlals of Constantinople and Adrianople." সামরিক যুদ্ধে (গ্রীকদের সঙ্গে) তুরস্ক জয়লাভ করে। জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কার্যক্রম কার্যকরী হয় এবং একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা তা স্বীকৃত হয়। ল্যুসেনের চুক্তি তুরস্কের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে প্রকটভাবে নাড়া দেয় এবং ক্ষয়িষ্ণু সালতানাত–খিলাফতের পতনকে ত্বরান্বিত করে। মুস্তাফা কামাল একজন জাতীয় নেতা বা আতাতুর্কের মর্যাদা লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে ইসমত ইনোনু বলেন যে, আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়েছে এবং আমরা একটি আধুনিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছি।" ("We have finished the exams and now we are graduating".) উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে সমস্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার মধ্যে ল্যুসেনের সন্ধি ছিল দীর্ঘস্থায়ী। এভাবে মোস্তফা কামাল পাশার একনিষ্ঠ দেশাত্মবোধ, কূটনৈতিক দক্ষতা ও সামরিক মেধার ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

তুর্কী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের যোগদানের ফলে তুরস্কের বুদ্ধিজীবী ও সেনাবাহিনীতে মূলতঃ দুটি বিপরীতমুখী ও পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। জার্মানীর পক্ষে সমর্থনকারী গোষ্ঠী এনভার পাশার নেতৃত্বে যুদ্ধে যোগদান করলেও কামাল পাশার নেততৃত্বে একদল স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ গোষ্ঠী এর তীব্র বিরোধিতা করে। ঘৃণ্য সেভার্সের চুক্তি সুলতান গ্রহণ করতে বাধ্য হলে তুরস্কের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করার জন্য ১৯১৮ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তুরস্কের মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে বৈপ্লবিক আন্দোলনের (Turkish Revolution) সূচনা হয়। এই আন্দোলনের প্রধান প্রধান ঘটনাপঞ্জী নিম্নরূপ।

১. ডিসেম্বর, ১৯১৮ ঃ মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে আনাতোলিয়ায় 'মুদাফাঈ হুকুক (Modafaai Hukuk) বা সোসাইটিস ফর দি ডিফেন্স অব রাইটস গঠিত হয়। এটি একটি বিপ্লবী সংগঠন, যা ক্ষয়িষ্ণু তুরস্ককে রক্ষা এবং বিদেশী আগ্রাসন বন্ধ করার পরকল্পনা প্রণয়ন করে।

২. জুলাই, ১৯১৯ ঃ এরজেরুমে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসে 'ইস্টার্ণ প্রভিনসিয়াল সোসাইটি ফর দি ডিফেন্স অব ন্যাশনাল রাইটস' গঠিত হয় এবং কামাল পাশাকে এই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই কংগ্রেস তুরস্কের জন্য সর্বপ্রথম স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে ঘোষনাপত্র প্রকাশ করে, তা পরবর্তীকালে 'জাতীয় প্যাকেট' (National Pact-Milli Misak) নামে পরিচিত ছিল।

৩. সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ ঃ এরজেরুমের পর সেভার্সে যে দ্বিতীয় কংগ্রেসের সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতেও কামাল সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সভায় 'এসোসিয়েসন ফর দি ডিফেন্স অব দি রাইটস অব আনাতোলিয়া এণ্ড রুমেলিয়া' গঠিত হয়।

৪. জানুয়ারি, ১৯২০ ঃ কামালবাদীদের চাপে জাতীয় পরিষদে নির্বাচন হয় এবং কামালবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করে। পরবর্তীতে 'ন্যাশনাল প্যাকট' সংসদে গৃহীত হয়। সুলতান সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে কামালসহ তার সহকর্মীদের দেশোদ্রোহিতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং ফতোয়া জারী করেন। কিন্তু কামাল, রউফ পাশা ও ইসমাত পাশা তাঁদের আন্দোলন আঙ্কারা থেকে পরিচালিত করতে থাকেন এবং এপ্রিলে আঙ্কারায় গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লীর সভা ডাকেন।

৫. আগস্ট, ১৯২০ ঃ তুরস্ক জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করলে অপরাপর পরাজিত রাষ্ট্রের মত তাকেও খণ্ডবিখণ্ড করে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করা হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মিত্রপক্ষ তুরস্কের উপর ঘৃণ্য সেভার্সের চুক্তি চাপিয়ে

দেয়। কিন্তু মোস্তফা কামালের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব জাতীয় পরিষদে জাতীয়তাবাদী দল সেভার্সের ঘৃণ্য চুক্তি অনুমোদনে প্রচণ্ড বাধা দেয়। যাহোক, সেভার্সের চুক্তির শর্তাবলী কার্যকরী হয়নি। কিন্তু এই চুক্তি স্বাধীনতাকামী ও স্বাদেশপ্রেমী তুর্কীদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বানার্ড লুইসের ভাষায়, "While the Allies were imposing their terms on the docile government of the Sultan, a new Turkish state was emerging in Anatolia led by men, who rejected outright the treaty and the principles that underlay it and condemned as traitors those Turks, who had accepted it."

৬. জানুয়ারি, ১৯২১ ঃ গ্রীক-তুরস্ক সংঘর্ষ ১৯২০ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। প্রথম পর্যায়ে বিপর্যস্ত হয়ে তুর্কী বাহিনী কামাল পাশা ও ইসমত ইনোনুর নেতৃত্বে গ্রীক বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে এবং এশিয়া মাইনর থেকে তাদের বিতাড়িত করে। এ হেন জাতীয় দুর্যোগের সময় গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লী ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'প্রভিশনাল ল অব ফান্ডামেন্টাল অরগানিজেশন' (Provisional Law of Fundamental Organization) নামে এক বিল পাস করে। এর শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. রাষ্ট্রই সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক।

২. গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লী নির্বাহী এবং আইনগত সকল ক্ষমতার অধিকারী।

৩. তুরস্ক রাষ্ট্র গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লী কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং সরকার তুরস্কের গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লী 'সরকার' হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।

৪. গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লীর সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

৫. প্রতি দু'বছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৬. গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লী আইন জারী, বাতিল, চুক্তি সম্পাদনা ও রহিত করার ক্ষমতা রাখবে।

৭. জাতীয় এসেমব্লী কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট যে কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করতে পারবেন।

১৯২১ সালের জানুয়ারিতে প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী সুলতান-খলিফার ক্ষমতা হ্রাস করে জাতীয় সংসদকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করা হয়।

৭. আগস্ট, ১৯২১ ঃ ইসমত ইনোনু দ্বিতীয় দফায় ১৯২১ সালে গ্রীক বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে কামাল জাতীয় এসেমব্লী কর্তৃক প্রধান সেনাধ্যক্ষ (Commander-in-Chief) নিযুক্ত হলে তাঁর নেতৃত্বে তুর্কী বাহিনী সাকরয়া নদী তটে সংঘটিত যুদ্ধে গ্রীকদের পরাজিত করেন। সুতরাং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই আগস্ট মোস্তফা কামাল সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তুর্কী বাহিনীকে সংগঠিত করেন। উল্লেখ্য যে, সুলতান-খলিফার উপর এসেমব্লীর সিদ্ধান্ত কার্যকরী হল। সাকারয়ার যুদ্ধের বিজয়ে মোস্তফা কামালকে মার্শাল উপাধি প্রদান করা হয় এবং তিনি গাজীর সম্মানও লাভ করেন।

www.pathagar.com

৮. অক্টোবর, ১৯২২ ঃ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে গ্রীক-তুরস্ক সংঘর্ষ বাধে এবং বীরত্ব ও নেতৃত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কামাল পাশা গ্রীকদের বিধ্বস্ত করে ইজমির তথা আনাতোলিয়া থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি ইতালি, ফরাসী, ব্রিটিশ নৌবহরকে পর্যুদস্ত করে তুর্কী সার্বভৌমত্ব দার্দানেলিস, থ্রেস ও ইস্তাম্বুলে কায়েম করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ১১ই অক্টোবর মুদায়নার সন্ধিতে সুলতানের কোন উল্লেখ ছিল না বরং গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লীর পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মূলতঃ মুদায়না চুক্তি প্রসঙ্গে প্রাইস বলেন, "It represents a complete Allied surrender to the demands of the Nationalists." এর ফলে গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৯. নভেম্বর, ১৯২২ ঃ মুদায়না চুক্তির পর মিত্রবাহিনীর সঙ্গে তুরস্কের একটি চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য ল্যুসেন বৈঠকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর মিত্রপক্ষের তরফ থেকে পৃথক পৃথকভাবে "সুলতানের রাজকীয় সরকার এবং "গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লী" থেকে প্রতিনিধি প্রেরণের আহবান জানান হয়। এই ব্যবস্থা সালতানাতের পতনকে ত্বরান্বিত করে। ("This ill-conceived action precipitated the end of the Sultanate"—জিওফ্রি লুইস) ১লা নভেম্বর এসমব্লীতে এ নিয়ে দীর্ঘ ও উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা হয় এবং পরিশেষে মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, দ্বৈত-প্রশাসনের অবসান কল্পে সালতানাতের উচ্ছেদ করতে হবে। অবশ্য খিলাফত বলবৎ থাকবে এবং তা তুর্কী রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হবে। সার্বভৌমত্ব থাকবে রাষ্ট্রের; খলিফা ষষ্ঠ মুহাম্মদকে পদচ্যুত করা হবে এবং তার ভ্রাতুস্পুত্র আবদুল মজিদ নামেমাত্র খলিফা থাকবেন। ১২ই নভেম্বর ষষ্ঠ মুহাম্মদ ব্রিটিশ নৌবহরে মাল্টায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১০. ডিসেম্বর, ১৯২২ ঃ সালতানাতের উচ্ছেদে কামাল পাশা প্রতিরোধের সম্মুখীন হন এবং তিনি উপলব্ধি করেন যে, কোন প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শ এসেমব্লী থেকে পাস করতে হলে একটি সংঘবদ্ধ ও আদর্শস্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রয়োজন। মোস্তফা কামাল সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, তাঁর একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন। 'এসোসিয়েসন ফর দি ডিফেন্স অব দি রাইটস অব আনাতোলিয়া এন্ড রুমোলিয়ার' প্রয়োজন ফুরিয়েছে এবং এর স্থলে তিনি ডিসেম্বর মাসে 'পিপর্লস পার্টি' নামে এক রাজনৈতিক সংগঠনের কথা প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন।

১১. এপ্রিল, ১৯২৩ ঃ মোস্তফা কামাল পাশার পিপলস পার্টির প্রথম ম্যানিফেস্টো ঘোষিত হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল। 'পিপলস পার্টি' বা Halk Firkasi নয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই শর্তাবলীর মধ্যে প্রধান ছিল ঃ

১. সার্বভৌমত্ব জাতির উপর ন্যস্ত থাকবে।

২. তুর্কী জাতীয় উচ্চ পরিষদ ব্যতীত অন্য কোন সংস্থা জাতির ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হতে পারবে না।

www.pathagar.com

৩. সমস্ত আইন প্রণয়নের ব্যাপারে এবং অর্থনীতিসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম সাধারণভাবে জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতিমালা গ্রহণের দায়িত্ব থাকবে পরিষদের । বানার্ড লুইস যথার্থই বলেন, "These reiterate his views on popular sovereignty, representative government and the abolition of the Sultanate and then go on to sketch a number of necessary reforms, especially in fiscal and administrative matters."

১২. জুলাই, ১৯২৩ ঃ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে নভেম্বর ল্যুসেনে মিত্রশক্তির সঙ্গে তুরস্কের বৈঠক শুরু হলেও ইসমত ইনোনু তুরস্কের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে আপোস না করায় ব্রিটিশ প্রতিনিধিবর্গের নেতা লর্ড কার্জন এই বৈঠক ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ভেঙ্গে দেন। যাহোক, দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর পুনরায় বৈঠক শুরু হয় এবং উভয় পক্ষ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জুলাই ল্যুসেন চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। এই চুক্তি সেভার্সের ঘৃণ্য চুক্তির বিপরীত ছিল। কারণ এই চুক্তি কেবলমাত্র প্রথম মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত তুরস্ককে ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনরুত্থানের সুযোগই দিল না বরং অর্পিত ঘৃণ্য ও আত্মঘাতী শর্তাবলী থেকে মুক্তি পেল। উপরন্তু, বর্তমান তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের সমস্ত অঞ্চলে তুরস্কের সার্বভৌমত্ব কায়েম হয়, ক্যাপিচুলেশন প্রথা তিরোহিত হয়, গ্রীক-তুর্কী জনগোষ্ঠীর বিনিময় হয়। বানার্ড লুইসের ভাষায়, "ল্যুসেনের চুক্তি তুর্কী জাতীয় প্যাক্টে প্রণীত দাবী-দাওয়াগুলোকে মূলতঃ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দান করে।" (For the Treaty of Lausanne was substantially an international recognition of the demands, formulated on the Turkish National Pact) অন্যদিকে ফিলিপ প্রাইসের মতে, "তুরস্ক স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বশেষ সংগ্রামে জয়ী হল।" (Turkey won the last campaign in the War of Independence.)

১৩. আগস্ট, ১৯২৩ ঃ ষষ্ঠ মুহাম্মদের দেশ ত্যাগের ফলে সালতানাতের পতন, আঙ্কারায় পিপলস পার্টি গঠন এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত ম্যানিফেষ্টো প্রচারের ফলে তুরস্কে স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ল্যুসেন চুক্তি সম্পাদনার ফলে 'গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লীর' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১ই আগস্ট। কামাল পাশার সভাপতিত্বে 'পিপলস পার্টির' যে সভা সংসদে বসে তাতে ২৮৬ জন সদস্য ছিল। ২৩শে আগস্ট সংসদ ল্যুসেন চুক্তি অনুমোদন করে এবং ১৩ই অক্টোবর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ইস্তাম্বুলের স্থলে আনাতোলিয়ায় অবস্থিত আঙ্কারা নতুন সরকারের রাজধানী হিসেবে গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে ইসমত ইনোনু বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। আঙ্কারায় রাজধানী স্থাপন এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রাইস বলেন, "রাজধানী পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে আধুনিক তুরস্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।" ("The shift to Ankara symbolized a clean break with the Ottoman past") এতে প্রমাণিত হয় যে, নতুন রাষ্ট্র কোন রাজবংশ, সাম্রাজ্য অথবা ধর্মের (ইসলাম) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেনি বরং তুর্কী রাষ্ট্রের জাতীয় প্রতীক হিসেবে আনাতোলিয়ার তুর্কী ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ("The new state was based not on a dynasty or empire or a faith, but on the Turkish nation and its capital was in the Turkish homeland.")

www.pathagar.com

১৪. অক্টোবর, ১৯২৩ ঃ আঙ্কারায় রাজধানী স্থাপন তুর্কী সার্বভৌমত্বের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যায়। কামাল পাশা 'গ্র্যাণ্ড নাশনাল এসেমব্লীর' সভাপতি হলেও, তুরস্কে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম এবং কার্যকরী সরকার গঠিত হয়নি। এই সরকারের নাম ছিল 'তুরকী জাতীয় পরিষদ সরকার'। ফলে রাষ্ট্রীয় প্রেসিডেন্টের পদে কেউ অধিষ্ঠিত ছিলেন না। উপরন্তু, সালতানাতের উচ্ছেদ হলেও আবদুল মজিদ খলিফা হিসেবে ইস্তাম্বুলে সমাসীন ছিলেন; ফলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী ছিল, যদিও খলিফা ছিলেন একজন ক্রীড়ানক। মন্ত্রিসভার গঠন, দায়-দায়িত্ব পরিষদের প্রেসিডেন্টের উপর নির্ভর করত কিন্তু সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান না থাকায় রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দেয়। এই কারণে কামাল পাশা ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ই অক্টোবর ঘোষণা দেন যে, তুরস্ককে শীঘ্রই একটি প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করা হবে। এই ঘোষণা সংবিধানিক সঙ্কটের সৃষ্টি করলে কামাল সংবিধানের পরিবর্তন (amendment) এনে ঘোষণা দেন যে, (১) তুরস্ক একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হবে; (২) তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন; (৩) প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন; (৪) তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রী পরিষদ গঠন করতে পারবেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর সকাল ৬.৪৫ মিনিটে জাতীয় উচ্চ পরিষদের অধিবেশনে প্রজাতন্ত্র গঠনের সপক্ষে ভোট গৃহীত হয়। সর্বমোট ২৮৭ ভোটের মধ্যে ১৫৮টি ভোট প্রজাতন্ত্র গঠনের সপক্ষে পড়ে; বাকী ভোটারগণ (সদস্যগণ) ভোট দানে বিরত থাকেন। ফলে, তুরস্ক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। ৮.৪৫ মিনিটে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং কামাল পাশা নবগঠিত তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ইসমত ইনোনুকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ফতেহ্ বে জাতীয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রজাতন্ত্র ঘোষণার মূলে কামালের যে অসাধারণ নৈপুণ্য, কৌশল ও ক্ষিপ্রতা লক্ষ্য করা যায় তা সত্যই বিরল। Wortham বলেন, "Possibly it may stand to posterity as his finest achievement .... the credit for having fashioned the instrument that enabled Turkey to extract such terms belongs to Mustafa Kamal."

১৫. মার্চ, ১৯২৪ ঃ গণতন্ত্র ঘোষিত হবার পর মোস্তফা কামাল যুগপৎ জাতীয় মহাসভা, উযীর সভা এবং রাষ্ট্রীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হবার পর কামালের সম্মুখে মাত্র একটি বাধা থাকে। তা হচ্ছে তেরশত শতাব্দীর প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মুসলিম ঐক্যের প্রতীক শরীয়তের প্রতিভূ ও ঐশীতন্ত্রের (Theocracy) নিদর্শন খিলাফত উচ্ছেদ। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে কামাল তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন। (Entrenched forces of Islamic orthodoxy)-এর ফলে ঐশীতন্ত্রের (Theocracy) অবসান হয়, (২) খিলাফতের অবসানে ধর্মীয় প্রধান বা শেখ-উল-ইসলাম (Sheikh-ul-Islam)-এর পতন হয় এবং উলেমা সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। আইন, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের আধিপত্যের অবসান ঘটে। (The abolition of the caliphate was a

www.pathagar.com

crushing blow to their whole hierarchic organization) (৩) শরীয়ত মন্ত্রণালয় বাতিল করা হয় এবং ধর্মীয় স্কুল ও মাদ্রাসাকে জাতীয় শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়, (৪) শরীয়ত কোর্ট উচ্ছেদ করা হয়। ফলে উলেমা ও কাযীগণ ধর্মীয় ও আইন ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

১৬. এপ্রিল, ১৯২৪ ঃ খিলাফত শরীয়ত কোর্ট, শেখ-উল-ইসলামের মত বহুল প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অবসানে কামাল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি কঠোরতা ও দৃঢ়চিত্ততার সঙ্গে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল জাতীয় মহাসভায় সংবিধানের পরিবর্তন আনেন। এই অধিবেশনে তুরস্ক জাতির জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিরোধীদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি ফতেহ ওকয়ারকে (Fethi Okyar) ইসমত ইনোনুর স্থলে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এপ্রিলের অধিবেশনে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সংবিধানে গৃহীত হয় ঃ

(১) তুরস্ক একটি প্রজাতন্ত্র রইবে এবং প্রজাতন্ত্রের রক্ষাবেক্ষণ ও সুদৃঢ় করা হবে; (২) একটি সংঘবদ্ধ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হবে; (৩) ইসলাম ধর্মকে খিলাফতের রাজনৈতিক হাতিয়ার থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। (To cleanse and elevate the Islamic faith by rescuing it from the position of a political instrument to which it has been accustomed for centuries.") খিলাফতের উচ্ছেদে হারামাইনের রক্ষণাবেক্ষণকারী মুসলিম জগতের খলিফা হিসেবে স্বীকৃত আবদুল মজিদের সঙ্গে কামাল পাশা তথা জাতীয় পরিষদের বিরোধ বাধে। খিলাফতের সমর্থনে ভারত-উপমহাদেশে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয় এবং মুহম্মদ আলী ও শওকত আলী ইস্তাম্বুলে গমন করেন। এমন কি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আমীর আলী ও ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের নেতা আগা খান ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইসমত ইনোনুকে পত্র দিয়ে খিলাফত উচ্ছেদ না করার অনুরোধ জানান। কিন্তু এ ধরনের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় যখন মহাসভা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মার্চ সর্বশেস খলিফা আবদুল মজিদকে পদচ্যুত করে খিলাফতের অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সর্বশেষ খলিফা বিতাড়িত হলে ৬২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩ শতাব্দীর প্রাচীন প্রতিষ্ঠান (Institution) খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটে।

খিলাফত উচ্ছেদ ঃ খিলাফত উচ্ছেদের পরিণতি ছিল বিবিধ। (১) মুসলিম গোঁড়ামির প্রতি কামাল প্রথম আঘাত হানেন; (২) তুরস্কের ধর্ম হবে ইসলাম; (৩) তুরস্কের রাষ্ট্র ভাষা হবে তুর্কী; (৪) তুরস্কের রাজধানী হবে আঙ্কারা; (৫) সার্বভৌমত্ব নিঃশর্তভাবে জাতির উপর ন্যস্ত থাকবে; (৬) আইনে প্রণয়ন ও নির্বাহী ক্ষমতা জাতীয় উচ্চ পরিষদের উপর সর্বতভাবে ন্যস্ত হবে; (৭) মহাসভা নির্বাহী ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হবে; (৮) নির্বাহী ক্ষমতা মহাসভা কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা তার কোন মনোনীত নির্বাহী পরিষদ বা মন্ত্রণাসভা কর্তৃক ব্যবহৃত হবে। সর্বসময় মহাসভা সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে অথবা বাতিল ঘোষণা করতে পারবে; (৯) বিচার ক্ষমতা জাতির নামে রীতি ও আইনের আওতায় স্বাধীন বিচারালয় কর্তৃক ব্যবহৃত হবে; (১০) সংবিধানে গৃহীত প্রজাতন্ত্র কোন প্রকারেই বাতিল বা পরিবর্তন করা যাবে না।

www.pathagar.com

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে ঘোষিত ও গৃহীত সংবিধানের সংশোধনীতে সর্বময় ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় প্রধান জাতীয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং 'পিপলস পাটি'র প্রধান কামাল পাশার উপর ন্যস্ত হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। সংবিধানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কোন এক ব্যক্তির উপর কেন্দ্রীভূত করা। এই শক্তি একক শক্তি বা Vaheditì Kuva— যা বিরোধীদলের ইন্ধন জোগায়। ফলে, সংবিধানিক সঙ্কট দেখা দেয় যখন কামালের অনুরক্ত অনুসারী হোসেন রউফ, ইসমাইল কনেবুলাত এবং আবদুল হক আদনান তাদের সদস্যপদে ইস্তফা দেন। যাহোক 'পিপলস পার্টি'র নির্বাচনে ইসমত ইনোনু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন এবং সংসদে তিনি আস্থা ভোট অর্জন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'পিপলস পার্টির' নাম পরিবর্তন করে 'রিপাবলিকান পিপলস পার্টি' (Cumhuriyet Halk Firkasi) রাখা হয় এবং বিরোধী দল 'প্রগেসিভ রিপাবলিকান পার্টি' নাম ধারণ করে। এই বিরোধী দলে নেতৃত্ব দেন আলী ফুয়াদ পাশা কাযিম কারাবেকির পাশা। সাংবিধানিক সঙ্কটের মোকাবেলা করার জন্য কামাল পাশা ইসমতের স্থলে ফাতিহ ওকয়ারকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কুর্দি বিদ্রোহের ফলে তুরস্কের রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয় এবং ফাতিহর স্থলে কামাল পুনরায় ইসমতকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কামাল কঠোর হস্তে বিরোধী দল প্রগ্রেসিভ রিপাবলিকান পার্টিকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুন বাতিল করেন এবং এই বাতিল ঘোষণা করা হয় 'ল ফর দি মেনটিনেন্স অব অর্ডার' এর বলে। মূলত এই আইন ছিল স্বেচ্ছাচারী সরকারের একটি প্রধান অস্ত্র।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

কামাল আতাতুর্ক এবং কামালবাদ

এম. ফিলিপ প্রাইস বলেন, "আধুনিক তুরস্কের ইতিহাসে মোস্তফা কামালের মত, যাকে গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লী 'আতাতুক' বা তুর্কী জাতির পিতা উপাধি প্রদান করে, অপর কোন ব্যক্তি জনগণের মনে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।" ("No man in Modern Turkey every acquired such a moral ascendancy over his people as did Mustafa Kamal on whom the name Ataturk—Father of the Turks—was conferred by the grand National assembly".) একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কামাল পাশার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তুরস্কে সাংবিধানিক সংস্কার (Constitutional reform) সুসম্পন্ন হয়। 'রিপাবলিকান পিপলস পার্টি' এই সাংবিধানিক সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মে 'রিপাবলিকান পিপল্‌স পার্টি'র তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে জাতীয় সংগ্রামের সূচনা থেকে জাতীয় রাজনীতিতে অনুসৃত প্রধান রূপরেখা কাঠামো এ কংগ্রেসে নির্ধারিত হয়। মোস্তফা কামাল এই কংগ্রেসের উদ্বোধনী ভাষণে তুর্কী জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, বিচার, অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক, সামাজিক ক্ষেত্রে যে সংস্কারের প্রোগ্রাম দেন তা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এই নীতিমালা আটটি অংশে বিন্যস্ত। নীতিমালাগুলো নিম্নরূপ ঃ

অধ্যায়সমূহ ঃ

১. পিতৃভূমি (Fatherland), জাতি, রাষ্ট্রের প্রধান, সংগঠন, সংবিধান;
২. প্রজাতন্ত্রবাদ, জাতীয়বাদ, সাম্যবাদ, রাষ্ট্রীয়করণবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বিপ্লববাদ;
৩. অর্থনৈতিক নীতি;
৪. আর্থিক সংগতি সম্পর্কিত নীতি;
৫. জাতীয় শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি;
৬. সামাজিক জীবন ও গণস্বাস্থ্য;
৭. অভ্যন্তরীণ, বিচার বিভাগীয় ও বৈদেশিক নীতি;
৮. রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ।

কামালবাদ ঃ বহুল আলোচিত ও তুর্কী জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ কামালবাদ ছিল একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম। মোস্তফা কামালের মতবাদে পুষ্ট এই কার্যক্রম মূলতঃ ছয়টি তাৎপর্যপূর্ণ নীতিমালার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানে গৃহীত দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই নীতিমালা ব্যক্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

১. **প্রজাতন্ত্রবাদ ঃ** কামালবাদের মূলমন্ত্রের মধ্যে অন্যতম ছিল সালতানাত ও খিলাফতের স্থলে তুর্কী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল মহাসভায় সংবিধান সংশোধন করে প্রজাতন্ত্র কায়েম করা হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ই অক্টোবর সংবিধানের সংশোধন করে আঙ্কারায় জাতীয় সরকার গঠিত হলে তা খলিফার ইস্তাম্বুল সরকারের প্রতি হুমকী স্বরূপ ছিল। কারণ সালতানাতের পতন হলেও খিলাফত ছিল। উপরন্তু, উক্ত তারিখে আঙ্কারার সংবাদপত্রে প্রজাতন্ত্র গঠনের সংবাদ প্রকাশ পায়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ৩রা মার্চ জাতীয় মহাসভা খিলাফতের অবসান ঘটায় এবং ২০শে এপ্রিল তুরস্ককে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। মোস্তফা কামাল বলেন যে, "প্রজাতন্ত্র তুর্কী জাতির জন্য সততা, সম্মান ও আত্মসম্মানের রক্ষাকবচে পরিণত হয়।" কামাল পাশা বলেন, "The basis of liberty, equality and justice is the sovereignty of the nation." একই কথার পুনরাবৃত্তি করে একজন তুর্কী (ওসমানলী নয়) বলেন যে, সার্বভৌমত্ব নিঃশর্তভাবে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত এবং এই রাষ্ট্র একটি প্রজাতন্ত্র। এই প্রজাতন্ত্রটি এখন শৈশাবস্থায় রয়েছে (This is the name of the new born baby)—এই মহান উক্তিটি করেন আবদুর রহমান শেরেফ নামীয় একজন অটমান ঐতিহাসিক।

২. **জাতীয়তাবাদ ঃ** নবগঠিত তুর্কী প্রজাতন্ত্রের অন্যতম মূলমন্ত্র হচ্ছে জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা। ঘূণেধরা পতনোন্মুখ তুরস্কের 'রুগ্নব্যক্তি' অটমান সাম্রাজ্য সালতানাত ও খিলাফতের প্রতীক এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যয়ের পর ঘৃণ্য চুক্তি তুরস্কের সার্বভৌমত্বে প্রচণ্ড আঘাত হানলে কামাল আতাতুর্ক, ইসমত ইনোনু প্রমুখ স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তাবাদী নেতা তুরস্ককে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পান। খলিফার মর্যাদাহানীর মূল কারণ এই যে, দীর্ঘ তেরো শতাব্দী ব্যাপী খিলাফত মুসলিম বিশ্বে তার কার্যকারিতা হারিয়ে একটি শূন্য, ফাঁপা, অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতীকে পরিণত হয়। কারণ সেভার্সের চুক্তির ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে কেবলমাত্র আনাতোলিয়া ও ইস্তাম্বুলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ল্যুসেনের চুক্তি হৃত গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পেতে সাহায্য করলেও প্রাচীন রাজনৈতিক কাঠামোর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সচেতন বুদ্ধিজীবী ও স্বাধীনতাকামী সামরিক নেতাগণ সন্ধিহান হয়ে পড়েন। এই কারণে নতুন রাষ্ট্র ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং এই প্রজাতন্ত্র খিলাফত বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ করে। ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ খিলাফত বজায় রাখার জন্য আবেদন জানালেও কামাল পাশা তা নাকচ করে খিলাফতই উচ্ছেদ করেনি এবং জাতীয়তাবাদী মতবাদের ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্র কায়েম করেন। তিনি স্পষ্টই বলেন যে, খলিফা ধর্মীয় নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও আসলে তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা। কারণ তিনি সম্রাট হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং একই সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। মোস্তফা কামালকে খিলাফত গ্রহন করার প্রস্তাব করলে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন যে, "খলিফা যেহেতু সম্রাট তার প্রজা রয়েছে; আমি জাতীয়তাবাদী (Republican), গণতন্ত্রী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে আমার কোন প্রজা থাকতে পারে না।"

www.pathagar.com

তুর্কী জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান জাতীয় পরিষদ (গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লী) তুরস্ককে প্রজাতন্ত্রই ঘোষণা করেনি, পূর্ববর্তী অটমান বা উসমানলী সাম্রাজ্যের আমলে যত প্রকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ছিল তার নামও জাতীয়করণ করা হয় যেমন– উসমানীয় দেশ (Memalike-i-Osmaniye) হবে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র, উসমানীয় সরকার (Devlet-i-Osmaniye) হবে তুরস্ক সরকার, উসমানীয় বাহিনী (Ordu-i-Osmaniye) হবে তুর্কী বাহিনী। উল্লেখ্য যে, তুর্কী নাম সম্বলিত রাষ্ট্র এশিয়া মাইনরেই নয়, মধ্য-এশিয়ার বহু মুসলিম রাষ্ট্র তুর্কী বংশোদ্ভূত ছিল। শুধু তাই নয়, জাতীয়তাবাদীদের ব্যাপক প্রচারের জন্য 'রিপাবলিকান পিপলস পার্টি' কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তুর্কী প্রতিষ্ঠান (Turk Ocaklan) নামীয় যুব সমিতি প্রজাতন্ত্রের আমলে হাজার হাজার শাখা স্থাপন করে সাংগঠনিক ব্যবস্থা জোরদার করে।

৩. সাম্যবাদ ঃ তুর্কী সংস্কার আন্দোলনে রিপাবলিকান পিপলস পার্টির ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অন্যতম হচ্ছে সাম্যবাদ। এই নীতির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ক. ইচ্ছা ও সার্বভৌমত্বের উৎস জাতি। এই ইচ্ছা ও সার্বভৌমত্বের নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের মানবিক দায়িত্বসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্যবহার করা একটি বৃহৎ নীতি।

খ. আইনের চোখে সকলেই সমান; সকলে সমানভাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। কোন শ্রেণী, গ্রুপ, বংশ, ব্যক্তি বা জা'মাত রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে বিশেষ কোন প্রকার অধিকার দিতে পারবে না।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানের ৬৮ থেকে ৭৫ অনুচ্ছেদে তুর্কীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, সাম্যবাদ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রত্যেক তুর্কী স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং স্বাধীনভাবে জীবন নির্বাহ করে। অন্যের কোন প্রকার ক্ষতি না করে এক ব্যক্তি সকল প্রকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। প্রত্যেক তুর্কীর জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা রাষ্ট্র প্রদান করবে। বলপূর্বক কেহ অন্যের সম্পত্তি দখল করতে পারবে না। কোন ব্যক্তিকে তার ধর্ম, মতাদর্শ, দর্শন প্রভৃতির জন্য উৎপীড়ন করা যাবে না।

৪. রাষ্ট্রীয়করণবাদ ঃ কামাল পাশা আধুনিক তুরস্কের স্রষ্টা এবং তিনি দূরদর্শী জননেতা হিসেবে রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়করণ নীতি অনুসরণ করেন। এর মূলে তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল অতিদ্রুত অনগ্রসরমান একটি ক্ষয়িষ্ণু জাতিকে দ্রুতগতিতে আধুনিকীকরণ করা। এ কারণে তিনি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যাবলি (priorities) চিহ্নিত করে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অগ্রগতির সাথে সাথে জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও অগ্রগতিকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। কামাল নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেন।

www.pathagar.com

১. জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম;
২. শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৩. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৪. সামাজিক সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৫. কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সংক্রান্ত অর্থনৈতিক বিষয়াদি।

কামালবাদের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিল রাষ্ট্রীয় স্বার্থে রাষ্ট্রীয়করণ নীতি। রিপাবলিকান পিপলস পার্টির তৃতীয় বৃহৎ কংগ্রেসে রাষ্ট্রীয়করণ নীতির বিষদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। ব্যক্তিমালিকানার সঙ্গে রাষ্ট্রীয়করণ নীতির প্রভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য ব্যক্তিমালিকানা একেবারে তিরোহিত হয়নি। যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছে, "অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কার্যাবলি ব্যক্তিসমূহের পক্ষে সম্পাদনা করা অসম্ভব। ফলে বৃহৎ ও শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন পড়ে। অর্থাৎ এরূপ কার্যাবলিতে ব্যক্তিগণ যথেষ্ট স্বার্থ আদায় করতে পারবে না বলে উক্ত কার্য হতে সরে দাঁড়াবে কিন্তু উক্ত কার্যাবলি জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং তা সম্পাদন করতে রাষ্ট্র অবশ্যই কার্যকরী ব্যবস্থা নিবে। ব্যক্তির তুলনায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। রাষ্ট্র সকলের সাধারণ স্বার্থাবলী ও অগ্রগতি চিন্তা করে। ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অগ্রসরের প্রতি মূল্য দেয়।"

রাষ্ট্রীয়করণের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে এই উদ্দেশ্যে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সঠিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

১. খনিজ ও বনসম্পদ, খাল, রেল ও সমুদ্র পথে ভ্রমণের প্রতিষ্ঠানসমূহ, টাকশাল ও ব্যাংকসমূহ, পানি, গ্যাস, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, ইলেকট্রিক ও অন্যান্য স্থানীয় সরকারি প্রশাসনিক কাঠামো, যেমন পৌরসভা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়করণ।
২. বৃহৎ শিল্প-কলকারখানায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিপ্লব আনা সম্ভব।
৩. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এই কারণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গৃহীত হয়। শিক্ষাকে জাতীয়করণের জন্য জনশিক্ষা মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। উদার ও জনমঙ্গলকর স্বাস্থ্য নীতি গৃহীত হয়।
৪. দেশের প্রতিরক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে সামরিক বাহিনী এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান ভিত্তি অস্ত্রাগার এবং মারণাস্ত্র নির্মাণের কারখানা, যেখানে সরকারি তত্ত্বাবধানে অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হয়।
৫. **ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ** ঃ কামলাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অর্থাৎ রাষ্ট্র থেকে ধর্মীয় অনুশাসনকে পৃথক করা। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ অর্থ অধার্মিকতা নয়। রিপাবলিকান পিপলস পার্টির প্রোগ্রামে উল্লেখ আছে।

"পিপলস পার্টি রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সমস্ত আইন ব্যবস্থা এবং প্রথাসমূহ, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধুনিক সভ্যতায় নিশ্চিতকৃত নীতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্বের প্রয়োজন অনুসারে সম্পাদন এবং পরিচালনা করবার নীতি স্বীকার করে নিয়েছে।"

www.pathagar.com

তুর্কী প্রজাতন্ত্র প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন সালতানাত ও খিলাফত, শরীয়ত কোর্ট, ওয়াকফ সম্পত্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করে এসেছে। সালতানাত ও খিলাফতের উচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর তুর্কী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদসত্ত্বেও ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জারীকৃত সংবিধানে ইসলামকে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তেরো শতাব্দী ব্যাপী বিস্তৃত খিলাফতের উচ্ছেদ সহজ কাজ ছিল না এবং এ ক্ষেত্রে মোস্তফা কামাল যে ধৈর্য এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দেন তা তুলনাবিহীন। তিনি প্রথমে জনমত সৃষ্টি করে আধুনিকীকরণ নীতি প্রচার করেন এবং ক্ষয়িষ্ণু অটমান খিলাফতের ব্যর্থতার কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন। বানার্ড লুইস বলেন, "In abolishing the Caliphate Kamal was making his first open assult on the entrenched forces of Islamic orthodoxy. The traditional Islamic state was in theory and in the popular conceptaion a theocracy in which God was the sole legitimate source of both power and law and the sovereign, His Vice-gerent on earth." তুর্কী প্রজাতন্ত্রের প্রধান ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রেসিডেন্ট কামাল এবং তিনি একাধারে কয়েকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তুরস্ককে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন।

১. সালতানাত ও খিলাফত উচ্ছেদের পর সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের উপর ন্যস্ত হয়। দৃশ্যতঃ তিনি ধর্মীয় নেতা নন বরং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব;

২. পূর্বেকার নিজামী আদালত, শরীয়ত কোর্ট বাতিল ঘোষিত হয়;

৩. শরীয়ত ও ওয়াকফ মন্ত্রণালয় বাতিল করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের জন্য;

৪. ইসলামের নামে শপথ গ্রহণ না করে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী পরিষদ 'সততার নামে' শপথ গ্রহণ করেন;

৫. শেখ-উল-ইসলামের পদ বাতিল ঘোষিত হয় এবং এর ফলে উলামাদের কর্তৃত্ব সীমিত হয়ে পড়ে।

৬. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ মাদ্রাসা রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় এবং এর জন্য জনশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনে কুর্দীস্থানে গোঁড়াপন্থী নেতা শেখ সাঈদ (Sekyh Sakl) বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যাহোক, তার বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর তুরস্কে দরবেশদের আখড়া, সংগঠন, পোশাক, সভাসমিতি বাতিল করে দেওয়া হয়। একথা বলা যাবে না যে, কামাল পাশা ইসলাম বিরোধী ছিলেন। তিনি তুরস্ককে আধুনিকীকরণ করার প্রয়াস পান এবং ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেন। শারিয়া কোর্ট বাতিল ঘোষিত হলেও তুর্কী মুসলমানদের জীবনে শরীয়তের অনুশাসন প্রভাব বিস্তার করে। বানার্ড লুইসের ভাষায়,

"But even after all these changes, the Seriat still remained in force in most fields of family and personal law and was still

www.pathagar.com

administered by judges who, though they sat in secular courts, was still to a large extent, by training and outlook, doctors of the Holy Law."

অবশ্য কামাল পাশা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের 'ফ্যামিলি ল' (Family law) সংশোধন করে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আইন মন্ত্রণালয়ের উপর এর দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরবর্তীকালে সুইস সিভিল কোর্টের অনুকরণে 'ফ্যামিলি ল' ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, কামাল পাশা ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সংসদে ধর্ম সম্পর্কিত যে অনুচ্ছেদে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তা বাতিল করেন এবং তার স্থলে সংযোজিত হয়, "The Turkish State is republican, nationalist, populist, secular and reformist."

৬. **বিপ্লববাদ** ঃ রিপাবলিকান পিপলস পার্টির তৃতীয় অধিবেশনে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "পিপলস পার্টি, তুর্কী জাতির অনেক ত্যাগের বিনিময়ে সম্পাদিত সংস্কারসমূহ থেকে উত্থিত ও অগ্রগতির নীতিসমূহে বিশ্বস্ত থাকবার এবং ঐগুলিকে রক্ষার জন্য বিপ্লববাদকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করে।" একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, বিপ্লববাদী চেতনা, মানসিকতা ও কার্যক্রম না থাকলে পুরাতন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত অটমান সাম্রাজ্যকে একটি নতুন ও আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব হত না। নব্য তুরস্ক বিপ্লবের উত্তরসূরী হিসেবে কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস ও পরবর্তী পর্যায়ে পিপলস পার্টি তুরস্কের সর্বস্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। এই কারণে ফিলিপ প্রাইস একে 'জাতীয় বিপ্লব' (National Revolution) হিসেবে চিহ্নিত করেন। সালতানাত ও খিলাফতের বিপরীতে কামাল পাশার আনাতোলিয়ায় একটি সম্মেলন, যা 'গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেমব্লী' নামে পরিচিত ছিল, আহ্বানের মধ্য দিয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এই বিপ্লব সূচিত হয়। এই বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল 'ন্যাশন্যাল প্যাক্ট' (National Pact)। স্বাধীনতা লাভ ও জাতীয়তাবাদী নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কামাল এই বিপ্লববাদী নীতি গ্রহণ করেননি, বরং সমগ্র তুর্কী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তিনি মহাবিপ্লবের সূচনা করেন। এই কারণেই মহান জাতীয় পরিষদ তাকে 'আতাতুর্ক' বা তুর্কী জাতির পিতার মর্যাদায় ভূষিত করে।

বার্নাড লুইস বলেন, "At the darkest moment in their history, the Kemalist revolution brought new life and hope to the Turkish people, restored their energies and self respect and set them firmly on the road not only to independence but to that rarer and more precious thing that is freedom."

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

তুর্কী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও কামালের অবদান

যুদ্ধোত্তোর তুরস্ক

রাজনৈতিক ঃ প্রাইস যথার্থই বলেন, "১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীগণ একটি সাম্রাজ্যে হারায় কিন্তু একটি রাষ্ট্র লাভ করে।" (The Ottoman Empire was dead but a new Turkish nation had been internationally recognised in control of all the truly Turkish lands of Asia Minor and of a small part of southeast Europe together with the historical capitals of Constantinople and Adrianople")। প্রথম মহাসমরে যোগদানের ফলে নব্য-তুর্কী বিপ্লবীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ মুহাম্মদ সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হবার সময় তুরস্কের সামরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অধঃপতন চরম সীমায় পৌঁছায়। প্রথম মহাসমরে যোগদানের ফলে বিজয়ী মিত্রশক্তি জার্মানীর মিত্র তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ড করার চক্রান্ত করে। রাজনৈতিক অবস্থার বিচারে তুরস্ক সাম্রাজ্য ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং ক্রমশঃ কনস্টান্টিনোপল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মিশর ও গ্রীস স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে মেসিডোনিয়া, এপিরাস, আলবেনিয়া, থ্রেসের বৃহদংশ এবং সাইপ্রাস, এজিয়ান সাগরের কতিপয় দ্বীপপুঞ্জ, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং হারজেগোভিনা সুলতানের হস্তচ্যুত হয়। অনুরূপভাবে উত্তর আফ্রিকায় তুরস্কের প্রভুত্ব হ্রাস পেতে থাকে।

অর্থনৈতিক ঃ ১৯১০-১১ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ বলকান যুদ্ধ থেকে প্রথম মহাসমর পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর তুরস্ক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় তার লোকসংখ্যা যেমন হ্রাস পেতে থাকে তেমনি অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। বলাই বাহুল্য যে, পতনোন্মুখ তুরস্ক সাম্রাজ্যের পক্ষে মহাসমরে যোগদান ছিল রোমাঞ্চকর এ্যাডভেঞ্চারের সামিল এবং নিরপেক্ষবাদী তালোত পাশা ও জাভেদা পাশার বিরোধিতা সত্ত্বেও জার্মান অনুরক্ত এনভার পাশা তুরস্ককে মহাসমরে জড়িত করেন। এর ফলে তুরস্কের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সেভার্সের সন্ধি অনুযায়ী তুরস্কের সার্বভৌমত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং অটমান সাম্রাজ্যের সীমানা ৬,১৩,৫০০ বর্গমাইল থেকে ১,৭৫,০০০ বর্গমাইলে দাঁড়ায়। এর ফলে লোকসংখ্যা ২০ মিলিয়ন থেকে ৮ মিলিয়নে হ্রাস পায়। প্রথমত, সাম্রাজ্যের সীমানা ও লোকসংখ্যা হ্রাসের দরুন রাজস্ব হ্রাস পেলে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে যোগদানের জন্য আনাতোলিয়ার কৃষক সম্প্রদায়কে বাধ্য করা হয়। ফলে যুবক সম্প্রদায় কৃষিকার্য থেকে

www.pathagar.com

বিরত থাকে এবং বৃদ্ধ ও মহিলাগণ রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করে। লোকক্ষয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে যোগদানের ফলে উৎপাদনক্ষম তুর্কী যুবাপুরুষদের অভাব দেখা দেয়। তাই একদিকে যেমন অর্থনৈতিক বিপর্যয় শুরু হয় অপরদিকে বিদ্রোহ ও অরাজকতায় তুরস্কের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ কলুষিত হয়।

সামরিক ঃ সামরিক আঁতাতের মাধ্যমে তুর্কী জার্মানীর পক্ষে যোগদান করে। সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য তুর্কীদের জার্মানীর উপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু প্রথম মহাসমরে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জার্মানী ব্যস্ত থাকায় স্বভাবত তুর্কী বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। উপরন্তু, রণক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা মিত্রশক্তির হাতে থাকায় মেসোপটেমিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে তুর্কী বাহিনীর ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। মহাসমরে অসংখ্য তুর্কী সৈন্য নিহত হওয়ার ফলে তুর্কী বাহিনীর ক্ষিপ্রতা ও শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে। কনস্টান্টিনোপল বিজেতা দ্বিতীয় মুহাম্মদ, প্রথম সেলিম ও মহামতি সোলায়মানের সময় যে বিশাল তুর্কী বাহিনী গঠিত হয় তা হ্রাস পায় এবং পঞ্চম মোহাম্মদের সময় তা এসে দাঁড়ায় ৫০০০-এ এবং দেহরক্ষী বাহিনী ৮০০ জনে। সমরক্ষেত্রে বিমান ও দুর্গ সংস্কারের ক্ষমতা নির্ধারণ করে মিত্রপক্ষ। উপরন্তু, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠন তুরস্কের জন্য সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই সমস্ত কারণে তুর্কী সামরিক বাহিনী যুদ্ধোত্তর যুগে সম্পূর্ণরূপে দুর্বল ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ইউরোপীয় শক্তিগুলির চক্রান্ত ঃ এভারসলে বলেন "(যুদ্ধে পরাজয়ে) অটমান সাম্রাজ্য পূর্বের গৌরব হারিয়ে ফেলে এবং কয়েকটি প্রদেশের উপর এর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এটি ছিল একটি মেকী কাঠামো এবং বৈদেশিক শক্তিসমূহের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ একে আরও দুর্বল করে তোলে। 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি'র অসহায়তা ও অক্ষমতার সুযোগে রাশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়ন করার প্রয়াস পায় কিন্তু পূর্ব ইউরোপ ও নিকট এশিয়ায় জার্মানীর আবির্ভাবে ইউরোপীয় রাজনীতির পটভূমি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। মিত্রশক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ হতে তুরস্ককে লয়েড জর্জের ভাষায়, 'তল্পিতল্পাসহ (Bag and Baggage) বিতাড়িত করা।' উড্রো উইলসনের ঘোষিত 'চৌদ্দ দফা' আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের যে অঙ্গীকার ছিল, বৃহৎ শক্তিবর্গের চক্রান্তে তা ধূলিসাৎ হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া অধিকৃত অঞ্চলে তাদের 'প্রভাব ক্ষেত্র' (zones of influence) সৃষ্টির ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিচালিত করে। এমনকি এই তিন মিত্রশক্তির মধ্যে অঞ্চল ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বৈরী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। কনস্টান্টিনোপল মিত্রপক্ষের করায়ত্ত হয় এবং সুলতান বন্দীজীবন যাপন করতে থাকেন। সুলতানের শাসন ছিল স্বেচ্ছাচারী এবং রাজকর্মচারিগণ ক্রমশঃ অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠেন। এর ফলে সুলতান এবং তুর্কী সরকার জনপ্রিয়তা হারায়। উপরন্তু, প্যান-তুরানীয় আন্দোলন অ-তুর্কীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তুর্কীদের মধ্যে একতা লক্ষ্য করা যায়নি। এ ছাড়া তুরস্কে খ্রিস্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তুরস্কের সুলতানের প্রতি আনুগত্য ছিল সন্দেহজনক। কারণ তাদের দলপতিগণ ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বিদ্রোহ ঘোষণা

www.pathagar.com

করত। খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে সুলতানদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ শুরু হয় তার ফলে পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন খ্রিস্টান রাজ্য গড়ে ওঠে। সুলতান ও প্রশাসকদের বিলাসিতা এবং যুদ্ধের বিপর্যয়ে অর্থনৈতিক সঙ্কটে তুরস্কে ব্যাপকভাবে দূর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। আমেরিকান রিলিফ কমিটির তথ্যানুযায়ী ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ হতে তুরস্কের এক চুতর্থাংশ লোক অনাহার ও মহামারীতে প্রাণত্যাগ করে। ১৯১৪ হতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ তুরস্কের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির যে অপমান, লাঞ্ছনা ও অমর্যাদা প্রদর্শন করে তার প্রতিবাদস্বরূপ ১৯১৯ হতে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছর নব্য-তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা বীরশ্রেষ্ঠ কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুর্কীগণ সংগ্রাম করে।

ষষ্ঠ মুহাম্মদ সর্বশেষ খলিফা-সুলতান ঃ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে যুদ্ধের সমাপ্তিতে সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করলে তার স্থলে তদীয় ভ্রাতা ষষ্ঠ মুহাম্মদ অটমান সাম্রাজ্যের সবশেষ খলিফা-সুলতানের পদে অধিষ্ঠিত হন। পূর্ববর্তী তুর্কী সুলতানদের মত ষষ্ঠ মুহাম্মদ স্বৈরাচারী এবং গণতন্ত্রবিরোধী ছিলেন। তিনি ক্ষমতাসীন হয়ে 'কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস'কে যুদ্ধে বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেন এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর পরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন।

তুরস্ক ধ্বংসের গোপন চুক্তি ঃ প্রথম মহাসমরের সমাপ্তিতে বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ বিজিত রাষ্ট্রের উপর অপমানজনক শর্ত আরোপ করে। যুদ্ধচলাকালীন সময়ে মিত্রশক্তি ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও রাশিয়া তুরস্ককে ধ্বংস করবার পরিকল্পনা করে কয়েকটি চুক্তির মাধ্যমে।

ক. **কনস্টান্টিনোপল চুক্তি (১৮ই মার্চ ১৯১৫) ঃ** বসফোরাসের পশ্চিম তীর, মার্মরা সাগর এবং থ্রেস, এশিয়া মাইনরের উত্তর-পূর্বাংশ ইমপ্রেস এবং তিউনিস দ্বীপ দু'টি রাশিয়াকে প্রদান করা হল। আরবদেশে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা হল।

খ. **লন্ডন গোপন চুক্তি (২৬ এপ্রিল, ১৯১৫) ঃ** অটমান সাম্রাজ্যের কতিপয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ইতালিকে প্রদান করা হল।

গ. **সাইকস-পিকট চুক্তি (১৬ই মে, ১৯১৬) ঃ** এরজেরুম, তেবরিজন্দ, তিউনিস রাশিয়া লাভ করবে; এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল এবং সিরিয়া ফ্রান্সকে প্রদান করা হবে; বাগদাদ, হাইফা ও দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া ব্রিটেন লাভ করবে।

ঘ. **সেন্ট জ্যা ডি মরীন চুক্তি (১৭ই এপ্রিল, ১৯১৭) ঃ** ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে সম্পাদিত এই চুক্তি মোতাবেক ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে অঞ্চল বন্টনের বিবেচনা করা হয়।

স্মার্নায় নৃশংসতা ঃ প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরে উপরোল্লিখিত চুক্তিসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, তুরস্ককে জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য মিত্রশক্তি বদ্ধপরিকর ছিল। মিত্রশক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত বিভেদ ও গোলযোগের ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন বিলম্বিত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মহান রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেনি। এর ফলে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের চুক্তি স্থগিত

www.pathagar.com

হয়ে যায় এবং সুলতান কনস্টান্টিনোপল হতে রাজত্ব করতে থাকেন। গ্রীস কনস্টান্টিনোপল লাভ করার আশা করে কিন্তু রাশিয়ার বিরোধিতায় তা সম্ভবপর হয়নি। এমতাবস্থায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার সময় গ্রীক প্রধানমন্ত্রী ভেনিকেলস্ মার্মরা সাগর হতে স্মার্না পর্যন্ত অঞ্চল ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবী করেন। মার্মরা সাগরের অন্যান্য অঞ্চল আন্তর্জাতিক করবার প্রস্তাব করা হয়। পশ্চিম আনাতোলিয়ায় তুর্কী ও গ্রীকদের বসবাস ছিল; যদিও তুর্কীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ক্রিমেনস এবং ব্রিটেশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সমর্থন লাভ করে গ্রীক বাহিনী ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে স্মার্নায় অবতরণ করে। স্মার্নায় তারা নিরস্ত্র তুর্কীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। সেখানে গ্রীক বাহিনী কর্তৃক পৃথিবীর অন্যতম জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারী-পুরুষ ও শিশু নিধন দ্বারা একটি সুপরিকল্পিত উপায়ে গ্রীকগণ স্মার্নায় তুর্কীদের নিশ্চিহ্ন করবার প্রয়াস পায়। এই কাপুরুষোচিত ও বর্বর হত্যাকাণ্ড সমগ্র তুরস্কে ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণার সঞ্চার করে। এর ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরও ত্বরান্বিত হয় এবং আশাহত ও নিপীড়িত তুর্কী জাতিকে সংঘবদ্ধ করে তুর্কী গৌরব অক্ষুণ্ন ও অম্লান রাখবার জন্য তুর্কী বাহিনীর একজন সামান্য কর্নেল মোস্তফা কামাল এগিয়ে আসেন।

মোস্তফা কামালের নেতৃত্ব (১৮৮১-১৯৩৮)

প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা ঃ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী মোস্তফা কামাল ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক ও তুর্কী জাতির প্রতিষ্ঠাতা। স্যালোনিকার একটি কৃষক পরিবারে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের তার জন্ম হয়। তার পিতা আলী রেজা গোঁড়া ছিলেন না এবং চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তার সুযোগ্য পুত্র মোস্তফা পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী হন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে তার পিতার মৃত্যু হলে তিনি আর্থিক সঙ্কটে পড়েন। মোস্তফা কামাল তার মাতা যোবায়দার সঙ্গে এক মামার বাসায় বসবাস করতে থাকেন। তিনি কৃষিকার্যেও কিছুকাল নিয়োজিত ছিলেন। এ কাজের পরিশ্রম এবং কর্তব্যবোধ পরবর্তীকালে মোস্তফাকে অদম্য স্পৃহা ও অফুরন্ত শক্তির অধিকারী করে। তার বুদ্ধিমতী মাতা তাকে এগার বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি করেন। কিছুকাল অধ্যয়ন করবার পর তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও আদর্শবান ছিলেন। এই কারণে তিনি সাধারণ মাধ্যমিক স্কুল ছেড়ে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মনাস্তিরের সামরিক স্কুলে ভর্তি হন। মাতার অজ্ঞাতেই তিনি স্যালোনিকার সামরিক একাডেমীতে যোগদান করেন। কিন্তু তার মাতা জানতে পেরে তাকে আশীর্বাদ করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি উন্নতি লাভ করেন এবং তার মেধা ও কর্মদক্ষতার জন্য তাকে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের সামরিক একাডেমীতে বদলী করা হয়।

ওয়াতন ঃ সামরিক একাডেমীতে মোস্তফা কামাল যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং তিনি ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি রুশো ও ভলটেয়ারের বিপ্লবাত্মক প্রবন্ধাদি পাঠ করে স্বাধীনতা, সাম্যবাদ, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন। কনস্টান্টিনোপলে তিনি মুক্ত চিন্তার অনুসারীদের সঙ্গে মিলিত হন এবং নবীন সামরিক

ক্যাডেটদের সঙ্গে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। তেইশ বছর বয়সে তিনি ক্যাপটেনের পদমর্যাদা লাভ করে সামরিক একাডেমী ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় আবদুল হামিদের রাজত্বকালে কনস্টান্টিনোপলের তরুণ সামরিক অফিসারবৃন্দ সুলতানের স্বৈরতন্ত্রের সমালোচনা করেন এবং ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তিকে সুস্থ করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তারা একটি সামরিক অভ্যুত্থানের প্রয়াস পান কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। যে গোপন সমিতি (ওয়াতন) এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে তার সদস্যদের নির্বাসিত ও কারারুদ্ধ করা হয়। মোস্তফা কামাল এই সমিতির সদস্য ছিলেন এবং তাকেও কয়েক মাস কারাবরণ করতে হয়। মুক্তি লাভ করে মোস্তফা দামেস্কে অবস্থিত তুর্কী পঞ্চম বাহিনীতে যোগদান করেন। কামালকে নির্বাসিত করে সুলতানের ধারণা জন্মেছিল যে মোস্তফার বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারাও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। কিন্তু স্বাধীনচেতা ও বীরদীপ্ত মোস্তফা কামাল 'ওয়াতন' নামে পূর্বে গঠিত গোপন সমিতির একটি শাখা দামেস্কে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নবীন বিপ্লবী সেনাদের সহযোগিতায় এই গোপন সমিতির পথিকৃৎ হিসেবে তুরস্ক বিপ্লবকে সুদূরপ্রসারী করেন।

'কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস' ঃ দামেস্কে নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে মোস্তফা কামাল স্বদেশ আগমন করে সেখানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে জোরদার করবার মনস্থ করেন। তিনি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে স্যালোনিকায় বদলি হয়ে নব্য-তুর্কী আন্দোলনে যোগদানের চেষ্টা করেন। কিন্তু তার বিপ্লাবাত্মক চিন্তাধারার জন্য তাকে সেখানে যেতে দেওয়া হয়নি। অতঃপর তিনি ছুটি গ্রহণ করে প্রথমে সিরিয়া যান এবং পরে মিসরগামী জাহাজে এথেন্স হয়ে স্যালোনিকায় আগমন করেন। নব্য-তুর্কী আন্দোলন ইতিমধ্যে দানা বেঁধে ওঠে এবং সুলতানকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনে বাধ্য করা হয়। কিন্তু সুলতানের বিরোধিতার জন্য তাকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পদচ্যুত করে তার তরুণ ভ্রাতা পঞ্চম মুহাম্মদকে সিংহাসনে বসান হয়। এই সময় কামাল গ্রেফতারী পরওয়ানা এড়িয়ে গাজাতে গিয়ে আত্মগোপন করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে দেখতে পান যে, তার প্রতিষ্ঠিত 'ওয়াতন' বৃহৎ আকার ধারণ করে 'কমিটি অব ইউনিয়ন এণ্ড প্রগ্রেস'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। কামাল শুধু এই কমিটির সদস্যপদই লাভ করেন নি, বরং এতে নেতৃত্ব দান করেন।

প্রথম মহাসমর ঃ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নব্য-তুর্কী বাহিনীর ক্ষমতা লাভ এবং এনভার পাশার জার্মানপ্রীতি প্রভৃতি কারণে কামালের সঙ্গে সামরিক নেতৃবৃন্দের মতবিরোধ দেখা দেয়। এই কারণে প্রথম মহাসমরে তাঁকে উপেক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন জার্মান কমান্ডারের অধীনে তিনি গ্যালিপলির লেফটেন্যান্ট কর্নেলের পদমর্যাদা লাভ করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিপলির যুদ্ধে তাঁর অসীম বীরত্ব ও সামরিক কৌশলে তুর্কীদের মনে স্বাধিকার লাভের আশার সঞ্চার হয় ব্রিটেনের সেনাবাহিনীকে দার্দানেলিস অবরোধে বাধা প্রদান করে কামাল অসামান্য সামরিক খ্যাতি অর্জন করেন এবং তাঁকে জাতীয় বীরের সম্মান দেওয়া হয়। যুদ্ধরত থাকলেও তিনি তুর্কী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

www.pathagar.com

কামালের ভূমিকা ঃ প্রথম মহাসমরে তুরস্কের শোচনীয় পরাজয়, তুরস্কের উপর আরোপিত ঘৃণ্য ও অপমানজনক চুক্তি, রাজনৈতিক অসন্তোষ, সামরিক বিশৃঙ্খলা, তুরস্ককে খণ্ড বিখণ্ড করবার পরিকল্পনা, সুলতানের একনায়কত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং 'কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেসের' অকার্যকারিতার ফলে অটমান সাম্রাজ্য পতনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছায়। সর্বোপরি, স্মার্নায় তুর্কীদের নিধন সমগ্র তুরস্কে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মিত্রপক্ষের কনস্টান্টিনোপল আগমনের সময় কামাল রাজধানীতে ছিলেন এবং তুর্কীদের অপমানের নীরব সাক্ষী হিসেবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, তুরস্ককে পরাজয়ের গ্লানি হতে উদ্ধার করে নতুন রাষ্ট্রে পরিনত করতে হবে। তিনি সহজেই উপলব্ধি করেন যে, প্রথম মহাসমরে পরাজয়ের পর সাত শত শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপৃত পতনোন্মুখ অটমান সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ওয়াভি বলেন, "একটি স্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যদি পরিচালিত করা না হয়, তা হলে তুর্কী জাতির কোনই ভবিষ্যৎ নাই।" কামাল এটা অনুধাবন করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। তিনি মনে মনে স্থির করেন যে, আনাতোলিয়ায় গমন করে এই আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। কিন্তু সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং এনভার পাশার সঙ্গে কামালের শত্রুতা থাকায় তাঁকে রাজধানী হতে তৃতীয় বাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেলের পদ প্রদান করে আনাতোলিয়ার সামসুনে বদলি করা হয়।

ন্যাশনাল প্যাক্ট ঃ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ২২শে জুন কামাল তাঁর বিশ্বস্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের নিকট প্রেরিত একটি ইশতিহারে তুর্কী জাতির এই মহাদুর্দিনে রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য একটি জাতীয় পরিষদ গঠন ও সেভার্সে একটি কংগ্রেসের বৈঠকের আহ্বান করেন। সুলতান একথা জানতে পেরে তাকে সামরিক পদ থেকে অব্যাহতি দেন, কিন্তু সামরিক বাহিনী তাঁকে পূর্ণ সমর্থন দান করে। তিনি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জুলাই বিদ্রোহী নেতা রিফাত বে, রউফ বে এবং আলী ফুয়াদ পাশার সঙ্গে আলোচনা করেন। আমাসিয়ায় এই নেতৃতবর্গ মিলিত হয়ে আধুনিক তুর্কী রাষ্ট্রের প্রথম শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করেন। অতঃপর ২৩শে জুলাই হতে ১৭ই আগস্টের মধ্যে এরজেরুমে একটি জাতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটি ন্যাশনাল প্যাক্ট (National Pact) নামে পরিচিত ছিল। এ সভার নাম ছিল 'জাতীয় স্বাধিকার রক্ষার জন্য পূর্ব প্রদেশীয় সমিতি' (এসোসিয়েসন্ ফর দি ডিফেন্স অব দি রাইটস অব ইষ্টার্ণ আনাতোলিয়া)। এই সভায় মোস্তফা কামালকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের অনুষ্ঠিত সেভার্সের উক্ত সভায় এরজেরুম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন করা হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তুরস্ককে বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত করে জাতীয় সরকার গঠন এবং তুরস্কের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য একটি জাতীয় সভা আহ্বান করতে হবে।

জাতীয় পরিষদ ঃ তুর্কী জাতীয়তাবাদী দলের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে কামাল অনাচার ও স্বেচ্ছাচারের অভিযোগে দামাদ ফরিদ পাশার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী করেন। দু'বার টেলিগ্রাম করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে আনাতোলিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং কর্মপরিষদ কামালের নেতৃত্বে শাসনভার গ্রহণ করে। অবশ্য সুলতান ফরিদ পাশার স্থলে আলী রেজা পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

সরকারের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী দলের বৈঠকে একটি নব-নির্বাচিত 'চেম্বার অব ডেপুটিজ' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আলী রেজা কামালপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইত্যবসরে মিত্রপক্ষের ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১০ই আগস্টের সেভার্সের ঘৃণ্য চুক্তিতে সর্বশেষ তুর্কী সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই অপমানকর চুক্তির ফলে বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্য কনস্টান্টিনোপল এবং আনাতোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হল। এদিকে নবগঠিত 'চেম্বার অব ডেপুটি'তে কামাল এবং তার জাতীয়তাবাদী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে তিনি অতি সহজেই একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করেন। সুলতান কামালকে গ্রেফতার করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রউফ বে সহ কামালের জাতীয়তাবাদী সদস্যদের গ্রেফতার করে নির্বাসন দিলে সমস্ত তুর্কী জাতি একতাবদ্ধ হয়ে কামালের নেতৃত্বে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এদিকে অটমান সংসদ বাতিল ঘোষিত হয়। বিতাড়িত কামালবাদিগণ আঙ্কারায় আগমন করে কামালের যোগ্য নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ২৩শে এপ্রিল একটি 'মহান জাতীয় পরিষদ' গঠন করেন। এই পরিষদ কামালকে সভাপতি ও সরকার প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করে এবং আধুনিক তুরস্কের সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করে। মহান জাতীয় পরিষদ রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হল। জাতীয় পরিষদের সকল সদস্য 'জাতীয় প্যাক্ট (National Pact)-এ স্বাক্ষর দান করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি এই পরিষদ আঙ্কারায় একটি parallel সরকার গঠন এবং কতিপয় আইন-কানুন প্রণয়ন করে; যথা- (১) জনগণের সার্বভৌমত্ব; (২) অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার; (৩) 'গ্রান্ড ন্যাশন্যাল এসেমব্লী' গঠন করা হয়। এই এসেমব্লীর মেয়াদ থাকবে দু' বছর এবং এর একজন প্রেসিডেন্ট থাকবে। এই সরকারের ঘোষণা দ্বারাই নব্য-তুরস্ক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হলেও একে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্বাধীনতা, তেজস্বিতা, বলদৃপ্ততা এবং জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ মোস্তফা কামাল জাতির এই যুগসন্ধিক্ষণে অসীম ধৈর্য, পরাক্রম ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা তুরস্ককে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

ইনোনুর যুদ্ধে গ্রীকদের পরাজয় ঃ প্রাইস বলেন, "নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে মোস্তফা কামালের কর্তব্য ছিল জাতীয় মুক্তি সুনিশ্চিত করা।" ব্রিটিশ ও তাদের ক্রীড়নক সুলতান ষষ্ঠ মুহম্মদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নির্মূল করবার প্রচেষ্টা এবং চুক্তির কার্যকারিতায় গ্রীক সৈন্য বাহিনীর স্মার্নায় অবতরণ এবং তুর্কীদের নৃশংস হত্যার ফলে মোস্তফা কামাল বিচলিত হয়ে পড়েন। পাশ্চাত্য চক্রান্ত নিশ্চিহ্ন করবার জন্য তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জুন আনাতোলিয়া এবং থ্রেসে আগত গ্রীকদের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেন। কিন্তু এই সময় তুরস্কের নিয়মিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী না থাকায় তাদের সমূহবিপদের মোকাবিলা করতে হয়। কামাল ও তাঁর দুজন সহচর ইসমাত ও ফেরজী পাশার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অল্প দিনের মধ্যে একটি নিয়মিত তুর্কী বাহিনী গঠিত হয়। তুর্কী বাহিনী রাশিয়া হতে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে গ্রীকদের অগ্রগতিকে রোধ করে এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ইনোনুর যুদ্ধে গ্রীকদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে। ইনোনুর যুদ্ধকে জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীর প্রথম সফল অভিযান বলা হয়ে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম বীরত্ব প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কামাল পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে কূটনৈতিক

www.pathagar.com

তৎপরতা শুরু করেন। গ্রীস ও ব্রিটেনকে তুরস্ক হতে বহিষ্কারের জন্য তিনি ফ্রান্স, ইতালি এবং রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ফ্রান্স তুরস্কে ব্রিটিশ প্রভাব যেমন বরদাস্ত করত না, অপরদিকে ইতালি স্মার্নায় গ্রীক অভিযান ও উপস্থিতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করে।

সাকারিয়ার যুদ্ধ ও এর গুরুত্ব ঃ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বলশেভিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে ফ্রান্স-তুর্কী এবং রুশ-তুর্কী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রীক বাহিনী পুনরায় আক্রমণ পরিচালিত করে ইস্কিশেহেরে আগমন করে। কামাল শহর পরিত্যাগ করে সাকারিয়া নদীর পাড়ে শিবির স্থাপন করেন। সাকারিয়ার যুদ্ধে গ্রীক বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং তাদেরকে স্মার্ণার দিকে বিতাড়িত করা হয়। কামাল স্বয়ং অসীম বীরত্ব ও রণকৌশলের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গ্রীকদের পশ্চিম আনাতোলিয়া হতে বিতাড়িত করেন। কিন্তু থ্রেসে অপর একটি গ্রীক বাহিনী এবং কনস্টান্টিনোপল ও বসফোরাস প্রণালীতে ব্রিটিশ নৌবহরের উপস্থিতি তুর্কী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ব্যাহত করে। সাকারিয়া যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এর সাফল্য আঙ্কারা সরকারকে সুদৃঢ় করে, তুর্কী বাহিনীর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করে, পশ্চিমা শক্তিবর্গের মনে ভীতির সঞ্চার করে এবং সর্বোপরি কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট রাশিয়াই নয়, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ কামাল পাশার সঙ্গে চুক্তিতে আগ্রহী নয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর লয়েড জর্জ তুরস্কের সঙ্গে মুদানিয়ার চুক্তি (Mudanya Pact) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই চুক্তি মোতাবেক ব্রিটেনের সমর্থনপুষ্ট গ্রীকগণ থ্রেস থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। বসফোরাস থেকে ইতালি এবং ফ্রান্স নৌবহর প্রত্যাহার করলে কেবলমাত্র ব্রিটেনের নৌবাহিনী তথায় অবস্থান করে। এভাবে তুরস্ক জাতির একটি সাফল্যজনক আন্দোলনে উত্তরণ ঘটে।

ল্যুসেনের চুক্তি ঃ গ্রীকদের বিপর্যয়ে তুরস্কে সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির অবস্থিতিতে তুরস্ক বিচলিত হয়ে পড়ে। ফ্রান্স ও ইতালি নৌবহর প্রত্যাহার করলে দার্দানেলিসে কেবলমাত্র ব্রিটিশ নৌবহর অবস্থান করতে থাকে। রাজধানী কনস্টান্টিনোপলেও ব্রিটেনের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে। এমতাবস্থায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে নভেম্বর ল্যুসেনের ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি এবং জাতীয়তাবাদী তুরস্ক সরকার একটি বৈঠকে মিলিত হয়। রাশিয়াও এই সভায় যোগদান করে। তুরস্কের পক্ষ হতে নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাত পাশা ইনোনু বৈঠকে যোগ দেন। দীর্ঘ কয়েক মাস বৈঠকের পর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে জুলাই কার্জনের বিরোধিতার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলেও সেভার্সের সন্ধি বাতিল করে ল্যুসেনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আধুনিক তুর্কী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় ল্যুসেনের চুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এভারসলের মতে, "এই চুক্তি মোস্তফা কামালের বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার অভূতপূর্ব নিদর্শন।" এই চুক্তি তুরস্ককে অপমান এবং গ্লানিকর পরিস্থিতি হতে রক্ষা করে, ক্যাপিচুলেশন প্রথা বাতিল করে, তুরস্ক কনস্টান্টিনোপল, আড্রিয়ানোপল, পূর্ব গ্রস ফেরত পায়; পুরাতন জরাজীর্ণ অটমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে ওঠে আধুনিক তুরস্ক প্রজাতন্ত্র, তুর্কী অধ্যুষিত অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মিত্রশক্তির কূটনৈতিক পরাজয় ঘটে। ধর্মভিত্তিক খিলাফতের স্থলে Secular

www.pathagar.com

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়; পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সংস্পর্শে এসে তুরস্কের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। বার্বার ওয়েভ বলেন, "এটি মোস্তফা কামালের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এবং তুরস্কের পুনর্জাগরণে তাদের জন্য নতুন ভাবধারায় পুষ্ট এবং বিজ্ঞান, শক্তি, সংগঠন দ্বারা উজ্জীবিত একটি নতুন পৃথিবীর দ্বারোদঘাটন করে।"

খিলাফতের উচ্ছেদ ঃ বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তুর্কী জাতীয়বাদী নেতা ও আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কামাল সাকারিয়া যুদ্ধের সাফল্যে 'গাজী' উপাধী গ্রহণ করেন। জাতীয় পরিষদের সভাপতি কামাল পাশাকে খিলাফত এবং সালতানাত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। তিনি সহজেই উপলব্ধি করেন যে, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের একতার প্রতীক এবং ধর্মীয় নেতা হিসেবে সুলতানের যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে, কারণ তিনি খলিফা হিসেবে পরিচিত। খিলাফত একটি আন্তর্জাতিক ধর্মীয় পদবী এবং এর অবর্তমানে মুসলিম বিশ্বে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। তুরস্কও খিলাফতের অনুরাগী ছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও মোস্তফা কামাল এই পুরাতন ও প্রভাবশালী খিলাফত বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। সর্বশেষ খলিফা সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ কামালের বিরোধিতা করে তাকে হত্যার চেষ্টা করেন, জাতীয়তাবাদীদের কারারুদ্ধ ও নিপীড়ন করেন। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি সরকারকে উচ্ছদ করবার প্রয়াস আরম্ভ করেন কিন্তু খিলাফত উচ্ছেদের একটি অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ল্যুসেনে (Lausanne) অনুষ্ঠিত সভায় ষষ্ঠ মুহাম্মদের উপস্থিতিতে। জাতীয় পরিষদের বিনা অনুমতিতে তিনি উপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হয় এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ১লা নভেম্বর খিলাফত উচ্ছেদ বিল জাতীয় পরিষদ প্রণয়ন করে। এর ফলে খিলাফত রহিত হয় এবং সুলতান লন্ডনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিল পাস করে খিলাফত রহিত করা সম্ভবপর হয়নি, কারণ এর ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে ষষ্ঠ মুহাম্মদের স্থলে সাময়িকভাবে আবদুল মজিদ এফেন্দিকে নতুন খলিফা বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাঁর ধর্মীয় ক্ষমতা ব্যতীত কোন শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার ছিল না। খিলাফত রহিতের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিরোধ করে এবং খিলাফত আন্দোলন গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষেও আগা খান, সৈয়দ আমীর আলী, মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী খিলাফত বজায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু জাতীয় পরিষদ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর খিলাফত রহিত বিলের বিরোধিতার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিল পাস করে এবং প্রচার করে যে, তুরস্ক একটি প্রজাতন্ত্র এবং জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ইসলামই আধুনিক তুরস্কের রাষ্ট্রীয় ধর্ম কিন্তু রাষ্ট্রের প্রধান খলিফা নন, তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রধান প্রেসিডেন্ট। আবদুল মজিদ সাময়িকভাবে মুসলমানদের খলিফারূপে পরিচিত হলেও ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২রা মার্চ নবগঠিত রিপাবলিকান পিপলস পার্টির সভায় কামাল পাশা খিলাফত সম্পূর্ণরূপে রহিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ৩রা মার্চ জাতীয় সভা এই বিষয়ে বিল পাস করে। এর ফলে খোলাফায়ে রাশেদূনে সময় হতে অর্থাৎ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ হতে খিলাফত শুরু হয়ে দীর্ঘ তের শতাব্দীর পর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণরূপে বাতিল ঘোষিত হল। আবদুল মজিদ পরিবার পরিজনসহ বহিষ্কৃত হন।

www.pathagar.com

কামালের অবদান

মোস্তফা কামাল পাশা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ও ইউরোপের 'রুগ্ন দেশ' তুরস্ক বৈদেশিক আক্রমণ হতে রক্ষাই করেননি, নবজীবন দানও করেন। সেদিন থেকে তাকে ত্রাণকর্তা বলা যেতে পারে। তিনি ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে তুরস্ককে একটি আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তিনি তার অতুলনীয় সংস্কার দ্বারা সালতানাত, খিলাফত, ক্যাপিচুলেশন ও মিল্লাত প্রথার অবসান ঘটান। পাশ্চাত্য প্রভাবে তিনি তুরস্কের আধুনিকীকরণে সফলতা লাভ করে এবং প্রগতিশীল, গণতন্ত্রী এবং সংস্কারপ্রবণ তুরস্ক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কামালকে জাতীয় পরিষদ 'আতার্তুক' বা 'তুর্কী জাতীর পিতা' নামে অভিহিত করে।

রাজনৈতিক সংস্কার ঃ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে কামাল পাশা জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল সামরিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতীক কামাল আতার্তুক তার অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ধীশক্তি, দৃঢ়চিত্ততা ও সামরিক শৌর্যবীর্য দ্বারা আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা লাভ করেন। নব্য-তুর্কী বিপ্লবের বিফলতায় কামাল উপলব্ধি করেন যে, তুরস্কের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করতে হলে একটি গণতন্ত্রপন্থী ও প্রগতিশীর রাজনৈতিক সংগঠন প্রয়োজন। এইকারণে সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেনের পদে যোগদান করেও তিনি রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি দামেস্কে অবস্থানকালে তুর্কী সংগঠন 'ওয়াতনে' (পিতৃভূমি সংস্থা-Watan) যোগ দেন এবং তাকে পিতৃভূমি ও স্বাধীনতাকামী সমিতি (Fatherland and Freedom Society) নামে পুনর্গঠিত করে। কামাল পাশার রাজনৈতিক সাফল্য আসে সামরিক গৌরব ও মর্যাদার মাধ্যমে। তার প্রতিষ্ঠিত 'ওয়াতন' বৃহৎ আকার ধারণ করে 'কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেসে'-এ রূপান্তরিত হয়। কামাল শুধু এই কমিটির সদস্য পদই লাভ করেননি বরং এতে নেতৃত্ব দেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মোস্তফা কামাল পাশা 'পিপলস পার্টি' গঠন করে সালতানাত উচ্ছেদসহ কতিপয় রাজনৈতিক সংস্কারে ব্রতী হন। পরবর্তী পর্যায়ে তুরস্ক তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একটি প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয় এবং তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এরপর খিলাফত বিলুপ্ত করে কামাল তুরস্ককে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী নীতি তাঁর ঘোষিত কামালবাদের (Kamalism) অন্যতম প্রধান মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসে আত্মনিয়োগ করেন এবং রাজধানী ইস্তাম্বুল থেকে আনাতোলিয়ার আঙ্কারায় স্থানান্তরিত করেন। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। কামালকে রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব ছিল এই যে, তিনি তুরস্ককে একটি (republican nationalist, populist, elitist, secular and reformist) রাষ্ট্রে পরিণত করেন। নব্য-তুর্কী বিপ্লবের তিনি অংশ গ্রহণ করলেও এনভার পাশার মত ব্যক্তিদের জার্মান প্রীতিতে তিনি এই সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তিনি নব-গঠিত তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের দিকপাল হিসেবে ঘোষণা দেন ঃ

www.pathagar.com

"The Turkish nation is ready and resolved to advance unhalting and undaunted on the path of civilization." অর্থাৎ তুর্কী জাতি নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং অকুতভয়ে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হতে সদাপ্রস্তুত এবং সংকল্পবদ্ধ।

ধর্মীয় সংস্কার ঃ কামাল পাশা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত উচ্ছেদ করে প্রমাণ করেন যে, তিনি একটি ধর্ম নিরপেক্ষ (secular) রাষ্ট্র কায়েম করেন। কামালবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের অর্থ অধার্মিকতা নয় বরং পার্থিব ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি থেকে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে পৃথকীকরণ। আধুনিকীকরণের নামে মোস্তফা ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করেন এবং রাষ্ট্র (state) থেকে ধর্ম (religion) কে পৃথকীকরণের মূলে ছিল নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী।

১. তুরস্ক প্রজাতন্ত্র জাতীয়তাবাদী নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত একটি রাষ্ট্র। তাই ধর্ম ভিত্তিক সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে দ্ব্যর্থহীন ও শর্তহীন জাতীয় সার্বভৌমত্বের উপর নির্ভরশীল।

২. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং সামাজিক জীবনে আধুনিক সভ্যতায় নীতিমালার অনুকূল নতুন সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, তারা উসমানীয় সাম্রাজ্যের মত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, এ সম্পর্কে কোন দ্বিধা নেই।

৩. বৈদেশিক নীতিতে ধর্মীয় নীতি বা মতবাদ ব্যবহার করার কোন সুযোগ নেয় এবং এ দ্বারা তুর্কী জাতির কোন উপকার হবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে কামাল আতাতুর্ক যে সাহসী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ওসমানলী সাম্রাজ্য ১৯২২-২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সাতাশ বছর সুদৃঢ় সালতানাত ও খিলাফত হিসেবে বজায় থাকে। বস্তুত খিলাফত ৬৩২ থেকে শুরু করে ১৩০০ বছর স্থায়ী হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ করা সহজ কাজ ছিল না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পূর্বে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে প্রথমে জনমত সৃষ্টি করা হয়। এতদসত্ত্বেও কুর্দী দরবেশদের বিদ্রোহ প্রজাতন্ত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। যাহোক, ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংস্কার কামাল আতাতুর্ক প্রবর্তন করেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য;

১. ১৯২২ সাল সালতানাতের অবলুপ্তি।

২. ১৯২৪ সালে খিলাফতের উচ্ছেদ; বানার্ড লুইস এ প্রসঙ্গে বলেন, "The abolition of Caliphate was a crushing blow to their whole hierarchic organization." অর্থাৎ খিলাফতের অবলুপ্তি তাদের ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ ছিল।"

৩. ১৯২৪ সালে শরীয়ত ও ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের বিলুপ্তি।

৪. ১৯২৮ সালে প্রেসিডেন্ট ইসলাম ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ না করে সততার নামে শপথ গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

৫. ক্যাপিচুলেশন অর্থাৎ অমুসলমান সম্প্রদায়ের আইন সামাজিক ও অন্যান্য সুবিধাদি ভোগের যে রীতি ছিল তার অবসান।

৬. নিজামিয়া আন্দোলন বিলোপ করা হয়; ওসমানলী যুগে এ আদালতে খ্রিস্টান, মুসলমান ও ইহুদী বিচারকেরা পাশাপাশি বসে আইন মোতাবেক প্রজাদের বিচার করতেন। এতে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

৭. শেখ-উল-ইসলামের পদ বিলোপ করা হয়। তিনি উকিলে-ই-শরিয়ত নামে অভিহিত হলেন।

৮. মক্তব, মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে শিক্ষা দফতরের উপর ন্যস্ত করা হয়।

৯. আরবী ভাষার সংস্কার করা হয় এবং আরবী হরফ পরিবর্তিত হয়ে তুর্কী ভাষা ও হরফ প্রচলিত হয়।

১০. ১৯২৫ সাল হিজরী সন পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক সময় ও পঞ্জিকা প্রবর্তিত হয়। আবদুল কাদের বলেন, "এর ফলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে পত্রাদি লেখার সুবিধা হলেও মুসলিম জগতের কিংবদন্তীর সঙ্গে তুরস্কের একটি দৃঢ়বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল।"

১১. ইসলামে মূর্তি নির্মাণ বেশরিয়তী কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ১৯২৬ সালে কামাল আতাতুর্কের একটি মর্মর মূর্তি খোদিত হয়ে প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হয়। বর্তমান আঙ্কারা যাদুঘরে এটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

১২. ১৯৩৪ সালে ধর্মীয় নেতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির ফেজ ও আলখাল্লা পরিধান নিষিদ্ধ ঘোষিত হল।

১৩. ১৯৩৫ সালে আরবী-ফারসী নামের পরিবর্তন করে তুর্কী নাম গ্রহণ বাধ্যতামূলক হল। কামাল নিজে 'আতাতুর্ক' এবং ইসমত পাশা 'ইনোনু' উপাধি গ্রহণ করেন।

১৪. ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যে প্রতিষ্ঠান ছিল, যেমন তরিকত, তা বিলুপ্ত হয়। কামাল বলেন, "বন্ধুগণ আমাদের জানা উচিত যে, তুরস্ক প্রজাতন্ত্র শেখ, দরবেশ ও মুরিদদের দেশ হতে পারে না। সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রকৃত তরিকত সভ্যতা তরিকত। পীর মুরিদদের আস্তানা অসামাজিক ও রাজনৈতিক আখড়া হতে পারে এ কথা মনে করে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর একটি সরকরি আদেশে এই সমস্ত তরিকতের আস্তানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমন কি দরবেশদের সমাধি (Turbe) ও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সামাজিক সংস্কার ঃ মোস্তফা কামালের সামাজিক সংস্কারের ফলে তুরস্কের সামাজিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। কামালের অসাধারন ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় তুরস্ককে নব জীবন দান করে। অটমান সুলতানদের শাসনামলে নারী ও পুরুষের স্বাধীন সত্ত্বা স্বীকৃতি পায়নি। কামাল পাশা তুরস্কের মহিলাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি স্বাধীনতা দেন; শুধু তাই নয়- সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীদের ও পুরুষের সম-

www.pathagar.com

অধিকার দান করেন। তুর্কী নারী-স্বাধীনতা (Women's lib.) আন্দোলনে পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রকটভাবে লক্ষণীয়। বিশ্লেষণ করলে নিম্নরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

ক. সুইস আইন ঃ প্রাচীন তুর্কী আইনের পরিবর্তন সাধন করে বিশেষ করে পারিবারিক আইন বাতিল করে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সুইস দিওয়ানী আইন সংসদ পাস করে। ইতিপূর্বে কামাল পরামর্শ দেন যে "নারীজাতি সামাজিক জীবনে পুরুষের সঙ্গে সম-মর্যাদা লাভ করে একে অপরের সাহায্যকারী হবে।" সভ্যতার মূলনীতি অগ্রগতি ও ক্ষমতার ভিত্তি হচ্ছে পরিবারিক জীবন। এই জীবনে নিকৃষ্টতা নিঃসন্দেহে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তিক্ততার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। পরিবার গঠনকারী নারী পুরুষ উভয়ের আবশ্যকীয় অধিকারের অধিকারী হবার জন্য পারিবারিক দায়িত্বসমূহে পূর্ণতা লাভ আবশ্যকীয়।"

সুইস 'ল' প্রবর্তনের ফলে শরিয়তী আইন বিলুপ্ত হল এবং নারীর পারিবারিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন দেখা দিল। (১) কুর'আন শরীফে বর্ণিত থাকায় বহু বিবাহ রহিত না করলেও স্পষ্টত এই প্রথা নিরুৎসাহ করা হয়। কারণ এটা নারী প্রগতি ও স্বাধীনতার প্রতি হুমকী স্বরূপ। বহু পত্নী গ্রহণে আইনের এমন বেড়াজাল সৃষ্টি করা হয় যে তা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়; (২) রেজিষ্ট্রিকরণ দ্বারা বিবাহ সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে এবং এর সাথে বৈধতা ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি লাভ সহজতর হয়; (৩) মেডিক্যাল সার্টিফিকেট গ্রহণ বিবাহের পূর্বে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং কেবল সক্ষম দম্পত্তিকে এরূপ সনদ দেওয়া হত; (৪) তালাক ঃ নারী স্বাধীনতার প্রধান অঙ্গ ছিল স্বামী যেমন স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত তেমনি স্ত্রীরও বিশেষ কারণে স্বামীকে তালাক দিবার অধিকার ছিল। ইতিপূর্বে অন্তঃপুরিকা স্ত্রীদের এ ধরনের কোন সুযোগ ছিল না; (৫) বহু বিবাহের ব্যতিক্রম দেখা যেত বিশেষ কারণে, যেমন স্বামীর সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা। প্রাচীন ও পুরাতন মূল্যবোধে ও ইসলামী অনুশাসনে অনুরক্ত গ্রাম্য মহিলাদের অপেক্ষা শহরের শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা মহিলাদের মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ বিশেষ কার্যকরী হয়। অবশ্য রাতারাতি নারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব ছিল না।

খ. নারী শিক্ষা ঃ কামাল আতাতুর্ককে তুর্কী নারী জাগরণের পুরোধা বলা হয়। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড একথা প্রচার করে কামাল তুরস্কের আধুনিকীকরণে নারীদের পুরুষের পাশাপাশি সম-অধিকার দেন। অবগুণ্ঠনরত নারীকে শিক্ষা দীক্ষায় তিনি অগ্রগতির সোপান হিসেবে তৈরি করেন। বিচার, চিকিৎসা, শিক্ষা, রাজনীতি এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্কী নারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারত। উল্লেখ্য যে, খালিদা (হালিদা) এদিবা খানুম (হানুম) তুর্কী প্রগতিবাদী ও নারী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। তিনিই ইস্তাম্বুল মহিলা কলেজের প্রথম স্নাতক ছিলেন। এই মহিলা একাধারে ছিলেন শিক্ষয়িত্রী, সৈনিক, বিপ্লববাদী, সাংবিধানিক, সমাজসেবী, গ্রন্থকার ও রাজনীতিবিদ। এই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তা নারী ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। এ. এম. আর্লে বলেন, "She deserves high rank among the distinguished women of the world" অর্থাৎ "পৃথিবীর বিদুষী নারীদের মধ্যে তার উচ্চ স্থান রয়েছে।" সহশিক্ষা

www.pathagar.com

প্রবর্তিত হয় এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীদেরকে বিদেশে প্রেরণ করা হত। আইন, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তুর্কী নারী স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে চাকুরি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে মুসলিম নারী জাগরণে এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ সময়ে নারী অধিকার রক্ষা সমিতিও গঠিত হয়।

গ. পর্দাপ্রথা বিলোপ ঃ মোস্তফা কামাল একবার মন্তব্য করেন, "ভ্রমণের সময় আমি শুধু গ্রামে নয় শহর ও নগরসমূহেও নারীদেরকে মুখমণ্ডল ও চক্ষুসমূহ নির্দিষ্টভাবে বন্ধ দেখতে পাই। বিশেষ করে এ গরমের মধ্যে এই অবস্থা তাদের জন্য কষ্টকর ও শাস্তিদায়ক বলে আমি মনে করি। তারা মুখমন্ডল দুনিয়াকে দেখাক এবং চক্ষু দ্বারা দুনিয়াকে দেখুক। এতে ভয়ের কিছু নেই।" ইসলামের 'নেকাব' বা পর্দা প্রথার প্রতি এরূপ চরম আঘাত দিতে ইতিপূর্বে কোন রাজনীতিবিদ সাহস করেননি। কামাল পাশা নারী আন্দোলন, স্বাধিকার ও নতুন জীবনাদর্শে তুর্কী নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে চান। এ কারণে তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে এক সরকারি ফরমানে নারীদের অবরোধ প্রথা বিলোপ করেন। স্বাধীনভাবে রাস্তায় চলাচলে আর কোন বাধা রইল না। কথিত আছে যে, "অবগুণ্ঠনাবতী নারীরা হেরেমের দরজা ভেঙ্গে দলে দলে রাস্তায় নেমে তাদের স্বাধীনতা ও প্রগতির অপূর্ব নির্দশন রাখেন।"

ঘ. রাজনৈতিক অধিকার ঃ ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বারা নারীদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও ভোট প্রদানের অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯৩৪ সালে তারা সংসদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে। রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বাধীনচেতা তুর্কী নারীদের অবাধ বিচরণ এক সময় অকল্পনীয় ছিল। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে তুর্কী নারীগণ অংশ গ্রহণ করে, যার ফলে ৩৯৯ জন সদস্য বিশিষ্ট সংসদে মহিলাদের সংখ্যা ছিল ১৭। এভাবে তুরস্কের নারী স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করে। শহরাঞ্চলে পর্দা প্রথা বিলুপ্ত হলেও গ্রামাঞ্চলে রক্ষণশীল পরিবারের মহিলাগণ পর্দা ব্যবহার করতে থাকেন।

ঙ. পোশাক পরিবর্তন ঃ তুর্কী সমাজের বিবর্তনে কামাল আতাতুর্ক বিশিষ্ট অবদান রাখেন। ইসলামের চিরাচরিত মস্তকাবরণের স্থলে পাশ্চত্যের অনুকরণে পোশাক ও মস্তকাবরণ পরিধান প্রবর্তন কামালের একটি বলিষ্ঠ সামাজিক সংস্কার বলে চিহ্নিত করা হয়। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তুর্কীরা আরবদের মত পাগড়ী ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ ঝুটি বিশিষ্ট গোলাকার লাল টুপী, যা মরক্কোর 'ফেজ' নামে অভিহিত, প্রচলিত করেন। নব্য-তুর্কীগণ মধ্য-এশিয়ার তুর্কীদের মত আস্ত্রাখান থেকে 'কল্পক' নামক শিরস্ত্রাণ আমদানি করে। সালতানাত-খিলাফতের বাহ্যিক প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত ফেজ টুপী পরিহার করে ইউরোপীয় 'হ্যাট' ব্যবহারের প্রয়াস পান কামাল। তিনি বলেন,

"তুরানী পোশাকের পুর্নজীবিত করবার দরকার নেই। সভ্য ও আন্তর্জাতিক পোশাক আমাদের জন্য উপযুক্ত পোশাক। তা পরিধান করব। পায়ে জুতা, উপরে প্যান্ট, ওয়েষ্ট কোট, সার্ট, টাইকোট এবং সর্বোপরি এদের সাথে মিলিয়ে রৌদ্র প্রতিরোধক শিরস্ত্রাণ যার আসল নাম 'হ্যাট' আমাদের জাতীয় পোশাক।"

www.pathagar.com

কামাল আতাতুর্ক সর্বপ্রথম এরূপ পোশাক পরে এনেবালো ও কাষ্টামনোয় গমন করেন। আধুনিক ইউরোপীয় পোশাকের প্রতি সমর্থন লাভের জন্য তিনি জনমত সৃষ্টি করেন। কামালের অনুকরণে প্রথমে সরকারি কর্মচারী ও পরে সাধারণ নাগরিকবৃন্দ 'হ্যাট' পরিধান করতে থাকেন। গ্রামের জনসাধারণ ও গোঁড়াপন্থীগণ 'হ্যাট' পরিধানকে ইসলাম বিরোধী মনে করলেও ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর ফেজ ও পাগড়ীকে জাতীয় পোশাক হিসেবে বাতিল এবং 'হ্যাট' সহ ইউরোপীয় পোশাক পরিধান বাধ্যতামূলক করে জনৈক কামালবাদী সংসদে একটি খসড়া আইন উপস্থাপন করলে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। নূরুদ্দীন পাশা ও অপর কয়েকজন সদস্য এই আইনের বিরোধিতা করেন। তুর্কীগণ খালি মাথায় চলাচল করা খুবই লজ্জাজনক মনে করত এবং এ কারণ পাগড়ী, ফেজ এবং পরিশেষে 'হ্যাট' ব্যবহার করে। কিন্তু 'Hat Law' কঠোর হস্তে প্রয়োগ করা হয় এবং যারা এই আইন অমান্য করে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হল। 'হ্যাট ল' মূলতঃ তুর্কী সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে। একদিকে যেমন সৈন্যবাহিনী, শিক্ষিত সমাজ এবং কামালবাদীরা ইউরোপীয় পোশাক বিশেষ করে 'হ্যাট', টেল কোট (Tailcourt) ব্যবহার করতে থাকে তেমনি অন্যদিকে গোড়াপন্থিগণ এই আইনকে 'কুফরী' বা ইসলাম বিরোধী হিসেবে ঘোষণা দেয়। ফলে সিভার্স, মারাস ও আর্জেরুমসহ ১০/১২টি শহর দাঙ্গা শুরু হয়। 'হ্যাট আইন' ফেজ নির্মাতাদের সর্বস্রান্ত করে। রাতারাতি ইউরোপীয় সাজার জন্য আধুনিক তুর্কীদের 'বহুরূপী হ্যাটওয়ালা' নামে নিন্দা করা হল। 'হ্যাট আইন' প্রসঙ্গে হালিদা এদিব বলেন, "অন্যান্য সংস্কারের তুলনায় এই আইন ছিল সর্বাপেক্ষা বাহ্যিক ও নিরর্থক"। বস্তুত 'হ্যাট আইনের' প্রধান ফল এই হল যে, একদিকে ধনবান ইউরোপীয় হ্যাট নির্মাতারা গরীব তুর্কীদের অর্থে ফেঁপে উঠল, অন্যদিকে তুরস্কে অরাজকতা সৃষ্টি হল। এতদসত্ত্বেও 'হ্যাট ল'র কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়। জোব্বা ও পাগড়ী কেবলমাত্র ধর্মীয় গোষ্ঠী, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মুফতি, ইমাম ও খতিবদের পরিধান করার অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মসজিদের বাইরে ইমাম-মুফতিদের পাগড়ী ও জোব্বা পরিধান নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

চ. পঞ্জিকা ব্যবহার ঃ কামালবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ককে একটি অত্যাধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। এ কারণে কামাল পাশা ইসলামের বহু অনুশাসন ও রীতি-নীতি তিরোহিত করেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হিজরী সনের স্থলে গ্রেগরী পঞ্জিকার প্রচলন। উল্লেখ্য যে, হিজরী চান্দ্র মাস হিসেবে গণনা করা হয়। ফলে মাসের মধ্যে কয়েকটি ২৯ অথবা ৩০ দিন হয়। এতে খাজনা আদায় বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য অটোমান সুলতান ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'মালী' বা অর্থনৈতিক পঞ্জিকা প্রবর্তন করেন। মূলতঃ এটি জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের পুনঃপ্রবর্তন; কিন্তু এই গণনা শুরু হয় হিজরী সনের তারিখ থেকে। দিন, ক্ষণ, মাস, বৎসর গণনায় কোন প্রকার বিঘ্ন যাতে না ঘটে তার জন্য তুর্কী সংসদ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে খ্রিস্টান গ্রেগরী ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে। ২৪ ঘন্টায় এক দিন গৃহীত হয়। এর ফলে হিজরী সনের অবসান হয়।

www.pathagar.com

ছ. পারিবারিক নাম-পদবী ঃ মোস্তফা কামাল দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং তিনি সমাজের প্রতি স্তরে সংস্কার কার্য পরিচালনা করেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে পারিবারিক পদবী-উপাধি ব্যবহার। প্রাচীন অটমান রীতি অনুযায়ী তুর্কী পুরুষগণ পাশা, এফেন্দী এবং মহিলাগণ 'হানুম' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সমগ্র তুর্কী ব্যাপী একই নামে বহু ব্যক্তি থাকায় তাদেরকে তাদের বাসস্থান অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়, যেমন কোনিয়ার আহমদ বা ইজমিরের আলী। কিন্তু এ ধরনের নাম ছিল বিভ্রান্তিকর। তা ছাড়া পিতা, প্রপ্রিতামহদের উপাধি সন্তান সন্তুতিদের উপর বর্তাত না, ফলে কোন পরিবারিক উপাধি (title) ছিল না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে প্রত্যেক তুর্কীকে পারিবারিক উপাধি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। যেমন অনেকে 'ওগলু' (সন্তান) পদবী গ্রহণ করে। ইসমত ইনোনু (যুদ্ধক্ষেত্র) এবং কামাল 'আতাতুক' পদবী গ্রহণ করেন। এই সংস্কারের ফলে প্রতি পৌর এলাকার নির্বাচন তালিকায় পারিবারিক উপনাম ব্যবহৃত হলে প্রতি ব্যক্তিকে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়।

জ. সাপ্তাহিক ছুটি ঃ অটমান সাম্রাজ্যে অফিস-আদালত, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজে কোন নির্দিষ্ট সাপ্তাহিক ছুটি ছিল না। যেমন স্কুলসমূহ বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুটি থাকত। শ্রমিকদের কোন নির্দিষ্ট ছুটি ছিল না। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করলো। পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তুরস্কের সরকারি অফিসসমূহের জন্য শনিবার দুপুরের পর থেকে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষিত হয়।

ঝ. গণ সমিতি (Turk olagi) ঃ কামাল আতাতুর্কের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব তুর্কী সমাজের প্রতি স্তরে অনুভূত হয়। রিপাবলিকান পিপলস পার্টি কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনামায় গণ সমিতি (Turk olagi) গঠনের বিষয় স্থান পায়। জিওফ্রি লুইস বলেন, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সংসদ গণজাগরণ ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংস্কার কার্যক্রম সুদূরপ্রসারী করার জন্য 'হালকেভী (Halkevis) বা গণ-কেন্দ্র গঠনের সুপারিশ করেন। এই গণ-সমিতি বা কেন্দ্র প্রতি শহরে ও গ্রামে প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সমিতিতে নয়টি শাখা ছিল ঃ (১) ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস; (২) সুকুমার শিল্প; (৩) নাটক; (৪) খেলাধূলা, (৫) সামাজিক সহযোগিতা; (৬) গণস্কুল ও বিদেশী ভাষা শিক্ষার কার্যক্রম; (৭) লাইব্রেরী ও প্রকাশনা; (৮) গ্রামীণ কার্যকলাপ এবং (৯) যাদুঘর ও প্রদর্শনী।

গণ-সমিতির মূল মন্ত্র ছিল এই যে, কোন প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শ ছাড়াই যে কোন ব্যক্তি এই সমিতিতে যোগদান করতে পারত। জে লুইস বলেন যে, "জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে যোগ দেয়।" (in a sincere spirit of brotherhood embracing all citizens of a nationalist outlook and loyal to the Revolutions") ১। প্রতিটি গণ-সমিতি একজন প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে পরিচালিত হত। ১৯৩২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৪টি, ১৪ই জুন আরও ২০টি, ১৯৩৩ সালে আরও ২১টি গণ-সমিতি খোলা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এই সমস্ত গণ-সমিতির পাশাপাশি 'গ্রাম্য

www.pathagar.com

যুব সংগঠন' (Village Institutes-koy enstituleri) গঠিত হয়। ১৯৫০ সালের মধ্যে সমগ্র তুরস্কে ৪,৩২২ গণ-সমিতি বা Halekodalari প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সমাজের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে কামাল পাশা এক বৈপ্লবিক সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন প্রবর্তিত করে আধুনিকীকরণের প্রয়াস পান।

ঞ. ভাষা সংস্কার ঃ মোস্তফা কামাল পাশার সর্বাপেক্ষা বিপ্লবাত্মক সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরবী ভাষা ও হরফের (script)-এর স্থলে তুর্কী ভাষা ও হরফের প্রবর্তন। কিন্তু এই পরিবর্তন সহজে সম্পন্ন হয়নি। আব্দুল কাদের যথার্থই বলেন, "তুরস্কের রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সাধন করেই কামাল নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ ও বিবিধ বাহ্য পরিবর্তন স্থায়ী করার জন্য তিনি (কামাল) তুর্ক জাতির মনোরাজ্যেও বিপ্লব আনয়নে বদ্ধ পরিকর ছিলেন।" ওসমানিয়া ভাষা আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষার সংমিশ্রণ; এর মধ্যে প্রথম দুটির প্রাধান্যই বেশি ছিল অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তুর্কী ভাষার স্বতন্ত্র বর্ণমালা ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরে তারা আরবী ভাষা ও বর্ণমালা গ্রহণ করে। এর ফলে বহু আরবী শব্দ ও ভাব তুর্কী ভাষায় প্রবেশ করে এবং আরবী ও ফারসী ভাষার চাপে তুর্কী ভাষার নিজস্বতা বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। উসমানি ভাষার প্রয়োগ নিজস্ব তুর্কী ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে থাকে। তুর্কী ভাষাকে উসমানিয়া (আরবী-ফার্সী মিশ্রিত ভাষা) ভাষা থেকে মুক্ত করার প্রয়াস দেখা যায় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকেই অটমান তুর্কীদের সময় থেকেই। শুধু ভাষাই নয় বর্ণমালার ক্ষেত্রেও বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ স্বাধীন তুরস্কে আরবী হরফের লিখন পদ্ধতি চালু ছিল, যা কামাল আতাতুর্কের পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল। বার্নাড লুইস বলেন,

"The Arabic alphabet though admirably suited to Arabic, is peculiarly inappropriate to the Turkish language. Although Turkish contains many loan words, borrowed from Arabic and Persian, its basic structure remains very different from both with a range of forms and sounds that the Arabic script is unable to convey."

তুর্কী ভাষা ও বর্ণমালার চর্চা বহু পূর্বেই শুরু হয়। দ্বিতীয় মাহমুদ, আবদুল হামিদ ও আবদুল মজিদ তুর্কী ভাষায় সংস্কারের ব্রতী হন এবং ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে অটমান সায়েন্টিফিক সোসাইটি তুর্কী বর্ণমালা সংস্কারের প্রশ্ন তোলে। পরবর্তী পর্যায়ে নামিক পাশা ল্যাটিন বর্ণমালায় তুর্কী ভাষা প্রয়োগের কথা বলেন। এমনকি পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাধারণ তুর্কী (Turki basit) নামে এক সাহিত্য আন্দোলন আরবী-ফার্সীর শব্দের স্থলে তুর্কী শব্দ ব্যবহারের কথা বলে। বলকান যুদ্ধের পূর্বে ও পরে তুর্কী শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের আন্দোলন জোরদার হয়। যাহোক, তানজিমাতের যুগ থেকে ভাষা ও বর্নমালা সংস্কারের চিন্তাভাবনা হচ্ছিল। এ সময়ে প্রধান উজীর মোস্তফা রশিদ পাশা ভাষা সংক্রান্ত একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। সুলতান আবদুল হামিদের রাজত্বে মিলাসলি হক্কি প্রাচীণ তুর্ক বর্ণমালার ভিত্তিতে একটি নতুন বর্ণমালা তৈরি করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্ক

www.pathagar.com

ভাষাকে বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য তুর্কউজাক (গৃহ) নামে এক জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই সংস্থার প্রখ্যাত নেতা, লেখক, কবির ও বক্তা হামদুল্লাহ সুবহি তুর্ক সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ক্রমশঃ তুর্ক ভাষা-চর্চাকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। আরবী ভাষায় চর্চা হতে থাকলে এই ভাষার জটিলতার জন্য শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেতে বিঘ্ন হল। এ প্রসঙ্গে বার্নাড লুইস বলেন,

"The Arabic letters were ill-suited to express the sounds of the Turkish language : they were difficult to teach and troublesome to print and this constituted a barrier to education and cultural expansion."

এমতাবস্থায় কামাল আতার্তুক তুর্কী ভাষা ও বর্ণমালা প্রবর্তনের জন্য কতিপয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১. ১৯২১-২২ ঃ আরবী হরফের স্থলে ল্যাটিন বর্ণমালায় তুর্কী যুবকগণ রুশ অধ্যুষিত ট্রান্সককেসাস ও তুর্কিস্থানে চর্চা করতে থাকে।

২. ১৩২৩ ঃ ইজমিরে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক কংগ্রেসে ল্যাটিন বর্ণমালা গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্ট মোস্তফা কামাল প্রস্তাব দেন।

৩. ১৯২৪ ঃ বাকুতে অনুষ্ঠিত একটি মহাসভায় তুর্কী বর্ণমালা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪. ১৯২৮ ঃ শিক্ষা মন্ত্রী হামদুল্লাহ সুবহি ঘোষণা দেন যে, তুর্কী জাতির জন্য তুর্ক ভাষা ও বর্ণমালা গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। উক্ত বছর আইন পাশার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বর্ণমালা কমিটি গঠিত হয়। কামাল ইস্তাম্বুলে 'দোলমা-বাগচি' প্রাসাদে মন্ত্রীবর্গ ও সরকারি কর্মচারীদের সম্মুখে হাতে কলমে ব্লার্ক বোর্ডে ল্যাটিন অক্ষরে তুর্কী বর্ণমালা শিক্ষা দেন। তিনি ঘোষণা দেন ঃ

"প্রিয় দেশবাসী, নতুন তুর্কী বর্ণমালা শীঘ্র লিখে নিন। সমস্ত জাতিকে গ্রামবাসী রাখাল, কুলি ও মাঝিকে শিখান। এটি দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসার নিদর্শন।"

কামাল শহর-গ্রামে ব্লাকবোর্ড নিয়ে তুর্কী ভাষা ও বর্ণমালা প্রচারের জন্য ভ্রমণে বের হয়ে জনমত সৃষ্টি করেন। অবশেষে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে সংসদে নতুন ভাষা ও বর্ণমালা সংক্রান্ত বিল উত্থাপিত হয় এবং ৩রা নভেম্বর তা গৃহীত হল। এর ফলে তুর্কী ভাষায় আরবী হরফ নিষিদ্ধ হল এবং তুর্কী বর্ণমালা স্বীকৃতি লাভ করল। ১৯২৯ সালের ১লা জুন থেকে আরবী বর্ণমালা ছাপা বা লিখা নিষিদ্ধ হল এবং ল্যাটিন হরফে তুর্কী বর্ণমালার প্রচলন হল। ৪০ বছরের অনধিক প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষ ও রমনীকে বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যাশিক্ষা করতে হত ল্যাটিন হরফে তুর্কী ভাষায়। আকস্মিকভাবে বর্ণমালা পরিবর্তনের জন্য ছাপার কাজ মন্থর হল কিন্তু ভাষা বিপ্লব অব্যাহত রইল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল 'তুর্কী ইতিহাস চর্চা সমিতি' এবং পর বছর ১২ই জুলাই 'তুর্কী চর্চা গবেষণা সমিতি' স্থাপিত হল। সরকারি উদ্যোগে ও ভর্তুকী দিয়ে ছাপার টাইপ ও টাইপ রাইটার আমদানি করা হয় এবং অতি

www.pathagar.com

দ্রুত তুর্কী বর্ণমালায় মুদ্রণ কাজ ত্বরান্বিত হল। তুর্কী প্রজাতন্ত্রের ভাষা সংক্রান্ত অন্যতম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হচ্ছে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তুরস্কের শহরের নাম তুর্কী ভাষায় উল্লেখের অনুরোধ। এর ফলে পূর্বে ইংরেজিতে উচ্চারিত শহরের নামগুলি তুর্কী ভাষায় লিখিত হতে থাকে, যেমন এংগোরার স্থলে আঙ্কারা, কনস্টানটিনোপলের স্থলে ইস্তাম্বুল, স্মার্নার স্থলে ইজমির, আড্রিয়ানোপলের স্থলে এদিরণে। যাহোক, মোস্তফা কামাল ভাষা ও বর্ণমালার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেন। ক্রুগার বলেন, "নতুন বর্ণমালা গ্রহণের ফলে তুর্কীরা সভ্যতার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দ্রুত ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হবে; ইউরোপীয়রাও এখন সহজে তুর্ক ভাষা ও সাহিত্য পড়তে পারবে।"

ট. আইন সংস্কার ঃ জিওফ্রি লুইস বলেন, "তুরস্কে ইসলামে বাহ্যিক প্রতীকধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলি নির্মূল করে মোস্তফা কামাল শরীয়তকে দেশের আইন হিসেবে যে গ্রাহ্য করবেন না, তা বলাই বাহুল্য। আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা নিম্নে বর্ণিত হল। সাংবিধানিক পদ্ধতিতে এ সব পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

১. ১৯২৩ সালে কামাল পাশা সর্বপ্রথম সালতানাতের বিলোপ সাধন করেন।

২. ১৯২৩ সালে মোস্তফা কামাল সংসদ কর্তৃক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

৩. ১৯২৪ সালে খিলাফত উচ্ছেদ করা হয়, শরীয়ত ও ওয়াকফ মন্ত্রণালয় বিলুপ্তি প্রধান মন্ত্রীর অধীনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়টি আনা হয় এবং মাদ্রাসা-মকতবগুলির দায়িত্ব উলামাদের পরিবর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত হয়; শেখ-উল-ইসলাম কেবলমাত্র ধর্ম বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারতেন।

৪. ১৯২৪ সালে আঙ্কারায় মোস্তফা কামাল আইন কলেজ উদ্বোধন করেন।

৫. ১৯২৬ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারি শরীয়ত আইনের পরিবর্তে 'সুইস সিভিল কোর্ড' (Swiss Civil Code) পাস করা হয়। ২৯শে মে জার্মানী ও ইতালির আইনের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক কোর্ড (Commercial Code) এবং ১লা জুলাই দণ্ডবিধি আইন (Penal Code) জারী করা হয়।

৬. ১৯২৬ সালে ইজমিরে মোস্তফা কামালকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হলে 'শৃঙ্খলা আইন' বা 'Law for the Maintenance of Order' গৃহীত হয়।

কামালবাদী সংস্কারের অন্যতম অবদান ছিল ইউরোপীয় ধাঁচে আইন প্রণয়ন।

ঠ. শাসন কাঠামো ঃ জাতীয়তাবাদী নীতিতে অনুপ্রাণিত মোস্তফা কামাল প্রশাসনিক বিবরণ দ্বারা তুরস্ককে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অটমান যুগের জরাজীর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ধূলিসাৎ করে কামাল তুর্কী প্রজাতন্ত্র গঠন করেন। মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, যা সংসদের নিকট জবাবদিহিমূলক ছিল। তিনি তিনটি মূল আদর্শ-নীতির ভিত্তিতে প্রশাসনের আমূল পরিবর্তন সাধিত করেন ঃ

১. জনমঙ্গলকর নীতিমালার ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠন।

২. তুরস্ককে ইউরোপীয় আদর্শে রাষ্ট্রীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করা।

www.pathagar.com

৩. তুরস্কের স্বাধীনতা ও স্বার্থকে সকল আইন ও শক্তির উর্ধ্বে রাখা এবং ধর্মীয় আইনের স্থলে পার্থিব আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করা। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রবর্তিত হয়। কামাল আতাতুর্কের বিপ্লবাত্মক কার্যক্রম ছিল রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা।

ঙ. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ঃ কামাল আতাতুর্কের অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে প্রাচীন প্রথার বিলুপ্ত এবং তুরস্ক একটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। তার সংস্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. ক্যাপিচুলেশন প্রথার বিলোপ ঃ এই প্রথা দ্বারা বিদেশীগণ তুরস্কের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভ করত। অমুসলমানদের অসহযোগিতার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হত। এইকারণে ক্যাপিচুলেশন প্রথা বিলোপ করা হয়।

২. 'মিল্লাত' প্রথা বিলুপ্ত ঃ 'মিল্লাত' প্রথা তুরস্কের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী অমুসলমান প্রজাবর্গ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। যে 'মিল্লাত' প্রথা অটমান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল তা কামাল পাশা উচ্ছেদ করেন। ল্যুসেনের চুক্তি (১৯২৩) মোতাবেক এই ঘৃণ্য প্রথা বিলুপ্ত হয়।

৩. কৃষি সংস্কার ঃ মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের দূরদর্শিতার ফলে কৃষি বিপ্লব সংঘটিত হয়। অটমান যুগের নিপীড়িত কৃষককূল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কামালবাদী নীতির ফলে। কৃষিপ্রধান দেশ তুরস্কের উন্নতিকল্পে তিনি ঘোষণা করেন যে "তুরস্কের প্রকৃত মালিকই কৃষককুল।" তিনি যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেন তা হল ঃ

১. জলসেচের দ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি;
২. আঙ্কারায় কৃষি কলেজ স্থাপন;
৩. সেখানে বিনা বেতনে শিক্ষা দান;
৪. ৩৫,০০০ বর্গমাইল পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা;
৫. রেশম, তুলা ও তামাক চাষের ব্যবস্থা;
৬. কর আদায়ের আমূল পরিবর্তন করে মধ্যস্থতাকারীর (আসাব) মাধ্যমের পরিবর্তে সরাসরি ভূমি কর প্রদানের নির্দেশ;
৭. ১৯৩০ সালে কৃষি ঋণ সংস্থা গঠন;
৮. ১৯৩৭ সালে তুরস্কে সর্বপ্রথম কৃষি ব্যাংক স্থাপন;
৯. বন ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াস;
১০. পশুপালন ও সংরক্ষণের পদক্ষেপ।

৪. শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ কামাল আতাতুর্কের প্রচেষ্টায় তুরস্কে শিল্পায়ন শুরু হয়। তিনি ঘোষণা করেন, "দেশকে শিল্পোন্নত করা আমাদের জাতীয় সমস্যাবলীর মধ্যে একটি। কার্য পরিচালনা ও বাঁচবার জন্য অর্থনৈতিক উৎপাদনের কাঁচামাল আমাদের রয়েছে। সর্ব প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠা করে তুরস্ককে সুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করাই হবে আমাদের লক্ষ্য।" এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ঃ

www.pathagar.com

৫. মেট্রিক পদ্ধতি ঃ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কে সর্ব প্রথম মাপ ও ওজনের জন্য মেট্রিক পদ্ধতি চালু করা হয়;

১. নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন ও পুঁজি সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন নতুন কল কারখানা প্রতিষ্ঠা;
২. শিল্প বিপ্লবে পুরাতন শিল্পকে বাঁচান এবং নতুন শিল্পে উৎসাহ দান;
৩. নতুন আমদানি নীতি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;
৪. ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সুমার ব্যাংক নামে একটি শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠা;
৫. ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে পাঁচসালা শিল্প পরিকল্পনা গৃহীত এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়।
৬. বাশাবাকাসাতে কাঁচের, কায়সারিয়াতে কাপড়ের, আসমিতে কাগজের, বাসলিয়াতে তুলার বারজারেটে পশমের কারখানা স্থাপন;
৭. খনিজ সম্পদ ও আহরণ ও অর্থনৈতিক প্রয়োগের ব্যবস্থা এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা স্থাপন;
৮. আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তণ আনয়নকারী তুরস্কের ১১টি ব্যাংকের সংখ্যা বেড়ে ৫১টিতে দাঁড়ায়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কারখানার সংখ্যা ছিল ৩৪১, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩১০-তে।

৬. যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ 'ইউরোপের রুগ্ন দেশ' তুরস্ককে কামাল আতাতুর্ক নবজীবন দান করেন। ক্ষমতা লাভ করে তিনি তাঁর কতিপয় বিশ্বস্ত সহকর্মী নিয়ে যে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন তাতে সড়ক উন্নয়ন, পুল ও বাঁধ নির্মাণ, স্থল, সমুদ্র ও আকাশ পথে যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করার নীতি সন্নিবেশিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে যাতায়াত ব্যবস্থা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। যে সমস্ত রেলপথ নির্মিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য– (১) আঙ্কারা-কায়সারী (৩৮০ কিলোমিটার), (২) কায়সারী-সিভার্স, (৩) সিভার্স-আরজেরুম, (৪) সিভার্স-সামসুন (৪৮০ কিলোমিটার)। শেষোক্ত লাইন দ্বারা আনাতোলিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণসাগর থেকে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত একটি রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। সড়ক নির্মাণ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। সালতানাতের যুগে যে সড়ক পথ ১৬,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তা সম্প্রসারিত হয়ে ২২,০০০ কিলোমিটারে পৌঁছায়। সমুদ্র ও আকাশ পথে যাতায়াতের ব্যবস্থাও করা হয়।

ঢ. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঃ আধুনিক তুর্কী প্রজাতন্ত্রের জন্য কামাল আতাতুর্ক সুশৃঙ্খল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থল ও নৌ ও বিমান বহর গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নতুন সমরপোত নির্মিত হয় এবং নতুন জাহাজ তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়। সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল স্থাপিত হয়।

ণ. শিক্ষা সংস্কার ঃ মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। খিলাফতের আমলে প্রচলিত মাদ্রাসা ভিত্তিতে ধর্মীয় শিক্ষা প্রচলিত ছিল। তিনি প্রজাতন্ত্র, জাতীয় গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে একটি প্রগতিশীল ও আদর্শ স্থানীয় শিক্ষা নীতি গ্রহণ করেন। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড হিসেবে প্রচার করে

www.pathagar.com

অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে তুরস্ককে মুক্ত করার লক্ষ্যে একটি বাস্তবধর্মী শিক্ষানীতি গৃহীত হয়। তানজিমাত যুগ এবং নব্য-তুর্কীদের দ্বারা তুরস্কে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক স্কুলসমূহ বিশেষ করে 'মুলকিয়া' (Mulkiye) নতুনভাবে ঢেলে সাজান হয়। এগুলি ছিল উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি রুশদীয়া (Rusdiye) নামে পরিচিত ছিল। পাশাপাশি সামরিক স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয় নব্য-তুর্কী আমলে, যেমন 'হারবীয়া' (Harbiye)। আবদুল হামিদের রাজত্বকালে তুরস্কে বিভিন্ন ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কী ভাষার পাশাপাশি আরবী পাঠ আবশ্যকীয় ছিল। শিক্ষা বিস্তারের জন্য অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কামালবাদের মূলমন্ত্র ছিল শিক্ষার বিস্তার। এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কতিপয় আদর্শ ও নীতিমালা গৃহীত হয়; যথা–

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয় সাধন ও পরিচালনার জন্য জনশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়;

২. সকল স্তরের পুরুষ ও নারীর জন্য শিক্ষার আলো বিস্তারের লক্ষ্যে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের স্কুল ও কলেজ পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়;

৩. শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তি সত্ত্বাকে জাগরিত করা, সামাজিক জীবনে গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রচেষ্টা করা এবং জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী সকল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা।

শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাইমারী, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে সামরিক টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯২৩-২৪ শিক্ষা বছরে মাধ্যমিক স্কুলে যেখানে ছাত্র সংখ্যা ৫,৯০৫ জন এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে ১,২৪১ জন ছিল, তা ১৯৩৪ সনে বেড়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫,৩৩২ এবং ২৪,৮৬২ জনে। প্রজাতন্ত্রের যুগে প্রাচীন ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় যা 'দারুল ফুনুন' নামে পরিচিত ছিল, তা ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাকাল্টি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১) ১৯২৫ সালে আইন স্কুল, (২) ১৯৩৩ সালে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) ১৯৩৩ সালে উচ্চ কৃষি ইনষ্টিটিউট, (৪) ১৯৩৪ সালে ভাষা, ইতিহাস ও ভূগোল অনুষদ (৫) ১৯৪১ সালে ইস্তাম্বুল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, (৬) ১৯৪৩ সালে বিজ্ঞান অনুষদ, (৭) ১৯৪৫ মেডিক্যাল অনুষদ (১৮২৬ সালে প্রথম সৃষ্টি করা হয়) গুলি পুনর্গঠিত অথবা নতুনভাবে স্থাপন করা হয়। বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য সরকার বৃত্তি দিতেন।

তুরস্কের আইন অনুসারে প্রত্যেক সক্ষম যুবককে তিন বছর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। ১৯৩৫ সালে আঙ্কারাতে প্রথম সামরিক স্কুল স্থাপিত হয়।

(ত) সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত ও নৃত্য চর্চা ঃ মোস্তফা কামাল পাশা তুরস্ককে আধুনিকীকরণের জন্য একদিকে যেমন তুর্কী জাতীয় সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন তেমনি পাশ্চাত্য প্রভাবে তুরস্কে ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও নৃত্যের (বল-ডান্স) প্রচলন করেন। তুরস্কের স্থাপত্যে ইতালীয় ব্যারক স্থাপত্যের ছাপ দেখা যায়। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পরীতিতে চিত্রকর ও ভাস্করগণ শিল্পচর্চা করতে থাকেন। ১৮৬০

www.pathagar.com

সালে প্রথম তুরস্কের যাদুঘর, ১৮৭৪ সালে যাদুঘর বিজ্ঞানের স্কুল এবং ১৮৮১ সালে চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। ভাস্কর্যে কামাল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। তিনি ১৯২৬ সালে ভিনিসীয় শিল্পীর খোদাইকৃত স্বীয় প্রস্তরমূর্তি ইস্তাম্বুলে এবং আঙ্কারায় উন্মোচন করেন। ইসলাম বিরোধী মূর্তি অঙ্কন বা খোদাই এর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সর্বপ্রথম মূর্তি (statue) প্রতিষ্ঠিত হল তুরস্কে। এ প্রসঙ্গে বার্নাড লুইস বলেন, "The significance of this public defiance of one of the most deep rooted of Islamic prejudices was social and political rather than artistic." দেশীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গতি উভয়ই প্রসারতা লাভ করে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে সাফেত নামে একজন তুর্কী বংশীবাদক প্রথম ফ্রান্সে গিয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯২৩ সালে ইস্তাম্বুলে প্রথম সঙ্গীত বিদ্যালয় (Conservatory of Music) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে আঙ্কারায় একটি জাতীয় অপেরা স্থাপিত হয়। পার্টিতে কামাল স্বয়ং বল-নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতেন। পশ্চিমা রীতি-নীতির কুফল প্রসঙ্গে হালিদা এদিব বলেন, "সাধারণ সমালোচকদের মতে পাশ্চাত্য রীতিনীতি আমদানির ফলে তুর্কীদের মধ্যে পাশ্চাত্যের পাপাচার ও ব্যভিচার ঢুকে পড়ে। কিন্তু তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নহে। অল্প সংখ্যক অলস মহিলা পাপে লিপ্ত হলেও এর ফলে অধিকাংশই মঙ্গল হয়েছে।"

মোস্তফা কামাল পাশাকে আধুনিক তুরস্কের নির্মাতা সম্মান দিয়ে তাকে 'আতাতুর্ক' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তুরস্কের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশের প্রেক্ষিতে কামাল আতাতুর্ক মাত্র ১৪ (১৯২৪-৩৮) বছরে যে বৈপ্লবিক বিবর্তন তুরস্কে আনেন তা তুলনাবিহীন। তুলনামূলক বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, আফগানিস্তান ও ইরানকে আধুনিকীকরণের যে কর্মকাণ্ড আমানুল্লাহ এবং রেজা শাহ গ্রহণ করে ব্যর্থ হন সেখানে কামাল আতাতুর্ক অসীম মনোবল ও দক্ষতা ও সাহসিকতার (তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়) সঙ্গে স্বীয় কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়িত করেন। তার প্রবর্তিত সমাজব্যবস্থা ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী অথবা ধর্ম সম্প্রদায় কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। তুরস্কে ধর্ম ছিল ব্যক্তিগত বিষয়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এর কোন প্রভাব ছিল না। কিন্তু সুন্নী গোঁড়াপন্থী আফগানিস্তান এবং শিয়া মোল্লাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ইরানী সমাজ ব্যবস্থা কোন প্রকার বৈপ্লবিক ও ইসলামি-বিরোধী সংস্কার গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না। কামালের মূলমন্ত্র ছিল "তুর্কী হও, মুসলমান হও ও আধুনিক হও।" তিনি ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কারক হিসেবে চির অম্লান হয়ে রয়েছেন। বার্নাড লুইসের মতে, "Unlike many reformers Kamal Ataturk was well aware that mere facade of modernization was worthless and that if Turkey was to hold her own in the world of our time fundamental changes were necessary in the whole structure of society and culture."

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তুরস্কে রাজনৈতিক দলসমূহ

দলসমূহ (Society of Zealots) ঃ তুরস্ক মূলত ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী খিলাফত, যার মূল ভিত্তি ছিল স্বৈরশাসন। ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে ওসমানলী বা অটমান সাম্রাজ্যের পত্তন হয় এবং দীর্ঘ ৬৩৬ বছর পর ১৯২৪ সালে এর পতন হয়। তুর্কী রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুরস্কে প্রথম রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এ ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতার মূলে ইউরোপীয় রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা দায়ী। অটমান একনায়কত্ব এবং স্বৈরাচারী শাসননীতির বিরুদ্ধে প্রথম যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তা ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের 'কুলেলী ঘটনা' (Kuleli incident) নামে পরিচিত। এ ঘটনাটি ছিল সুলতান আবদুল মজিদকে হত্যার একটি ষড়যন্ত্র মাত্র। কিন্তু ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়লে ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। কতিপয় ইউরোপীয় লেখক এই ঘটনাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন যে, এটিই ছিল সংসদীয় এবং পার্লামেন্টারী সরকার প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন যে, এই ঘটনা খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়, কারণ ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ছিল সীমিত এবং খ্রিস্টানদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য সুলতানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সামিল ছিল। বার্নাড লুইস এই ঘটনাকে 'Coup de etat on orthodox lines' বলেছেন। যে সংগঠনের মাধ্যমে কুলেলী ঘটনার সূত্রপাত হয়, তা হচ্ছে 'Society of Zealots' বা 'ধর্মান্ধের সমিতি।'

নিউ অটমান সোসাইটি ঃ তুরস্কে গণতান্ত্রিক রাজনীতির সুচনা হয় সাদিক রিফাত পাশার বলিষ্ঠ লেখনীতে। তাঁর প্রবন্ধসমূহ সুলতান আবদুল মজিদকে প্রভাবান্বিত করে। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে সংস্কারপন্থী প্রধানমন্ত্রী বায়বাকদার মোস্তফা পাশা এ মূলে উদ্যোগ গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি পদচ্যুত ও নিহত হন। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের অধীন মিশরে মোহাম্মদ আলী পাশা বিভিন্ন প্রকার সংস্কার প্রবর্তন করেন। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মজিদ সংসদ গঠনের প্রয়াস পান কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে খোদিভ ইসমাইল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে মিশরে প্রথম সংসদ গঠন করেন। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক সংগঠনের পূর্বসূরী হিসেবে সংসদীয় সরকার গঠনের ভাবধারা প্রচারিত হয় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। এই আদর্শের প্রবক্তা ছিলেন নামিক কামাল। তিনিসহ মোট ছয় জন ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে একটি "গুপ্ত সমিতি" গঠন করেন এবং

www.pathagar.com

ইতালির গুপ্ত সংঘ কার্বোনারীর (Carbonari) প্রভাব এই তুর্কী সংগঠনে পড়ে। ক্রমশঃ এই সংঘের সদস্য সংখ্যা ২৫-এ উন্নীত হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের সংগঠন 'নব্য-উসমানীয় সমিতি' (New Ottoman Society) নামে পরিচিত ছিল। আদর্শবাদী ও জাতীয়বাদী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষা প্রচারণা ও প্রভাবের মাধ্যমে তাদের মতবাদকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। একই সময়ে ফুয়াদ পাশা সুলতানের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে অন্যান্য পাশাদের একত্রিত করে একটি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি।

কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস ঃ সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সময়ে প্রথম যে সাংবিধানিক যুগের সূচনা হয় ১৮৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাতে নির্বাচনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। সে সময়ে পার্লামেন্টে কোন বিরোধী দল ছিল না। এ সময় আবদুল হামিদের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক বেআইনী বিরোধী দল গঠিত হয়। এই সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ছিল 'ঐক্য ও প্রগতি সংস্থা' (Committee of Union and Progress)। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে আবদুল হামিদের রাজত্বে 'অটমান সোসাইটি ফর ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস' গঠিত হয়। কিন্তু সুলতানের দমন নীতির ফলে এই সংগঠনের বহু সদস্যকে বিতাড়িত এবং প্রচারপত্র বিলি করার জন্য হত্যা করা হয়। কিন্তু এই সংস্থা স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। স্যালোনিকাতে যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় তা ছিল খুবই কার্যকরী। এই সংস্থা সুলতানের নিকট একটি তারবার্তা পাঠিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিলম্বে নির্বাচন দাবী করে। 'ডেপুটি অব চেম্বার্স' এর সভা আহ্বান করার জন্য চরম পত্র দেওয়া হলে সুলতান শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং রুমোলিয়ায় বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ শুরু হলে ১৯০৮ সালের ২৩শে জুলাই শাসনতন্ত্র জারি করা হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে 'কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস' ব্যতীত অপর যে পার্টি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে তা হচ্ছে 'উদারপন্থী দল' (Liberal-Ahrar)। ইস্তাম্বুলে এই দলের কতিপয় প্রার্থী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। তাদের প্রার্থীরা পরাজিত হয়। ফলে সংসদে বিরোধী দল ছিল না। কিন্তু ইস্তাম্বুলে তাদের দলের সদস্যগণ জয়লাভ করতে না পারলেও অবশ্য আঙ্কারায় একজন সদস্য পদ লাভ করে। নির্বাচনের পর অধিকাংশ খ্রিস্টাব্দে সদস্য সংসদে বিরোধী দল গঠন করে। কতিপয় নতুন দলও গঠিত হয় এবং এই দলসমূহ বিক্ষুব্ধ সদস্যদের সমর্থন লাভ করে। অবশ্য এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধী গোষ্ঠী 'কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেসে'র বিরুদ্ধে হুমকী ছিল না। তবে তারা প্রকৃত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় লিবারাল ইউনিয়নের তরফ থেকে। এই দল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে জয়লাভ করে কিন্তু এই বিজয় ছিল ক্ষনস্থায়ী। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে 'ঐক্য ও প্রগতি সংস্থা' পুনরায় সংসদে সংখ্যাধিক্য লাভ করে মূলতঃ স্বৈরশাসন (dictatorship) প্রতিষ্ঠা করে। বিরোধীদলকে দমন করা হয় এবং তাদের সদস্যদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে কেবলমাত্র 'ঐক্য ও প্রগতি

www.pathagar.com

সংস্থা' অংশ গ্রহণ করে এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে স্বাক্ষরিত চুক্তি (armistice) পর্যন্ত এই দল একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে নতুন ও পুরাতন রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহন করে। পুরাতন দলের মধ্যে "ঐক্য ও প্রগতি সংস্থা", যা ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪-১৯ ডিসেম্বরে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নবগঠিত জাতীয়তাবাদী পার্টি (nationalist) এবং লিবারাল ইউনিয়ন বেসরকারি পর্যায়ে নির্বাচনে অংশ নেয়।

লিবারাল ইউনিয়ন ঃ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলে গঠিত অনেক রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল লিবারাল পার্টি (Ahrar)। দীর্ঘকাল নিষিদ্ধ থাকার পর এই দলটি পুনর্গঠিত হয়। এটি ক্ষমতাশালী দল না হলেও ইস্তাম্বুলে যুদ্ধ শেস হবার পর থেকে অটমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস পর্যন্ত (১৯১৯-১৯২৪) লিবারাল ইউনিয়ন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মন্ত্রণালয় গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে অটমান সংসদে এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হয়।

পিপ্‌লস পার্টি (Halk Firkasi) ঃ জিওফ্রি লুইস বলেন, "The framework of the Nationalist movement was the League for the Defence of Rights" রুমেলিয়া ও আনাতোলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত অধিকার সংরক্ষণ লীগের (League for the Defence of Rights) উত্তরাধিকারী হিসেবে মোস্তফা কামাল পাশার বলিষ্ট নেতৃত্বে পিপ্‌লস পার্টি আত্মপ্রকাশ করে। এই সমিতি তুরস্কের সংস্কার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে এই সমিতির একটি সাধারণ সভা আহ্বান করা হয় এবং ঐ বছরের নভেম্বরে পূর্বোক্ত 'লীগ ফর ডিফেন্স অব রাইটস' এর উত্তরাধিকারী হিসেবে সকল সম্পত্তির ও মতাদর্শের উত্তরসূরী হিসেবে কাজ শুরু করে। এক বছর পরেই কামাল আতাতুর্কের নির্দেশে এই দলটি 'রিপাবলিকান পিপ্‌লস পার্টি' নামে অভিহিত হয়। এই নব গঠিত দলে প্রাধান্য ছিল কামাল আতাতুর্কের; কিন্তু এই দলেই আঙ্কারাতে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় দল (Splinter group) এর সৃষ্টি হয় এবং এই বিরোধী গ্রুপের উদ্দেশ্য ছিল কামালের একনায়কত্বের (absolution) বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। অবশ্য কামালের দলে ২৬০ জন সদস্য ছিল; তবুও সংখ্যালঘিষ্ট গ্রুপটি সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেও কামালের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ায়। এই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন রউফ বে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে এই বিদ্রোহী গ্রুপ কোন সদস্য প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করায়নি, যার ফলে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের কোন ভূমিকা ছিল না।

প্রগ্রেসিভ রিপাবলিকান পার্টি এবং ফ্রি রিপাবলিকান পার্টি ঃ মোস্তফা কামাল গঠনমূলক বিরোধীদলের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য দুটি দল গঠন করেন; একটি ১৯২৪-২৫ সালে 'প্রগ্রেসিভ রিপাবলিকান পার্টি' এবং ১৯৩০ সালে 'ফ্রি রিপাবলিকান পার্টি' নামে গঠিত হয়। পরীক্ষামূলকভাবে গঠিত এ সব দল সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল সংসদের বিরোধী দলকে নিষ্ক্রিয় করে স্বীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। গাজী

www.pathagar.com

কামালের ক্ষমতা এতই সুদূরপ্রসারী ছিল যে, তিনি ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যদের মনোনীত করতেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে দলীয় কংগ্রেসের পর রাজনৈতিক দল এবং সরকার একীভূত হয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দলের মহাসচিব নিযুক্ত হন। প্রদেশসমূহের গভর্নর পার্টির সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৩৯ সালের কংগ্রেস কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর পর রাষ্ট্র থেকে দলকে পৃথক করার চেষ্টা করে। দলীয় ও সরকারি নিযুক্তি পৃথক করা হয় এবং সংসদে (Majlis-meclis) বিরোধী দল সৃষ্টির জন্য 'পিপলস পার্টি'র কয়েকজন সদস্য নিয়ে একটি স্বতন্ত্র দল গঠিত হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দলীয় কংগ্রেসের এই স্বতন্ত্র গ্রুপের অস্তিত্ব ছিল, এর পর দলটি বিলুপ্ত হয়।

দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত রিপাবলিকান পিপলস পার্টি ১৯২৩ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। সরকারি দল এমনই ক্ষমতাসীন ছিল যে তার কোন প্রকার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বা কৌশলের (manoeuvre) প্রয়োজন ছিল না এবং তাই বিরোধীদলের দমনের প্রশ্নও ছিল না। উল্লেখ্য যে, প্রজাতন্ত্রী পার্টি ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য ক্ষমতা দখল বা প্রয়োগের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। মধ্যপ্রাচ্য থেকে উদ্ভূত (শেখতন্ত্র) মতাদর্শে এই দল শহরে একটি 'সম্ভ্রান্তদের দল' (Clique of Notables) হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রদেশে তাদের মিত্র ছিল। এই দলের বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তি প্রাধান্য কোন নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম নয়। সমগ্র দেশে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত এই দলটি বিভিন্ন প্রকার সমাজ উন্নয়ন ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল। এর ফলে এই দলটি রিপাবলিকান সরকারের একটি হাতিয়ার (apparatus) হিসেবে পরিণত হয়। সংগঠনের কর্মীগণ কামালবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক বিপ্লবের সুচনা করে। এইকার্যক্রম সুদূরপ্রসারী করার জন্য তুরস্কে পিপলস-হাউস (Peoples House-Halkevi) এবং 'পিপলস রুম' (Halkodast) গঠিত হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম গঠিত 'তুর্কী গণসমিতি' (Turk Ocagi) থেকে এই সংগঠন উদ্ভুত। এগুলিকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আঙ্কারায় একটি কংগ্রেসের বৈঠক আহ্বান করা হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের সভায় 'রিপাবলিকান পার্টি' পিপলস-হাউস এবং পিপলস-রুমের কার্যাবলী সম্পৃক্ত করে গ্রামে গঞ্জে সম্প্রসারিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল তুর্কীদের জাতীয়তাবাদী, প্রজাতন্ত্রবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে রিপাবলিকান পার্টি ক্ষমতাচ্যুত হবার পূর্বে সারা দেশের ৫০০টি পিপলস-হাউস এবং ৪০০০ 'পিপলস-রুম' ছিল। এই সমস্ত সংগঠনে বক্তৃতা, মিটিং, সেমিনার, লাইব্রেরী, প্রকাশনা, ড্রামা, খেলাধূলা, গানবাজনা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে বিপ্লবের আদর্শকে সম্প্রচারিত করা হত। উল্লেখ্য যে, 'রিপাবলিকান পার্টির' গঠনে ইউরোপীয় একদলীয় পার্টি, যেমন জার্মানীর নাৎসী পার্টি, রাশিয়ার কমিউনিষ্ট এবং ইতালির ফ্যাসিষ্ট পার্টির প্রভাব থাকতে পারে। তবে তুর্কী দল অন্যান্য একদলীয় পার্টি থেকে পৃথক ছিল কারণ স্বৈরাচারী একদলীয় পার্টি হলেও 'রিপাবলিকান পার্টি' দু'বার বিরোধীদল সৃষ্টি করে। অবশ্য ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় বার এই চেষ্টার ফলে তাদের ক্ষমতা হারাতে হয়। ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬

www.pathagar.com

সালে এসোসিয়েসন আইন (Law of Association) এবং ফৌজদারী আইন (Penal code) সংশোধন করে সরকারি দল (আর. পি. পি) ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল গঠন এবং পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু কমিউনিষ্ট এবং মৌলবাদী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ দলদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বঞ্চিত করা হয়। কারণ প্রজাতন্ত্রী সরকারের মৌলিক নীতির পরিপন্থী কোন রাজনৈতিক তৎপরতা সহ্য করা হয়নি।

জাতীয় পুনঃরুদ্ধার পার্টি (National Recovery Party) রিপাবলিকান পিপলস পার্টির বিপরীতে সর্বপ্রথম যে শক্তিশালী বিরোধী দল গঠিত হয় তা হল 'জাতীয় পুনরুদ্ধার পার্টি'। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১০ই জুলাই ইস্তাম্বুলের গভর্নরের অনুমতিক্রমে এই দল গঠিত হয়। 'মিল্লা কালকিনমা পার্টিসি' নামে গঠিত এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নূরী ডেমিরাল, আই. হুসনী, আত্তানী উলাস এবং রিফাত আতিলহান।

কামাল উত্তর তুরস্কে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রসারতা ঘটে। কামালবাদের ভিত্তিতে রাজনীতিকদল গঠিত হয় গণতন্ত্রের প্রসার হয় এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার ঘটে।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

কামালোত্তর তুরস্ক

১৯৩৮ সনের ১১ নভেম্বর আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা ও তুর্কী জাতীর পিতা কামাল আতাতুর্ক মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর কামালের ঘনিষ্ঠ সহচর ও ইসমত ইনোনু তুর্কী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ইনোনু রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও লাভ করেন। যে সময়ে ইনোনু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন সে সময়ে জার্মানির হিটলার ও ইতালির মুসোলিনী ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা করেছিলেন। একদিকে হিটলারের চেকোস্লোভাকিয়া দখল এবং অন্যদিকে মুসোলিনীর আলবেনীয়া দখল পার্শ্ববর্তী তুরস্কে এক ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। ১৯৩৯ সনের ১২ মে তারিখে ব্রিটেন ও তুরস্ক পারস্পরিক নিশ্চয়তা চুক্তি সম্পাদন করে। পরের মাসে তুরস্ক ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ নয় চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তুরস্কের সবসময় রুশভীতি ছিল এবং ১৯৩৯ সনের ২৩ আগস্ট তারিখে রুশ-জার্মান চুক্তি সম্পাদিত হলে এই ভীতি বহুলাংশে বেড়ে যায়। একই বছরের ১ সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যান্ড এবং রাশিয়া পোল্যান্ডে পূর্বাঞ্চল দখল করলে তুর্কী সরকার বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী রাশিয়ার সাথে অনাক্রমণ চুক্তি করার জন্য তুরস্ক ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মস্কো সফর করেন। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে তুরস্কের সম্পাদিত চুক্তি বলবৎ থাকায় রাশিয়া তুরস্কের সাথে কোন চুক্তি করার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এর ফলে তুরস্ক ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে ১৯৩৯ সালের ১৯ আগস্ট তারিখে তুরস্ক ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত করে। এই চুক্তির ফলে তুরস্ক কোনো ইউরোপীয় শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের সামরিক সাহায্য দিবে। এই চুক্তি মোতাবেক তুরস্ক ব্রিটেন ও ফ্রান্স থেকে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের জন্য ২৫ কোটি পাউণ্ড লাভ করে। এই চুক্তিতে রাশিয়া তুরস্কের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

তুরস্ক প্রথম মহাসমরের জার্মানিকে সমর্থন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বিপর্যের সম্মুখীন হয়েছিল। একথা মনে করে তুর্কী রাজনীতিবিদগণ দ্বিতীয় মহাসমরের প্রাক্কালে জোট বাঁধার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। তুরস্ক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে রাশিয়া বা জার্মানি বা অন্য কোন ইউরোপীয় শক্তির সাথে জোট বাঁধতে দ্বিধা করে। ১৯৪০ সনের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মৈত্রীর চুক্তির ২০ ও ২১ ধারা অনুযায়ী দার্দানেলিস প্রণালী দিয়ে বিদেশী জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা ছাড়া তুরস্ক অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। হিটলারের সাথে মুসোলিনী সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ পরিচালনার ক্রান্তিলগ্নে ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ বিস্তার লাভ করে। পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী তুরস্ক ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে সাহায্য দিবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দান করে। কিন্তু তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী কোন পক্ষে তুরস্কের যোগদানকে বাস্তবতা বর্জিত বলে অভিহিত

www.pathagar.com

করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভাবনীয় ঘটনাবলি তুরস্ককে বিপদগ্রস্থ করে তোলে। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া বাধ্য হয়ে জার্মান শিবিরে যোগ দান করে। ১৯৪০ সনের অক্টোবর মাসে ইতালি গ্রীস আক্রমণ করলে যুদ্ধের পরিস্থিতি মারাত্মকভাবে নূতন মোড় নেয়। ১৯৪১ সন জার্মানি যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও ক্রীট দখলে করে ইউরোপে ত্রাসের সৃষ্টি করে। জার্মানি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়াও দখল করে। এজিয়ান সাগরে জার্মান-ইতালির প্রভুত্ব সম্প্রসারণে তুরস্ক শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া তুরস্ক শাসিত ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননে তুর্কী বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয় এ সময়ে।

মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য তুরস্কের জার্মান রাষ্ট্রদূত ফ্রাঞ্চ ফন প্যাপেন তুরস্কের সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। জার্মানি ইরাক সিরিয়া ও ইরানের মধ্য দিয়ে সামরিক সরঞ্জাম ও ছদ্মবেশে সৈন্য পাঠাবার জন্য তুরস্কের সাথে একটি চুক্তি করার প্রস্তাব দেয়। পক্ষান্তরে জার্মানির হিটলার সরকার এসে তুরস্কের সীমানা বৃদ্ধি এবং ইজিয়ান সাগরের কয়েকটি দ্বীপের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্যাপেনের প্রচেষ্টায় ১৯৪০ সনের ১৮ জুন তুরস্কের সাথে জার্মানির একটি "যুদ্ধ নয়" (Non-Aggression Pact) চুক্তি সম্পাদিত হয়। সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যই তুরস্ক এই চুক্তি করতে বাধ্য হয়। তবে এই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, পূর্বে সম্পাদিত ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাথে চুক্তি বাতিল করা যাবে না। চাপের মুখে আত্মরক্ষার্থে তুরস্ক ১৯৪১ সনের ৯ অক্টোবর জার্মানির সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে। এভাবে জার্মানি তুরস্কের উপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু তুরস্কের নেতৃবৃন্দের প্রধান লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক চাপের মুখে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে তুরস্কের স্বার্বভৌমত্য ও অখণ্ডতা বাজায় রাখা। জার্মানি-ব্রিটেন, ফ্রান্স-রাশিয়ার আঁতাতে শঙ্কিত হয়ে তুরস্কের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তোলার জন্য তুরস্ককে নানা রকম চাপ দেয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ক্রাইমিয়া ও ককেশাস দখল করে তুর্কী অধ্যুসিত জনগোষ্ঠীকে স্বায়ত্ব শাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতি; কিন্তু তুরস্ক এই ফাঁদে পা দেয়নি এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাথে সুসম্পর্ক রাখে।

১৯৪২ সনের শেষার্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এক দিকে জার্মানি, ইতালী ও পরে জাপান একটি আঁতাত গঠন করে; অন্য দিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এবং পরে রাশিয়া মিত্র শক্তি সৃষ্টি করে। তুরস্ক ব্রিটেনের উপর সমরাস্ত্র সরবরাহের জন্য বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। ১৯৪২ সনে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তুরস্ককে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করার আহ্বান জানানো হবে। ১৯৪৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টান চার্চিল এবং তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ইসমত ইনোনু এক বৈঠকে মিলিত হন। ব্রিটেন তুরস্কে স্যার হেনরী মেইটল্যান্ড উইলসন ও স্যার জন কানিংহামের নেতৃত্বে একটি কূটনৈতিক মিশন পাঠায়। এর ফলে মিত্রশক্তির অনুকূলে ১৯৪৩ মাসের শেষের দিকে তুরস্ক যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চার্চিল ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাথে তুর্কী প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হয় এবং তুরস্ককে আনুষ্ঠানিকভাবে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করতে বলা হয়। কিন্তু রুশ আগ্রসনের ভীতি সব সময় তুরস্কের ছিল। এ কারণে রাশিয়ার সাথে সম্পাদিত মৈত্রীচুক্তি তুরস্ক বলবৎ রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪১

www.pathagar.com

সনের ৭ ডিসেম্বর পার্ল হার্বারে জাপানীরা বোমা নিক্ষেপ করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করে। এর ফলে যুদ্ধের নূতন মাত্রা যোগ হয়। তুরস্ক মিত্রপক্ষে যোগ দেয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ককে শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিণত করার চেষ্টা করে রাশিয়ার প্রভাব সীমিত করে। মিত্রশক্তির বিমানবহর তুরস্কের বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করতে থাকে। পাশ্চাত্য দেশ থেকে বিশেষ করে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স থেকে তুরস্কে অস্ত্রশস্ত্র আসতে থাকে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারী ট্রুমান গ্রীস ও তুরস্ককে অর্থনৈতিক ও সামারিক সাহায্য দান করার জন্য ১৯৪৭ সনে মার্কিন কংগ্রেসে অর্থ বরাদ্দ করেন। তুরস্ক দশ কোটি ডলার লাভ করে। এরপর থেকে আমেরিকার সাথে তুরস্কের সামরিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। তুরস্কের রেলপথ, নৌপরিবহন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি আধুনিকীকরণের জন্য আমেরিকা থেকে তুরস্কে বিশেষজ্ঞ দল আসে। বিমান ঘাঁটির সংস্কার করে আধুনিকীকরণ করা হয়। তুরস্ককে ইউরোপীয় পুনবার্সন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে আমেরিকা। এভাবে তুরস্ক ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা রাখতে থাকে। ১৯৪৯ সনের আগস্ট মাসে নবসৃষ্ট ইউরোপীয় পরিষদের (বর্তমান ইউরোপীয় কাউন্সিল) সদস্যপদ লাভ করে। এরপর ১৯৫২ সনে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা বা 'ন্যাটো'র সদস্য হয়। ক্রমশঃ তুরস্ক ১৯৪৫ সনে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুরস্ক অধিক কর্মতৎপর হতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে তুরস্কে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন লক্ষিত হয়। প্রেসিডেন্ট ইসমত ইনোনু এক ভাষনে বলেন যে, এক পার্টি সরকারের পরিবর্তে বহুদলীয় রাজনীতির মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিবর্তন প্রয়োজন। এ সময় রিপাবলিকান পার্টির কয়েজন সদস্য দেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য কয়েকটি আইনের সংশোধন দাবী করেন। তাদের মধ্যে ইজমির থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং এককালীন প্রধানমন্ত্রী জালাল বায়ার (১৯৩৭–৩৯), কারস থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ফুয়াদ কোপরুল, আইদীন থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী আদনান মেন্দারেস এবং এককালের প্রখ্যাত বিচারক ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা রফিক কোরালতান বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিলেন। এই চারজন সদস্য রিপাবলিকান পার্টির দলীয় শাসননীতিকে স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচার নীতি বলে অভিহিত করেন। এর ফলে প্রেসিডেন্ট ইসমত ইনোনু স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে ১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাসে সরকারি নীতির পরিবর্তনের আভাস দেন। শীতকালীন অধিবেশন উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তিনি বলেন যে, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও গোপন ব্যালট পত্রের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে জালাল বায়ার মেন্দারেস, ফুয়াদ ও রফিক ১৯৪৬ সনের ৭ জানুয়ারি তারিখে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। ইনোনু সরকার নবগঠিত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করে ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন ১৯৪৬ সনের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেয়। সংসদ নির্বাচনে মোট ২৭৬ টি আসনের মধ্যে ডেমোক্র্যাটিক দল ৬১টি আসন লাভ করে। এর ফলে নবগঠিত

www.pathagar.com

দলের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। সংসদে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের আবির্ভাব হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকায় সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতির সমালোচনা হতে থাকে। ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টির নামে ডেমোক্র্যাটিক দলের বৈষম্য ও বিভেদ চলতে থাকে। প্রেসিডেন্ট ইনোনু এই দূরত্ব লাঘব করার চেষ্টা করেন।

১৯৫০ সনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তুরস্কে সরকার গঠন করে। জালাল বায়ার প্রেসিডেন্ট এবং আদনানে মেন্দারেস প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। রিপাবলিকান দল বিরোধী দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিছু দিনের মধ্যে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে কোন্দল ও বৈরীতা দেখা দিল। আক্রোশ বশে মেন্দারেস সরকার রিপাবলিকান পার্টির বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎসহ দলীয়করণের অভিযোগ আনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তুরস্কে সামরিক শাসন জারী করা হয় এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। উপরন্তু, জরুরি আইন জারী করা হয় স্বার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব বজায় রাখার জন্য। এ সমস্ত বিধি নিষেধ ১৯৪৭ সনে তুলে নিলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে চালু হয়। কিন্তু সরকার ও বিরোধী দলের কোন্দল ক্রমশ মারাত্মক আকার ধারণ করে। পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে নিরপেক্ষ এবং কারচুপিবিহীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সনের ১৪ মে তারিখে। ৮৫ লক্ষ ভোটার ভোট দান করে। গণনা ছিল নির্ভুল। ফলাফল ঘোষিত হলে দেখা যায় যে, সরকারি দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ৪০৮টি এবং বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টি ৬৯টি, স্বতন্ত্র প্রার্থী ৯টি এবং ন্যাশনাল দল ১টি আসন লাভ করে। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, দীর্ঘ ২৭ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে কামাল আতাতুর্কের রিপাবলিকান পার্টির এ নির্বাচনে ভরাডুবি হয়। এটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিস্ময়কর। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কামাল কর্তৃক যে সমস্ত সংস্কার বলপূর্বক জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তা জনসাধারণ ভালভাবে গ্রহণ করেনি। তাদের মধ্যে চাপা উষ্মা ছিলো। তাছাড়া সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নে নিয়োজিত আধা সামরিক বাহিনী (Gendermeric) জনসাধারণকে তাদের নিপীড়নে অস্থির করে তোলে। এতদসত্ত্বেও ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ সনের গণভোটে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। রিপাবলিকান দল ৩১ এবং ডেমোক্র্যাটিক দল ৫০৩ টি আসন লাভ করে ১৯৫৪ সনের ভোটে। অবশ্য ১৯৫৭ সনের ভোটে রিপাবলিকান দলের আসন ১৭৮তে উন্নীত হয় এবং ডেমোক্র্যাটিক দলের সংখ্যা কমে ৪২৪-এ পৌছায়।

ডেমোক্র্যাটিক দল ক্ষমতায় আসারপর তারা বিরোধী রিপাবলিকান দলের উপর উৎপীড়ন শুরু করে আক্রোশবশে। তারা রিপাবলিকান পার্টির বিরুদ্ধে অবৈধ অর্থ সংগ্রহের অজুহাতে তাদের তহবিল বাজেয়াপ্ত করে। উপরন্তু, সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌছে যে ডেমোক্র্যাটিক দল পরিচালিত সরকার রিপাবলিকান দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বন্ধ করে দেয়। এ ছাড়া ১৯৫৪ সনের মে মাসে সরকার নূতন সংবাদপত্র আইন জারি করে। এই আইন ছিল দমননীতির সামিল এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ ধরনের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ সরকার জনগণের সমর্থন হারাতে থাকে। বিচার বিভাগ হস্তক্ষেপ গণতন্ত্রের মূল্যবোধের পরিপন্থী জেনেও সরকারি দল তাদের দলীয় স্বার্থে বিচারকদের প্রভাবান্বিত করতে থাকে। নির্বাচনকে কুক্ষিগত করার

www.pathagar.com

জন্য সরকার এক আইনের বলে নির্বাচন জোট গঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারি দলের ক্ষমতালিপ্সা। ১৯৫৬ সনের জুনে জারী করা একটি আইনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে হ্রাস করা হয়। সরকার বিরোধী সংবাদ প্রকাশে সাংবাদিকদের কারারুদ্ধ করা হয়। শুধু তাই নয় সকল প্রকার সভা সমিতি বা মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এ সমস্ত উৎপীড়নজনক ব্যবস্থায় ১৯৫৭ সনের নির্বাচনে সংসদে তাদের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়।

ডেমোক্র্যাটিক দলের ছত্রছায়ায় সরকারি দল বিরোধী রিপাবলিকান পার্টির উপর নির্যাতন শুরু করে। ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে তুর্কী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বর্ষিয়ান নেতা মোস্তফা কামাল পাশার ঘনিষ্ঠ সহচর ইসমত ইনোনু এস্কি শহরে ডেমোক্র্যাটিক দলের একটি সভায় যোগদান করতে গেলে তাকে পাথর নিক্ষেপে আহত করা হয়। এতদসত্ত্বেও তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় সভামঞ্চে এসে বক্তৃতা করেন। সরকারের ঘৃণ্য ও হীন চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে। ডেমোক্র্যাটিক দলের সবকাজ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি এর একটি কারণ। দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিতে সাধারণ জনগণ মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। উৎপীড়নমূলক নীতির বশবর্তী হয়ে সরকার ১৯৬০ সনের ১৮ এপ্রিল তারিখে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে সংসদে একটি অস্বাভাবিক ও অমানবিক বিল উত্থাপন করে আইনে পরিণত করে। সরকার বিরোধীদলের উপর নিপীড়ন চালাবার জন্য নাশকতামূলক ও অবৈধ কার্যকলাপ অনুসন্ধান কমিশন গঠন করে। বিরোধী রিপাবলিকান দল এই কমিশনকে চরম অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করে। ২৮ এপ্রিল সংবাদপত্রের উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত তারা একটি আইন জারী করে।

কামাল আতাতুর্ক যে সামরিক বাহিনী গঠন করেন তা প্রজাতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষা করে। কোন প্রকার উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক ও জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ রোধ করাই ছিল সেনাবাহিনীর দায়িত্ব। কিন্তু এই জাতীয় বাহিনী ডেমোক্র্যাটিক দলের অগণতান্ত্রিক ও অনুদার বিভিন্ন পদক্ষেপে অসন্তোষ প্রকাশকারী উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণ ইসমত ইনোনুর সাথে সাক্ষাৎ করে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। কিন্তু গণতন্ত্রমনা ও প্রজাতন্ত্রীর এককালীন কর্ণধার ইনোনু সামারিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ বা 'কুৎ-দে-তা' কে প্রত্যাখ্যান করেন। সামরিক হস্তক্ষেপ সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও জেনারেলদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ থেকে যায়। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ও সম্ভাব্য পদক্ষেপের কথা চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। ১৯৬০ সনের মে মাসে আঙ্কারা ও ইস্তাম্বুলের সামরিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করতে থাকে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল জামাল গুরসেল ১৯৬০ সালের ২৭ মে সামরিক আইন জারী করে সমস্ত ক্ষমতা স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয় প্রেসিডেন্ট জালাল বায়ার, প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেস, মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দসহ ডেমোক্র্যাটিক দলের সকল সংসদ সদস্যকে বন্দী করা হয়। জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষিত হয়। এর স্থলে একটি জাতীয় সংহতি পরিষদ গঠন করা হয়। জেনারেল গুরসেলকে অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

১৯৬০ সনের তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থান

১৯৬০ সালে তুরস্কের সামরিক প্রধান জেনারেল গামেলের নেতৃত্বে একটি সামরিক বিপ্লব (military coup) সংঘটিত হয়। এই বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের পশ্চাতে বিভিন্ন কারণ ছিল। নিম্নবর্ণিত কারণসমূহ মূলত প্রধান ছিল–

রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঃ কামাল আতাতুর্কের শাসনামলে তুরস্কের ক্ষমতাশালী দল ছিল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি-এর বিপক্ষে ছিল ডেমোক্রাটিক পার্টি নামে স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দল। কামালের মৃত্যুর পর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইসমত ইনুনে তুর্কী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি পরপর তিনবার প্রেসিডেন্টের পদ মর্যাদা লাভ করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে যে বিপ্লব হয় তার প্রেক্ষিত ১লা নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইনোনু দলীয় শাসন প্রবর্তনের ওয়াদা করলে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় উন্নয়ন দল (National Development Party-NDP)। তারপর গঠিত হয় জালাল বায়ার (যিনি কামালের সময়ে ইসমত ইনোনুর স্থলে কিছুকাল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন) এবং আদনান মেন্দারেসের নেতৃত্বে গঠিত হয় গণতন্ত্রী দল (Democratic Party-DP)। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে এইদলের কিছু ইসলামপন্থী সদস্য প্রাক্তন মার্শাল ফওজী চাকামকের নেতৃত্বে জাতীয় দল গঠন করে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনী আইন সংশোধন করে একদলীয় শাসনের স্থলে বহু দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু হয়। এর ফলে ক্ষমাতসীন পিপলস পার্টির প্রভাব হ্রাস পায়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে গণতন্ত্রী দল জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়ী হয়। এর ফলে ইসমত ইনোনুর স্থলে জালাল বায়ার প্রেসিডেন্ট এবং মেন্দারেস প্রধানমন্ত্রী হন। মন্ত্রী সভার সদস্য পদ লাভে ব্যর্থ হয়ে কিছু সংখ্যক সদস্য ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কৃষকদল গঠন করে। যাহোক, গণতন্ত্রীদের ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে মে পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিল। যে সমস্ত রাজনৈতিক ধর্মীয় ও সামাজিক ও সামরিক এবং অর্থনৈতিক কারণে গণতন্ত্রী দলের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায় তার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

ক. রাজনৈতিক বিপর্যয় ঃ আদনান মেন্দারেসের সরকার ক্ষমতাসীন হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তুরস্কের জনগণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। (১) ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তুরস্ক উত্তর আটলান্টিক জোটে (NATO : North Atlantic Treaty Organization) যোগদান করে। পরের বছর ১৮ই ফেব্রুয়ারি গ্রীস ও তুরস্ক ন্যাটোর পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করে।

www.pathagar.com

১৮ই আগস্ট ইজমিরে ন্যাটার পূর্বাঞ্চলীয় দফতর স্থাপিত হয়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি গ্রীস, তুরস্ক ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে আংকারায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তুরস্কের অসহায় অবস্থা দেখে রাশিয়া তার কিয়দংশ দাবী করে। অবশ্য ৩০শে মে রাশিয়া এই দাবী প্রত্যাহার করে। মেন্ডারেসের শাসনামল পররাষ্ট্র নীতির দিক থেকে বিপর্যস্ত ছিল। মেন্ডারেস ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করেন। উক্ত বছরের ৯ই আগস্ট গ্রীস, তুরস্ক ও যুগোশ্লাভিয়া ২০ বছরের জন্য বলকান চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ থেকে ১৮ই জানুয়ারি মেন্দারেস সিরিয়া, লেবানন ও ইরাক সফরে যান। উক্ত বছরে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইরাকের সঙ্গে বাগদাদ চুক্তি সম্পন্ন হয়। এই চুক্তি সম্পাদনে রাশিয়া আরব রাষ্ট্রসমূহকে তুরস্কের বিরুদ্ধে উস্কানী দিলেও ৪ঠা এপ্রিল ইংল্যান্ড এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তান বাগদাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৭শে মার্চ যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদ প্যাক্টে যোগদান করলে তুরস্কের রুশ ভীতি দূর হল। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই এপ্রিল বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়ার রাষ্ট্র সম্মেলনে তুরস্ক পরিদর্শক হিসেবে প্রতিনিধি প্রেরণ করলে তার আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে নভেম্বর আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় তুরস্ক তেলআবীব থেকে দূত সরিয়ে নিলেও ইসরাইলের সঙ্গে তুরস্কের কূটনৈতিক সম্পর্কের ফলে আবরদেশসমূহ তুরস্কের প্রতি বিরূপ ছিল। মেন্দারেসের শাসনামলের শেষের দিকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী সাইপ্রাস সমস্যা সমাধানের জন্য একদল তুর্কী লন্ডন যাত্রা করে কিন্তু যে বিমানটি তুর্কীদের বহন করে তা দুর্ঘটনার কবলিত হয় এবং মেন্দারেস ছাড়া অপর সকলে নিহত হন। ১৯শে ফেব্রুয়ারি সাইপ্রাস তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। দশ বছরের রাজত্বকালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এক অসাধারণ নজীর স্থাপন করলেও মেন্দারেস রাজনৈতিক বিপর্যয় এড়াতে পরেন নি।

খ. অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেন্দারেসের গণতন্ত্রী দল কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ক্ষমতাশীল দল যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বহুলাংশে ছিল অবাস্তব। মেন্দারেস চান বড় বড় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে মুস্তাফা কামালের সংস্কার আন্দোলনের সমতুল্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা; কিন্তু কামালের মত দুরদর্শিতা, কর্মতৎপরতা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মেন্দারেস ছিলেন না। গণতন্ত্রী দলের মানসিক গঠনও সময়োপযোগী ছিল না। অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও তুর্কী সমাজে উদীয়মান মধ্যবিত্ত সমাজই ছিল গণতন্ত্রী দলের প্রধান সমর্থক এবং ব্যক্তিগত মুলধন নিয়োগে তাদের উৎসাহিত করলেও তেমন সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যায়নি। ফলে পুঁজি বিনিয়োগে মারাত্মক সঙ্কট দেখা দেয়। ফলে মেন্দারেস সরকার দ্রুত শিল্পায়নের নীতি গ্রহণ করে বহু কলকারখানা স্থাপন করে এবং একমাত্র সরকারি পর্যায়ে কর্পোরেশনগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সাফল্যজনক বাস্তবায়নের অভাব এবং পুঁজি বিনিয়োগের সঙ্কটের ফলে তুরস্কে অতি সত্ত্বর অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল। কল-কারখানা পরিচালনার যে অভিজ্ঞতা ও দেশ প্রেমের প্রয়োজন ছিল তার অভাবে কিছু সুবিধাভোগকারী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ফলে অতি শীঘ্র ঘুষ, অনুগ্রহ, লাভজনক কার্যকলাপ,

www.pathagar.com

কালোবাজারী, ভুয়া কমিশন সমাজে দুষ্ট গ্রহের মত বিরাজ করতে থাকে জনগণের স্বার্থে নয়, রাজনৈতিক ফল আদায়ের জন্য। অপরিকল্পিত বিনিয়োগ এবং সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার অভাবে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল। গণতান্ত্রিক দল বিপুল অর্থ বরাদ্ধ করলেও তা বিনিয়োগ করা হয় বিশৃঙ্খলভাবে। যেখানে অধিক পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপাদিত হত, সেখানে ভূগর্ভের পশু খাদ্যাগার নির্মিত হয়; ইক্ষু চাষ শুরু না করে চিনির কল স্থাপিত হয, ফলে কাঁচা মালের অভাবে শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে। যেখানে বহু বছর পরে কলকারখানায় বিদ্যুৎ ব্যবহার হবে সেখানে অগ্রীম অপরিকল্পিত বৈদ্যুতিক কারখানা স্থাপিত হয়। অর্থনৈতিক সঙ্কটের অন্যতম কারণ ছিল সরকারি পর্যায়ে অহেতুক অনুষ্ঠানদিতে অর্থ অপচয়। ফলে ক্রমশ রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য হতে থাকে। গণতান্ত্রিক দল গঠিত তুর্কী সরকার কি প্রকার অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয় তার অন্যতম নজীর হচ্ছে বৈদেশিক ঋণের বোঝা। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ২২.৮ কোটি ডলারে বৈদেশিক ঋণের মাত্রা এসে দাঁড়ায়। এই ঋণের মধ্যে ব্রিটিশ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি। আমেরিকা ঋণ দান বন্ধ করে দেয়। আমদানী রপ্তানিতে ছাড়িয়ে যায়। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য মন্থর হয়ে পড়ে এবং তুরস্ক মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

গ. সামাজিক বৈষম্য ঃ মেন্দারেসের সরকারের আমলে সামাজিক বৈষম্য ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রেও বিপর্যয় দেখা দেয়। আইনের ক্ষমতা ও শাসন এবং জনস্বার্থে পরিচালিত রীতি-নীতি ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ক্ষমতাশীল দলের স্বার্থে গৃহীত হতে থাকে। চাকুরি প্রদান, সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ, অর্থনৈতিক উৎসসমূহের ব্যবহার যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিবর্তে দলীয় স্বার্থে করা হত। ফলে তুরস্কে একটি সুবিধাবাদী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, যারা সকল ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করে। ফলে সংসদে ক্ষমতাশীল এবং বিরোধী দলের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দেয়। মেন্দারেস কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ককে সামরিক শক্তিতে পরিণত করার জন্য পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে বিনা সুদে ঋণ দানে প্রলুব্ধ করেন এবং অর্জিত ঋণ গ্রহণের পর প্রকৃত স্বদ্ব্যবহারের স্থলে অপচয়ের ফলে তুরস্ক দেওলিয়া হয়ে পড়ে। মেন্দারেস সরকার দমন নীতির প্রয়োগ করে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ছাপা খানার আইন সংশোধন করে। এর প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল বিরোধী দলের প্রচারনাকে স্তব্ধ করা। কিন্তু এই ঘৃণ্য পদক্ষেপ রাজনৈতিক সঙ্কটকে ত্বরান্বিত করে। মেন্দারেস সরকারের বিরুদ্ধে আমেরিকার একটি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন 'ওয়াতান' পত্রিকায় পুনঃমুদ্রিত হলে সম্পাদক এস এমিনকে কারাদন্ড দেওয়া হয়। সরকারি নীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপককে বলপূর্বক অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

ঘ. ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের কোন্দল ঃ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে মে বিপ্লবের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে, ক্ষমতাশীল গণতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে সংসদের বিরোধীদলসমূহের সম্পর্ক সন্তোষজনক ছিল না। এর প্রধান কারণ ক্ষমতাশীল দল ন্যায় ও ক্ষমতা নীতির ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনার ব্যর্থতা। সাংবিধানিক স্বাধীনতা আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক ও স্বার্বভৌমত্বের অপব্যাখ্যার ফলে বিরোধ

www.pathagar.com

চরম আকার ধারণ করে। মূলতঃ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই এই কোন্দল শুরু হয় এবং বিরোধী দল রিপাবলিকান পিপলস্ পার্টি, জাতীয়তাবাদী দল মজলিসের অভ্যন্তরে ও বাইরে ক্ষমতাশীল গণতান্ত্রিক পার্টির বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ক্ষমতাশীল দল বিরোধীদলের উপর দমন নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

১৯৬০-এর ২৭শে মের বিপ্লব ঃ দমন নীতীর ফলশ্রুতিতে গণতান্ত্রিক দল ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্র আইন কঠোর করে এবং বিরোধী দলীয় নেতা ইসমত ইনোনুর সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ নিষিদ্ধ করে। এমন কি ইসমত ইনোনুর প্রাণের হুমকীও দেওয়া হয়।

২৭শে মের প্রত্যুষে আঙ্কারা রেডিওতে বিপ্লবের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং সেনাবাহিনী সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। তুর্কী বাহিনী দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে এবং সাবেক রাষ্ট্র প্রধান, কেবিনেট ও ক্ষমতাশীল দলের সদস্যবর্গ পার্লামেন্টে আশ্রয় গ্রহণ করে। একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে সেনাবাহিনী শাসনকার্য পরিচালনা করে। জাতীয় কমিটির প্রেসিডেন্ট জেনারেল গুরসেল রাষ্ট্র প্রধান ও সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্য থেকে পাঁচ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

তুরস্কের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কারণে সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং জেনারেল গুরসেল স্বহস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পর্ব

ইরান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

আফসারী ও জান্দ বংশের শাসন

পটপ্রেক্ষিত

সাফাভি বংশের পতন ঃ ইরানের রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাফাভি বংশের অভ্যুত্থান এবং ১৫০২ থেকে ১৭৩৬ সন পর্যন্ত ২৩৪ বছর পর্যন্ত তাদের নিরবচ্ছিন্ন শাসন। এ কারণেই ই. জি. ব্রাউন তার History of Perisa গ্রন্থে বলেছেন, "পারস্যের সাফাভি বংশের উত্থান ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।" এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন মহান শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯)। ইরানের আধুনিকরণে শাহ আব্বাসের অসামান্য অবদান ছিল। সে সময় রাজধানী ইসফাহান প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত হয়। চার্ডিনের ভাষায় (১৬৬৬) ইসফাহানে ১৬২ মসজিদ, ৪৮টি মাদ্রাসা, ১৮২টি সরাইখানা এবং ২৭৩ হাম্মাম ছিল। সাফাভি বংশের সর্বশেষ শাসক ছিলেন- তৃতীয় আব্বাস। ইরান যখন বহিঃশক্রদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন নাদির কুলি খান নামে এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও সমরকুশলী সেনাবাহিনীতে যোগদান করে সাফাভি বংশের পতনকে সাময়িকভাবে রোধ করেন। কিন্তু ক্ষমতালোভী নাদির কুলি দুর্বল ও অযোগ্য সাফাভি শাসক তৃতীয় আব্বাসকে ক্ষমতাচ্যুত করে পারস্যের সিংহাসনে উপবেষন করেন। নাদির কুলি 'শাহ' উপাধি ধারণ করে শাসন করলে ১৭৩৬ সনে সাফাভি বংশের পতন হয়।

আফসারী বংশের প্রতিষ্ঠাতা নাদির শাহ (১৭৬৬-৪৭) ঃ আফগান অধিপতি আফসারী বংশোদ্ভুত নাদির কুলি শাহ হিসেবে পারস্য শাসন করতে থাকেন ১৭৩৬ সন থেকে। সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নাদির কুলি অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তিনি পারস্যের সাফাভি রাজবংশের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। হৃতরাজ্য ও অঞ্চলগুলো তুরস্ক ও রাশিয়ার কাছ থেকে উদ্ধার করে পারস্যের অখণ্ডত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নাবালক শাহ তৃতীয় আব্বাসের আকস্মিক মৃত্যুতে সিংহাসন শূন্য হয়ে পড়লে ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা দখল করে 'শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তিনি অভিষেক উৎসব 'নওরোজ' জাঁকজমকের সাথে পালন করেন। উপজাতীয় প্রথা অনুযায়ী আফসারী গোত্রের সদস্যগণ পারস্যের সিংহাসনে কোনো সাফাভি উত্তরাধিকারী না থাকায় নাদির কুলি বেগকে সিংহাসনে বসার অনুরোধ জানান। নাদির কুলি কয়েকটি শর্তে সিংহাসনে বসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে যে, তাঁর বংশধরদের উত্তরাধিকারী করতে হবে, সাফাভি বংশের কেউ সিংহাসন দাবি করতে পারবে না; প্রথম তিন খলিফা, হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমানের প্রতি অভিশাপ-বর্ষণ বন্ধ করতে হবে এবং ইমাম হোসেনের জন্য শোক প্রকাশ (মার্সিয়া) এবং মুহররম বন্ধ করতে হবে। পারস্যের সিংহাসনে বসার পর নাদির শাহ, যাঁকে এশিয়ার নেপোলিয়ন (Napoleon of Asia) বলা হয়, দেশজয়ের পরিকল্পনা করেন। তিনি চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লং-এর

www.pathagar.com

সমকক্ষ ছিলেন। ক্ষমতালাভের পূর্বেই তিনি আফগান ও তুর্কিদের দমন করেন। তা ছাড়া তিনি রাশিয়ার সম্প্রসারণবাদ নীতিতে কুঠারাঘাত করেন। সিংহাসনে বসার পর পারস্যের প্রভাবশালী বখতিয়ার গোত্র তাঁর বিরোধিতা করে। তিনি দুবার সমরাভিযান করে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন। নাদির শাহ বখতিয়ার গোত্রের পুনর্বাসনের জন্য পারস্যের সীমান্ত অঞ্চলে জমি বন্টন করেন। এ ছাড়া তাদের খুশি করার জন্য দুর্ধর্ষ বখতিয়ারি যোদ্ধাদের পারস্য সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নাদির শাহ দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। একসময় তিনি তুর্কিদের বিরুদ্ধে অভিযান করে বাগদাদ দখল করেন। নাদির আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে কান্দাহারে বিদ্রোহী গিলজাই উপজাতির বিদ্রোহী নেতা মীর মুহম্মদের ভাই মীর হুসাইনের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। নাদির শাহের আগমনে মীর হুসাইন এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নেন। প্রায় এক বছর এই দুর্গ অবরুদ্ধ থাকার পর মীর হুসাইন আত্মসমর্পণ করেন। মীর হুসাইনকে বন্দি করা হয় এবং পরে মাজেন্দ্রানে তাঁকে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়। কান্দাহার দখলের ফলে শক্তিশালী গিলজাই আফগানদের পতন ঘটে এবং আফসারী আফগান দলপতি ও পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নাদির শাহের পুত্র রেজা কুলি পিতার আদেশে বল্খ প্রদেশ আক্রমণ করেন। তিনদিন বিরামহীন যুদ্ধের পর রেজা কুলি বল্খ দখল করেন। এ ছাড়া রেজা কুলি অক্রাস নদী পার হয়ে ৪০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল উজবেকবাহিনীকে পরাস্ত করেন। এরপর তিনি মধ্য-এশিয়ার বুখারার দিকে অভিযান করেন। কিন্তু পিতা নাদির শাহের নির্দেশে রেজা কুলি রাজধানী ইস্পাহানে ফিরে আসেন।

নাদির শাহের ভারতবর্ষ আক্রমণ তাঁর সমরাভিযানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিভিন্ন কারণে নাদির শাহ ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে মুঘল শাসিত ভারতবর্ষে অভিযান করেন। অর্থাভাব বা সংকট, কান্দাহার হয়ে ভারতবর্ষে অভিযানের সুযোগ, খাইবার গিরিপথ দিয়ে যাতায়াতের সহজ রাস্তা, মুঘল বাদশাহ মুহম্মদ শাহের সঙ্গে বৈরিতা প্রভৃতি কারণে নাদির শাহ ভারতবর্ষে অভিযান করেন। নাদির মুঘল-সম্রাটকে পারস্য থেকে পলাতক কোনো বিদ্রোহীকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু বহু পারস্যবাসী নাদিরের ভয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নেন। এ ছাড়া নাদিরের প্রেরিত দূতদের প্রতি অসদাচরণ অভিযানের অন্যতম কারণ। একজন দূতকে বন্দি করে রাখা হয়। অন্যজনকে জালালাবাদের মুঘল শাসনকর্তা মীর আব্বাস হত্যা করেন। নাদির শাহ গজনি ও কাবুল হয়ে খাইবার গিরিপথ পার হয়ে পেশওয়ারে পৌঁছান। এরপর পাঞ্জাবে প্রবেশ করে লাহোর দখল করেন। লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মুহম্মদ শাহ সেনাপতি সাদাত খানের নেতৃত্বে কর্নালের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু পারস্যবাহিনীর কাছে মুঘলবাহিনী পরাজিত হল। মুঘল-সম্রাট পারস্য-সম্রাটের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। নাদির বিজয়ীর বেশে রাজধানী দিল্লিতে প্রবেশ করলেন। নাদির শাহকে পঞ্চাশ লাখ টাকার অর্থ গ্রহণ করে পারস্যে ফিরে যাবার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি ৫৭ দিন দিল্লিতে অবস্থান করে ধনসম্পদ লুট করেন। কিন্তু একদিন গুজব রটল যে নাদির শাহ নিহত হয়েছেন। এই সুযোগে দিল্লিবাসী কিছুসংখ্যক পারস্য সৈন্যকে হত্যা করে। সংবাদ পেয়ে নাদির দিল্লি নগরী ধ্বংসের আদেশ দেন। পারস্য সৈন্যবাহিনীর লুটতরাজ, গণহত্যা, বাড়িঘর অগ্নিদগ্ধ করতে থাকে। দিল্লির রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়ে

www.pathagar.com

যায়। ধারণা করা হয় যে, এই হত্যাকাণ্ডে লক্ষাধিক দিল্লিবাসী প্রাণ হারায়। অবশেষে মুহম্মদ শাহের বিশেষ অনুরোধে নাদির শাহ্ এই হত্যাকাণ্ড বন্ধের আদেশ দেন। সুলতান মাহমুদের মতো নাদির শাহ্ ভারতবর্ষ দখল ও জয় করে এখানে রাজত্ব করতে আসেননি। তিনি ধনসম্পদ লুট করতে এসেছিলেন। এর প্রমাণ এই যে, ভারতবর্ষ থেকে পারস্যে ফিরে যাবার সময় তিনি হীরা-জহরত-মণিমাণিক্যসহ প্রায় ৬০ লাখ টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে যান। তা ছাড়া কয়েক হাজার আশরাফি (স্বর্ণমুদ্রা), এক কোটি টাকা মূল্যের সোনার থালা। শুধু তা-ই নয়, তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের প্রতীক শাহজাহানের ময়ূর-সিংহাসন এবং মহামূল্যবান কোহিনুর নামক হিরকখণ্ড (যা বর্তমানে ইংল্যান্ডের টাওয়ার অব লন্ডনে সংরক্ষিত আছে) নিয়ে যান। ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পূর্বে নাদির শাহ মুহম্মদ শাহের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন এবং মুহম্মদ শাহের মাথায় মুঘল-সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দেন। এ ছাড়া মুহম্মদ শাহের এক কন্যার সাথে নাদির শাহের দ্বিতীয় পুত্র নসরুল্লাহ্ খানের বিয়ে হয়।

ভারতবর্ষে সাফল্যজনক সমরাভিযান নাদির শাহের বীরত্ব ও খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে নাদির বিদ্রোহী শাসনকর্তা খুদাই খান আব্বাসিকে শাস্তিদানের জন্য সিন্ধু অঞ্চলে অভিযান করেন। খুদাই খান পরাজিত ও বিতাড়িত হন। এই অভিযানের ফলে নাদির শাহ বল্‌খ থেকে অক্সাস নদী পার হয়ে বোখারায় অভিযান করেন। বোখারার শাসনকর্তা আবুল ফয়েজ খান নাদিরের বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি তাঁর ভগ্নীকে নাদিরের সাথে বিয়ে দেন। বুখারা জয়ের পর মধ্য-এশিয়ায় খিভা নাদিরের অধিকারের আসে। তিনি স্থানীয় শাসনকর্তা ইলবার্স খানকে পরাজিত করে আসপ ও জাউক নামে দুটি দুর্গ দখল করেন। সুদূর ইরাক থেকে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করে নাদির শাহ্ তাঁর বিজয় গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ কারণেই তাঁকে 'এশিয়ার নেপোলিয়ন' বলা হয়েছে।

কৃতিত্ব

নাদির শাহ্ রাজত্বের শেষার্ধে নৃশংসতা ও বর্বরতার সাথে সকল বিদ্রোহ দমন করতে থাকেন। ক্ষমতার দম্ভ তাঁকে গ্রাস করে। এ কারণে জনগণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে। 'তারিখ-ই-জাহানগুসা'য় বর্ণিত আছে যে, নাদির শাহের নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য তাঁর প্রজাগণ বিদ্রোহ করে, এমনকি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলি কুলিকে সিস্তানে বিদ্রোহ দমনে পাঠালে তিনি নিজেই নাদিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কুর্দিস্তানে বিদ্রোহ দেখা দিলে নাদির শাহ্ এক বাহিনী নিয়ে স্বয়ং অভিযান করেন। এই অভিযানকালে মুহম্মদ সালেহ্ খান এবং মুহম্মদ কুলি খান নামের স্বগোত্রীর দুই আত্মীয়ের হাতে নাদির নিহত হন। নাদির শাহ সম্বন্ধে আরভিন বলেন, "Nadir Shah was no mere soldier, no savage leader of a savage horde (?), but a master of diplomacy and statecraft as well as of the sword." অর্থাৎ "নাদির শাহকে একজন সাধারণ সৈনিক বলা যাবে না, তাঁকে এক বর্বর উপজাতির বর্বর নেতাও বলা যাবে না; বরং কূটনীতিজ্ঞান ও শাসনকার্যের দক্ষতায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, যেমন ছিলেন রণাঙ্গনে অপরাজেয় বীর।" এশিয়ায় যে-কজন দিগ্বিজয়ী বীর জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁদের একজন। চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লং-এর মতো

www.pathagar.com

তেজস্বিতা ও বীরত্ব ছাড়া নাদির শাহ মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য-এশিয়ায় বিশাল অঞ্চল দখল করতে পারতেন না। দরিদ্র পরিবারের এক মেষপালক পারস্যের সম্রাটের মর্যাদা লাভ করেন। সাফাভি বংশের পতনের জন্য তিনি দায়ী হলেও তুর্কি ও রুশ আগ্রাসন থেকে পারস্যকে রক্ষা করে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই কারণে পার্সি সাইকস বলেন, "এভাবে আফসারি বংশের মেষপালক নাদির স্বীয় সামরিক প্রতিভাবলে ইরানকে (পারস্য) আফগান, তুর্কি ও অন্যান্য আক্রমণকারী শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত অভিলাষ পরিপূর্ণ করলেন এবং মহাসমারোহে সাইরাস, নওশেরওয়ান ও শাহ আব্বাসের ঐতিহ্যবাহী সিংহাসনে আরোহন করলেন।" শাসক হিসেবে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেন। দিল্লিতে অভিযান করে তিনি অগাধ সম্পদের মালিক হন। অপরদিকে তাঁর অভিযানের ফলে দিল্লির মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়। তিনি সুন্নিপন্থি ছিলেন এবং এ কারণে তিনি শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব ক্ষুণ্ন করার জন্য জাকারিয়া নামে পঞ্চম মাযহাব (হানাফি, শাফায়ি, মালিকি ও হাম্বলি) প্রবর্তন করেন। নাদির শাহ আকবরের দীণ-ই-ইলাহির মতো এই মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি উদারপন্থি ও সহিষ্ণু ছিলেন। এ কারণে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার তৌরাত ও বাইবেল ফারসিতে অনুবাদের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি।

সুশাসক হিসেবে নাদির খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি স্থলবাহিনীর মতো নৌবাহিনী গঠন করেন। এর ফলে কাস্পিয়ান সাগর এবং পারস্য উপসাগরে নৌ-অভিযান করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া জলদস্যুদের দমন সহজতর হয়। নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হতে থাকে। এ সময়ে ইংরেজরা সমুদ্র উপকূলে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের সুযোগ পায়। তিনি সন্ধিগ্ধপরায়ণ ছিলেন। একবার তিনি অজ্ঞাতনামা এক আততায়ীর গুলিতে আহত হলে কুচক্রীরা তাঁকে বলে যে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রেজা কুলি ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন। সন্দেহবশে রেজা কুলির চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করা হয়। পরে তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে অনুতপ্ত হন। তাঁর অনুশোচনা হয়। যাহোক, নাদির শাহ পারস্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাটের মর্যাদা লাভ করেছেন।

আফসারীদের পতন

১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহের মৃত্যুর পর আফসারীদের পতন হয়, কারণ তাঁর কোনো যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁর মৃত্যু বিদ্রোহের ঘণ্টাধ্বনি ছিল। আফগান, উজবেক পারস্যবাসীদের দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনীর মধ্যে ঐক্য থাকল না। আফগান উপজাতির মধ্যে খুব প্রতাপশালী ছিলেন আহম্মদ শাহ আবদালি যিনি পরে ভারতবর্ষে অভিযান করেন। আহমদ শাহ নাদিয়া শাহের অধীনে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তিনি আফগানিস্তানে এক স্বাধীন রাজ্য কায়েম করেন। নাদির শাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অন্ধ রেজা কুলিকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলি কুলি খান আদিল শাহ উপাধি ধারণ করে পারস্যের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু কয়েক মাস রাজত্ব করার পর তাঁর ভাই ইব্রাহিম শাহ ক্ষমতা দখল করেন। আদিল শাহকে বন্দি ও পরে অন্ধ করা হয়। কিন্তু সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে ইব্রাহিমকে বন্দি করে। পরবর্তীকালে আদিল শাহ এবং তাঁর ভাই ইব্রাহিম শাহ মেসেদের কারাগারে নিহত হন। আফসারি বংশের সর্বশেষ শাসক ছিলেন নাদির শাহের পৌত্র এবং রেজা কুলির পুত্র শাহরুখ। তিনি ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে শাসনভার গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। কিন্তু আবদালিদের অভিযানের ফলে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করতে পারেননি। ইস্পাহান তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে খোরাসান অঞ্চলে ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। মেসেদে কাযার দলপতি আগা মুহম্মদের হাতে তিনি নিহত হন। শাহরুখের মৃত্যুর পর আফসারী বংশের পতন হয়।

জান্দ বংশ

আফসারী বংশের পর পারস্যে, বিশেষ করে ইস্পাহানে যে বংশের অভ্যুত্থান হয় তার নাম 'জান্দ' বংশ। 'জান্দ' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা যায় না, তবে অনেকের মতে, জরথুস্ত্রদের ধর্মগ্রন্থ 'জান্দ আভেস্তা' থেকে 'জান্দ' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এই বংশের আযমাখের পুত্র করিম খানের নেতৃত্বে জান্দ বংশ পারস্যে ক্ষমতা লাভ করে। করিম খান ১৭৫০ থেকে ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। তারপর আরও ছয়জন শাসক ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জান্দ বংশের সিংহাসনে বসেন।

করিম খান জান্দ (১৭৫০-১৭৭৯ খ্রি.)

পারস্যে জান্দ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন করিম খান। তিনি নাদির শাহের বাহিনীতে সামান্য সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। আফসারি বংশের শেষ সুলতান শাহরুখের সময়ে যখন পারস্যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় তখন বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন গোত্রপতিদের দ্বারা শাসিত ছিল। এঁদের মধ্যে বখতিয়ার গোত্রপ্রধান আলি মার্দান সামরিক বাহিনী গঠন করে ইস্পাহান দখল করেন। ইস্পাহানে আফসারি বংশের শেষ শাসক শাহরুখের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি বখতিয়ারি বাহিনীর হাতে পরাজিত হলে ইস্পাহান আলি মার্দানের দখলে চলে আসে। এ সময় জান্দ বংশের প্রভাবশালী গোত্রপতি করিম খানের সাথে আলি মার্দানের পরিচয় হয়। করিম খান আলি মার্দানকে সামরিক বাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আলি মার্দান করিম খানকে ইস্পাহানের শাসক নিয়োগ করেন। অতি অল্প সময়ে করিম খান ইস্পাহানের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন। আলি মার্দান ও করিম খান সাফাভি বংশের গদিচ্যুত শাহ সুলতান হুসাইনের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় ইসমাইলকে নামেমাত্র সুলতান হিসেবে পারস্যের সিংহাসনে বসান। প্রকৃত শাসক ছিলেন প্রধান সেনাপতি আলি মার্দান এবং প্রধান উজির করিম খান। অল্পদিনের মধ্যে আলি মার্দান এবং করিম খানের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিল। সংঘর্ষে আলি মার্দান পরাজিত ও নিহত হন। এর ফলে দক্ষিণ পারস্যে করিম খান ক্ষমতার অধিকারী হলেন।

করিম খানের প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে আযারবাইযানের শাসনকর্তা আজাদ খান আফগানি এবং কাযার দলপতি মুহম্মদ হুসাইন খান তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করলেন। করিম খান উভয়সংকটে পড়লেও বিচলিত হলেন না। তিনি সেনাবাহিনী সুসংহত করে প্রথমে আযারবাইযানের শাসনকর্তা আজাদ খানের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেন; কিন্তু তিনি আজাদ খানের নিকট পরাজিত হন। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে কাযউইনের রণক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে করিম খান আত্মগোপন করেন। এ সময়ে তিনি বুশায়ারে কিশাতের দলপতি রুস্তম সুলতানের সামরিক সাহায্য লাভ করেন। করিম খান আজাদ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। বুশায়ারের নিকট 'কোতাল-ই-কামারিজ' নামক রণাঙ্গনে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমূল লড়াই হয়। এই যুদ্ধে

www.pathagar.com

আজাদ খান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে তিনি করিম খানের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

করিম খান জান্দ আজাদ খানের বশ্যতা লাভ করে কাযার দলপতি মুহম্মদ হোসেন খানের বিরুদ্ধে সমরপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হোসেন খান এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সিরাজ অবরোধ করেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে করিম খান মুহম্মদ হোসেনের বাহিনী মোকাবেলা করেন। তিনি মুহম্মদ হোসেনের বিশাল সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হতে না পেরে কৌশল ও কূটচাল অবলম্বন করলেন। করিম খান সিরাজে রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিলেন এবং অর্থের বিনিময়ে মুহম্মদ হোসেনের সৈন্যদের নিজদলে ভিড়াতে লাগলেন। এর ফলে মুহম্মদ হোসেনের সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মুহম্মদ হোসেন সিরাজের অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হন। এ সময়ে করিম খানের সেনাপতি শেখ আলি খান অতর্কিত আক্রমণে মুহম্মদ হোসেনের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। পলায়নের সময় মুহম্মদ হোসেন আততায়ীর হাতে নিহত হন। মুহম্মদ হোসেনের পুত্রগণ আত্মসমর্পণ অথবা নিহত হলে কাযার বংশের ক্ষমতা লোপ পায়। আযারবাইযানের দলপতির বশ্যতা স্বীকার এবং কাযারদের সামরিক বিপর্যয়ে করিম খান জান্দ তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি সুদৃঢ় করেন। তিনি ফারস, ইস্পাহান, জিলান, মাজেন্দ্রানে স্বীয় প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থন হন।

করিম খান জান্দ সুশাসক ছিলেন। তাঁর রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতেন। তাঁর শাসনামলে কয়েকটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে মারাত্মক ছিল পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে দুর্ধর্ষ আরব শেখদের বিদ্রোহ এবং জিলানের আফসারি শাসক ফতেহ আলি খানের বিদ্রোহ। করিম খান পারস্য উপকূলবর্তী এলাকায় মীর মুহম্মদ এবং সুলায়মান নামে দুজন দুর্ধর্ষ আরব শেখকে নিরস্ত্র করেন। মহানুভব করিম খান তাঁদের ক্ষমা করে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন এবং তাঁরা করপ্রদানের বাধ্য হন। অন্যদিকে জিলান প্রদেশে আফসারি শাসক ফতেহ্ আলি খান করিম খানের বিরোধিতা করে অস্ত্রধারণ করেন। করিম খান ফতেহ্ আলির বিদ্রোহ দমন করে তাঁকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করেন। করিম খানের বিপথগামী ভাই জাকি খানও করিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। পরে অনুতপ্ত হয়ে ভাই-এর কাছে ক্ষমা চান। দয়াপরবশ হয়ে করিম খান তাঁর ভাইকে ক্ষমা করেন এবং দামগান অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের জন্য এক বাহিনী দিয়ে তাঁকে সেখানে পাঠান।

করিম খান জান্দের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বসরা দখল। ইরাকের বসরা নগরী অধিকারের ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। সাদিক খান দীর্ঘ তেরো মাস অবরোধের পর তুর্কিদের অধিকৃত বসরা দখল করেন। বসরা দখলের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে পারস্যের রেশম ও খনিজদ্রব্যাদি পাঠানো সম্ভব হয়। করিম খান জান্দ দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পারস্যের উপকূলে ইউরোপীয় বাণিজ্য-জাহাজ আসতে থাকে। দেশের রাজনৈতিক সংকটের সুযোগে ওলন্দাজ বণিকেরা পারস্য সাগরের খারক দ্বীপ দখল করে। ওলন্দাজ প্রতিনিধি ব্যারন নিপহাউজেন এই দ্বীপ দখল করলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়। দ্বীপের লোকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় বারো হাজারে। কিন্তু ওলন্দাজদের আধিপত্য বেশিদিন টেকেনি। এর কারণ এই যে বন্দর রিগের

www.pathagar.com

জলদস্যু মীর মোহান্না ওলন্দাজদের কাছ থেকে খারক দ্বীপ দখল করেন। করিম খান জান্দ পারস্যের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ দেন। বহির্বাণিজ্য বা সমুদ্র-বাণিজ্যের প্রসারতার জন্য করিম খান ইংরেজ বণিকদের একটি ফরমান দেন। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত এই ফরমানে ইংরেজদের বুশায়ারে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। ইংরেজগণ ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বসরাতেও বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ইংরেজ বণিকগণ শঠতার বশবর্তী হয়ে করিম খানের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকেন। এ কারণে করিম খান একটি বাহিনী পাঠিয়ে বসরার বাণিজ্যকুঠি অধিকার করেন। অবশ্য ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে করিম খানের মৃত্যু হলে ইংরেজগণ পুনরায় বসরায় বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করে।

দক্ষ সেনাপতি, বিচক্ষণ শাসক ও কূটনীতিজ্ঞ করিম খান জান্দ পারস্যের একচ্ছত্র শাসক হিসেবে দীর্ঘ ২৯ বছর শাসন করেন। তিনি 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করেননি। তিনি সাফাভি রাজবংশের এক বংশধরকে সিংহাসনে বসান। অবশ্য ইস্পাহান এবং পার্সিপলিসের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত এক দুর্গে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। করিম খানের অন্যতম প্রশাসনিক কৃতিত্ব ছিল এই যে তিনি ইস্পাহান থেকে রাজধানী সিরাজে স্থানান্তরিত করেন। ঐতিহাসিক এই নগরীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য খ্যাতি ছিল। শুধু তা-ই নয়, অমর কবি হাফেজ ও কবি শেখ সাদির সমাধিসৌধ এই শহরে অবস্থিত। করিম খান হাফেজের সমাধির ওপর একটি আকর্ষণীয় সৌধ নির্মাণ করেন এবং শেখ সাদির সমাধিসৌধটি সংস্কার করেন। এ দুটি সমাধি একটি মনোরম বাগানের মধ্যে নির্মিত হয়। করিম খান সিরাজ শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য সুন্দর সুন্দর ইমারত তৈরি করেন। একটি বিপণিকেন্দ্র স্থাপিত হয় যার নাম ছিল 'বাজার-ই-ওয়ালি'। কৃতিত্বের সাথে ১৭৫০ থেকে ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৯ বছর শাসন করে আশি বছর বয়সে করিম খান জান্দ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর জান্দ বংশ বেশি দিন টেকেনি। Laurence Lockhart and J. A Boyle বলেন, "He (Karim Khan Zand) turned out to be one of the best and mildest rulers that Persia had ever had." (অর্থাৎ "পারস্যের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে করিম খান জান্দ অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং দয়ালু শাসক ছিলেন।") করিম খান উদার, প্রজারঞ্জক ও মহানুভব শাসক ছিলেন। তিনি পরাধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। উইলবারের মতে, "করিম খান জান্দ চমৎকার ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি জনগণের ঐকান্তিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন।"

জান্দ বংশের পতন

করিম খান জান্দের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য ও অকর্মণ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। করিম খান জান্দের মৃত্যুর পর ১৭৭৯ থেকে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জান্দ বংশের ছয়জন শাসক রাজত্ব করেন। এর পর তাঁদের কাছ থেকে আগা মুহম্মদ খান কাযার ক্ষমতা হরণ করেন। আগা খান নৃশংস শাসক ছিলেন এবং জান্দ বংশের পতনের পর ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে কাজার বংশ প্রতিষ্ঠা করেন, এই বংশ রেজা খান পাহলভি কর্তৃক ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে পাহলভি বংশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত পারস্যে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাজার বংশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা

পটভূমি ঃ প্রাচীন পারস্য অথবা বর্তমানের ইরান ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ। বহু প্রাচীন রাজবংশ পারস্যে রাজত্ব করে সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তোলে। সর্বপ্রথম একামেনীয় বংশের প্রতাপশালী সম্রাট সাইরাস ও দরায়ূস তৎকালীন গ্রীক সাম্রাজ্যের জন্য ছিলেন বিভীষিকা। একামেনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী পার্সিপলিশ ধ্বংস করে গ্রীক দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার খ্রিঃ পূঃ ৩৩১ অব্দে পারস্য দখল এবং তাঁর সেনাপতি সেলুকাস সেলুসিড বংশ স্থাপন করেন। এই সময় থেকেই পারস্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এমন কি পার্থিয়ান (খ্রিঃ পূঃ ২৫০-২২৬) এবং সাসানীয় (খ্রিঃ পূঃ ২২৬-৬৫২) যুগেও প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের মিলন ঘটে। পারস্য মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ৬৩৮ সালে এবং সাদ বিন আবি-ওয়াককাস সাসানীয় রাজধানী মা'দাইন (টেসিফোন) দখল করার পর পারস্যে মুসলিম প্রভাব, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে পারস্য মুসলিম জাহানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। আব্বাসীয়দের পতনের পর পারস্যে মঙ্গল-ইলখানী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইলখানীগণ ১২৫৮ থেকে ১৩৩০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করে। এরপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলখানী বংশ আধিপত্য বিস্তার করে। দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুর লঙ্গ চাগতাই বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং পারস্যে আধিপত্য বিস্তার করেন। তেমুরী বংশ ১৩৩৬ থেকে ১৫০৭ সাল পর্যন্ত পারস্যে একচ্ছত্র রাজত্ব করে। তৈমুরী বংশের পতনে পারস্যে শিয়া সাফাভী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসমাইল সাফাভী (১৪৯৯-১৫২৪ খ্রিঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান শাহ্ আব্বাসের আমলে পারস্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তাঁর সময়ে ইংল্যান্ডের শার্লি ভ্রাতৃদ্বয় ইরানে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন এবং এই সময় ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশ থেকে ব্যবসায়ীগণ ইরানে আসতে থাকে। প্রায় দুই শত বছর সাফাভী বংশ স্থায়ী হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৭২৯ সালে পারস্য আফগানদের দ্বারা শাসিত হয়। ১৭৩৬ থেকে ১৭৪৭ সাল পর্যন্ত নাদির শাহ্ রাজত্ব করেন। নাদির শাহ্ আফগান গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং দক্ষিণাঞ্চলে জান্দ বংশ শাসনকার্য পরিচালনা করে।

কাজার বংশ

ফতেহ্ আলী শাহ (১৭৯৭-১৮৩৪) ঃ ইরানের ইতিহাসে কাজার বংশের শাসন একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। নাদির শাহের মৃত্যুর পর অরাজকতা শুরু হলে কিজিলবাস গোত্রের 'কাজার' উপজাতির আগা মোহম্মদ খান কাজার ইরানে আধিপত্য বিস্তার

www.pathagar.com

করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাজার বংশ ১৭৯৬ থেকে ১৯২৬ সাল অর্থাৎ এক শত ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। ১৭৯৭ সালে আগা মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেহ আলী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৮৩৪ সালে পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তাঁর শাসনামলে ইরানে ফরাসী ও ব্রিটিশ শক্তির প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা হয়।

ফিনক্যানস্টাইনের চুক্তি ঃ ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন ফতেহ্ আলীর দরবারের দূত পাঠান এবং ইরানের সঙ্গে সন্ধি করে রাশিয়ার দখল থেকে ককেশাস অঞ্চল উদ্ধারের প্রস্তাব দেন। ব্রিটেনের প্রভাব সীমিত করে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের প্রয়াসে এবং ভারতবর্ষে অভিযানের অভিলাসে নেপোলিয়ন ফতেহ্ আলী শাহের সহযোগিতা কামনা করেন। ইরান ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পাদিত এই সামরিক ফিনক্যানস্টাইনের চুক্তিতে নেতৃত্ব দেন জেনারেল গারদো (Gardaune)। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তান ও ইরানকে মধ্যবর্তী রাষ্ট্র বা buffer state হিসাব স্বীকৃতি দান কিন্তু ক্রমবর্ধমান ফরাসী প্রভাবে শঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ইরানের দরবারে দূত পাঠান।

ক্যাপটেন ম্যালকম ও স্যার জোনসের আগমন ঃ ফতেহ্ আলী শাহ কাজারের দরবারে ভারতের ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ক্যাপটেন ম্যালকম ও স্যার জোনসকে দূত হিসেবে পাঠান। তাঁদের কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে ইরানে ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ ভারতের রুশ ও ফ্রান্স ভীতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে ম্যালকম এবং জোনস ফতেহ্ আলী শাহকে প্রভাবান্বিত করে একটি চুক্তি সম্পন্ন করেন। এই চুক্তি মোতাবেক ১৮০৮ সাল থেকে ইরানের মধ্য দিয়ে ফরাসী সৈন্যবাহিনী চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং স্থির হয় ইরান ফরাসী সেনাবাহিনী বা এজেন্টকে আমন্ত্রণ জানাবে না। পক্ষান্তরে, ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ প্রশিক্ষক নিযুক্ত করে ইরানী সেনাবাহিনী সুগঠিত করার প্রয়াস পায়।

রুশ-ইরান সম্পর্ক

তার্কুমানচাই সন্ধি ঃ ফতেহ আলী শাহের রাজত্বে ইরানের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি হয়। মূলত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সংঘর্ষ হয়। কাজার শাসনের পূর্বে জর্জিয়ার খ্রিস্টান রাজা ইরানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। ফলে ইরানী সাম্রাজ্য থেকে জর্জিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাশিয়ার নিকট থেকে জর্জিয়া উদ্ধারের জন্য ফ্রান্সের সহায়তায় ১৮১২ সালে রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করে। এর ফলে উত্তরের কাস্পিয়ান অঞ্চল সুরক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যুবরাজ আব্বাস মির্জা রাশিয়ার সঙ্গে একটি ঘৃণ্য চুক্তি, যা 'গুলিস্তান চুক্তি' নামে পরিচিত করতে বাধ্য হন। বাকু, কারাবাগ ও দারবান্দসহ্ ককেশাস অঞ্চলে অনেক এলাকা রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে ইরান বাধ্য হয় এবং ককেশাস প্রদেশ, দাগিস্তান, জর্জিয়া, ইশেরেটিয়া ও আবগেজিয়ার উপর থেকে অধিকার প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া কাস্পিয়ানের আলিশও পারস্যের হস্তচ্যুত হয় এবং কৃষ্ণসাগর থেকে পারস্য রণতরীসমূহ সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। যুবরাজ আব্বাস মির্জা এই ঘৃণ্য চুক্তিকে অবজ্ঞা করে আলিশ দখল করেন। ফলে রুশ-পারস্য সংঘর্ষ বাঁধে এবং তুলনামূলকভাবে ক্ষমতাশালী রুশ বাহিনী ১৮২৬ এবং ১৮২৭ সালে আব্বাস মির্জার বাহিনীকে আব্বাসাবাদে পরাজিত করে সুরক্ষিত ইরিভান দুর্গ দখল করে।

www.pathagar.com

আযারবায়জানেও রুশ প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৪ সালে ব্রিটেন ইরানের সঙ্গে যে চুক্তি করে তাতে ব্রিটেন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেও তারা কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলশ্রুতিতে, ফতেহ আলী শাহ কাজারের রাজত্বের শেষার্ধে পারস্য রাশিয়ার সঙ্গে ১৮২৮ সালে 'তার্কুমানচাই' সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধি অনুযায়ী পারস্য যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইরিভান ও নাখিচাবান রাশিয়াকে প্রদানে বাধ্য হয়।

মোহম্মদ শাহ কাজার (১৮৩৪-৪৮) : ফতেহ আলী শাহ কাজারের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র মোহাম্মদ শাহ কাজার ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইরানের সিংহাসনে উপবেশন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রুশ ও ব্রিটিশ আধিপত্যবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কাজার বংশের সুলতান মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে রাশিয়া 'তার্কুমানচাই' সন্ধির শর্তানুযায়ী ইরানে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস পায়। 'তার্কুমানচাই' সন্ধি স্বাক্ষরিত করার জন্য রুশ প্রতিনিধি গ্রিইবয়ডভ (Griboedov) তেহরানে আসেন কিন্তু মোহাম্মদের বিরোধিতায় ও তার প্ররোচনায় তিনি নিহত হলে ইরানের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠে। এই চুক্তির অষ্টম পরিচ্ছেদে (Article) কাস্পিয়ান সাগরে রুশ নৌ-বহর চলাচলের সুযোগই পেল না বরং কাস্পিয়ান সাগরের তীরে ইরানের অঞ্চলে অবতরণ করা এবং একাদশ পরিচ্ছেদ অনুযায়ী একজন রুশ কনসুল এবং বাণিজ্যিক প্রতিনিধি নিযুক্তির দাবি করে। এভাবে রাশিয়া ক্রমশঃ ইরানে তার প্রভাবই বিস্তার করে নি বরং ব্রিটিশ ভারতের হুমকীস্বরূপ আফগানিস্তানের হিরাতে অভিযান প্রেরণের জন্য মোহম্মদ শাহকে উস্কানী দেয়। রাশিয়া হরিরুদ উপত্যকায় পুনর্দখল করার জন্য এবং বিশেষ করে হিরাত দখল করে কান্দাহার ও কাবুলের যাতায়াত পথ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চাপ দেয়। এর ফলে রাশিয়া ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। ব্রিটেন ১৮০২ সালে ইরানের সাথে যে সমঝোতায় আসে তাতে তারা উভয়ে আফগানিস্তানকে একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার দেয়। রুশ প্ররোচনায় আফগানিস্তানে প্রেরিত ইরানী অভিযানে ব্রিটেন তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এর ফলে ব্রিটেন সাময়িকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে এবং ব্রিটেনে প্রেরিত ইরানী দূতকে লর্ড পামারস্টোন স্বাগত জানাননি। কূটনৈতিক চাপের মুখে আফগানিস্তানে প্রেরিত ইরানী বাহিনী প্রত্যাহার করা হয় এবং হিরাত আফগানিস্তানের শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়। যাহোক, ১৮৪১ সালে ইরানের সাথে ব্রিটেনের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয় এবং ১৮৪৩ সালে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য স্যার জন ফেনউইক উইলিয়ামকে পাঠান হয়।

নাসিরুদ্দীন শাহ (১৮৪৮-৯৬ খ্রি.) সিংহাসনারোহণ : ১৮৪৮ সালে মোহাম্মদ শাহ কাজারের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন শাহ মাত্র সতের বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর সময় তেহরানে রুশ ও ব্রিটিশ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ প্রতিনিধি কর্ণেল ফারাটে (Farrat) এবং প্রিন্স ডলগোরোকী (Dolgorouky) উভয়ে রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের জন্য তৎপর ছিলেন। সতেরো বছর বয়স্ক উত্তরাধিকারী তখন তাব্রিজে ছিলেন কিন্তু রানী মাতা এবং বিচক্ষণ অমাত্য মির্জা তাকি খানের দূরদর্শিতায় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা রোধের সকল ব্যবস্থা গৃহিত

www.pathagar.com

হয়। তাকি খান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং প্রধান প্রশাসক বা 'আমীর-ই-কবীর' হিসেবে প্রশাসনের সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালন করেন।

মির্জা তাকি খান ঃ অতি সাধারণ পরিবারের জন্মগ্রহণ করেও মির্জা তাকি খান একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন এবং পিটার এভেরীর ভাষায়, 'তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত অপেক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ" ("His political lineage is much more significant than his descent.") তিনি প্রগতিশীল শাসক হিসেবে অর্থনৈতিক সংস্কার এবং বৈদেশিক নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টা করেন। তিনি ১৮৪২ সালে ইরান-তুর্কী সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য এরজেরুম গমন করেন এবং তানজিমাত আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। তাকি খান এক মিশনে রাশিয়ায় সফর করেন। সেন্ট পিটার্সবার্গে তিনি পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন। নাসিরুদ্দিনের শাসনামলে ইরানীদের ব্রিটিশ ভারতে ফার্সী ভাষা শিক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং এই উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইরানে নব-জাগরণের সূত্রপাত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইরানী ব্যবসায়ীগণ মধ্যপ্রাচ্য ও ব্রিটিশ ভারত সফর করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। উদারপন্থী তাকি খানের প্রচেষ্টায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয় এবং ইরান অর্থনৈতিক সঙ্কটমুক্ত হয়। তাঁর সুযোগ্য প্রশাসনে ইরানে তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়– (১) গোঁড়াপন্থী মোল্লা, যারা প্রগতিবিরোধী ও রক্ষণশীল; (২) মধ্যবৃত্ত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, যারা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল এবং (৩) সুবিধাভোগকারী অভিজাতবর্গ। তাকি খানের পতনের মূলে ছিল মোল্লাশ্রেণীর বিরোধিতা। সিংহাসনের স্বার্থে এবং কাজার বংশের স্থায়িত্বে জন্য তিনি গোঁড়াপন্থী 'বাবী' সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি ব্রিটিশ ও রুশ প্রভাব থেকে ইরানকে মুক্ত রাখতে গিয়ে রাশিয়ার চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন। তিনি কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে আশুরাদায় (Ashurada) রাশিয়াকে একটি নৌঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দেন। এতে তাঁর রুশপ্রীতি প্রমাণিত হলেও মূলতঃ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তুর্কোখাম জলদস্যুদের হাত থেকে ইরানকে রক্ষা করা। তিনি 'বাবী' সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু সৈয়দ মোহাম্মদ আলীকে, (যিনি 'শায়খ-উল-ইসলাম' নামে পরিচিত ছিলেন) গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। ফলে সমগ্র ইরানে বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। নাসিরুদ্দীন শাহ্ তাকি খানকে ১৮৫১ সালে পদচ্যুত করতে বাধ্য হন এবং রাশিয়ার প্রিন্স ডলগোরোকীর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁকে ১৮৫২ সালে হত্যা করা হয়। মির্জা তাকি খানের মৃত্যু ব্রিটিশদের সমর্থনে হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়, কারণ তিনি রাশিয়াকে নৌঘাঁটি নির্মাণের সুযোগ দেন।

পররাষ্ট্র নীতি ও হিরাত সঙ্কট ঃ নাসিরুদ্দীন শাহ ১৮৫১ সালে মির্জা তাকি খানের মৃত্যুর পর শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। শাসনকার্য স্বহস্তে পরিচালনা করার শুরুতে ১৮৫২ সালে তিনি গোঁড়াপন্থী 'বাবী' আততায়ীর গুলিতে আহত হন। তিনজন আততায়ীকে নিশৃংসভাবে হত্যা করা হয়। এর ফলে 'বাবী' আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রশমিত হলেও পরবর্তীকালে শাহকে একজন 'বাবী' খুনীর হাতে প্রাণ দিতে হয়।

www.pathagar.com

তেহ্রানের হত্যাকাণ্ড সমগ্র ইউরোপে প্রচারিত হলে ইরানের অভ্যন্তরীণ ঘটনা বিশ্ব মানব অবহিত হল এবং মানবাধিকার প্রশ্নের সোচ্চার হল। তাকি খানকে পদচ্যুত করে এবং 'বাবী'দের উপর দমননীতি চালিয়ে শাহ্ জনপ্রিয়তা হারান। তাকি খানের স্থলাভিষিক্ত হন সদর-ই-আযম মির্জা আগা খান নূরী। প্রথম থেকেই তিনি ব্রিটিশদের প্রতি অনুকূর মনোভাব পোষণ করলে রুশ প্রতিনিধি এতে রুষ্ট হন। কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা সম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য অতি সাবধানে কূটনৈতিক দাবার গুটি চালেন। তিনি অবহিত আছেন যে, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে (মোহাম্মদ শাহ্) রাশিয়া ইরানের উপর ঘৃণ্য তার্কুমানচাই চুক্তি চাপিয়ে দেয়, যা ইরানের সার্বভৌমত্বে হানিকর ছিল। সদর-ই-আযম শাহকে পরামর্শ দেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা না করে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তুরস্কের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করলে ইরান থেকে রুশ প্রভাব স্তিমিত করা যাবে এবং রুশ অধিকৃত ইরানের অঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধার করা যাবে। এভাবে সদর-ই-আযম রুশ প্রতিনিধিকে অবজ্ঞা করলে তাঁকে অপদস্থ হয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গে ফিরে যেতে হয়। এরপর সদর-ই-আযম কূটনৈতিক চালে ব্রিটেনকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন। তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্রিটিশ ভারত সরকারের সঙ্গে ১৮৫৩ সালে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ না করার নীতি লঙ্ঘন করে ১৮৫৬ সালে হিরাত দখল করেন। আফগানিস্তান রাশিয়া এবং ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী রাষ্ট্রের (buffer state) মর্যাদা লাভ করে কিন্তু ইরানের আগ্রাসনে তা লঙ্ঘিত হলে ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা হানি হয়। এই ঘটনার ফলে ব্রিটেন এবং পারস্যের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। ব্রিটিশ ভারত থেকে জেনারেল আউটরাম নৌযাত্রা করে ব্রিটিশ সৈন্যসহ খারগ (Khareg) দ্বীপ দখল করেন। পারস্য উপসাগরে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ ঘাঁটি স্থাপিত হয় খারগে। অতঃপর তিনি বুশির ও খুরমশহর দখল করেন।

প্যারিস চুক্তি ও ইরান ঃ ১৮৫৬ সালে হিরাতকে কেন্দ্র করে যে ইঙ্গ-ইরান সংঘর্ষ হয় তার অবসান হয় প্যারিস সন্ধির স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে। ১৮৫৭ সালে সম্পাদিত এই চুক্তি (১) আফগানিস্তানকে মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (buffer state) হিসেবে গণ্য করার অঙ্গীকার করে, (২) ইরান হিরাত অবরোধ প্রত্যাহার করে, (৩) ভবিষ্যতে ইরান-আফগান বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ইরান ব্রিটিশ সরকারের মধ্যস্থতা গ্রহণ করবে, (৪) জেনারেল আউটরামের অভিযান স্থায়ীভাবে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে, (৫) ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের সূচনায় রুশ তার আগ্রাসন নীতি পুনঃরুজ্জীবিত করে, (৬) পিটার এভেরীর ভাষায়, "প্যারিস চুক্তি ইংল্যান্ডের রানী এবং ইরানের শাহের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে; এরপর ব্রিটিশ প্রতিনিধি তেহ্রানে প্রত্যাবর্তন করেন। ক্রমশঃ ইরান বৃহৎ শক্তির বিশেষ করে রাশিয়া এবং বৃটেনের আধিপত্য বিস্তারের সংঘর্ষ কেন্দ্র হয়ে উঠে (big power rivalry)।

সদর-ই-আযমের পদচ্যুতি ও নাসিরুদ্দীনের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ ঃ নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামলে সদর-ই-আযমের কূটনৈতিক শঠতা, চাল, কপটতায় ব্রিটিশ ও রুশ প্রতিনিধিগণ তাঁর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। উপরন্তু, হিরাত আক্রমণ করে ঘৃণ্য প্যারিস

www.pathagar.com

চুক্তির ফলে ইরানের মর্যাদাহানি হয় এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে বিদেশী প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ফলে সদর-ই-আযমের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং শাহ ১৮৫৭ সালে তাঁকে পদচ্যুত করে সমস্ত ক্ষমতা স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন।

দারুল-ফুনুন, ১৮৫১ ঃ নাসিরুদ্দীন শাহ একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তিনি ইরানের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য বিভিন্ন স্কুল ও বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা থেকে ইরানকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার জন্য তিনি ১৮৫১ সালে বিজ্ঞান ভবন বা 'দারুল-ফুনুন' প্রতিষ্ঠা করেন যাতে ইরানীগণ পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসতে পারে। উপরন্তু, শাহ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তরুণ ইরানীদের নিয়ে কূটনৈতিক কোর গঠন করার চেষ্টা করেন। বিদেশে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে ইরানীগণ ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রাচুর্যের সংস্পর্শে আসে। আকস্মিকভাবে ইরান বিদেশী পণ্যদ্রব্যের বাজারে পরিণত হয়। তুরস্ক ও রাশিয়া থেকে বহু মূল্যবান বিলাস সামগ্রী আমদানি করা হয়, বিশেষভাবে এক শ্রেণীর অভিজাতদের জন্য অথচ অধিকাংশ ইরানী ছিল দারিদ্রপীড়িত।

টেলিগ্রাফ লাইন (১৮৫৬-৭২) ঃ ইরানকে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া মূলতঃ শুরু হয় নাসিরুদ্দীন শাহের উদার মনোভাবের ফলে। তিনি তাঁর দেশকে বিদেশীদের প্রভাবের অঞ্চল হিসেবেই উন্মুক্ত করে দেননি, বরং বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বিদেশে প্রশিক্ষণ দ্বারা আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য তিনি বৃত্তি দেন। তিনি স্বয়ং ইউরোপীয় উন্নতি, সমৃদ্ধি ও প্রগতি দেখার জন্য তিন বার ইউরোপ সফরে যান যথাক্রমে ১৮৭৩, ১৮৭৮ এবং ১৮৮৯ সালে। তিনি ইউরোপীয় যোগাযোগ ব্যবস্থায়, বিশেষ করে টেলিগ্রাফ দেখে মুগ্ধ হন। তাঁর বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশী সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ না হয়ে বিদেশী কোম্পানীকে বিভিন্ন চুক্তি দিয়ে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করা। ১৮৫৮ ইরানে প্রথম টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালূ হয় খুবই সীমিতভাবে। এরপর ইরান ব্রিটিশ সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনের জন। ১৮৬২ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক টেলিগ্রাফ প্রবর্তন সহজতর হয়। ব্রিটেন ইতোমধ্যে তুরস্কের সাথে টেলিগ্রাফ কনভেনশন সম্পাদিত করে। শাহ ইরানের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দু'জন ব্রিটিশ প্রকৌশলী কর্নেল স্টিওয়ার্ট এবং কর্নেল চ্যামপেলকে ইরানে আমন্ত্রণ জানান। এই দুজন কর্মকর্তা ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। ১৮৬৪ সালে বাগদাদের নিকটবর্তী পারস্যের সীমান্ত থেকে কারমান শাহ-হামদান-তেহরান থেকে বুসিরে পর্যন্ত একক টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়। ১৮৭২ সালে মেসার্স সাইমন ব্রাদার্স লন্ডন থেকে জার্মানী ও রাশিয়া হয়ে তাব্রিজ এবং সেখান থেকে তেহরান পর্যন্ত দ্বৈত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ইন্দো-ইউরোপীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানি এই আন্তঃমহাদেশীয় টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এমনকি বুসিরের সাথে করাচীর টেলিযোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৮৮৪ সালের মধ্য টেলিযোগাযোগের ব্যবস্থা সুফল ও কুফল সম্বন্ধে জনগণ অবহিত হয়। একদিকে সমগ্র দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা

www.pathagar.com

স্থাপিত হলে শাহ সহজেই খবরাখবর পেতে থাকেন, অন্যদিকে এই টেলিগ্রাফ লাইন শাহবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৮৮৪ সালে ব্রিটিশ প্রকৌশলীদের দ্বারা কমপক্ষে ১৪টি স্টেশন স্থাপিত হয় এবং এই সমস্ত প্রকৌশলী টেলিগ্রাফ স্টেশনের পাশে স্বস্ত্রীক অথবা খ্রিস্টান আর্মেনীয় মহিলাদের সাথে বিবাহ করে বসবাস করতে থাকেন। টেলিগ্রাফ কোম্পানি তাদের কর্মচারীদের সুবিধার্থে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে এবং কর্মচারীরা পারস্য ভাষা শিখে। পিটার এভেরীর ভাষায়, "টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার এবং বিদেশী প্রকৌশলীদের অবস্থান প্রমাণ করে যে, কত দ্রুত ইরান বিদেশী প্রভাবের মোকাবেলা করতে পারে।" পারস্য সরকারকে আন্তর্জাতিক লাইনসমূহের জন্য নজরানা ও টোল দিতে হত। টেলিযোগাযোগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয় এবং একজন ব্রিটিশ উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়।

শাহের বিদেশ ভ্রমণ, ১৮৭৩, ১৮৭৮, ১৮৮৯ ঃ নাসিরুদ্দীন শাহ সমস্ত ক্ষমতা স্বীয় হস্তে রাখলেও তিনি একটি কেবিনেট গঠন করে দফতর বণ্টন করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনিক দায়ত্ব পালন করতেন, যদিও শাহ এবং কেবিনেটের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রভাবের দ্বন্দ্ব বজায় ছিল। সিপাহসালার হাজী মির্জা হোসেন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি শাহকে বিদেশ ভ্রমণের জন্য উৎসাহিত করেন। শাহ ১৮৭৩ সালে সর্বপ্রথম উত্তরের শক্তিশালী রাষ্ট্র রাশিয়ায় গমন করেন। বিদেশ ভ্রমন, বিদেশী পণ্য, ইউরোপীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতিতে রক্ষণশীল মোল্লা শ্রেণী সরকারের প্রতি বিরূপভাজন হয়। তারা আন্দোলন করে যে, সরকার ইরানকে একটি ফিরিঙ্গিস্তান বা ফিরিঙ্গিদের আবাসস্থলে রূপান্তরিত করতে চায়। যাহোক, বিদেশ ভ্রমণের ফলে শাহ আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার সংস্পর্শে আসেন। এরপর তিনি ১৮৭৮ এবং ১৮৮৯ সালেও বিদেশ সফর করেন।

রয়টার কনসেশন, ১৮৭২ ঃ নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামলকে প্রকৃত অর্থে প্রগতি ও সংস্কারের যুগ বলা হয় এবং তার পূর্বে ইরানে পশ্চিমা প্রভাব এত দ্রুত অনুপ্রবেশ করেনি। তাঁর উদারনৈতিক, প্রগতিবাদী মন্ত্রীপরিষদ অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলার জন্য সর্বপ্রথম কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রথমটি টেলিযোগাযোগ স্থাপন এবং দ্বিতীয়টি ১৮৭২ সালে ব্রিটিশ নাগরিক ব্যারন-ডি-রয়টারকে কনসেশন প্রদান। এই কনসেশন প্রদানের মূল উদ্দেশ্য কনসেনশন গ্রহণকারী দ্বারা প্রদত্ত রয়ালটির দ্বারা রাশিয়ার ঋণ থেকে মুক্তি লাভ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রয়টারকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা বা কনসেশন প্রদান করে ইরান একটি আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই কনসেশন ছিল ত্রিমুখী–(১) সমগ্র ইরানে রেলপথ ও সড়ক নির্মাণ; (২) ৭০ বছরব্যাপী খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও বিতরণ এবং (৩) একটি জাতীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। রয়টার কনসেশন যুগোপযোগী হলেও ১৮৮৭ সালে শাহ রাশিয়ায় গমন করলে ব্রিটিশ প্রীতির জন্য তার প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করা হয় নি; উপরন্তু, তিনি কনসেশন পদ্ধতি চালু করে ইরানকে বিদেশী ব্যবসায়ী ও মুনাফাখোরদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করার চেষ্টা করার অভিযোগে সুবিধাভোগী অভিজাত ও গোঁড়াপন্থী মোল্লা শ্রেণী সরকার

www.pathagar.com

বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ–এই অভিযোগ করা হয় এবং ১৮৮৯ সালে রয়টারকে প্রদত্ত কনসেশন প্রত্যাহার করা হয়রয়টার তার প্রদত্ত থোক জমা (caution money) ফেরত পান। এতদসত্ত্বেও ইরানী সরকার ১৮৮৯ সালে ব্যারন-ডি রয়টারকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ একটি জাতীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। ইরানে 'ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব পারসিয়া' নামে যে ব্যাংক স্থাপিত হয় তা দশ হাজার স্টার্লিং দিয়ে শুরু করা হয় এবং এই ব্যাংক নোট ছাপান ও খনিজ সম্পদ আহরণ ও উত্তোলনের অধিকার লাভ করে। এ ছাড়া ১৮৮৮ সালে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মেসার্স লিঞ্চ (Lynch) ব্রাদার্স কারুন নদীর মোহনা থেকে ৭১৭ মাইল পর্যন্ত জলপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে। এই পথটি রাহ্-ই-লিঞ্চ (Rah-i-Lynch) নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য জনগণের বিরোধিতায় এই ব্রিটিশ কোম্পানিকে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার দেওয়া হয় নি। অর্থ সঙ্কটের জন্য ইরানী সরকার বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানিকে নগদ অর্থের (রয়ালটি) বিনিময়ে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কনসেশন প্রদান করে কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়াবহ। লিঞ্চ কোম্পানিকে প্রদত্ত কনসেশন পরবর্তীতে 'কারুন কনসেশন' নামে অভিহিত হয় এবং পরবর্তীকালে (বিশ বছর পরে) খুজিস্তান প্রদেশের তেল সন্ধান, উত্তোলন ও বিক্রয়ের প্রধান প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়, যা ইরানের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতি সৃষ্টি করে।

তামাক কনসেশন, ১৮৯০ ঃ ই. জি. ব্রাউন বলেন, "নাসিরুদ্দীন শাহের শেষ ছয় বছরের রাজত্বকালে পারস্যে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে, যার পরিণত হয় তাঁরই মৃত্যুতে, সূত্রপাত হয় ১৮৯০ সালের ৮ই মার্চ তারিখে একটি ব্রিটিশ কোম্পানিকে প্রদত্ত তামাক কনসেশনে।" একথা সত্য যে, অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠার জন্য একটি ব্রিটিশ কোম্পানিকে তামাক উৎপাদন, বিক্রি ও রপ্তানির সর্বাধিক সুবিধা (একচেটিয়া) মঞ্জুর করা হয়। এই কনসেশনের শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ (১) জনসেশন পঞ্চাশ বছর কাল বলবৎ থাকবে; (২) এই কনসেশন পারিসয়ান টুবাকো মনপলী কোম্পানি নামে পরিচিত হবে; অপর কেহ এর অংশীদার হবে না; (৩) এই কোম্পানির তামাক উৎপাদন, বিক্রি ও রপ্তানির একচেটিয়া অধিকার থাকবে; (৪) ইরান সরকারের শুল্ক দফতরের মহা নিয়ন্ত্রকের হিসাব মোতাবেক সমগ্র ইরানে বার্ষিক ৫,৪০০,০০০ কিলোগ্রাম তামাক সেবন করা হয় এবং প্রতি বছর ৪,০০০,০০০ কিলোগ্রাম তামাক রপ্তানি করা হলে বার্ষিক ৫০০,০০০ স্টার্লিং পাউন্ড মুনাফা হবে। কিন্তু কোম্পানি ইরান সরকারকে বার্ষিক মাত্র ১৫,০০০ স্টার্লিং পাউন্ড সেলামী এবং মুনাফার এক-চতুর্থাংশ দিতে অঙ্গিকার করে।

তামাক কনসেশনের প্রতিক্রিয়া ঃ মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বিদেশী কোম্পানিকে তামাক কনসেশন প্রদত্ত হলে ইরানে নানারূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। যেমন– (১) একটি বিদেশী কোম্পানির হাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্ত সুবিধা অর্পিত হলে সাধারণ তামাক চাষীগণ বিশেষ উপকৃত হয়নি; কারণ সমস্ত মুনাফা কোম্পানি ভোগ করছিল; (২) কোম্পানির মুনাফার মাত্রা সরকারকে প্রদত্ত সালামী বা রয়ালটির তুলনায় অধিক হলে সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল; (৩) তামাক কনসেশন একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল; অথচ নিরীহ ও অর্থক্লিষ্ট তামাক উৎপাদনকারী ও

www.pathagar.com

বিক্রেতাগণ নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়; (৪) তামাকের কনশেসন দিয়ে শাহ্ এবং তাঁর পরিবার এবং অভিজাত শ্রেণী বিলাসবহুল জীবনযাপন শুরু করে। এর ফলে ইরানের ক্রমবর্ধমান বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সরকারের প্রতি বিরূপভাজন হয়ে পড়ে; (৫) সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড বিরোধিতা আসে উলেমা শ্রেণীর নিকট থেকে। অধিকাংশ ইরানী তামাকসেবী এবং তামাকের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে এবং রপ্তানিতে তামাকের ঘাটতিই পড়ে না বরং বিদেশী বণিকদের হাতে এই ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়ায় মোল্লাগণ একে ইসলামবিরোধী পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করলেন। ফিরিঙ্গিদের তত্ত্বাবধানে তামাক উৎপাদন থাকায় প্রভাবশালী মোল্লা হাজী মির্জা হাসান ফতোয়া দিলেন যে, তামাক সেবন করা যাবে না। এই নিষেধাজ্ঞা সমগ্র ইরানে কার্যকরী হয়। এমনকি শাহের সরকারে এই নিষেধ পালিত হয়। দেশব্যাপী তামাক বিদ্রোহ শুরু হলে উপায়ন্তর না দেখে শাহ ১৮৯২ সালের ৫ই জানুয়ারি তামাক কনসেশন বাতিল ঘোষণা করেন। ১৮৯২ সালের এপ্রিল ইরানী সরকার তামাক কোম্পানিকে পাঁচ লক্ষ স্টার্লিং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। ইম্পিরিয়াল ব্যাংক এই অর্থ প্রদান করে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। তামাক কনসেশনকে সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ স্বেচ্ছাচারী সরকার বিরোধী সকল আন্দোলন বলা যায়। এই পরিণতি হয়েছিল ভয়ঙ্কর। একদিকে শাহের রাজকীয় মর্যাদার হানীই হয় না, ব্রিটিশ সরকার ও জনগণ এই কনসেশন বাতিল হলে অপদস্থ হয় এবং রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে। ই. জি. ব্রাউন বলেন, "তামাক কনশেসনের পরিসমাপ্তি ঘটে, কিন্তু এর ফলাফল বন্ধ হয় নি, এই সমস্ত ফলাফলের মধ্যে ব্রিটেনের মর্যাদাহানী এবং রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার অন্যতম।"

রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ঃ তামাক কনসেশনের বাতিল মূলতঃ ইরানে রাশিয়ার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পথ সুগম করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইরানের ইতিহাস মূলতঃ রুশ-ব্রিটিশ ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দ্ব। ব্রিটিশ নাগরিককে টেলিগ্রাফ স্থাপনের সুযোগ দিলেও উত্তরাঞ্চল রাশিয়াকে রেলপথ স্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়। ট্রান্স-ককেশাস রেলপথ নামে পরিচিতি এই রেলপথে খোরাসান থেকে আসকাবাদ পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৮৫ সালে স্থাপিত এই রেলপথ নির্মাণের ফলে ইরানের বহিঃবাণিজ্যের সম্প্রসারণ হয়। নাসিরুদ্দীন শাহ্ সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাহায্য লাভে ব্যর্থ হলে রাশিয়ার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণে রাশিয়ার অনন্য ভূমিকা ছিল। রাশিয়া তার কশাক বাহিনীর মত একটি ইরানী কশাক বাহিনী গঠন করে। রাশিয়ার জার এই বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার জন্য এক হাজার বেবডন রাইফেল ও কিছু বন্দুক দান করেন। শাহ্ ১৮৭৮ সালে রাশিয়া ভ্রমণকালে রুশ কশাক বিগ্রেডের ক্ষিপ্রতায় মুগ্ধ হয়ে ১৮৭৯ সালে একটি ইরানী কশাক রেজিমেন্ট গঠন করেন। উল্লেখ্য যে, পাহলভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রেজা শাহ্ তাঁর সামরিক জীবন শুরু করেন এই কশাক বিগ্রেডে। ইরানে রুশ প্রভাবের অপর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্রিটিশ আয়ত্তাধীন ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের অবলুপ্তি করে তেহরানে একটি রুশ ডিসকাউন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। এটি রাশিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন হলেও ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

মুজাফফরউদ্দীন শাহ (১৮৯৬-১৯০৬) ঃ ১৮৯৬ সালে সমগ্র ইরানে 'বাবী' আন্দোলনের, ফলে মোল্লাদের অসন্তোষ ও রাজনৈতিক সঙ্কট এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে মির্জা মোহম্মদ রিজা নামের এক মোল্লার গুলির আঘাতে নাসিরউদ্দীন শাহের জীবনাবসান হয়। তাঁর পুত্র মুজাফফরউদ্দীন শাহ ১৮৯৬ সালের জুন মাসে ইরানের সিংহাসনে বসেন। ক্ষমতা লাভ করে তিনি মারাত্মক অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হন। নাসিরুদ্দীনের তামাক নীতি ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ কোম্পানিকে যে পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তার ফলে রাজকোষ শূন্য ও ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়। এ ছাড়া বিদেশী ঋণের বোঝাও বাড়তে থাকে। বিলাসবহুল জীবনযাপন ও বিদেশ ভ্রমণে মাত্রাধিক অর্থ অপচয় হয়। এমতাবস্থায় শাহের অর্থ ঋণ নেওয়া ছাড়া গত্যান্তর ছিল না। তিনি সর্বপ্রথম লন্ডনে ১,০০,০০০ স্টার্লিং পাউন্ড ঋণ গ্রহণে ব্যর্থ হলে ১৮৯৮ সালে তিন জন বেলজিয়ামবাসীকে অর্থ উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল কিরমানশাহ এবং আজারবাইজানে দু'টি শুল্ক এলাকা থেকে পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করা। এই ব্যবস্থা সাময়িকভাবে সমস্যা নিরসন করলেও অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটেনি। এমতাবস্থায় শাহ রুশ সরকারের নিকট থেকে অর্থ ঋণ লাভের চেষ্টা করেন; কারণ তামাক কনসেশন বাতিল হলে ব্রিটেনের সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের ভাটা পড়ে। ইরান ১৯০০ সালে রাশিয়ার নিকট থেকে ২,৪০০,০০০ স্টার্লিং পাউন্ড অথবা ২২জত(১,২) মিলিয়ন রুবল ঋণ গ্রহণ করে। এই ঘৃণ্য রুশ ঋণের শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) এই ঋণের বার্ষিক সুদের হার ছিল ১৫%; (২) এই ঋণ আগামী ৭৫ বছরে পরিশোধ করতে হবে; (৩) ঋণের অর্থে ইরান তার বৈদেশিক ঋণ থেকে মুক্ত হবে এবং ব্রিটিশ তামাক কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিবে; (৪) রাশিয়ার বিনা অনুমতিতে ইরান বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না; (৫) ঋণের অর্থ ক্ষতিপূরণ প্রদানে প্রায় শেষ হয়ে গেলে রাশিয়া পরের বছর ১৯০১ সালে পুনরায় ঋণ দান করে (৬) ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য ফারস এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ব্যতীত সকল শুল্ক ঘাঁটি থেকে অর্থ আদান করতে পারবে; (৭) শুল্ক আদায়ের কর্তৃত্ব বেলজীয়দের হাতে থাকবে, তবে শুল্ক আদায়ের সুবিধার্থে সীমান্ত শহর জুলফা থেকে তাব্রিজ হয়ে তেহরান পর্যন্ত রাস্তা নির্মিত হবে। এই সাথে রাশিয়া পেট্রোলিয়াম ও কয়লা উৎপাদনের সুবিধাও আদায় করে নেয়।

রুশ ঋণের অশুভ ফল ঃ রাশিয়ার প্রদত্ত ঋণের বোঝা ইরানের জন্য মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই ঋণ ইরানের কোন উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহৃত হয় নি, মূলতঃ ঋণ পরিশোধে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে আর্থিক সফলতা আসে নি। উপরন্তু, বিদেশে ভ্রমণের জন্য মোজাফরউদ্দীন শাহ্ প্রচুর অর্থ অপচয় করেন। এমন কি বিদেশ ভ্রমণের জন্য বার্ষিক ৫,০০০ স্টার্লিং পাউন্ড রাশিয়ার নিকট থেকে অনুদান গ্রহণ করতেন, যা রাজকীয় মর্যাদার জন্য ছিল হানিকর। ই. জি. ব্রাউন বলেন, "রুশ ঋণ ব্রিটিশ আর্থিক মর্যাদায় যেমন প্রচন্ড আঘাত হানে, ঠিক যেমন দুর্ভাগ্যজনক তামাক কনসেশন তার নৈতিক মর্যাদায় হানিকর ছিল।" অপরদিকে ইরানীয় অর্থনীতিতে রাশিয়ার অসামান্য প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। এভেরী বলেন যে, "বিদেশী ঋণের উপর নির্ভরশীল ইরানে গণবিক্ষোভ ও সাংবিধানিক আন্দোলনের সূচনা হয় এবং এর মূল কারণই ছিল রুশ নির্ভরশীলতা।"

www.pathagar.com

রুশ প্রাধান্য ঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাশিয়া ইরানে সামান্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। এমনকি ১৯০১ সালে পারস্য উপসাগরে একটি রুশ বাণিজ্য জাহাজের আবির্ভাব হয়। এর মূল কারণ ছিল পারস্য উপসাগর এবং কৃষ্ণসাগরের মধ্যে বাণিজ্য পথ খোলা। কিন্তু ইতিপূর্বে ইরান ও ব্রিটেনের মধ্যে সম্পাদিত প্যারিস চুক্তি মোতাবেক পারস্য উপসাগরের খারগ দ্বীপে ব্রিটিশ কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বৃহৎ শক্তির সংঘর্ষ পারস্য উপসাগরে অহেতুক ছিল না। অর্থ সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও নাসিরুদ্দীন শাহ্ দ্বিতীয়বার ইউরোপ সফল করেন এবং প্যারিসে অবস্থানকালে তাঁর দৈনিক খরচ হয় ২৪০ পাউন্ড স্টার্লিং। শাহ্ বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য ২৪ জন ইরানীকে লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, মস্কো এবং ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করেন। বলাই বাহুল্য যে, এই পদক্ষেপ ছিল মোহাম্মদ শাহের আধুনিকীকরণ নীতির প্রতিফলন। তিনি নিজেও একাধিকবার বিদেশ সফরে গিয়ে পাশ্চাত্যে সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হন। কিন্তু ইরানের ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কটে এ ধরনের বিলাসিতা ও অর্থ অপচয় মারাত্মক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৯০১ সালে ইরানের সঙ্গে রাশিয়ার যে শুল্ক চুক্তি হয় তাতে ইরান রাশিয়া থেকে আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রীর উপর কর এবং ব্রিটেন থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির উপর অধিক কর ধার্য করার শর্ত ছিল।

উইলিয়াম নক্স ও ইরানী তৈল ঃ রুশ-ব্রিটেন প্রভাব ও প্রাধান্যের যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা চলে আসছিল তাতে ইরানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। রুশ ভাল্লুকের ছায়া ইরান ও আফগানিস্তানে পড়ার সম্ভাবনায় ব্রিটিশ সরকার ইরানে প্রভাব বলয় বিস্তারের জন্য তৎপর হয়ে উঠে। রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য অধিক রাজস্বের প্রয়োজনে শাহ্ ১৯০১ সালে ব্রিটিশ নাগরিক উইলিয়াম নক্স-ডি আরছিকে (William Knox D'Arcy) ইরানের উত্তরাঞ্চলের পাঁচটি প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র পারস্যে তৈল উত্তোলনের অধিকার দেন। ডি-আরছি একজন তেল অনুসন্ধানকারী ছিলেন এবং তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ ছয় বছর উত্তরাঞ্চল ব্যতীত ইরানে তেল অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ইরানের মোট ৬২৮,০০০ বর্গ মাইল এলাকার মধ্যে ডি-আরছির কনসেশনের অধীনে ৪৮০,০০ বর্গ মাইল এলাকা ছিল। একটি তেল অনুসন্ধান কোম্পানি গঠিত হয় এবং সরকারকে মুনাফার ১৬% প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। মূলতঃ এই অনুসন্ধান দক্ষিণে খুজিস্তান অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল।

মুজাফফরউদ্দীন শাহের মৃত্যু ঃ মুজাফফরউদ্দীন শাহ্ ১৯০৬ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনামল অর্থনৈতিক সঙ্কট, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, অমাত্যবর্গের দুর্নীতি, বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রভাব বলয় সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সৃষ্ট মোল্লা ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অসন্তোষ, মোল্লা শ্রেণীর বিরোধিতা, 'বাবী' আন্দোলনের জের প্রভৃতি কারণে ছিল খুবই সঙ্কটময়। নানা কারণে শাহ্ বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ১৯০৬ সালে সর্বপ্রথম ইরানে সংবিধান প্রণীত হয় এবং ১৯০৭ সালের ৮ই জানুয়ারি মৃত্যুর পূর্বে তিনি সংবিধানে স্বাক্ষর দান করেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইরানে 'বাবী' আন্দোলন

পটভূমি ঃ সুলতান নাসিরুদ্দীন শাহের রাজত্বকালে ইরানে বাবী নামক এক ধর্মদ্রোহী আন্দোলন শুরু হয়। পিটার এভেরী বলেন যে, "নাসিরুদ্দীন শাহ তাঁর শাসনামলে একটি প্রভাবশালী ধর্মীয় রক্ষনশীল মোল্লা গোষ্ঠীর বিরোধিতার সম্মুখীনই হন নি; উপরন্তু, বাবী নামক একট বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় আন্দোলনের, যা ধর্মদ্রোহিতার (heresy) সামিল, মোকাবেলা করেন।" 'বাবী' অর্থাৎ ফটক থেকে বাবী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং এর প্রবর্তক ছিলেন সৈয়দ আলী মোহম্মদ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'বাবী' আন্দোলন ইরানের রাজনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করে এবং ইসলাম বিরোধীদের চক্রান্ত জোরদার হয়।

'বাবী' আন্দোলনের প্রবর্তক ঃ বাবী মতবাদের প্রবর্তক সৈযদ আলী মোহম্মদ ১৮১৯, মতান্তরে ১৮২১ সালে সিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সামান্য মুদির ঘরে জন্ম গ্রহণ করলেও তাঁর জ্ঞান পিপাসা এত অধিক ছিল যে, তিনি বাল্যকালে শিয়াদের তীর্থ স্থান কারবালায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য গমন করেন। বাবী মতবাদ প্রবর্তনের পটভূমি বিশ্লেষণ করে এভরী বলেন যে, "সৈয়দ আলী মোহম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত বাবী আন্দোলনের মূলে ইরানের তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা দায়ী ছিল।" লক্ষণীয় যে, বাবী মতবাদ দক্ষিণে সিরাজ নগরীতে ১৮৪৪ সালে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়। বাবী আন্দোলনের কারণসমূহ উল্লেখ করে এভরী বলেন ঃ

কারণ ঃ

১. শাহের পাশ্চত্য প্রীতি ঃ নাসিরুদ্দীন শাহের আধুনিকরণ নীতি এবং আমীর-ই-কবীর মির্জা তাকি খানের উদার মনোভাব ও ধর্ম নিরপেক্ষতা (Secularism) নীতিতে ইরানের গোঁড়াপন্থী এক ধর্মীয় গোষ্ঠী বনিক ও সাধারণ জনতার মধ্যে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে বানচাল করার জন্য একটি আন্দোলন শুরু করে এবং নিজস্ব ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। নাসিরুদ্দীন শাহের পাশ্চাত্য প্রীতি এই আন্দোলনের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

২. ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয় ঃ 'বাবী' আন্দোলনকে মূলত ধর্মীয় আন্দোলন বলা যায় এবং পাশ্চাত্য প্রভাবে ইরানের সামাজিক ধর্মীয় ও সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তনের পটভূমিতে এই আন্দোলন প্রবর্তীত হয়। বিদেশীদের উপস্থিতি ইরানের মৌলিক ধর্মীয় ভাবধারা ও চেতনায় আঘাত হানে এবং পাশ্চাত্যের জাগতিক অগ্রগতিতে বিভ্রান্ত না হয়ে ইরানীয় ধর্মীয় সম্প্রদায় বহু যুগের সঞ্চিত ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয়। বাবী আন্দোলন সকল প্রকার অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরোধী ছিল।

www.pathagar.com

৩. মোল্লাতন্ত্র ঃ 'বাবী' মতবাদ ইরানের রক্ষণশীল চিরাচরিত ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। মোল্লা-ওলামাদের প্রভাব থেকে সিংহাসন এবং দেশকে রক্ষার জন্য সৈয়দ আলী মোহাম্মদ এক বিকল্প মতবাদ প্রচার করেন, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনি নিজেই। তিনি একজন কট্টরপন্থী শিয়া হিসেবে ঈমাম মাহদীতে বিশ্বাস করতেন এবং তিনি নিজেকে "বাবী" বা ফটক হিসেবে দাবী করেন। এর অর্থ এই যে, একমাত্র তার মাধ্যমে দ্বাদশ ইমামের সঙ্গে, যিনি অন্তর্ধান করেছেন, সাক্ষাৎ ঘটবে। তাঁর সমর্থকেরা 'বাবী নামে পরিচিত ছিল।

৪. উত্তর ও দক্ষিণের বৈষম্য ঃ 'বাবী' আন্দোলনকে এক অর্থে ইরানের উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিবাদ বলা যায়। এই আন্দোলনে সিরাজ, কিরমান, ইয়াজদ প্রভৃতি শহরের বনিক সম্প্রদায় অংশ গ্রহণ করে। বলাই বাহুল্য যে, উত্তরাঞ্চল অপেক্ষা দক্ষিণাঞ্চল অনুন্নত ছিল, যদিও ব্যবসা-বাণিজ্য দক্ষিণাঞ্চলের পারস্য উপসাগরের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হত। এভরী বলেন যে, ইরানের দক্ষিনাঞ্চলের সাথে উত্তরাঞ্চলের সদ্ভাব ছিল না; কারণ সাফাভী বংশের পতনে রাজধানী ইসফাহানের পরিবর্তে উত্তরে তেহরানে কাজার বংশ রাজধানী স্থাপন করে। তেহরান থেকে সিরাজের দূরত্ব অনেক এবং প্রাচীন পারস্যের সংস্কৃতির লীলাভূমি সিরাজই 'বাবী' আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৪৪ সালে সৈয়দ আলী হজ্জব্রত পালনের পর মক্কা থেকে বুসায়রে প্রত্যাবর্তন করে 'বাবী' মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। ক্রমশঃ তিনি কয়েকজন অনুসারীসহ নিজ শহর সিরাজে প্রবেশ করেন। সৈয়দ আলী শিরক ও বিদাতের আশ্রয় নিয়ে বিকৃত ও অনৈসলামিক মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তিনি বলেন যে, নবী করীমের মিশন শেষ হয়েছে এবং তিনি তার স্থলে এক নতুন ধর্মমত প্রচার করে নবযুগের সূচনা করবেন।

'বাবী' মতবাদ ঃ 'বাবী' মতবাদ প্রচলিত সুন্নী রক্ষণশীল মতবাদের পরিপন্থী। শিয়া মতবাদ পুষ্ট এই ধর্মমতের মূল মন্ত্র হচ্ছে যে সৈয়দ আলী নিজেকে মাহদী হিসেবে প্রচার করেন এবং দ্বাদশ ইমাম মুহম্মদ আন-মুনতাজারের সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী হিসেবে নিজেকে দাবী করেন। তিনি প্রচার করেন যে, তিনিই "বাবী" বা ফটক, যার মাধ্যমে দ্বাদশ ইমামের সাক্ষাৎ লাভ করা যাবে।

'বাবী' মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. সৈয়দ আলী মোহাম্মদ নিজেকে অবতার হিসেবে দাবী করেন।

২. 'বাবী' মতাবাদের প্রচারক নিজেকে নাখতাহ-ই-বায়ান বা বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন।

৩. সৈয়দ আলীর ধর্মদ্রোহিতার নজীর হচ্ছে এই যে, তিনি প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নী ধর্মমত পুষ্ট রাসূলে খোদাকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার না করে নিজেকে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে প্রচার করেন।

৪. ধর্মদ্রোহিতার অপর নজীর হচ্ছে যে তিনি নিজেকে 'নাখতাই-ই-আলা' বা সর্বোচ্চ বিন্দু মনে করেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে আল্লাহর অবতার বা প্রতিনিধি মনে করেন।

www.pathagar.com

৫. বলাই বাহুল্য যে, 'বাবী' ধর্মমতের উৎপত্তি হয়েছে শিয়া মতবাদে, বিশেষ করে দ্বাদশ ঈমামপন্থী (Twelvers) মতবাদ থেকে। এই মতবাদের মূল মন্ত্র এই যে দ্বাদশ ইমাম মুহম্মদ আল-মুনতাজার অন্তর্ধান করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদের রক্ষা বা পুনঃরুদ্ধারের (Salvation) জন্য প্রত্যাবর্তন করবেন।

৬. 'বাবী'দের ধর্মগ্রন্থের নাম 'বায়ান'। পাপীষ্ঠ সৈয়দ আলী এই গ্রন্থকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআনের সমতুল্য মনে করতেন।

৭. 'বাবী'রা প্রচার করে যে, যেহেতু আল্লাহকে দেখা যায় না, সেহেতু তাঁকে সরাসরি সম্বোধন করা যায় না, যদিও সমস্ত কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। কয়েকজন নিয়োজিত প্রতিনিধির মাধ্যমে তাকে আরাধনা করতে হয়। নবী এবং তারপর 'বাবী'র প্রচারকদের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

৮. খ্রিস্ট ধর্মে ত্রাণকর্তা বা savior এর স্থান আছে। কিন্তু ইসলামে তা নেই। 'বাবী' মতাবলম্বীদের ত্রাণকর্তার উপর বিশ্বাস ছিল, যা মূলতঃ শিয়াদের মতবাদ।

৯. পিটার এভরী মনে করেন যে, মুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠীর (clericalism) বিরোধী 'বাবী' মতবাদে প্রাচীন ইরানী মতবাদ আহরিমা বা পাপ থেকে উদ্ভূত, যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে এক সহস্র বছর পরে একজন ত্রাণকর্তা (Messiah) আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর পাপ মোচন করে মানব গোষ্ঠীকে হেদায়েত করবেন। 'বাবী' মতবাদের অন্যতম সমর্থক আহমদ কাসরাভীও এই মত পোষন করেন।

১০. 'বাবী'পন্থীরা ১৯ সংখ্যাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে এবং এই বেজোড় সংখ্যাটি শুভ বলে মনে করা হয়। এই কারণে 'বাবী'গণ তাদের বছর, মাস ও অন্যাণ্য দ্রব্যাদি ১৯ ভাগে ভাগ করতে চেয়েছিল। জরথুস্ত্র বা অগ্নি উপাষকদের অনেক ধ্যান ধারণা তারা গ্রহণ করে।

১১. 'বাবী' মতাবলম্বীগণ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করার পক্ষপাতী ছিল না। তারা নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল এবং পর্দা প্রথার ঘোর বিরোধী ছিল। তারা রাজনীতি, আইন ও শিক্ষা দীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

১২. 'বাবী' ধর্মমত থেকেই ইরান ও পাকিস্তানে 'বাহাই' মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। বাহাই বর্তমানে সর্বজনসমাদৃত ধর্ম যা বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছে; যদিও এই ধর্ম ইসলামে শিরক ও বিদাতের সমতুল্য। এভেরী বলেন যে, "'বাবী' ও বাহাই ধর্মমত অন্যান্য মহান ধর্মগুলো থেকে আহৃত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমন্বয়।

'বাবী' মতবাদ প্রচার ঃ 'বাবী' মতবাদের প্রবক্তা-সৈয়দ আলী মুহাম্মদ তাঁর নতুন ধর্মীয় মত প্রচারে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এতদসত্ত্বেও সৈয়দ আলী মোহাম্মদ কর্তক প্রচারিত 'বাবী' মতবাদ ইরানে প্রচারিত হতে থাকে। 'বাবী'দের অন্যতম সংগঠন ছিলেন বুসায়েবের মোল্লা হোসেন। তিনি সৈয়দ আলীকে ঈমাম মেহদী হিসেবে প্রচার

www.pathagar.com

করে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। ত্রিশ বছর বয়স্ক সৈয়দ আলী তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য মোল্লা হোসেনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এভারী যতার্থই বলেন যে, "মোল্লা হোসেনের মত বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের পক্ষেই 'বাবী' আন্দোলনকে সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভয়ঙ্কর রূপ দান করা সম্ভব ছিল।" ক্রমবর্দ্ধমান 'বাবী'পন্থীদের প্ররোচনায় গোঁড়াপন্থী ইরানীগণ শিরক ও বিদাতকে নির্মুল করার জন্য 'বাবী'দের উপর উৎপীড়ন শুরু করে। সিরাজের অধিবাসীরা সৈয়দ আলী মোহম্মদের গৃহ আক্রমণ করলে তিনি ইসফাহানে পলায়ন করেন। তিনি এবং মোল্লা হোসেন একসময়ে গৃহবন্দী ছিলেন কিন্তু তারা পলায়ন করতে সক্ষম হন। ১৮৪৫ থেকে ১৮৫০ সালে সৈয়দ আলীর হত্যা পর্যন্ত 'বাবী' মতবাদ সমগ্র ইরানে প্রসার লাভ করে। ১৮৪৮ সালে বেহদাস্তের 'বাবী' সম্মেলনে 'বাবী'গণ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নিজেদের স্বতন্ত্র ধর্মমত প্রচার করে। এরপর থেকে 'বাবী'গণ সন্ত্রাসের সাহায্যে ইরানে অরাজকতা সৃষ্টি করে। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তরে তাব্রিজে বন্ধী জীবন কাটান। এক পর্যায়ে তাঁকে যুবরাজ নাসিরুদ্দীন কারাগার থেকে মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের সামনে হাজির হয়ে তার মতবাদ ব্যাখ্যা করতে নির্দেশ দেন। ১৮৪৮ সালে সংঘটিত এই ধর্মীয় সমাবেশে তর্ক-বিতর্ক হয়। সৈয়দ আলী কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি এবং তার ধর্মীয় মতবাদ একটি বিভ্রান্তিকর ও রাষ্ট্রদ্রোহী অপচেষ্টা বলে চিহ্নিত করা হয়। তাকে ভন্ড নবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এভরী বলেন যে, "তার ভাষা ছিল জড়তাপূর্ণ, আরবী ভাষার উপর জ্ঞান ছিল সীমিত, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, মরমীবাদ ও আধ্যাতিকতা সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। তাকে সকলের সামনে বেত্রাঘাত দ্বারা অপদস্ত করে পুনরায় অন্তরীণ করা হয়।" 'বাবী' প্রবক্তার প্রতি এহেন অপমানকর আচরণে তার অনুসারীগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ১৮৪৮ সালে মোহাম্মদ শাহ কাজারের প্রধান মন্ত্রী হাজী মির্জা আনাসী ইসফাহানের ধর্মীয় নেতাদের নিকট একটি পত্রে সৈয়দ আলীর বিভ্রান্তিকর ইসলাম বিরোধী প্রচারণার কথা বলেন। তিনি বলেন যে, "সৈয়দ আলী নবী হিসেবে দাবী করছেন এবং তার অনুসারীরা ভাঙ্গ সেবন করে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করেছে।" ১৮৫০ সালে 'বাবী' অনুসারীগণ জানজানে বিদ্রোহ ঘোষনা করে। এক বছর শাহের সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ লিপ্ত থাকার পর তাদের নেতা মৃত্যুবরণ করে। এই বিদ্রোহের সময় সৈয়দ আলী মোহম্মদকে তাব্রিজের ধর্মীয় নেতাদের নিকট ধর্মীয় বিচারে জন্য পাঠান হয়। ধর্মীয় আদেশে বা ফতোয়া অনুযায়ী তাকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাকে গুলি করে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং একদল খ্রিস্টান জল্লাদ যখন তার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করছিল তখন তাকে বেঁধে রাখার রশি ছিঁড়ে গেলে তিনি ধুম্রায়চ্ছন্ন পরিবেশের সুযোগে পাশের প্রহরী কক্ষে পলায়ন করেন। ঘাতকেরা ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে গেলে কোন মৃতদেহ দেখতে না পেয়ে পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাকে আত্মগোপন করে থাকতে দেখে। সেখানে তাকে হত্যা করা হয়। সৈয়দ আলী যে একজন অতিমানব বা অবতার বা আল্লাহর প্রতিনিধি নবী বা মাহদী, যিনি অন্তর্ধান করতে পারতেন, ছিলেন না তার প্রমাণ হচ্ছে যে তাকে একজন সাধারণ অপরাধীর মত মৃত্যুবরণ করতে হয়। ১৮৫৯ সালে তার মৃত্যু হলেও 'বাবী' মতবাদ ধুলিসাৎ হয়ে যায়নি।

www.pathagar.com

'বাবী'দের উপর উৎপীড়ন ঃ 'বাবী'পন্থীগণ ইরানে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়। 'বাবী'র মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী উনিশ বছরের তেজদীপ্ত যুবক মীর্জা ইয়াহইয়া নূরী 'বাবী' আন্দোলনকে সুদূরপ্রসারী করেন। মির্জা নূরী সৈয়দ আলীর ভাই ছিলেন এবং তার উপাধী ছিল "সুবহ-ই-আজল" (Morning of Eternity) কিন্তু তার অনুসারীদের সংখ্যা ছিল অল্প এবং উৎপীড়নের জন্য তিনি বাগদাদে পলায়ন করেন। অপরদিকে 'বাবী'র অপর একজন অনুসারী বাহাউল্লাহ 'বাবী' মতবাদকে সুদূর-প্রসারী করেন। তিনি নিজেকে খোদার প্রতিনিধি মনে করতেন এবং তিনি ১৮৬৩ সালে ইরানের বাইরে অবস্থানকালে নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করেন। তিনি ১৮৯২ সালে প্যালেস্টাইনে মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য যে, 'বাবী' মতবাদ থেকে উদ্ভূত বাহাই ধর্মমত বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছে। 'বাবী'পন্থীগণ তাদের ধর্মমত প্রচারের জন্য অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করে। 'বাবী' বলেন যে, "স্বর্গে প্রবেশের একমাত্র দ্বার হচ্ছে নিগ্রহকক্ষ (torture chamber)।" 'বাবী'দের অমানবিক নির্যাতন সহ্যের মানসিকতা প্রসঙ্গে ই. জি. ব্রাউন বলেন যে, "'বাবী'গণ তাদের মতবাদ প্রচারের জন্য যে শাহাদাৎ (martyrdom) বরণ করে তাতেই তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রতিফলিত হয়েছে।" ১৮৫০ সালে সৈয়দ আলীর হত্যার পর 'বাবী'গণ ইরানের শাহের নির্যাতনের শিকার হয়। তাদেরকে একই সঙ্গে ধর্মদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে ধিকৃত করা হয়। তাদের নির্যাতন ও উৎপীড়ন চরম আকার ধারণ করে যখন ১৮৫২ সারে নাসিরুদ্দীন শাহকে হত্যার জন্য একজন 'বাবী'পন্থীকে অভিযুক্ত করা হয়। এই হত্যার অপপ্রষ্টার জন্য তিনজন আততায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। তারা হচ্ছেন কুম শহরের নিবাসী মোল্লা ফতহুল্লাহ, নায়রিজের মির্জা মোহাম্মদ এবং জানজানের সাদেক। একজন অষ্ট্রেলিয় সাংবাদিক তেহরানের রাজপথে এই তিনজন আততায়ীর নৃশংস হত্যার লোমহর্ষক বিবরণ দেন। 'বাবী' বা বাহাই মতবাদকে নির্মূল করার জন্য সর্বজনসমক্ষে দৃষ্টান্তমূলক হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। নাসিরুদ্দীন শাহের রাজত্বকালে ইরান থেকে 'বাবী' বা বাহাইদের বিতাড়িত করা হয়। তারা প্রথমে ইরাকে গমন করে এবং সেখান থেকে তারা তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এভরীর মতে, "'বাবী' আন্দোলন রক্ষণশীল মুসলিম গোঁড়াপন্থীদের খপ্পর থেকে মুক্তি পাবার একটি প্রয়াস মাত্র এবং ইউরোপীয় প্রভাবমুক্ত একটি নতুন ধর্মমতে উদ্বুদ্ধ অভিনব আধ্যাত্মিকতা (enlightenment) সৃষ্টির প্রচেষ্টা।"

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্যের সাংবিধানিক আন্দোলন

ই. জি. ব্রাউন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Persian Revolution of 1905-9-এ পারস্যের সাংবিধানিক আন্দোলনের পটভূমি, ঘটনা ও ফলাফর বিষদভাবে আলোচনা করেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন শাহ কাজারের রাজত্বে পারস্যের সাংবিধানিক আন্দোলনের সুত্রপাত হয়, যদিও তাঁর পুত্র মোজাফফর শাহের আমলে (১৮৯৬-১৯০৬) সংবিধান সাক্ষরিত হয়। পারস্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পটভূমি ছিল খুবই বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ। নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামলের বেশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী হচ্ছে, (১) ইরান সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য, তথা ইউরোপীয় সভ্যতার দার প্রান্তে আসে এবং আধুনিকীকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তার ফলে টেলিগ্রাফ লাইন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বৈদেশিক বনিকদের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা, তামাক কনসেশন প্রভৃতি ইরানকে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসতে সহায়তা করে, (২) নাসিরুদ্দীনের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হতে থাকে, বিজ্ঞান ভবন বা 'দারুল ফুনুন' নির্মিত হয়, পাশ্চাত্যের শিক্ষাক্রম প্রবর্তীত হয় এবং ৪২ জন তরুন ইরানী ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরীত হয়; (৩) যে সময়ে ইরানে সাংবিধানিক আন্দোলনের পটভূমি তৈরি হচ্ছিল অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ, তখন মুসলিম বিশ্বে নব জাগরণ শুরু হয়ে গেছে, বিশেষ করে তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ ১৮৭৬ সালে সংবিধান প্রণয়ন করেন নব্য-তুর্কীদের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে। মিশরেও আরবী পাশার নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। মুসলিম বিশ্বের এই সংস্কার ও সাংবিধানিক আন্দোলন যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেন তিনি হচ্ছেন সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী। তিনি এবং উদারপন্থী ইরানী রাষ্ট্রদূত ও বুদ্ধিজীবী মির্জা ম্যালকম খানের অবদান অনস্বীকার্য; (৪) নাসিরুদ্দীন শাহের হত্যার জন্য 'বাবী' ধর্মান্ধদের দায়ী করা হয়। কিন্তু তার জীবন নাশের প্রথম চেষ্টা বিফল হলে তিনি 'বাবী'দের উপর অমানুষিক নির্যাতন করেন। এতদসত্ত্বেও, 'বাবী' মতবাদ অনৈসলামিক হিসাবে ধিকৃত হলেও এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ তারাই প্রথম সংঘবদ্ধভাবে রাজপরিবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে বা পরবর্তীকালে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রেরণা জোগায়। পিটার এভরী বলেন, "The Babis became the whipping boy for any movement or initiation in thought." (৫) ১৯০৫ সালে মুজাফফর শাহের শাসনামলে রুশ বিপ্লব শুরু হয় কিন্তু এই আন্দোলন কার্যকরী না হওয়ায় ইরানী উদারপন্থ বুদ্ধিজবী শ্রেণীদের সাংবিধানিক বিপ্লব ব্যহত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে কার্যকরী হয়। ১৯০৫ সালে রাশিয়া জাপানের কাছে পরাজিত হয় এবং রাশিয়ার মত একটি বৃহৎ শক্তি জাপানের

www.pathagar.com

মত একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কাছে পরাজয় বরণ করবে তা কল্পনাতীত। ভি. ডি. মহাজন বলেন, "আধুনিক যুগের ইতিহাসে প্রথম বারের মত একটি বৃহৎ পশ্চিমা শক্তিকে মোকাবেলাই করল না বরং তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করল।" এই এশিয়া বিজয় অন্যান্য দেশের সংস্কার ও সাংবিধানিক আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়। মহাজনের ভাষায়, "To the East it held out fresh hopes and feelings of confidence"। নাসিরুদ্দীন শাহের স্বৈরাচারী শাসনে বিদেশী প্রভাব ও অর্থনৈতিক সুবিধার বিরোধিতা করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। শাহ এই আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করলেও জামালুদ্দীন আফগানী, ম্যালকম খান, হাজী শেখ এবং হাদীনজম আব্বাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে; (৬) নৃশংসতা ও উৎপীড়ন দ্বারা একটি আন্দোলনকে সমূলে উৎপাঠন করা যায় না– একথা চিন্তা করে নাসিরুদ্দীন শাহ ১৮৫২ সালের পর উদারপন্থী সংস্কারক গোঁড়া ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব খর্ব করার জন্য এবং তাদের সমর্থন লাভের জন্য তিনি তেহরানে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। 'ফারামোশ খানা' (Faramush Khana) নামে পরিচিত এই সংস্থার প্রধান ছিলেন শাহ এবং এর সদস্যদের প্রত্যেককে শাহের আনুগত্য স্বীকার করতে হত। কিন্তু এর সদস্যগণ নির্বিঘ্নে গোপনে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে পারত; ফলে এটি একটি মুক্তিচিন্তাবিদদের আস্তানা (Freemasonry) হয়ে দাঁড়ায়, যা শাহের স্বার্থের অনুকূলে ছিল না। এই কারণে শাহ ১৮৬১ সালে এ ফারামোশখানা বন্ধ করে দেন।

সাংবিধানিক আন্দোলনের পথিকৃত ঃ জামালউদ্দীন আফগানী

জন্ম ঃ প্যান-ইসলামিজম বা বিশ্ব ইসলামবাদ আন্দোলনের জনক এবং সংস্কারক জামালউদ্দীন আফগানীর মতবাদ ছিল সুদূরপ্রসারী। ই. জি. বাউনের মতে, "এটি আলোচনার বিষয় যে, মহান ব্যক্তিবর্গ মহৎ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন না, মহৎ আন্দোলন মহাত্মন ব্যক্তির উদ্ভাবন ঘটায়। যাহোক, এ দু'টিকে কোনদিনই পৃথক করা যাবে না এবং যে মহান ব্যক্তিত্ব সমগ্র মুসলিম জাহানকে ধর্মীয় গ্রন্থীতে আবদ্ধ করে একতাবদ্ধ করে স্বাধীনতা ও স্বাধীকারের ক্ষেত্রে সোচ্চার হন তিনি সৈয়দ জামালউদ্দীন ছাড়া অন্য কেহ নন।" তার মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি ১৮৩৮-৩৯ সালে ইরানের আসাদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। এই কারণ তাঁকে আসাদাবাদী বলা হত। আসাদাবাদ হামদানের নিকটবর্তী বাগদাদ ও তেহরান রোডের সন্নিকটে অবস্থিত এবং সে সময়ে কাবুল বা আফগানিস্তানের অধীনস্থ ছিল। তাঁর পিতা সৈয়দ সফদার, যিনি প্রখ্যাত হাদিসবেত্তা সৈয়দ আলী আল-তিরমিযের বংশধর হিসেবে দাবী করেন। সৈয়দ জামালুদ্দীনের শৈশবকালে কাবুলে গিয়ে বসবাস করেন। সম্ভবত এই কারণে পরবর্তীকালে সৈয়দ জামালুদ্দীনের তাখাল্লুস বা উপ-নাম হয় আফগানী। তবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে তিনি জন্মসূত্রে একজন ইরানী ছিলেন।

শিক্ষালাভ ঃ সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী শৈশবকাল থেকেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। আট বছর বয়স থেকে তিনি তাঁর পিতার কাছে বিদ্যা-শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেন এবং দশ বছরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তৎকালীন মুসলিম জ্ঞানভান্ডারের প্রায় সমস্ত পাঠ গ্রহন করেন, যেমন আরবী ভাষা, ব্যাকরণ

www.pathagar.com

শব্দতত্ত্বসহ, ইতিহাস, সুফীবাদ, ধর্মতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, অংক শাস্ত্র, জ্যোর্তিবিদ্যা, শরীরবিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্র। তাঁর জ্ঞান পিপাসা ও সমন্বয় ক্ষমতা এরূপ ছিল যে তিনি অতি অল্প বয়সে ও সময়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন। তিনিই বিশ্ব-ইসলামবাদের বা Pan-Islamism-এর মূল প্রবক্তা ছিল।

আফগানীর দর্শন ঃ প্যান-ইসলামী মতাদর্শের মূল ভিত্তি ছিল একই খলিফার অধীনে সমগ্র মুসলিম জাহানকে একতাবদ্ধ করা। উনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র ইউরোপীয় শক্তির আওতাধীনে আসে এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য ও স্বাধীনতা বজায়ের জন্য সর্বপ্রথম তুরস্কে নব্য-তুর্কী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে নামিক কামালের নাম করা যায়। অবশ্য সুলতান আবদুল হামিদ নিজ স্বার্থে এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু বিশ্ব-ইসলামবাদকে যে মহান পুরুষ অসাধারণ গুরুত্ব দেন তিনি ছিলেন সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী। তিনি শিয়া মতাবলম্বী হয়েও মুসলিম জাহানকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আফগানী (সুন্নী) নাম ধারণ করেন। তাঁর লেখনী ছিল প্রখর এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা দর্শনতত্ত্বকে অধিক প্রাধান্য দিতেন। তিনি কল্পনাবিলাসী ছিলেন না, বাস্তববাদী ও প্রতিভাধর আন্দোলনকারী ছিলেন। তিনি ওয়াহাবীদের গোঁড়ামতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি যুক্তিবাদ ও আধুনিকতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় মতবাদে পুষ্ট ছিল। বিশ্ব-ইসলামবাদী আফগানী পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন। পিটার এভরী আফগানী সম্বন্ধে বলেন, "He was a political philosopher as well as theological reformer capable of the most subtle dialectic and of tenacious loyalty to his principles." জুরজী জায়দান তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি নিঃস্বার্থভাবে সমস্ত জীবন মুসলিম ঐতিহ্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং সমস্ত বিলাসিতা বর্জন করেন। তিনি তার মতাদর্শ দ্বারা তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও অনুসারীদের মনে একটি সদাজাগ্রত সংস্কারমূলক স্পৃহা জানাতে সক্ষম হন।

কর্মক্ষেত্র ঃ সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর কর্মক্ষেত্র ছিল বিস্তৃর্ণ। তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করে ইসলামের ঐক্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ, ভারত, মিশর ও তুরস্ক সফর করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ১৮৫৬ সালে তিনি ভারতে সফর করেন। তথায় তিনি সর্বপ্রথম ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হন। ভারত থেকে ১৮৫৭ সালে তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করেন। অতঃপর আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করে তিনি দোস্ত মোহাম্মদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। আফগানী মোহাম্মদ আজমের (১৮৬৭-৬৯) রাজত্বকালে আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। আজমের ভ্রাতা শের আলীর শাসনামলে আফগানী তার পদমর্যাদা হারান এবং গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুন আফগানিস্তান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৬৯ সালে তিনি ভারত হয়ে দ্বিতীয় বারের মত হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। মক্কা থেকে তিনি কায়রোতে গমন করেন এবং তথায় ৪০ দিন অবস্থান করেন। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করতে

www.pathagar.com

থাকলে মিশরের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে মিশর থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি অতঃপর তুরস্কে গমন করেন। সেখানে ইস্তাম্বুলে প্রধানমন্ত্রী আলী পাশা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। ১৮৭০ সালে তিনি তুরস্ক থেকে শেখ-উল-ইসলামের বিরোধিতায় বিতাড়িত হলে পুনরায় মিশরে যান। ১৮৭১ সালে মিশরে অবস্থানকালে তিনি মিশরীয় উদারপন্থী লেখকদের সংস্পর্শে আসেন, যেমন আবদুল্লাহ পাশা, মোস্তফা পাশা ও মোহাম্মদ পাশা। আফগানীর বিশ্ব ইসলামবাদ মতবাদে শঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৮৭৯ সালে তিনি ভারতে বিতাড়িত হন এবং হায়দ্রাবাদে বসবাস করতে থাকেন। মিশরে আরবী পাশার বিদ্রোহ দমন করার পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আফগানীকে ১৮৮১ সালে দেশ (ভারত) ত্যাগ করতে বাধ্য করে। তিনি প্রথমে লন্ডন এবং পরে প্যারিসে যান। প্যারিসে তিনি তিন বছর অবস্থান করে তার মতবাদ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। অতঃপর আফগানী প্যারিস থেকে মক্কা ও পিটার্সবার্গে গমন করেন। পিটার্সবার্গে অবস্থানকালে তিনি জারকে রুশ ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেন। রাশিয়ায় অবস্থানকালে আফগানীর সঙ্গে পারস্যের নাসিরুদ্দীন শাহ্ সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু তাদের সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে মিউনিকে সাক্ষাৎ হয়।

শাহ্-আফগানী বিরোধ ঃ সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর সঙ্গে পারস্যের সুলতান নাসিরুদ্দীন শাহের সম্পর্ক মোটেই বন্ধুসুলভ ছিল না। আফগানীর উদার প্রগতিবাদী, স্বৈরাচার বিরোধী, সংস্কারমূলক আন্দোলনে শাহ্ ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন। কারণ, তার বিশ্ব-ইসলামবাদের মতবাদ মিশর, তুরস্ক এবং ইরানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণে শাহ্ আফগানীকে পারস্য সফরের আমন্ত্রণ জানান। কিছুকাল অবস্থান করে পারস্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট ও শাহের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে তিনি শাহের বিরাগভাজন হন। এই কারণে তিনি ইরান ত্যাগ করেন। আফগানীর প্রথম সফরের মত ১৮৮৯ সালের দ্বিতীয় ইরান সফর সুখকর হয়নি। তাঁকে শাহ প্রধানমন্ত্রীত্ব প্রদানের আশ্বাস দিয়ে তেহরান সফর করতে বলেন কিন্তু তাকে পরে অপদস্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী আমীনুস-সুলতান মির্জা আলী আসকার খান আফগানীকে ইরানের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁর মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের উন্নতি হয় এবং শাহ বিরোধী অভ্যন্তরীণ গোলযোগের নিরসন হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যে আফগানীর বিভ্রান্তি দূরীভূত হয় এবং তিনি শাহ বিরোধী প্রচারণা শুরু করেন। শাহের বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করে তিনি ইরান ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু তাকে দেশত্যাগের অনুমতি না দিলে তিনি তেহরানের অদূরে শাহ আবদুল আজিমের সমাধীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, যা 'বাস্ত' নামে পরিচিত। তিনি সেখানে সাত মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন এবং পরিশেষে শাহ ৫০০ অশ্বারোহী প্রেরণ করে সমাধীর পবিত্রতা লঙ্ঘন করে আফগানীকে বিতাড়িত করেন। শাহ্-আফগানী বিরোধের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে, আফগানী তাঁর স্বভাবসুলভ এবং আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি দ্বারা নির্ভীকভাবে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইরানের তৎকালীন সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। যে কারণগুলো তিনি তাঁর বিভিন্ন পুস্তিকা ও ভাষণে প্রচার করেন তা হচ্ছে ঃ (১)

www.pathagar.com

নাসিরুদ্দীন শাহের স্বৈরাচারী শাসন; (২) রাজদরবারের বিলাসিতা; (৩) আমিনুস-সুলতানের দুর্নীতিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা; (৪) তামাক কনসেশনের ফলে অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা; (৫) অর্থনৈতিক দেওলিয়াপনা; (৬) বৈদেশিক-ইউরোপীয় প্রভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত; (৭) বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা; (৮) রক্ষণশীল মোল্লা শ্রেণীর প্রতি উদাসীনতা ও নির্যাতন; (৯) আফগানীর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ; এর ফলে শাহ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়। বস্তুত তাঁকে একটি খচ্চরে বেঁধে হামদান থেকে বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়।

মৃত্যু ঃ শাহ-আফগানী বিরোধ চরমে উঠে যখন আফগানীকে অন্তরীন করা হয়। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর মতবাদের সমর্থনে অসংখ্য অনুসারী পেতে থাকেন, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাযউইনের শের আলী, তাব্রিজের মির্জা আগা, কিরমানের শেখ আহম্মদ এবং মির্জা রিজা, তেহরানের মোহাম্মদ আলী খান। তিনি ইরাকে অবস্থানকালে সিরাজের মুজতাহিদ হাজি মির্জা মোহাম্মদ হাসানের নিকট একটি পত্রে শাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তামাক কনসেশন বন্ধ করার আহ্বান জানান। তামাকের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া হলে শাহের মর্যাদাহানী হয়। এ প্রসঙ্গে এভেরী বলেন, "Then came the Tobacco concession, Sayyid Jamaludin's fiery reaction to which suddenly put a dagger, poised at the heart of the Shah, into the hands of the Mullahs and the people"। ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি ইরাক হয়ে ইস্তাম্বুলে গমন করেন ১৮৯২ সালে। সেখানে সুলতান আবদুল হামিদ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তুলনামূলকভাবে তাঁর মতবাদ তুরস্কের সুলতানের নিকট হৃদয়গ্রাহী হয়, কারণ তুরস্ক সাম্রাজ্য অ-তুর্কী ভাষাভাষীদের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি বসফোরাসে গৃহবন্ধী হন এবং সেখানে ১৮৯৭ সালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ১৮৯৭ সালের ১লা মে মির্জা মোহাম্মদ রিজা নামের তার একজন শীষ্য নাসিরুদ্দীন শাহকে গুলি করে হত্যা করে। আপাতঃদৃষ্টিতে বিশ্ব-ইসলামাবাদ কার্যকরী না হলেও, জামালউদ্দীন আফগানীর মতবাদ, ধ্যান-ধারণা, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে। জামালউদ্দীন আফগানী তাঁর লেখনী ও ভাষণের মাধ্যমে ইরানে নব-জাগরণের সূচনা করেন এবং ম্যালকম খানের পাশাপাশি সাংবিধানিক আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেন।

প্রিন্স ম্যালকম খানের অবদান

উত্থান ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত ইরানের সাংবিধানিক আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক ছিলেন প্রিন্স ম্যালকম খান। এই শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইরানের শাহ বিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলনে সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী এবং ম্যালকম খান অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ম্যালকম খান ইসফাহানের এক আর্মেনীয় গ্রামীণ পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাসিরুদ্দীন শাহের একজন প্রভাবশালী উপদেষ্টার পদ লাভ করেন। তিনি ব্রিটেনে ইরানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত ছিলেন কিন্তু শাহের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে তিনি পদত্যাগ করেন। ম্যালকম খান মূলত

www.pathagar.com

ছিলেন একজন উদারপন্থী, সংস্কারপন্থী, প্রভাবশালী চিন্তানায়ক। তাঁর ভাষণ এবং লেখনীর মাধ্যমে ইরানীদের তিনি সাংবিধানিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৮৯১ সালে লন্ডনে জামালউদ্দীন আফগানীর সঙ্গে ম্যালকম খানের সাক্ষাৎ হয় এবং তাদের যৌথ উদ্যোগ ও প্রেরণায় নাসিরুদ্দীনের পুত্র মোজাফফরউদ্দীনের রাজত্বে সাংবিধানিক আন্দোলন জোরদার হয়।

মতবাদ ঃ প্রিন্স ম্যালকম খান একজন চিন্তানায়ক, সমাজ সংস্কারক এবং কূটনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ১৮৭২ থেকে ১৮৮৯ পর্যন্ত নাসিরুদ্দীন শাহের রাজত্বে লন্ডনে ইরানী রাষ্ট্রদূত ছিলেন। কিন্তু শাহের নিকট বৈপ্লবিক সংস্কারের জন্য কতিপয় প্রস্তাব রাখেন, যার ফলে তিনি শাহের বিরাগভাজন হন। তাঁর পদচ্যুতির পর তিনি লন্ডনে অবস্থান করে 'কানুন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। আরবী শব্দ 'কানুন'-এর অর্থ 'আইন'। এই শব্দ দ্বারা তিনি শরিয়তের বিপক্ষে নতুন আইন অনুশাসনের ইঙ্গিত করেন। ১৮৮০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি কানুনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তিনি উলামাদের প্রভাব থেকে ইরানকে মুক্ত করে একটি নতুন সংবিধানের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। তিনি তাঁর পত্রিকায় গণতান্ত্রিক, স্বাধীকার ও সাংবিধানিক আন্দোলনের দ্বারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। তিনি বলেন, কেহই আইনের উর্ধ্বে নয়। তিনি 'শারিয়া' শাসনের স্থলে আইনকে সময়োপযোগী করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। স্থানীয় আইন বা 'উরফ'কে তিনি কোন গুরুত্ব দেন নি। সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যও 'কানুনে' জোরালো বক্তব্য রাখা হয়। এর ফলে 'কানুন' ইরানে নিষিদ্ধ হয়। ই. জি. ব্রাউন কানুনের বিষদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, প্রিন্স ম্যালকম খান দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর ধরে 'কানুন' প্রকাশ করেন এবং মোট ৪১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'কানুন' ঃ ম্যালকম খান প্রকাশিত 'কানুন' মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা ও উলামা প্রভাবে জর্জরিত ইরানের জনগণের নিকট সাদরে গৃহীত হলেও শাহ এবং বিশেষ করে তাঁর প্রধানমন্ত্রী আমীনুস-সুলতানের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। তারা ম্যালকম খান প্রচারিত মতবাদকে জামালউদ্দীন আফগানীর বিশ্ব-ইসলামবাদের মত ইরানের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করেন। ১৮৯০ সালে ২২শে মার্চ তারিখে প্রকাশিত 'কানুনে' নিম্নবর্ণিত অভিযোগসমূহ প্রচারিত হয় ঃ

১. রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অজ্ঞ, নিম্নশ্রেণীভুক্ত কর্মচারীদের উপর।

২. রাষ্ট্রের স্বার্থ বিদেশী দূতাবাসের (legation) নিকট জলাঞ্জলী দেওয়া হচ্ছে।

৩. রাষ্ট্র বিলাসিতা ও চাটুকারিতায় ভরপুর হয়ে গেছে।

৪. সেনাবাহিনী পৃথিবীর কাছে হাস্যকর মনে হবে।

৫. মুজতাহিদ ও ধর্মীয় নেতাগণ শরিয়তের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত।

৬. রাস্তাঘাট এবং শহরসমূহে নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে।

এই সমস্ত অভিযোগ উত্থাপন করে ইরানে "আইনের শাসন" প্রবর্তনের জন্য দাবী জানানো হয় এবং ধর্মীয় আইনের পাশাপাশি 'সিভিল কোড' এ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

www.pathagar.com

এ ছাড়া ম্যালকম খান সাংবিধানিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি পার্লামেন্ট গঠন করার দাবী জানান। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে এই সংসদ এবং সংসদের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। এই সংসদের সদস্যদের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক থাকবে। উইলফ্রিড ব্লান্ট ম্যালকম সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি সংস্কৃতিবান ও উদারপন্থী সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন। ম্যালকম খানের মতবাদ প্রচারের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত 'কানুন' ইরানে গোপনে পাচার করা হত এবং বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিবাদী শ্রেণী তাঁর মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়। তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং লন্ডন, প্যারিস, ইস্তাম্বুল ও কলকাতায় অবস্থানকারী ইরানীগণ ম্যালকমের আদর্শে উৎসাহিত হয়। বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে ইরানের রাজনৈতিক সঙ্কট, পাশ্চাত্য প্রভাবের কুফল, কাজারদের স্বৈরাচারী শাসন, মোল্লাদের ধর্মান্ধতা, পরনির্ভরশীলতা ও আইনের শাসনের অনুপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন প্রগতিবাদী সংগঠন স্থাপিত হয়, যেমন "ফ্রি ম্যাসনরী লজ" (Freemasonry Lodge), "লীগ অব ওয়ালর্ড হিউম্যানিটি (আলম আল-ই-আদামীয়াতঃ World of Humanity)। 'কানুন' পত্রিকার ১৮৯০ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় সর্বপ্রথম ইরানে বিরাজমান অরাজকতার জন্য নাসিরুদ্দীন শাহকে দোষারোপ করা হয়। ইরানের সাংবিধানিক আন্দোলনে সৈয়দ জামালউদ্দীন এবং প্রিন্স ম্যালকম খান ব্যতীত মোজতাহিদ শেখ হাদী বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

'বাস্ত' আন্দোলন ঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইরানের সাংবিধানিক আন্দোলনে 'বাস্ত' বা ধর্মীয় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নাসিরুদ্দীন শাহের স্বৈরাচারী শাসনের অবসানে তাঁর পুত্র মোজাফফর শাহ ১৮৯৬ সালে ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৯০৬ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রশাসনিক দুর্বলতা, অমাত্যবর্গের দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা, বহিঃশক্তির প্রভাব অমিতাচারিতা, আর্থিক সঙ্কট, বিদেশী ঋণের বোঝা সমগ্র দেশে এক বিস্ফোরণমুখী পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এরূপ শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তির জন্য উদারপন্থী রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিক্ষকশ্রেণী, মধ্যবিত্ত সমাজ একজোট হয়ে আন্দোলনে যোগদান করে। সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতার ফলে ১৯০৪ সালের ১৩ই ডিসেম্বর প্রায় ২০০০ মোল্লা এবং ব্যবসায়ীগণ তেহরানের অদূরে শাহ্ আবদুল আজিমের সমাধীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অহিংস ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ধর্মীয় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, যা 'বাস্ত' নামে পরিচিত। ইরানীদের মতে এটি একটি সরকার-বিরোধী নিরব ও অহিংস প্রতিবাদ। সমাধীতে আশ্রয় গ্রহণকারীগণ শাহের নিকট 'আদালত খানা' বা বিচারালয় দাবী করে যার মূলমন্ত্র ম্যালকম খানের 'কানুনে' লিপিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়া তারা কুচক্রী রুশপন্থী মন্ত্রীদ্বয় আমীন উদ-দৌল্লাহ্ এবং আলা-উদ-দৌল্লাহর পদত্যাগ দাবী করে। এই মোল্লাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন তেহরানের সৈয়দ মুহাম্মদ তাবাতাবায় এবং সৈয়দ আবদুল্লাহ্ বেহবেহানী। তাঁরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রী সভায় জনগণের অংশগ্রহণের দাবী জানান। শাহের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ১৯০৬ সালের ১২ই

www.pathagar.com

জানুয়ারি 'বাস্ত' গ্রহণকারীগণ তেহরানে ফিরে আসে। শাহ একটি 'দস্তখত'-এ বিক্ষোভকারীদের দাবী মেনে নেন। এই সময় বিক্ষোভকারীরা 'ইরান জাতি দীর্ঘজীবী হউক' (জিন্দাবাদ-মিল্লাত-ই-ইরান) ধ্বনি দেয়। উল্লেখ্য যে, সাংবিধানিক আন্দোলন কেবলমাত্র স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই ছিল না; ইরানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশীদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনও ছিল। প্রথম বাস্তের পর প্রতিশ্রুত সংস্কারসমূহ প্রবর্তনের জন্য ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে মোল্লাগোষ্ঠী লিখিতভাবে আবেদন জানায়। কিন্তু স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী ইন-উদ-দৌল্লাহ বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশী নির্যাতন শুরু করেন। তেহরানে দাঙ্গায় একজন ছাত্র নিহত হলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর বিক্ষোভকারীগণ তেহরান থেকে কুমে আশ্রয় গ্রহণ করে। সরকার তেহরান ও কুমে পালিত হরতাল বানচাল করার জন্য দোকান খোলার আদেশ জারী করে নতুবা লাইসেন্স বাতিলের হুমকী দেয়। বিদ্রোহীগণ সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে এবং ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় 'বাস্ত' কর্মসূচি শুরু করে। তারা এবারে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে বণিক, ছাত্র, সাধারণ নাগরিকগণ গুলহাকের ব্রিটিশ লিগেশনে আশ্রয় গ্রহণ করে। বার থেকে চৌদ্দ হাজার বিক্ষোভকারী ব্রিটিশ আশ্রয়ে থাকে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কুমে আশ্রয় গ্রহণ করে। এর ফলে মোজাফফর শাহ স্বৈরাচারী প্রধান মন্ত্রী ইন-উদ-দৌলাহকে বরখাস্ত করেন এবং জনপ্রিয় ও উদারপন্থী নেতা মির্জা নসরুল্লাহ খানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। অতঃপর শাহ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে কুম থেকে তেহরানে প্রত্যাবর্তন করতে বলেন কিন্তু শাহের শঠতায় বিশ্বাস না করে তারা তাদের সমস্ত দাবী পূরণের জন্য চাপ দেয়। এভাবে তারা দাবী করে যে, তাদের (১) একটি সুসংবদ্ধ ও লিখিত সংবিধান এবং (২) একটি জাতীয় সংসদ প্রদান করতে হবে। মোজাফফর শাহ ১৯০৬ সালের ৫ই আগস্ট তারিখে বিদ্রোহীদের সমস্ত দাবী মেনে নেন; অতঃপর দ্বিতীয় 'বাস্ত' সমাপ্ত হয়।

সংবিধান ও মজলিস ঃ 'বাস্ত' আন্দোলনের প্রেক্ষিতে স্বৈরাচারী শাসক সুলতান মোজাফফর শাহ আন্দোলনকারীদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। ১৯০৬ সালের ৫ই আগস্ট একটি ফরমান জারী করে সংবিধান ও জাতীয় সংসদ গঠনের তিনি অনুমতি দেন এবং ১৯শে আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদ উদ্বোধন করেন। ১৯০৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর প্রথম নির্বাচন আইন প্রণীত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ফরমানে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, জাতীয় সংসদ বা মজলিস-ই-সূরা-ই-মিল্লী'র প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে, (১) রাজপরিবারের সদস্য, (২) অভিজাত শ্রেণী, (৩) জমিদার, (৪) ব্যবসায়ী, (৫) কৃষক, (৬) শিল্পপতি, (৭) ধর্মীয় নেতা (Doctors of Divinity) শ্রেণীদের দ্বারা। নির্বাচনী আইনে ভোটারদের যোগ্যতার মাপকাটি বর্ণিত হয়; যেমন ভোটারদের (১) ২৫ বছরের উর্ধ্বে বয়স হতে হবে, (২) ইরানী নাগরিকত্ব, (৩) জমিদার ও কৃষকশ্রেণীর ১০০০ তুমান অথবা ২০০ পাউন্ডের উর্ধ্বে সম্পত্তির মালিকানা, (৪) বণিক শ্রেণীর নির্দিষ্ট কারখানা এবং দফতর, (৫) কারিগর শ্রেণীদের (guild) নিজস্ব শিল্প কারখানা এবং দোকান থাকতে হবে। যাদের ভোটাধিকার থাকবে না তারা হচ্ছে ঃ (১) মহিলা, (২) বিদেশী নাগরিক, (৩) ধর্মদ্রোহী, (৪) অপ্রাপ্তবয়স্ক, (৫) অপরাধী, (৬) কপর্দকহীন, (৭)

www.pathagar.com

সামরিক বাহিনীর সদস্য, (৮) গভর্নর অথবা উপ-গভর্নর। সমগ্র দেশকে কয়েকটি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। সাংবিধানিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের চাপে শাহ ১৭ই সেপ্টেম্বর মজলিসের কাঠামো সুনির্দিষ্ট করতে বাধ্য হন। স্থির হয় যে, মজলিসে সর্বমোট ১৫৬ জন সদস্য থাকবে। এর মধ্যে তেহরান থেকে ৬০ জন এবং অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাকী ৯৬ জন। সানি-উদ-দৌল্লাহ মজলিসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং শাহ ৭ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাব মজলিসের উদ্বোধন করেন।

মজলিসের কার্যক্রম ঃ মজলিসের উদ্বোধন ইরানের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। জাপানের পরেই এশিয়ায় এই প্রথম নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত মজলিসের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, শাহ মজলিসের অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল যেমন সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনা, মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করা, বিলের উপস্থাপনা ও অনুমোদন, পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া। শাহ ইচ্ছা করলে পার্লামেন্ট বাতিল করতে পারবেন– এরূপ ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ইরানী মজলিস সার্বভৌম ছিল এবং বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমাবার জন্য মজলিস ইঙ্গ-ব্রিটিশ ও রাশিয়ার নিকট থেকে ৪,০০,০০০ পাউন্ড স্টার্লিং ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। ইরানী সংবিধানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় নেতাদের সদস্য নির্বাচন। পাঁচ জন মুজাহিদদের নিয়ে সংসদীয় কমিটি গঠিত হয় এবং তাঁদের দায়িত্ব ছিল প্রস্তাবিত বিলসমূহ পর্যালোচনা করা এবং শরিয়ত বিরোধী কোন প্রস্তাব থাকলে তা বাতিল বা বর্জন করা। এ থেকে প্রামাণিত হয় যে ইরানী সাংবিধানিক আন্দোলনে ধর্মীয় নেতাদের অসামান্য প্রভাব ছিল। মোজাফফর শাহ ৩০শে ডিসেম্বর সংবিধান স্বাক্ষরিত করেন এবং ১৯০৭ সালের ৭ই জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। ১৯০৭ সালের ১৯শে জানুয়ারি মোজাফফর শাহের পুত্র মোহাম্মদ আলী শাহ ইরানের শাসনভার গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ আলী ও সংসদীয় সঙ্কট ঃ মোহাম্মদ আলীর প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বৈরাচারী শাসননীতির ফলে ইরানে সাংবিধানিক সঙ্কট চরম আকারে দেখা দেয়। সংবিধানে কাজার সুলতানের ক্ষমতা সীমিত করা হয় এবং সংসদের প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। 'ওয়ালী-আল-আহদ' বা উত্তরাধিকারী থাকাকালীন তিনি সংবিধান এবং সংসদের রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন কিন্তু ক্ষমতালাভ করে তিনি ক্রমশঃ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। ফলে, সংসদ সদস্যদের সঙ্গে শাহের বিরোধ বাধে। বিদেশী ঋণ এবং উচ্চপদে বিদেশীদের নিয়োগে সংসদে ঘোর আপত্তি তোলে এবং ১৯০২ সালের মার্চ মাসে শুল্ক বিভাগের প্রধান বেলজিয়ামবাসী এম. নিউয়াস (M. Naus) পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। মোহাম্মদ আলীর সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপে মদদ জোগায় রাশিয়া। এই মূল কারণ ১৯05 সালে উদারপন্থীদের বিপ্লব ব্যর্থ হলে তারা ১৯০৭ সালের ইরানী সংবিধানকে সুনজরে দেখেনি। সংসদ সদস্যগণ ক্রমবর্দ্ধমান সংসদীয় বিরোধী রাষ্ট্রনীতিতে ভীত হয়ে বিভিন্ন শহরে সংগঠন বা আনজুমান গঠন করেন। এর

www.pathagar.com

মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাব্রিজের "আনজুমান-ই-নুজ্জার"। এছাড়া প্রকাশনার ক্ষেত্রে উদারনীতি প্রতিষ্ঠিত হলে ধর্ম বিরোধী প্রকাশনা ব্যতীত সকল প্রকার পত্র-পত্রিকা প্রকাশের কোন বাধা থাকে না। ১৯০৭ সালের ৭ই অক্টোবর মৌলিক আইনে প্রকাশনার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ফলে ইরানের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হলে গণতান্ত্রিক ও সংবিধানের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। এ প্রসঙ্গে 'তামাদ্দুন, 'হাব্রুল মতিন', 'সুর-ই-ইসরাফিল' এবং 'মুসাওয়াত' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই সমস্ত পত্রিকার মাধ্যমে ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি স্বৈরাচারী নীতি ভয়াবহতা জনগণের নিকট উপস্থিত হতে থাকে। এদিকে পার্লামেন্টে দুটি দল ছিল, একটি জাতীয়তাবাদী, অপরটি সংস্কারবাদী। জাতীয়তাবাদী দলের নেতা ছিলেন সৈয়দ আবদুল্লাহ বাহাবাহানী ও সৈয়দ মোহাম্মদ তাবাতাবায়। তারা সংসদের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দাবী করেন এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তারা তাদের মতবাদের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখেন। অন্যদিকে সংস্কারবাদী দলের নেতা ছিলেন তাব্রিজের সৈয়দ হাসান তাকিজাদাহ। উলামাদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি হয়। বিশিষ্ট আলেম ফজলুল্লাহ নুরী তাবাতাবায় এবং বাহবাহানীর প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকিজাদাহ শাহের পক্ষ গ্রহণ করেন। ফলে শাহ রুশ প্ররোচনায় স্বীয় স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রকাশের জন্য সংবিধান বাতিলের ষড়যন্ত্র করতে থাকেন এবং উদারপন্থী প্রধানমন্ত্রী নাসির-উল-মূলককে বন্দী করেন।

মজলিস বিধ্বস্ত ও সংসদ সদস্যদের নিধন ঃ মোহাম্মদ আলী কাজারের রাজত্বকাল ছিল সাংবিধানিক সঙ্কটের আবর্তে ইরানীদের করুণ ইতিহাস। শাহ সংবিধানপন্থীদের উপর সন্ধিহান হয়ে দমন নীতি বাস্তবায়ন করতে থাকেন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে শাহ সংবিধান বলপূর্বক বাতিল ও উৎখাত করার চেষ্টা করেন। তিনি রক্ষণশীল মোল্লা এবং রাজকীয় সমর্থকদের একটি দল সংসদ ভেঙ্গে দেবারও চেষ্টা করেন। শাহের এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপে জনগণ হতবুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং শাহ নতুন করে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য হন। কিন্তু এতে সাংবিধানিক সঙ্কট সহজে নিরসন হয়নি। ১৯০৭ সালে ইঙ্গ-রুশ চুক্তি সম্পাদিত হলেও তার মারাত্মক কুফল অনুভূত হয় এবং সংস্কারপন্থীগণ বৈদেশিক ঋণের পক্ষপাতি ছিলেন না। কিন্তু সংখ্যাধিক্য ভোটে রুশ ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব পাশ হলে আমীনুস-সুলতানকে একজন সংস্কারপন্থী গুলি করে হত্যা করে। আমিনুস-সুলতানের মন্ত্রী পরিষদ পদত্যাগ করলে নাসিরুল মূলককে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করতে বলা হয়। কিন্তু সংস্কারপন্থীদের চাপে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সন্ত্রাসের বিস্তারে শাহ বিচলিত হলেন এবং সংবিধান বিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। সৌভাগ্য বশতঃ তিনি ঘোড়ার গাড়িতে ভ্রমণ করায় সে যাত্রায় বেঁচে যান। এদিকে ইরানে সাংবিধানিক সঙ্কট মারাত্মক আকার ধারণ করলে ব্রিটিশ প্রতিনিধি মারলিং এবং রুশ প্রতিনিধি এম. ডি. হার্টউইগ নিরব ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হন। ১৯০৮ সালের জুন মাসে শাহ গ্রীষ্মকালীন আবাসের উদ্দেশ্যে তেহরান ত্যাগ করেন কিন্তু শহর ত্যাগের পূর্বে তিনি কশাক বিগ্রেডের নেতা রুশ কর্নেল লিয়াকভকে মজলিস বিধ্বস্ত করার নির্দেশ দেন। ১৯০৮ সালে ২৩শে জুন লিয়াকভ সামরিক আইন জারী করে রাজধানীতে প্রবেশ করেন এবং গোলাবর্ষণে

www.pathagar.com

পার্লামেন্ট ভবন বিধ্বস্ত করে দেন। শুধু তাই নয় মজলিসের অসংখ্য সদস্যকে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। এতদসত্ত্বেও সাংবিধানিক আন্দোলন নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। প্রথম মজলিস বাতিল ঘোষিত হলে তাব্রিজ সাংবিধানিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। তাব্রিজের সংসদ সদস্যগণ সংঘবদ্ধ হয়ে শাহের দমন ও স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ করে কিন্তু কশাক বিগ্রেডের সাহায্যে সাময়িকভাবে তাদের আন্দোলন স্তব্ধ করা সম্ভব হলেও কতিপয় ক্ষণজন্মা নেতার প্রচেষ্টায় এই আন্দোলন সুদূরপ্রসারী হয়। এই প্রসঙ্গে সর্দার আসাদের নাম উল্লেখ করা যায়। পিটার এভেরী বলেন, "তাব্রিজীদের রক্ষনশীলতা, তাব্রিজীদের মননশীলতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এভাবেই তাব্রিজ ইরানের দ্বিতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।" (Tabriz's orthodoxy, Tabriz's intellectualism and political awareness................ and Tabriz's special position as a second political and cultural centre in Iran.)

মজলিসের কার্যকলাপ ঃ তাব্রিজবাসী সংসদ সদস্য ও জাতীয়তাবাদী দল শাহের দমন নীতিতে অতিষ্ট হয়ে সশস্ত্র বিক্ষোভ শুরু করে। সর্দার আসাদের নেতৃত্বে এই দল ইস্পাহান ও রেসত দখল করে এবং কশাক বিগ্রেডের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। প্রাক্তন জেনারেল ওয়ালী খানের নেতৃত্বে ককেসিয়ান, তুর্কী ও আর্মেনীয়দের সমন্বয়ে একটি নিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। ব্রিটেন ও রাশিয়া এই সশস্ত্র বিদ্রোহকে সুনজরে দেখেনি। তেহরানে তিন দিন ব্যাপী খণ্ড যুদ্ধ চলে এবং ১৯০৯ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে সংঘটিত এই বিদ্রোহের ফলে শাহ মোহাম্মদ আলী ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে রুশ লিগেশনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহের পরাজয়ের ফলে তেহরান জাতীয়তাবাদীদের দখলে চলে যায়। শাহকে দেশ ত্যাগ করে রাশিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীল শেখ ফয়জুল্লাহ ও তার পাঁচজন সঙ্গীকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদন্ড দেয়। ১৯০৯ সালের ১৫ই নভেম্বর পুনরায় সংসদের অধিবেশন বসে এবং এই অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে মোহাম্মদ আলীকে পদচ্যুত করে তার ১২ বছর বয়স্ক নাবালক পুত্র আহম্মদ শাহকে ১৯০৯ সালে ইরানের সিংহাসনে বসান হয়। এভাবে ১৯০৯ সালে দ্বিতীয় সংসদ গঠিত হয় এবং মোহাম্মদ আলী শাহের সংক্ষিপ্ত স্বৈরাচারের (Lesser despotism-Istibdad-i-Saghir) পরিসমাপ্তি হয়। কাজার বংশের প্রবীন নেতা আসাদ-উল-মূলককে আহমদ শাহের রিজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। জেনারেল ওয়ালী খানকে প্রতিরক্ষা এবং সর্দার আসাদকে স্বরাষ্ট্রে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে স্বার্থের বিরোধ শুরু হলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হয়। এদিকে ইরানের অর্থনৈতিক সঙ্কট দূরীভূত হয়নি। এই পরিস্থিতির সুযোগে শাহ মোহাম্মদ আলী রাশিয়া থেকে দক্ষিণে আষ্ট্রবাদে আগমন করে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। ১৯১২ সালের জুন মাসে তার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি ব্রিটেন ও রাশিয়ার অনুরোধে সরকারি ভাতা লাভ করেন। দ্বিতীয় মজলিস প্রাক্তন শাহের ভাই সুজা-উস-সুলতানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। রাশিয়ায় অহেতুক হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে থাকে। রাশিয়ার চাপে আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ও সংস্কারক মরগান

www.pathagar.com

সুসতারকে পদত্যাগ করতে হয়। রাশিয়া ভবিষ্যতে কোন বিদেশী উপদেষ্টা নিয়োগের পূর্বে রুশ অনুমতি লাভের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; কিন্তু মজলিস এই দাবী প্রত্যাখ্যান করলে রাশিয়া সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাব্রিজ, রেসত ও এনজেরিতে অনেক উদারপন্থী নেতাদের হত্যা করে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়। সুসতার পদত্যাগ করে স্বদেশে চলে যান। ১৯১৪ সালের ২১ জুলাই আহম্মদ শাহের অভিষেকের সময় তৃতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকা হয় এবং এই অধিবেশন নভেম্বর পর্যন্ত চলে। উল্লেখ্য যে, প্রথম মহাসমরের প্রাক্কালে জাতীয় পরিষদ ডাকা হয় এবং শাহ এতে পারস্যের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেন।

সংবিধানিক আন্দোলনের ব্যর্থতা ঃ ইরানের মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় সংবিধানিক আন্দোলন এক যুগান্তকারী ঘটনা; মূলতঃ এশিয়ায় জাপানের পরেই জাতীয় সংসদ ও সংবিধান প্রবর্তিত হয়। পরপর তিনটি মজলিসের প্রতিষ্ঠা সাংবিধানিক ইতিহাসে খুবই বিরল; এতদসত্ত্বেও ইরানী জনগণের দৃঢ় মনোবল, আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মত্যাগ অস্বীকার করা যায় না। ইরানের সাংবিধানিক সঙ্কটের বিবিধ কারণ ছিল। যেমন–

১. সাংবিধানিক আন্দোলন ইরানী জনগণের সর্বস্তরে পৌঁছাতে পারেনি। মোটামোটিভাবে এটি ছিল শহর কেন্দ্রিক যেমন তেহরান, ইসফাহান, কুম, রেস্ত, তাব্রিজ ইত্যাদি।

২. মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় সার্বভৌম সংসদের ধারণা ও কার্যবিধি, মৌলিক আইন সম্বন্ধে জনগণের সঠিক ধারণা ছিল না।

৩. কাজার বংশ মূলত একটি ব্যক্তি কেন্দ্রিক রাজতন্ত্র ছিল, যা স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। নাসিরুদ্দীন শাহ গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেননা; কিন্তু তাঁর রাজত্বে আধুনিক ও পাশ্চাত্য চিন্তা, ধ্যান-ধারণার উন্মেষ হয়, যা মোহাম্মদ আলীর শাসনে সাংবিধানিক আন্দোলনের রূপ নেয়। কিন্তু দমন নীতির ফলে এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

৪. মোল্লা, উলামা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, এমন কি স্বীয় স্বার্থে কোন কোন মোল্লা, যেমন শেখ নূরী, রাজতন্ত্রের পক্ষে প্রচারণা চালান।

৫. ইরানী সংবিধান প্রণয়ন বা বাতিলের ক্ষেত্রে বিদেশী শক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য।

রুশ-ব্রিটিশ প্রভাব ঃ 'বাস্ত' এর এক পর্যায়ে ব্রিটিশ লিগেশন সংস্কারপন্থীদের আশ্রয় দেয়; রাশিয়ার ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের সাংবিধানিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে রাশিয়া ইরানী সংবিধান ও মজলিসকে সুনজরে দেখেনি। তাই তাদের সামরিক নেতা লিয়েকভ কশাক বিগ্রেডের সাহায্যে পার্লামেন্ট ধ্বংস করে দেন। মূলত রাশিয়া উদারপন্থী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করে। শাহ রাশিয়ার সমর্থন লাভ করেন, রাশিয়ায় বিতাড়িত হন এবং রুশ ব্যতীত অন্যান্য উপদেষ্টাদের বিশেষ করে মরগান সুসতারের প্রাধান্য খর্ব করার চেষ্টা করেন। সার্বভৌম সংসদ বিদেশী প্রভাব থেকে ইরানকে রক্ষা করে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করে। এমন কি সংবিধানের বিরোধিতা করায় আমিনুস-সুলতান মির্জা আলী আসকার খান নিহত হন।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

১৯০৭ সনের ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন

পটভূমি ঃ ১৯০৭ সালে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন ইরানের ইতিহাস একটি যুগান্তকারী ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দী ইরানের ইতিহাসে বৃহৎ শক্তিবর্গের দ্বন্দ্বের ইতিহাসে ইরানকে দাবার গুটির মত ব্যবহার করা হয়েছিল। এই বৃহৎ শক্তির মধ্যে একটি হচ্ছে ব্রিটেন এবং অপরটি রাশিয়া। নাসিরুদ্দীন শাহ এবং তার পুত্র মোজাফফর উদ্দীন শাহের রাজত্বকালে এই দুই ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে তাদের স্বার্থে ইরানে প্রভাব বলয় বিস্তারের যে প্রচেষ্টা হয় তা একদিকে যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে অন্যদিকে স্বাধীকার ও সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মারাত্মক বিভ্রান্তি ও বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি চরম আকার ধারণ করে তার নজীর রয়েছে ইরানের কাছ থেকে কে কত বেশি সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারবে তার উপর।

সুযোগ-সুবিধা আদায় ঃ

১. ১৮১০ সালে ইরানের সঙ্গে ব্রিটেনের তেহরান চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেন যখন আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে তখন রাশিয়া সন্ধিহান হলেও ১৮১২ সালে গুলিস্তানের চুক্তিতে ইরান উত্তরাঞ্চলের অনেক অঞ্চল রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

২. একদিকে ব্রিটেনের ব্যারন ডি রয়টারকে যেমন রেলপথ ও সড়ক নির্মাণের সুযোগ দেওয়া হয় তেমনি রাশিয়াও উত্তরাঞ্চলে আস্ত্রাবাদে রেলপথ নির্মাণ করতে থাকে। ব্রিটেনের মেসার্স লিঞ্চ ব্রাদার্স কারুন নদীর মোহনা থেকে ১১৭ মাইল জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। এমন কি তেল উত্তোলন, টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন, তামাক কনসেশন প্রভৃতি সুযোগ লাভ করে ব্রিটেন ইরানে প্রভাব বলয় বিস্তার করার চেষ্টা করে; অপরদিকে, রাশিয়া কশাক বিগ্রেড তৈরিতে ইরানের শাহকে সাহায্য করে, এমন কি অস্ত্রশস্ত্রও প্রদান করে।

৩. ব্যারন ডি-রয়টার যখন ইরানে জাতীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হন তখন রাশিয়াও ইরানে ডিসকাউন্ট ব্যাংক স্থাপন করে।

৪. বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে রাশিয়া ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে যায়। ব্রিটেন একটি নির্দিষ্ট ভাতা দিত শাহকে, কিন্তু ১৯০০ সাল রাশিয়া ইরানকে ৩২.৫ মিলিয়ন বা ৩২৫ লক্ষ রুবল ঋণ দেয়। এ ছাড়া রাশিয়া তাব্রিজ থেকে তেহরান পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ, উত্তরাঞ্চলে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানের সুযোগ পায়।

৫. নাসিরুদ্দীন শাহ রাশিয়ার উপর মারাত্মকভাবে নির্ভরশীল ছিলেন, যা ইরানীগণ সুনজরে দেখে নি; কারণ, এতে পরনির্ভরশীলতার পরিচয় পাওয়া

www.pathagar.com

যায়। লন্ডনে অবস্থানকারী ম্যালকম খান তার পত্রিকা 'কানুনের' মাধ্যমে ইরানের শাহকে বৈদেশিক ঋণের কুফল সম্বন্ধে হুশিয়ার করে দেন।

৬. সংসদীয় গণতন্ত্রের বুনিয়াদ হয় ইংল্যান্ডে এবং এই কারণে ব্রিটিশ উপদেষ্টাগণ ইরানে সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে আন্দোলনে সহায়তা দেন। তেহরানের ব্রিটিশ লিগেশনে আন্দোলকারীগণ আশ্রয় গ্রহণ করে, অন্যদিকে ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র শক্তি জাপানের নিকট রাশিয়া পরাজিত হলে বৃহৎ শক্তি হিসেবে ব্রিটেনের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়। এই পরাজয়ে জার মানসিকভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর সামরিক দুর্বলতাও প্রমাণিত হয়। উপরন্তু, ১৯০৫ সালে রাশিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে ইরানের সংবিধানিক আন্দোলনে রাশিয়া সমর্থন দেয়নি বরং মজলিস ধ্বংসের জন্য ১৯০৮ সালে জেনারেল লিয়াকভের নেতৃত্বে কশাক বিগ্রেড পাঠায়।

৭. ব্রিটেন ও রাশিয়ার বৈরীতা দূর করে মৈত্রী স্থাপনের অন্তরালে জার্মান ভীতি কাজ করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জার্মানী মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়। বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন এবং বিশেষ করে ইরানে জার্মান ইস্টার্ন ব্যাংক স্থাপনের পরিকল্পনায় রাশিয়া ও ব্রিটেন শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ দুই বৃহৎ শক্তি পারস্য উপসাগরে জার্মানদের উপস্থিতি মোটেই পছন্দ করেন নি। অন্য দিকে ব্রিটিশ ভারতের স্বার্থে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পারস্য উপসাগরে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। নাসিরুদ্দীন শাহের দরবারের ব্রিটিশ প্রতিনিধি মালিং এবং রুশ প্রতিনিধি হাটউইগের উপস্থিতির মূলেই ছিল শাহের নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় এবং সংবিধানিক সঙ্কটে তাকে পরামর্শ দেওয়া।

ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষর, ৩১শে আগস্ট, ১৯০৭ ঃ ই. জি. ব্রাউন বলেন, ইঙ্গ-রুশ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল দুটি বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করে কতিপয় বিষয়ের উপর সমঝোতা সৃষ্টি করা, যাতে ভবিষ্যতে উভয়ের মধ্যে কোন সংঘর্ষ না হয়। ১৯০৭ সালের ৩১শে আগস্ট তারিখে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল তিনটি। (১) ইরানের সার্বভৌমত্য রক্ষা করা এবং বিদেশী শক্তি ইরানের ভূখন্ড দখল করতে না পারে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, (২) রাশিয়া এবং ব্রিটেন ইরানের শাহকে সর্বোতভাবে ইরানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্য বজায়ের জন্য সাহায্য দেওয়া, (৩) উত্তর ইরানে রাশিয়ার, দক্ষিন-পূর্ব ইরান ব্রিটেনের প্রভাবাধীন থাকবে এবং মধ্যবর্তী অঞ্চল নিরপেক্ষ থাকবে। অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে ছিল; (১) ইরানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশীগণ শিল্প ও ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু ব্রিটেন ও রাশিয়ার ক্ষতিকারক কোন সুবিধা দেওয়া যাবে না, (২) ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্রিটেন ও রাশিয়া উদার ও বন্ধুসুলভ আচরণ করবে।

ইঙ্গ-রুশ চুক্তির ফলাফল ছিল মারাত্মক। লরেন্স লকেহার্ট এবং জে. এ. বয়েল বলেন যে, "১৯০৭ সালে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-রুশ চুক্তি ইরানে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল।" ("The Anglo-Russian Agreement which was concluded in 1907,

www.pathagar.com

caused consternation in Iran.") প্রথমত, ব্রিটেন ও রাশিয়ায় তাদের নিজেদের স্বার্থে এবং জার্মান ভীতির ফলে মোটামুটি একটি গোপন আলাপের মাধ্যমে শতাব্দীর বৈরীতা, দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘাত আকস্মিকভাবে মিটিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং পারস্য সরকার বা মজলিস মোটেই এ ব্যাপারে অবহিত ছিলনা। ইঙ্গ-রুশ চুক্তি যদিও ইরানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় তবুও মূলতঃ এটি ছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। লকেহার্ট এবং বয়েলের মতে, "যেভাবে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় তা ইরানের জন্য ছিল অপমানকর।" ("The manner in which it was concluded, was in itself an affront to Iran.") এই চুক্তির শর্তাবলীর কার্যকারিতা সম্বন্ধে ই. জি. ব্রাউন বিশ্লেষণ করে বলেন যে, ইরান ও আফগানিস্তানকে নিরপেক্ষ মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (buffer) হিসেবে রক্ষা করার দায়িত্ব থাকলেও মূলত বৃহৎ শক্তির স্বার্থে ইরানকে তিন টুকরো করা হয় ব্রিটিশ ও রাশিয়ার প্রভাব বলয় সৃষ্টির জন্য। এই দুই শক্তিশালী ইউরোপীয় সামরিক শক্তি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়; রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৫) রাশিয়ার জারের শোচনীয় পরাজয় এবং বোয়ার (দক্ষিণ আফ্রিকা) যুদ্ধে ব্রিটেনের বিপর্যয়। এই বিপর্যয় ইরানী সাংবিধানিক আন্দোলনে প্রভাব ফেলে। অপরদিকে, দুটি বিপর্যস্ত রাষ্ট্র মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ইরানকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে, জার্মানী ইরানে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাছাড়া, আমেরিকা ও জাপানের ইরানে প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নই আসে না। বস্তুত, ইরান ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইঙ্গ-রুশ শক্তির সংঘাতের 'দাবার গুটি' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং (১) ইরানের অজ্ঞাতে ইঙ্গ-রুশ চুক্তিতে মজলিসের জাতীয়তাবাদী সদস্যবর্গ সন্তুষ্ট হতে পারেনি; (২) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের জন্য উভয় শক্তির যৌথ পূর্ব অনুমোদন জটিলতার সৃষ্ট করে। এটি এক ধরনের যৌথ নিয়ন্ত্রণ (Dual control) বলা যায়, যার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ। সুতরাং প্রভাব বলয় সৃষ্টি এবং পূর্ব অনুমোদনের শর্ত ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনে। ইরানের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে এই চুক্তিকে হস্তক্ষেপ বলে চিহ্নিত করা হয়। ইসফাহান ও কেরমানশাহকে রাশিয়ার প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্তিকরণ ইরানকে বিভক্ত করার সামিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাংবিধানিক সঙ্কট ১৯০৭ সালে মোজাফফর শাহের আমলে চরম আকারে দেখা দিলে ব্রিটেন ও রাশিয়া ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। মূলত ১৯০৭ সালে ৮ই জানুয়ারি মোজাফফর শাহের মৃত্যুর পর উক্ত সালের ৩১শে আগস্ট তারিখে এই ঘৃণ্য চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়, যখন তাঁর পুত্র মোহাম্মদ শাহ ইরানের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। উল্লেখ্য, মোহম্মদ আলী শাহই প্রথম মজলিসকে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি উৎখাতের চেষ্টা করেন। ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনের ফলাফল ছিল এই যে, জার্মান ভীতি উভয় দেশকে নিকটতর করে আঁতাত কর্ডিয়াল (১৯০৪) স্বাক্ষরিত হওয়ার মাধ্যমে তা পরবর্তীতে ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনের উত্তরসূরী হিসেবে ট্রিপল আঁতাতে (১৯০৭) পরিণত হয়।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

পারস্যের অর্থনৈতিক পুর্নগঠনে মরগান সুস্তারের অবদান

পটভূমি ঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইরানে অর্থনৈতিক সঙ্কট মারাত্মক আকারে দেখা দেয়। সরকার দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং প্রশাসনিক সঙ্কট অর্থনৈতিক সঙ্কটকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের অর্থ পরিশোধে অপারগ ইরান আমেরিকার অর্থনীতিবিদ মরগান সুস্তারকে অর্থবিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে। সুস্তারের নিয়োগের পশ্চাতে ইরানের অর্থনৈতিক অচলাবস্থা এবং রাজনৈতিক সঙ্কট মূলত দায়ী। মোহাম্মদ আলী শাহের (১৯০৭-১৯০৯) রাজত্বকালে এই সঙ্কট চরম আকার ধারণ করে এবং তাঁকে পদচ্যুত করে তার স্থলে তাঁর নাবালক পুত্র আহামদ শাহকে (১৯০৯-১৯২৫) সিংহাসনে বসান হয়। ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইরানের অর্থমন্ত্রী সানী-উদ-দৌল্লাহ মজলিসে রাশিয়া থেকে ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু বিদেশী অর্থে নির্ভরশীল ইরান ক্রমশঃ দেওলিয়া হতে থাকে এবং সমগ্র দেশে রুশ বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। উপরন্তু, ১৯০৭ সালে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন মোতাবেক স্বাক্ষরকারী দেশের নিকট থেকে এককভাবে কোন বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ১৯১১ সালে জর্জিয়াবাসী দু'জন আততায়ী সানী-উদ-দৌল্লাহকে হত্যা করে। প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক মন্ত্রী সানী-উদ-দৌল্লাহর হত্যা ইরানের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায়, মজলিস মরগান সুস্তার নামে একজন প্রখ্যাত আমেরিকান অর্থনীতিবিদগকে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯১১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মজলিস মরগানের নিযুক্তি অনুমোদন করে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ ১৯১১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মাসে মজলিসের অনুমোদনক্রমে মরগান সুস্তার ইরানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্কট দূরীকরণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভেরী বলেন, "মরগান সুস্তারের ইরান পরিদর্শন ও কার্যক্রম পারস্যের অর্থনীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন বেসরকারি আমেরিকান বিশেষজ্ঞের প্রথম প্রয়াস।" তারপরে অপর যে আমেরিকান শেষ কাজার সুলতান আহাম্মদ আলী এবং রেজা শাহের রাজত্বে ইরানে আসেন তিনি হচ্ছেন ড. মিলসপাউ (Millspaugh)। এভেরী বলেন যে, "মরগান সুস্তার ইরানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্যাপক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে পথিকৃত ছিলেন।" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সুস্তার আমেরিকান সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন না; তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অর্থনৈতিক সংগঠনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ইরানের অর্থনৈতিক অবস্থায় প্রয়োগ করেন। ইরানের দ্বিতীয় মজলিস তাঁকে নিযুক্ত করেন। এই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নাসিরুল মূলক। সংসদে গণতন্ত্রপন্থীরা

www.pathagar.com

(Democrats) যার নেতা ছিলেন তাকিজদেহ, দেশ ত্যাগ করেন এবং নরমপন্থীদের (Moderates) মধ্যে বিরোধ বন্ধ হয়। একজন আমেরিকান অর্থনীতিবিদের ইরানের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ইরান উনবিংশ শতাব্দীতে ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অতিষ্ট হয়ে পড়ে। এই কারণে ইরান ইউরোপীয় দুটি বৃহৎ শক্তির পাশাপাশি তৃতীয় একটি শক্তি ব্যবহার করতে চাইত, যাতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস করা যায়। ইরান ব্রিটেন ও রাশিয়ার মত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিপরীতে একটি গণতান্ত্রিক ও উদারপন্থী দেশ থেকে উপদেষ্টা গ্রহণে আগ্রহী ছিল। এভেরী বলেন যে, আমেরিকান চিকিৎসক, মিশনারীগণ ও শিক্ষকবৃন্দ তাদের সততা ও একাগ্রতা দ্বারা ইতিপূর্বে ইরানের জনগণের হৃদয় জয় করে। ইতিপূর্বে ১৮৮৩ সালে নাসিরুদ্দীন শাহের আমলে জে. ভি. ডাবলু বেনজামিন নামে একজন আমেরিকান কূটনীতিবিদ আগমন করেন। এ ক্ষেত্রে আমেরিকান কংগ্রেসের অবদান রয়েছে। কংগ্রেসের অনুমোদনের সাপেক্ষেই বেনজামিন এবং সুস্তার ইরানে আসতে পারেন। বলাই বাহুল্য যে, সুস্তারের আগমনের পূর্বেই ইরানে অর্থনৈতিক দেওলিয়া শুরু হয়। রাশিয়া ইরানকে ১৯০০ সালে যে ঋণ দেয় এবং পরিশোধের জন্য যে ঘৃণ্য শর্ত আরোপ করে তাতে ইরানের সার্বভৌমত্বে আঘাত লাগে। অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে রক্ষা পাবার জন্য সুস্তারকে নিয়োগ করা হয়। ১৯১১ সালে তিনি তেহরানে আসলে উৎসাহী ও উৎগ্রীব ইরানীগণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। অবশ্য সকল শ্রেণীর লোকে তাঁর আগমন এবং ইরানের রাজস্ব ক্ষেত্রে তাকে জড়িয়ে পড়তে দেখে সন্তুষ্ট হয়নি। এই শ্রেণীর লোকেরা বকতিয়ারী গোত্রভুক্ত ছিল।

অর্থনৈতিক পদক্ষেপ ঃ মরগান সুস্তার ইরানের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দূর করে সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা সরকারের প্রশাসনকে শক্তিশালী করতে চান; কিন্তু ইরানের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না। তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল মজলিস অনুমোদিত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত করা। অর্থ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে রাজস্ব সুষ্ঠুভাবে আদায়ের মাধ্যমে দেওউলিয়াপনা দূরীকরণই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি কর্তব্য পালনের গোড়াতেই উপলব্ধি করেন যে, অর্থ দফতর পরিচালনার কোন নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট নিয়মকানুন ছিলনা। এমন কি দফতরের অবকাঠামোও ছিল না। সমগ্র দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল 'মুসতাউফী' নামধারী কতিপয় কর্মচারীদের উপর। 'মুসতাউফী' শব্দটির অর্থ রাজস্ব আদায়কারী। এই সমস্ত রাজস্ব আদায়কারী বংশপরম্পরায় কর্মরত ছিল এবং রাজস্ব এলাকা ও খাজনা আদায়ের সততার জন্য তারা সুপরিচিত ছিল। সুস্তার যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন কাজার পরিবারের সদস্য মুতাসিদুস-সালতানাহ আজারবায়জান প্রদেশের রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন। একটি রাজস্ব এলাকাকে বলা হত 'ইস্তাফা'। 'মুসতাউফীর' প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজস্ব আদায় এবং তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করতেন। কিন্তু রাজস্ব প্রদানকারী সরকারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব দিতেননা। এ ছাড়া নিম্নস্তরে কিছু দুর্নীতি ছিল। জমিদারশ্রেণী কখন কখন সরকারকে রাজস্ব দিতেননা এবং রাজস্ব প্রদান না করা বিদ্রোহের সামিল ছিল। মুসতাউফীদের একটি রেকর্ড বা 'সিয়াক' (Siyaq) রাখতে হত এবং রাজস্ব প্রদানকারী কি পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করে তা তাতে উল্লেখ থাকত। ইরানী সরকার

www.pathagar.com

বেলজীয় নাগরিক এম. নিউস (M. Naus)-কে শুল্ক বিভাগের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন। তিনি ১৮৯৯ সালে ইরানে আধুনিক হিসাবরক্ষণের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। সুস্তারের আগমনের পূর্বে ইরানের রাজস্ব ব্যবস্থার যে সংস্কার করা হয় তা হচ্ছে 'মুসতাউফী' কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে 'সিয়াক' এর পরিবর্তে দু'বার হিসাবরক্ষণ; প্রথমবার রাজস্ব আদায়কারীর পর্যায়ে এবং দ্বিতীয়বার অর্থ মন্ত্রণালয়ের পর্যায়ে। এ ছাড়া, রাজস্ব প্রদানকারীদের পূর্ণ তালিকা প্রণীত হয়। সংবিধান প্রবর্তিত হলে ভুসুক উদ-দৌল্লাহ অর্থমন্ত্রণালয়ে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করে রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতিগত উন্নতি করেন। কিন্তু তিনি যে সমস্ত রাজকর্মচারী বা আমলা নিযুক্ত করেন তাদের কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক ছিল না। উপরন্তু, তারা মোটা অঙ্কের বেতন ভোগ করতেন। সুস্তারের দু'বছর আগে এম. বিজো (M. Bizot) নামে একজন ফরাসী অর্থনীতিবিদ তেহরানে দু'বছর রাজস্ব আদায়ের পন্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন কিন্তু তাতে কোন সুফল হয় নি। এই ব্যবস্থাকে বলা হয়েছে 'মুনতাজিবে খিদমত' অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের বেতনভুক কর্মচারীবৃন্দ। মরগান সুস্তার রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনেন।

রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ঃ ১৯১১ সালের মে মাসে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে মরগান সুস্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করার সময় সমস্ত ইরানকে আটটি রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত করা হয়; (১) ফারস ও পারস্য উপসাগর; (২) আজারবায়জান ও কুর্দিস্তান; (৩) গিলান; (৪) মাজেন্দ্রান ও গুরগান; (৫) খুজিস্তান; (৬) বুরুজার্দ ও ইসফাহান (৭) তেহরানের মধ্যবর্তী অঞ্চল; (৮) কুম ও সাভে। সুষ্ঠুভাবে রাজস্ব আদায় পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ হিসাব বিভাগ নামে একটি দফতর স্থাপন করা হয়। এই বিভাগের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি দফতর ছিল কর্মচারীদের বেতন বা অবসর ভাতা প্রদানের জন্য। এ ছাড়া রাজস্ব সংক্রান্ত দুর্নীতি তদন্ত ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার তহবিল থেকে প্রদত্ত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য খরচপত্র ট্রেজারীতে প্রদত্ত চেকের মাধ্যমে দেওয়া হত। সুস্তার যোগদান করার পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল এবং আশা করা হয় যে, রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় দুর্নীতি নির্মূল করে রাজস্ব আদায়ের মাত্রা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত করার সকল পদক্ষেপ সুস্তার গ্রহণ করবেন। সুস্তার রাজস্ব মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠিত করে প্রাণসঞ্চার করেন। অপ্রয়োজনীয় বিভাগগুলো বিলুপ্ত করে সাধারণ হিসাবরক্ষণ বিভাগটি রাখা হয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন একজন মহাপরিচালকের দায়িত্বে সেটি ন্যস্ত হয়। সুস্তার এই বিভাগের নিয়ন্ত্রণ স্বহস্তে রাখেন। এই বিভাগের মহাপরিচালক ছিলেন আবদুল্লাহ মুসতাউফী। তিনি তার দফতর তেহরানের আতাবেক পার্কে সুস্তারের অফিসে স্থানান্তরিত করেন।

রাজস্ব সংস্কার ঃ ১৯০৭ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং দেশকে বৈদেশিক ঋণের ভার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। জাতীয় সংসদ যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা মোটামোটি নিম্নরূপ ঃ (১) রাজস্ব এলাকা পুনঃনির্ধারণ; (২) অবসর ভাতা ও অনুদানের পরিমাণ হ্রাস; (৩) নতুন কর (Levy) প্রবর্তন; (৪) বেতনের পরিবর্তে খাস জমি বণ্টনের ব্যবস্থা বাতিল। এ ব্যবস্থা 'টুয়ুল' (tuyul) নামে পরিচিত ছিল।

www.pathagar.com

১৮৭০ সালে দ্রব্যাদির স্থলে নগদ করের পরিমাণ নির্ধারণের যে পদ্ধতি প্রচলিত হয় তা বাতির ঘোষিত হয়। কাজারদের প্রবর্তিত এই সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির সহায়ক হবে ধারণা করা হয় এবং এই ব্যবস্থা 'টুয়ুলদার' (tuyuldars) নামে এক নতুন জোতদার শ্রেণী সৃষ্টি করে। পুরাতন পরিবর্তন রেট বা 'তাসির' (tasir) বাতিল করে সংবিধানপন্থীগণ অধিক মাত্রায় রাজস্ব আদায় করে বৈদেশিক ঋণ থেকে দেশকে মুক্ত করতে চান এবং দু'বৃহৎ শক্তি বা দৌলাতায়েনের ব্রিটেন ও রাশিয়ার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে চান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯০৮ সালে মোহম্মদ আলী শাহের রাজত্বকালে মজলিস বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত হলে প্রথম সংসদ বাতিল হয় এবং অর্থনৈতিক সংস্কার বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যাহোক, সুস্তার পরিবর্তন রেট নতুনভাবে প্রবর্তন করেন। কিন্তু রাজনৈতিক সঙ্কটের দরুন তাঁর সে প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়নি।

সুস্তারের অবদান ঃ মরগান সুস্তার অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহন করে অর্থ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা করেন। তিনি মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করে কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগরে সৃষ্টি করেন। এই বিভাগের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করা হয়। গতিশীলতার সৃষ্টির জন্য পুরাতন বৃদ্ধ কর্মচারীদের স্থলে নবীন, কর্মঠ ও বুদ্ধিদীপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। সুস্তারের সংস্কারের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল নগদ অর্থ আমদানি (cash flow) যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে লেনদেন করা সম্ভবপর হয়। সুস্তার বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ঋণ বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করতেন। মজলিসের অনুমোদনক্রমে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ইরানকে ১,২৫০,০০০ পাউন্ড স্টার্লিং ঋণ দান করে। এই ঋণ তিনি প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করতেন যাতে আর কোন ঋণ গ্রহন করতে না হয়। হিসাব পরিচালক আবদুল্লাহ মুসতাউফির ভাষায় সুস্তার ঋণের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ (to prime the pump) করার চেষ্টা করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, ঋণে জর্জরিত কোন দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করতে পারে না। দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি নিয়মিত নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব আদায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, রাজস্ব সুষ্ঠুভাবে আদায় হলে পরনির্ভরশীলতা কমে যাবে। এই ঋণের অর্থে সামরিক মন্ত্রণালয়ের বহু দাবি পূরণ করা হলেও অপচয়ের মাত্রা কমে যায়। এ ক্ষেত্রে সুস্তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। দেশ দেওলিয়া হয়ে গেলে ঋণ গ্রহণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে মনে হলেও এই ঋণের অর্থে সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া বেতন প্রদানের মাধ্যমে তাদের মনে আত্মবিশ্বাস ও কর্মস্পৃহা ফিরে আসে। কারণ, প্রশাসনিক অবকাঠামোতে গতিশীলতা আনতে হলে সরকারি কর্মচারীদের একনিষ্ঠ ত্যাগ প্রয়োজন। অভাব-অনটন, অনাচার ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে মনে করে সুস্তার অর্থ বন্টনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

ট্রেজারার-জেনারেল ঃ মরগান সুস্তার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Strangling of Persia," London 1912-তে ইরানের সাংবিধানিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গৃহযুদ্ধের মারাত্মক ও ভয়াবহ ফলাফলের উল্লেখ করে বলেন যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইরান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় (verge of economic

www.pathagar.com

collapse)। এই বিপর্যয় এড়াতে ইরান সরকার মরগান সুস্তারের সাহায্য কামনা করে। তিনি অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা (economic discipline) পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মজলিসের অনুমোদনের জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন, যার ফলে তিনি ইরানের ট্রেজারার-জেনারেলের পদ মর্যাদা লাভ করেন। ইরানে অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতার অধিকারী হলেন। রাজস্ব আদায়, হিসাবরক্ষণ, পরিদর্শন, আয়-ব্যয়ের খাত নির্ণয় ইত্যাদি সকল দায়িত্ব তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালের ১৩ই জুন তারিখে এই বিল পাস হয়। এভেরী বলেন যে, "এই বিল সুস্তারকে ইরানী সরকারের একজন অনুগত কর্মচারীর স্থলে নীতি নির্ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।" ("The Bill made Shuster rather more the master than the servant of the Iranian Government")। সুস্তার মধ্যমপন্থী বা moderates-দের উপেক্ষা করে গণতন্ত্রীদের (Democrat) সহায়তায় এই বিল পাস করেন। গণতন্ত্রীগণ তাদের স্বার্থে সুস্তারের হস্তে সর্বাধিক ক্ষমতা রাখার পক্ষপাতী ছিল না। বরং তারা লুয়াসের উত্তরসূরী মরনার্ডের (Mornard) অধীনে একজন কর্মচারী হিসেবে সুস্তারকে দেখতে চান, অবশ্য সুস্তার এই অধীনতা অস্বীকার করেন। ফলে, তিনি রাজনৈতিক চক্রের ষড়যন্ত্রে আবর্তিত হতে থাকেন। উপরন্তু, ইরানীগণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন বিদেশী সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী একজন উপদেষ্টার প্রতি বিরূপভাবাপন্ন ছিল। এর ফলে তাঁর অর্থনৈতিক মিশন ব্যহত হয়।

সুস্তারের পতন ঃ মরগান সুস্তার ইরানের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের চেষ্টায় সফলকাম হলেও, তার গৃহীত পদক্ষেপ তাঁর পতনকে ত্বরান্বিত করে; (১) তিনি সর্বময় ক্ষমতা লাভের জন্য ট্রেজারার-জেনারেলের পদ সৃষ্টি করে জনপ্রিয়তা হারান; (২) তিনি রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের আদায়কৃত অর্থ নিকটবর্তী ব্যাংকে জমা দিবার যে নির্দেশ জারী করেন তা সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী হয়নি, বিশেষ করে আজারবাইজানে। আজারবাইজানে মুতামিদুস সালতানা এবং তার দুই পুত্র সুস্তারের নির্দেশ অমান্য করেন; (৩) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রদেশসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে ট্রেজারী পুলিশ গঠিত হয়। অনেক উপজাতীয় গোষ্ঠী রাজস্ব প্রদানে অস্বীকার করলে এই বাহিনী পাঠানো হত; কিন্তু ইরানে অবস্থিত রুশ বাহিনীর সহায়তায় অনেক উপজাতীয় নেতা রাজস্ব প্রদান থেকে বিরত থাকে। ফলে, ট্রেজারী পুলিশের কার্যকারিতা ব্যহত হয়; (৪) মরগান সুস্তার ইরানী সংসদের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করলেও তিনি কার্যক্ষেত্রে একনায়কত্বের পরিচয় দেন। তিনি রুশবিরোধী ছিলেন এবং এই কারণে তিনি মেজর স্টোক নামে একজন ব্রিটিশ নাগরিককে ট্রেজারী পুলিশে কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। এই পদক্ষেপ ১৯০৭ সালে ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনের পরিপন্থী ছিল। উপরন্তু, ইরানের যে অঞ্চল রুশ প্রভাবাধীনে ছিল স্টোককে সেই অঞ্চলে নিয়োগ করা হলে রুশ বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করে। সঙ্কট এড়াবার জন্য ব্রিটিশ সরকার স্টোকের নিয়োগ অনুমোদন করেনি। অবশ্য স্টোকের নিয়োগের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে, তিনি পারস্য ভাষা জানতেন; (৫) ১৯১১ সালে নির্বাসিত প্রাক্তন শাহ মোহাম্মদ আলী রাশিয়া থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে দেশে উত্তেজনা ও অরাজকতা সৃষ্টি হতে থাকে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে সুস্তারের ঋণ গ্রহণের পরিকল্পনা ব্যহত হয়। এমতাবস্থায় উত্তরাঞ্চলে রাশিয়া তার অবস্থান সুদৃঢ় করে; (৬) স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে প্রাক্তন শাহ উত্তর-পশ্চিম খোরাসানের তুর্কোমান উপজাতীয়দের সমর্থন লাভের জন্য ধার নোট (Credit note) প্রদান করতে থাকেন। এর ফলে সুস্তার অনুসৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এভেরীর মতে, "প্রাক্তন শাহের প্রত্যাবর্তনে উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ইরানে যে আতঙ্ক এবং অস্থিরতা দেখা দেয় তার ফলে সুস্তারের দ্রুত ও সূক্ষ্ম অর্থনীতির বাস্তবায়ন ব্যহত হয় ("halted Shuster's swift but delicate restorative surgery on Iran's finance.")। এই সময়ে ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম আকার ধারণ করে। মরগান সুস্তার এই রাজনৈতিক অচলাবস্থায় ইরানী অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন; (৭) যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুস্তারের পতন হয় তা হচ্ছে বিতাড়িত শাহের ভ্রাতা বিদ্রোহী প্রিন্স সুয়ায়ুস সালতানার ভূ-সম্পত্তি ক্রোক করার প্রচেষ্টা। সুস্তারের প্রভাবে মজলিস প্রিন্স সুয়ায়ুস সালতানার তেহরানের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য একটি বিল পাস করে। এই নির্দেশ পালনের জন্য ট্রেজারী পুলিশের সহায়তায় সুস্তার সম্পত্তি ক্রোক করেন। উল্লেখ্য যে, প্রিন্স রুশপন্থী ছিলেন এবং রাশিয়া থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। সুতরাং সুস্তারের এহেন পদক্ষেপ রাশিয়াকে বিচলিত করে তোলে। সুস্তারের পুলিশ বাহিনী প্রিন্সের প্রাসাদের পাহারারত কশাক বিগ্রেডকে বিতাড়িত করে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। কিন্তু রুশ কনসুলেট থেকে প্রতিনিধি এসে সুস্তারের বাহিনীকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করে। রুশ কার্যকলাপ সার্বভৌম মজলিসের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ স্বরূপ, যা বখতিয়ারী শাসকবর্গ মোটেই পছন্দ করেননি। ১৯১১ সালের ২৯শে নভেম্বর রুশ সরকার ইরানী সরকারকে সুস্তারের পদচ্যুতির জন্য চাপ দেয়। রুশ সরকার চরমপত্র দিয়ে বলে যে তাদের দাবি যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে না পালন করা হয় তাহলে রাস্তে অবস্থিত রুশ সৈন্যবাহিনী তেহরানের দিকে অগ্রসর হবে এবং যাবতীয় সামরিক ব্যয় ইরান সরকারকে বহন করতে হবে। মজলিস ১৯১১ সালের ১লা ডিসেম্বর রাশিয়ার ঘৃণ্য চরমপত্রকে বাতিল ঘোষণা করে। ফলে ১২,০০০ সদস্যবিশিষ্ট রুশবাহিনী রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়। রুশ আগ্রাসনে ইরানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের বিভেদ ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হয়। এমন কি মহিলা সমিতিও এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে। ২৪শে ডিসেম্বর বখতিয়ারী প্রধানমন্ত্রী ও রুশপন্থী সামসামুস সালতানা 'ক্যু দে তা'র মাধ্যমে মজলিস ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত ক্ষমতা স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন। মজলিসের অবর্তমানে সুস্তারের অবস্থান খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে; কারণ তিনি মজলিস, মন্ত্রী পরিষদ নয়, কর্তৃক নিযুক্ত হন। নতুন মন্ত্রী পরিষদ সুস্তারকে পদত্যাগ করার জন্য বললে তিনি অস্বীকার করেন। ফলে ১৯১১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর সুস্তারকে বরখাস্ত করা হয়। সুস্তারের পদচ্যুতি রাশিয়ার আগ্রাসন নীতির প্রতিফলন।

মরগান সুস্তার ইরানের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করেন কিন্তু প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য তিনি ব্যর্থ হন।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

ইরান ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯১৪ সনে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইরান তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে। কিন্তু এ নিরপেক্ষতা ঘোষণা ছিলো নিরর্থক কারণ এ সময় দেশটি বিদেশীর শক্তির আওতাধীন এবং বিদেশী সৈন্যদের পদানত ছিল। বলা বাহুল্য যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব থেকে তেলসমৃদ্ধ ইরানে প্রভাব বলয় সৃষ্টির জন্য রাশিয়া এবং ব্রিটেন প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। কিন্তু জার্মানির বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনে তারা কোন প্রকার সংঘাতে যায় নি। ইরানের শাসনতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের যে প্রয়াস রাশিয়া করছিল তাতে ব্রিটেন কোন বাধা দেয়নি। অন্যদিকে ১৯০১ সনে ব্রিটিশ নাগরিক উইলিয়াম নকস দ্যা আর্চি ইরানের তেল সন্ধান আহরণ ও বাজারজাত করার জন্য ইরানি সরকারের সাথে যে চুক্তি করে রাশিয়া তাতে কোন আপত্তি জানায়নি। মসজিদ-ই-সুলায়মানে তেল আবিষ্কৃত হলে ইরান এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানী গঠিত হয়। ব্রিটিশ এবং রুশদের স্বার্থান্বেষী মনোভাবে ইরানী জনগণ উপলব্ধি করে যে, পরাশক্তি ইরানের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করার ষড়যন্ত্র করছে। ইরান সরকার যখন বুঝতে পারল যে ইরানের তেল লুট করার ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানীর মূখ্য উদ্দেশ্য তখন তা প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফী আন-মামালিক জার্মানির সাথে এক গোপন চুক্তি করেন। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী জার্মানী ইরানের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। এ ছাড়া জার্মানী ইরানকে অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয়ের জন্য অর্থ মঞ্জুর করার অঙ্গিকার করে।

প্রথম মহাসমরের সময়ে ইরানে ব্রিটিশ, রুশ ও জার্মান প্রভাব বিস্তারের এক অশুভ পায়তারা চলতে থাকে। এ তিন পরাশক্তি পরস্পরের প্রতি সন্দেহপরায়ন ছিল। কাজউইনে অবস্থানরত রুশ বাহিনী রাজধানী তেহরানের দিকে অগ্রসর হলেও জার্মান রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতায় ইরানের সরকারী দফতরসমূহ ইসফাহানে সরিয়ে নিবার প্রয়াস দেখা যায়। কিছু কিছু সরকারি বিভাগ এবং জার্মান, অষ্ট্রীয় ও অটম্যান তুরস্কের দূতাবাস তেহরান ত্যাগ করলেও ব্রিটেন এবং রাশিয়ার দূতদ্বয় তরুণ ইরানী শাসক আহমদ শাহকে রাজধানী তেহরানে অবস্থান করার পরামর্শ দেন। এর ফলে জার্মান পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে জার্মান রাষ্ট্রদূত কুমে একটি বিকল্প ইরানী সরকার গঠন করতে সহায়তা করেন। এই অস্থায়ী বিকল্প সরকার পরে কেরমানশাহে স্থানান্তরিত হয়। নিযাম আস সালতানাকে এই সরকারের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। এর ফলে ইরানে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠিত হয়।

www.pathagar.com

ইরানে রুশ ও ব্রিটিশ প্রভাব সীমিত করার জন্য জার্মান সরকার ইরানে পরপর কয়েকটি কূটনৈতিক মিশন পাঠান। জার্মান দূতাবাসের সামরিক উপদেষ্টা কাউন্ট কনিৎজ সর্বাত্মক কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। ইরানে প্রেরিত জার্মান মিশনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল কুর্দ ও লূরদের মধ্যে প্রেরিত ক্লাইন (Klein), ইসফাহান ও কিরমানে জুগমেয়ার (Zugmeyer), ইয়াজদ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিয়াখ (Biach) এবং বখতিয়ারী ও কাশফাই গোত্রের নিকট ওয়াস্‌সাম (Wassmus) মিশন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ইরানে জার্মান কূটনৈতিক মিশনসমূহের তৎপরতা খুবই কার্যকরী হয়, বিশেষকরে জার্মান কনসাল কর্নেল ওয়াস্‌মাস এ ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। জার্মান মিশনসমূহ দক্ষিণ ইরানে ব্রিটিশ প্রভাব হ্রাস করতে সক্ষম হলে ব্রিটিশ সরকার পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মেসোপটেমিয়া ফ্রন্ট থেকে এক প্লাটুন সৈন্য ইরানের দক্ষিণে পাঠায়। এর মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণে, বিশেষ করে পারস্য উপসাগরে অবস্থিত মূল্যবান তেল খনিগুলোকে সংরক্ষণ করা। ১৯১৬ সনে ব্রিটিশ সরকার স্যার জেনারেল পারসী সাইক্‌সকে দক্ষিণ ইরানের একটি সামরিক মিশনের প্রধান করে পাঠান। তিনি চতুরতার সাথে দক্ষিণ পারস্য বাহিনী নামে স্থানীয় গোত্রগুলো থেকে লোক নিয়ে এক বাহিনী গঠন করেন। এর ফলে দক্ষিণ ইরানে গোত্রসমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং জার্মান প্রভাব হ্রাস পায়। উল্লেখ যে, দক্ষিণ পারস্য বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাইক্‌স এই বাহিনীর সাহায্যে গুপ্তচর বৃত্তিতে নিয়োজিত জার্মান চরদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হন।

ইরানের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ আজারবাইজানে রুশ ও তুর্কী বাহিনীর মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হতে থাকে আধিপত্যবাদকে কেন্দ্র করে। এর ফলে ব্যাপক প্রাণহানী ও ক্ষয়ক্ষতি হয়। আজারবায়জান বিশেষ করে ট্রান্সককেশীয় অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ হয়। আর্মেনীয়, জর্জীয় ও আজারবায়জানী জনগোষ্ঠী ১৯১৭ সনের ডিসেম্বরে একটি পার্লামেন্ট গঠন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এই অঞ্চল থেকে রুশ বাহিনীকে প্রত্যাহার করা হলে তুর্কী বাহিনী তাদের আধিপত্য কায়েম করে। জর্জিয়া ও আর্মেনীয়গণ তুরস্কের সম্প্রসারণবাদে বিঘ্ন সৃষ্টি করলেও আজারবায়জানীগণ তাদের পূর্ণ সহযোগিতা দান করে। এর ফলে আজারবায়জানে সীমানা বৃদ্ধি পেয়ে তাদের স্বাধীনতা লাভের আশা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। অপর দিকে ট্রান্সককেশীয় ফেডারেশনের অপর দুই গোষ্ঠী জর্জীয় ও আর্মেনীয়গণ আজারবায়জানীদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে জর্জিয়া একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। জর্জীয়া জার্মানীর সাহায্য কামনা করে। ১৯১৮ সনের মে মাসের ২৬ ও ২৮ তারিখে যথাক্রমে আজারবায়জান ও আর্মেনীয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। জর্জীয়া সরকারের অনুরোধে কর্নেল ক্রেস ফন ক্রেমেনস্টাইনের নেতৃত্বে একটি জার্মান বাহিনী জর্জিয়ায় আসে এবং বতুল দখল করে। এর ফলে ট্রান্সককেশীয় অঞ্চলে তুর্কী প্রভাব সীমিত হয়ে পড়ে।

নব্যতুরস্ক সরকার প্যান তুরানবাদ বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের জন্য আজারবায়জান সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করতে থাকে। আজারবায়জান এবং ককেশীয় অঞ্চলের

www.pathagar.com

মুসলিম অধ্যুসিত অঞ্চলে 'ইসলামী বাহিনী' নামে এক সংগঠন তৈরি করে। এই বাহিনী গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাকু দখল করে কাস্পিয়ান সাগরের আশেপাশে মধ্য-এশিয়ার তুর্কী বংশোদ্ভূত লোকদের সহায়তা দান করে। তাছাড়া তুর্কী বাহিনী নব গঠিত 'ইসলামী বাহিনী' গঠন দ্বারা মধ্য-এশিয়ায় রুশ প্রভাব নির্মূল করা। বাকু দখল হলে মহাসমরের মিত্র জার্মানী শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং বাকুকে রক্ষা বা উদ্ধার করার জন্য রাশিয়ার সাথে সামরিক চুক্তি করে। জার্মানি আজারবায়জানের মূল্যবান তেল সম্পদ করায়ত্ত করার জন্য স্বীয় স্বার্থে এই চুক্তি করে। কিন্তু পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জার্মানির এই দূরভিসন্ধি কার্যকর হয়নি। অপরদিকে মধ্য-এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ আজারবায়জান অঞ্চলে জার্মানি ও রাশিয়ার সম্প্রসারণবাদে ব্রিটেন বিচলিত হয়ে পড়ে। তাদের আধিপত্যবাদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য ব্রিটেন মেজর জেনারেল এন. সি ডানস্টারভিনের নেতৃত্বে একটি বাহিনী আজারবায়জানে প্রেরণ করে। কিন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই অভিযান সফল হয়নি। এর ফলে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখে তুর্কী ও ইসলাম বাহিনী যৌথভাবে আক্রমণ পরিচালনা করে বাকু দখল করে। এর ফলে ককেশীয় অঞ্চলে তুর্কী সরকারের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এদিকে বাকু অধিকৃত হলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে মনে করে ব্রিটেন ইরানের সমগ্র পূর্ব সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করে। এটি 'পূর্ব পারস্যের বেড়া' (East Persia Cordon) নামে পরিচিত। ব্রিটেনের আশঙ্কা ছিল যে, তুরস্ক কাস্পিয়ান সাগর অতিক্রম করে মধ্য-এশিয়া দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু এটি অলীক আশংকা মাত্র।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

১৯২১ সালের রুশ-পারস্য চুক্তি

পটভূমি ঃ উনবিংশ শতাব্দীর ইরানের ইতিহাস ইঙ্গ-রুশ প্রভাব বলয় বিস্তারের ইতিহাস। এই সময় ইরানকে বৃহৎ শক্তির চক্রান্তের 'দাবার গুটি'র মত ব্যবহার করা হয়। ১৯০৭ সালে ইঙ্গ-রুশ চুক্তি সম্পাদিত হলেও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যহত থাকে। রাশিয়ার প্ররোচনা ও সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলেই আমেরিকান অর্থনীতিবিদ মরগান সুস্তারকে ১৯১১ ইরান থেকে বিদায় নিতে হয়। তার আগে রুশ কশাক বিগ্রেডের নেতা লিয়াখভের সাহায্যে ইরানী মজলিস বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়। ১৯০৯ সালের ১৫ই নভেম্বর মোহাম্মদ আলী শাহ নির্বাসিত হলে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসান হয়। তিনি রিজেন্টের মাধ্যমে দেশ শাসন করেন। ১৯১৪ সালের ২১শে জুলাই আহামদ শাহের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় এবং তৃতীয় মজলিসের সভা ডাকা হয়। লক্ষনীয় যে, এই সময় প্রথম মহাসমর শুরু হয়ে গেলে শাহ ইরানের নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করেন। ১৯১৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তৃতীয় মজলিস কার্যকরী ছিল। প্রথম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে প্রথম মহাসমর চলাকালীন সময়ে পারস্য এক আন্তর্জাতিক সঙ্কটে ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয়। সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈরাচারী জারের পতনে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব শুরু হয়। সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ লেনিন রাশিয়ায় জারের শাসনের উচ্ছেদ কল্পে কার্যাবলী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯১৮ সালে বলশেভিক সরকার ইরানকে প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা বাতিল করে। কমিউনিষ্ট সরকার ১৯০৭ সালে সম্পাদিত ইঙ্গ-রুশ চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পতনে ইরানের সঙ্গে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ১৯২০ সালে বাকুতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে রুশ সরকার উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নীতি বর্জন করে পারতপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কটাক্ষ করে।

রুশ কমিউনিষ্ট সরকার ঃ রাশিয়ার নতুন ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিপ্লবী সরকার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুসুলভ ও পারস্পরিক মর্যাদার ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে। রাশিয়া তার প্রতিবেশী তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী ও পরস্পরের সমঝোতার মাধ্যমে নতুন চুক্তি সম্পাদনের আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৯২০ সালের ২০শে অক্টোবর মুসির উদ-দৌল্লাহ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মস্কোতে রাশিয়ার সাথে মৈত্রী চুক্তির ব্যাপারে প্রাথমিক আলাপ হয়। কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থ হয়। ইরানের পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ নেন মুসাভিরুল মামালিক। ১৯২০ সালের ১৮ই মে রুশ নৌ-বহর কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী এনজিলীতে অবতরণ করে এবং ইরানের রাজদ্রোহী কুচিক খানকে রাশিয়া সাহায্য করলে ইরানী সরকার এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তিনি ৬০০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী গঠন করে রাশিয়ার

www.pathagar.com

সহায়তায় ইরানী সরকার উৎখাতের চেষ্টা করেন। কুচিক খানের সঙ্গে সমঝোতা করে ১৯২০ সালের ১৮ই মে রুশ বাহিনী এনজেলীতে অবতরণ করে। কুচিক খানের সহায়তায় রাশিয়া গিলানে একটি রুশ প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু রাশিয়ার আগ্রাসন নীতিতে শঙ্কিত হয়ে কুচিক খান সাময়িকভাবে তাঁর নীতি পরিবর্তন করলেও রুশ বাহিনীর সাথে যৌথভাবে এজেলীতে অবরোধ সৃষ্টি করেন। যা হোক, ইরানী সরকার কশাক ব্রিগেডের সাহায্যে বিশেষ করে রেজা খানের প্রচেষ্টায় রুশ ও কুচিক খানের বাহিনীকে ১৯২১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর পরাস্ত করেন। গিলানে ইরানী আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং কুচিক খান পলায়ন করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর মাথার খুলী রেজা খানের নিকট আনা হয়। ফলে, ইরানের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি হয়। যা হোক, ইরানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন নীতির মূলে দুটি কারণ ছিল; (১) রাশিয়ার নতুন কমিউনিষ্ট সরকার ইরানের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তির জন্য সামরিক চাপ প্রদান; (২) ব্রিটেনকে তার সৈন্যবাহিনী, যা দক্ষিণাঞ্চলে ছিল, প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি। রুশ খসড়া চুক্তি প্রচারণার মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে সদ্ভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করে। রুশ যোগাযোগকারী ছিলেন টিচিচেরিন (Tchicherin)। তিনি ঘোষণা করেন যে, নবগঠিত সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি হচ্ছে ইরানের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তির সম্পাদন করা, যাতে ইরানে স্বাধীনতা, রাজনৈতিক একতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে। অবশেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর রাশিয়ার সাথে ইরানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

রুশ-পারস্য চুক্তির শর্তাবলী ঃ পিটার এভেরী তাঁর 'Modern Iran' গ্রন্থে ১৯২১ সালে সম্পাদিত রুশ-পারস্য চুক্তির শর্তাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেন। মস্কোতে ১৯২১ সালে ২৬শে ফেব্রুয়ারি এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং স্বাক্ষর দান করেন রাশিয়ার পক্ষে টিচিচেরিন (Techicherin) এবং ইরানের পক্ষে মুসাভভিরুল মামালিক।

এই চুক্তির ধারাগুলি হচ্ছে ঃ

১. রুশ বিপ্লবী কমিউনিষ্ট সরকার পূর্ববর্তী জার সরকার কর্তৃক অনুসৃত উপনিবেশিক (Colonialism) নীতি বর্জন করবে। সেই সাথে জার শাসিত রাশিয়ার সকল চুক্তি বাতিল ঘোষিত হবে।

২. এশিয়ার জনগণের স্বার্থ রক্ষার নামে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে স্বাক্ষরিত জার শাসিত রাশিয়ার চুক্তিসমূহ বাতিল করা হবে। এই সাথে ইরানের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী সকল প্রকার চুক্তিতে রাশিয়ার অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। ইরান সংক্রান্ত তৃতীয় শক্তির সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধি বর্জিত হবে।

৩. ১৮৮১ সালে যে রুশ-পারস্য সীমান্ত নির্ধারিত হয় তা বলবৎ করা হবে। সেই সঙ্গে ক্যাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণাঞ্চলে আশুবাদা এবং অন্যান্য দ্বীপাঞ্চলে রাশিয়া তাবেদারি পরিত্যাগ করবে। পারস্য সারাখের (Sarakhs) উপর রুশ কর্তৃত্ব মেনে নেবে। এ ছাড়া আটরাক (Atrek) নদীসহ সীমান্ত নদীসমূহ রাশিয়া ও পারস্য উভয়ে ব্যবহার করতে পারবে। সীমান্ত বিরোধ নিরসনের জন্য যৌথ কমিশন গঠন করা হবে।

www.pathagar.com

৪. পারস্য ও রাশিয়া উভয়ে উভয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

৫. উভয় দেশের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে তারা নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে; (১) পারস্য ও রাশিয়া উভয়ে উভয়ের স্বার্থের বিরোধী কোন সংগঠন বা গোষ্ঠী গঠনে সহায়তা করবে না অথবা এই দুই দেশের মিত্রদের বিরুদ্ধে কোন বিরোধী বা সন্ত্রাসী দল গঠন করতে সাহায্য করবে না; (২) উভয় দেশের অভ্যন্তরে অপর কোন তৃতীয় শক্তির উপস্থিতি বন্ধ করতে হবে, বিশেষ করে এরূপ কোন শক্তি, যা সীমান্ত লঙ্ঘনের হুমকী দিতে পারে; (৩) উভয়ের অঞ্চল দিয়ে অপর কোন দেশের মালামাল স্থানান্তরিত করা যাবে না, যা উভয়ের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে।

৬. যদি কোন তৃতীয় শক্তি অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে পারস্য আক্রমণের পরিকল্পনা করে অথবা কোন বিদেশী শক্তি রুশ-পারস্য সীমান্তে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ালে পারস্য সরকার যদি তা নিরসনে ব্যর্থ হয় তা হলে পারস্য সরকারের অনুরোধে রুশ সরকার পারস্যে সৈন্য পাঠিয়ে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। অবশ্য আগ্রাসন বন্ধ হয়ে গেলে রুশ সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে।

৭. উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তানুযায়ী কাস্পিয়ান সাগরে অবস্থানরত রাশিয়ার বিরোধিতাকারী পারস্য নৌবহরে অংশগ্রহণকারী বিদেশীদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হবে।

৮. জার সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত রাশিয়ার অর্থনৈতিক নীতি বর্জন করে পারস্যকে পূর্বের মত ঋণ প্রদান করে রাশিয়ার অধীন করা হবে না। পূর্বের সমস্ত ঋণ এবং অনুদান বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯. রাশিয়া ডিসকাউন্ট ব্যাংকের সম্পদ, দায় দেনা পারস্যকে ছেড়ে দিবে কিন্তু মাত্র একটি বাড়ি রুশ কনসুলেটের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

১০. রাশিয়া তার নির্মিত এনজেলী-তেহরান এবং কাযউইন-হামাদন সড়ক; জুলফা-তাব্রিজ-সুফিয়ান-উমুরিয়া রেলপথ, উমুরিয়া হ্রদের বার্জগুলো টেলিগ্রাফ লাইন, এনজেলী নৌবহর এবং বৈদ্যুতিক কেন্দ্রসমূহ পারস্যকে অর্পণ করবে।

১১. ১৮২৮ সালে রাশিয়ার সঙ্গে পারস্যের ঘৃণ্য তার্কুমানচাই সন্ধি বাতিল ঘোষণা করা হবে এবং কাস্পিয়ান সাগরে ইরানের নৌবহর চলাচল করতে পারবে।

১২. জার সরকারকে প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা বাতিল ঘোষিত হবে এবং রুশ দখলে ইরানের সকল সম্পত্তি কেবলমাত্র রুশ কনসুলেট ব্যতীত ইরান সরকারকে হস্তান্তর করা হবে। রাশিয়া তেহরানের অনতিদূরে জারগানদারের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিবে। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ লিগেশন গুলহাকে অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

www.pathagar.com

১৩. উপরোক্ত অনুচ্ছেদের বরাতে আরও বলা হয় যে পূর্বের রুশ অধীনস্ত কোন অঞ্চল বা রুশ দখলে কোন সম্পত্তি কোন তৃতীয় শক্তিকে দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে তৃতীয় শক্তি বলতে ব্রিটিশ সরকারকে বোঝানো হয়েছে।

১৪. এই অনুচ্ছেদে কাস্পিয়ান সাগরে ইরানী মৎসজীবীদের অবাধে মৎস্য শিকার করার অধিকার থাকবে।

১৫. জারের আমলের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বাতিল করা হবে এবং এই সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্কুল ও বিদ্যাপিঠ হিসেবে ব্যবহারের জন্য ইরানী কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

১৬. এই অনুচ্ছেদে সর্বপ্রকার অতিরাষ্ট্রিক (extra-territorial) অধিকার বর্জিত হবে।

১৭. উভয় দেশের নাবিকদের সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ অথবা এর পরিবর্তে অর্থদানের যে নীতি ছিল তা থেকে জনগণকে অব্যহতি দেওয়া হবে।

১৮. উভয় দেশের নাগরিকদের পরস্পরের দেশের ভ্রমণের সমান সুযোগ-সুবিধা থাকবে এবং এর মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুসুলভ আচরণ গড়ে উঠবে।

১৯. এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিধি মেনে চলা হবে। আমদানি-রপ্তানি, অর্থ বিনিয়োগ ও পরিশোধ ব্যবস্থা, শুল্ক ইত্যাদি উভয় দেশের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত বাণিজ্যিক কমিশন নির্ধারণ করবে।

২০. আন্তর্জাতিক নিয়মমাফিক মাল পারাপারের জন্য (transit) উভয় দেশের সমান অধিকার থাকবে।

২১. উভয় দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ডাক ও টেলিগ্রাফ লাইন চালু করা হবে।

২২. উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায়ের জন্য দূত বিনিময় করা হবে।

২৩. উপরের ধারার বাস্তবায়নে উভয় দেশের কনসুলেট প্রতিষ্ঠিত হবে।

২৪. এই চুক্তি উভয় দেশ কর্তৃক তিন মাসের মধ্যে অনুমোদিত হবে।

২৫. চুক্তিটি রুশ ও পারস্য উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হবে, যাতে উভয় দেশের জনগণ এই চুক্তির মর্ম উপলব্ধি করতে পারে।

সুফল ঃ ১৯২১ সালে রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি উভয় দেশের মধ্যে দীর্ঘ দিনের বৈরীতা ও শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব দূরীকরণে সাহায্য করলেও, চুক্তিটির বিভিন্ন অনুচ্ছেদে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে, চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল রাশিয়ার স্বার্থে এবং ব্রিটেনকে কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যে। অবশ্য বৃহৎ শক্তির প্রভাব বলয়ের 'দাবার গুটি' হিসেবে ব্যবহৃত ইরান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক প্রগতি ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মর্যাদা লাভ করেছিল। বস্তুত, উনবিংশ শতাব্দীর ইরানের ইতিহাস বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস। রাজনৈতিক অচলাবস্থা

www.pathagar.com

ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে ইরান ব্রিটেন ও রাশিয়ার নানা ধরনের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়। ১৯২১ সালের চুক্তি দৃশ্যত ঃ ১৮২৮ সালের রুশ-ইরান তুর্কোমানচাই চুক্তি এবং ১৯১১ সালের ইঙ্গ-রুশ চুক্তিকে বাতিল করে। ইরান থেকে রাশিয়া তার সেন্যবাহিনী প্রত্যাহার করলে ব্রিটেনও তার বাহিনী সরিয়ে নেয়। ১৯২১ সালের চুক্তি পরবর্তীকালে ১৯২৫ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে সম্পাদিত পারস্য, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের মধ্যে একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করে। এই চুক্তির ফলে পূর্বের ঘৃণ্য ক্যাপিচুলেসন প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং ইরান একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে।

কুফল ঃ অনুচ্ছেদে ৫-এ স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে যে, কোন তৃতীয় পক্ষ ইরান ও রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা। এই শর্ত বিশেষভাবে ব্রিটেনের দিকে ইঙ্গিত করে। এই ধারার পাশাপাশি অনুচ্ছেদে ৬ এ উল্লেখ আছে যে, যদি কোন বৈদেশিক শক্তি ইরান আক্রমণ করে তা হলে ইরান সরকারের আমন্ত্রণে রাশিয়া হস্তক্ষেপ করবে। এই ধারাটিও ব্রিটেনের হস্তক্ষেপের দিকে ইঙ্গিত করছে। মূলতঃ ব্রিটেন যেমন রুশ ভাল্লুকের থাবার জন্য শঙ্কিত ছিল অনুরূপভাবে রাশিয়াও পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সিংহের গর্জনে ব্যতিব্যস্ত ছিল। ইরানী সশস্ত্র বাহিনীতে বিদেশীদের অংশগ্রহণের যে ধারা অনুচ্ছেদ ৭-এ আছে সেটাও স্পষ্টতঃ ব্রিটিশ সামরিক হস্তক্ষেপকে ইঙ্গিত করছে। অবশ্য উভয় দেশের সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার কথা থাকলেও রুশ কশাক বিগ্রেড উত্তরাঞ্চলে অবস্থান করছিল। বিদ্রোহী ইরানী নেতা কুচিক খান রাশিয়ার সহায়তায় ১৯১৯-২০ সালে ইরানে অরাজকতা সৃষ্টি করলে রেজা খান তাকে পরাজিত করেন। ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে রুশ-ইরান বাণিজ্যিক সম্পর্কের উল্লেখ আছে যা পূর্বের ১৮২৮ সালের তুর্কোমানচাই চুক্তি এবং ১৯০২ সালের ট্যারিফ কনভেনশনের পুনরাবৃত্তি। মূলতঃ ব্রিটেন অপেক্ষা রাশিয়া ইরানের নিকট থেকে ব্যবসায়িক সুবিধা অধিক অর্জন করে। এই পক্ষপাতিত্ব বিশেষ করে রুশ পণ্যের জন্য স্বল্প শুল্ক নির্ধারণ ইরানী ব্যবসায়ীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই শর্তের ফলে ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ইরানী ব্যবসা-বাণিজ্য মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রেজা খান তাঁর উপদেষ্টা তৈমুরতাশকে মস্কোতে পাঠান। জারের আমলে ইরানের উপর স্বল্প ও সুবিধাজনক ট্যারিফ নির্ধারিত হলে প্রতি বছর ইরানে এক মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হতে থাকে। অপরদিকে সুবিধাভোগকারী দেশ রাশিয়া অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হতে থাকে। ১৯২১ সালের চুক্তির ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, রুশ ডিসকাউন্ট ব্যাংকের যাবতীয় সম্পত্তি ইরান সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে রাশিয়াকে ইরানে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। যদিও সকল প্রকার সামরিক কর্মকাণ্ড (অনুচ্ছেদ ৭) বন্ধ করার ধারা ছিল তবুও বিদেশী লিগেশনে ইরানী রাজনীতিবিদেরা যাতে আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য দূতাবাসগুলোকে সৈন্যসামন্ত দ্বারা সুরক্ষিত রাখা হত। মজলিসে ১৯২২ সালের চুক্তিটি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হলে এর ধারাসমূহ পুঙ্খনুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়। গণতন্ত্রীদলের তাকীজাদেহ এই চুক্তির বিরোধিতা করে বলেন যে, ৫ এবং ৬ নম্বর

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদে রাশিয়াকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেওয়া হয়, যা ইরানের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করবে। এ ছাড়া ১৯২১ সালের চুক্তিটি রাশিয়ার জন্য প্রচারণা গুরুত্ব (Propaganda value) ছিল। এই প্রচারণার মূলে দুটি উদ্দেশ্য ছিল ঃ (১) ব্রিটিশ প্রভাবকে খর্ব করা এবং (২) ইরানে রুশ প্রভাব বৃদ্ধি করা। এ কারণে বাগদাদ থেকে তেহরান পর্যন্ত সড়ক পথে যাতায়াতের জন্য ইঙ্গ-পারস্য ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করা হয়। এই ধরনের বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব প্রবল আকার ধারন করে। এভেরীর ভাষায়, "Xenophobia was given a wider rein"। উল্লেখ্য যে, রেজা শাহ ক্ষমতালাভ করার পর ইরানকে বৈদেশিক প্রভাব বলয় থেকে রক্ষার জন্য ১৯১৯ সালে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-পারস্য চুক্তি এবং ১৯২১ সালে সম্পাদিত রুশ-পারস্য সন্ধি বাতিল ঘোষিত হয়।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

রেজা খানের অভ্যুত্থান এবং পাহ্লভি বংশ

পটভূমি ঃ প্রাচীন পারস্য অর্থাৎ বর্তমানের ইরান ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ। বহু প্রাচীন রাজবংশ পারস্যে রাজত্ব করে সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তোলে। সর্বপ্রাচীন একামেনীয় বংশের প্রতাপশালী সম্রাট সাইরাস ও দারায়ুস তৎকালীন গ্রিক সাম্রাজ্যের জন্য ছিলেন বিভীষিকা। একামেনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী পার্সিপলিস ধ্বংস করে গ্রিক দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডার খ্রিঃ পূর্ব ৩৩৯ অব্দে পারস্য দখল এবং তার সেনাপতি সেলুকাস সেলুসিড বংশ স্থাপন করেন। এই সময় থেকেই পারস্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এমনকি পার্থিয়ান (খ্রিঃ পূর্ব ২৫০-২২৬ খ্রি.) এবং সাসানীয় (২২৬-২৫২ খ্রি.) যুগেও প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের মিলন ঘটে। পারস্য মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে এবং সা'দ-বিন-আবি ওয়াক্কাস সাসানীয় রাজধানী মা'দাইন (টেসিফোন) দখল করবার পর থেকে পারস্যে মুসলিম প্রভাব, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতে পারস্য মুসলিম-জাহানের একটি অবিচ্ছেদ অঙ্গ ছিল। আব্বাসীয়দের পতনের পর পারস্যে ইলখানি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংস ও পারস্যে আধিপত্য বিস্তারের ফলে ইলখানি সুলতানগণ ১২৫৮ থেকে ১৩৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পারস্যে রাজত্ব করেন। এর পর ইলখানি রাজবংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুজাফফরি, জালাইরি, কুর্ত, কারা-কয়নলু, আক-কয়নলু বংশ। এর পর দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুর লঙের নেতৃত্বে পারস্যে তৈমুরি বংশের আবির্ভাব হয়। এই বংশ সাধারণভাবে চাগতাই বংশ নামে অভিহিত। তৈমুরি লং এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারিগণ ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একচ্ছত্রভাবে পারস্যে রাজত্ব করতে থাকেন। হোসেন বায়কারা তৈমুর বংশের সর্বশেষ নৃপতি ছিলেন এবং তৈমুরি বংশের ধ্বংস্তূপের উপর স্থাপিত হয় সাফাভি বংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাহ ইসমাইল সাফাভি (১৪৯৯-১৫২৪)। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯ খ্রিঃ)। শাহ আব্বাসের রাজত্বকালে ইরানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যোগসূত্র সুদৃঢ় হয়। তাঁর সময়ে ইংল্যান্ডের শার্লি ভ্রাতৃদ্বয় ইরানে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন এবং ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশ থেকে ব্যবসায়িগণ ইরানে আসতে থাকেন। প্রায় দুশো বছরকাল সাফাভি বংশ স্থায়ী হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পারস্য আফগানদের দ্বারা শাসিত হয়। ১৭৩৬ থেকে ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নাদির শাহ রাজত্ব করেন।

www.pathagar.com

কাজার বংশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইরানে আফসারী ও জান্দবংশ রাজত্ব করে। এর পর ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে আগা মোহাম্মদ খান ইরানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাজার বংশ একশত বিশ বছর রাজত্ব করে। আগা মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেহ আলি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে ইরানে ফরাসি ও ব্রিটিশশক্তির প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। একদিকে নেপোলিয়ন দূত প্রেরণ এবং ইরানের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে রাশিয়ার দখল থেকে ইরানের ককেশাস অঞ্চল উদ্ধারের প্রস্তাব দেন, অপরদিকে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ইরানের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে প্রাচ্য ও ভারত উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ প্রভাব ও আধিপত্য হ্রাসের প্রয়াস পায়। ইরানে ক্রমবর্ধমান ফরাসি প্রভাবে শঙ্কিত হয়ে ভারতের ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ক্যাপটেন ম্যালকমকে ইরানের শাহের দরবারে পাঠান। ফতেহ আলি শাহের সঙ্গে ম্যালকম একটি চুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইরান ফরাসি সেনাবাহিনী অথবা এজেন্টকে আমন্ত্রণ জানাবে না। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ফিনকেনস্টাইনে (Finkenstain) ইরান ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই সামরিক চুক্তিতে নেতৃত্ব দেন জেনারেল গ্যারাদো (Gardaune), কিন্তু পরের বছর ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যালকম ইরানের মধ্য দিয়ে ফরাসি সৈন্য চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য ফতেহ আলি শাহের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। পরিশেষে শাহ ব্রিটিশ প্রশিক্ষক নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীকে সুগঠিত করার চেষ্টা করেন। ফতেহ আলি শাহের রাজত্বকালে রাশিয়ার সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের অবনতি হয়। কাজার শাসনের পূর্বেই জর্জিয়ার খ্রিস্টান নৃপতি ইরানের বিপক্ষে রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং ইরানি সাম্রাজ্য থেকে জর্জিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; রাশিয়ার কাছ থেকে জর্জিয়া উদ্ধারের জন্য ইরান ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি করে এবং ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করে কাস্পিয়ান অঞ্চল সুরক্ষিত করে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যুবরাজ আব্বাস মির্জা রাশিয়ার সঙ্গে একটি ঘৃণ্য চুক্তি করতে এবং বাকু, দারবান্দসহ ককেশাস অঞ্চলের অনেক স্থান রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৮২৬ এবং ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ইরানিগণ রুশবাহিনীর কাছে পর্যুদস্ত হয় এবং আব্বাস মির্জা আব্বাসাবাদে পরাজিত হন। এর ফলে এভিরানের দুর্গ রুশবাহিনীর হস্তগত হয় এবং আজারবায়জানে রুশ প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন ইরানের সঙ্গে চুক্তিতে ইরানকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফতেহ আলির রাজত্বে ইরান আফগানিস্তানে অভিযান প্রেরণ করে হিরাট দখল করে। ফতেহ আলির মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র মোহাম্মদ মির্জা কাজার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। রাশিয়ার সহায়তায় মোহাম্মদ মির্জা আফগানিস্তানে অভিযান প্রেরণ করে সিস্তান দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্রিটেনের তীব্র প্রতিরোধের ফলে এই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং ইরানি বাহিনীকে হিরাট ত্যাগ করতে হয়। এর ফলে ইরান ও ব্রিটেনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের প্যারিস চুক্তি মোতাবেক পারস্য উপসাগরের খারগ (Kharag) দ্বীপে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

ফতেহ আলি শাহের সময় থেকেই ইরানের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটজনক হতে থাকে। তাঁর পৌত্র মোহাম্মদ শাহ এই জটিল পরিস্থিতি নিরসনে ব্যর্থ হন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন মাত্র সতেরো বছর বয়সে সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি কাচার খানের বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁর আমলে সৈয়দ আলি মোহাম্মদ 'বাবি' নামে এক ব্যক্তি নতুন ধর্মমত প্রচারের চেষ্টা করেন। তিনি শিয়া গোঁড়া ধর্মমতের বিরোধিতা করে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে ইমাম মাহদি এবং 'বাবা' অর্থাৎ ফটক, যার মাধ্যমে দ্বাদশ ইমাম মাহদির সাক্ষাৎলাভ ঘটবে, এরূপ দাবি করেন। তাঁর তথাকথিত ধর্মগ্রন্থ 'বায়ান'-কে কুরআনের সমতুল্য বলা হয়। তিনি নিজেকে আল্লাহর অবতার বলে দাবি করেন। সিরাজে ধর্মমত প্রচারের সময় অনৈসলামিক কার্যকলাপের অভিযোগে তাঁকে বন্দি করা হয়। তিনি বন্দিদশা থেকে পালিয়ে প্রথমে ইস্পাহান এবং পরে আজারবায়জানে যান। সেখানে তাঁকে জেলে আবদ্ধ করে রাখা হয়। অবশেষে সৈয়দ আলিকে হত্যা করা হলে 'বাবি' মতাবলম্বিগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু করে। তাদের নেতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা নাসিরউদ্দিনকে হত্যার চেষ্টা করে বিফল হয়; এর ফলে 'বাবি'দের উপর নির্যাতন শুরু হয় এবং তাদেরকে ইরাক ও তুরস্কে বিতাড়িত করা হয়। নাসিরউদ্দিনের শাসনামলে ইরানের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। তিনি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। বাগদাদ থেকে বুসির পর্যন্ত এ লাইন স্থাপিত হয়। তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশীদের মূলধন প্রয়োগের জন্য উৎসাহিত করেন এবং বিভিন্ন ধরনের কনসেশন দেন। ব্রিটেনের একজন নাগরিককে ইরানে সংবাদ আদান-প্রদান ও খনিজসম্পদ আহরণের জন্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ব্যারন দি রয়টারকে প্রদত্তা কনসেশন সত্তর বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। উপরন্তু, তাঁকে ইরানে প্রথম একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক স্থাপন ও নোট ছাপানোর অধিকার দেওয়া হয়। রাশিয়া রেলপথ স্থাপন এবং বেলজিয়াম শুল্ক প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। নাসিরউদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে 'দারুল ফুনুন' অর্থাৎ 'বিজ্ঞান ভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সামরিক বিদ্যা ও বিদেশী ভাষা–ফরাসি, ইংরেজি ও রুশ শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষাদীক্ষার উন্নতির জন্য ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ৪২ জন ছাত্রকে বিদেশে পাঠানো হয়। নাসিরউদ্দিনের বৈদেশিক নীতি এবং বৈদেশিক কোম্পানিকে সুযোগ-সুবিধাদানের ফলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এরূপ মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, ইরানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। নাসিরউদ্দিন বুদ্ধিজীবীদের পরিচালিত এই আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করেন; কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জামালউদ্দিন আফগানি, ম্যালকম খান এবং হাজি শেখ হাদিনজম আব্বাসির একান্তিক প্রচেষ্টায় এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

প্যান-ইসলামিজম বা বিশ্ব-ইসলামবাদ আন্দোলনের জনক এবং সংস্কারক জামালউদ্দিন আফগানির মতবাদ ছিল সুদূরপ্রসারী। ভারতবর্ষ, ইরান, আফগানিস্তান এবং মিশরে তাঁর মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব-ইসলামবাদের মূলমন্ত্র ছিল বিভেদের ঊর্ধ্বে মুসলিম-জাহানকে সংঘবদ্ধ করা। তাঁর সম্বন্ধে জুরজি জায়দান বলেন, "The goal towards which all his actions tended and the pole around

www.pathagar.com

which all his hopes revolved was the unity of Islam and the union of all Muslims in all parts of the earth in a single Islamic Empire under the protection of the supreme Caliph. To this ideal he devoted all his energy. To this goal he sacrificed all his worldly ambitions and renounced wives and domestic comfort and all material possessions. He died without leaving a written record of his ideas and aims, except for his essay on the reputation of the Materialists and various separate letters and pamphlets on a number of questions. But in the heart of his friends and disciplines he awakened a living spirit. He kindled their energy and gave point to their pens and the East profitted greatly and will continue to profit by their labours."

তেহরানের শিক্ষক, চিন্তানায়ক ও সমাজসংস্কারক ম্যালকম খান ছিলেন একজন আর্মেনীয়। তিনি পরবর্তী পর্যায়ে লন্ডনে ইরানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। তিনি সংস্কারের জন্য কতিপয় প্রস্তাব পেশ করেন, কিন্তু সেগুলো অগ্রাহ্য হলে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে পদত্যাগ করে লন্ডন থেকে 'কানুন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এতে তিনি ইরানি সরকারের এবং মোজতাহিদদের গোঁড়ামির তীব্র সমালোচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নাসিরউদ্দিনের শাসনামলে মোজতাহিদ শেখ হাদি নজম আব্বাসি সংস্কার আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

নাসিরউদ্দিন শাহ বিলাসপ্রিয় ছিলেন এবং সরকারি খরচে বিভিন্ন সময়ে ইউরোপ সফর করেন। এর ফলে সরকারের অর্থের প্রচুর অপচয় হয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে একটি ব্রিটিশ কোম্পানিকে মাত্র ১৫,০০০ পাউন্ড বার্ষিক রাজস্বের বিনিময়ে তামাক চাষের (Tobacco concession) সুবিধা প্রদান করেন। এতে ইরানিগণ মোজতাহিদদের প্ররোচনায় বিদ্রোহ করে, এমনকি তারা ধূমপান থেকে বিরত থাকে। ফলে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিয়ে শাহকে কনসেশন বাতিল করতে হয়। ক্রমশ দেশের পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করতে থাকে এবং শাহবিরোধী আন্দোলন সুদূরপ্রসারী হয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে মির্জা রিজা নামে এক বিদ্রোহী নাসিরউদ্দিনকে গুলি করে হত্যা করে।

নাসিরউদ্দিন শাহের স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর অযোগ্য পুত্র মুজাফফরউদ্দিন। তাঁর কুশাসনে ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। অপরদিকে বৈদেশিক প্রভাব, বিশেষভাবে রুশ প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাশিয়া ইরানে রেলপথ নির্মাণে সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং ঋণগ্রহণে উৎসাহিত করে। বিলাসপ্রিয় মুজাফফরউদ্দিন তাঁর ইউরোপ সফরে তেহরানে চরমভাবে প্রতিষ্ঠিত রুশ ব্যাংক থেকে ৪২ মিলিয়ন রুবল ঋণ গ্রহণ করেন। দেশের এই পরিস্থিতিতে ইরানে এক গণ-আন্দোলন শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'বাস্ত' অর্থাৎ 'অহিংস আন্দোলনে' ইরানি জনগণ যোগদান করে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে চিনি-ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফালাভের জন্য

www.pathagar.com

কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। বেত্রাঘাতের দণ্ড থেকে রেহাই পাবার জন্য দোষী ব্যক্তিগণ তেহরানের শাহ্ আবদুল আজিমের মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করল। সেখানে তারা মোল্লা সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এই সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাইদ আবদ-আল্লাহ্ বাহ-বাবানী, সাইদ মোহাম্মদ তাবে-তাবাই, আগা সাইদ জামালউদ্দিন এবং শেখ ফজলে আল্লাহ্। তাঁরা স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী আইনদ্দৌল্লার পদত্যাগ দাবি করেন। এভাবে মোল্লা-ছাত্রদের সঙ্গে সরকারের বিরোধ শুরু হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বিক্ষোভকারিগণ কুম শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তেহরান বাজার বন্ধ থাকে। দোকানপাট না খুললে প্রধানমন্ত্রী তাদের লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দেন। অতঃপর প্রায় ২,০০০ ব্যবসায়ী ও দোকানদার তেহরানের ব্রিটিশ দূতাবাসে (গুলাহক) 'বাস্ত' অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে। এর ফলে মুজাফফরউদ্দিন শাহ্ প্রধানমন্ত্রী আইনুদৌল্লাকে বরখাস্ত করেন।

মুজাফফরউদ্দিন শাহের সময়ে ১৯০৫ সালে রুশ বিপ্লব শুরু হয়। এটি কার্যকর না হওয়ায় পারস্যের উদারপন্থি বিপ্লবীদের আন্দোলন ব্যাহত হয়। এতৎসত্ত্বেও ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্ট বা 'মজলিশ-ই-মিল্লি'র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে নির্বাচিত ১৫৬ জন সদস্য নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত হয়। মুজাফফরউদ্দিন শাহের সময় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন সংবিধান প্রণীত হয়। এর ফলে সংবাদপত্রের উপর আরোপিত সেন্সরশিপ প্রত্যাহার করা হয়। সভাসমিতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হয়। 'মজলিশ' এবং 'সুর-ই-ইসরাফিল' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মুজাফফরউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী মোহাম্মদ আলি শাহ্ ইরানের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির প্রয়াস পান; তিনি বৈদেশিক ঋণগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু মজলিশ তাঁর এই প্রস্তাব অনুমোদন করেনি। তিনি আজম আলি আসগরকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে ঋণগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁকে হত্যা করা হয় এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন নাসির উল-মূলক। মোহাম্মদ আলির রাজত্বকালে ইরান ব্রিটিশ ও রুশ প্রভাবাধীন দুটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বস্তুত ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন মোতাবেক রাশিয়া এবং ব্রিটেন ইরানের অখণ্ডত্ব রক্ষায় অস্বীকার করে। ইরানকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়– ১. রাশিয়ার প্রভাবাধীন উত্তরাঞ্চল, ২. ব্রিটেনে প্রভাবাধীন দক্ষিণাঞ্চল; ৩. নিরপেক্ষ মধ্য ও পূর্বাঞ্চল। শাহ্ ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক প্রভাব, উদারপন্থি ও মোল্লাদের গণবিক্ষোভ এবং সার্বভৌম পার্লামেন্টে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁর নিরাপত্তা এবং স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার ও সৈন্যদের দ্বারা 'কশাক ব্রিগেড' নামে একটি বাহিনী গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রতিবন্ধকতার দরুন তিনি ব্যর্থ হন।

কাজার সুলতান মোহাম্মদ আলি শাহের রাজত্বকালে ইরানে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দল ছিল ঃ ১. সংস্কারপন্থি (reformists) এবং ২. জাতীয়তাবাদী (nationalists)। প্রথম দলের নেতৃত্ব দেন তাকিজাদেহ্। তিনি তাব্রিজ থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্টের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব দেন সাঈদ

www.pathagar.com

আবদ-আল্লাহ্ বাহ-বাবানি এবং সাঈদ মোহাম্মদ তাবে-তাবাই। বাহ-বাবানি এবং তাবে-তাবাই শাহের ক্ষমতা ধূলিসাৎ করে ইরানের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করেন।

ইরানের গণজাগরণের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শাহের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের প্রচণ্ড বিরোধ বাধে। জাতীয়তাবাদিগণ সংবাদপত্রের মাধ্যমে গোপনীয়ভাবে তাঁদের মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। ফলে শাহ্ তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেন। তিনি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যু-দেতা'র মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতার করেন। পরে অবশ্য তিনি ইউরোপে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। দমন ও শোষণনীতির চরম প্রকাশ ঘটে এ সময়। শাহ্ ইতিমধ্যে রুশ সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে একটি কশাক ব্রিগেড সৃষ্টি করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নির্মূল করার চেষ্টা করেন। তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তেহরান ছেড়ে গ্রীষ্মের প্রাসাদে চলে যান। কিন্তু কশাক ব্রিগেডকে তেহরানে অভিযান করে পার্লামেন্ট ভবন ধ্বংসের নির্দেশ দেন। কশাক ব্রিগেডের নেতা ছিলেন রুশ কর্নেল লিয়াকভ (Liakhov)। সামরিক আইন জারি এবং সেন্সরশিপ পুনরায় বহাল করা হয়। এর ফলে তাব্রিজে জাতীয়তাবাদিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তুরস্কে নব্য-তুর্কি আন্দোলনের গতিধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইরানের জাতীয়তাবাদিগণ বখতিয়ার গোত্রের দলপতি সর্দার আসাদের নেতৃত্বে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু করে। তারা ইস্পাহান দখল করে রাস্তের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে প্রাক্তন জেনারেল মোহাম্মদ ওয়ালি খানের নেতৃত্বে ককেশীয়, তুর্কি এবং আর্মেনীয় ইরানিগণ একটি নিয়মিত বাহিনী গঠন করে। এই সুসংবদ্ধ বাহিনী তেহরানে অভিযান করে শহর দখল এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে। শাহ্ এবং তাঁর অনুচরেরা রুশ দূতাবাসে আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হন। শাহকে সিংহাসনচ্যুত এবং ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করে ওডেসায় নির্বাসিত করা হয়। জাতীয়তাবাদিগণ বিপ্লববিরোধী শেখ ফজল আল্লাহ্ এবং তাঁর পাঁচজন সঙ্গীকে নির্মমভাবে হত্যা করে, পার্লামেন্ট পুনরায় আহ্বান করা হয় এবং মোহাম্মদ শাহের স্থলে তাঁর বার বছরের নাবালক পুত্র আহামদ শাহকে সিংহাসনে বসানো হয়। নাবালক শাহের অভিভাবক নিযুক্ত হন কাজার অধিপতি আসাদ-আল-মালিক। কিছুদিনের মধ্যে বিপ্লবী নেতা সর্দার আসাদ এবং জেনারেল ওয়ালি খানের মধ্যে বিরোধ বাধে। ওয়ালি খান ছিলেন যুদ্ধমন্ত্রী এবং সর্দার আসাদ স্বরাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ওয়ালি খানকে পদচ্যুত করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইরানে অর্থনৈতিক সংকট মারাত্মক আকারে দেখা দেয়। সরকার দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং প্রশাসনিক সংকট অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। বিদেশী পুঁজি-বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের অর্থ পরিশোধে অপরাগ ইরান আমেরিকার অর্থনীতিবিদ মরগান সুস্তারকে অর্থবিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ইরানের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দূর করে সুষ্ঠু রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা সরকারকে শক্তিশালী করতে চান। কিন্তু ইরানের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না। তিনি পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। তাঁর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব ছিল

www.pathagar.com

শাহের বিতাড়িত ভ্রাতা সুজা-আল-সালতানার ভূ-সম্পত্তি ক্রোক করে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা। যেহেতু সুজা রাশিয়ার কাছে ঋণগ্রস্ত ছিলেন, সেহেতু মরগান সুস্তারের এহেন পদক্ষেপে রাশিয়া স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কশাকবাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু সুস্তার কশাক আক্রমণ প্রতিহত করে অর্থনৈতিক সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রুশ সরকার সুস্তারের পদত্যাগ দাবি করে। ইরানের বিপ্লবিগণ রুশ হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু গণতন্ত্রবাদী ইরানিদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয় এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় ক্যু-দে-ত'র মাধ্যমে সমস্ত ক্ষমতা শাহ স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাব্রিজ, রাস্তাসহ বিভিন্ন শহরে রুশবাহিনী বিপ্লবীদের গ্রেফতার ও নির্যাতন করতে থাকে। রাশিয়ার চাপে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয় এবং মরগান সুস্তার পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই আহামদ শাহের অভিষেক উপলক্ষে তৃতীয় বারের মতো ইরানি পার্লামেন্টের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই পার্লামেন্ট ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত কার্যরত থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জাতীয় পরিষদ ইরানের নিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করে। কিন্তু নিরপেক্ষ নীতির অবমাননা করে রাশিয়া ও অপরাপর ইউরোপীয় শক্তি তাদের শক্তি ও প্রভাববলয় হিসেবে ইরানকে ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়া ইরানের উত্তরাঞ্চল আজারবায়জানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। দক্ষিণ-ইরানে ব্রিটেনের স্যার পার্সি সাইক্স একটি ইরানি রাইফেলবাহিনী গঠনে সহায়তা করেন। এই অসহনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করে আমিন বানানি বলেন, "Brigandage and tribal lawlessness were alarming. Highway robbery was universal. In fact, highwaymen often raided towns and in the absence of any authority sometimes remained wrecking all economic activities." ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব ইরানে পরিলক্ষিত হয় এবং এটি ব্রিটিশ প্রভাবকে খর্ব করার পক্ষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এমনকি রুশ সমর্থন লাভ করে গিলানে কুচিক খান এবং আজারবায়জানে খিয়াবনি ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বৈদেশিক আক্রমণ ও অনুপ্রবেশ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। রুশ-বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ইরান থেকে রুশবাহিনী অপসারণের ফলে ব্রিটেনের প্রভাব হয়ে ওঠে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এর ফলে রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সম্পর্ক ইরান গড়ে তোলে তা ভেঙ্গে যায়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ইরানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে ব্রিটেনের প্রভাব সুসংহত হতে থাকে। কিন্তু ইরান সরকার ব্রিটেনকে নতুন সুযোগ-সুবিধা দিতে অস্বীকৃতি জানালে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে সরকারের পরিবর্তন হয় এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ভসুক-উদ-দৌল্লাহর নেতৃত্বে একটি নতুন সরকার গঠিত হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-পারস্য চুক্তি মোতাবেক ইরান ব্রিটেনের একটি প্রটেক্টরেটে পরিণত হয়। ইরানের সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রক হয় ব্রিটেন। ব্রিটিশ সরকার ইরানি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ এবং দুই মিলিয়ন পাউন্ড ঋণ দানে অঙ্গীকারা বদ্ধ হয়। এই চুক্তি-সম্পাদনে স্যার পার্সি সাইক্সের যথেস্ট অবদান ছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু মাত্রাধিক ব্রিটিশ প্রভাবে ইরানি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও বিপ্লবিগণ ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁরা এই ঘৃণ্য চুক্তির চূড়ান্তকরণের প্রতিবাদ করেন। অপরদিকে রাজনৈতিক অসন্তোষ, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অভাব, রাশিয়া কর্তৃক গিলান দখল এবং সোভিয়েত সরকারের ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক চাপের ফলে ভসুক-উদ-দৌল্লাহর সরকারের পতন হয়। মন্ত্রিপরিষদ ইঙ্গ-পারস্য চুক্তি চূড়ান্তকরণ থেকে বিরত থাকে।

রেজা খানের অভ্যুত্থান

ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন সংকটাপন্ন, তখন রাশিয়া ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে ইরান থেকে ব্রিটিশবাহিনী অপসারণের দাবি জানায়। ইরানি জনগণ এবং সরকার ব্রিটিশবিরোধী এই পদক্ষেপে সন্তুষ্ট হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মজলিশের চতুর্থ সভায় ইঙ্গ-পারস্য চুক্তি বাতিল ঘোষিত হয়। অপরদিকে রাশিয়ার সঙ্গে ইরানের একটি নতুন চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল বৈদেশিক আক্রমণের প্রচেষ্টা ব্যাহত করার জন্য বলশেভিক রাশিয়া ইরানে রুশ সেনাবাহিনী পাঠাতে পারবে। অবশ্য এই চুক্তিবলে রাশিয়া ইরানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার এবং রাশিয়া কর্তৃক নির্মিত ও অর্থপুষ্ট ব্যাংক, রেলপথ, কলকারখানার উপর সকল দাবি প্রত্যাহার করবে। ব্রিটিশ ও রাশিয়ার প্রভাবের একটি প্রতিযোগিতা-ভূমি হিসেবে ইরানকে গণ্য করা হয় এবং এর ফলে ইরানের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক কাঠামো ভেঙ্গে যায়। ইরানের এই চরম সংকটে কশাক ব্রিগেডের এক সেনাপতি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে তাব্রিজ থেকে তেহরানে এসে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত এ 'ক্যু-দে-তা'র নায়ক ছিলেন রেজা খান। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, কাজার শাসনের অবসানে নেপথ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন সাঈদ জিয়া নামক এক তরুণ স্বাধীনচেতা সাংবাদিক। সাঈদ জিয়া প্রধানমন্ত্রী এবং রেজা খান যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে চতুর্থবারের মতো পার্লামেন্টের সভা আহ্বান করা হয়। সাঈদ জিয়া প্রধানমন্ত্রী হলেও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা 'সর্দার সিপাই' হিসেবে রেজা খান সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হন।

ইরানের পাহ্লভি বংশের প্রতিষ্ঠাতা রেজা খানের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায়না। তবে মনে করা হয়ে থাকে যে, তিনি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ কাস্পিয়ান সাগরের কাছে মাজেন্দ্রান প্রদেশের আসছহাট দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মেজর আব্বাস আলি খান এবং পিতামহ ক্যাপটেন মুরাদ আলি খান ইরানি সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন। মাত্র চল্লিশ দিনের শিশু রেজা খান তাঁর পিতাকে হারান। মাজেন্দ্রানের প্রচণ্ড শীত থেকে নবজাত শিশুকে রক্ষার জন্য তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে তেহরানে চলে আসেন। রেজা খান কাজারদের মতো তুর্ক-বংশোদ্ভূত ছিলেন না; তাঁর ধমনিতে প্রকৃত ইরানি রক্ত প্রবাহিত ছিল। শৈশব থেকেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। বাল্যকাল থেকে তিন শরিয়তের বিধি অনুযায়ী চলতেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে রেজা খান কশাক ব্রিগেডে যোগদান করেন। রেজা খানের পুত্র মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহ্লভির মতে, তাঁর পিতা নিরক্ষর ছিলেন, কারণ ইরানে সে সময়ে শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল কেবলমাত্র বিত্তশালী এবং মোল্লাশ্রেণীর। কিন্তু মেধা, দক্ষতা এবং চারিত্রিক

www.pathagar.com

দৃঢ়তার দরুন রেজা খান শীঘ্রই একজন সামান্য সৈনিক থেকে কশাক ব্রিগেডের অধিনায়ক পদে উন্নীত হন।

ইরানের কশাক ব্রিগেডে রুশ সেনাপতিদের অসামান্য প্রতাপ ছিল। কিন্তু রেজা খানের দেশপ্রেম ও কর্মদক্ষতায় ইরানি সৈন্যগণ আকৃষ্ট হয়। ক্রমশ তিনি প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। ইরানের চরম রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সংকটে তিনি ব্যথিত হন। কশাক ব্রিগেডে রুশ সৈন্যদের প্রতিপত্তিতে তিনি বিক্ষুব্ধ হন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে তিনি কশাক ব্রিগেডের রুশ অফিসারদের অপসারণ করে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইরানি বাহিনী নিয়ে তিনি রাশিয়ার অগ্রগতিতে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। ইরানকে বৈদেশিক শক্তির প্রভাববলয় থেকে মুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিণত করার প্রয়াস পান রেজা খান। তাঁর সম্বন্ধে আমিন বানানি বলেন, "Reza Khan was tall, broad-shouldered possessed a natural air of authority. He was strong-willed and impatient, quick-tempered and uncouth but he had to perfection the politician's talent for opportunity."

কশাক ব্রিগেডের সর্বাধিনায়কের পদ থেকে রাষ্ট্রীয় প্রধানের ক্ষমতালাভে রেজা খান অসামান্য দুরদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তিনি কাজার বংশের অধঃপতন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, রুশবাহিনীর স্বেচ্ছাচার, বৈদেশিক প্রভাবে জর্জরিত ইরানকে একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে তাঁর সহকর্মী মেধাবী সাংবাদিক সাঈদ জিয়াউদ্দিন তাবে-তাবাইয়ের সহযোগিতায় ভগ্নপ্রায় ইরানি রাজনৈতিক কাঠামোকে ধূলিসাৎ করে নতুন রাষ্ট্র গঠন করার প্রয়াস পান। এই প্রসঙ্গে তাঁর পুত্র মোহাম্মদ রেজা শাহের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, "He (Sayed Zia-Ud-Din Tabi-Tabai) was kind of revolutionary and was well-equipped to bring political pressure to bear in the capital while my father applied military force." কুশাসনের অবসান ঘটিয়ে রেজা খান জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি কাজউইন থেকে তেহরানে আসেন। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটি 'তেহরান মার্চ' নামে অভিহিত। পৃথিবীর ইতিহাসে রেজা খানের ক্ষমতালাভকে রক্তপাতহীন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ 'ক্যু-দে-তা' বলা হয়েছে। জিয়াউদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর এবং রেজা খান ইরানি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও যুদ্ধমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংস্কারক জিয়াউদ্দিন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ভূস্বামীদের ভূসম্পত্তি জাতীয়করণ করেন। এর ফলে উচ্চবিত্ত শ্রেণী বিরোধিতা শুরু করে কিন্তু কৃষকশ্রেণী উপকৃত হয়। কাজার বংশের সর্বশেষ দুর্বল শাহ্ আহামদ শাহ্ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নীরব দর্শক ছিলেন। সাঈদ জিয়াউদ্দিন প্রশাসনের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন আনার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তার ফলে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসেই তিনি পদত্যাগ করে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হন। রেজা খান ধীর ও স্থির গতিতে পরিবর্তন আনার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভসুক-আস সুলতানের মন্ত্রিসভায় যুদ্ধমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি এ সময়ে সেনাবাহিনী

www.pathagar.com

সুগঠিত করেন, রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট বিদ্রোহী কুচুক খান এবং গিলানের বলশেভিক সাহায্যপুষ্ট আন্দোলনকে দমন করেন। রেজা খান ইরানকে বৈদেশিক প্রভাববলয় থেকে রক্ষার জন্য ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-পারস্য চুক্তি এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত রুশ-পারস্য সন্ধি বাতিল ঘোষণা করেন। কাজার বংশের দুর্বলতার সুযোগে আজারবায়জান, লুরিস্তান, কুর্দিস্তান, ফার্স এবং খোরাসানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। রেজা খান তাঁর সুশৃঙ্খল বাহিনী নিয়ে কঠোর হাতে এই সমস্ত বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি ইতোমধ্যে 'সদর-ই-সিপাহ' অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর সর্বময় কর্তা হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। দেশপ্রেমিক রেজা সরকারি দফতর থেকে ব্রিটিশ কর্মচারীদের বরখাস্ত করে ইরানিদের নিয়োগ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় রুশ, ব্রিটিশ ও সুইডিশ সামরিক অফিসারদের বহিষ্কার করা হয় এবং ৪০,০০০ সদস্যের একটি শক্তিশালী ইরানি বাহিনী গঠিত হয়। ভসুক-আস-সুলতানকে পদচ্যুত করে মোস্তাফি-আল-মামলুককে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। এতে রেজা খানের নেপথ্য ভূমিকা থাকবার সন্দেহে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। কিন্তু ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে ইরানের শাহ আহামদ শাহ রেজা খানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে ইউরোপে চলে যান।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতালাভ করে রেজা খান স্বীয় প্রভাব ও কর্মদক্ষতাকে সুদূরপ্রসারী করতে থাকেন। তিনি তুরস্কের কামাল পাশা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের মতো পারস্য প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টের সভায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রেজা খান মন্ত্রিবর্গের সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী এবং মোল্লাশ্রেণী (মোদাররেস এবং মোজতাহিদ) প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় ও বিক্ষোভ শুরু করে। তুরস্কের মহানায়ক আতাতুর্ক কর্তৃক খিলাফতের অবসানে মুসলিম জাহানে মোল্লাশ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে এই আশঙ্কায় তারা রেজা খানের সাংবিধানিক সংস্কারে বাধা সৃষ্টি করে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করা হয় যে, তিনি একজন 'বাবি' এবং ইসলামকে ধ্বংস করবার জন্য এই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। মোল্লাপন্থি শিয়া সম্প্রদায়ের সহানুভূতি লাভের জন্য তিনি মহরমের মিছিলে যোগদান এবং কুম, নজফ ও কারবালার পবিত্র শিয়া ইমামদের স্থানগুলো জিয়ারত করেন। কিন্তু ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মোল্লাশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বিরোধিতায় তিনি অবশেষে প্রজাতন্ত্রের স্থলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। এর ফলে ইরানে নতুন রাজশক্তির আবির্ভাব হয়। মসলিশ-আস-শুরা পরপর তিনটি আইন জারি করে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি রেজা খানকে সর্দার সিপাই এবং সংবিধান অনুযায়ী সমগ্র ইরানের প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। ৩১ অক্টোবর মসলিশ কাজার রাজবংশের বিলুপ্তি ঘোষণা করে এবং সমস্ত ক্ষমতা রেজা শাহের উপর অর্পিত হয়। ফলে পাহলভি বংশের আবির্ভাব হয়। উল্লেখ্য, কাজার বংশের উৎপত্তি হয় তুর্কি গোত্র থেকে, কিন্তু পাহলভি ইরানি (মাজেন্দ্রান) বংশোদ্ভূত। অবশেষে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে রেজা খানকে জাতীয় সভায় ইরানের শাহানশাহ বলে ঘোষণা করা হয় এবং এই বংশ বংশানুক্রমিক রাজবংশের রূপ গ্রহণ করে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল রেজা শাহের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

রেজা শাহ্ পাহ্লভির সংস্কার

সেনাবাহিনী গঠন ঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল উৎস হিসেবে রেজা শাহ সর্বপ্রথম সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত করেন। তাঁর ক্ষমতালাভের পূর্বে ইরানে কোনো সংঘবদ্ধ জাতীয় সেনাবাহিনী ছিল না। কাজারদের সময়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের গঠিত সেনাবাহিনী ছিল, যার মূল ভিত্তিই ছিল উপজাতীয়; এ ছাড়া কশাক ব্রিগেড, দেহরক্ষী এবং ব্রিটিশদের দ্বারা গঠিত দক্ষিণ পারস্যের রাইফেল বাহিনী ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারে যুদ্ধসংক্রান্ত একটি মন্ত্রণালয় থাকলেও কোনো প্রকার কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কোনো অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানা, সামরিক পোশাক ছিল না। এই বিচ্ছিন্ন সৈন্যদের মধ্যে বিশেষভাবে ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কশাক ব্রিগেড। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে নাসিরউদ্দিন শাহ ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সর্বপ্রথম এই ব্রিগেড গঠন করেন। রুশ সেনাপতি দ্বারা পরিচালিক এবং রুশ সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই কশাক ব্রিগেড ইরানে কেবল শাহের শক্তিকে সুদৃঢ়ই করেনি, বরং তা ইরানি স্বার্থবিরোধী রুশ প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে গন্য হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ-বিপ্লবের পর এবং ইরানে রাশিয়ার প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকলে কশাক ব্রিগেড ইরানিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। রেজা খান সর্বপ্রথম এই কশাক ব্রিগেডে যোগদান করেন এবং স্বীয় দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ও রণনৈপুণ্যের দ্বারা এই ব্রিগেডের রুশ সেন্যদের অপসারণ করে সেনাদ্যক্ষ হন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে তিনি সর্বপ্রথম একটি সুগঠিত জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ক্ষুদ্র স্বাধীন উপজাতীয় বাহিনীগুলো ভেঙে দিয়ে একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গঠিত হয়। এই জাতীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কতিপয় সুইডিশ প্রশিক্ষক ব্যতীত বিদেশী কারিগর ও শিক্ষকদের অপসারণ করা হয়। বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য ক্যাডেটদের সুযোগ দেওয়া হয়। সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন মজলিশ বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানে (conscription) আইন পাশ করে। এই আইনবলে ২১ বছর বয়স্ক সকল ইরানি নাগরিকের পাঁচ বছরের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল। এর ফলে ইরানের সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে থাকে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত আইনে পূর্বের আইন সংশোধন করে সামরিক বাহিনীতে দ্রুত পদোন্নতির ব্যবস্থা করা এবং নানারকমের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় এই আইন শিথিল করে উলামা, বিচারক, মাদ্রাসার ছাত্র, খ্রিস্টান, ইহুদি ও অগ্নিউপাসক সম্প্রদায়ের লোকদের সামরিক কর্তব্য থেকে রেহাই দেওয়া হয়। রেজা খান বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনী গঠনে প্রয়াসী হয়। রাশিয়া এবং ব্রিটেন থেকে বিমান ক্রয় করে ইরানি বিমানবহর গঠন করা হয়। পারস্য উপসাগরে দুটি ডেস্ট্রয়ার এবং চারটি গানবোট দিয়ে প্রথম নৌবাহিনী গঠিত হয়। সামরিক বাহিনী গঠনে রেজা খান তাঁর রাজস্বের মোটা অঙ্ক ব্যয় করতেন। সুইডেন, জার্মানি ও চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা হয়। এর ফলে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ইরানে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ৪,০০,০০০ সৈন্যের একটি সংঘবদ্ধ বাহিনী গঠিত হয়। এর অবশ্য কুফলও ছিল, কারণ আপাতদৃষ্টিতে এই

www.pathagar.com

বিশাল বহর যতই শক্তিশালী মনে হোক না কেন, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর ইরানের প্রবেশপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। উপরন্তু, আমিন বানানির ভাষায়, "The heavy investment of money, man-power, time and resources at the expense of other vital needs, may be considered an error of judgement. In the atmosphere of intense nationalism that had been created, however such error was well-nigh unavoidable."

প্রশাসনিক সংস্কার ঃ কাজার বংশের রাজত্বকালে ইরানে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। কেন্দ্রীয় শাসন অথবা সরকার ছিল না। সরকারি কর্মচারিগণ ছিল অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ। মন্ত্রিপরিষদ ছিল এবং কখনও কখনও বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা হত। কিন্তু রেজা শাহ ক্ষমতালাভ করে সর্বপ্রথম সমগ্র ইরানকে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তাধীনে আনেন। তাঁর আমলে সরকার একনায়কত্বের রূপ গ্রহণ করলেও মজলিশের গণতান্ত্রিক সংবিধান মোতাবেক তিনি কতিপয় সংস্কার প্রবর্তন করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ১২ ডিসেম্বর মজলিশ 'সিভিল সার্ভিস' আইন জারি করে এবং এর ফলে আমলাতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। পাশ্চাত্যরীতির অনুকরণে ইরানিদের প্রশাসনিক কার্যে নিয়োগ করা হয়। নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি এবং বরখাস্ত করার অধিকার সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। প্রশাসনের সুবিধার্থে সমগ্র দেশকে কাজারদের সময় চারটি ভৌগোলিক সীমারেখায় বা 'আয়ালাত' (Ayalats)-এ এবং আয়ালাতগুলোকে কয়েকটি 'ভিয়ালাত' (Vayalats)-এ বিভক্ত করা হয়। কিন্তু এতে প্রশাসনিক নৈরাজ্য দেখা দিলে এ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ১০টি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে 'ওস্তান' (Ostans) এবং 'ওস্তান'গুলোকে কয়েকটি 'শাহরেস্তান' (Sahrestans)-এ বিভক্ত করা হয়। প্রশাসনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে শাহরেস্তানগুলোকে আবার 'বাক্স' (Bakhsh)-এ বিভক্ত করা হয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ, যেমন– মেয়র, পুলিশ অফিসার ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত করত। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে একজন অভিজ্ঞ মার্কিন অর্থনীতিবিদকে সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বাজেট প্রণয়নের জন্য নিযুক্ত করা হয়। এমনকি শহর নির্মাণের জন্য তেহরান মিউনিসিপ্যালিটি একজন বিশিষ্ট মার্কিন নগর পরিকল্পনাকারীকে নিয়োগ করে।

ইরানের আধুনিকীকরণের নায়ক রেজা খান প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শুধু আমূল পরিবর্তন সাধনই করেননি, তাঁর কতিপয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ইরানের জাতীয় স্বার্থও সংরক্ষিত হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে তুরস্কের সঙ্গে পারস্যের সীমানাসংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। এমনকি তিনি তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। কামালের সংস্কার আন্দোলনে তিনি অনুপ্রাণিত হন এবং জাতীয়তাবাদী স্বার্থরক্ষার্থে ব্রিটিশ প্রভাব হ্রাস করার জন্য ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ইঙ্গ-পারস্য চুক্তি বাতিল করেন। পারস্য উপসাগরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রেজা খান স্বয়ং গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সাল থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানি যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিল তা বাতিল ঘোষিত হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে D'Arcy-কে তেল উৎপাদনের জন্য যে সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব দেওয়া হয় তা পরবর্তীকালে ইঙ্গ-পারস্য তেল কোম্পানির উপর অর্পিত হয়। রেজা খান

www.pathagar.com

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে এই সুযোগ-সুবিধা বাতিল করে দেন। অবশ্য কোম্পানি লীগ অব নেশনস-এ বিষয়টি উপস্থাপন করলে কোম্পানিকে আরও ছয় বছরের জন্য কনসেশন বৃদ্ধি করা হয়; তবে তাদের প্রভাব ও কার্যক্রম হ্রাস করা হয়। ব্যয় হ্রাস করে একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কায়েম করা হয়। বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা এবং ভূস্বামীদের সুযোগ-সুবিধাও রহিত করা হয়।

জনস্বাস্থ্য ঃ চিকিৎসাব্যবস্থার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ইরানে সম্ভব হয়নি। জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে রেজা খান বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আমেরিকান এবং ইউরোপীয় মিশনারি প্রতিষ্ঠানসমূহ চিকিৎসার ক্ষেত্রে সামান্য অবদান রাখলেও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেনি। অবশ্য তারাই প্রথম ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ইরানের বিভিন্ন শহরে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে একটি আইন জারি করে প্রাদেশিক সরকারকে জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর বিশেষ নজর দিতে বলা হয়। উপদ্রুত ও মহামারির প্রকোপে বিধ্বস্ত এলাকায় ডাক্তার, সেবিকা, ওষুধপত্র প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ইরানে টিকাদানের ব্যবস্থা চালু হয়। ডাক্তারদের চিকিৎসাব্যবসার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পাহ্লভি বংশ প্রতিষ্ঠার পূর্বে চিকিৎসাব্যবস্থা অজ্ঞতা এবং মোল্লাদের বিরোধিতার জন্য বিশেষ কার্যকর হয়নি। রেজা খান ক্ষমতালাভ করে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে প্যারিসের লুই পাস্তুর ইনস্টিটিউটের মতো তেহরানে একটি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ডাঃ জোসেফ মেসনার্ড (Joseph Mesnard)-কে এই ইনস্টিটিউটের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অনুযায়ী চিকিৎসাব্যবসায় উৎসাহিত করার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। মোল্লাদের চরম বিরোধিতার দরুন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শবব্যবচ্ছেদের কোনো প্রথা ছিল না। কিন্তু শারীরিক গঠন সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভের জন্য এর প্রয়োজন ছিল। সেই কারণে ইরান সরকার ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শবব্যবচ্ছেদের রীতি প্রবর্তন করেন। রেজা খানের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ইরানে প্রতি ৪,০০০ লোকের জন্য ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে একজন ডাক্তার তৈরি হয়ে যায়। সংক্রামক ব্যাধি দূর করার জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট এই মন্ত্রণালয় একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রীর দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও রেলওয়ে, খনিজ ও শিল্প বিভাগে নিজস্ব চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল। কেবলমাত্র তেহরানেই নয়, ইরানের সর্বত্র সুসজ্জিত হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়; যেমন– মেসহেদ-এ রেজা শাহ হাসপাতাল। বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইরানি চিকিৎসকগণ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। আমেরিকান, পোলিশ, জার্মান ও ফরাসি চিকিৎসকদের নিয়োগ দ্বারা চিকিৎসাবিদ্যার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। পাহ্লভি রাজত্বে ইরানের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও অনুন্নত ও অশিক্ষিত ইরানি জনগণ পাশ্চাত্য প্রবর্তিত চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিল না। ফলে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থেকে যায়।

www.pathagar.com

বিচার বিভাগ ঃ ইরানের আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টায় রেজা খান পাশ্চাত্য রীতিনীতি, আইন-কানুন, প্রথা-ব্যবস্থা চালু করেন। সংস্কার আন্দোলনে রেজা খান বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। লক্ষণীয় যে, আইন ও বিচারব্যবস্থার মতো অপর কোনো ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব প্রকট ছিল না। পাহ্‌লভি রাজত্বের পূর্বে যদিও দুটি পৃথক বিচারব্যবস্থা ছিল, যেমন– 'শারিয়া' অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষে ও সাধারণ, সিভিল আইনসংক্রান্ত এবং 'উরফ' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বিধিবদ্ধ আইন। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থা বা 'উরফ'-এর প্রচলন বিশেষ ছিল না। কেবলমাত্র 'দিওয়ানখানা-ই-আদলিয়া' অর্থাৎ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, কার্যকর প্রয়োগ ছিল না। অপরদিকে 'শারিয়া' ব্যবস্থা ছিল মূলত প্রধান। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সিভিল কোর্ট প্রতিষ্ঠা, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিচারব্যবস্থার বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এর মূল কারণ 'শারিয়া' কোর্টের প্রাধান্য। রেজা খান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে খ্রিস্টানদের সুযোগ-সুবিধা প্রদত্ত ঘৃণ্য 'ক্যাপিচুলেশন' ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং সিভিল আইন প্রবর্তনের সংকল্প করেন। ১৯২৪ এবং ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যিক ও শাস্তিমূলক (penal) আইন প্রবর্তিত হয়। 'শারিয়া' কোর্টের প্রাধান্য বিলুপ্ত করে সিভিল কোর্ট স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব বিচার মন্ত্রণালয়কে দেওয়া হয়। মজলিশের মাধ্যমে ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কতিপয় আইন পাশ করা হয়। এতে পাশ্চাত্য আইনের প্রতিফলন দেখা যায়। কমিউনিস্টদের প্রভাব নিরসনের জন্য ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রেজা খান সংবাদপত্রের বিধি এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রবর্তন করেন।

বিচারব্যবস্থার সংস্কারে রেজা খান ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ববর্তী 'শারিয়া' কোর্টে সকল প্রকারের জমিজমা রেজিস্ট্রির অধিকার সিভিল কোর্টে স্থানান্তর করেন। এর ফলে শুধু 'শারিয়া' কোর্টের ক্ষমতাই সীমিত হয়নি, মোল্লাশ্রেণীর প্রভাবও হ্রাস পায়। মোল্লাশ্রেণী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ আয়ে জীবিকানির্বাহ করত। নতুন আইন প্রবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় ও তাদের অনেককে আলখাল্লা ছেড়ে সরকারি অথবা সাধারন চাকরি গ্রহণ করতে হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে চূড়ান্তভাবে ইরানের বিচারব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং পাশ্চাত্যকরণ করা হয়। আকস্মিক এই পরিবর্তনের ফলে বিচারব্যবস্থা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত বিচারক ও আইনজ্ঞ পাওয়া যায়নি। এর ফলে একদিকে যেমন মোল্লাশ্রেণীর বিরোধিতা শুরু হয়, অপরদিকে শূণ্যতার সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্যকরণের পটভূমি বিচার করলে দেখা যায়, ইরানের মতো অনুন্নত এবং গোঁড়া শিয়া মতাবলম্বীদের দ্বারা পরিচালিত 'শারিয়া' আইনের সীমাবদ্ধতায় ইউরোপীয় অধ্যাপক এবং উপদেষ্টাদের যথেষ্ট অবদান ছিল। ক্রমশ 'শারিয়া' কোর্টের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। অ্যাটর্নি জেনারেলের অনুমোদন ব্যতীত 'শারিয়া' কোর্টে কোনো বিষয়ে বিচার করা যেত না। তাঁদের শুধু বিবাহসংক্রান্ত বিচার এবং জমিজমার ট্রাস্টি নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়।

আমিন বানানি বলেন, "Despite the striking changes of the Reza Shah period, it would be erroneous to assure that the time-

www.pathagar.com

honoured concepts of the Shariah, which were at the heart of Iranian society and culture were disregarded and replaced altogether." রেজা খান তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের নারী জাগরণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরদানশিন অবহেলিত ও অশিক্ষিত ইরানি নারীদের ঘৃণ্য সামাজিক কুসংস্কার ও অনাচার থেকে মুক্তিদানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বৈবাহিক আইন পাশ করে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। শারিয়া আইন প্রসঙ্গে বলা যায়, "Nowhere did the hold of the old Shariah concepts prove more lasting than in laws pertaining to marriage, divorce, family relation and crimes against morality." রেজা শাহের সময়ে বৈবাহিক আইন একটি সামাজিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আইন হলেও মূলত বিবাহসংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধ 'শারিয়া' মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হত। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত বিবাহ আইনে প্রত্যেক বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়। বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রিকরণ না হলে আইনসঙ্গত হত না। তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই সমান অধিকার ছিল। বিবাহ আইন অনুযায়ী পুরুষের বয়স ন্যূনাধিক ১৮ এবং মহিলার ১৬ বছর নির্ধারিত হয়। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণের অর্থলাভ করার অধিকার অর্জন করে। উত্তরাধিকার আইন ও নাবালকের অভিভাবকত্ব আইন দ্বারা স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা হয়। বিবাহ আইন, সিভিল কোড প্রভৃতি প্রবর্তনের ফলে ইরানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় কিন্তু এই পরিবর্তন সীমাবদ্ধ ছিল শহরাঞ্চলে। রেজা শাহের সংস্কার আন্দোলন গ্রামের অতি প্রাচীন ধ্যানধারণা ও রীতিনীতির পরিবর্তন সাধনে ব্যর্থ হয়। পরদাপ্রথার উচ্ছেদ নারী আন্দোলনে নিঃসন্দেহে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কিন্তু এটা গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। অবশ্য তুরস্কের নারী জাগরণে অনুপ্রাণিত হয়ে রেজা শাহ ইরানি তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেন। সরকারি অফিসে চাকরি, উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষার জন্য সরকারি বৃত্তি, অবাধ চলাফেরা, পরদাপ্রথার বিলুপ্তি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রেজা শাহ পারস্য ভাষার সংস্কারেও মনোনিবেশ করেন। তিনি অবশ্য আরবি হরফ বর্জন করেননি। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে হেলেনিস্টিক নাম 'পারস্য'-র পরিবর্তে 'ইরান' রাখা হয়।

শিক্ষাসংস্কার ঃ রেজা খান পাহলভি ইরানের পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পাহলভি রাজত্বের পূর্বে ইরানের ঘুনে-ধরা শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির চেতনাবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তির উদ্রেক করতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে ইরানে শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞানসাধনার সহায়ক ছিল না। শিক্ষা প্রধানত উচ্চ এবং রাজবংশীয় শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সুদীর্ঘকাল ধরে ইরানে যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধঃপতন ঘটে, এর ফলস্বরূপ শিক্ষাব্যবস্থা মোল্লাশ্রেণীর একচেটিয়া দায়িত্বরূপে পরিণত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র মক্তবকে বোঝাত এবং ধর্মীয় শ্রেণীভুক্ত 'আকন্দ' শিক্ষাদান করতেন। তাঁর কোনো যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হত না এবং সরকারি অনুমোদন ব্যতীত ইচ্ছামতো যে-কোনো স্থানে মক্তব খুলে শিক্ষাদানের

www.pathagar.com

অধিকার ছিল। পাঠ্যবিষয় ও মক্তবের ফি নির্ধারিত না থাকায় শিক্ষাব্যবস্থা একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিনত হয় এবং এই সুবিধা ভোগ করতে থাকে মোল্লাশ্রেণীভুক্ত শিক্ষকেরা। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও ভাগ্যহত পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বিশেষ সুযোগ ছিল না, পরদানশিন বালিকাদের মক্তবে পড়া নিষিদ্ধ ছিল। উল্লেখ্য, আধুনিক বিষয়বস্তুর স্থলে উনবিংশ শতাব্দীর ইরানে প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ানো হত শিয়া ধর্ম, কবিতা, পারস্য-আরবি ডিকশনারি বা নিসাব, ব্যাকরণ, কোরান ও হাদিস। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্পাদিত হত, কোনো সরকারি শিক্ষাপদ্ধতি চালু ছিলনা। এ ছাড়া কুম, ইস্পাহান প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং এই সমস্ত সেমিনারি থেকে মোল্লাগণ প্রশিক্ষণ লাভ করত।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ইরানে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার হতে থাকে। এই পরিবর্তনের প্রধান ভূমিকা পালন করে ইরানে স্থাপিত বিভিন্ন বিদেশী মিশনারি প্রতিষ্ঠান। এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এই সমস্ত মিশনারি স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশে। কেবলমাত্র তেহরানেই পঁচিশটি মিশনারি স্কুল ছিল। ইরানে পাশ্চাত্য প্রভাবে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে। 'দারুল ফুনুন' বা 'বিজ্ঞান ভবন' নাসিরউদ্দিন শাহের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া সামরিক অ্যাকাডেমি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্কুলও চালু করা হয়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম একটি সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য 'জাতীয় স্কুল কাউন্সিল' গঠিত হয়। এর ফলস্বরূপ প্রাথমিক পর্যায়ে দশটি সরকারি স্কুল খোলা হয়। এই সমস্ত স্কুলে আরবি, ফার্সি ও অঙ্ক শেখানো হত। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা চলে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রেজা শাহ ক্ষমতা লাভ করে শিক্ষাকে সর্বস্তরে বিস্তার করে নবজাগরণের প্রয়াস পান। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে একটি অধ্যাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চ কাউন্সিল (High Council of Education) গঠিত হয়। দীর্ঘ বারো বছরব্যাপী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। টেক্সট-বই প্রণয়নের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন স্তরের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। পুরাতন ও ধর্মীয় বিষয়বস্তুর পাশাপাশি নতুন বিষয়বস্তু, যেমন– ভূগোল, ইতিহাস, শরীরচর্চা, শিল্পকলা, সঙ্গিত প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়। ছয় বছরব্যাপী মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা ফরাসি লাইসির (Lycee) উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়। এই পর্যায়ে বিজ্ঞান, বৈদেশিক ভাষা, পদার্থবিজ্ঞান, বীজগণিত, রসায়ন প্রভৃতি পড়ানো হত। শিক্ষকদের প্রশিক্ষনদান, স্কুল পাঠ্যবই প্রণয়ন, নতুন নতুন স্কুল স্থাপন এবং শিক্ষা ও প্রশাসনের সমন্বয় সাধন দ্বারা ইরানে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষকদের ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া তেহরানে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপিত হয়। ক্রমশ সমগ্র দেশে এই ধরনের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠ প্রয়োগ সম্ভবপর হয়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয় এবং এর বাস্তবায়নে বৈদেশিক মিশনারি স্কুলের প্রশাসন ও বিষয়বস্তু পঠনের উপর সরকারি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশ সেগুলি জাতীয়করণ করা হয়।

www.pathagar.com

সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কারিগরি শিক্ষার দিকে রেজা খান দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি স্কুল-কলেজও স্থাপন করে। জার্মান বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম তেহরানে একটি পলিটেকনিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিশ দশকে ইরানে সর্বপ্রথম একটি সঙ্গীত এবং একটি শিল্পকলা অ্যাকাডেমি স্থাপিত হয়। পাহ্লভি রাজত্বের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব ছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তেহরানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র, মেডিসিন, প্রকৌশল, মানবিক শাখা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয়। এই শিক্ষায়তনে ইরানি এবং বিদেশী অধ্যাপকেরা অধ্যাপনা করেন। রেজা শাহের শিক্ষানীতির দুটি প্রধান দিক ছিল–মহিলাদের জন্য শিক্ষায়তনের দ্বার উন্মোচন করা এবং শিক্ষাব্যবস্থা ও নীতিতে মোল্লাশ্রেণীর প্রভাবকে নির্মূল করা। পাহ্লভি রাজত্বকালে ইরানকে একটি শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা রেজা শাহ্ করেন তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে দ্বিমত রয়েছে। ইউরোপীয় ভাবধারায় মৌলবাদী ইরানিগণ কতখানি উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তা বলা দুষ্কর। গোঁড়াপন্থি মোল্লাগণ তাঁর শিক্ষানীতিকে ইসলামের সনাতনী মূল্যবোধের উপর হামলাস্বরূপ মনে করে। শিক্ষাকে জাতীয়করণে মাদ্রাসা-মক্তবের যে একচেটিয়া অধিকার ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে তা লোপ পেল। ফলে বিরোধিতা শুরু হয়। জনৈক লেখক বলেন, "the basic point of failure has been its educational philosophy. We feel that the existing school system has accomplished with relative success the aims which consciously or unconsciously motivated its founders that of producing a distinguished intellectual elite and of establishing an instrument by which the thoughts and actions of the common people might be efficiently guided. It is, therefore, not as much a technical failure of the schools as a changed social philosophy which makes the existing system anachronistic and unsatisfactory." এতৎসত্ত্বেও এই কথা স্বীকার করতে হবে যে, শিক্ষাব্যবস্থার ফলে নিরক্ষরতা দূর হয়, জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ে, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়; বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়; জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং টেকনিক্যাল স্কুল ইরানকে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে।

অর্থনৈতিক সংস্কার ঃ রেজা শাহের অর্থনৈতিক সংস্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে কাজার বংশের রাজত্বকালে ইরানের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানা প্রয়োজন। এক কথায় বলতে গেলে, সে সময় ইরান দেনার দায়ে জর্জরিত এবং দেউলিয়া হয়ে পড়ে। বৃহৎশক্তির প্রভাবের বলয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে ইরান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রের রাজস্বের মূল উৎস ছিল তিনটি ঃ (ক) খাস জমি, (খ) অভ্যন্তরীণ কর ও (গ) শুল্ক। রাজস্ব আয়ের মূল উৎসভূমি ছিল জমিদারশ্রেণীর করতলগত। রাষ্ট্র ভূস্বামীদের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দিত, কিন্তু

www.pathagar.com

ভূস্বামীরা সরকারের তহবিলে সামান্য অর্থ জমা দিয়ে বাকি অংশ আত্মসাৎ করতেন। রাজস্ব আয় হ্রাস পেলে মজলিশ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে খাস জমি বিক্রয় দ্বারা রাজস্ববৃদ্ধির চেষ্টা করে। ফলে নতুন ভূস্বামীশ্রেণীর উদ্ভব হয়। ভূমি-রাজস্বের মতো অভ্যন্তরীন কর-ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কারণ কারচুপি ছাড়াও পাশ্চাত্য রীতিতে আয়কর ও বিভিন্ন প্রকার কর আরোপ অনুন্নত ইরানে সম্ভবপর হয়নি। করব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকান অর্থনীতিবিদ মর্গান সুস্তারকে নিয়োগ করা হয়; কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য তাঁর ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে অপর একজন বিশেষজ্ঞ আর্থার মিলসপকে (Arthur Millspaugh) করব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাসের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। দুর্নীতি ও সরকারি ক্ষমতার শিথিলতার জন্য কার্যকর না হলেও মিলসপ-এর করব্যবস্থা ইরানে বলবৎ থাকে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মিলসপ-এর কার্যকাল শেষ হলেও তাঁর নীতির উপর ভিত্তি করে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মজলিশ কর-আইন জারি করে। রেজা শাহের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

ভূমি-রাজস্ব ও বিভিন্ন ধরনের কর ছাড়াও শুল্ক ছিল রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। দক্ষ ও অভিজ্ঞ বেলজিয়ান কাস্টমস কর্মচারীদের সহায়তায় শুল্কব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকর হয় এবং ইরানের অর্থনীতিতে এর সুফল দেখা দিতে থাকে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ট্যারিফ আইন জারি করা হয়। এর ফলে শুল্কনীতি ও কার্যক্রম সুদৃঢ় হয়। অর্থনীতিতে সুষ্ঠু বাস্তবায়নে অর্থ মন্ত্রণালয়ের যথেষ্ট অবদান ছিল। বলা বাহুল্য বিদেশী অর্থ উপদেষ্টা এবং পাশ্চাত্যে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ইরানি অর্থনীতিবিদ, যেন দাওয়াব এবং হাজিব-এর প্রচেষ্টায় রাজস্বব্যবস্থা সুসংহত হয়। ১৯২৫ থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাণিজ্যিক আইন জারি করা হয়। অর্থনৈতিক সংস্কারে রেজা শাহের বিশেষ অবদান পরিলক্ষিত হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ইরানের প্রথম জাতীয় ব্যাংক অথবা 'ব্যাংক-ই-মিল্লি' স্থাপনে। এর ফলে ইরানের অর্থনীতির আধুনিকীকরণ হয়। রেজা শাহ ইরানের মুদ্রাব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন করেন। প্রথমদিকে রিয়াল ছিল রৌপ্যভিত্তিক, কিন্তু প্রথম মহাসমরে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে রৌপ্যের মান কমতে থাকে। ফলে ইরানের বৈদেশিক ঋণ বাড়তে থাকে। এ কারণে তিনি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট' জারি করেন। রেজা খানের শাসনামলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সুদৃঢ় হয়।

রেজা খানের রাজত্বকালে কৃষিক্ষেত্রে এক নবজাগরণের সূচনা হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ভূমিব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি বোর্ড গঠিত হয়। বস্তুত ইরানে তিন ধরনের ভূমিস্বত্ব ছিল ঃ (ক) ব্যক্তিগত, (খ) রাষ্ট্রীয় এবং (গ) ওয়াকফ্ অর্থাৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তাধীন জমিজমা। শেষের দুটি স্তরের জমি অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতার মধ্যে থাকলেও মূলত ওয়াকফ সম্পত্তি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বন্দোবস্ত দেওয়া হত। কিন্তু কৃষিব্যবস্থায় নানা অব্যবস্থা ও অনিয়ম দেখা দিলে রেজা শাহ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভূমি উন্নয়ন আইন (Land Development Act) জারি করেন। জমির উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সেচব্যবস্থা, অনাবাদি জমি চাষের সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও কৃষিঋণ দান করা হয়। কৃষিব্যবস্থার সুষ্ঠু

www.pathagar.com

পরিচালনার জন্য ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কৃষি বিভাগ স্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কারাজে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে একটি কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। কৃষি যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও পশুপালনের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। প্রয়োজনে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়। পাহ্লভি শাসনে কৃষিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হলেও একথা নিশ্চিত যে, তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থায় কৃষকসমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়নি। এর মূল কারণ ভূমিবন্টন ও রাজস্ব আদায়ে ভূস্বামীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও কর্তৃত্ব। তারা উৎপাদনের পঞ্চাশ ভাগ শস্য আদায় করে বিলাসব্যসনে কালাতিপাত করতেন। কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়নি; কারণ কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাদের কোনো উৎসাহ দেওয়া হত না। উপরন্তু, অনুন্নত ও সনাতনী পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়াস দেখা গেলেও আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা কৃষি উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি।

রেজা খানের শাসনামলে যাতায়াতব্যবস্থার উন্নতি হয়। উল্লেখ্য, তাঁর ক্ষমতালাভের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ তাদের সুবিধার্থে ইরানে জলপথ, রাস্তা ও রেলপথ নির্মাণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কোয়েটা, জায়েদান, জুলফা, তাব্রিজ রেলপথ স্থাপিত হয়। এ ছাড়া খসরুভি-কাযউইন, রাস্ত-কাযউইন, রাস্ত এবং বাকুএঞ্জেলি এবং কারুন নদীতে জলপথে যাতায়াতব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ইরানের অভ্যন্তরে রেলপথ নির্মিত হয়। এই পথ তেহরান থেকে শাহ আবদুল আজিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যাতায়াতব্যবস্থার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সরকার একটি নিরীক্ষণ কমিটি গঠন করে। সমগ্র ইরানে রেলব্যবস্থার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা মজলিশ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে অনুমোদন করে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বৈদেশিক কারিগরি সহায়তায় ট্রান্সইরানিয়ান রেলপথের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। এটি রেজা খানের অন্যতম স্মরণীয় কৃতিত্ব। প্রাথমিক অবস্থায় ইরানে বিমান-চলাচলের ব্যবস্থা করে একটি জার্মান বিমান সংস্থা। উল্লেখ্য, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে Funkers নামে এই সংস্থা ইরানের বিভিন্ন শহরের মধ্যে সর্বপ্রথম বিমানে ডাক ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করে। এর পর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইরান নিজস্ব বিমান সার্ভিস চালু করে। গণসংযোগের মাধ্যম হিসেবে ইরানে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম বেতার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে টেলিফোনও চালু হয়। এভাবে রেজা খান পাশ্চাত্যকরণ নীতির বাস্তবায়নে ইরানকে মধ্যযুগীয় একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশ থেকে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন। রেজা খান বৈদেশিক শত্রুর কবল থেকে ইরানকে রক্ষা করে একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটেন ও রাশিয়া ইরানের ভূখণ্ডের কিয়দংশ দখল করলে রেজা খান ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র মোহম্মদ রেজার পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাসিত হন। সেখানে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রেজা শাহের ব্যর্থতা

আধুনিক ইরানের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথিতযশা সংস্কারক ও পাহ্লভি বংশের প্রথম শাহ হিসেবে রেজা খান অশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি অনুন্নত এবং মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে পাশ্চাত্যকরণের দ্বারা ইরানকে একটি প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত

www.pathagar.com

করেন। কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ড সূক্ষ্মরূপের বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, তিনি বিশেষ সফলকাম হননি। তাঁর সঙ্গে কামাল আতাতুর্কের তুলনা করলে তা প্রমাণিত হবে। বস্তুত, একই সময়ে কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে, রেজা খান ইরানে এবং আমানউল্লাহ আফগানিস্তানে পাশ্চাত্যকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্ব স্ব দেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কামাল আতাতুর্ক ব্যতীত অপর দুইজন সফরকাম হতে পারেননি। অবশ্য আরনল্ড টয়েনবি বলেন, "Like Mustafa Kamal Pasha whom he evidently admired and imitated Reza Khan was a soldier and a self-made man. Indeed he had a more romantic career than his Turkish confrere, who only rose from second lieutenant to President of a Repulic whereas Reza Khan rose from trooper to Shah." পর্যালোচনা করলে অবশ্য প্রতীয়মান হবে যে, কামাল আতাতুর্কের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার অন্তরালে বহুদিনের জাতীয় জাগরণের ইতিহাস রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে তানজিমাত বা সংস্কার আন্দোলন (১৮৩৯-১৯০৯) এবং পরবর্তী পর্যায়ে নব্য-তুর্কি আন্দোলন (১৯০৮-৯) উল্লেখযোগ্য। সুতরাং গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কামাল আতাতুর্কের সংস্কার আন্দোলনের পথ সুগম করে। দ্বিতীয়ত, তুরস্কের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা ইরান ও আফগানিস্তানের তুলনায় অনুকূল ছিল। ধর্মীয় সম্প্রদায় বা মোল্লাশ্রেণীর প্রকট প্রভাব তুরস্কে ছিল না। কারণ খিলাফত উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের ধর্মীয় ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু ইরানের শিয়া গোঁড়াপন্থি মোল্লা এবং আফগানিস্তানের মৌলবাদী সুন্নি মোল্লাদের চরম বিরোধিতায় রেজা খান এবং আমানউল্লাহর সংস্কার কামাল পাশার মতো কার্যকর এবং সুদূরপ্রসারী হয়নি। পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্বরিতগতিতে একটি মূলত ধর্মীয় ও মধ্যযুগীয় ভাবাদর্শে পুষ্ট ইরানকে আধুনিকীকরণের চেষ্টায় রেজা শাহ প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। অধ্যাপক ল্যাম্বটন বলেন, “রেজা শাহের পাশ্চাত্যকরণ নীতি খুবই দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয় এবং এর ফলে পাশ্চাত্য রীতিনীতি ও ভাবাদর্শের সঙ্গে ইরানের সনাতনী প্রথা ও ভাবধারার সুষ্ঠু সমন্বয় হয়নি। বিদেশে প্রশিক্ষণ দ্বারা ও বৈদেশিক কারিগরি সাহায্যে এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে রেজা শাহ একটি মধ্যযুগীয় ইসলামি ভাবধারায় পুষ্ট দেশকে রাতারাতি আধুনিক করতে চান। এর ফলে তাঁর সংস্কার সমাজের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি।” রিচার্ড ফ্রাই বলেন, "The Shah forcibly revolutionized the social and religious life of his people, as a result the revolution took place mainly on the surface."

ইরানের আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা প্রচন্ড বিঘ্ন আসে শিয়া সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। পাশ্চাত্য প্রভাবে ইরানি বুদ্ধিজীবী (Elite) শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এমনকি পাশ্চাত্য জড়বাদের (materialism) প্রভাবে আহম্মদ কাসাভি 'আইন' গ্রন্থে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের পরিপন্থি যে-মতবাদ প্রচার করেন এটা গোঁড়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। রেজা শাহের বিশেষ করে শিক্ষা ও আইন সংক্রান্ত সংস্কারনীতি গোঁড়া সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন শিয়া মন্ত্রী

www.pathagar.com

ঈসা সাদিক বলেন, "The work of westernization or progress needs a centralized government; without it the wordly priests would become too powerful and the task that has been started might be endangered and postponed." কৃষিক্ষেত্রে সরকার যে-নীতি প্রবর্তন করে তা কৃষকশ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক ছিল না, বরং ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল ছিল। ইরানের একজন খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ, কবি, সাংবাধিক এবং বুদ্ধিজীবী মুহম্মদ তাকি বাহার পাহ্লভি সংস্কারের সমালোচনা করে বলেন যে, আধুনিক ও কার্যকর রাজনৈতিক নীতিমালার অভাবে সংস্কার ফলপ্রসূ হয়নি। তাঁর মতে, বিফলতার প্রধান কারণ ইরানের পুরাতন সনাতনী ও অনগ্রসর মৌলিক ইসলামি চিন্তাধারায় পুষ্ট সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক চেতনাবোধের অভাব এবং সংস্কারমনা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবর্তমান। G. Lenezowski বলেন, "Reza Shah had never been in Europe, and his concepts of modernization were sometimes native. Moreover, he was a despot and greedy individual apt to neglect his subjects in order to satisfy his personal ambitions, possessing no real concept to the rule of law and lacking the unselfishness that rendered Kamal a true statesman and father of his nation."

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ইরানে তেল জাতীয়করণ ও ড. মোসাদ্দেকের অবদান

পটভূমি ঃ মধ্য প্রাচ্যের অন্যতম তেলসমৃদ্ধ দেশ ইরানের সমৃদ্ধি নির্ভর করে তেল অনুসন্ধান, উত্তোলন ও রপ্তানির উপর। মোট কথা ইরানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হচ্ছে অফুরন্ত তেল সম্পদ। তেলকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, কোন্দল, বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইরানী তেলকে কেন্দ্র করে জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কনসটিয়াম গঠনকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সূচনা হয়েছে। মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তেল ছিল আধুনিক ইরানের জন্য আর্শীবাদ স্বরূপ। আধুনিকীকরণের মূলে রয়েছে শিল্পায়ন এবং তেল ছাড়া দ্রুত শিল্পায়ন করা সম্ভব নয়। তাই পশ্চিমা দেশসমূহে তেলের চাহিদা বেড়ে গেলে তেল উৎপাদনকারী দেশে তেলের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে শুরু হয় ব্যাপক অনুসন্ধান, জরিপ ও উত্তোলনের জন্য প্রযুক্তি।

লোকটাস ও রয়টার কনশেসন ঃ নাসিরুদ্দীন শাহের রাজত্বকালে ইরানের তেল সম্পদ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম অনুসন্ধান চালান একজন ব্রিটিশ নাগরিক। ১৮৫৫ সালে যে বিশেষজ্ঞ এই দায়িত্ব পালন করেন তাঁর নাম লোকটাস। কিন্তু যে বিদেশীকে দীর্ঘকাল যাবৎ এ গুরুত্বপূর্ণ কনশেসন প্রদান করা হয় তিনি হচ্ছেন ইংরেজ ব্যারন জুরিয়াস ডি. রয়টার। এভেরীর মতে, "রয়টার কনশেসনই পারস্য সরকার কর্তৃক কোন বিদেশীকে প্রদত্ত সর্ববৃহৎ কনশেসন এবং এর ব্যাপকতাও ছিল অত্যাধিক।" ১৮৭২ সালে নাসিরুদ্দীন শাহের রাজত্বকালে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী মির্জা হাসান খান সিপাহ শালার বিদেশী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের পারস্যের সম্পদ আহরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহারে তা রপ্তানির কনশেসন প্রদানের পরিকল্পনা করেন। রুশ ঋণ পরিশোধের জন্য ব্রিটিশ নাগরিক রয়টারকে এই কনশেসন দেওয়া হয়। খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য রয়টারকে সাত বছরের জন্য সুবিধা দেওয়া হয়। এই সুবিধা লাভের ফলে রয়টার পারস্যে কয়লা, লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ, (সোনা ও রূপা ছাড়া) প্রভৃতি খনিজ পাদর্থ আহরণের ক্ষমতা পান। এর বিনিময়ে পারস্য সরকার ১৫% রয়ালটি পায়। রুশ সরকার ব্রিটিশ কনশেসনে খুশী হতে পারে নি। এ ছাড়া ইরানী জনগণ পারস্যের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য বিদেশী ব্যবসায়ীকে কনশেসন প্রদান সুনজরে দেখে নি। ফলে ১৮৭৪ সালে রয়টার কনশেসন বাতিল ঘোষিত হয়। কনশেসন লাভে আগ্রহী বিদেশীদের ইরানে আগমন সম্বন্ধে লর্ড কার্জন বলেন যে, ১৮৬৫ সালে কমপক্ষে কনশেসন লাভে আগ্রহী পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় তেহরানে অবস্থান করেন। কিন্তু ব্যারন

www.pathagar.com

রয়টারের কনশেসন বাতিল হলে ইরান সরকার ১৮৭৭ সালে এক ফরমান জারী করে হাজী আলী আকবর আমিনকে 'সেমনানের' মরুভূমিতে তামা, ব্রোঞ্জ, কয়লা এবং তেলের খনিসমূহের মালিকানা স্বত্ব প্রদান করে।

লিঞ্চ ব্রাদার্সের কনশেসন ঃ ১৮৮৯ সালে কার্জনের ইরান সফরের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৮ সালে কারুন নদীতে নৌচলাচলের ব্যবস্থার জন্য কনশেসন লাভ করেন লিঞ্চ ব্রাদার্স। উপরন্তু, তারা দক্ষিণে খুজিস্তান প্রদেশে তেল অনুসন্ধানের অধিকারও লাভ করে। উল্লেখ্য যে, বিশ বছর পরে এই অঞ্চল ইরানের তৈল সম্পদ আহরণ ও শিল্পজাতকরণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই অঞ্চলেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ কারিগরেরা তৈলকূপ খননের চেষ্টা করেন। ক্রমাগত বিদেশীদের কনশেসন প্রদানের বিরুদ্ধে ইরানী জনগণ ১৮৯২ সালে সোচ্চার হয়, যা পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালে ড. মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে তৈলকে জাতীয়করণ করা হয়। যে সমস্ত ব্রিটিশ বাণিজ্যিক সংস্থা এ ধরনের সুবিধা লাভ করে তাদের মধ্যে ১৮৮৪ সালে হোটস (Hotz) নামে একটি আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। বুসিয়েরের সন্নিকটে দালিকিতে তৈলকূপ খননের অনুমতি দেওয়া হয়। তারা সত্তর ফুট পর্যন্ত খনন করেন কিন্তু তেলের সন্ধান না পাওয়ায় এই কোম্পানির কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জ্যাকুয়েস ডি-মরগান ঃ নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামলে একজন ফরাসী ভূতাত্ত্বিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ ইরান এবং ইরাকের সীমান্তে কাসর-ই-শিরিনে তৈল অনুসন্ধান করেন। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত একটি ফরাসী পত্রিকা Annnales des Mines-এ উল্লেখ্য করা হয় যে, জ্যাকুয়েস ডি. মরগান নামের একজন ফরাসী তৈল অনুসন্ধানকারী সুসায় কয়েক বছর খনন কাজ পরিচালনা করেন। তিনি এই অঞ্চলে ভূমি থেকে তেল নির্গত (seepage) হতে দেখেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে পরিচালিত খনন কাজ সফলকাম হয়নি। দীর্ঘকাল পরে এখানে তেল আবিষ্কৃত হয়। বিদেশী ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ইরানী বিশেষজ্ঞদেরও তেল অনুসন্ধানের সুযোগ দেওয়া হয়। নাসিরুদ্দীন শাহ ১৮৯৬ সালের এক ফরমানে মোহাম্মদ খালাত বারীকে ইরানের উত্তরে মাজেন্দ্রানের তিনটি এলাকায় তেল অনুসন্ধানের অনুমতি দেন। কিন্তু এই সুযোগ-সুবিধা কার্যকরী হয় নি।

পার্শিয়ানে ব্যাংক মাইনিং রাইটস কর্পোরেশন ঃ ১৮৭৪ সালে ব্যারন ডি রয়টারকে কনশেসন থেকে বঞ্চিত করার পর পারস্যের অর্থনৈতিক সঙ্কট দূরীকরণের জন্য পুনরায় রয়টারকে ১৮৮৯ সালে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। রয়টার প্রথমে পারস্যে ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি লাভ করে 'ব্যাংক-ই-শাহী' বা ইম্পিরিয়াল ব্যাংক স্থাপন করেন, যা বর্তমানে 'ব্রিটিশ ব্যাংক অব মিডল ইস্ট' নামে পরিচিত। এই ব্যাংক পারস্যে তেলসহ খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানের অনুমতি লাভ করে। নাসিরুদ্দীন শাহের মৃত্যুর পর ১৮৯৬ সালে তাঁর পুত্র মোজাফফর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজত্বে মারাত্মক অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিলে তিনি বিদেশী কোম্পানিকে ব্যাংক স্থাপন এবং তেল অনুসন্ধানের অনুমতি দেন। ১৮৯০ সালে 'ব্যাংক-ই-শাহী' সরকারি অনুমোদন লাভ করে এবং এই ব্যাংক তেল অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য নাম পরিবর্তন করে "পার্শিয়ান ব্যাংক মাইনিং রাইটস কর্পোরেশন" গঠন করে। এই ব্রিটিশ বাণিজ্যিক

www.pathagar.com

কর্পোরেশন ইরানের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে সিমনান, দালিকি এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে অনুসন্ধান পরিচালনা করে ব্যর্থ হয়। ফলে ১৯০১ সালে এই কোম্পানির তেল কনশেসন বাতিল হয়ে যায়।

নকস-ডি-আর্চির কনশেসন ঃ ১৮৮৯ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত পার্শিয়ান ব্যাংক মাইনিং কোম্পানি অনুসন্ধান চালিয়ে ব্যর্থ হলে রয়টারের একজন সহকারী এডওয়ার্ড কোটে (Eduard Cotte) ফরাসী ভূতাত্ত্বিক ডি. মরগানের জরিপ রিপোর্ট পড়ে আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত জেনারেল কিতাবজী (Kitabji) নামের একজন ইরানীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। কিতাবজী প্যারিসে ব্রিটিশ মন্ত্রী স্যার হেনরী ড্রমন্ড উলফের সঙ্গে সাক্ষাত করে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের ইরানে তেল উত্তোলনের জন্য অর্থ বিনিয়োগের অনুরোধ করেন। হেনরীর প্রচেষ্টায় কিতাবজী ও ডি মরগান উইলিয়াম নকস ডি-আর্চি নামক একজন পুঁজিপতি-ব্যবসায়ী-শিল্পপতি সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তারা আর্চিকে ইরানে তৈল অনুসন্ধানের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিদা আদায়ের প্রতিশ্রুতি দেন। ব্রিটিশ ধনকুবের আর্চি পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ খনিতে অর্থ বিনিয়োগ করে কোটিপতি হন। প্রাথমিক স্তরে তিনি তার সহকারী ম্যারিয়টকে তেহরানে প্রেরণ করেন ১৯০১ সালে এবং কিতাবজী ও ডি. মরগানের সহায়তায় ১৯০১ সালের ২০শে মে তারিখে তেল কনশেসন লাভ করেন। রাশিয়া আপত্তি জানালে আর্চি ম্যারিয়টকে ইরানের উত্তরাঞ্চলে রুশ প্রভাবাধীন পাঁচটি প্রদেশে অনুসন্ধান চালাতে নিষেদ করেন। ডি-আর্চি ৬০ বছর মেয়াদী কনশেসন লাভ করে ভূতাত্ত্বিক জরিপ চালাতে শুরু করেন। জি. বি. রেনল্ডের নেতৃত্বে একটি জরিপদল কাজ শুরু করে এবং কাসরে শিরিনের সন্নিকটে চিরাহ সুরখ (Chirah Surkh) নামক স্থানে সর্বপ্রথম তৈল কূপ খনন করে। অবশ্য পরবর্তীকালে ১৯১৩ সালে এই কূপটি তুরস্ক সরকারকে হস্তান্তর করা হয়। শর্তানুযায়ী ইরান সরকার দু'বছরের মধ্যে আর্চিকে একটি অনুসন্ধান কোম্পানি গঠন করতে বলে এবং শর্ত থাকে যে, ইরান সরকারকে মুনাফার ১৬% ভাগ রাজস্ব দিতে হবে। ইরানের সর্বমোট ৬২৮,০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে ডি-আর্চি ৪৮০,০০ বর্গ মাইল এলাকায় জরিপ চালান।

তেল অনুসন্ধান ঃ ডি-আর্চির কর্মচারী প্রকৌশলী জি. বি. রেনল্ডের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কাসর-ই-শিরিনে প্রথম তেলকূপ খনন করা হয়। এই কূপ থেকে ১৯০৩ সালে ৫০৭ মিটার গভীরে গ্যাস ও তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। এই এলাকায় অপর একটি কূপ খনন করা হয়, যা থেকে দৈনিক ২৫ থেকে ৩০ টন তেল উত্তোলন করা হয়। পশ্চিম ইরানে তেলের সন্ধান লাভ করে ডি. আর্চি দক্ষিণ-পশ্চিমে খুজিস্তান অঞ্চলে জরিপ শুরু করেন। সুষ্ঠুভাবে অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য ডি-আর্চি ১৯০৩ সালে ৬০০,০০০ পাউন্ড পুঁজি করে "দি-ফার্স্ট এক্সপ্লয়টেশন কোম্পানি লিমিটেড" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তিনি স্বীয় ফান্ড থেকে কয়েক লক্ষ পাউন্ড বিনিয়োগ করে অন্যান্য পুঁজিপতি সংস্থাকে অর্থ বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ফলে ১৯০৫ সালে "কনশেসন সিন্ডিকেট লিঃ" নামে একটি বাণিজ্য সংস্থা স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সালের ২৬শে মে তারিখে বার্মা অয়েল কোম্পানি অর্থ বিনিয়োগ করে। নতুন কোম্পানি চিরাহ সুরখে কূপ খনন করে আহওয়াজের উত্তরে মেমাবেটিনে অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু ৫৯১

www.pathagar.com

থেকে ৬৬১ মিটার গভীরে কূপ খনন করে তেল না পাওয়ায় তা বাতিল হয়। ইতিমধ্যে ডি-আর্চি অর্থ সঙ্কটে পড়লে ইরানে তেল অনুসন্ধানে অর্থ বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকেন এবং তাঁর প্রকৌশলী রেনল্ডকে স্বদেশে ফিরে আসতে বলেন।

এ্যাংলো-পার্সিয়ান ওয়েল কোম্পানি (APOC) ঃ ১৯১৪ সালে প্রথম মহাসমর শুরু হলে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য বিশেষ করে নৌবাহিনীর জাহাজগুলোর তেলের প্রয়োজন হয়। এই কারণে ইরানের তেল অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহের জন্য 'এ্যাংলো-পার্সিয়ান ওয়েল কোম্পানি' গঠিত হয়। ১৯০৯ সালের ১৪ই এপ্রিলে গঠিত এই ইঙ্গ-পারস্য তেল কোম্পানি পরবর্তীকালে রেজা শাহের সময়ে ইঙ্গ-ইরানীয় তেল কোম্পানি নামে পরিচিত হয়। ১৯১০ সালে এই কোম্পানি সর্বপ্রথম ময়দান-ই-নাফতুনে, যা বর্তমানে মসজিদ-ই-সোলায়মান নামে পরিচিত, তেলকূপ খনন করে। পরের বছর ১৯১১ সালে তেল উত্তোলন শুরু হয়। এরপর অন্যান্য অঞ্চলে তেল আবিষ্কৃত হতে থাকে, যেমন নাফাত-ই-শাহ, হাফাত-ই-শাহ, হাফত খেল, গাচ শারেন। ১৯১৩ সালে আবাদানে একটি তেল পরিশোধনাগার স্থাপিত হয়। ১৯১১ সালে ময়দান-ই-নাফতুন থেকে আবাদান পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩৫ মাইল পাইপ লাইন বসিয়ে আবাদানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে তেলের ব্যাপক চাহিদার ফলে তেল উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে হয়। ব্রিটিশ সরকার এই উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করার জন্য ইঙ্গ-পারস্য তেল কোম্পানিতে ১৯১৪ সালের মে মাসে ২,০০০,০০০ পাউন্ড স্টারলিং বিনিয়োগ করে। ফলে, ব্রিটিশ সরকারের শেয়ার অন্যান্যদের শেয়ারের তুলনায় অধিক হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকারের এহেন পদক্ষেপ ইরানের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানে। অবশ্য, ১৯১৪ সালে যেখানে অপরিশোধিত তেল উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ৩,৫৪,৪০০ টন সেখানে ১৯১৯ সালে তা দাঁড়ায় দশ লক্ষ টনে।

তেল সংঘাত ঃ ১৯১৪ সালে প্রথম মহাসমর শুরু হলে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। ফলে তুরস্ক ব্রিটিনের জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়ায়। ইরাক তুরস্কের অধীনে ছিল এবং ইরানের সন্নিকটে তুরস্কের অবস্থিতিতে ব্রিটেন বিচলিত হয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশ নৌবহরের জন্য তের সংরক্ষণের প্রতি সজাগ হয়ে উঠে। ব্রিটিনের শক্তির প্রতি হুমকী স্বরূপ তুরস্ক আবাদান থেকে খুজিস্তান পর্যন্ত স্থাপিত পাইপ লাইনের ক্ষতি সাধন করে। এমতাবস্থায় পাইপ লাইন রক্ষনাবেক্ষণের জন্য একদল সৈন্য পাঠান হয়। অনুরূপভাবে দক্ষিণে তেল সংস্কারের জন্যও সৈন্য পাঠাতে হয়। উত্তর রাশিয়া তুরস্কের সামরিক তৎপরতায় বিচলিত হয়ে বাকু অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করে। ইরানের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ তেলকে কেন্দ্র করে রাশিয়া, ব্রিটেন ও তুরস্কের মধ্যে সামরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত শুরু হওয়ার উপক্রম হয়। ফলে ইরানের নিরপেক্ষতা, যা ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনে (১৯০৭) এবং রুশ-পারস্য চুক্তি (১৯২১) দ্বারা স্বকৃিতি ছিল, তা ভঙ্গ হয়। ইরানের সিংহাসনে তখন উপবিষ্ট ছিলেন আহম্মদ আলী শাহ। তাঁর রাজত্বকালে ইরানের চরম দুর্দিন নেমে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইরানকে বৃহৎশক্তি তাদের প্রভাব বলয় হিসেবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ১৯২১ সালের জুন মাসে কশাক ব্রিগেডের অধিনায়ক রেজা খান 'ক্যু-দে-তার' মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ইরানকে সমূহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন।

www.pathagar.com

প্রথম রেজা শাহের তেল নীতি ঃ ১৯৫১ সালের ১৫ই মার্চ মজলিস কর্তৃক ইরানের তৈল জাতীয়করণ হওয়ার পূর্বে পাহলভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রেজা শাহ ইরানের প্রাকৃতিক সম্পদকে বিদেশী চক্রের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষার প্রয়াস পান। এভেরী বলেন, "ইরানের তেল সম্পদ ছিল ব্যাপক এবং উচ্চমানের সম্পদ থাকায় এর মূল্যও ছিল অধিক।" কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতার ফলে ইরান তার নিজস্ব সম্পদ থেকে প্রাপ্ত উপযুক্ত রয়ালটি থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। রেজা শাহের রাজত্বে তেলকে কেন্দ্র করে যে ষড়যন্ত্র হয় তার ফলেই অসন্তোষ দেখা দেয়। রেজা শাহের তেল নীতি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিল। তিনি ব্রিটিশ কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক মাত্র ১৬% ভাগ রয়ালটিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ ইরানকে দেউলিয়াপনা হতে রক্ষার জন্য তার থেকে অধিক পরিমাণের রয়ালটির প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া তেলকে কেন্দ্র করে তুরস্ক, ব্রিটেন ও রাশিয়ার ক্রমাগত আগ্রাসনের ফলে ইরানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হতে থাকে। উপরন্তু, ইরানীরা ইরানের সম্পদ ভোগ করতে পারতনা। এভরী বলেন যে, "দক্ষিণ থেকে উত্তরে তেল আনার যে খরচ হত তার চেয়ে কম খরচে রাশিয়া থেকে তেল, পেট্রোল ও কেরোসিন আনা যেত।" পাইপ লাইনের অভাব ও অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা এ জন্য দায়ী ছিল। রেজা শাহ তার সংস্কার আন্দোলনে অর্থনৈতিক প্রগতির কথা চিন্তা করে তেলকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। ব্রিটেনের সঙ্গে রেজা শাহের দ্বন্দ্বের মূল কারণ ছিল ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানি প্রদত্ত কনশেসন। আন্তর্জাতিক মন্দার ফলে ইরান সরকারের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। অন্যদিকে ব্রিটিশ কোম্পানি ইরানকে পর্যাপ্ত রয়ালটি প্রদান না করায় অর্থনৈতিক সঙ্কট বৃদ্ধি পায়। মূলত প্রথম মহাসমরের ফলে তেল উৎপাদন ও পরিশোধনের খরচ বেড়ে গেলে ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃত রয়ালটি দেওয়া নিয়ে গড়িমসি করে। রেজা শাহের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির ১৯২০ সালে আলোচনা হয়। ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে লর্ড কাডমান (Cadman) তেহরান সফর করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘায়িত হতে থাকে এবং কোন প্রকার সমাঝোতায় পৌঁছান যায়নি। এমতাবস্থায়, রেজা শাহ ১৯৩২ সালের ২৭শে নভেম্বর ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানিকে প্রদত্ত কনসেন বাতিল করে দেন। বাতিল করার পূর্বে তিনি ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানির হিসাব নিকাশে অসাধুতা এবং অনিয়মের অভিযোগ তুলে কনশেসন বাতিল করেন। এ কথাও বলা হয় যে, রেজিষ্টারে যে হিসাব দেখানো হয়েছে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ অর্থ কোম্পানি আত্মসাৎ করেছে এবং ইরানকে তার ন্যায্য প্রাপ্য রয়ালটি থেকে বঞ্চিত করেছে। এ ছাড়া এই কোম্পানিতে ইরানীদের তুলনায় বিদেশীদের অধিক কর্মসংস্থান করা হয়েছে, যা ইরানীদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। কিন্তু বিদেশী প্রকৌশলী ও টেকনিসিয়ান ছাড়া অধিকাংশ ইরানীই এই সংস্থায় কর্মরত ছিল। রেজা শাহ ইরানী সম্পদ দ্বারা ইরানীদের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করেন।

১৯৩৩ সালের কনশেসন ঃ রেজা শাহের জাতীয়তাবাদী নীতির প্রতিফলন দেখা যায় ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানির কনশেসনের বাতিলে। যদিও রেজা শাহ ব্রিটিশদের সঙ্গে কোন প্রকার সংঘর্ষে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না, তবুও জাতীয় স্বার্থে রয়ালটি বৃদ্ধি

www.pathagar.com

এবং ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানির কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে উদ্দত হন। ইরান ও ব্রিটেনের সম্পর্কে ভাটা পড়ে তখন যখন ব্রিটিশ সরকার কোম্পানিতে বিনিয়োগকৃত পঞ্চাশ ভাগ শেয়ার বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখেন। ব্রিটিশ সরকার ইরানকে হুমকী দিয়ে পারস্য উপসাগরে একটি ক্ষুদ্র নৌবহর প্রেরণ করে। কিন্তু ইরান তার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় ব্রিটেন বিষয়টি আলোচনার জন্য লীগ অব নেশনসে উপস্থাপন করে। লীগ জানিয়ে দেয় যে, সংঘাতটি ব্রিটিশ সরকার এবং ইরানের মধ্যে নয়, পরিচালিত তেল কোম্পানি এবং ইরান সরকারের মধ্যে। যাহোক, রেজা শাহ কোম্পানির সঙ্গে একটি নতুন চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী ছিলেন। বিষয়টি লীগ অব নেশনসে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে উপস্থাপিত হয়। কোম্পানির তরফ থেকে বক্তব্য রাখেন স্যার জন সিমম্ন এবং ইরান সরকারের বিচারমন্ত্রী। অতঃপর ১৯৩৩ সালের ২৯শে এপ্রিল ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানির সঙ্গে ইরান সরকারের নতুন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মেয়াদ স্থির হয় ষাট বছর; ১৬% থেকে বাড়িয়ে রয়ালটির পরিমাণ ২০% ভাগ করা হয়; একতরফাভাবে এই চুক্তি বাতিল করা যাবেনা। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে অধিক সংখ্যক ইরানীদের চাকরি দিতে হবে। পূর্বের বার্ষিক রয়ালটির পরমাণ ছিল ৬৭১,২৫০ পাউন্ড স্টারলিং ও নতুন চুক্তি অনুযায়ী তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,০৫০,০০০ পাউন্ড স্টারলিং-এ। এই আয়ের মধ্যে ১,০০০,০০০ পাউন্ড স্টারলিং তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করতে হবে। যাহোক, ইরানী স্বার্থে নতুন চুক্তি সম্পাদিত হলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়। এই নতুন চুক্তি কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য অনেক সুবিধা প্রদান করে, যেমন– হাসপাতাল, স্কুল, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি। কিন্তু এই নতুন চুক্তিতে কোম্পানির বোর্ডে একজনও ইরানী সদস্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়নি; যদিও কোম্পানি ইরানে ইরানীদের স্বার্থে কাজ করবে। কোম্পানির 'গভর্নিং বোর্ডে' কোন ইরানী না থাকায় কোম্পানির বিদেশী সদস্যগণই সিদ্ধান্ত নিতেন; ফলে কোম্পানি যখন ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালে জার্মানী ও ইতালিতে তেল বিক্রয়ে ব্যর্থ হল তখন ব্রিটিশ সদস্যদের উপরই দোষ চাপান হয়। তেল বিক্রয়ে ব্যর্থ হলেও ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানিকে মোট ৪,০০,০০০ পাউন্ড স্টারলিং রয়ালটি প্রদান করতে হত। ইরানের তেল সম্পদ মন্ত্রী ড. মোসাদ্দেক ১৯৫১ সালে ১৫ই মার্চ মজলিসে ইরানের তেল শিল্পকে জাতীয়করণ করে একটি বিল পাশ করেন, যা ২০ মার্চ সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

তেল কনসেশন ইরানী স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। এ কারণে তেল জাতীয়করণ করা হয়।

তেল জাতীয়করণের পটভূমি ঃ জাতীয় সম্পদ তেলকে কেন্দ্র করে ইরানে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শুরু হয়। কাজার বংশের রাজত্বকলে ব্রিটিশ নাগরিক ব্যারন ডি রয়টার তেল অনুসন্ধানের জন্য চুক্তি লাভ করেন এবং ইঙ্গ-পারস্য তেল কোম্পানির মাধ্যমে ইরানে তেল জরিপ, অনুসন্ধান ও উত্তলনের প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইরানের জাতীয় স্বার্থের হানিকর শর্তাবলি থাকায় একদিকে যেমন মজলিসে বাক-বিতন্ডা হয় অন্যদিকে রুশ-ব্রিটিশ দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। পাহলভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রেজা শাহ পাহলভীর জাতীয়তাবাদী মনোভাব ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানির শোষণ নীতিতে

www.pathagar.com

বাধা সৃষ্টি করে এবং ১৯৩২ সালে এই চুক্তি বাতিল করলেও ১৯৩৩ সালে এই চুক্তি পুনঃস্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ইরানকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিলেও ব্রিটেনের প্রতি অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইরান বৃহৎশক্তিসমূহের 'দাবার গুটি' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৪১ সালের ২৬শে আগস্ট ব্রিটিশ ও রুশ বাহিনী যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর পারস্যে প্রবেশ করে দখল করে। ইরানী বাহিনী বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। ইরানকে অক্ষশক্তির বলয় থেকে মুক্ত করে মিত্রশক্তির আওতায় আনার চেষ্টা করা হয় এবং ১৯৪১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও রাশিয়ার চাপে রেজা শাহ সিংহাসনচ্যুত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাসিত হন। তাঁর স্থলে তাঁর ২৩ বছরের পুত্র মোহম্মদ রেজা শাহ (দ্বিতীয়) ইরানের সিংহাসনে বসেন। মোহম্মদ রেজা শাহের শাসনামলে ইরানে তেল জাতীয়করণ করা হয় এবং এই যুগান্তকারী ঘটনার নায়ক ছিলেন ইরানের জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল নেতা ড. মোসাদ্দেক।

ড. মোসাদ্দেকের উত্থান ঃ ড. মোহম্মদ মোসাদ্দেক ইরানের ইতিহাসে এক অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। ইরানের প্রাকৃতিক সম্পদ তেলকে জাতীয়করণ করে তিনি যশস্বী হয়েছেন; কিন্তু এই প্রক্রিয়া সহজে কার্যকরী হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যহতির পরে ইরান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃহৎ শক্তি 'দাবার গুটি'র মত ইরানকে ব্যবহার করে। ১৯৪৩ সালের ১লা ডিসেম্বর রুজভেল্ট, স্টালিন এবং চার্চিল তেহরান ঘোষণার দ্বারা ইরানের সঙ্গে মিত্রবাহিনীর সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। আমেরিকান অর্থনীতিবিদ আর্থার মিলসপাউ অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠার জন্য অর্থ উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। কিন্তু রাশিয়ার বিরোধিতা ও কতিপয় স্বার্থান্বেষী ইরানীদের অসহযোগিতায় তাঁর কর্মপ্রণালী বাস্তবায়িত হয়নি এবং মিলসপাউকে ইস্তফা দিতে হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ-রুশ বাহিনী ইরানে অবস্থানে করতে থাকে, যা ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটেই করেনি, সার্বভৌমত্বেও আঘাত হানে। এই অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৪১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর রেজা শাহ পদচ্যুত হন এবং তাঁর পুত্র মোহম্মদ রেজা শাহ সিংহাসন বসেন। ১৯৪২ সালের ২৯শে জানুয়ারি ইরান, ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত "ট্রাইপারটাইট ট্রিটি অব এলায়েন্স"-এর শর্ত মোতাবেক ইরানের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্বকে স্বীকার করা হয় এবং জার্মান আক্রমণ থেকে ইরানকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সমাপ্ত হলে শর্ত মোতাবেক ব্রিটিশ ও রাশিয়ার বাহিনী দেশ ত্যাগের কথা থাকলেও ব্রিটিশ বাহিনীর মত রুশ বাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে ইরান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করেনি। বরং রাশিয়া ইরানের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ, বিশেষ করে আযারবায়জান সঙ্কট করতে থাকে। উপরন্তু, ইরানে 'তুদেহ পার্টি' (Tudeh) নামে এক কমিউনিষ্ট দল গঠনে উৎসাহ দেয়। ইরানের প্রধানমন্ত্রী কাভাস-আস-সালতানাহ মস্কোয় গমন করে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন এবং ১৯৪৪ সালে রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে তেল সুবিধা দানের অঙ্গিকার করেন। রাশিয়ার চাপে মন্ত্রী পরিষদে তিনজন তুদেহ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মজলিসে বিরোধী দলের নেতা সৈয়দ জিয়াউদ্দীন 'ইরাদা-ই-মিল্লী' বা National Will দল গঠন করে রাশিয়াকে প্রদত্ত সুবিধা প্রদানের বিরোধিতা করেন। এই সময়ে

www.pathagar.com

সংসদ সদস্য ড. মোহাম্মদ মোসাদ্দেক রাশিয়ার এই সুবিধাকে বিলম্বিত করার প্রস্তাব দেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে তা বিবেচনার প্রস্তাব করেন। ভার্সাই চুক্তির পর ১৯৪৫ সালে ইরান থেকে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৪৩ সালের ২রা মার্চ ব্রিটিশ বাহিনীও ইরান ত্যাগ করে কিন্তু ১৯৪৬ সালের ৯ই মের পূর্বে রাশিয়া তার বাহিনীকে প্রত্যাহার করেনি।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঃ ১৯৪৪ সালে ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সঙ্কটাপন্ন হয়। উত্তরে আযারবায়জানে রুশ প্রভাবাধীন উপজাতিরা গণতন্ত্রী দল (Democrat Party) গঠন করে তেহরান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করে এবং তাব্রিজে রাজধানী স্থাপন করে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে ডিসেম্বরে শাহ ইরানী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে তথায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। মজলিসে ক্রমশঃ কমিউনিষ্ট তুদেহ পার্টির সদস্য কমতে থাকে এবং ড. মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে একটি জাতীয়তাবাদী দলের আবির্ভাব হয়। উল্লেখ্য যে, ড. মোসাদ্দেক রাশিয়াকে তেল কনশেসন প্রদানে বিরোধিতা করলে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তিনি ইরানী পার্লামেন্টে জাতীয়তাবাদী দলসমূহকে সংঘবদ্ধ করে একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। "জাবেহ্-ই-মিল্লি" (Jabiheh-yi-Milli) বা জাতীয় ফ্রন্ট নামে এই দল ক্রমশঃ বহু সদস্যদের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। এই জাতীয় ফ্রন্টের বিরোধিতায় মজলিসের ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবরে যে অধিবেশন হয় তাতে ইরান-রুশ তেল চুক্তিটি ২–১০২ ভোটের ব্যবধানে অনুমোদন লাভ করতে পারেনি। ফলে চুক্তিটি নাকচ হয়ে যায়। মজলিসে জাতীয়তাবাদী দল ও বামপন্থী তুদেহ পার্টির সংঘর্ষ অব্যহত থাকে এবং জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ইরানী স্বার্থে ব্রিটিশ পরিচালিত ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানিকে অধিক পরিমাণ রয়ালটি প্রদানের জন্য আন্দোলন শুরু করে। এই দল আমেরিকান তেল কর্পোরেশনের সাথে সাউদী আরবের (Aramco) যে-সুবিধাজনক শর্তে চুক্তি সম্পাদিত হয় তার উল্লেখ করে ইঙ্গ-ইরান তেল কোম্পানির নিকট থেকে আরও সুযোগ-সুবিধা দাবী করে। মজলিসে কমিউনিষ্টপন্থী তুদেহ পার্টি সমর্থন হারাতে থাকলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। রেজা শাহের সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে উত্তরাঞ্চলের তুদেহ পার্টির সদস্যদের গ্রেফতার করেন। তুদেহ পার্টির সদস্যরা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে ইরান সরকার দেশের উপদ্রুত অঞ্চলের সামরিক আইন জারী করেন।

শাহের উপর হামলা ও তুদের পার্টি বিলুপ্ত

তেল সঙ্কট ঃ মোহাম্মদ রেজা শাহ তুদেহ পার্টির কর্মকাণ্ডে দেশের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হবার উপক্রম হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রেজা শাহ তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় সফরকালে একজন উগ্রপন্থী তুদেহ পার্টির সদস্য তাঁকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে। তিনি আহত হলেও সে যাত্রায় বেঁচে যান। এই ঘটনার পরেই সামরিক আইন জারী করা হয় এবং তুদেহ পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইরানে তেল উত্তোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং তুলনামূলকভাবে পূর্বের হারে ইরানী সরকারে প্রদত্ত রয়ালটিতে জাতীয়তাবাদী দল মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। তারা মজলিসে নতুন বিল উত্থাপনের প্রয়াস পায়। ১৯৫০-৫১

www.pathagar.com

সালে ড. মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ব্রিটিশ কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং ইরানের জাতীয় সম্পদ তেলকে জাতীয়করণের জন্য বিল উত্থাপন করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল রজম আরা এই বিলের বিরোধিতা করেন এই কথা বলে যে, বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ ধরনের পদক্ষেপ সংঘাতের সৃষ্টি করবে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জুন রজম আরাকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। আযারবায়জান বিদ্রোহ দমনে জেনারেল রজম আরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করার তিনি শাহের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। কিন্তু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা না থাকায় তিনি জাতীয়করণ বিলের বিরোধিতা করেন। ফলে মজলিসের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট এবং কমিউনিষ্ট তুদেহ পার্টির সদস্যগণ তাঁর উপর আস্থা হারায়। এদিকে জাতীয়করণের আন্দোলন জোরদার হয়। সংবাদপত্রের উপর কড়াকড়ি শিথিল করলে এই আন্দোলনকে জাতীয় চেতনা ও স্বার্থের অনুকূল বলে প্রচার করা হয়। এভেরীর মতে, 'নতুন প্রেস আইন নতুন উদ্দমে উগ্র জাতীয়তাবাদকে সুদূরপ্রসারী করে'; ("whipping up high degree of xenophobia")। ফলে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় এবং তিনি ১৯৫১ সালের ৭ই মার্চ আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

তেল জাতীয়করণ ঃ ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী রজম আরার মৃত্যুর পর মজলিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। জেনারেল রজম আরাকে একজন ব্রিটিশ এজেন্ট মনে করা হত এবং তেলের জাতীয়করণে তিনি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। তাকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলেও অভিহিত করা হয়। তাঁর কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। এভেরী বলেন, "যে ব্যক্তি রজম আরার মৃত্যুর পর দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের জন্য দায়ী ছিলেন তিনি মোহাম্মদ মোসাদ্দেক, যার পূর্ব নাম ছিল মোসাদ্দেকুস সালতানাহ।" মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে মজলিসে যে বিল উত্থাপিত হয় তার মূল ভিত্তি ছিল ১৯৩৩ সালে সম্পাদিত ঘৃণ্য ইঙ্গ-ইরানী তেল চুক্তি। এই চুক্তি কোম্পানিকে ষাট বছর পর্যন্ত তেল উত্তোলন ও বাজারজাত করার একচেটিয়া অধিকার দেয়। প্রথম রেজা শাহ ১৯৩২ সালে এই কোম্পানির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাসের প্রয়াস পান কিন্তু ব্রিটেনের হুমকীর প্রেক্ষিতে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৯৩৩ সালের চুক্তিটি মূলতঃ ইরানী সার্বভৌমত্বের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ বলে মনে করা হয়। কি অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৫১ সালে মোসাদ্দেক বিলটি উপস্থাপন করেন তা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, (১) প্রধানমন্ত্রী রজম আরার হত্যা শুধুমাত্র ইরানীদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের আত্মপ্রকাশই নয় উপরন্তু সুবিধাবাদী বিদেশী পুঁজিপতিদের ইরানী সম্পদের একচেটিয়া ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ; (২) এই হত্যা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অচলাবস্থাকে নগ্নভাগে প্রকাশিত করে; জাতীয়তাবাদী ও তুদেহ দলের সংঘাতের চরম ও চূড়ান্ত ফল হচ্ছে এই হত্যাকাণ্ড; (৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মোহম্মদ রেজা শাহের অর্থনৈতিক সঙ্কট দূরীকরণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যর্থতা; (৪) শাহের মজলিসের অভ্যন্তরে ক্ষমতার লড়াই, শাহের হত্যার প্রচেষ্টা বিফল হলে তিনি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য সংসদীয় আইন পাসের ক্ষমতা হ্রাস করার চেষ্টা করেন। ফলে শাহের সাথে মজলিস ও ভূ-স্বামী গোষ্ঠীর বিরোধ বাধে; (৫) জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট তুদেহ পার্টির (১৯৪৯ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পূর্ব পর্যন্ত) এবং

www.pathagar.com

উগ্রপন্থী মোল্লাদের কার্যকলাপে সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং তুদেহ পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে জাতীয়দাবাদী ফ্রন্টের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

তেল কমিশন ঃ ১৯৩৩ সালের চুক্তি সংশোধন করে ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানি নতুন শর্তে চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী ছিল। কিন্তু কোম্পানির ৫০ ভাগ এবং সরকারের ৫০ ভাগ শেয়ারে মজলিস রাজি ছিল না। মজলিস তেল কমিশন গঠিত হয় এবং এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন ড. মোসাদ্দেক। কোম্পানি শর্তে রাজি না হয়ে মোসাদ্দেক ১৯৫১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তেল জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রজম আরা এর বিরোধী ছিলেন এবং সেজন্য ১৯৫১ সালের ৭ই মার্চ ফিদাইন-ই-ইসলামের মত একটি গোঁড়াপন্থী দলের সৈন্যের গুলির আঘাতে তিনি নিহত হন। পরের দিন ৮ই মার্চ মজলিস মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে তেল কমিশনের প্রস্তাব অর্থাৎ তেল জাতীয়করণ অনুমোদন করে। উল্লেখ্য যে, এই প্রস্তাবে মজলিসে কোন বিরোধিতা হয়নি। ১৫ই মার্চ মজলিস তেল জাতীয়করণ বিল পাস করে। পরবর্তী পর্যায়ে ২০শে মার্চ সিনেটে বিলটি সম্মতি লাভ করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

মোসাদ্দেক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত ঃ ১৯৫১ সালে তেল জাতীয়করণের মূখ্য ভূমিকা পালন করেন ড. মোহাম্মদ মোসাদ্দেক। কিন্তু আইন পাস হলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রচন্ড আপত্তি আসে। তেল সম্পদ জাতীয়করণ একটি জাতীয়বাদী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং ব্রিটেন এর বিরোধিতা করলে ইরান বিষয়টি ইরানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা দেয়। ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ইরানে ব্রিটিশ বিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। শ্রমিক হরতাল পালিত হয় এবং দু'জন ব্রিটিশ কর্মচারীসহ কয়েকজন দাঙ্গায় নিহত হয়। পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এটলী ও পররাষ্ট্র সচিব পার্লামেন্টে ভাষণ দেন। ব্রিটিশ নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে ব্রিটিশ সরকার পারস্য উপসাগরে রণতরী পাঠায়। তেল জাতীয়করণের সময়কালে ইরানের রাজনৈতিক পট দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। রজম আরার মৃত্যুর পর রেজা শাহ হোসেন আলাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁর নিযুক্তিকে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী দল সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ফলে ১৯৫১ সালের ২৭শে এপ্রিল হোসেন আলা পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে পরের দিন ২৮শে এপ্রিল শাহ ড. মোসাদ্দেককে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের আহ্বান জানান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করে মজলিস ও সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত তেল সম্পদ জাতীয়করণের আইন বাস্তবায়নে আর কোন বাধা রইল না। ২৮শে এপ্রিল মজলিস ও ৩০শে এপ্রিল সিনেট আইনকে কার্যকরী করার জন্য ভোট দেয়। অগত্যা শাহানশাহ ২রা মে বিল স্বাক্ষরিত করতে বাধ্য হন।

শাহ-মোসাদ্দেক বিরোধ ঃ ড. মোসাদ্দেক ছিলেন ইরানের বুদ্ধিদীপ্ত জাতীয়তাবাদী নেতা, যিনি দেশপ্রেমিক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। ইরানের জাতীয় সম্পদ বিদেশীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হবে তা তিনি কোন দিনই চাননি। এই কারণে তিনি

www.pathagar.com

জাতীয়করণে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন। কিন্তু সিংহাসন ও মজলিসের মধ্যে বিরোধ অব্যাহত থাকে। শাহান শাহ মোসাদ্দেককে মজলিসের চাপে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়। রজম আরা অথবা হোসেন আলার মত তিনি শাহের নিজস্ব ব্যক্তি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হননি বরং মজলিসের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন। এর ফলে মজলিসের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শাহের একনায়কত্ব হ্রাস পায়। ডঃ মোসাদ্দেক তেল কমিশনের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেন। শাহের সঙ্গে মোসাদ্দেকের বিরোধের কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ (১) মোসাদ্দেক সাম্রাজ্যবাদী-স্বৈরাচারী ও একনায়কত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং গণতন্ত্রী, জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাই তিনি স্বাভাবিক কারণে ১৯২৫ সালে শাহের সিংহাসন লাভকে সুনজরে দেখেননি। উদারপন্থী হিসেবে তিন রাজবংশের শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন, (২) তিনি সিংহাসন ও দরবারের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন এবং তাঁর ক্ষমতার উৎস ছিল মজলিস, (৩) তিনি কোন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ভূস্বামী শ্রেণীভুক্ত থাকায় জনগণের মনোভাব উপলব্ধি করতে পারতেন। তিনি কমিউনিষ্ট বা বামপন্থী রাজনীতি করতেন না এবং এই কারণে জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করেন। সংসদে তাঁর সমর্থক সদস্যদের সংখ্যা অধিক থাকায় মেজরিটি ভোটে তিনি বিল পাস করতে পারতেন। অপর দিকে সংবিধান অনুযায়ী শাহ মজলিসের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ফলে শাহের সাথে পরবর্তী পর্যায়ে মোসাদ্দেকের দ্বন্দ্ব বাধে। তাঁর সম্বন্ধে লর্ড কার্জন বলেন, "তিনি সৎ, বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, কর্মঠ এবং আমীরদের প্রতি অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন।" অবশ্য মোসাদ্দেক কতটুকু ব্রিটিশ ঘেষা ছিলেন তার প্রমাণ ইতিহাসেই রয়েছে। বস্তুতঃ মজলিসে তাঁর সমর্থক দলের মধ্যে ছিল (১) জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের সদস্যবর্গ, (২) রক্ষণশীল উচ্চ বংশীয়গণ, (৩) গোঁড়াপন্থী মোল্লা, (৪) বামপন্থী কতিপয় আন্দোলনকারী।

জাতীয়করণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ ঃ ১৯৫১ সালে ইরানের তেল সম্পদ জাতীয়করণ নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ স্বার্থে আঘাত হানে। বিশেষ করে ইঙ্গ-ইরান তেল কোম্পানির একচেটিয়া তেল উত্তোলন ও বাজারজাতকরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কোম্পানি ১৯৩৩ সালের চুক্তির বরাতে দাবী করে যে, একতরফাভাবে চুক্তি বাতিল করা যাবে না এবং ১৯৩৩ সালে সম্পাদিত চুক্তি ষাট বছর অর্থাৎ ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ব্রিটিশ সরকারও বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং ব্রিটিশ রণতরী পারস্য উপসাগরে পাঠান হয়। ইংরেজ সৈন্য আবাদান অঞ্চলে অবতরণের হুমকী দেয়; এতদসত্ত্বেও ইরানী জনগণ তাদের এই ঘৃণ্য চাল নস্যাৎ করে দেয়। অবশেষে ব্রিটেন বিষয়টি ১৯৫১ সালের ২২শে মে আন্তর্জাতিক আদালতে উত্থাপন করে কিন্তু সেখানে বিষয়টি নিষ্পত্তি না হলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করে এবং শাহ ইরানী সেনাবাহিনীকে আবাদানে পাঠাতে বাধ্য হন। ২৭শে সেপ্টেম্বর আবাদান ইরানীদের দখলে যায় এবং ৪ঠা অক্টোবর ব্রিটিশ কর্মচারীগণ ইরান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে জাতীয় ইরানী তেল কোম্পানি ইরানের সমস্ত তেল ক্ষেত্রসমূহ ও আবাদানের শোধানাগারে দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইরানের

www.pathagar.com

সঙ্গে ব্রিটেনের বিরোধ নিরসনের জন্য 'হ্যারিমান ফর্মূলা' তৈরি করা হয়। কিন্তু মোসাদ্দেকের আপোষহীণ নীতির ফলে এই ফর্মূলা ব্যর্থ হয়। কারণ এতে তেল বাজারজাতকরণের দায়িত্ব ইরানী তের ব্যবসায়ীদের উপর ন্যাস্ত করার শর্ত ছিল। যাহোক, নিরাপত্তা পরিষদে ১৯৫১ সালের ১২ই অক্টোবর বিষয়টি আলোচিত হয়। ড. মোসাদ্দেক স্বয়ং এই পরিষদের সভায় যোগদান করে বলেন যে, তেল সম্পদ জাতীয়করণ নিছক ইরানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং এ ক্ষেত্রে কোন বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবেনা। রাশিয়ার 'না' ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। ইতিমধ্যে পাউন্ড স্টারলিং থেকে ডলারে ইরানী রিয়াল কনভারসান করা হয় এবং ব্রিটিশ ব্যাংকসমূহ যেমন 'ব্রিটিশ ব্যাংক অব ইরান' এবং 'মিডল ইস্ট ব্যাংক' তাদের দফতর তুলে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ইরানের তেল সম্পদ জাতীয়করণ নিয়ে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলতে থাকে; এমন কি আন্তর্জাতিক ব্যাংকও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। কিন্তু ড. মোসাদ্দেক তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

জাতীয়করণ উত্তর সংকট ঃ ১৯৫১ সালে তেল সম্পদ জাতীয়করণ করলে ড. মোসাদ্দেককে পরোক্ষভাবে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর ফলে বিরোধী সদস্যগণ তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণাই শুরু করেনি বরং তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের সূচনা হয়। সমস্যাগুলো হচ্ছে ঃ (১) আকস্মিকভাবে ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানি বাতিল ঘোষিত হলে তেল থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব বন্ধ হয়ে যায়; (২) বৈদেশিক মুদ্রা মারাত্মক হ্রাস পায়; (৩) অর্থনৈতিক কার্যকলাপ স্থবির হয়ে পড়ে; কারণ তেহরানে অবস্থিত ব্রিটিশ ব্যাংক একদিনে ১৪,০০০,০০০ পাউন্ড স্টারলিং তুলে নেয়। ফলে ইরান অর্থনৈতিক দেউলিয়ার সম্মুখীন হয়; (৪) আইন অনুসারে তেল বাজারজাতকরণের দায়িত্ব ইরানী ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয় কিন্তু তারা পরিশোধিত তেল বাজারজাত করতে পারেনি। ড. মোসাদ্দেক দু'বছরে ইতালি ও জাপানে যে পরিমাণ তেল বিক্রি করেন ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানি একদিনে তার চেয়ে অধিক তেল বিক্রি করে; (৫) ব্রিটিশ তেল প্রকৌশলীগণ ইরান ত্যাগ করলে অনভিজ্ঞ ইরানী কর্মচারীগণ তেল শোধনাগার পরিচালনায় ব্যর্থ হয়; (৬) ইরানের তেল থেকে বঞ্চিত হয়ে ব্রিটেন সাউদী আরব, কুয়েত ও ইরাক থেকে তেল সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে ইরানের রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেলে দেশ মারাত্মক অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখী হয়। ফলে পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, ইরান ব্রিটেনের সঙ্গে ১৯৫২ সালের অক্টোবরে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়।

মোসাদ্দেকের ভাগ্য বিপর্যয় ঃ তেল সম্পদ জাতীয়করণ মোসাদ্দেকের অসাধারণ ও অবিস্মরণীয় কীর্তি হলেও এর পরিণতি ছিল ভয়াবহ। মজলিসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তিনি এককভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করলে সংসদে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। এদিকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ইরানের বৈরীতার সুযোগে ইরানে বামপন্থী তুদেহ পার্টির পুনরুত্থান ঘটে। তারা ১৯৫১ সালের ৮ই মে তারিখে একটি খোলা চিঠিতে ৮টি দাবী পেশ করে। ইত্যবসরে দক্ষিণপন্থী ও শাহের সমর্থক ড. ইমামী মজলিসের সভাপতি নির্বাচিত হলে ড. মোসাদ্দেক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু মোসাদ্দেকের সমর্থকদের চাপে এবং সংসদে তাঁর অনুকূর সংখ্যাধিক ভোট পড়ায় তিনি অল্প দিনের

www.pathagar.com

মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীত্ব ফিরে পান। মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি এবং সংসদে সংখ্যাধিক দলের নেতা হিসেবে তিনি মজলিস এবং শাহের কাছ থেকে অধিক ক্ষমতা দাবী করেন যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের সাংবিধানিক সঙ্কট না দেখা দেয়। তিনি শাহের নিকট সমর মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু শাহ সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করতে রাজী ছিলেন না। ফলে ড. মোসাদ্দেক পুনরায় পদত্যাগ করেন। ১৬ই জুলাই তিনি পদত্যাগ করলেও ২২শে জুলাই তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী কসভ আস-সালতানার স্থলাভিষিক্ত হলেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করে তিনি শাহের ক্ষমতা হ্রাস করতে, এমন কি মজলিস ভেঙ্গে দিতে চান। তিনি সিনেটের কার্যক্রম ৬ বছর থেকে কমিয়ে ২ বছর করতে চান। মজলিস ১৯৫২ সালের আগস্টে ছয় মাসের জন্য প্রশাসনিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষমতা তাঁর উপর অর্পন করে। পরে মোসাদ্দেক এই ক্ষমতা আরও ছয় মাসের জন্য বাড়িয়ে নেন।

শাহের দেশত্যাগ ও মোসাদ্দেকের প্রভাব ঃ ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানির চুক্তি বাতিল, আবাদান তেল শোধনাগারসহ তেল ক্ষেত্রসমূহে ইরানী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ব্রিটিশদের ইরান ত্যাগ বাধ্য করে ড. মোসাদ্দেক ইরানী জনগণের নিকট ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক জননেতা ও জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব। অবশ্য অর্থনৈতিক সঙ্কটের সুযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ডানপন্থী দল তৎপর হয়ে উঠে। কিন্তু শাহের (Crown) সাথে প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের বিরোধের মূল কারণ অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রচেষ্টা। বংশ-পরম্পরা রাজবংশের শাসনের প্রতি মোসাদ্দেকের প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা ছিল এবং দেশের সর্বময় প্রশাসনিক ক্ষমতালাভ করে তিনি অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটাবার জন্য কতিপয় অভূতপূর্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি রাজকীয় সম্পত্তির উপর কর ধার্য করার চিন্তা-ভাবনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর চাপের মুখে শাহকে নতি স্বীকার করতে হয় এবং ১৯৫২ সালের ৬ই অক্টোবর শাহ সিনেটে ড. মোসাদ্দেকের জাতীয়করণ নীতি সমর্থন করেন। ১৯৫৩ সালের ১১ মে তারিখে তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সরকারের কাছে হস্তান্তর করেন। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক চাপই নয় মোসাদ্দেকের সঙ্গে শাহের বিরোধের আরও কারণ ছিল। শাহ মোসাদ্দেকের সমরমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা পূরণ করেননি। উপরন্তু, রাজপরিবারের উপর মোসাদ্দেকের বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি রাজমাতা ও রাজকুমারী আসরাফকে বিদেশে অবস্থান করতে বাধ্য করেন এবং রাজকুমারী আসরাফের স্বামী এবং বেসামরিক বিমান চলাচলের পরিচালক আহমদ শফিককে পদচ্যুতি করেন। ক্রমশঃ মোসাদ্দেক তাঁর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে থাকেন এবং ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হুমকী দেন যে, যদি মজলিস তাঁকে সর্বময় ক্ষমতা না দেয় এবং সেনাবাহিনীর দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পন না করে তা হলে তিনি মজলিস ভেঙ্গে দিয়ে রেফারেন্ডাম ডাকবেন। মোসাদ্দেক তাঁর জীবনের নিরাপত্তার জন্য মজলিসের মধ্যে থাকতেন এবং সেখান থেকে সরকারি নির্দেশ দিতেন। মজলিসে তাঁর বিরোধিতা করেন মজলিসের প্রেসিডেন্ট কাসানী। ইত্যবসরে রেজা শাহ ১৯৫৩ সালের ১৩ই আগস্ট ড. মোসাদ্দেকের স্থলে রাজভক্ত জেনারেল ফয়জুল্লাহ জাহেদীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। রাজকীয় বাহিনীর যে কর্নেল শাহের ফরমান নিয়ে মোসাদ্দেকের নিকট

www.pathagar.com

গমন করে তাকে মোসাদ্দেক আটক করে শাহের আদেশ অগ্রাহ্য করেন। মোসাদ্দেক পদত্যাগ না করায় জাহেদীর নিযুক্তি কার্যকর হয়নি। তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে স্বয়ং এক বাহিনী নিয়ে মোসাদ্দেককে গ্রেফতার করতে যান। কিন্তু তিনি তা করতে ব্যর্থ হন এবং প্রাণ ভয়ে আত্মগোপন করেন। অন্যদিকে শাহের আদেশ অমান্য করা হলে তিনিও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাণীসহ তাঁর নিজস্ব বিমানে দেশ ত্যাগ করেন। শাহ প্রথমে রানী সুরাইয়াকে নিয়ে বাগদাদে যান এবং পরে সেখান থেকে রোমে পলায়ন করেন। ১৫ই আগস্ট মোসাদ্দেক জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দেন। ১৭ই আগস্ট মোসাদ্দেককে ইরানী জনতা জাতীয় বীরের মর্যাদা দেয়, কিন্তু মাত্র দু'দিনে অর্থাৎ ১৯ই আগস্ট তারিখে রাজনৈতিক পটের দ্রুত পরিবর্তন হয়।

মোসাদ্দেকের গ্রেফতার ও পতন ঃ ১৯৫৩ সালের ১৩ই আগস্ট মজলিস ভেঙ্গে দিয়ে মোসাদ্দেক জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও আন্দোলনকারীদের হটকারিতা, অসংখ্য রাজভক্তদের অবিরাম আত্মত্যাগ এবং মোসাদ্দেকের একনায়ত্বের ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির চাপে রেজা শাহ দেশ ত্যাগ করলেও রাজদরবার এবং প্রত্যান্ত অঞ্চলে তাঁর সমর্থকের অভাব ছিলনা। উপরন্তু, তুদেহ পার্টির সমর্থকেরা শাহের মূর্তি ভঙ্গ করে অবমাননা করলে এবং রেজা শাহ (প্রথম) পাহলভীর সমাধী অবমাননা করার হুমকী দিলে জনগণ তা বরদাস্ত করেনি। জাতীয়তাবাদী দলের সদস্যগণ আধুনিক ইরানের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম রেজা শাহের প্রতি অবমাননাকর আচরণে তুদেহ পার্টির সদস্যদের উপর অসন্তুষ্ট হন। রাজভক্ত জনতা জাতীয়তাবাদী দল, কমিউনিষ্ট বিরোধী গোষ্ঠী ও গোঁড়াপন্থী মোল্লাগণ মোসাদ্দেকের বিরোধিতা করে। ১৯ই আগস্ট তেহরানের রাজপথে সামরিক ট্যাঙ্ক দেখা যায়। তুদেহ পার্টির সদস্যরা আত্মগোপন করে। প্রায় নয় ঘণ্টাব্যাপী তেহরানে দাঙ্গা হয় এবং পরিশেষে সেনাবাহিনী ২০শে আগস্ট মোসাদ্দেককে গ্রেফতার করে। এই সামরিক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন রাজভক্ত জেনারেল জাহেদী। এভাবে মোসাদ্দেক সরকারের পতন হয় এবং শাহ ২২শে আগস্ট রোম থেকে তেহরানে প্রত্যাবর্তন করেন। মোসাদ্দেকের পতনের মূলে পাশ্চাত্য শক্তির ষড়যন্ত্র ছিল বলে মনে হয়; কারণ তিনি ইরানের অমূল্য তেল সম্পদ জাতীয়করণ করে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। ১৯৫৩ সালের ২২শে আগস্ট শাহ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ২১শে ডিসেম্বর একটি সামরিক আদালত মোসাদ্দেককে তিন বছরের জন্য নির্জন কারাবাস প্রদান করে। ১৯৫৬ সালে তিনি কারামুক্ত হয়ে তেহরানের একটি গ্রামে বাকি জীবন কাটান।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়
দ্বিতীয় রেজা শাহ্ পাহলভী এবং শ্বেত বিপ্লব

পটভূমি ঃ ড. মোহাম্মদ মোসাদ্দেকের তীব্র বিরোধিতার মূলে শাহান শাহ রেজাকে দেশ ত্যাগ করতে হয় ১৯৫৩ সালের ১৬ই আগস্ট। কিন্তু রাজভক্ত সভাসদ, জেনারেল ও ডানপন্থী রাজনীতিবিদদের সহায়তায় রেজা শাহ মাত্র ছয় দিন প্রবাসে থাকার পর পুনরায় তেহরানে প্রত্যাবর্তন করেন ২২শে আগস্ট। তাঁর বিশ্বস্ত জেনারেল জাহেদী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। শাহান শাহ রেজা শাহের শাসনামলকে বিপদসঙ্কুল (stormy) বলা যায়। কারণ তিনি সিংহাসনচ্যুত হন, বিভিন্ন রাজনৈতিক সঙ্কটের মোকাবেলা করেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্র পক্ষের বিদেশী সেনাবাহিনীর মদদ জোগান এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে জাতীয় ইরানী তেল কোম্পানি গঠিত হয়। রেজা শাহ্ অর্থনৈতিক সঙ্কট দূরীকরণের জন্য ১৯৫৪ সালে আটটি বিদেশী কোম্পানির সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক কনসর্টিয়াম গঠন করেন। রেজা শাহ্ ইরানের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করেন এবং সমাজ সংস্কারমূলক কতিপয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা শ্বেত বিপ্লব বা (White Revolution) নামে সুপরিচিত।

শ্বেত বিপ্লব (White Revolution) ঃ ১৯৬৩ সালে রেজা শাহ্ ইরানে যে সংস্কার ও প্রগতির আন্দোলন শুরু করেন, তা ইরানীদের জীবনের সকল স্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত করে। সুইজারল্যান্ডে স্নাতক পর্যায়ে লেখাপড়ার সময় তিনি ইরানের ভূমি সংস্কারের চিন্তা ভাবনা করেন, যা তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "মিশন ফর মাই কান্ট্রি" তে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৯৫০ সালে নির্বাসনের পূর্বেই তিনি তাঁর নিজস্ব মালিকানাধীন কিছু কৃষিজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রজম আরার সরকার তাতে বাধা দেয়। কারণ ভূস্বামী ও আমীরগণ এ ধরনের ভূমি সংস্কারে শঙ্কিত হয়ে উঠে। ফলে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে মোসাদ্দেকের পতনের পর ১৯৫৮-৫৯ সালে ভূমি সংস্কার বিল উপস্থাপিত হয় কিন্তু গোঁড়াপন্থী মুজতাহিদগণ এই আইনকে শরিয়ৎ ও সংবিধানের পরিপন্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। যাহোক, ১৯৬৩ সালের ২৬শে জানুয়ারির গণভোটে ইরানী জনগণ ছয়দফা বিশিষ্ট ভূমি সংস্কার প্রকল্প অনুমোদিত করে। পরবর্তীকালে আরও ছয়টি দফা সংযোজিত হয়। শাহান শাহের বিনারক্তপাতে সংঘটিত বার দফা বিশিষ্ট বিপ্লবকে 'শ্বেত বিপ্লব" বলা হয়। এলওয়েল সার্টন বলেন যে, ১৯৬৩ সালের প্রথমার্ধে শাহ্ যে বিপ্লব শুরু করেন তা 'শ্বেত বিপ্লব' বা 'শাহানশাহ ও জনগণের বিপ্লব' বলা হয়।

শ্বেত বিপ্লবের ব্যাখ্যা ঃ এভেরী বলেন, "১৯৬২ সালের ৯ই জানুয়ারি মন্ত্রী পরিষদ যে বিলটি পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে অনুমোদন করে তা বস্তুত ১৯৬০ সালের ১৬ই

www.pathagar.com

মে তারিখ উপস্থাপিত হয়।" এই বিলে মোট পঁয়ত্রিশটি অনুচ্ছেদ ছিল। শাহের শ্বেত বিপ্লবের মূল দফাগুলো নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল ঃ (১) ভূমি সংস্কার (Land reform), (২) বনভূমি জাতীয়করণ, (৩) সরকারি কারখানা বেসরকারিকরণ, (৪) মজদুরদের অধিক পরিমাণ মুনাফা (২০%) প্রদান, (৫) সার্বজনীন ভোটারাধিকার আইন, (৬) শিক্ষা সংস্কার, (৭) জনস্বাস্থ্য সংস্কার, (৮) কৃষি সংস্কার, (৯) ন্যায় আদালত ও মধ্যস্থতা কাউন্সিল গঠন, (১০) জনসম্পদ জাতীয়করণ, (১১) শহর ও গ্রামাঞ্চল পুনর্গঠন ও (১২) প্রশাসনিক সংস্কার। রেজা শাহ্ তাঁর 'শ্বেত বিপ্লব' দ্বারা শুধুমাত্র কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নের প্রয়াস পান নি বরং সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। ("The whole spectrum of Iranian economic and social affairs")।

ভূমি সংস্কার ঃ

প্রাথমিক স্তর ঃ শাহান শাহ্ রেজা শাহের 'শ্বেত বিপ্লবে'র সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও জনসেবামূলক পদক্ষেপ হচ্ছে ভূমি সংস্কার। ১৯৬১ সালের ১১ই নভেম্বর শাহ্ এক ফরমান জারী করে ড. আমীনীর সরকারকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে নির্দেশ দেন। এই ফরমানে বর্ণিত ছয় দফা প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করেই শাহের 'শ্বেত বিপ্লবে'র সুচনা হয়। এই ফরমান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন পাস করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়। যথা- (১) গ্রাম পঞ্চায়েত স্থাপন, (২) শহর, প্রাদেশিক কাউন্সিল স্থাপন ও পরিচালনার জন্য বর্তমানের আইন সংশোধন, (৩) একটি নতুন বেসরকারি চাকরি বিধি প্রণয়ন, (৪) রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসনিক সংস্কার সাধন, (৫) শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, (৬) সামাজিক ন্যায়ের (social justice) ভিত্তিতে এবং স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণে প্রশাসনের অবকাঠামো পুনর্গঠন। এভেরী মনে করেন যে, শাহান শাহের এ ধরনের সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা প্রেসিডেন্ট কেনেডীর সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। উল্লেখ্য যে, ড. আমীনীর সরকার ভূমি সংস্কার আইন সম্পর্কে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ১৯৬২ সালের ১৭ই জুলাই তিনি পদত্যাগ করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন শাহের বিশ্বস্ত অনুচর জনাব আসাদউল্লাহ্ আলম। কৃষিমন্ত্রী ড. হাসান আরসানজানী এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করেন। ড. আরসানজানী শাহের শ্বেত বিপ্লবকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের একটি পন্থা মনে করে পরে তিনি পদত্যাগ করেন। যাহোক, আরসানজানী সরকার ১৯৬২ সালের ৯ই জানুয়ারি ভূমি সংস্কার বিল পাস করে। পূর্বের ছয় দফার সঙ্গে আরও ছয় দফা সংযোজিত হয়। ১৯৬৩ সালের ২৬শে জানুয়ারি গণভোটের মাধ্যমে ইরানী জনগণ এই সংস্কারকে নিরঙ্কুস সমর্থন জানায়।

মূল বৈশিষ্ট্য ঃ শাহান শাহের ভূমি সংস্কার আইনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে; (১) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, (২) অনুপস্থিত ভূ-স্বামীদের (absentee landlord) স্থলে কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন, (৩) জমিদারদের উৎপীড়ন থেকে কৃষকদের রক্ষা করা। উল্লেখ্য যে, বর্গা প্রথায় চাষ করা জমির $\frac{২}{৫}$ অংশ পেত চাষী এবং $\frac{৩}{৫}$ অংশ পেত জমির মালিক। এ ছাড়া উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{৫}$ অংশ জমির জন্য, $\frac{১}{৫}$ অংশ

www.pathagar.com

বীজের জন্য রাখা হতো এবং $\frac{1}{5}$ অংশ জমির মালিক পেত। ফলে ভূমিহীন কৃষকদের দুর্দশা চরমে উঠায় জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের চিন্তা-ভাবনা করা হয়। (৪) পূর্বে একজন জমিদার একাধিক এলাকায় জমির মালিক হতে পারত কিন্তু ১৯৬২ সালে ভূমি সংস্কার বিল পাস হলে কোন ভূস্বামী একাধিক গ্রামে জমির মালিক হতে পারত না, (৫) প্রতি গ্রামের জমি ছয় অংশে বা dang-এ বিভক্ত করা হত এবং এই ছয় অংশ সম্বলিত জমিকে একটি ইউনিট ধরা হত এবং এর ভিত্তিতে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হত। ১৯৬০ সালের শাহান শাহের ব্যক্তিগত কৃষি খামারের হাজার হাজার জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। (৬) ভূমি সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সকল ভূ-স্বামীদের তাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ঘোষণা করতে বলা হয় এবং তাদের নির্ধারিত বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি সরকার ক্রয় করে নেন। অতঃপর এই জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং তারা সরকারকে কিস্তিতে পনেরো বছর ধরে জমির মূল্য পরিশোধ করতে থাকে। কৃষি ব্যাংক এ ক্ষেত্রে কৃষকদের সহায়তা করে। ফলে ভূমিহীন কৃষক কালক্রমে জমির মালিক হয়ে যায়।

কার্যকরী ব্যবস্থা ঃ শাহান শাহের ভূমি সংস্কার কর্মপদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ হয় আযারবায়জানের মারাগাহ অঞ্চলে। পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষামূলক সংস্কারের কার্যকারিতা লক্ষ্য করে অন্যান্য অঞ্চলে এর বিস্তৃতি হয়। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে আযারবায়জানে ২৫০ জন জমিদার তাদের অতিরিক্ত জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এর ফলে ২৫৭,৬০৯ হেক্টর সম্বলিত ১,০৪৭টি খামার (estate) কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য সরকারের নিকট বিক্রি করা হয়। এর ফলে ২৩,৭৮৩ জন কৃষক উপকৃত হয়। ১৬,৮৫৩,৩৫০ রিয়াল বিনিয়োগ করে পঁয়তাল্লিশটি সমবায় সমিতি গঠিত হয়। ভূমি সংস্কারের অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে গিলান, কাযউইন, ফারস ও কিরমানশাহে সংস্কার সম্প্রসারিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শাহান শাহের সরকার তিনটি পর্যায়ে ভূমি সংস্কার আইন কার্যকরী করে। এক পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পর্যায়ে যত সংখ্যক কৃষক পরিবার চাষাবাদের উপযোগী জমি লাভ করে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল।

সুফল ও কুফল

সুফল ঃ শাহান শাহ রেজা শাহ প্রবর্তিত ভূমি সংস্কার মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আপাতঃদৃষ্টিতে ভূমি সংস্কার কৃষক সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সহায়তা করে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। সুফল বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, (১) ভূমিহীন কৃষক সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জমির মালিক হয়; (২) কৃষকদের উপর অহেতুক অর্থনৈতিক চাপ দেওয়া হয় নি; কারণ তাদের পনোরো বছর ধরে জমির অর্থ পরিশোধ করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং এক্ষেত্রে কৃষি ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ লাভের ব্যবস্থা করা হয়; (৩) কৃষিকার্যের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারিভাবে বীজ, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতি, সেচব্যবস্থা, পশুপালন প্রভৃতির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়; (৪) কৃষি সমবায় গঠন, খামার কৃষিভিত্তিক কলকারখানা স্থাপনের ফলে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষিত হয়;

www.pathagar.com

(৫) কৃষকদের জমি চাষের পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়; যেমন বিনা রাজস্বে ফসল ব্যতীত অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী, তরিতরকারী, ফল ও চায়ের বাগানে চাষাবাদের সুযোগ বিলে সংরক্ষিত ছিল, (৬) আর্থিক স্বচ্ছলতার সাথে সাথে কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি হয়; তারা ভোটাধিকার লাভ করে। ১৯৬৩ সালের ১৫ই জানুয়ারি জাতীয় কৃষক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং কৃষক পার্টি (Peasants Party) গঠিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ২৬ জন কৃষক পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়। কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন শ্বেত বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং মনে করা হয়ে থাকে যে, ভূমি সংস্কারের ফলে প্রায় দেড় কোটি ইরানী উপকৃত হয়।

কুফল ঃ শাহান শাহের ১৯৭৯ সালের পদচ্যুতি ও দেশত্যাগের অন্যতম কারণ ছিল শাহের তথাকথিত 'শ্বেত বিপ্লবে'র বিফলতা।

(১) 'আলোর স্মারক', (৩রা জুন ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৭) গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইরানে ভূমি সংস্কারের শ্লোগানটি ছিল একটি মারাত্মক ছদ্মবেশী ষড়যন্ত্র। কারণ কৃষি অর্থনীতিকে এমনভাবে দাঁড় করানো হয়েছিল যাতে রাজপরিবারের কাছেই মুনাফার সিংহভাগ চলে আসে। এটি ছিল দেশের কৃষি অর্থনীতিকে ধ্বংস করারই একটি উদ্যোগ। উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শাহ 'পাহলভী ফাউন্ডেশন' সৃষ্টি করেন। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ফাউন্ডেশনে শাহ ১৩ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তি অনুদান দিলেও প্রকৃত অর্থে কৃষককূলের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়নি। এর মূল কারণ ছিল ১৯৫৮-৬০ সালের মধ্যে ৫০০০ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ৫,০০,০০০ একর জমি বিতরণ করলেও ভূমি আইনের বাইরে অনেক জমি ছিল যা রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। জনৈক লেখক বলেন, "এমন আইন পাস করা হয় যে, যাতে ঐ সমস্ত ভূমি পাহলভী ফাউন্ডেশনের নামে সরাসরি রাজপরিবারের মালিকানায় চলে যায়।" উল্লেখ্য যে, ঐ ফাউন্ডেশন হচ্ছে রাজপরিবারের আর্থিক লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। বিদেশী কয়েকটি কৃষি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকেও কিছু জমি দেওয়া হয়েছিল, যার উৎপাদিত ফসল ইরান ভোগ করতে পারত না; বিদেশী বাজারে তা চলে যেত। উদাহরণ স্বরূপ ইরানে বিরাট এলাকা নিয়ে এ্যাসপ্যারাগাস নামক এক প্রকার খাদ্র উৎপাদন করা হত, অথচ এটি ইরানীদের কোন খাদ্য নয়। এ সময় ইরানের বাজারে স্বদেশে উৎপাদিত মাখন পাওয়া যেত না। পক্ষান্তরে তেহরানের সুপার মার্কেটে ড্যানিশ মাখনই পাওয়া যেত।

(২) তথাকথিত 'শ্বেত বিপ্লব'কে জনগণ সুনজরে দেখেনি। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়েছে রাজকীয় পরিবার জনগণের দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তৃণমূল পর্যায় থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তৎপর হয়ে পড়েছেন; কিন্তু এই 'শ্বেত বিপ্লব'কে শাহ ও জনতার বিপ্লবও বলা হয়েছে। সমালোচকেরা বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুষ্ট শাহ, যিনি একবার দেশ থেকে মোসাদ্দেক কর্তৃক বিতাড়িত হন, তথাকথিত কৃষি বিপ্লবের সূচনা করলেও ব্যর্থ হন। রসিকতা করে বিপ্লবীরা অনেকে একে 'শ্বেত বিপ্লব' (White Revolution) বলতেন এই অর্থে যে তা 'হোয়াইট হাউজে' (White House) জন্মলাভ করেছে। শাহ অবশ্য তাঁর অনুচরদের সহায়তায় ১৯৬৩ সালের ২৬শে

জানুয়ারিতে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের রায় লাভ করেন। কিন্তু কার্যত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নয়। এলওয়েল সার্টন বলেন, "১৯৬৩ সালের প্রথমার্ধে শাহ 'শ্বেত বিপ্লব' অথবা 'শাহ ও জনতার বিপ্লব' নামে এক কর্মসূচি ঘোষনা করেন। পরের শিরনাম প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক দলসমূহকে অবজ্ঞা করে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনই শাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।" এই উদ্দেশ্য গনভোট বা referendum দ্বারাই প্রমাণিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে যে ২৬ জন কৃষক সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয় তারা শাহের সমর্থক ছিল।

(৩) ভূমি সংস্কারের গোড়ায় অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ সাল থেকেই মজলিসের সাথে শাহের বিরোধ বাধে এবং এর ফলে ঘন ঘন রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হতে থাকে। ভূমি সংস্কারকে কেন্দ্র করে শাহের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ড. আলী আমীনীর মতানৈক্য হয়। ড. আমীনী শাহকে তথাকথিত কৃষক আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে বিচার না করে সমগ্র দেশের দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির উপর গুরুত্ব দেন। ফলে আমীনীকে পদত্যাগ করতে হয়। এমন কি কৃষিমন্ত্রী ড. হাসান আরসানজানীও বিদায় নেন। আরসানজানী শাহ ও জনতার বিপ্লবকে কোন প্রয়োগিক (pragmatic) কর্মসূচি মনে না করে একটি 'সস্তা শ্লোগান' বলে অভিহিত করেন।

(৪) তথাকথিত শ্বেত বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে কৃষক সমাজ স্বচ্ছল ও আরাম প্রিয় হয়ে উঠে এবং ক্রমশ তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করে বিলাসী জীবনের সুযোগ সুবিধা লাভের প্রত্যাশী হয়। ফলে কৃষি ছাড়া অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প ব্যাহত হতে থাকে। কৃষি কাজ ও হস্তশিল্পের পরিবর্তে দেশে সংযোজন কারখানার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

(৫) গ্রাম কাউন্সিল গঠন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিগ্রেড গঠন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল। এর দ্বারা যৎকিঞ্চিত ইরানী জনগণ উপকৃত হয়। মূলতঃ যে উদ্দেশ্যে 'শ্বেত বিপ্লব' প্রবর্তিত হয় তা চরিতার্থ হয়নি। কারণ সামাজিক বিচার (Social justice) ও ন্যায়নীতির (fair play) অভাব ছিল।

(৬) সামন্ততন্ত্রে পুষ্ট জমিদার শ্রেণী তাদের খামার থেকে বঞ্চিত হয়ে শাহের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। ভূমি সংস্কারকে এড়াবার জন্য কোন কোন জমিদার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যান্ত্রিক চাষের ব্যবস্থা করেন।

(৭) তাছাড়া জমির মালিক সরকারের নিকট থেকে জমির প্রকৃত মূল্য পেত না। কারণ জমির মূল্য নির্ধারণ করা হত একতরফাভাবে। মূলতঃ রাজস্বের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে সরকার থেকে টাকা দেওয়া হত; ফলে জমিদারগণ ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হত। উল্লেখ্য যে, ১৯৬২ সালের নভেম্বরে একজন ভূমি সংস্কার কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। সম্ভবত উৎপীড়ন ও দুর্নীতির জন্যই তাকে হত্যা করা হয়।

(৮) শাহ তার 'শ্বেত বিপ্লব' দ্বারা সমাজের সকল স্তরে তাঁর প্রভাব সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করলে শাহ বিরোধী চক্র-গোঁড়া ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতা ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬৩ সালের ২২শে মার্চ কোমে একটি গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়, যার নেতৃত্ব দেন ইরানের ধর্মীয়

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ। শাহের বাহিনীর গুলিতে অসংখ্য লোক নিহত হয়। এভেরী যথার্থই বলেন, "ধর্মীয় অনুভূতি ও পাশ্চাত্যের জড়বাদের দ্বন্দ্ব ইরানের ইতিহাসে বিস্ফোরণের মত দেখা দেয়।"

বনভূমি জাতীয়করণ ঃ 'শ্বেত বিপ্লবে'র দ্বিতীয় স্তরে জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে বনভূমি জাতীয়করণ করা হয়। পূর্বে এই বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে প্রায় ২০ মিলিয়ন হেক্টর জমি আনা হয় এবং কাষ্ঠ শিল্প উন্নতির প্রতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বনভূমি থেকে আহৃত কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র ও গৃহ নির্মাণ সামগ্রী তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

সরকারি কারখানা বেসরকারিকরণ ঃ ভূ-স্বামী ও জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে সরকার জমি অধিগ্রহণ করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণের ফলে প্রাক্তন জমিদারগণের অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থার উন্নতি কল্পে বিক্রিত জমির জন্য ক্ষতিপূরণ বাবত প্রাপ্ত অর্থ জমিদারেরা যাতে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে ব্যয় করতে পারে তার জন্য সরকারি কারখানাগুলো বেসরকারিকরণ করে তাদের দেওয়া হয়। মিলকারখানার জন্য শেয়ারের অংক নির্ধারিত হয়, যার প্রতিটির মূল্য ছিল ১০০০ রিয়াল। প্রতিটি শেয়ারে ৬% মুনাফা নিশ্চিত ছিল। রেজা শাহের সরকার বিদেশী পুঁজিপতিদের দেশে অর্থ বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ দান করে এবং এর ফলে দেশে অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠে। ফলে শ্রমিকেরা বেকারত্ব থেকে নিষ্কৃতি পায়। সরকারি ও বেসরকারি উদ্দোগে অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ও মিল কলকারখানা গড়ে উঠে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালের দিকে ইরানে ২,২৭০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল এবং এই সমস্ত কল-কারখানায় প্রায় ১৬ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত ছিল। রেজা শাহ্ এভাবে শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেন।

মজদুরদের অধিক পরিমাণ মুনাফা প্রদান ঃ শিল্প বিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত হলে কলকারখানা উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মজদুরদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তাদের মুনাফার হার বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই মুনাফার পরিমাণ ছিল লভ্যাংশের ২০% ভাগ। শিল্প বিপ্লব এবং ভূমি সংস্কার আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল মজদুর ও কৃষক ইউনিয়ন বা কোয়াপারেটিভ (সমবায়) গঠন। মিল মালিকদের সঙ্গে মজদুরদের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে শিল্প সম্পর্ক তিক্ততার পরিণত না হয়। এই যৌথ চুক্তির ফলে ইরানের এক হাজার করকারখানার ৯০,০০০ মজদুরদের স্বার্থ রক্ষা পায়। সমবায়ের মাধ্যমে মজদুরদের চিকিৎসা, বাসস্থানসহ সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। এমন কি আহত হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল। তাদের জন্য জীবন বীমার বন্দোবস্ত করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের লভ্যাংশের স্থলে বোনাস দেওয়া হত। শ্রমিক কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা দ্বারা শ্রমিকেরা ঋণ লাভের সুযোগ পায়। একটি পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ১৯৭৩ সালে ইরানে ৬,৭১,৪৫১ জন শ্রমিক কলকারখানায় নিয়োজিত ছিল এবং তাদের কল্যাণে গঠিত হয় ১০০৬টি সমবায় সমিতি।

www.pathagar.com

সার্বজনীন ভোটাধিকার আইন ঃ রেজা শাহের সংস্কার আন্দোলনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ২০ বছরের উর্ধ্বে সকল নাগরিকের ভোট প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ। আইন পাশ করে এই ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। পূর্বে ভূ-স্বামীগণই বেশির ভাগ জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারত। রেজা শাহ্ প্রথম বারের মত মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করেন। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় ইরানী মহিলাদের ভোটাধিকার লাভ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এভেরী বলেন যে, "ইরানী মহিলাদের ভোটাধিকার মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং অন্তঃপুরিকাগণ মজলিস ও সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হতে থাকেন।" এমন কি তাদেরকে মন্ত্রী পরিষদেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শিক্ষা সংস্কার ঃ জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে রেজা শাহ্ শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষা কোর বা বিগ্রেড গঠন করেন। শিক্ষার আলো বিস্তারের জন্য তিনি উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার কৃতকার্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বিগ্রেড তৈরি করেন। এই বিগ্রেডের সদস্যদের দেড় বছর গ্রামাঞ্চলে অবস্থান করে নিরক্ষর জনসাধারণকে বিদ্যাশিক্ষা দান করতে হত। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিরক্ষতার হার হ্রাস পেয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রথম দিকে ২,৪৬০ জন তরুণ এই শিক্ষা বিগ্রেডে ছিল, যা পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৯,৭২৩ জনে। নিম্নস্তরে শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে উচ্চ স্তরে শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে থাকে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজারদের শাসনামলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১১ সালে। ১৯২১ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য কাউন্সির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপিত হয়। প্রথম রেজা শাহের আমলে শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। রেজা শাহের সিংহাসনচ্যুতির সময় সমগ্র দেশে ছত্রিশটি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। ড. আমিন বানানী তাঁর (The Modern Nation of Iran, 1921-1941) গ্রন্থে শিক্ষকদের পেশার প্রতি সরকারের শুভ দৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় রেজা শাহের রাজত্বে ইঙ্গ-ফরাসী কনসের্টিয়ামকে ৭৭০টি কৃষি স্কুল, ৭৮০টি সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে দশটি গ্রামের মধ্যে মাত্র দুটিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হত। ১৯৬১ সালে শাহের শিক্ষিতের হার যেখানে ৬৫% ভাগ ছিল সেখানে গ্রামাঞ্চলে ছিল মাত্র ১৫% ভাগ। শিক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা কোর হিসেবে সেনাবাহিনীর নবীন ক্যাডেটদের নিযুক্ত করা হয়। শিক্ষা বিস্তারের এই ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ১৯৭৩ সালে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা পৌঁছায় ৫০ লক্ষে এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,১৫,০০০ জনে।

জনস্বাস্থ্য সংস্কার ঃ শিক্ষা বিস্তারের জন্য রেজা শাহ্ যে প্রকার সুষ্ঠু এবং সংঘবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি কল্পেও তিনি অনুরূপ ব্যবস্থা চালু করে। শিক্ষা বিগ্রেডের মত স্বাস্থ্য বিগ্রেডও গঠন করা হয়। প্রাথমিক স্তর সালতানাবাদে ৪২৩ জন প্যারামেডিকদের নিয়ে সামরিক ব্যারাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা প্রশিক্ষণ লাভের পর ৬০,১৩,০০০ গ্রামে চিকিৎসা দানের জন্য ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রায় ৬০ লক্ষ

www.pathagar.com

লোক উপকৃত হয়। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পদক্ষেপও এই স্বাস্থ্য বিগ্রেডের সদস্যরা গ্রহণ করে, যেমন- পানির পাইপ ও হাম্মামখানা প্রতিষ্ঠা এবং কূপ ও ঝর্ণা পরিষ্কার। এর পাশাপাশি তারা বৈদ্যুতিক আলো ঘরে ঘরে পৌঁছানোর জন্য জেনারেটর স্থাপন করে। এছাড়া রাস্তা-ঘাট সংস্কারও তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সংক্রামক ব্যাধির জন্য টিকার ব্যবস্থা করা হয়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জনসাধারণ বিনামূল্যে চিকিৎসা লাভ করে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ যেমন লায়নস ক্লাব ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জনহিতকর কাজে নিয়োজিত ছিল। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। চিকিৎসক তৈরির জন্য ছিল মেডিক্যাল কলেজ।

কৃষি সংস্কার ঃ রেজা শাহের 'শ্বেত বিপ্লবে'র কর্মসূচি গ্রামের উন্নয়ন ও কৃষক সমাজের সার্বিক উন্নতিতে বিশেষ প্রাধান্য পায়। ভূমি সংস্কারের পাশাপাশি গ্রামের জীবনযাত্রায় গতি সঞ্চারের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বাহিনী গঠিত হয়। পূর্বে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিকাজের উৎসাহ (motivation) দেওয়া হত না; কৃষিবীজ, সেচ ও পোকামাকড় থেকে শস্যকে রক্ষার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করা হত না। কৃষি শিক্ষার জন্য কোন কলেজও ছিল না। প্রথম রেজা শাহ ১৯৩০ সালে সর্বপ্রথম কৃষি ব্যাংক, একটি বনরক্ষণ বিদ্যা সম্পর্কিত (Forestry) স্কুল এবং কৃষি কলেজ স্থাপন করেন। শস্যাগার (Silo) বিভিন্ন শহরে নির্মিত হয়। ১৯৩০ সালে ভূমি উন্নয়ন আইন (Land development Act) জারী করা হয়। কিন্তু রেজা শাহের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়নি। দ্বিতীয় রেজা শাহ পাহলভী পিতার কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিকে সুদূরপ্রসারী করেন। তিনি কৃষি বিগ্রেডের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিগ্রেডের মত গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে কৃষি বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেন। কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, যান্ত্রিক উপায়ে ভূমি কর্ষণ, কীট নাশক সম্বন্ধে জ্ঞান, গৃহপালিত জীবজন্তু, যেমন- গরু, মহিষের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞান দানই ছিল কৃষি বিগ্রেডের প্রধান দায়িত্ব। কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। তৃণমূল পর্যায় (grass route level) কৃষকদের সচেতেন করে তোলার জন্য চাষী ক্লাব গঠিত হয়। পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। গ্রাম উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, যেমন রাস্তাঘাট উন্নয়ন, প্রদর্শন খামার প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ রোপণ, পয়োঃপ্রণালী স্থাপন, পুল ও হাম্মাম নির্মাণ, ডাক বাক্স স্থাপন, খেলাধূলার জন্য মাঠ নির্মাণ, বাগান প্রতিষ্ঠা। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কৃষি বিগ্রেডের দায়িত্ব ছিল। কৃষি বিগ্রেডের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কৃষককূল সচেতন হয়ে উঠে এবং গ্রামের আধুনিককরণ শুরু হয়।

ন্যায় আদালত ও মধ্যস্থতা কাউন্সিল গঠন ঃ বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করে বিচারকে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের দোরগোড়ায় পৌঁছাবার জন্য রেজা শাহ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গ্রামবাসীদের পক্ষে শহরে গিয়ে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা যাতায়াতের অভাবে ও অর্থাভাবে সম্ভবপর হত না। এই কারণে গ্রামাঞ্চলে ন্যায় আদালত ও শহরে মধ্যস্থতা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে ৩১৬৪টি বিচারালয় এবং শহরে ১১৬টি মধ্যস্থতা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। জমি-জমা সংক্রান্তে

www.pathagar.com

মামলার জন্য গ্রাম্য আদালত ১০,০০০ রিয়াল মূল্য পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমাধান করতে পারত। এই অংকের উপরের মামলা শহরে বিচারের জন্য প্রেরিত হত।

জলসম্পদ জাতীয়করণ ঃ রেজা শাহ্ উপলব্ধি করেন যে, একটি জাতির সার্বিক উন্নতিকল্পে বিদ্যুৎ অপরিহার্য। এই কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ২৩টি বাঁধ দিয়ে জল-বিদ্যুৎ (hydroelectric) উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। জল সম্পদকে সরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন করে জাতীয় অগ্রগতিতে প্রয়োগ করা হয়। কৃষি কাজে সেচ ব্যবস্থা চালু ও বন্যা নিয়ন্ত্রণেও বিদ্যুতের ব্যবহার রয়েছে। দেশের পানি সম্পদকে সুষ্ঠু ব্যবহার করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের জন্য পানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় তৎপর ছিল। রেজা শাহের সময়ে নির্মিত উল্লেখযোগ্য বাঁধের মধ্যে ছিল শাহবানু ফারাহ্ বাঁধ, শাহ্পুর বাঁধ, রেজা শাহ্ বাঁধ, মোহাম্মদ রেজা শাহ্ বাঁধ, শাহ্ আব্বাস বাঁধ।

শহর ও গ্রামাঞ্চল পুনর্গঠন ঃ শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য বিগ্রেডের সহায়তায় মোহাম্মদ রেজা শাহ্ গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রায় আমূল পরিবর্তন আনেন। গ্রামের মানুষ শহরে মানুষের মত সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় সার্ভিসের আওতায় বিগ্রেডের সদস্যদের নিয়োগ করা হয়।

প্রশাসনিক সংস্কার ঃ "শ্বেত বিপ্লবে'র অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রশাসনিক সংস্কার। রেজা শাহ্ দু'টি প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। প্রথমটি মজলিসে বিল পাস করে তাঁর ব্যক্তি সম্পত্তির কিয়দংশ জনগণের মঙ্গলার্থে ব্যয়ের জন্য "রাজকীয় ফাউন্ডেশন" নামে এক সংস্থার নিকট হস্তান্তর। দ্বিতীয়টি সাত বছর ব্যাপী মাস্টার প্লান তৈরি করে ইরানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। এই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় ১৩৭,০০০,০০০ পাউণ্ড স্টার্লিং। এভেরীর মতে, এই বিপুল অংকের টাকা সাত বছর ব্যাপী উন্নয়নমূলক প্লানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাথাভারী আমলাতন্ত্রের চাপ সহ্য করতে না পেরে সুবিধাবাদীদের অধিক চাকরি প্রদানের জন্য একটি পন্থা মাত্র। এতদসত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজ তদারক করার জন্য মন্ত্রণালয় আমলা-রাজকর্মচারী নিযুক্ত হয়। প্রশাসনিক মান উন্নয়নের জন্য একটি সিভিল সার্ভিস কোর্ড প্রণীত হয়। এই বিধিবদ্ধ আইনে রাজকর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়। রেজা শাহ্ বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ করে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনকে প্রসারিত করেন। এই কারণে তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিগ্রেড সৃষ্টি করেন।

মোহাম্মদ রেজা শাহ কর্তৃক প্রবর্তিত 'শ্বেত বিপ্লব' ইরানের মধ্যযুগীয় ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে এক নব-জাগরণের সূচনা করে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে তিনি সংস্কার করে ইরানকে একটি আধুনিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তিনি সফলকাম হতে পারেননি। এ কারণে পুঞ্জিভূত নিরাশা ও হতাশা ইরানের জনগণকে ১৯৭৯ সালে এমনভাবে গ্রাস করে যে, তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। খোমেনী পরিচালিত ইরানী ইসলামী বিপ্লবই তাঁর মর্যাদা, সমৃদ্ধি এবং ক্ষমতা ধূলিসাৎ করে দেয়। বিভিন্ন কারণে স্বদিচ্ছা থাকলেও রেজা শাহে 'শ্বেত বিপ্লব' সফলকাম হয়নি। সফলকাম হলে ১৯৭৯ সালে তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হতেন না।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

পাহ্লভী বংশের পতন এবং ইসলামী বিপ্লব

পটপ্রেক্ষিত ঃ ১৯৭৯ সালের ইরানের গণ অভ্যুত্থানের পটভূমি অত্যন্ত ব্যাপক ও যুগান্তকারী। এর ফলে এই গণবিপ্লব ইরানের আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্র, যা মহান সাইরাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। গণ-আন্দোলনের সাফল্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শাহেন শাহ্ মোহাম্মদ রেজা শাহের পতন, নির্বাসন এবং সেই সাথে পিতা প্রথম রেজা শাহ্ কর্তৃক ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত পাহ্লভী রাজবংশের বিলুপ্তি। ইরানের ইসলামী বিপ্লব, যা আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনীর নেতৃত্বে সফলতা লাভ করে, বিভিন্ন কারণে সংঘটিত হয়।

১. সনাতন সমাজ ব্যবস্থা ঃ পাহ্লভী রাজবংশের পতন পাহ্লভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রেজা শাহের সংস্কারের ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্যে নিহিত রয়েছে। প্রথম রেজা শাহ ইরানের সনাতন সমাজ ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে রাতারাতি পাশ্চাত্যের প্রভাবে আধুনিকীকরণের প্রয়াস পান। কিন্তু তিনি কাজার সুলতান নাসিরুদ্দীন শাহ্ এবং মোজাফফরউদ্দীন শাহের মত কখনও ইউরোপে ভ্রমণ করেননি। জি. লাঞ্জাওয়েস্কী বলেন যে, "তিনি কখনও ইউরোপ ভ্রমণ করেননি এবং আধুনিকীকরণের ধ্যান-ধারণা ছিল খুবই সনাতনী।" ("Reza Shah had never been in Europe and his concepts of modernization were sometimes native.") রেজা শাহের পাশ্চাত্যকরণ সম্পর্কে রিচার্ড ফ্রাই বলেন, "শাহ্ বলপূর্বক জনগণের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন এবং এর ফলশ্রুতিতে এই বিপ্লব সমাজের গভীরে প্রবেশ না করে উপরে ভাসমান স্তরে ছিল। ("The Shah forcibly revolutionized the social and religious life of his people and as a result the revolutions took place mainly on the surface.") দ্বিতীয় রেজা শাহের সময়ে আধুনিকীকরণ বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেনি।

২. বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় গোষ্ঠীদের বিরোধিতা ঃ ইরানকে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা প্রচন্ড বিঘ্ন আসে গোঁড়াপন্থী শিয়া সম্প্রদায়ের নিকট থেকে। পাশ্চাত্য প্রভাবে ইরানে বুদ্ধিজীবী (Elite) শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং ধর্মহীনতার মাত্রাও বেড়ে যায়। পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রভাব এরূপ বিস্তার লাভ করে যে আহম্মদ কাসাভী ১৯৩২ সালে তাঁর গ্রন্থ 'আইন'-এ ইসলাম পরিপন্থী যে মতবাদ প্রচার করেন তা গোঁড়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। কাসাভী 'বাহাই' ধর্ম মত বিশেষ করে 'আহরিমা' এবং পরিত্রাণকর্তা (Messiah) সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন তা সুন্নী জামাতের পরিপন্থী। মোহাম্মদ রেজা শাহের সরকার পূর্ববর্তী সরকারের ন্যায় মোল্লা শ্রেণীর উপর অকথ্য নির্যাতন করে।

www.pathagar.com

৩. ইসলাম পরিপন্থি কার্যকলাপ ঃ মোহাম্মদ রেজা শাহের 'শ্বেত বিপ্লব' বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী ও আত্মঘাতী পদক্ষেপের জন্য সফলকাম হয়নি। রেজা শাহ ইরানের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ১৯৬২ সালে ইরানের মন্ত্রীসভা প্রাদেশিক ও নগর কাউন্সিল সংক্রান্ত একটি বিল অনুমোদন করে। এতে ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম সম্পর্কিত বিধানটি বাদ দেওয়া হয়। অথচ সংবিধানে সকল নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যকে ইসলাম সম্পর্কিত ধারাটি মেনে চলতে বলা হয়। বিধানটি পরিবর্তন করে বলা হয় যে, "নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য পবিত্র কুরআন নিয়ে শপথ করাটা বাধ্যতামূলক নয়, তারা যে কোন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ গ্রহণ করতে পারবেন। কোন নগরীতে অবস্থানরত আয়াতুল্লাহ খোমেনী এ বিলটিকে সংবিধান বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু শাহ জবাবে বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী আলম নিজ দায়িত্বেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। খোমেনী প্রধানমন্ত্রীর নিকট তারবার্তা পাঠিয়ে বিলের বিরোধিতা করেন এবং ইরানী জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্তের বিরুদ্ধে হুশিয়ার করে দেন।

৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ ঃ প্রথম রেজা শাহের ইরানকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কামাল আতাতুর্কের 'হ্যাট ল'-এর মত তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ ইউরোপীয় ধাঁচে প্রচলন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ১৯৩৫ সালে তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাসহ পাশ্চাত্যের আধুনিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে জনসম্মুখে উপস্থিত হয়ে কেরিকেচারের (Caricature)-এ সামিল হন; কারণ কোট ও পাতলুন প্রচলন ও পর্দা প্রথার উচ্ছেদের জন্য দেশে দাঙ্গা দেখা দেয়। শহরে কিছুটা পালিত হলেও এই নিয়ম গ্রামাঞ্চলে কেহ গ্রাহ্য করেনি। নারী স্বাধীনতা ইরানী রক্ষণশীল সমাজে বিশেষ রেখাপাত করে নি। মোহাম্মদ রেজা শাহ মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করেন এবং এরপর থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে মহিলাগণ অবদান রাখেন। উপরন্তু, ১৯৬৭ সালে পরিবার সংরক্ষণ আইন (Family protection law) পাস করা হয়। এ আইনের বলে মহিলাগণ পুরুষদের সমতুল্য বিবাহ, তালাক, সম্পত্তিতে অধিকার, শিশুদের উপর সমান দাবীদার হয়ে উঠে। নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অনৈসলামিক ফতোয়া দিতে ইরানী মোল্লা শ্রেণী বিলম্ব করেনি। কারণ তারা সহজেই উপলব্ধি করেন যে, পাশ্চাত্য প্রভাবে ইরানে মদ, জুয়া, বেলিল্লাপনাসহ অনৈসলামিক কার্যকলাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনৈক লেখক বলেন, "সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইরানের ইসলামী ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার জন্য রেজা শাহ সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতিকে সে ইরানবাসীর উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা (ক্যাবারে নৃত্য) মদ, জুয়ার সয়লাবে গোটা দেশ ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে শুড়িখানা ও নৈশক্লাবের আড্ডা প্যারিস-নিউইয়র্ককেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ইসলামী ঐতিহ্যের অনুসারী ইরানের নারী সমাজকে আধুনিকতার নামে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।"

www.pathagar.com

৫. অর্থনৈতিক সঙ্কট ঃ ইরানের তৈল সম্পদকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত গতিতে চলে। কাজার ও পাহলভী বংশের রাজত্বকালে বিদেশীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়; তামাক ও তেল কনসেশন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানি একচেটিয়াভাবে তেল উত্তোলন, বাজারজাত করে মাত্র ১৬% রয়ালটির বিনিময়ে ইরানকে দেউলিয়া করে তোলে। ড. মোসাদ্দেক ১৯৫১ সালে মজলিসে তেল শিল্পকে জাতীয়করণ করলেও পাশ্চাত্যের চক্রান্তে মোহাম্মদ রেজা শাহ কর্তৃক পদচ্যুত হন। কিন্তু রেজা শাহকেও সাময়িকভাবে দেশ ত্যাগ করতে হয়। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মজলিস ও শাহের মধ্যে প্রকট আকারে দেখা দেয়, যার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ। অর্থনৈতিক দিক থেকে ইরানকে পঙ্গু করার আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলে। জনৈক লেখক বলেন, "ইরানের তেল সম্পদের বিরাট লভ্যাংশ ব্রিটেন ও মার্কিন তেল কোম্পানির হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো ইরানে তাদের প্রভাব সম্প্রসারিত করেছিল। বস্তুতঃ ইরানের অর্থনীতিকে পরনির্ভরশীল এবং বিশ্বপুঁজিবাদের চারণভূমিতে পরিণত করা হয়েছিল।

৬. রাজকীয় বিলাসিতা ঃ অর্থনৈতিক সঙ্কটের পাশাপাশি রাজ পরিবারের অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতা, স্বজনপ্রীতি (ঘৃণ্য পুলিশ বাহিনী সাভাকের প্রধান ছিলেন রানী সুরাইয়ার আত্মীয়) এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দানা বাধে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রাজ পরিবারের সদস্যদের মালিকানায় রাষ্ট্রের বেশির ভাগ আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। রাজ পরিবার বিলাসিতায় কালাতিপাত করত। কথিত আছে যে, শাহান শাহের স্ত্রী ফারাহ দীবার দৈনিক খরচ ছিল কয়েক লক্ষ ডলার, যা সরকারি তহবিল থেকে দেওয়া হত।

৭. শাহের একনায়কত্ব ও অসাংবিধানিক কার্যকলাপ ঃ রেজা শাহ 'শ্বেত বিপ্লব' দ্বারা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টায় বিফল হন। কারণ এই ভূমি সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কার তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছেনি। এই সমস্ত সংস্কার ছিল এক ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিলাসিতা। তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং মজলিস ও সিনেটের কোন সিদ্ধান্ত মানতেন না। যার ফলে সাংবিধানিক সঙ্কটই শুরু হয়নি বরং তিনি ইচ্ছামত প্রধানমন্ত্রীকে পদচ্যুত এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করতেন। ১৯৫৩ সালের ১২ই আগস্ট মোসাদ্দেক জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে শাহান শাহ এক ফরমান জারী করে তাঁকে পদচ্যুত করে এবং তাঁর স্থলে জেনারেল ফয়জুল্লাহ জায়েদীকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু শাহের আদেশ মোসাদ্দেক অমান্য করলে জায়েদীর নিয়োগ বাতিল হয়ে যায় এবং ১৯৫৩ সালের ১৬ই আগস্ট প্রথম বারের মত শাহকে দেশত্যাগ করতে হয়। জনপ্রিয়তা হারালে মোসাদ্দেক জেনারেল জায়েদীর নিকট ২০শে আগস্ট আত্মসমর্পণ করেন এবং ২২শে আগস্ট শাহান শাহ পুনরায় সিংহাসনে বসেন। ১৯৫৩ সালে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে শাহ স্বেচ্ছাচারী শাসন শুরু করেন। কারণ ইতিপূর্বেই তিনি একটি সিভিল সার্ভিস প্রবর্তন করেন এবং সেনাবাহিনীর সমর্থন লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে ডঃ মনুচেহের ইকবাল প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করে মজিলসে নিজেকে শাহের দাস বা 'চাকির'

www.pathagar.com

(Chakir) হিসেবে ঘোষণা করেন। এভেরীর মতে, "এইভাবে প্রধান মন্ত্রীত্ব শাহের করতলগত হল।" তিনি মজলিসে জাতীয়তাবাদী সরকারি দল বা হিযব-ই-মিল্লিয়ান' গঠন করে শাহের স্বৈরাচারকে সুদূরপ্রসারী করেন।

৮. নিপীড়ন ও নির্যাতন ঃ ইরানে শাহান শাহের রাজত্বকাল নির্ভর করে এক কুখ্যাত গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর তৎপরতায়। এই নৃশংস ও অত্যাচারী বাহিনীর নাম ছিল সাভাক (Savak)। ১৯৪৯ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রেজা শাহ তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে একজন আততায়ীর গুলিতে আহত হন। এরপর তাঁর নিরাপত্তা এবং দেশের স্থিতিশীলতার জন্য তিনি সামরিক আইন জারী করেন। মজলিসের ক্ষমতা হ্রাস করে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার (executive) ক্ষমতা স্বীয় হস্তে গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাতে সাংবিধানিক সঙ্কট বাড়ে। এভেরী যথার্থ বলেন যে, "প্রথম রেজা শাহের সিংহাসন চ্যুতির পর থেকে এই সঙ্কট অব্যাহত ছিল এবং দ্বিতীয় রেজা শাহের প্রাণের প্রতি হুমকী বহুদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ("exposed the forces seething below the surface") এবং একটি সাবধান সংকেত (warning shot) মাত্র।" যাহোক, ১৯৫৭ সালে তেহরানসহ অন্যান্য কতিপয় এলাকা থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করলে রাজপরিবারের নিরাপত্তার জন্য তিনি সাভাক নামে এক গুপ্ত ও জিঘাংসামূলক পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। সাভাক ফারসীতে 'সাজমান-ই-আমনিয়াত-ওয়া-কিসওয়ার' (Organisztion for security of the State) নামে পরিচিত ছিল। এই কুখ্যাত বাহিনীর আধিনায়ক ছিলেন রাণী সুরাইয়া আত্মীয় জেনারেল তৈমুর বখতিয়ার। এই বাহিনী গঠনে আমেরিকার secret service (F.B.I) বা গুপ্ত বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করা হয়। শুধুমাত্র নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার নামে অসংখ্য নিরীহ জনগণকে গ্রেফতার, নির্যাতন, পঙ্গু ও হত্যা করা হয় এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও এই বাহিনী খর্ব করে। সাভাক বাহিনীর নৃশংসতা ও বর্বরতায় জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত ছিল এবং একে নির্যাতনের একটি চাবিকাঠি (Instrument) মনে করত। তাদের অত্যাচারের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেলে জনগণ শাহের সরকারকে উৎখাত করতে বদ্ধ পরিকর হয়। সাভাকের সদস্যরা শাহের প্রীতিভাজন ছিল এবং সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পেত। শাহ বিরোধী আন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লবে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী নেতৃত্ব দেন।

৯. রাজনৈতিক সঙ্কট ঃ শাহান শাহ রেজা শাহ উত্তরাধিকারসূত্রে পাহলভী বংশের সিংহাসনে বসেন। তাঁর পিতা বিতাড়িত হলে বৃহৎশক্তিবর্গ তাদের স্বার্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে মোহাম্মদ রেজাকে পাহলভী সিংহাসনে বসায়। ১৯৪১ থেকে ১৯৭৯ সালে খোমেনী পরিচালিত ইসলামী বিপ্লবের ফলে বিতাড়িত হবার পূর্বপর্যন্ত মোহাম্মদ রেজা শাহের শাসন সঙ্কটজনক ছিল। ভাগ্য বিপর্যয় হলেও তিনি স্থূল কূটনৈতিক চালে রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে স্বীয় গদী বজায় রাখেন। উল্লেখ্য যে, মোহাম্মদ রেজা শাহের রাজত্বকালে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল তৎপর ছিল তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য; (১) কমরেড পার্টি, 'হামবাহান', (২) ফ্রিডম পার্টি, 'আজাদী', (৩) জাস্টিস পার্টি, 'আদালত', (৪) পেট্রিয়ট পার্টি, 'মিহান পারপাসতান, (৫) তুদেহ, 'কমিউনিস্ট পার্টি', (৬)

www.pathagar.com

ন্যাশনাল উইল পার্টি, 'ইরাদা-ই-মিল্লী', (৭) ন্যাশনালিস্ট পার্টি, 'মিল্লীয়ান-ই-ইরান', (৮) ন্যাশনাল ফ্রন্ট 'মোসাদ্দেক', (৯) নিউ-ইরান পার্টি 'ইরান-ই-নভিন'। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে গঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদ, কোন্দল, বিদ্বেষ ও টানাপোড়ানে ইরানের রাজনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শাহ্ ক্রমশঃ ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে থাকেন এবং সরকারি পার্টি 'হিযব-ই-মিল্লীয়ান'কে প্রাধান্য দেন। তিনি অবশ্য এক 'সরকারি' বিরোধী দল গঠন করেন, যার নাম দেওয়া হয় 'হিযব-ই-মারদুন'। শাহের স্বৈরাচারী নীতির প্রতিফলন দেখা যায় যখন তিনি ১৯৫৪ সালে তুদেহ পার্টির সমর্থনে একটি সামরিক 'ক্যুর' খবর পান। ১৯৫৫-৫৬ সালে তুদেহ্ পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং তাদের সদস্যদের গ্রেফতার, নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। শাহের নির্যাতন ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যখন তিনি আর দুই পার্টি ভিত্তিক (সরকারি ও বিরোধী) রাজনীতিতে আস্থাবান হলেননা। তিনি সমস্ত রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে দিয়ে একটি সংগঠন তৈরি করেন, যার নাম ছিল 'রেজারেকশন পার্টি' (Rastakhiz-i-Iran)। এভেরী যথার্থই উল্লেখ করেন যে, "এ ধরনের পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ক্ষমতা শাহের হাতে কেন্দ্রীভূত করা।"

১০. ধর্মীয় নেতাদের অবদান ঃ মোহাম্মদ রেজা শাহ্ পাহ্লভীর সিংহাসনচ্যুতি ও ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের মূলে ইরানের রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় নেতাদের অবদান অনস্বীকার্য। জনৈক লেখক বলেন যে, ইরানী জনগণের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ জনগণের কাছে সাম্রাজ্যবাদ, স্বৈরতন্ত্র ও শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ তুলে ধরেন। মূলতঃ ইরানের ইতিহাসে কাজার বংশ থেকে পাহলভী বংশের শেষ পর্যন্ত মোল্লাগণ নেতৃত্ব দেন। ১৮৯২ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গন-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মুজতাহিদ মীর্জা-হাসান সিরাজী, সাইয়েদ মুহম্মদ বিহ্বাহানী, সাঈদ তাবাতাবাঈ, শেখ ফজলুল্লাহ্ নূরী, আয়াতুল্লাহ্ কাসানী প্রভৃতি আলেমবৃন্দ। তাঁরাই ১৮৯২ সালে তামাকের বিরুদ্ধে প্রথম ফতোয়া দেন, যার ফলে রাজপরিবারেও তামাক সেবন বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০৬ সালের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে আলেমগণ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। রেজা শাহের 'শ্বেত বিপ্লবের' বিরুদ্ধে ইরানের মোল্লাহ শ্রেণী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শাহের উৎখাতের পশ্চাতে আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ খোমেনী ও আয়াতুল্লাহ্ তেলেঘানীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইরানীর রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব বহু দিন থেকে পরিলক্ষিত হলেও, মোহাম্মদ রেজা শাহের বিরুদ্ধে তথা পাহলভী রাজবংশ উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে খোমেনীর নেতৃত্বে যে গণ বিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন শুরু হয় তার নজীর ইতিহাসে বিরল। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত পাহ্লভী বংশ ২৫০০ হাজার বছরের রাজতন্ত্রের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে মোহাম্মদ রেজা শাহ্ নিজেকে 'আরিয়ামেহের' (Aryamehr) অর্থাৎ আর্য জাতির সূর্য হিসেবে ঘোষণা এবং সমগ্র দেশে উৎসব পালন রক্ষণশীল, গণতন্ত্রপন্থী, রাজতন্ত্রবিরোধী মোল্লা শ্রেণীকে বিচলিত করে তোলে। উপরন্তু, মোসাদ্দেকের পতনে তারা শঙ্কিত হয়ে উঠে। বিদেশী দখলদার বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইরানে যে প্রভাব বিস্তার করে

www.pathagar.com

তাতে ইরানের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয়। রেজা শাহ জাতীয় তৈল কোম্পানি থাকা সত্ত্বেও বিদেশী পুঁজিপতি ও তেল ব্যবসায়ীদের কনসর্টিয়ামের মাধ্যমে তেল উত্তোলনের যে সুযোগ দেন তাতে ইরান অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। বিদেশী আগ্রাসন ও অর্থনৈতিক দাসত্ব মোল্লা শ্রেণী পছন্দ করেনি। ইসলাম বিরোধী সংস্কার, 'শ্বেত বিপ্লবের' নামে শোষণ, সাভাক গঠনের মাধ্যমে নির্যাতন, এক পার্টি (রাস্তাখিজ) গঠন করে এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা, তুদেহ কমিউনিস্ট দলের প্রভাবে বিজাতীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ মোল্লা শ্রেণী বরদাস্ত করেননি। এ সমস্ত কারণে ইসলামী বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে।

খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব ঃ

প্রাথমিক স্তর ঃ ইরানের ইতিহাসে ইসলামী বিপ্লব এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কারণ রেজা শাহের (প্রথম) ভাষায় ইরানের দীর্ঘ আড়াই হাজার বছরের রাজত্বকালের (kingship) পরিসমাপ্ত ঘটে ১৯৭৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের ফলে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত করেন আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী। ১৯৭৮ সালে শেষার্ধে এই গণবিক্ষোভ শুরু হয়, যার ফলশ্রুতিতে দৌর্দণ্ডপ্রতাপ পশ্চিমা শক্তির মদদপুষ্ট মোহাম্মদ রেজা শাহকে দ্বিতীয় এবং শেষ বারের মত সিংহাসনচ্যুত হয়ে দেশত্যাগ করতে হয়। এই সময় শাহ জনপ্রিয়তা হারিয়ে রাজনৈতিক দলের প্রচন্ড বিক্ষোভ ও বিদ্রূপের পাত্র হয়ে উঠেন। তাঁর পতনে যে সমস্ত দল সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের বিভেদ ভুলে গিয়ে শাহের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকরে তাদের মধ্যে (১) ইসলামপন্থী আলেম ও মোল্লাশ্রেণী, (২) মধ্যমপন্থী জাতীয়তাবাদী ন্যাশনাল ফ্রন্ট, (৩) বামপন্থী তুদেহ পার্টির দলছুট সদস্যবর্গ, (৪) ছাত্র জনতা; অপরদিকে শাহের সমর্থকদের মধ্যে ছিল (১) রাজভক্ত অনুচর, (২) সরকারি রাস্তাখিজ পার্টির সদস্যবৃন্দ, (৩) ঘৃণ্য, কুচক্রী ও পাষণ্ড সাভাক নামক গুপ্ত ঘাতক পুলিশ বাহিনী, (৪) ডানপন্থী রাজনীতিবিদেরা।

খোমেনীর ব্যক্তিত্ব ঃ ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে ২২৫ কি. মি. দক্ষিণে খোমাইন নামক শহরে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল-মুসাভী জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান থেকে তাঁর উপাধি হয় খোমেনী। খোমেনীর প্রপিতামহ সাঈদ দ্বীন আলী শাহ কাশ্মীরে বসবাস করতেন এবং পিতামহ সাঈদ আহমদ হিন্দী কাশ্মীর থেকে ইরাকের নাজাফে এসে বসবাস করেন। তিনি ইরানের খোমেইন শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইউসুফ খানের কন্যাকে বিবাহ করে খোমাইন এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। খোমেনীর পিতার নাম সাঈদ মোস্তফা এবং তিনি পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি আরাক ও কোমে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আইনজ্ঞ ও ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে খুব অল্প দিনে খ্যাতি অর্জন করেন। ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান অর্জন করে তিনি দর্শন শাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন। ইমাম খোমেনীর জনপ্রিয়তা দেখে প্রথম রেজা শাহ শঙ্কিত হয়ে উঠেন। কোমের ফাউজিয়া মাদ্রাসায় তিনি তাঁর শিক্ষকতা অব্যহত রাখেন এবং অল্প সময়ে আয়াতুল্লাহ হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কিন্তু মোহাম্মদ রেজা শাহের রাজত্বে ১৯৬৪ সালে ৩৫ বছর বয়সে স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর চক্রান্তে তাঁর শিক্ষকতা জীবনের অবসান হয়। তিনি কোম থেকে ইরাকের নাজাফে বিতাড়িত হন। কোম পরবর্তীকালে

www.pathagar.com

আয়াতুল্লাহর সহযোগীদের প্রচেষ্টায় শাহ বিরোধী ইসলামী বিপ্লবের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। প্রবাসে অবস্থান করে তিনি ইরানের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান। ১৯৬৪ সালে খোমেনীর উপর শাহ বিরূপ ছিলেন এই কারণে যে তিনি তাঁর তথাকথিত শ্বেত বিপ্লবের তীব্র সমালোচনা করেন। শাহ আক্রোশবশে খোমেনীকে 'উন্মাদ ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' বলে আখ্যায়িত করেন।

১৯৬১ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ঘটনাপঞ্জী

১৯৬১ : ইরানে শাহ বিরোধী ইসলামী বিপ্লবের গোড়ার দিকে শিয়া রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রধান আয়াতুল্লাহ বুরুজারদি নেতৃত্বে দেন। ১৯৬১ সালে বুরুজারদির ইন্তেকালের পর আলেম সমাজ ও জনগণ মুজতাহিদ, ধর্মীয় নেতা, দর্শন, ফিকহ ও নীতি শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ আলেম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। ১৯৬১ সালে প্রভাবশালী সর্বজন শ্রদ্ধেয় খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের গতি সঞ্চারিত হয়। শাহ মাদ্রাসাভিত্তিক ধর্মীয় গোষ্ঠীদের উপর নানা প্রকার চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। এমন কি তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার উপর কড়াকড়ি আরোপ করেন। শাহের সাতে ধর্মীয় নেতা খোমেনীর দ্বন্দ্বের এখানেই সূত্রপাত হয়। তিনি স্বৈরাচারী শাহের ইসলাম বিরোধী শাসনকে উৎখাত করতে চাইলেন এবং নানা প্রকার প্রচারণা পত্র বিলি করতে থাকেন।

১৯৬২ : ইরানী মন্ত্রীসভা ১৯৬২ সালে প্রাদেশিক ও নগর কাউন্সিল সংক্রান্ত বিল অনুমোদন করলে খোমেনী তার বিরোধিতা করেন। এই বিলে উল্লেখ আছে "নির্বাচিত প্রতিনিধির জন্য পবিত্র কুরআন নিয়ে শপথ করাটা বাধ্যতামূলক নয়, তারা যে কোন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ গ্রহণ করতে পারবেন।" এই বিলের বিরুদ্ধে খোমেনী ঘোষণা করেন যে "এই বিলটি সংবিধান বিরোধী।" শাহ প্রধানমন্ত্রীর উপর দায়িত্ব চাপালে খোমেনী প্রধানমন্ত্রী আলমের নিকট একটি তারবার্তা পাঠান। অবস্থা সঙ্কটজনক হলে শাহের সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নতি স্বীকার করেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি প্রাদেশিক ও নগর কাউন্সিল বিল বাতিল করেন। মূলতঃ শিক্ষা, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিগ্রেডের মত এই সমস্ত কাউন্সিলের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারী পাহলভী বংশের রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করা।

১৯৬৩ : ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে মন্ত্রীপরিষদ তথাকথিত 'শ্বেত বিপ্লবের' অন্যতম ভূমি সংস্কার বিল অনুমোদন করে। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, এই বিল শাহ এবং মন্ত্রিপরিষদের মধ্যেই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টিই করেনি, বরং এর ফলে কৃষিমন্ত্রী ড. আরসানজানী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইরানের ধর্মীয় গোষ্ঠী এই 'শ্বেত বিপ্লব'কে একটি 'শ্লোগান' বলে প্রচারণা করে। খোমেনী বিলের যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন শাহ তা জানতেন। ১৯৬২ সালের নভেম্বরে একজন ভূমি সংস্কার অফিসারকে হত্যা করা হয়, যা গণ-বিরোধিতা প্রমাণ করে। এতদসত্ত্বেও, শাহ বলপূর্বক ১৯৬৩ সালের ২৬শে জানুয়ারি সাভাক বাহিনীর সহায়তায় গণ-ভোটের (referendum) মাধ্যমে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। এই গণভোট বর্জন করার জন্য খোমেনী দেশবাসীকে আহ্বান

জানান। এতদসত্ত্বেও ভোট পর্ব শেষ হলে খোমেনী ফতোয়া জারী করেন যে, স্বৈরাচারী পুঁজিবাদী শক্তির মদদকারী শাহ সরকারের কার্যকলাপ রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে এই জালিম সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আহ্বান জানান। পরিণতিতে ১৯৬৩ সালের ২২শে মার্চ তারিখে কোমের পবিত্র ফায়জিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে ধর্মীয় সমাবেশে শাহের কুখ্যাত সাভাক বাহিনী নির্মম হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। অসংখ্য লোক শাহাদাৎ বরণ করে এবং খোমেনী তীব্র ভাষায় এই নিষ্পাপ ও নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর বর্বরোচিত হামলার বিরুদ্ধে জনগণকে রুখে দাঁড়াতে বলেন। ইরানের রাজনৈতিক পট দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য শাহ সামরিক আইন জারী করেন এবং ১৯৬৩ সালের ৬ই জুন কোম থেকে খোমেনীকে গ্রেফতার করা হয়। খোমেনীর গ্রেফতার সুপ্ত বারুদে যেন বিস্ফোরণ হল। গণ মিছিল, হরতাল, বিক্ষোভ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ল খোমেনীর মুক্তির দাবীতে।

১৯৬৪-৬৫ ঃ গণ-বিক্ষোভ ও জনতার দাবীতে ১৯৬৪ সালে এক বছর পর খোমেনীকে মুক্তি দেওয়া হয়। খোমেনী ক্রমশঃ শাহের ঘৃণ্য চক্রান্ত, গণবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের তীব্র ভাষায় নিন্দা করতে থাকেন। তিনি সেনাবাহিনীর প্রতি এক আবেদনে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শাহের শাসন উৎখাত করার আহ্বান জানান। ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক অসন্তোষের ফলে শাহ ১৯৬৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর কোম থেকে খোমেনীকে পুনরায় গ্রেফতার করেন। তাঁকে তুরস্কের ইজমিরে নির্বাসিত করা হয়। এই কুকীর্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী আলী মনসুর নিহত হন। ইরানী জনগণ খোমেনীর প্রতি অমানবিক আচরণের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির কাছে আবেদন জানায়। তুরস্ক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে খোমেনীকে ইরাকে প্রেরণ করে। ১৯৬৫ সালে খোমেনী নাজাফে এসে বসবাস শুরু করেন।

১৯৬৫-৭৮ ঃ ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ঈমাম খোমেনী ইরাকের নাজাফে বসবাস করেন। কিন্তু তিনি প্রবাসে থেকেও ইসলামী বিপ্লবের গতি নির্ধারণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী আমীর আব্বাস হোবায়দাকে একটি পত্রে তাঁর গণবিরোধী ও শাহের অনুকূলে অসাংবিধানিক ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। প্রবাসকালে ১৯৭৭ সালের ২৩শে অক্টোবর কুখ্যাত সাভাক বাহিনীর হাতে খোমেনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোস্তফা খোমেনী নিহত হন। ফলে পুত্র শোকে কাতর ঈমাম খোমেনী শাহের বর্বরোচিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সোচ্চার হতে বলেন। এই সময় শাহের প্রচার যন্ত্রে খোমেনীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাকে 'পাগল', 'যাদুকর', 'কবি', 'ধর্মত্যাগী' বলে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৭৮ সালের ৭ই জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের তেহরান সফরের পর পরই এ ধরনের বিষোদগার শুরু হয়। সরকারি পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের কুরুচিপূর্ণ ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা জনগণ সহ্য করতে না পেরে কোম নগরীতে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল বের করে। শাহ এই বিক্ষোভ দমনের প্রচেষ্টায় ২০০ নিরীহ লোক আত্মহুতি দেয়। এ ধরনের রক্তপাতে সমগ্র ইরানের জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং শাহ বিরোধী

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলও শাহের পতনের জন্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে তাব্রিজের জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে ৫০০ জনকে হত্যা করা হয়। সিরাজেও এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে ১৯৭৮ সালের ১৯শে আগস্ট যখন মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা শাহের নৃশংস বাহিনী আবাদানের রেক্স সিনেমা হলে প্রায় ৪২০ জন লোককে অগ্নিদগ্ধ করে মেরে ফেলে। সর্বাপেক্ষা হৃদয় বিদারক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ১৯৭৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর যখন শাহের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ তেহরানের রাজপথে হাজার হাজার ইরানী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বর্তমানে শোহাদা স্কোয়ারে সমবেত জনতার উপর সাভাক বাহিনী মেশিনগানের গুলি বর্ষণে প্রায় ৫০০০ লোককে হত্যা করে রাজপথ রক্ত রঞ্জিত করে। ঈমাম খোমেনী তখন ইরাক থেকে ১৯৭৮ সালের ৩রা অক্টোবর প্যারিসে বিতাড়িত হয়ে ফ্রান্সে অবস্থান করছিলেন। ইত্যবসরে পরিস্থিতি আয়ত্ত্বের বাইরে চলে গেলে শাহ শরীফ ইমামীর সরকার বাতিল করে তাঁরই অনুচর সামরিক বাহিনীর সদস্য জেনারেল আজহারীর নেতৃত্বে সামরিক সরকার গঠন ও সামরিক আইন জারী করেন। ১৯৭৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর ঈমাম খোমেনীকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা মিছিল করলে তাদের উপর গুলি বর্ষণ করা হয় এবং ৬০ জন ছাত্র শাহদাত বরণ করে।

১৯৭৯ ঃ জেনারেল আজহারী ইসলামী বিপ্লবের মূলে কুঠারঘাত করতে ব্যর্থ হলে শাহ ড. মোসাদ্দেকের এককালীন সহচর ও ন্যাশনাল ফ্রন্টের নেতা ড. শাপুর বখতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। ১৯৭৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি শাহ বিরোধ আন্দোলন দমন করতে পারেননি। এদিকে প্রবাসে অবস্থান করে খোমেনী দেশবাসীকে শাহের 'তাখত' উচ্ছেদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। জনতার দাবী ছিল রাজতন্ত্র বিলোপ করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েম করা। এমতাবস্থায় ইরানে গৃহ যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে ঈমাম খোমেনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, কিন্তু শর্ত জুড়ে দিলেন যে শাহ দেশত্যাগ না করলে তিনি দেশে ফিরবেন না। ফলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, রেজা শাহ তাঁর পরিবারবর্গসহ ১৯৭৯ সালের ১৬ই জানুয়ারি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর ১লা ফেব্রুয়ারি ঈমাম খোমেনী দেশে ফিরে আসেন।

বিপ্লোবত্তোর ইরান (১৯৭৯-৮৯) ঃ ১৯৭৯ সালে দেশ ত্যাগের পূর্বে রেজা শাহ দেশ পরিচালনার জন্য একটি রিজেন্সী কাউন্সিল গঠন করেন। সংসদ সদস্য মন্ত্রিপরিষদ, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান এবং দু' একজন বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শাহপুর বখতিয়ার ছিলেন এই কাউন্সিলের প্রধান প্রবক্তা। খোমেনী প্যারিস থেকে এক চরম পত্রে বখতিয়ারকে পদত্যাগ করতে বলেন। জনতা ঈমামকে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য চাপ দিলে বখতিয়ার অসম্মতি জানান। এর ফলে খোমেনীপন্থীদের সাথে শাহপন্থীদের ২৫শে জানুয়ারি তেহরানে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ফলে খোমেনীকে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য বখতিয়ারকে বাধ্য করা হয়। দীর্ঘ ১৫ বছর প্রবাসে কাটাবার পর খোমেনী ইরানে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে এসে খোমেনী মেহেদী

www.pathagar.com

বাজারগানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং দেশ পরিচালনার জন্য একটি ইসলামী বিপ্লব পরিষদ গঠন করেন। ফলে ইরানে বাজারগান এবং বখতিয়ার উভয়েই একই সময়ে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী জনতা খোমেনীর আহ্বানে ১৯৭৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বখতিয়ারের সরকারকে উৎখাত করে। ১১ই ফেব্রুয়ারি বাজারগান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর ফলে পাহ্লভী রাজতন্ত্রের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হল এবং শাহের স্বৈরাচারী শাসনের বৈরীতার অবসান ঘটে। ১৯৭৯ সালের ৩০শে মার্চ ইরানে দেশব্যাপী গণভোট (রেফারেন্ডাম) অনুষ্ঠিত হয় এবং ৯৮.২% ভোটে জনগণ ইরানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করে। ১লা এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৯ সালের ১৩ই মে তেহরানের ইসলামী আদালত শাহের পরিবারের সকল সদস্যের বিরুদ্ধে মৃত্যুর দণ্ডাদেশ প্রদান করে। ৩রা আগস্ট গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এর উদ্দেশ্য ছিল সংবিধান প্রণয়ন করা। ১৯শে আগস্ট বিশেষজ্ঞ পরিষদ (মজলিসে খুবরেগান) খসড়া সংবিধান পর্যালোচনার জন্য প্রথম অধিবেশন ডাকে। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭২। সংবিধান চূড়ান্ত হবার পর ১৯৭৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ৯৯.৫% আস্থা ভোটে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে মতবিরোধের কারণে মেহেদী বাজারগান প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দেন। ইমাম খোমেনী এই নবগঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতীভূ ছিলেন। ১৯৮৯ সালের ৩রা জুন তারিখে ঈমাম খোমেনী মৃত্যুবরণ করেন। মধ্যপ্রাচ্যের লৌহমানব রেজা শাহের পরাক্রমশালী রাজতন্ত্র কোমবাসী একজন আলেমের উদ্দাত্ত কণ্ঠে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে ধর্মবেত্তা ঈমাম খোমেনীর রাজতন্ত্র উচ্ছেদের কাহিনী সত্যই বিরল; তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও তীক্ষ্ণ মেধা ইরানকে একটি গোঁড়াপন্থী ইসলামী প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করে।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিপ্লবোত্তর ইরানের পররাষ্ট্র নীতি এবং ইরান-ইরাক যুদ্ধ

বিপ্লবোত্তর ইরানের ঘটনাবলি

ইসলামী বিপ্লব ইরানের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পাহলভি বংশের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ইসলামী বিপ্লব ছিল প্রচণ্ড রকমের প্রতিবাদ। পাহলভি বংশের পতনের অর্থাৎ দ্বিতীয় রেজা শাহের অপসারণ ও দেশত্যাগ পশ্চিমা প্রভুদের মোটেই সন্তুষ্ট করেনি, বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। ইরানের শাহের প্রতি মার্কিন প্রশাসনের নিলর্জ্জ সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব খোমেনীর ইসলামী সরকারকে স্বাভাবিক কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ক্ষিপ্ত করে তুলে। ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় রেজা শাহ ইরান ত্যাগ করতে বাধ্য হলে মার্কিন যুক্তরাষ্টে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যে সমস্ত কারণে যুক্তরাষ্ট্র শাহের মিত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল তার মূল ভিত্তি অর্থনৈতিক তোষণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাহকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সমর্থন করে এবং শাহের শাসন স্থিতিশীল হিসেবে ঘোষণা দেয়। তারা মনে করে শাহের শাসন প্রগতিশীল এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সহায়ক। মার্কিন সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে শাহের বিরুদ্ধে সংগঠিত বিরোধীদলগুলো ঐক্যবদ্ধ নয়। দ্বিতীয় রেজা শাহের নির্ভরযোগ্য মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরানী নীতি ছিল বিভ্রান্তিকর। এর কারণ ইরানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণরূরপে জানত না। শাহের শাসন ছিল উৎপীড়নমূলক এবং জনস্বার্থ বিরোধী। তোষন ও শোষন নীতির ফলে ইরানী জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও বিপ্লবাত্মক মনোভাব গড়ে উঠে। শাহের তৈরি সেনাবাহিনী শাহের অনুগত থাকলেও গণবিপ্লব ও স্বশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হলে সেনাবাহিনীর অকার্যকর হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, তেল সমৃদ্ধ ইরান বৈদেশিক শোষণের শিকার হয়, যা ড. মোসাদ্দেকের মত রাজনীতিবিদ সহজেই উপলব্ধি করেন। শোষিত শ্রেণীর মধ্যে বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণী ছিল এবং তারা উপলব্ধি করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করে ইরানের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে চাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থে শাহের ইরানকে একটি আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা করে। ১৯৭৮ সনে শাহের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ শুরু হলে শাহ নভেম্বর মাসের ৬ তারিখে জেনারেল আযহারীর হাতে সরকারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমেরিকা এই সরকারকে সমর্থন দেয়। আযহারী বিক্ষোভ সমাবেশ বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে শাহ শাহাপুর বখতিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান ইরান বিষয়ক কূটনীতিবিদ শাহপুর বখতিয়ারের কার্যক্ষমতায় সম্পূর্ণ সন্দিহান হলেও মার্কিন

www.pathagar.com

সরকার দৃঢ়ভাবে বখতিয়ারের সরকারকে সমর্থন জানায়। ১৯৭৯ সনে দ্বিতীয় রেজা শাহ পদচ্যুত হলে স্বাভাবিক কারণে ইরানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তবে শাহের পতনের অব্যাবহিত পরে মার্কিন সরকার ইরান সরকারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে। তারা ইরানে খাদ্য শস্য সরবরাহ অব্যহত রাখে; পক্ষান্তরে ইরান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তেল সরবরাহ হতে থাকে। লক্ষনীয় যে, শাহকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়নি। কিন্তু ইরানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকলে শাহকে চিকিৎসা দানের অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্টে নিয়ে আসা হয়। শাহের আমেরিকায় আগমনের নেপথ্যে যে দুজন মার্কিন কূটনীতিবিদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছিল তারা হচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদী ও উৎকট মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী হেনরী কিসিঞ্জার এবং চেজম্যানহাটন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ধনকুবের ডেভিড রকফেলার। এই ব্যাংকে শাহ ইরান থেকে কোটি কোটি টাকার অর্থ পাচার করেন। এ ক্ষেত্রে মদদ দেন কিসিঞ্জার এবং রকফেলার। শাহকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনার যে পূর্ব পরিকল্পনা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছাত্রদের দ্বারা অবরুদ্ধ মার্কিন দূতাবাসে প্রাপ্ত কতিপয় সরকারি দলিলপত্র।

১৯৭৯ সনের নভেম্বর মাসের ৪ তারিখে ইরানের বিপ্লবী ছাত্রগণ শাহকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করার প্রতিবাদের মার্কন দূতাবাস দখল করে। এর ফলে দূতাবাসের একশত কর্মকর্তা ও কর্মচারী জিম্মি হয়ে পড়ে। এই অভাবনীয় নাটকীয় ঘটনার সূত্রপাত হয় ১৯৭৯ সালের ৪ঠা নভেম্বর। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হয়। বিপ্লবী ছাত্রদল দূতাবাসের গোপনীয় তথ্য সম্বলিত নথিপত্র আটক করে জানতে পারে যে, দূতাবাস দীর্ঘদিন থেকে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে নিয়োজিত ছিল। মার্কিন দূতাবাসে আটককৃত জিম্মিদের ঘটনা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী হওয়ায় ইরানের প্রতি বিভিন্ন দেশে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। মার্কিন সরকারের পক্ষে জিম্মি সমস্যা সমাধানের দুটি পথ খোলা ছিল। এক শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার মাধ্যমে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করা অথবা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ঝটিকা বাহিনীর সাহায্যে জিম্মিদের মুক্ত করা। তাৎক্ষনিকভাবে সামারিক অভিযানের সম্ভাবনা থাকায় বিপ্লবী ছাত্রগণ দূতাবাসের চারদিকে ডিনামাইট স্থাপন করে। এর ফলে মার্কিন সরকার কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে তাদের সমস্যা মোকাবেলা করে। প্রাথমিক পর্যায়ে পূর্বতন এ্যাটর্নী জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ক এবং সিনেটের কর্মকর্তা উইলিয়াম মিলারের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ প্রতিনিধিদল ইরানে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু খোমেনী ও ইরান সরকার এই প্রতিনিধিদলকে আলোচনার জন্য ইরান আসতে দেয়নি। ফলে প্রতিনিধিদ্বয় ইস্তাম্বুল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান। ইরান সরকারের বৈরী মনোভাবের ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ইরানের মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এর ফলে প্রেরিতব্য ৩০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রাংশ আটকা পড়ে। নভেম্বরের ৯ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে জিম্মিদের মুক্ত করার চেষ্টা করে। তারা নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে একটি জরুরি প্রস্তাব করে। ইরান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান বনী সাদর শাহকে ইরানে প্রত্যার্পণ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি

www.pathagar.com

আহ্বান জানান। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, শাহের মত স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিবাজ শাসক উৎপীড়ন ও নির্যাতন করে ইরানে জনগণের প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মত পাপ করেছেন এবং ইরানের অমূল্য সম্পদ (দুই বিলিয়ন ডলার) বিদেশে পাচার করেছেন। এ কারণে সদর বলেন যে, দেশের প্রচলিত আইনে শাহকে ইরানে বিচার করা হবে এবং তার প্রাপ্য শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে। সদর আরও বলেন যে, ইরানী ইসলামী বিপ্লব বিরোধী শাহের যে চক্র এখনও সন্ত্রাস করছে শাহ দেশে প্রত্যাবর্তন করলে তার পরিসমাপ্তি হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিপ্লবী সরকারের অনমনীয় মনোভাবের ফলে জিম্মিদের মুক্তির কোন সুরাহা করতে পারে নি। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত ইরানী ছাত্রদের বহিষ্কারের পরিকল্পনা করে কিন্তু সিনেট এটি সংবিধান বিরোধী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করায় তা বাতিল করা হয়। কিন্তু কার্টার সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইরানী সরকারের ৬৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ আটক করে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংকগুলোতে, যেমন চেজম্যানহাট্রন, সিটি ব্যাংক, গচ্ছিত ইরানের অর্থ আটক করা হয়। এই অর্থনৈতিক অবরোধ তেমন কার্যকরী হয়নি। ইরানী পররাষ্ট্র মন্ত্রী বনি সদর জাতিসংঘ মহাসচিব কুট ওয়াল্ডহাইমকে এক পত্রে জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের প্রতি যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রকাশ করছে তার অবসানের জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন ডেকে আলোচনার ব্যবস্থা করা হউক। জিম্মি সঙ্কটের অবসানের জন্য শাহের অপরাধের বিচার হওয়া প্রয়োজন এবং একটি কমিশন গঠনের মাধ্যমে তা সহজে করা যায়। কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরব সাগরে 'কিটি হক' এবং 'মিডিওয়ে' নামের দু'টি বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ (aircraft carriers) পাঠায়। এই মূল উদ্দেশ্য ছিল ইরানকে ভয়ভীতি দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করা। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ইরানী নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ আহমদ মাদানী ঘোষণা দেন যে, মার্কিন আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য ইরানী নৌবাহিনী প্রস্তুত রয়েছে। ইতিমধ্যে ইরানের বিপ্লবী ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী ইরানী যুবকদের সেনা প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি আমেরিকাকে এক নম্বর শত্রু (Enemy No 1) হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দুই কোটি যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী গঠনের তাগিদ দেন।

ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জিম্মি সঙ্কটকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার অবসানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ এক অধিবেশনের আয়োজন করে। বলিভিয়ার অধিবাসী সার্জিও প্যালোকিয়স দ্য ভিৎসিও-র সভাপতিত্বে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বসে। নভেম্বরের ২৮ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য এই পরিষদে যোগদান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন বনি সদর। খোমেনী পরিষদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করায় তার পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভবপর হয়নি। পক্ষান্তরে বনি সদর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সদরের স্থলাভিষিক্ত হন সাদিক কুতুবজাদে। তিনি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে ইরানী পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে আটককৃত তিনজন সিনিয়র মার্কিন কূটনীতিবিদ দূতাবাসে আটককৃত জিম্মিদের অন্তর্ভুক্ত নন বলে মন্তব্য করেন। বিপ্লবী ছাত্রগণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আটককৃত তিনজন মার্কিন কূটনীতিবিদকে গুপ্তচর হিসেবে

www.pathagar.com

আখ্যায়িত করলে তারা মুক্তি পায়নি। পরিস্থিতি যখন সংঘাতের দিকে মোড় নিচ্ছিল তখন অছি পরিষদ ১৯৮০ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর এক অধিবেশন ডাকে। এই অধিবেশনে ইরানের বিরুদ্ধে নমোনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে কোন নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়নি; কিন্তু জিম্মিদের বিনা সংঘাতে মুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়। এই প্রস্তাব বিপ্লবী ছাত্ররা প্রত্যাখ্যান করে। পক্ষান্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুতুবজাদে বলেন যে, ছাত্ররাই মার্কিনি জিম্মিদের বিচার করবে। অন্যদিকে বিপ্লবী পরিষদের সচিব আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ বেহেস্তী বলেন যে, বিপ্লবী আদালত ইসলামী আইন অনুযায়ী জিম্মিদের বিচার করবে। এর মধ্যে মার্কিন সরকার ১০ ডিসেম্বর হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালতে ইরানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এই আদালতে মার্কিন এ্যাটর্নী জোনারেল বেঞ্জামিন আর. সি. কিডলেটি তার সরকারের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং মানবতার খাতিরে এবং প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য ইরানের প্রতি আহ্বান জানান। ইরান সরকার আন্তর্জাতিক আদালতের আহ্বানকে অনধিকার চর্চা হিসেবে আখ্যায়িত করে তা বাতিল করে এবং বলে যে এটি ইরানের আভ্যন্তরীণ বিষয়।

ইরানের বিপ্লবী সরকারের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক ক্রমশ অবনতি হলে মার্কিন সরকার আমেরিকায় ইরানী কূটনীতিবিদদের সংখ্যা সীমিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইরানী চ্যর্জ দ্যা আফেয়ার্স আলী আগাকে দূতাবাসের কর্মচারীর সংখ্যা ১৫-তে এবং ৪টি মিশনের প্রত্যেকটিতে ৫ জন করে কর্মচারী রাখার নির্দেশ দেয়। এর ফলে মার্কিন সরকারের বৈরী মনোভাব প্রকাশ পায়। ইতোমধ্যে মার্কিন সরকারের Ways and Means Committee এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে যদি কোন বিদেশী সরকার ইরানী আটককৃত মার্কিন জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারে বৈরিতা প্রদর্শন করে তাহলে সে দেশের আমদানীকৃত পণ্যের উপর বর্ধিত হারে শুল্ক আরেপ করা হবে। এই প্রস্তাবটি জাপান সরকারের প্রতি লক্ষ্য করে প্রণীত হয়।

১৯৮০ সালের ১ জানুযারি জিম্মি সঙ্কট নিরসনের জন্য মহাসচিব কূট ওয়াল্ডহাইম ইরানে আসেন। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুতুবজাদের সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু বিপ্লবী ছাত্রদের অনমনীয় মনোভাবের জন্য মহাসচিব জিম্মিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। ইরানের বিপ্লবী পরিষদ এ সময় বিদেশী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরিষদ ব্রিটিশ ও পশ্চিম জার্মানিসহ বিদেশী সাংবাদিকদের অসত্য সংবাদ প্রচারের জন্য সাবধান করে দেয়া হয়। মার্কিন সাংবাদিকদের বহিষ্কার করা হয়। ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮০ সনের ১৪ জানুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের প্রস্তাব গৃহিত হলে সোভিয়েত রাশিয়া এতে ভেটো প্রয়োগ করে। ইসলামী বিপ্লব সফল হলে ইরানে মোল্লাদের প্রণীত একটি সংবিধান গণভোটে গৃহীত হয়। শিয়া ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে বর্ণনা করা হয় এবং সমস্ত ক্ষমতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর হাতে ন্যস্ত করা হয়। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানকেও খোমেনীর কাছ থেকে সকল রাজনৈতিক বিষয়ে সম্মতি গ্রহণ করতে হত। ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জয়লাভ করলেও প্রকৃত অর্থে তিনি ক্ষমতাহীন ছিলেন। এর ফলে জিম্মি সমস্যার

www.pathagar.com

সমাধান হয় নি। মধ্যপন্থী রাষ্ট্রপ্রধান বনি সদর এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুতুবজাদে জিম্মি সঙ্কট নিরসনে ব্যর্থ হন। এর কারণ কট্টরপন্থী মোল্লাতন্ত্রের প্রতিভূ খোমেনীর কঠোর মনোভাব। জাতিসংঘের মহাসচিব শাহের কার্যকলাপ তদন্তের জন্য ইরানে এক প্রতিনিধি দল পাঠান; কিন্তু এই প্রতিনিধিদল তাদের উপর আরোপিত কার্যক্রম পরিচালিত করতে পারেনি। এর মূল কারণ খোমেনীর বৈরী মনোভাব। খোমেনী দাবি করেন যে, প্রতিনিধি দল শাহের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ না করলে জিম্মিদের মুক্তি দেয়া হবেনা। এটি অযৌক্তিক দাবী মনে করে প্রতিনিধিদল ইরান ত্যাগ করে।

জিম্মি সঙ্কটের অবসানকল্পে পদচ্যুত ইরানী স্বৈরাচারী শাসক দ্বিতীয় রেজা শাহ পাহলভিকে আমেরিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র পানামায় পাঠান হয়। ইরান সরকার শাহকে ইরানে পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পানামায় এক কূটনৈতিক মিশন পাঠায়। ফলে ২৬ মার্চ শাহ পানামা ত্যাগ করে মিসরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা জিম্মি সঙ্কটকে আরও নাজুক করে তুলে। ইরানী সরকার ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ থেকে জিম্মিদের তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শাহের মিসরে আশ্রয় গ্রহণ পরিস্থিতিকে আরও সঙ্কটপূর্ণ করে তুলে। এর ফলে কার্টার সরকারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ৭ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ২৫ এপ্রিল কার্টার প্রশাসন ইরানে জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য একটি গোপন সামরিক অভিযান পাঠায়। কিন্তু এই অভিযান ব্যর্থ হয়। দীর্ঘদিন অর্থাৎ ১৯৭৯ সানের ৪ নভেম্বর থেকে ১৯৮০ সনের ২৯ শে জানুয়ারি পর্যন্ত ১০০ জন কূটনীতিবিদ মার্কিন দূতাবাসে জিম্মি হিসেবে অবস্থান করেন। কার্টারের সামরিক অভিযান ব্যর্থ হলেও আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা এবং বৈদেশিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য খোমেনী সরকার জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। ইরান ও ইরাক সীমান্তে উত্তেজনা বিরাজ করায় খোমেনী উপলব্ধি করেন যে, জিম্মি সঙ্কটের অবসান হওয়া প্রয়োজন। সাদেক তাবাতাবায়ী নামে খোমেনীর এক নিকট আত্মীয় এবং ইরানী সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি ১৯৮০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষণা করেন যে, ইরান সরকার জিম্মি সঙ্কট সমাধানের জন্য মার্কিন সরকারের সাথে আলাপ আলোচনায় আগ্রহী। মার্কিন সরকার ইরানী সরকারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করায় জার্মান সরকারের মাধ্যমে আলোচনা চালাতে থাকে। ১০ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট কার্টার আলোচকদের নাম ঘোষণা করেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি আন্ডারসেক্রেটারী ওয়ারেন ক্রিস্টোফারের নেতৃত্বে এই মিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন কার্টারের উপদেষ্টা লয়েড কার্টার, সহকারী কোষাধ্যক্ষ সচিব রবার্ট কারসাওয়ে, পররাষ্ট্র দফতরের আইন উপদেষ্টা রবাট ওয়েন, নিকটপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার ডেস্কের প্রধান সহকারী পররাষ্ট্র সচিব হ্যারল্ড সন্ডার্স এবং একজন ইরান বিশেষজ্ঞ আরনাল্ড র‍্যাফায়েল।

আলাপ আলোচনার পূর্বেই খোমেনী প্রদত্ত কয়েকটি পূর্বশর্ত ঘোষণা করা হয়; এগুলো হচ্ছে (১) শাহ অবৈধভাবে যে বিপুল সম্পদ লুট করে বিদেশে পাচার করেছেন তা ফেরৎ দিতে হবে, (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আটককৃত ইরানী সম্পদ মুক্ত করতে হবে, (৩) ইরানের বিরুদ্ধে সমস্ত দাবী-দাওয়া ছেড়ে দিতে হবে, (৪) ইরানের বিরুদ্ধে কোন

www.pathagar.com

প্রকার রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গিকার। ইতোমধ্যে ইরানী প্রধানমন্ত্রী রাজায়ী নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমেরিকায় যান। কিন্তু ইরানী প্রতিনিধি দল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সাথে দেখা করেনি। রাজায়ী নিউইয়র্ক থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে আলজিরিয়া সফল করেন। এতে ধারণা করা হয় যে, ইরান সরকার আলজিরিয়া সরকারকে মার্কিন জিম্মি সঙ্কট নিরসনে অনুরোধ জানাবে। আলজিরিয়া সরকারের মধ্যস্থতায় জিম্মি সঙ্কট নিরসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যে তিনজন আলজিরিয় সরকারি কর্মচারী এ ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন তারা হচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহম্মদ বিন ইয়াহিয়া, ওয়াশিংটনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত রিহ্দা মালিক এবং তেরানের নিযুক্ত আলজিরিয় রাষ্ট্রদূত কাসিম গারাইবা। ৩ নভেম্বর রাষ্ট্রদূত রিহ্দা মালিক মার্কিন সরকারকে ইরানী বিপ্লবী সরকারের দাবি দাওয়ার কথা অবহিত করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে ক্রিস্টোফার আলজিরিয়ায় যান এবং আলজিরিয় সরকারকে জানান যে, যুক্তরাষ্ট্রে ইরান কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে। ক্রিস্টোফার আরও জানান যে, শর্তগুলো বাস্তবায়নে কিছু বিলম্ব হতে পারে। ২২ নভেম্বর রাজায়ী সরকার বলেন যে, মার্কিন প্রস্তাব অত্যন্ত অস্পষ্ট। এর ফলে পুনরায় ব্যাখ্যা দানের জন্য ক্রিস্টোফার ২ ডিসেম্বর পুনরায় আলজিরিয়ায় যান। আলোচনার প্রধান শর্ত ছিল শাহ কর্তৃক পাচারকৃত ইরানী সম্পদ ফেরৎ প্রদান। যাহোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫ থেকে ৬ হাজার বিলিয়ন ডলার আলজিরিয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দিবে এবং বাকি অর্থ আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং সমঝোতার মাধ্যমে ফেরৎ দেয়া হবে। ১৯৮১ সনের ১৯ জানুয়ারি ক্রিস্টোফার আলজিরিয়ায় একটি দলিলে স্বাক্ষর করেন। এই দলিল একই দিনে ইরানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এতে স্বাক্ষর করেন ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেহজাদ নাবাভী। সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, মার্কিন জিম্মিদের প্রথমে তেহরান থেকে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে নিয়ে যাওয়া হবে এবং পরে সেখান থেকে তাদের জার্মানি হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শাসনামলে জিম্মিদের মুক্তি দেয়া হয়নি। গণভোটে কার্টার পরাজিত হলে রোনাল্ড রেগান প্রেসিডেন্ট হন এবং তার সময়ে জিম্মিদের মুক্তি দেয়া হয়। রেগানের প্রতিনিধি হিসেবে কার্টার পশ্চিম জার্মানিতে গিয়ে জিম্মিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ইরান-ইরাক যুদ্ধ (১৯৮০)

নবগঠিত বিপ্লবী ইরান সরকারকে একদিকে যেমন জিম্মি সঙ্কটের মোকাবেলা করতে হয় অপর দিকে প্রায় একই সময়ের ইরাকের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়। ইরান ও ইরাকের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের মূল কারণ সীমান্ত নিয়ে বিরোধ। ইরানের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে শাতিল-আরব বা ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রীস নদীর অববাহিকায় জলাভূমি ইরান ও ইরাকের সীমারেখা নির্ধারণ করছে। এই অঞ্চল নিয়ে প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে বিরোধ বহু দিনের। এই বিরোধ নিরসনের জন্য উভয় দেশের মধ্যে বহুবার চুক্তি সম্পাদিত হয়, যেমন– ১৮৪৭ সনের এরজিরুম চুক্তি, ১৯১৩ সনের চুক্তি, ১৯৩০ ও ১৯৭৫ সনের চুক্তি। ১৮৪৭ সনে এরজিরুম চুক্তি সম্পাদনের সময় ইরাক অটমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই চুক্তির ২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল যে, শাতিল-আরব ওসমানী বা অটমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পরবর্তীকালে ইরানের পশ্চিমাঞ্চলে

www.pathagar.com

মসজিদ-ই-সুলায়মান নামক স্থানে তেলের খনি আবিষ্কৃত হলে এবং শাতিল-আরব ভূখণ্ডের পূর্ব উপকূলে মুহাম্মারা বা খুররমশহরে বন্দরনগরী প্রতিষ্ঠিত হলে ইরাক ও ইরানের মধ্যে এক সীমান্ত সঙ্কট দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৩ সনে অটমান সাম্রাজ্যে ব্রিটেন, ইরান এবং রাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলে এক সভায় মিলিত হন। এই সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, শাতিল-আরব ইরাক বা অটমান সাম্রাজ্যভুক্ত থাকবে। তবে ছোট ছোট চরাঞ্চল পারস্য বা ইরানের দখলে থাকবে। একথাও স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, এই অঞ্চলে ইরাক জনপথ ব্যবহার করতে পারবে। চতুর্থ শক্তির-পারস্য, রাশিয়া, ব্রিটেন ও অটমান কর্তৃক চুক্তি সম্পাদিত হলে মুয়াম্মারা বরাবর একটি সীমারেখা নির্ধারিত হয়। এই সীমান্ত রেখাকে 'থলওয়েল' বা গভীরতর স্রোতধারায় মধ্যবর্তী রেখা বলা হয়। শাতিল-আরবে পারস্য সুবিধা লাভ করলে প্রতিদানে পারস্য অটমান সাম্রাজ্যকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দেয়। ১৯১৩ সনে সম্পাদিত চুক্তি বেশিদিন কার্যকরী হয়নি। প্রথম মুহাযুদ্ধের পর ইরাকের উপর অটমান সাম্রাজ্যের প্রভাব হ্রাস পেয়ে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সনের চুক্তির ফলে পূর্বের চুক্তির শর্তাবলির কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয় এবং আবাদানের ক্ষেত্রেও 'থলওয়েল' রেখা সীমা হিসেবে গৃহীত হয়।

সীমান্তরেখা ছাড়াও ইরাক ও ইরানের মধ্যে কুর্দি সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিরোধ বাধে। সংশ্লিষ্ট কুর্দিজাতি বহুযুগ ধরে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি করে আসছে এবং আন্দোলন পরিচালনা করছে। উপরন্তু, ১৯৬৯ সনে ইরান ইরাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে ১৯৩৭ সনে সম্পাদিত চুক্তির ধারা ভঙ্গ করে শাতিল-আরব অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। এ কারণে ১৯৭৫ সনের ৬ মার্চ আলজিয়ার্সে ইরান ও ইরাকের মধ্যে সীমানা নিয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনার ফলশ্রুতিতে বাগদাদে ১৯৭৫ সনের জুন মাসে "নিষ্পত্তিমূলক চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়। ইরান ও ইরাকের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি মোতাবেক শাতিল-আরব সীমান্তে 'থলওয়েল রেখা' বরাবর সীমান্ত নির্ধারিত হয়।

সাদ্দাম হোসেন ইরাকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলে সীমান্ত নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সাদ্দাম হোসেন ইরানে সরকার পরিবর্তন এবং ইসলামী বিপ্লবের নাজুক পরিস্থিতির সুযোগে সীমান্তে আধিপত্য বিস্তরের সুযোগ খুজতে থাকেন। ১৯৭৯ সনের অক্টোবর মাসে লেবাননে ইরাকী রাষ্ট্রদূত ইরানের প্রতি তিনটি দাবী পেশ করেন (১) ১৯৭৫ সনের চুক্তি বাতিল; (২) ইরান কর্তৃক ১৯৭১ সনে দখলকৃত আবু মুসা ও তান্‌ব দ্বীপসমূহ প্রত্যার্পণ এবং (৩) ইরানের বেলুচ, কুর্দ ও আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণ দান। ১৯৭৯ সনের নভেম্বরে বাগদাদ বেতার থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ইরানের বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী তেহরানে অবস্থিত ইরাকী কূটনীতিবিদদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। ডিসেম্বরে ইরান ইরাক সরকারের কাছে অভিযোগ করে যে, ইরাক বাহিনী আন্তর্জাতিক সীমানা লংঘন করে ইরানের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। এভাবে উভয় দেশের মধ্যে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ চলতে থাকে। পরিশেষে পরিস্থিতি এমন অবনতি হয় যে, ইরান ও ইরাক ১৯৮০ সনের মার্চ মাসে তাদের দূতদের স্ব স্ব দেশে ডেকে পাঠায়। এপ্রিল মাসে ইরাকী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাদূল হাম্মাদী জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট একটি চিঠি পাঠান। এই পত্রে ইরানের উপসাগরীয় দ্বীপসমূহ ছেড়ে দেয়ার জন্য

www.pathagar.com

চাপ সৃষ্টি করা হয়। এর জবাবে ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদিক কতুবজাদে এক বিবৃতিতে বলেন যে, ইরাকী সরকার সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদী ও জাইয়নবাদী (Zionism) মনোবৃত্তিতে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। ইরাক ও ইরানের মধ্যে সম্পর্ক দ্রুত অবনতি হতে থাকে যখন ইরানের একটি তেল শোধনাগারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এই ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণে ইরানের গ্যাস পাইপের যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং ইরান ইরাককে এ বিস্ফোরণের জন্য দায়ী করে। ইরান ও ইরাকের মধ্যে এর ফলে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয় এবং ইরান ৭ এপ্রিল তার সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়। খোমেনী সরকার সাদ্দাম হোসেনের ইরাকী বাথ পার্টি পরিচালিত সরকারকে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু আখ্যায়িত করে। এর ফলে ইরান ও ইরাকের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধের শুরুতে ইরাক থেকে হাজার হাজার ইরাকী শিয়া ও কুর্দিদের বহিষ্কার করা হয়। এ সমস্ত উদ্বাস্তু ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৯৮০ সনের ৬ এপ্রিল ইরান-ইরাক সীমান্ত রেখা বরাবর সংঘর্ষ শুরু হয়। এই অভিযানে ইরাক দাবী করে যে, ১০ সেপ্টেম্বর ইরান 'আইন-ই-কাউস' এলাকা মুক্ত করতে আকাশ যুদ্ধে দুটি ফ্যাটম জঙ্গি বিমান হারিয়েছে। ২৭ শে সেপ্টেম্বর সাদ্দাম হোসেন সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতাকালে একতরফাভাবে ১৯৭৫ সনের চুক্তি বাতিল করেন। তিনি দাবী করেন যে, সমগ্র শাতিল-আরবের উপর ইরাকের সার্বভৌমত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইরান ও ইরাক দুটি পাশ্ববর্তী দেশ– একটি সুন্নী ও অপরটি শিয়া শাসক গোষ্ঠীদের দ্বারা পরিচালিত। উভয় দেশের সামারিক শক্তি তুলনামূলকভাবে সমান সমান বলা যায়। কিন্তু ট্যাংক বহরে ইরাকের রাশিয়া নির্মিত ২৭০০-T থাকায় ইরানের ট্যাংক বহর অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। বিমান বাহিনীতে ইরানের ৪৪৫টি মার্কিন জঙ্গী বিমান থাকলেও শাহের পতনের পর জঙ্গী বিমানের মাত্র ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ব্যবহার উপযোগী ছিল। পক্ষান্তরে ইরাকের ২৩০টি সোভিয়েত মিগ–২১ ও ২৩ এবং বোমারু বিমান ৩২২টি থাকায় আকাশে ইরানের চেয়ে ইরাক প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। অবশ্য ইরানী নৌবাহিনী ইরাকী নৌবাহিনী অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। ইরান-ইরাক যুদ্ধ তিন পর্যায়ে সংঘটিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৯৮০ সনের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৮১ সনের জুলাই মাস পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যহত ছিল। এ পর্যায়ে ইরানে ইরাকের প্রাধান্য ছিল এবং তারা জয়লাভ করে। ইরাক সীমান্তবর্তী কাসর-ই-শিরীন ও মেহরান দখল করে আবাদানে অভিযান করে। সেপ্টেম্বরে ইরাকী বাহিনী খোররামশহর দখল করে। তারা কারুন নদী পার হয়ে আহওয়াজ ও দেজফুলের দিকে অগ্রসর হয়। শুশানগ্রার্ডসহ ইরানের খুজিস্তানের বেশ কয়েকটি শহর ইরাকের অধিকারে আসে। ইরান বাগদাদ, বাকুবা ও মসুলে বিমান হামলা চালালে ইরাকী বিমানবাহিনী আহওয়াজ, কেরমানশাহ, রিজাইয়া প্রভৃতি শহরে বোমা নিক্ষেপ করে। জাপানীদের দ্বারা নির্মিত খোমেনী বন্দরে অবস্থিত পেট্রো রাসায়নিক কারখানা ইরাকী বোমার আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে ইরাক তার মুখ্য উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারেনি। যদিও সাময়িক সামরিক বিজয় তারাই অর্জন করে।

প্রথম পর্যায়ে বিপর্যস্ত হলেও ইরানী বাহিনী সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে দ্বিতীয় পর্যায়ে সামরিক সাফল্য অর্জন করে। নবগঠিত ইরানী বিপ্লব পরিষদ সেনাবাহিনীকে সুসংহত করতে না পারলেও স্বেচ্ছাসেবক দল, অগণিত লোকবল ও সেনাবাহিনী ১৯৮১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইরাকের উপর প্রচণ্ড অভিযান চালাই। তারা আবাদান থেকে

www.pathagar.com

কারুন নদী অতিক্রম করে আহওয়াজের দিকে অভিযান করে ইরাকী বাহিনীকে বিতাড়িত করে। ইরাকী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ অব্যহত থাকে এবং ১৯৮১ সনের ১২ ডিসেম্বর কাসর-ই-শিরীনের নিকট যুদ্ধে ইরানী বাহিনী ইরাকী বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে। আহওয়াজ ও শুশানগার্দ এলাকায় ইরাক প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করায় ইরানের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়। কিন্তু ১৯৮২ সনের মে মাসে ইরান বাহিনীর তীব্র চাপের মুখে ইরাকী বাহিনী এ অঞ্চল ত্যাগ করে খোররমশহরে অবস্থান নেয়। কিন্তু ইরান ইরাকী বাহিনীকে পরাস্ত করে খোররমশহর পুর্নদখল করে। ইরানী বাহিনীর প্রবল আক্রমণে ইরাকী বাহিনী শাতিল-আরব পার হয়ে ইরাকের অভ্যন্তরে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয় ইরানী গোলন্দাজগণ ফাও ও বসরার উপকণ্ঠে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ইরানের পদাতিক বাহিনীর অগ্রগতি ইরাকী বিমান বাহিনীর আক্রমণে বিঘ্নিত হয়।

ইরান-ইরাক যুদ্ধের তৃতীয় পর্যায়ে উভয় পক্ষের কোন লাভ হয়নি। উভয় দেশ স্ব স্ব অবস্থান সুদৃঢ় করে। ইরাকের বিমান বাহিনী অধিকতর শক্তিশালী থাকায় ইরানের তেল শোধনাগারসহ বিভিন্ন শহরে বিমান হামলা করা সম্ভবপর হয়। বিশেষ করে খারগ তেল বন্দরে আগত জাহাজগুলোর উপর ক্ষেপনাস্ত্রের আক্রমণ পরিচালিত হলে ইরানের তৈল সম্পদের খুব ক্ষতি হয়।

ইরান-ইরাক যুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন আরব দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। পার্শ্ববর্তী জর্ডানের রাজা বাদশাহ্ হোসেন ইরাকের প্রতি সমর্থন জানান। এ ছাড়া মরক্কোর বাদশাহ হাসান, সৌদি আরবের বাদশাহ্, কুয়েতের আমির, সংযুক্ত আরব আমিরাতের শেখ সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন দেন। তথ্যানুযায়ী আরব দেশসমূহ ইরানের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইরাকের যুদ্ধ তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য দেয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে উপসাগরীয় দেশসমূহ ইরাককে ১৪ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিতে রাজি হয়। এ ছাড়া সৌদি আরব ৬ বিলিয়ন, কুয়েত ৪ বিলিয়ন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ৩ বিলিয়ন, কাতার ১ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়। অন্যদিকে সিরিয়া এবং লিবিয়া ইরানকে সমর্থন করে। এর ফলে সাদ্দাম হোসেন সিরিয়া ও লিবিয়া থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করে নেয়। ইরান-ইরাক যুদ্ধে তিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়া মোটামুটিভাবে নিরপেক্ষ ছিল। উল্লেখ্য যে, উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া মোটামুটি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

তৃতীয় পর্ব

আফগানিস্তান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

আফগানিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বিংশ শতাব্দী

ভৌগোলিক অবস্থান

এশিয়ার স্থলবেষ্টিত (land locked) দেশ হিসেবে আফগানিস্তান বিভিন্ন কারণে বহুল পরিচিত। এর ভৌগোলিক অবস্থার দেশটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যুগ যুগ ধরে নির্ধারিত করেছে। এশিয়ার দক্ষিণ-মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত এই দেশ আয়তনে ৬,৫৩,০০০ বর্গ কি. মি.। দুর্গম পাহাড়-পবর্ত, মরু অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত আফগানিস্তান। এর চারভাগের তিনভাগই পাহাড়-পর্বত এবং উপত্যকা এবং অবশিষ্ট এক ভাগ অর্থাৎ দেশের উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে মরুভূমি। আফগানিস্তানের উত্তরে উজবেকিস্তান ও তাজাকিস্তান, উত্তর-পূর্ব কোণে চীন, পূর্ব ও দক্ষিণে পাকিস্তান, দক্ষিণ এবং পশ্চিমে ইরান, উত্তর-পশ্চিমে তুর্কমেনিস্তান। পৃথিবীর অন্যকোন দেশ আফগানিস্তানের মত অধিক সংখ্যক পার্শ্ববর্তী দেশ দ্বারা পরিবেশিষ্ট নয়। এখানেই আফগানিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়েছে। আফগানিস্তানের জনসংখ্যা অনুর্ধ্ব দু'কোটি। এ দেশ সর্বমোট প্রদেশের সংখ্যা ৩৪টি। জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাধান্য রয়েছে পশতুন, এছাড়া রয়েছে উত্তরাঞ্চলে তাজিক, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উজবেক এবং পূর্ব দিকে হাজারা। আফগনিস্তানের জনসংখ্যার দিক থেকে ৯৯.৫% মুসলমান। সংখ্যা লঘুদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ এবং ইহুদী। এক সময় আফগানিস্তানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল, যা বামিয়ানের ভগ্নপ্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তি প্রমাণ করে। শিয়াদের সংখ্যা কম এবং সুন্নীদের প্রাধান্য রয়েছে।

প্রাচীন ইতিহাস ঃ আফগানিস্তান নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানামত প্রচলিত আছে। কোন এক সময় এ অঞ্চলে ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত খোরাসান এ দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণে এ অঞ্চলকে খোরাসান বলা হত। তবে এটির নাম হয় আরিয়ানা বা আর্যদের স্থান। বর্তমানে আফগানিস্তান নামটি সম্ভবত আফগানিস্তানের সুলতান আমীর আব্দুর রহমান খানের সময় থেকে প্রচলিত হয়। তিনি উপজাতি সমৃদ্ধ ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীন আফগান অঞ্চলকে 'ইয়াগিস্তান' বলতেন। এর অর্থ অবাধ্য, দুরন্ত, স্বাধীনচেতা, বিদ্রোহী ও উদ্ধতস্বভাবের মানবগোষ্ঠীর বাসস্থান। সাধারণ অর্থে আফগানিস্তানের অর্থ আফগানদের ভূমি। আফগানগণ বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত এবং তাদের নিজস্ব 'জিরগা' বা প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। আমীর আব্দুর রহমানের শাসনামলে আফগানিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারিত হয়। কিন্তু আফগান অ-

www.pathagar.com

আফগান শব্দ মূলত পারস্য শব্দ আফগান অর্থ গোলযোগ, চিৎকার, আর্তনাদ ও অশান্তি। সাসানীয় আমলে অধিকৃত আফগানিস্তান 'আবগান' নামে পরিচিত ছিল। ধারণা করা হয় যে, আব্বাসীয় খিলাফতে ৯৮২ সনে আফগান শব্দটির বহুল প্রচার শুরু হয়। এক সময় আফগানিস্তান খুবই সমৃদ্ধ দেশ ছিল এবং এর ইতিহাস ও ঐতিহ্য খুব প্রাচীন। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে বহু বছর ধরে আফগানিস্তান বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণকারীদের পদানত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব হাজার বছর থেকে আফগানিস্তানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে বিকাশ ঘটে। গ্রীসের মহাবীর আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যবিলন দখল করে পূর্ব দিকে অভিযান করে ইরান ও আফগানিস্তানে আগমন করেন। তিনি আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল, যা ব্যাকট্রিয়া বা বলখ নামে পরিচিত, নামে একটি প্রদেশ স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, তিনি বলখ প্রদেশ থেকে রোকসেলানা নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেন। আলেকজান্ডারের পর তার সেনাপতি সেলুকাস ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিক থেকে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত সেলুসিদ রাজ্য নামে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আফগানিস্তান যাযাবরদের বাসস্থান ছিল। আর্য, ব্যাকট্রিয়, আরাকোশিয়া (কান্দাহার), দ্রানজিয়ানা (জলেকা) এবং গান্ধারের (বাদখাসান) মত উপজাতিয় গোষ্ঠী আফগানিস্তানে এসে বসবাস করতে থাকে। বিভিন্ন ভাষা ও জাতিতে বিভক্ত এ সমস্ত উপজাতি। আফগানগণ সর্বদা গোত্র কলহে নিয়োজিত থাকত। প্রথমে আলেজান্ডারের সময়ে আফগানিস্তান পারস্যের অধীন ছিল। ১০০০ অব্দ থেকে ৩৩১ অব্দ পর্যন্ত পারস্যের কর্তৃত্ব আফগানিস্তানে বলবৎ থাকার পর গ্রীক ম্যাসিডোনিয়ানদের নিকট পারসিকদের (সাসানীয়) পতন হয়। আফগানিস্তানে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির আগমন ঘটে এবং তারা আফগানিস্তানকে পদানত করে রাখে, যেমন শক ও হুন ও কুষান উপজাতি। আফগানিস্তানে খ্রি. পূ. ২০০ অব্দের পর কুষান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আফগানিস্তানে বৌদ্ধ প্রভাবে নির্মিত প্রত্নকীর্তি দেখা যাবে। প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতের ইতিহাসে আফগানিস্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আরব দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বিতীয় খলিফা প্রথম উমরের (রা) সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ হয়। পারস্য বিজয়ের পর (৬৩৪-৬৪১) স্বাভাবিক কারণে মুসলিম সামরিক অভিযান পূর্বাঞ্চলে পাঠানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতে উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলে সামরিক বাহিনী পাঠানো হয় এবং হিরাতসহ নিশাপুর, বলখ, গজনী, বামিয়ান, বাস্ত, কাবুল অধিকৃত হয়। আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের শাসনামলে (৭৫৪-৭৫) আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে অভিযান করে মুসলিম বাহিনী কান্দাহার (আল কুন্দুহার) দখল করে। আব্বাসীয় খিলাফতে গজনী রাজধানী স্থাপন করে সবুক্তগীণ গজনী রাজ্য কায়েম করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। পরবর্তীকালে তার পুত্র সুলতান মাহমুদ দশম ও একাদশ শতাব্দীতে গজনী থেকে সতের বার ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করেন। গজনীদের পর ঘোরী বংশের অভ্যুত্থান হয় এবং আফগানিস্তানের ঘোর শহরে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। মুহাম্মদ ঘোরী এখান থেকে দু'বার ভারতবর্ষে সমরাভিযান করে প্রথমবার পরাজিত হন তরাইনের রণক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাসীয় খিলাফতের শেষের দিকে সেলজুকদের অভ্যুত্থানের পর তাদের রাজত্ব কাবুল, গজনী, কান্দাহার, ইরান, এশিয়া মাইনর এবং মধ্য-এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। সেলজুকদের উত্তরাধিকারী হিসেবে খাওয়ারিজম শাহ আফগানিস্তান দখল করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব ঘটে এবং মোঙ্গলগণ ১২২১ সনের মধ্যে আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তার করে কিন্তু জালালউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ কান্দাহার থেকে মোঙ্গলদের বিতাড়িত করে কাবুলের অনতিদূরে উত্তরে পারওয়ার প্রদেশ পর্যন্ত নিয়ে যান। জবল সিরাজে পরাস্ত হয়ে বিধ্বস্ত মোঙ্গল বাহিনী হিরাত, বলখ ও বামিয়ান থেকে বিতাড়িত হয়। কিন্তু খাওয়ারিজম শাহ এই বিজয় ধরে রাখতে পারেননি। এ কারণে মোঙ্গলগণ পুনরায় আফগানিস্তান দখল করে। পরে তারা হাজার হাজার সৈন্য দলে বিভক্ত হয়ে আফগানিস্তানে বসবাস করতে থাকে। এ কারণে আফগানিস্তানের একটি গোত্র হাজারা নামে পরিচিত।

আফগানিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী পশতুন এবং তারা পশতু ভাষায় কথা বলে। তারা সুলেমান পর্বতমালা থেকে আফগানিস্তানে আসে। উত্তরে কারাকুরাম এবং দক্ষিণে গোমাল নদীর মধ্যবর্তী স্থানে পশতুনরা বসবাস করত। এরা ছিল নৃ-তাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এবং এদের নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুন্নী জামাতের সঙ্গে একাত্ম হয়। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশতুনরা গজনী মালভূমির বেশ কয়েকটি তুর্কি উপজাতির সঙ্গে মিশতে থাকে। মোঙ্গলদের পর মধ্য-এশিয়ার তুর্কী বংশোদ্ভূত বীর তৈমুর লং তৈমুরী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন মধ্য এশিয়ায়। তিনি আফগানিস্তান দখল করেন। তৈমুর লং-এর বংশধরেরা হিরাতে রাজধানী স্থাপন করে শাসন করেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তারা হিরাত থেকে বাদখাশান ও কাবুল থেকে গজনী পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে। এ সময় নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বহু আফগান ভারতবর্ষে আগমন করে। লক্ষনীয় যে, ভারতবর্ষে তুর্কী শাসনের শেষ ভাগে আফগান লোদী ও শূর বংশের শাসন কায়েম হয়। বাংলাদেশেও আকবরের শাসন আমলে কররানী আফগানদের আধিপত্য ছিল। ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের কাবুল থেকে জহিরুদ্দীন বাবুর ভারতবর্ষে আগমন করে ইব্রাহিম লোদীকে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে ১৫২৬ সনে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট হুমায়ুনের শাসনকালে মুঘলদের বিপর্যয় হয় এবং আফগান শেরশাহ শূরীর নিকট পরাজিত হয়ে হুমায়ুন ইরানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। একথা অনস্বীকার্য যে, মুঘলদের রাজত্বকালে আফগানিস্তান মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুর কাবুলে সমাহিত রয়েছেন।

মুঘল সম্রাটগণ আফগানিস্তানকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেও স্বাধীনচেতা আফগানগণ বিদ্রোহ করে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ১৭০৮ সনে কান্দাহারকে স্বাধীন করেন মীর ওয়ালিস। আফগানীরা হিরাতকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকে। পার্শ্ববর্তী পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ খোরাসান অঞ্চল দখল করেন এবং ভারতবর্ষে এসে দিল্লীতে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন

www.pathagar.com

দিল্লীতে ছিলেন না। লুটতরাজ করে, হত্যাযজ্ঞ সমাপ্ত করে তিনি পারস্যে ফিরে যান। নাদির শাহের পর আফগানিস্তান ও মুঘল ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন আহমদ শাহ আবদালী। তিনি আফগানিস্তান ছাড়া সমগ্র উত্তর ভারতের পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও দিল্লী দখল করেন। ১৭৬৩ সনে আবদালী তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজিত করেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন ভারতবর্ষে অবস্থান করেননি।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে। মুঘল শাসনের পতন হতে থাকলে শিখ নেতা রঞ্জিত সিংহ আফগানীদের অধিকৃত পেশওয়ার দখল করে কাশ্মীর, মুলতান ও লাহোর অঞ্চলে শিখ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে শিখ শক্তির অভ্যুত্থানে শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষে রুশ আগ্রসনের ভীতি সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠে। আফগানিস্তানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একদিক আহমদ শাহ্ আবদালীর পৌত্র শাহসুজা স্বীয় আধিপত্য অব্যহত রাখার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে আফগান নেতা দোস্ত মুহাম্মদের আর্বিভাব হয়। বলাই বাহুল্য যে, আফগানিস্তানের ইতিহাস রক্তাক্ত ইতিহাস। আফগানদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য যুদ্ধপ্রীতি। বহু জাতির সংমিশ্রণে শংকর আফগান জাতিদের মধ্যে উপজাতীয় কোন্দলকে প্রাক-ইসলামী যুগের আরব গোত্র কলহের সঙ্গে তুলনা করা যায়। গ্রীক, শক, হুন, আর্য, তাজিক, হাজারা, উজবেক, পুশ্তুন সব মিলে পাঠান নামে পরিচিত হলেও এক গোত্র অন্য গোত্রকে সহ্য করতে পারেনা। উনবিংশ শতাব্দী থেকে আফগানিস্তানের যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দেখা যায় তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হত্যাকান্ড রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ দিয়েছে। এই রক্তে লিখা রাজনৈতিক ইতিহাসের নেপথ্য নায়করা হচ্ছেন পরাশক্তি ব্রিটিশ, জার্মান, রুশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আহমদ শাহ আবদালী বা দূররানী আফগানিস্তানে দূর্রানী বংশ প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনলেও তার ১৭৭৩ সনে মৃত্যু ছিল অশনি সংকেত। আহামদ শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র তিমুর শাহ্ দক্ষিণ কান্দাহার থেকে উত্তরে কাবুলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। গোত্রীয় প্রভাব দূর করে সমঝোতার সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। গোত্র কলহ্ দমনে তিমুর শাহ্ ব্যর্থ হন। তার উত্তরাধিকারী শাহজামান দুর্বল শাসক ছিলেন। এ কারণে সামন্তবাদী গোত্র প্রধানদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তিনিও দমন করতে পারেননি। এর ফলে আহামদ শাহ আবদালীর শক্তিশালী দূররানী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন দেখা দেয়। শাহ জামান গোত্রীয় কোন্দল দমনের জন্য ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসকদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন। ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষে রুশ ও ফরাসী প্রভাব রোধ কল্পে আফগানিস্তানের সাথে মৈত্রী চুক্তি করে। তৈমুর শাহের পুত্র শাহ্ জামান অবশ্য ব্রিটিশ বিরোধী মহিশূরের অধিপতি টিপু সুলতানের সাথে মিত্রতা স্থাপন করলে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসকগণ ইরানে সাফাভী শাসকদের সহায়তায় আফগানিস্তানের শাসক শাহ্ জামানকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র শাহ্ সুজা। তিনি ব্রিটিশদের সাথে ১৮০৯ সনে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল আফগানিস্তান ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইরানের সাথে মৈত্রী চুক্তি করবেনা। অবশ্য শাহ্ সুজার পতনের পর আফগান-ব্রিটিশ চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

www.pathagar.com

মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র আফগানিস্তানের ইতিহাসকে কলুষিত করেছে। Tribal overlordship বা গোত্রীয় প্রাধান্য জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থি ছিল। একমাত্র আবদালী বিবদমান আফগান গোত্রগুলোকে একত্রীভূত করতে পেরেছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত দূর্‌রাণী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে সামন্তবাদ উপগোত্রীয় নেতাদের বৈরী মনোভাবের ফলে। দূর্‌রাণী বংশের পতনের পর আফগানিস্তান চারভাগে বিভক্ত হয়ে যায় সামন্ত গোত্রপতিদের নেতৃত্বে। এই চারটি প্রদেশ হচ্ছে কাবুল, কান্দাহার, হিরাত ও পেশওয়ার। পাঞ্জাব শিখনেতা রঞ্জিত সিংহ পেশওয়ার দখল করলে আফগানিস্তান চিরতরে এই প্রদেশ হারায়। আফগানিস্তানের অরাজকতাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমীর দোস্ত মোহাম্মদ নামে এক সামন্ত নেতার আবির্ভাব হয়। তিনি সামন্তবাদী গোত্রদের একত্রীত করে আফগানিস্তানে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করেন। দোস্ত মোহাম্মদ শান্তিতে শাসন করতে পারেননি। কারণ তাকে রঞ্জিত সিংহ ও ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হয়। এ সময় আফগানিস্তান পরাশক্তির আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে (Big Power Rivalry) পরিণত হয়, যেমনি হয়েছিল ইরানে কাযার শাসনামলে। ১৮২৬ সালে ক্ষমতালাভ করে দোস্ত মুহাম্মদ ১৮৬৩ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্রদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে রাজনৈতিক অরাজকতা শুরু হয়। এ সুযোগে আফগানিস্তানে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনবার ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ব্রিটিশ বাহিনী বহুদিন আফগানিস্তানে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু ১৮৮০ সনে কান্দাহারের নিকট মাইওয়ান্ডের যুদ্ধে এক ব্রিগেড ব্রিটিশ সৈন্য আফগানদের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও আফগানিস্তানে দীর্ঘ ৮০ বছর ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় থাকে।

আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এবং সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার জন্য দেশটি চিরকাল অশান্ত ছিল। দোস্ত মোহাম্মদের পৌত্র আব্দুর রহমান আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার জন্য ব্রিটিশদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। তার সময়ে সীমানা নির্ধারণ করার প্রয়াস দেখা যায়। ভারত বিষয়ক পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার মর্টিমার ডুরান্ড একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে কাবুলে যান। আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ ভারতের সাথে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা 'ডুরান্ড লাইন' নামক অভিহিত। এর ফলে সীমানা চিহ্নিত হয়। ১৯০১ সনে আব্দুর রহমান মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র হাবিবুল্লাহ খান আমীর হন। হাবিবুল্লাহ ১৯১৯ সনে আততায়ীর হাতে নিহত হলে তার পুত্র আমানুল্লাহ খান আমীরের দায়িত্ব লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই স্বাধীন আফগানিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা এবং সংস্কারক। তিনিই প্রথম আফগানিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করেন ১৯২৩ সনে। তিনি শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ১৯২৬ সনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অনাগ্রাসন চুক্তি করেন। তিনি এক ভেস্তীওয়ালা বা বাচ্চা-ই-সাকা, যার প্রকৃত নাম ছিল হাবিবুল্লাহ খান, কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন ১৯২৮ সালে। এ ঘটনার পরপরই নাদির কুলী নামে আমানুল্লাহ খানের বরখাস্তকৃত এক সমরমন্ত্রী বাচ্চা-ই-সাকাকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে। তিনি

www.pathagar.com

নাদির শাহ উপাধি ধারণ করে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে শাসন করেন। এরপর ক্ষমতায় আসেন তার পুত্র জহির শাহ। তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর শাসন করেন। তার সময়ে পাশ্চাত্যের পরিবর্তে রাশিয়ার সাথে সখ্যতা বৃদ্ধি পায়। দেশের শাসনতান্ত্রিক সংকট, সোভিয়েত প্রীতি, স্বৈরাচার শাসন ও রাজনৈতিক কোন্দল প্রভৃতি কারণে জহির শাহের শাসন জনপ্রিয়তা হারায়। ১৯৭৩ সালের ১৬ই জুলাই রাজা জহির শাহ ইতালিতে সরকারি সফরকালে তার জ্ঞাতী ভাই সামরিক বাহিনীর প্রধান সর্দার দাউদ রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন।

সর্দার দাউদের ক্ষমতালাভের পরপরই আফগানিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ধারণা করা হয় যে, আফগানিস্তানের অবকাঠামোগত উন্নয়নে রাশিয়ার অবদান থাকায় রাশিয়ার সমর্থনে দাউদ ক্ষমতায় আসেন। ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ আফগানগণ সমাজতান্ত্রিক (Socialism) ব্যবস্থা প্রবর্তন মেনে নেয়নি। এ কারণে সোভিয়েত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো মুজাহিদ বাহিনী গঠন করতে থাকে। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মুজাহিদগণ সংঘবদ্ধ হতে পারেনি। সোভিয়েত সরকার আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তারের জন্য আফগানিস্তানে সমাজতন্ত্রের সমর্থক রাজনৈতিক দল গঠন করে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য খালক ও পারচাম দল। পারচাম দলের প্রধান ছিলেন নূর মোহাম্মদ তারাকি এবং খালক দলের কর্ণধার ছিলেন বারবাক কারমাল। ১৯৭৮ সালে পারচাম দলের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানে দাউদ ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। এর ফলে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে নূর মোহাম্মদ তারাকির আবির্ভাব ঘটে এবং আফগানিস্তানে ক্রমশ রুশ প্রভাব বিস্তার লাভ করে। কিন্তু দলীয় কোন্দলের ফলে তারই সহকর্মী হাফিজউল্লাহ আমিন কর্তৃক তিনি ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। তারাকি সোভিয়েত ঘেঁষা হলেও হার্ভাডে শিক্ষাপ্রাপ্ত আমিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হন। কিন্তু ক্ষমতার লড়াই-এ অল্প দিনের মধ্যে তিনিও ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। নূর মোহম্মদ তারাকির সময় আফগানিস্তানের সাথে রাশিয়ার একটি মৈত্রী চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তির অজুহাতে নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হাজার হাজার রুশ সৈন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। এ সময় পারচাম দলের প্রতিপক্ষ খালক দলের অধিনায়ক বারবাক কারমালকে ক্ষমতায় বসিয়ে রাশিয়া একট পুতুল সরকার গঠন করে। বহুদিন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ইরান ও আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে স্নায়ু যুদ্ধ (Cold war) চলছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইরান ছাড়া ইরাক থেকে ভিয়েতনাম পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ এলাকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বলয় গড়ে উঠে। ইরানে দ্বিতীয় রেজা শাহ পাহলভীর পতনের ফলে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে তার পরম মিত্রকে হারায়। এ সময় মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষ তথা মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত প্রভাব হ্রাসের উদ্দেশ্যে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রেগ্যান পাকিস্তানকে আধুনিক সমরাস্ত্র দিকে সুসজ্জিত করার ঘোষণা দেন। আফগানিস্তানে রুশ অভিযানের যৌক্তিকতা দেখানো হয়েছে এভাবে। সোভিয়েত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে ১৯৭৯ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে আফগান-রুশ মৈত্রী চুক্তির স্তবক ৪ এবং ৮ এর

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে মস্কো আফগানিস্তানে স্বার্থে কাবুল পর্যন্ত সফল সমরাভিযান করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি প্রত্যাখান করে রাশিয়ার সামরিক পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক আগ্রাসন হিসেবে চিহ্নিত করে।

আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীর অবস্থানে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয় এবং এতে প্রমাণিত হয় যে মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন প্রভাব শূন্যের কোঠায় পৌছেছে। এ কারণে রেগ্যানের মার্কিন সরকার আফগান মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতা দানের চিন্তাভাবনা করতে থাকে। উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তানে রুশ বাহিনী ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সন পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর অবস্থান করে। রুশ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ ক্ষমতায় আসার পর সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন দেখা যায়। ১৯৮৭ সনে বারবাক করমালাকে অপসারণ করে তার স্থলে বসানো হয় ক্রীড়ানক সৈয়দ মুহাম্মদ নজিবউল্লাহকে। আফগানিস্তান থেকে রুশ বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য আফগান মুজাহিদগণ জেহাদ ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সমস্ত মোজাহিদদের অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে রুশদের আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত করার জন্য। আফগান মুজাহিদদের সাথে ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। CIA-এর হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৫ সালে রাশিয়ার সৈন্য বাহিনীকে উৎখাত করার জন্য ওসামার সাথে ৫০০০ সৌদী, ৩০০০ ইয়ামেনী, ২০০০ আলজেরিয়া, ২০০০ মিশরীয়, ৪০০ তিউনিশিয়, ১৫০ ইরাকী, ২০০ লিবিয়া এবং অনেক জর্দানী যোদ্ধা–মুজাহিদ ছিল। এদের অনেকেই CIA আয়োজিত যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণ লাভ করে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত ওসামা আফগানিস্তানে ছিলেন এবং রুশ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সোভিয়েত বাহিনী ১৯৮৯ সনে বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

রুশ ক্রীড়নক নজিবউল্লাহ ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েতের অধীনে তাবেদার সরকার পরিচালিত করেন। কিন্তু আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ঐক্য ও স্থিতিশীলতার অভাবে নজিবউল্লাহ ১৯৮৯ থেকে আরও তিন বছর অর্থাৎ ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। এরপর আফগানিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আবির্ভাব ঘটে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পুষ্ট সামরিক ও আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত বুরহানউদ্দীন রাব্বানীর। আফগানিস্তানে নজিবুউল্লাহর পতন ও পরবর্তীকালে তালেবান সরকার কর্তৃক হত্যা দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করে। আফগানিস্তান একটি মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মৌলবাদী গোষ্ঠীদের আবির্ভাবে সমগ্র দেশ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে পরাশক্তি রুশ বাহিনীর অবস্থিতি স্বাধীনচেতা আফগানদের জন্য ছিল বোমসেল অর্থাৎ আত্মঘাতী বোমার অনুরূপ। স্বাধীনতা, স্বাধিকার, ও জাতীয় অখণ্ডত্ব ও নিরাপত্তা হারিয়ে আফগানগণ যখন পুতুল নজিবউল্লাহ সরকারের অধীনে ছিল তখন আফগান মুজাহিদগণ ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, গোড়ার দিকে আফগানিস্তানে মৌলবাদী গোষ্ঠীর অভ্যুত্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র ইন্ধনই জোগায়নি, অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে দীর্ঘ দশ বছর।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে ১,১০,০০০ সদস্য বিশিষ্ট রুশ সৈন্য মোতায়েন ছিল। সোভিয়েত বাহিনীর নিকট মওজুদ ছিল ২৮১টি ফাইটার এয়ারক্রাফট, ২৪টি ইলিশিয়ান, ২৮ বোম্বার, ২২০টি হেলিকোপ্টার, যার মধ্যে ৪৮টি গানশিপ, ৭৬টি পরিবহন বিমানসহ এক বিরাট বিমানবহর। এই বিশাল সেনাবহরকে রুখে দাঁড়াবার জন্য আফগানিস্তানে গঠিত হয় সাতটি মৌলবাদী জঙ্গী গোষ্ঠী। সুন্নী রক্ষণশীল আফগানিস্তানে কমিউনিষ্ট, বিধর্মী, নাস্তিক রুশ বাহিনীর উপস্থিতি মোটেই সুখকর ছিল না। এ ছাড়া নিকটবর্তী রাষ্ট্রে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তারে পাকিস্তান শঙ্কিত হয়ে উঠে। শিয়া রাষ্ট্র হিসেবে ইরানের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতা আয়াতউল্লাহ খোমেনী আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীর অবস্থানকে সুনজরে দেখেননি। উপরন্তু, মধ্যপ্রাচ্যে রুশ বাহিনীর অবস্থানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে বিরাট ধাক্কা লাগে এবং এ কারণে CIA অর্থাৎ Criminal investigation Agency of America) আফগানিস্তানে রুশ বিরোধী তৎপরতা শুরু করে। যে সমস্ত মৌলবাদী ধর্মীয় জঙ্গী গোষ্ঠী রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তারা হচ্ছে– (১) হিজব-ই-ইসলাম বা খালিস-এর প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী ইউনুস খালিস; (২) হিজব-ই-ইসলামী ঃ এর প্রভাবশালী নেতা ছিলেন গুলবদিন হিকমতইয়ার; (৩) জামাত-ই-ইসলামী ঃ এর নেতৃত্ব দেন তাজিক বংশোদ্ভূত কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন অধ্যাপক বোরহানউদ্দীন রাব্বানী; (৪) ইত্তেহাদ-ই-ইসলাম ঃ এই সংগঠনের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন প্রফেসর আব্দুল রসুল সাইয়াফ; (৫) জবাহ-ই-নিজাত মিল্লি; এর গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন কাবুলের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী সিতগাতউল্লাহ মোজাদ্দিদী; (৬) হরকত-ই-ইনকিলাব-ই-ইসলামী ঃ এর নেতৃত্বে ছিলেন মধ্যপন্থী চিন্তাবিদ মোহাম্মদ নবী মোহাম্মদী। (৭) মাহাজ-ই-মিল্লি-ই-ইসলামি; প্রখ্যাত আলেম ও সুফী পীর সৈয়দ আহামদ গীলানী এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন।

রুশ-আগ্রাসনের অবসানে মুজাহিদগণ একতাবদ্ধ হলেও তাদের মধ্যে নানা মতবিরোধের জন্য রুশ বাহিনীর বিতাড়ন দীর্ঘ দশ বছর বিলম্বিত হয়। আপাততঃ রাব্বানীই আফগানিস্তানে জেহাদ সংগঠিত করেন। ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত নজিবুল্লাহ রাশিয়ার ছত্রছায়ায় দু'বছর ক্ষমতায় থাকার পর গদিচ্যুত হন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন বুরহানউদ্দীন রাব্বানী। কিন্তু তিনি উত্তর আফগানিস্তানে জেহাদ পরিচালনা করেন। তার যে দুজন বিশ্বস্ত কমান্ডার ছিল তারা হচ্ছেন আহম্মদ মাসুদ এবং ইসমাইল খান। রাব্বানী রাষ্ট্রপতি এবং মাসুদ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পরে নজিবুল্লাহর প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবদুর রশিদ দোস্তম এই গোষ্ঠীতে যোগদেন। এই গোষ্ঠী পরে 'নদার্ন এ্যালায়েন্স' নামে পরিচিত হয়। লক্ষণীয় যে, এই মুজাহিদ জঙ্গী বাহিনী গঠিত হয় তাজিক ও উজবেক যোদ্ধাদের দ্বারা। এরা আফগানিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পশতুন বাহিনীর নেতা গুলবদিন হিকমতিয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। হিকমতিয়ার পাকিস্তানের সমর্থন লাভ করেন। পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে। রাব্বানী সরকারের অধীনে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করে তিনি দক্ষিণে কান্দাহারে ঘাঁটি স্থাপন করে রাব্বানী সরকারের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হন। রুশ বিরোধী জিহাদে হিকমতিয়ারের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল এবং তিনি আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে

www.pathagar.com

আধিপত্য বিস্তার করে কাবুলে অভিযান করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি জাতিসংঘের সাধারণ সভায় অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক যান এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের সাথে দেখা করেন। এ ধরনের ঔদ্ধত্বের জন্য তিনি মার্কিন সরকারের বিরাগভাজন হন।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত রুশ বাহিনীর অবস্থানের দরুন আফগানিস্তানে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। রুশ বিরোধী আন্দোলনে মধ্যপন্থী ও কট্টরপন্থী মৌলবাদী জঙ্গী অংশগ্রহণ করে। এ সময় ১৯৮৫ সালে মুজাহিদদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১,৪০,০০০-তে। এছাড়া অ-আফগান আরব মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০,০০০। মুজাহিদদের সংখ্যা যত বড়ই হোক না কেন তাদের মধ্যে ঐক্য না থাকায় রুশ বাহিনীকে সহজে তাড়ানো সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারকারী রাব্বানী ও মাসুদের 'নর্দান এ্যালায়েন্সের' সাথে হিকমতিয়ারের ইসলামী এ্যালায়েন্স গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইসলামী এ্যালায়েন্স কান্দাহারসহ দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বিশাল পশতুন জনগোষ্ঠীর সমর্থন নিয়ে হিকমতিয়ার উত্তরে অভিযান পরিচালনা করে কাবুল দখল করে। এক পর্যায়ে সাউদী আরব হিকমতিয়ারকে সাহায্য ও সমর্থন দান করে। হিকমতিয়ার ও রাব্বানী মাসুদের নেতৃত্ব পরিচালিত সংঘর্ষে কাবুলের রাস্তা রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধের কারণে কট্টরপন্থী তালেবানদের আবির্ভাব হয়।

তালেবান নামে যে কট্টরপন্থী ধর্মীয় সংগঠন আফগানিস্তানের রাজনীতিতে আবির্ভূত হয় তার প্রতিষ্ঠাতা কান্দাহারের এক দরিদ্র ঘরের সন্তান মোল্লা ওমর। আফগানিস্তানে তালেবানদের অভ্যুত্থান ঘটে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে। নজিবুল্লাহর পতনের পর থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত রাব্বানী আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং 'নর্দান এ্যালায়েন্সের' নেতৃত্ব দেন। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে মোল্লা ওমর আফগানিস্তানের অস্থিরশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে অতি অল্পদিনের মধ্যে কট্টরপন্থী অবিসংবাদী নেতাতে পরিণত হন আফগানিস্তানে এবং শরিয়ত আইন প্রবর্তন দ্বারা বর্বরোচিত আচরণ শুরু করেন। অনেকে তালেবানদের ধর্মীয় ফাসিষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাহোক, তিনি প্রথমে হিকমতিয়ারের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে কান্দাহারে আধিপত্য বিস্তার করেন। সুসংগঠক তালেবান নেতা মোল্লা ওমর কালো পোষাকধারী মোল্লাদের যোদ্ধায় রূপান্তরিত করেন এবং সামরিক প্রশিক্ষণ দ্বারা তাদের অপ্রতিরোধ্য করে তোলেন। মোল্লা ওমর তালেবান দলের প্রতীভূ ছিলেন এবং এক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করেন। তাছাড়া তিনি আরব ধনকুবের ও আল-কায়দার অবিংশবাদী নেতা ওসামা বিন লাদেনের সাহায্য ও সহযোগিতা পান। মোল্লা ওমর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল দখল করে উত্তর দিকে তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। কান্দাহার ও হেলমন্দ প্রভৃতি প্রদেশ দখল করার পর তিনি রাজধানী কাবুলে প্রবেশ করেন। কাবুলের পতনের ফলে রাব্বানী ও মাসুদ রাজধানী ত্যাগ করে উত্তরে আত্মগোপন করেন। তালেবানগণ ধীরে ধীরে সমগ্র আফগানিস্তানের ৯০% অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে ইসলামের নামে দুঃশাসন কায়েম করে। রাব্বানী ও

হিকমতিয়ারের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আফগানদের জীবনে প্রচণ্ড বিপর্যয় ডেকে আনে এবং বহু নিরীহ আফগান নিহত হয়। এ কারণে প্রথম দিকে তালেবানদের প্রতি আফগান সাধারণ জনগোষ্ঠীর সমর্থন ছিল না। নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও অল্পদিনের মধ্যে তালেবানদের প্রকৃত চরিত্র জনগণের কাছে উন্মোচিত হয়। তারা ধর্মের নামে স্বৈরাচার শুরু করে।

তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠার পর তারা এককালীন রাশিয়ার দোসর কাবুলে জাতিসংঘ ভবনে আত্মগোপনকারী নজিবউল্লাহ এবং তার ভাইকে নির্যাতন করে হত্যা করে। তাঁদের প্রকাশ্য ফাঁসী দেয়া হয়। শুধু তাই নয় তারা ধর্মীয় উন্মাদনায় (fanaticism) উদ্দীপ্ত হয়ে শরিয়া আইন জারী করে নির্যাতন শুরু করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। বোরখা বা হিযাব বাধ্যতামূলক করা হয়। একা মহিলাদের রাস্তায় চলাফেরা নিষিদ্ধ হয়। ধূমপান, সঙ্গিত, নাচ, প্রেক্ষাগৃহ, ময়ূর পালা, ঘুড়ি উড়ানো ও টেলিভিশন দেখা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ধর্মের নামে জনগণকে উৎপীড়ন শুরু করলে তালেবানদের প্রতি সাধারণ আফগানদের ঘৃণা প্রদর্শিত হতে থাকে। আর্থিক দিক থেকে সঙ্কট দেখা দিলে ধনকুবের ওসামা বিন লাদেন ১৯৯৬ সালে তালেবান সরকার প্রধান মোল্লা ওমরের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন এবং সুদান থেকে বিতাড়িত হয়ে আফগানিস্তানে আশ্রয় নেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবক গঠনের জন্য অকাতরে অর্থ দান করতে থাকেন। তালেবান সরকারের মূর্তি বিরোধী পদক্ষেপে বামিয়ানে প্রাচীন কালের বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতীক দুটি বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসে সারা বিশ্বে তাদের কট্টরপন্থী ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

তালেবান শাসন সারা বিশ্বে কট্টরপন্থী মোল্লাদের দুঃশাসন হিসেবে পরিচিত লাভ করে। অসংখ্য নিরীহ লোকদের হত্যা করা হয়। শিক্ষার প্রসারতা বন্ধ হয়ে যায়। নারীদের স্বাধিকার স্তব্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া নজিবুল্লাহকে ফাঁসি দিয়ে গলিত লাশ ঝুঁলিয়ে রাখাকে তাদের মধ্যযুগীয় বর্বরতা হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ জন্য দুই-তিনটি দেশ ছাড়া অন্যকোন দেশ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দান থেকে বিরত থাকে। আফগানিস্তান অর্থনৈতিক মন্দার অন্যতম কারণ ছিল যুদ্ধাবস্থায় আফগানিস্তান থেকে গ্যাস ও তেল রপ্তানিতে বিঘ্ন সৃষ্টি। পরিস্থিতি এক পর্যায়ে এমন দাঁড়ালো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ আফগানিস্তানে অবরোধ জারী করে। মোল্লা ওমর ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে আশ্রয় দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আফগানিস্তানের সম্পর্ক তিক্ত হয়। কারণ ওসামাকে সুদানে মার্কিন দূতাবাসে হামলা পরিকল্পনার জন্য দায়ী করা হয়। এছাড়া আমেরিকান তেল কোম্পানি UNOCAL আফগানিস্তান থেকে গ্যাস ও তেল রপ্তানি করতে না পারায় পশ্চিমাদেশে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জালানী গ্যাসের সংকট দেখা দেয়। পাকিস্তান ও সাউদী আরব তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সমর্থন দেয়। যেহেতু আফগানিস্তানের ৯০ ভাগ তালেবানদের কর্তৃতাধীনে ছিল সেহেতু তড়িঘড়ি করে আফগানিস্তানে কোন সামরিক অভিযান প্রেরণে আমেরিকা আগ্রহী ছিল না। কিন্তু ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার, ওয়াশিংটন ডিসির পেন্টাগণ ও

www.pathagar.com

অন্যান্য মার্কিন স্থাপনায় বিমান দ্বারা আত্মঘাতী হামলা এবং হত্যাযজ্ঞের ফলে আমেরিকার সাথে তালেবান সরকারের বিরোধ শুরু হয়। এ সময় মোল্লা ওমর সরকারে প্রধান থাকলেও মূলত আফগানে সরকার ওসামা বিন লাদেনের পরামর্শে পরিচালিত হতে থাকে। ওসামার গুপ্তচরেরা আত্মঘাতী বোমা মেরে পানশীরের বাঘ আহাম্মদ শাহ মাসুদকে, যিনি 'নর্দাম এ্যালায়েন্সের' প্রতীভূ ছিলেন, হত্যা করে ২০০১ সালে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে মার্কিন লক্ষ্যবস্তুর উপর হামলার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। সুদান থেকে আফগানিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী বিন লাদেনের আস্তানায় ১৯১৮ সালের ২০ আগস্ট টম ক্রুজ মিসাইল দ্বারা হামলা চালালেও তার কোন ক্ষতি হয়নি। এরপর আমেরিকা মোল্লা ওমরের কাছে বিন লাদেনকে তাদের হাতে সমর্পণ করার অনুরোধ জানায়। কিন্তু মোল্লা ওমর এই অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাহার করেন। ইতোমধ্যে ১৯৯৯ সালের খাদ্য দ্রব্য ছাড়া জাতিসংঘ আফগানিস্তানে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করে। কিন্তু আফগানিস্তানের অবরোধে এমন কোন ক্ষতি হয় নি; কারণ ধনকুবের বিন লাদেন তালেবান সরকারের অর্থ যোগান দেন। আল-কায়দার অবিংশবাদী নেতা বিন লাদেনের প্রতি প্রতিহিংসামূলকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর দোসরদের নিয়ে আফগানিস্তানের উপর বোমা হামলা চালাতে থাকে ২০০১ সালের ১১ নভেম্বর। এক মাস ধরে আমেরিকার বোমারু বিমানগুলো আফগানিস্তানের বড় বড় শহরগুলোতে তালেবান বাহিনীর ব্যারাক ও উত্তর জোটের সাথে যুদ্ধের প্রতিরক্ষা ব্যূহে উপর্যুপরি বোমা হামলা চালাতে থাকে। এ ধরনের বোমাবাজিকে 'কার্পেট বোম্বিং' বলে। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে বোমা বর্ষণের ফলে তালেবানদের দখল থেকে মাজার-ই-শরিফ মুক্ত হয়ে। এ হামলায় উজবেক যুদ্ধবাজ আব্দুর রশিদ দোস্তম চার হাজার মিলিশিয়া নিয়ে মাজার-ই-শরিফে প্রবেশ করেন। তালেবানগণ মাজার-ই-শরীফ ছেড়ে মাজার-ই-শরিফ ও কাবুলের মধ্যবর্তী কুন্দুজ শহরে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে। মাজার-ই-শরিফের পতনে তালেবানগণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। কারণ তাদের সরবরাহ রুট বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে সম্মিলিত জোট আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স উপর্যুপরি বোমা নিক্ষেপে তালেবানদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। দোস্তম মাজার-ই-শরিফ দখল করে তার বাহিনী নিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ১১ নভেম্বরের মধ্যে তালাখান্দ, বাগলান, সামানগান প্রদেশগুলোসহ পুল-ই-খুমারির মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো অধিকার করেন। এছাড়া উত্তর জোটের জেনারেল ফাহিমের নেতৃত্বে ট্যাংকবহর ১১ নভেম্বর বামিয়ান গিরিপথে অবস্থান গ্রহণ করে। এর ফলে কাবুলে অভিযান সহজতর হয়। মার্কিন ব্রিটিশ বোমারু বিমানগুলো কাবুলে বোমা নিক্ষেপ করতে থাকলে তালেবান মোল্লাপন্থী যোদ্ধাগণ রাজধানী ছেড়ে চলে যায়। দীর্ঘ দিনের গোত্রীয় সংঘাত, রক্তপাত এবং বৈদেশিক আক্রমণের ফলে তালেবান সরকারের পতন হয় ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ টুইন টাওয়ারের ধ্বংসের দুই মাসের মধ্যে। এর ফলে কাবুলে উত্তর জোটের নেতৃবৃন্দ আফগান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেল। ছয় মাসের মধ্যে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। সম্মিলিত বাহিনীর সমর্থনে তালেবানদের পতনে আফগানিস্তানের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্য উদিত হয়। তালেবান নেতা মোল্লা ওমর এবং আল-কায়দা নেতা

www.pathagar.com

ওসামা বিন লাদেন ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেলেও তারা এখন সম্ভবত জীবিত আছেন। তাদের অন্তর্ধান সত্যই রহস্যজনক। ধারণা করা হয় যে, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী দুর্গম তোরাবোরা পাহাড়ের গুহায় বিন লাদেন ও তার ধর্মগুরু আল-জাওয়াহিরী অবস্থান করছেন। মার্কিন বোমারু বিমান বোমা ফেলে এবং মার্কিন বাহিনী অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করতে পারেনি।

১৯৭৯ থেকে ২০০১ সাল দীর্ঘ একুশ বছর আফগানিস্তানের ইতিহাস রক্তে ভিজা ইতিহাস। এ সময় বহু আফগান নাগরিক হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে প্রতিহিংসামূলক রাজনৈতিক কোন্দলের জন্য। তালেবানদের পতন আফগানিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনে। গঠিত হয় বিভিন্ন দলমতের সরকার। নতুন সরকার প্রধান হলে বিশিষ্ট আফগান বুদ্ধিজীবী ও পাশ্চাত্য ঘেষা নেতা হামিদ কারজাই। তিনি লয়া জিরগা বা নির্বাচনী সংস্থার মাধ্যমে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ ভোট লাভ করেন। কারজাই বর্তমানে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমীর দোস্ত মুহম্মদ ও প্রথম আফগান যুদ্ধ

দূররানী রাজবংশের অভ্যুত্থান

উপজাতি ঃ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত আফগানিস্তানের ইতিহাস অতি বিচিত্র। এই উপজাতির মধ্যে রয়েছে গীলজাই ও আবদালী। ফ্রেজার টাইটলার যথার্থই বলেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিশাল ও ক্ষমতাশালী পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে আফগানিস্তানে স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম হয়। বিশেষভাবে নাদির শাহের মৃত্যুর পর যে পারস্য সাম্রাজ্য লাহোর ও আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলে আফগান উপজাতীয়গণ তাদের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। এ সময়ে আবদালী উপজাতীয় ছিল খুবই প্রভাবশালী। এই উপজাতির দু'টি শাখা ছিল– পুপুলজাই এবং বারাকজাই। এই দুই শাখা থেকে উদ্ভূত সাদোজাই এবং মুহম্মদজাই ছিল অধিকতর ক্ষমতাশালী। মূলত এই দুটি উপজাতিই আফগানিস্তানের ইতিহাসে দু'শত বছর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সাদোজাই ও দূররানী ঃ সাদোজাই এবং মুহম্মদজাই গোষ্ঠীর মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাশালী ছিল সাদোজাই। এ উপজাতির প্রভাবশালী সদস্য আহমদ শাহ পরবর্তীকালে আফগানিস্তানের শাসক নির্বাচিত হন। মুহম্মদজাই গোষ্ঠীর নেতা হাজী জামাল খান আহম্মদ শাহের পক্ষ সমর্থন করেন। এই উপাধি থেকেই আহম্মদ শাহ দূররানী নামে অভিহিত হতে থাকেন। আহম্মদ শাহ ১৭৪৭ থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। আফগানিস্তান এবং ভারত-উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলে আহমদ শাহ দৌর্দণ্ডপ্রতাপের সাথে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

মুহম্মদজাই উপজাতি ঃ ১৭৭৩ সালে আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর সাদোজাই উপজাতির প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। এর ফলে বিশাল দূররানী সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং সংঘবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে আফগানিস্তানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। দূররানী উপজাতির অপর শাখা মুহম্মদজাই গোত্রের প্রধান পায়েন্দা খান এ সময়ে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। আহম্মদ শাহ আবদালী বা দূররানীর বংশধরদের মধ্যে কোন্দল শুরু হলে মুহম্মদজাই গোত্র তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। পায়েন্দা খানের পুত্র ফতেহ খান মুহম্মদজাই গোত্রের প্রধান হলে সাদোজাই গোত্রের শাহ মুহম্মদ ১৮১৮ সালে তাঁকে হত্যা করলে মুহম্মদজাই গোত্র সাদোজাই গোত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে। দূররানী বংশের পতনের পর মুহম্মদজাই গোত্রের অভ্যুত্থান হয়। ফতেহ খানের নৃশংস হত্যার পর মুহম্মদজাই গোত্রের কোন বলিষ্ঠ নেতা না থাকায় তথায় রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ১৮১৮ থেকে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত পায়েন্দা খানের পুত্রদের মধ্যে বিবাদ অব্যহত থাকায়

www.pathagar.com

মুহম্মদজাই তাঁদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে পারেননি। কিন্তু পায়েন্দা খানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র দোস্ত মুহম্মদ তাঁর ভাইদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন এবং ক্রমশঃ আহমদ শাহ আবদালীর সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

দোস্ত মুহম্মদের ক্ষমতালাভ

পূর্বাবস্থা ঃ ১৮২৬ সালে ক্ষমতা লাভ করে দোস্ত মুহম্মদ এক মারাত্মক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতার সম্মুখীন হন। আফগান উপজাতীয় কোন্দল বিশেষ করে মুহম্মদজাই-এর সদস্যদের অর্থাৎ পায়েন্দা খানের পুত্রদের মধ্যে আত্মঘাতী বিরোধ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। উত্তরে বলখ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সিন্ধু ও বেলুচিস্তান আফগান সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে; পশ্চিমে হিরাতে সাদোজাই গোত্রের শাহ মুহম্মদ এবং তাঁর পুত্র কামরান স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অপরদিকে কান্দাহারী সর্দারেরা গজনী দখল করে। এ ছাড়া ভারত উপ-মহাদেশের রঞ্জিত সিংহের নেতৃত্বে শিখ শক্তির অভ্যুত্থানে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিরাট হুমকী দেখা দেয়। উচ্চাভিলাষী ও রণদক্ষ রঞ্জিত সিংহ ভারতবর্ষের আফগান অধিকৃত অঞ্চল দখল করতে থাকেন। তিনি ক্রমশঃ মুলতান, পেশওয়ার ও কাশ্মীরসহ সিন্ধু নদীর পূর্বতীরবর্তী অঞ্চলসমূহ দখল করে শিখ প্রভুত্ব কায়েম করেন। দোস্ত মুহম্মদ আফগানিস্তানের অধিপতি নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে এ ধরনের রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হন। মূলতঃ তিনি সিংহাসনে উপবেশন করার সময় তাঁর রাজত্ব রাজধানী কাবুলের চর্তুপার্শ্বে একশ মাইলের অধিক বিস্তৃত ছিল না। ফ্রেজার টাইটলার বলেন যে, আহমদ শাহ দুররানীর প্রতিষ্ঠিত বিশাল আফগান সাম্রাজ্য এত দ্রুত যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে তার নজীর ইতিহাসে বিরল। দোস্ত মুহম্মদ মুহম্মদজাই গোত্রভুক্ত সর্দার ছিলেন এবং তিনি আফগানিস্তানের এই রাজনৈতিক দুর্দিনে স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় রাখার প্রয়াস পান। সাদোজাই অপেক্ষা মুহম্মদজাই গোত্রের মধ্যে বিরোধ থাকলেও তারা আফগানিস্তানে একটি বংশানুক্রমিক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

দোস্ত মুহম্মদের সমস্যা ঃ বাল্যকাল থেকেই দোস্ত মুহম্মদ আফগান উপজাতীয় বিদ্বেষ, কোন্দল ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে লালিত পালিত হন। (brought up in a hard school of intrigue and plotting and treachery) পায়েন্দা খানের কনিষ্ঠ সন্তান এবং একজন কিজিলবাস মাতার পুত্র দোস্ত মুহম্মদ ক্ষমতা লাভ করে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হলেও তিনি তাঁর মাতৃকুলের কিজিলবাস গোত্রের সমর্থন লাভ করেন। তিনি যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সাহসী ও তেজস্বী হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। তিনি নিরক্ষর হলেও অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তোলেন এবং স্বীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। কাবুলে ১৮২৬ সালে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে অতি অল্প সময়ে কেবল সামরিক নেতাই নয় একজন দক্ষ শাসক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। ক্ষমতালাভ করে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁর রাজ্য ছিল সীমিত, ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ এবং তিনি চারদিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে আফগানিস্তানকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন দোস্ত মুহম্মদ। বৈদেশিক পর্যটক চার্লস ম্যাসের ভাষায়, দোস্ত

www.pathagar.com

মুহম্মদের ক্ষমতালাভের পর সমগ্র দেশের অরাজকতা, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহনিতা বিরাজ করছিল। উপরন্তু, ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় রঞ্জিত সিংহের অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়।

আফগান-শিখ সংঘর্ষ ঃ দোস্ত মুহম্মদ স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য ক্রমবর্ধমান শিখ শক্তির আগ্রাসনকে প্রশমিত করার জন্য পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের দুর্গগুলো সুরক্ষিত করেন। এজন্য প্রথমে তিনি হিন্দুকুশ এবং আমুর দরিয়ার মধ্যবর্তী হৃত আফগান অঞ্চল পুনর্দখলে মনোনিবেশ করেন। হিন্দু-শিখ আধিপত্য থেকে কাশ্মীর উপত্যকাসহ পেশওয়ার ও সিন্ধু অঞ্চলকে উদ্ধার করার জন্য দোস্ত মুহম্মদ একজন স্বাধীনচেতা আফগান নেতা এবং সুন্নী মুসলমান হিসেবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, বহু আফগান হিন্দু-শিখ শাসনাধীনে বসবাস করত এবং আহমদ শাহ আবদালী যেভাবে মারাঠা ও হিন্দুদের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করেন অনুরূপ ইসলামের বিজয় কেতন প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করেন। ইত্যবসরে রঞ্জিত সিংহের বাহিনী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অভিযান করে পেশওয়ার দখল করে। দোস্ত মুহম্মদ শিখ আগ্রাসনের উপযুক্ত জবাব প্রদানের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। আফগান বাহিনীর সাথে শিখ বাহিনীর জমরুদের নিকট সংঘর্ষ হয় এবং দোস্ত মুহম্মদের পুত্র মুহম্মদ আকবরের নিকট রঞ্জিত সিংহের সেনাপতি হরিসিংহ পরাজিত ও নিহত হন। আমীর দোস্ত মুহম্মদ তাৎক্ষণিকভাবে পেশওয়ার দখল না করে ভারতের বৃটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডকে আফগান ও শিখ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পত্র দেন। ১৮৩৬ সালে লিখিত পত্রে তিনি ব্রিটিশ ভারতের শাসনকর্তাদের মধ্যস্থতা কামনা করেন। মূলতঃ এই পত্রটিই মধ্য-এশিয়ায় ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের সূত্রপাত করে।

ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক ঃ

প্রথম আফগান যুদ্ধ ঃ দোস্ত মুহম্মদের সাথে ভারতের ইংরেজ শাসকদের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে অবশ্য পারস্য ও আফগানিস্তানকে রুশ-ব্রিটিশ প্রভাবের বলয় কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এতদঞ্চলে রুশ প্রভাব বিস্তারকে ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেনি। কারন, তারা রুশ ভাল্লুকের ছায়ায় সব সময় আতঙ্কিত ছিল। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের সিংহাসনে উপবেশন করে আমীর দোস্ত মুহাম্মদ নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করেন। বস্তুতঃ দোস্ত মুহম্মদের রাজনৈতিক অবস্থা সঙ্কটজনক ছিল। জনৈক লেখক বলেন, "উত্তরে বলখে বিদ্রোহ, দক্ষিণে তাঁর এক ভাই কান্দাহার দখল করে রেখেছেন, পূর্বে পেশওয়ার রঞ্জিত সিংহের করায়ত্ত, সদোজোই গোত্রের শাহ সুজা ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে উদ্ধত, পশ্চিমে মুহম্মদ শাহ ও কামরান হিরাত দখল করে রয়েছেন এবং আরও পশ্চিমে পারস্য সম্রাট রুশ সহায়তায় আফগানিস্তানের উপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমতাবস্থায় দোস্ত মুহম্মদের ভারতীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিত্রতা না করে উপায় ছিল না।" ১৮৩৬ সালে লর্ড অকল্যান্ডের নিকট দোস্ত মুহম্মদ পত্র দিয়ে গভর্নর জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় অভিনন্দন জানান এবং রঞ্জিত সিংহের বিরুদ্ধে সাহায্যে প্রার্থনা করেন। তিনি অকল্যান্ডকে নম্র ভাষায় জানান যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশ

www.pathagar.com

সরকারের হস্তক্ষেপ করার রীতি নেয়। অপরদিকে, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন ভারত সরকারকে পারস্য ও আফগানিস্তানে রুশ প্রভাব বিস্তারের সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। লর্ড অকল্যান্ড আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য আলেকজান্ডার বার্নসকে কাবুলে পাঠান। দোস্ত মুহম্মদ ব্যক্তিগতভাবে বার্নসকে অভ্যর্থনা জানান এবং ভারতে ফিরে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে দোস্ত মুহম্মদের বিরুদ্ধে রঞ্জিত সিংহের আগ্রাসন বন্ধের ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করেন। কারণ তার ধারণা ছিল যে, শিখ নেতা পেশাওয়ার দখলে রাখতে পারবেন না। কিন্তু অকল্যান্ড এবং তাঁর পরামর্শদাতা ম্যাক্‌নাগাটেন ও কলভিন রঞ্জিত সিংহের উপর চাপ সৃষ্টি করতে রাজী হননি। ব্রিটিশ সরকারের বৈরীতে প্রকাশিত হলে দোস্ত মুহম্মদ বার্নসের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং রুশ প্রতিনিধি ক্যাপটেন ভিকোভিচকে (Vikovich) কাবুলে আমন্ত্রণ জানান। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৩৮ সালে বার্নস কাবুল ত্যাগ করেন। দোস্ত মুহম্মদের পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তনে আশঙ্কিত হয়ে অকল্যান্ড শিখ রানা রঞ্জিত সিংহ এবং শাহ্ সুজার সঙ্গে একটি ত্রি-মুখী চুক্তি (Tripartite Treaty) সম্পাদন করেন। রুশ-ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস, পারস্য সম্রাট কর্তৃক হিরাত দখল, রঞ্জিত সিংহের আগ্রাসন এবং ত্রি-মুখী চুক্তির সম্পাদনায় দোস্ত মুহম্মদ বিচলিত হন এবং এ সমস্ত কারণেই প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৮-৪২) সংঘটিত হয়। ১৮৩৮ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ফিরোজপুর থেকে যাত্রা করে কোয়েটায় পৌঁছায় এবং বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে ১৮৩৯ সালে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। কাবুলে দোস্ত মুহম্মদের রুশ প্রীতির জন্য জনপ্রিয়তা হারান এবং তিনি কাবুল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। শাহ্ সুজা কাবুল দখল করেন এবং দোস্ত মুহম্মদ রাজবন্দী হিসেবে কলকাতায় প্রেরিত হন।

কাবুল পুনরুদ্ধার ঃ দোস্ত মুহম্মদের পদচ্যুতিতে আফগানবাসী ব্রিটিশ রাজশক্তির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এদিকে শাহ সুজার জনপ্রিয়তা না থাকায় কাবুলে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় ছিলনা। অধিকন্তু ত্রি-মুখী চুক্তির স্বাক্ষরদানকারীদের মধ্যে সখ্যতার অভাবে তা ভেঙ্গে পড়ে। রঞ্জিত সিংহের মৃত্যুর পর ব্রিটিশদের সঙ্গে শিখদের সম্পর্কে ভাটা পড়ে। অকল্যান্ডের বৈদেশিক নীতির তীব্র সমালোচনা হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। এতদসত্ত্বেও কাবুলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তখনও অবস্থান করছিল। কাবুলে খাদ্যাভাব এবং বিদেশী সৈন্যদের উপস্থিতিতে আফগানবাসী বিদ্রোহ করে। কাবুলের দ্বৈত-শাসনে (শাহ সুজা ও দোস্ত মুহম্মদ) রাজনৈতিক অরাজকতার সৃষ্টি হয়। ক্রুদ্ধ জনতা ব্রিটিশ প্রতিনিধি বার্নসের গৃহ আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেন। শাহ সুজা কাবুল ত্যাগ করলে দোস্ত মুহম্মদের পুত্র মুহম্মদ আকবর খান আফগানদের নেতা হিসেবে ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন। কিন্তু অকল্যান্ডের পরামর্শদাতা ম্যাক্‌নাগাটেনও নিহত হন। প্রায় ১৬০০০ সৈন্য প্রত্যাগমনের সময় আক্রান্ত হয় এবং ১২০ জন ব্যতীত সকলকে হত্যা করা হয়। ব্রিটিশ বাহিনীর বিপর্যয়ে অকল্যান্ডের পরিবর্তে লর্ড এলেনবরাকে গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। তিনি বলিষ্ঠ হস্তে সামরিক বিপর্যয়কে রোধ করার জন্য পোলোককে (Pollock) কাবুল প্রেরণ করেন। ১৮৪২ সালে তিনি কাবুলের রাজপ্রাসাদ তোপ দিয়ে উড়িয়ে দেন এবং খুরদ্ কাবুল গিরিপথে আকবর খানকে

www.pathagar.com

পরাজিত করে সামরিক বিপর্যয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এরপর ব্রিটিশ বাহিনী আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং শাহ সুজার মৃত্যুর পর ১৮৪৩ সালে দোস্ত মুহম্মদকে পুনরায় কাবুলের সিংহাসন বসান হয়। দোস্ত মুহম্মদ ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রথম আফগান যুদ্ধের ফলাফল ঃ প্রথম আফগান যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল ছিল এই যে এই যুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় ব্রিটিশ বাহিনীর বিপর্যয় ঘটে এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে দোস্ত মুহম্মদ তাঁর সিংহাসন ফিরে পান। বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে,

১. এই যুদ্ধে ২০,০০০ লোকের জীবন বিসর্জন হয় এবং ১৫ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় হয়।

২. এই যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং ১২০০ সৈন্য প্রাণ হারায়।

৩. এই যুদ্ধ ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়।

৪. এই যুদ্ধ প্রমাণ করে যে, ব্রিটিশ বাহিনী অপরাজেয় নয়।

৫. এই যুদ্ধে আফগান উপজাতীয়দের মনোবল বৃদ্ধি করে।

৬. এই যুদ্ধ সর্ব প্রথম আফগানিস্তানে রুশ-ব্রিটিশ কূটনৈতিক সংঘর্ষের সূত্রপাত করে।

৭. এই যুদ্ধ ব্রিটিশ সামরিক দক্ষতার প্রতি বিরাট হুমকী স্বরূপ ছিল। অকল্যান্ডের অদূরদর্শিতার ফলেই এই বিপর্যয় হয়। (Auckland's policy was baneful, lawless and blundering)

৮. ব্রিটিশ দ্বৈত-নীতির ফলাফল ছিল মারাত্মক। দোস্ত মুহম্মদ যখন অকল্যান্ডের কাছে রঞ্জিত সিংহের বিরুদ্ধে সহযোগিতা চান তখন ব্রিটেন তা অস্বীকার করে কিন্তু আফগানিস্তানে রুশ হস্তক্ষেপকে তারা স্বাগত জানায়।

৯. এই যুদ্ধের ফলে শাহ সুজা পরাজিত ও নিহত হননি; পারস্য সম্রাটের আগ্রাসনও স্তব্ধ করে দেওয়া হয় এবং হিরাত থেকে পারস্য বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়।

১০. চুক্তি ভঙ্গ করে ব্রিটিশ বাহিনী সিন্ধুর মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে, যা আন্তর্জাতিক রীতিনীতির বহির্ভূত।

১১. ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতির সমালোচনা করে ডিউক অব ওয়েলিংটন বলেন, "আফগানিস্তানের সরকারকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য সিন্ধু নদ অতিক্রম করে আফগানিস্তানে প্রবেশ সে দেশের অনন্তকালের জন্য অনুপ্রবেশের সামিল।"

দোস্ত মুহম্মদের কৃতিত্ব ঃ ১৮৪৩ সালে কাবুলের সিংহাসনে পুনরায় উপবেশন করে দোস্ত মুহম্মদ ১৮৪৮ সালে জনগণের চাপে ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে শিকদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর থেকে ব্রিটিশ-আফগান বৈদেশিক সম্পর্ক শীতল হলো।

www.pathagar.com

পরবর্তী পর্যায়ে ১৮৫৪ সালে ক্রিমিয়া যুদ্ধ বাধলে রুশ প্রভাব খর্ব করার জন্য ব্রিটিশ-ভারত দোস্ত মুহম্মদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। আমীর পেশওয়ারে গমন করে ব্রিটিশ এজেন্ট লরেন্স এবং এডওয়ার্ডের সঙ্গে আলাপ করেন এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে সৈন্য ও রসদ পাঠাবার জন্য প্রতিমাসে এক লক্ষ টাকা প্রদান করার অঙ্গিকার করা হয়। কিন্তু কাবুলে বিদেশী সৈন্যের অবস্থিতি বিপদজনক হতে পার মনে করে কান্দাহারে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়। ১৮৫৭ সালে সম্পাদিত চুক্তির ফলে দোস্ত মুহম্মদ আফগানিস্তানের বৈদেশিক হস্তক্ষেপ থেকে রেহাই পান এবং দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম হয়। এই কর্মকাণ্ডকে ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গীতে masterly inactivity অর্থাৎ 'মহা অকর্মণ্যতা' বলা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও, দোস্ত মুহম্মদের তেজস্বীতা ও দূরদর্শিতার ফলে আফগান আধিপত্য আমুর দরিয়া এবং সিসতান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৮৬২ সালে মৃত্যুর এক বছর পূর্বে হিরাত দখল করে তিনি তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করেন।

পিটার লামসডেন দোস্ত মুহম্মদ সম্বন্ধে বলেন যে, "তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী এবং রাজকীয় চেহারার অধিকারী। তিনি খুবই নম্র স্বভাবের ছিলেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গি এবং প্রখর দৃষ্টি তাঁর বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তাকেই ইঙ্গিত করে।" দোস্ত মুহম্মদ ধর্মভীরু, সদাশয় এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ শাসক ছিলেন। আফগানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আফগান রাষ্ট্র কায়েম করে বংশ পরম্পরায় শাসনব্যবস্থা চালু করেন। ১৮৬৩ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি ১৬জন সন্তান রেখে যান। এর মধ্যে তৃতীয় সন্তান শের আলী স্বীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা বলে কাবুলের সিংহাসনে বসেন। দোস্ত মুহম্মদের উত্তরাধিকারী হিসেবে শের আলী তাঁর প্রজাদের বৈরিতা নির্মূল করেন। দোস্ত মুহম্মদ আধুনিক আফগানিস্তানের ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আমীর ছিলেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আমীর মুহম্মদ শের আলী ও দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ

শের আলীর ক্ষমতালাভ ঃ দোস্ত মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র শের আলী ১৮৬৩ সালে আফগানিস্তানের আমীর নির্বাচিত হন। দোস্ত মুহম্মদ শের আলীর তেজস্বীয়তা ও বিচক্ষণতার জন্য তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনিত করেন। কিন্তু তাঁর দুই জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা মুহম্মদ আফজাল খান এবং মুহম্মদ আযিম খান কনিষ্ঠ ভ্রাতার উত্তরাধিকারীত্বে বিরোধিতা করলে শের আলী ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারে সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করেন। লর্ড লরেন্স শের আলীকে আমীর হিসেবে স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি সামরিক বা আর্থিক সাহায্য প্রদানে বিরত থাকেন। কারণ, এর ফলে একদিকে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হতে পারে, অপর দিকে রুশ সরকারের আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপের অযুহাত হয়ে দাঁড়াবে। তিনি ১৮৫৫ সালে সম্পাদিত ব্রিটিশ-আফগান চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলেন এবং নিষ্কলুষ নিরপেক্ষতা (strict neutrality) বজায় রাখেন। ঘটনা প্রবাহে আফগানিস্তানের ক্ষমতা শের আলীর কাছ থেকে তাঁর ভাই মুহম্মদ আফজালের হাতে চলে যায়। তিনি কাবুল দখল করে ১৮৬৬ থেকে ১৮৬৭ সাল অর্থাৎ এক বছর ক্ষমতাসীন থাকেন। এরপর ১৮৬৭ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত দু'বছর আফজালের ভাই মুহম্মদ আযিম আমীর থাকেন। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার এই দুই ভায়ের রাজত্বকে স্বীকার করেনি। ১৮৬৯ সালে শের আলী পুনরায় কাবুল দখল করেন। তবে তাঁর সামরিক সাফল্যের কৃতিত্ব ছিল তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবদুর রহমানের। স্যার লরেন্সের স্থলে লর্ড মেয়ো ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হলে শের আলী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ভারতে আসেন। তিনি মেয়োর সঙ্গে শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি করলে আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব কায়েম হয়। মৈত্রীর প্রতীক হিসাবে মেয়ো একটি ক্ষুদ্র গোলন্দাজ বাহিনী প্রেরণ করেন। লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২) এবং তাঁর উত্তরাধিকারী লর্ড নর্থব্রুক (১৮৭২-৭৬) স্যার লরেন্সের 'নিরপেক্ষতা নীতি' বহাল রাখেন।

ব্রিটিশ আগ্রাসন (ফরওয়ার্ড নীতি) ঃ ১৮৬৯ সালে কাবুলে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করার পর থেকে ১৮৭৯ সালে মৃত্যু পর্যন্ত আমীর শের আলী রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হন, যার ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। উল্লেখ্য যে, শের আলী দূররানী উপজাতীয়দের দুর্লভ গুণাবলীর অধিকারী হলেও তাঁর পিতা দোস্ত মুহমদের মত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা ছিল না। তিনি অতিমাত্রায় ব্রিটিশ সাহায্য সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হলেও, রর্ড মেয়ো বা নর্থব্রুক তাঁকে তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা দেননি। উপরন্তু, ১৮৭২ সালে লর্ড মেয়োর হত্যার পর আফগান-ব্রিটিশ সম্পর্কে ফাটল ধরে। প্রথম আফগান যুদ্ধের ভয়াবহ ফলাফলের কথা চিন্তা করে শের আলী ব্রিটিশ

www.pathagar.com

এজেন্টের কাবুলে অবস্থানের বিরোধী ছিলেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বেনজামিন ডিসরেলী সরকারি দলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী হলে 'নিরপেক্ষতা নীতি' বর্জিত হয় এবং ক্রমশঃ আফগানিস্তানের প্রতি আগ্রাসন বা 'ফরওয়ার্ড নীতি' গৃহীত হয়। ডিসরেলী ১৮৭৬ সালে লর্ড লিটনকে ভাইসরয় করে ভারতে পাঠান। লিটনের সঙ্গে শের আলীর সম্পর্কের উন্নতি কল্পে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বৃটিশ সরকার আগ্রহী ছিলেন কিন্তু একটি শর্ত ছিল যে হিরাতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট অবস্থান করবেন। কিন্তু শের আলী বিদেশী রেসিডেন্টের আফগানিস্তানে বসবাসের বিরোধী ছিলেন।

'ফরওয়ার্ড নীতি'র কার্যকারিতা ঃ লর্ড মেয়োর নিষ্ক্রিয় 'নিরপেক্ষ নীতি'র বিপরীতে ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানের প্রতি আগ্রাসন বা 'ফরওয়ার্ড নীতি' গ্রহণ করে। আগ্রাসন নীতি হস্তক্ষেপ নীতির সামিল ছিল। ব্রিটিশ শাসকগণ উপলব্ধি করেন যে, লর্ড মেয়ো ও লর্ড নর্থব্রুক পরিচালিত 'নিরপেক্ষতা' নীতি আফগানিস্তানে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের সম্প্রসারণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই কারণে ডিসরেলী 'ফরওয়ার্ড নীতি' প্রবর্তন ও সমর্থন করেন। এই নীতির মূলে কতকগুলো কারণ ছিল; যথা– আফগানিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট, আফগান-ব্রিটিশ সম্পর্কের ক্রমবনতি, প্রথম আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিপর্যয়, রুশ প্রভাবের সম্ভাবনা ইত্যাদি। ব্রিটিশ প্রতিনিধি না থাকায় আফগানিস্তানের প্রকৃত রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানা সম্ভব ছিল না। সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া লর্ড সলসবেরী লর্ড নর্থব্রুককে পত্র দ্বারা হিরাতে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি অবস্থানের জন্য আমীরকে চাপ সৃষ্টি করতে বলেন। কিন্তু অহেতুক বৈদেশিক চাপের ফলে অসন্তোষ সৃষ্টির সম্ভাবনা এবং ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নিরাপত্তার অজুহাতে শের আলী হিরাতে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অবস্থানের বিরোধিতা করেন। লর্ড নর্থব্রুক 'নিরপেক্ষতা নীতির' পক্ষপাতী ছিলেন এবং এর ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করে। ১৮৭৬ সালে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন লর্ড লিটন। লিটনের সঙ্গে শের আলীর সম্পর্ক ভাল ছিলনা। তিনি আফগান আমীরকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাঁর ভাষায় শের আলী ছিলেন, "বিকৃতমনা একজন বর্বর" (A savage with a touch of insanity)। যাহোক, রুশ আগ্রাসন বন্ধের জন্য এবং ব্রিটিশ-ভারতের উত্তরাঞ্চলে রুশ বাহিনীর উপস্থিতিতে বিচলিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানকে একটি অখণ্ড, সার্বভৌম এবং বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্ররূপে দেখতে আগ্রহী ছিল। ডিসরেলী আগ্রাসন (Imperialist) নীতির প্রতিফলনের জন্য লর্ড লিটন কাবুলে একটি মিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৭৮ সালে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের অবসানে বার্লিন চুক্তি হয় এবং এ বছরে রুশ সরকার আফগানিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্য জেনারেল স্টোলেটভকে কাবুলে পাঠায়। শের আলী রুশ সেনাপতির আগমনকে অপছন্দ করলেও তিনি তাঁকে গ্রহণ করেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটি চুক্তি করতে বাধ্য হন। কাবুলে রুশ প্রতিনিধির আগমনে লর্ড লিটন কাবুলে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য শের আলীকে পত্র দিয়ে চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু শের আলী ব্রিটিশ দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করেন। যদিও রুশ সরকারের নির্দেশে রুশ প্রতিনিধি প্রত্যাহার করা হয় তবুও শের আলী ব্রিটিশ অনুরোধ মেনে নেননি। লর্ড লিটন ১৮৭৮ সালের ১৭ই আগস্ট যে পত্র লিখেন শের আলী তার জবাব দিতে বিলম্ব করেন। ঐ বছর তাঁর উত্তরাধিকার

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ জান মৃত্যুবরণ করে। উল্লেখ্য যে, শের আলী একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের আমীর ছিলেন এবং এই কারণে বৈদেশিক প্রতিনিধি গ্রহণ আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বের হুমকি স্বরূপ ছিল। লিটন ক্রুদ্ধ হয়ে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করার নীতি গ্রহণ করে বলপূর্বক স্যার নেভিল চেম্বারলেনের নেতৃত্বে কাবুলের উদ্দেশ্যে একটি ব্রিটিশ মিশন পেশওয়ারে পাঠান। রুশ আগ্রাসনের আশঙ্কায় ভাইসরয় যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা 'ফরওয়ার্ড নীতি'র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য আফগানিস্তানের উপর আধিপত্য বিস্তারই ছিল 'ফরওয়ার্ড নীতির' মূল উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বে ভ্রূক্ষেপ করেনি। ব্রিটিশ সরকার লর্ড লিটনকে নির্দেশ দেয় যে, আফগানিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত করতে হবে এবং আমীর তা করতে অস্বীকার করলে আফগানিস্তানে অভিযান করে ব্রিটিশ সমর্থক শাসককে ক্ষমতা দিতে হবে। যদি তাও ব্যর্থ হয় তবে আফগানিস্তানে অভিযান করে দখল করতে হবে। ফ্রেজার টাইটলার এই নীতিকে ব্রিটিশ 'ফরওয়ার্ড নীতির' সর্বোচ্চ পর্যায় (high water-mark) বলে অভিহিত করেন।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ ঃ

কারণ ঃ কাবুলে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অবস্থানকে কেন্দ্র করে আফগানিস্তানের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয়। অপরদিকে কাবুলে রুশ জেনারেল স্টোলেটভের উপস্থিতিতে ভাইসরয় লর্ড লিটন আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন এই মনে করে যে, শের আলী রাশিয়ার হাতের পুতুলে (tool in the hands of Russia) পরিনত হতে পারেন। লর্ড লিটন ১৮৭৮ সারের ১৪ই আগস্ট শের আলীকে পত্র দিয়ে জানান যে, তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপের জন্য স্যার নেভিল চেম্বারলেনকে পাঠাচ্ছেন। শের আলী ১৭ই সেপ্টেম্বর পত্রটি পান কিন্তু ২১শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পত্রের জবাব না পেলে লিটন চেম্বারলেনকে পেশওয়ারে পাঠান। পেশওয়ার থেকে মেজর ক্যাভাগনারীর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী আফগান সীমান্তে আলী মসজিদে প্রবেশ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যদের আফগান সীমান্ত অতিক্রমের অনুমতি দেওয়া হয়নি। লিটনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তিনি কোয়েটা, খায়বার, কোরাম প্রভৃতি গিরিপথ দিয়ে সৈন্য পাঠাবার চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। ১৯শে অক্টোবর শের আলী যে সরকারি জবাব দেন তা ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। এমতাবস্থায় লিটন ব্রিটিশ সরকারের নিকট অভিযান প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। অভিযানের পূর্বে নভেম্বর মাসে ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার শের আলীর নিকট চরমপত্র (ultimatum) দেয় এবং ব্রিটিশ রেসিডেন্টের উপস্থিতি দাবী করে। কোন জবাব না পাওয়ায় ২১শে নভেম্বর ব্রিটিশ বাহিনী বলপূর্বক আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। এর ফলেই দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সূচনা হয়।

যুদ্ধের গতি ঃ ব্রিটিশ বাহিনীর বলপূর্বক আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশে বিচলিত হয়ে শের আলী রুশ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কাবুলে রুশ প্রতিনিধির উপস্থিতি রুশ-ব্রিটেন সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। রুশ সেনাপতি জেনারেল কাউফম্যান হিন্দুকুশ পর্বতমালার মধ্য দিয়ে শীতকালে সৈন্য পাঠাবার অসুবিধার কথা উল্লেখ করে শের আলীর আহবানে সাড়া দেন না। শের আলী আফগানিস্তানের সঙ্গে রুশ প্রতিনিধি স্টোলেটভের সঙ্গে সম্পাদিত মৈত্রীচুক্তির উল্লেখ করে রুশ সাহায্যের পুনরায় আহবান জানান।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম সঙ্কটজনক মনে করে এবং ব্রিটিশ আগ্রাসন নীতিতে শঙ্কিত হয়ে শের আলী কাবুল ত্যাগ করে রুশ সরকারের সঙ্গে আলাপের জন্য সেন্ট পিটার্সবার্গ গমনের মনস্থ করলেন। কিন্তু তাঁকে এই সফর থেকে বিরত রাখা হয় এবং তিনি মাজার-ই-শরিফে প্রত্যাবর্তন করে ১৮৭৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রাণত্যাগ করেন। কাবুল ত্যাগের পূর্বে তিনি রাজ্যের শাসন ক্ষমতা তাঁর পুত্র ইয়াকুব খানের উপর অর্পণ করেন। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটিশ বাহিনীর "খায়বার কলাম" জালালাবাদ দখল করে; কুরাম বাহিনী অতি সহজে দুর্ভেদ্য পৈয়ার কোটাল (Peiwar Kotal) দখল করে। অন্যদিকে দক্ষিণ বাহিনী কান্দাহারে প্রবেশ করে। আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সামরিক অভিযান অতি অল্প সময়ে সাফল্য অর্জন করে এবং আপাতঃদৃশ্যে কোন জাতীয় প্রতিরোধ ছাড়াই আফগানিস্তানের বিশাল অংশ ব্রিটিশদের হস্তগত হয়।

গান্দমাক চুক্তি (Treaty of Gandmak) ঃ ব্রিটিশ সামরিক সাফল্যের ফলশ্রুতিতে ইয়াকুব খান ১৮৭৯ সালের মে মাসে ব্রিটিশদের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। 'গান্দমাক' চুক্তি নামে পরিচিত এই সন্ধির শর্তানুযায়ী ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানকে সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবে, আমীর প্রতি বছর ৬০,০০০ পাউন্ড লাভ করবেন, খায়বার গিরিপথ ভারতীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকবে; আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে নির্ধারিত হবে; কাবুলে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি অবস্থান করবে। এই চুক্তি সম্পাদিত হলে ব্রিটিশ বাহিনী আফগানিস্থান থেকে প্রত্যাহার করা হয়। ক্যাভাগনারী প্রথম ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলেন। ইয়াকুব খানের নতজানু পররাষ্ট্র নীতি এবং অকর্মণ্যতার ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম আফগানিস্তান বিদেশী প্রভাবাধীন হল, যা তাঁর পিতা ও পিতামহ রোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। মূলতঃ ইয়াকুব খান রুশ-ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তারে 'একটি দাবার গুটি'র (pawn) মত ছিলেন এবং রাশিয়ার নিষ্ক্রিয়তা ও সিদ্ধান্তহীনতার ফলে ইয়াকুব খান ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপে প্রতিবাদ করতে পারেননি। পি. ই. রবার্টস গান্দমাকের চুক্তিকে লিটনের আফগান নীতির চূড়ান্ত সফলতা বলে মনে করেন। ডিসরেলীর মতে, "এই চুক্তি ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারকে একটি বিজ্ঞানসম্মত ও পর্যাপ্ত (scientific and adequate frontier) সীমান্ত প্রদান করে।"

প্রতিক্রিয়া ঃ ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসে ক্যাভাগনারী ব্রিটিশ মিশনের প্রধান হয়ে কাবুলে আগমন করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা আফগান জনগণ ও সেনাবাহিনী কাবুল ও হিরাতে বিদেশীদের অবস্থানকে সুনজরে দেখেনি। ইতোপূর্বে সেখানে ব্রিটিশ দূত বার্নস নিহত হন। কয়েক মাসের মধ্যেই বালাহিসরে অবস্থিত ব্রিটিশ মিশনের দফতর অগ্নিদগ্ধ হয় এবং ক্যাভাগনারীসহ বহু মিশন সদস্য প্রাণ হারায়। এই ঘটনার পর গান্দমাকের চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আফগানিস্তানে দ্বিতীয় ব্রিটিশ অভিযান বিপর্যস্ত হয়। এই হত্যাকান্ডে আমীর ইয়াকুব খানের কতটুকু হাত ছিল তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, এই ঘটনা ছিল বিদেশীদের প্রতি স্বাধীনচেতা আফগানদের ঘৃণার প্রতীক। কাবুলে ব্রিটিশ প্রতিনিধির হত্যায় ব্রিটিশ সরকার খোলাখুলিভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে তিনটি পৃথক বাহিনী জালালাবাদ, কান্দাহার এবং কাবুলের দিকে প্রেরণ করে। রবার্টসের নেতৃত্বে কাবুলের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ব্রিটিশ বাহিনী ১৮৭৯ সালের ১২ই অক্টোবর চারাসিয়ায়

www.pathagar.com

(Charasiah) আফগান বাহিনীর মোকাবেলা করে তাদের বিধ্বস্ত করে। ব্রিটিশ বাহিনী বালাহিসর দখল করে। ব্রিটিশ বাহিনীর সাফল্যে আমীর ইয়াকুব খান সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং তাঁর পরিবারসহ তাঁকে কলকাতায় নির্বাসিত করা হয়। ইয়াকুব খানের ভাগ্য বিপর্যয়ে আফগানিস্তান ব্রিটিশদের করায়ত্ত হল। রবার্টস কাবুলে স্বীয় প্রশাসনিক দফতর স্থাপন করেন। রাজকোষ নিয়ন্ত্রণসহ আদালত প্রতিষ্ঠা করে ক্যাভাগনারীর হত্যাকারীদের বিচার শুরু করেন। কিন্তু কাবুল বিদেশীদের হস্তগত হওয়ায় আফগানবাসী মোটেই সন্তুষ্ট ছিলনা এবং তাদের মধ্যে অসন্তোষের দাবানল জ্বলতে থাকে। আফগানগণ রবার্টসের বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং রবার্টস অল্পের জন্য বেঁচে যান। যাহোক, ডিসেম্বরের মধ্যে সকল প্রতিরোধ নির্মূল করা হয় এবং পেশওয়ার ও কাবুলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কান্দাহরেও ব্রিটিশ আগ্রাসন নীতির প্রতিফলন দেখা যায়। আফগান বিরোধীতায় বিচলিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড (disintegration) করার নীতি অবলম্বন করেন। ফ্রেজার টাইটলারের মতে, "ভাইসরয়ের উগ্র চিন্তাভাবনা ফরওয়ার্ড নীতির যথার্থ ফলশ্রুতি" ("the uppermost thought in the Viceroy's mind was the logical conclusion of the forward policy")। যাহোক, আফগানিস্তানকে ব্রিটিশ সরকার একটি মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (buffer state) হিসেবে গণ্য করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের অনুকূলে দোস্ত মুহম্মদের পৌত্র মোহাম্মদ আফজালের পুত্র আবদুল রহমানকে আফগানিস্তানের আমীর হিসেবে ১৮৮০ সালে কাবুলের সিংহাসনে বসায়।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সমালোচনা ঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ স্বাধীন ও সার্বভৌম আফগানিস্তানের প্রতি প্রচণ্ড হুমকীস্বরূপ ছিল এবং পরিশেষে এই যুদ্ধ ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে; আমীর শের আলী এবং তাঁর পুত্র ইয়াকুবের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে; স্বাধীনচেতা আফগানদের সম্মান, সম্ভ্রম ও মর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত আসে। এতদসত্ত্বেও ব্রিটিশ অনুসৃত 'ফরওয়ার্ড নীতি' কার্যকারিতা সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচণ্ড সমালোচনা হয়। মূলতঃ লর্ড লিটনের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, সামরিক ও কূটনৈতিক বিফলতা প্রথম পর্যায়ে ব্রিটিশদের বিপর্যয় ডেকে আনে। রুশ ভীতি লিটনকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, তিনি বলপূর্বক ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার নেভিলকে পাঠাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ ছাড়া জেনারেল কাভিগনাকের কাবুলে উপস্থিতি আফগানদের আত্মসম্মানে আঘাত হানে এবং তাঁর নৃশংস হত্যা ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতি ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত হয়। এই সমস্ত বিপর্যয়ের জন্য লর্ড লিটনকে দায়ী করা হয় এবং তাঁর আফগান নীতি ব্যর্থতার দরুণ তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়। গান্দামাকের চুক্তি লিটনের রাজনৈতিক সাফল্য হলেও এর কার্যকারিতা ছিল ক্ষণস্থায়ী। কারণ, ক্যাভিগনাকের হত্যার পর এই চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। ডিসরেলী এবং সলসবেরী লর্ড লিটনের আফগান নীতি সমর্থন করলেও তাঁর হঠকারিতা ও উগ্র আক্রমণ (ফরওয়ার্ড) নীতির তীব্র সমালোচনা করেন বাকপটু গ্লাডস্টোন। যাহোক, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে আফগানিস্তান ব্রিটিশ প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়; আমীর আবদুর রহমান ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করলেন, কাবুলে রুশ প্রভাব সাময়িকভাবে নিরসন করা হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

আমীর আবদুর রহমানের রাজত্বকাল

আবদুর রহমানের ক্ষমতালাভ ঃ আবদুর রহমান ছিলেন দোস্ত মুহম্মদের পৌত্র ও আমির মুহম্মদ আফজালের পুত্র। আফগানিস্তানের ইতিহাসে আমির আবদুর রহমানের ক্ষমতালাভ ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আমীর শের আলীর নির্বাসনে তদীয় ভ্রাতা মুহম্মদ আফজাল খান (১৮৬৬-৬৭) আমির নির্বাচিত হলেও তাঁর ভাই শের আলী ১৮৬৯ সালে দ্বিতীয়বারের মত কাবুলের সিংহাসন দখল করেন। মুহম্মদ আফজাল খানের সুযোগ্য পুত্র আবদুর রহমান সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু শের আলীর ক্ষমতা পুনর্দখলের ফলে আবদুর রহমান রাশিয়ায় আত্মগোপন করেন। রুশ সরকার তাঁকে ভাতা প্রদান করে। শের আলীর পুত্র ইয়াকুব খানের ভাগ্য বিপর্যয়ে আবদুর রহমান ১৮৮০ সালে স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষার জন্য রাশিয়া থেকে হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে কুহ-ই-দামান উপত্যাকায় আগমন করেন। কাবুল থেকে চল্লিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত কুহ-ই-দামানে আফগান 'জিরগা' বা উপজাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক আমির নির্বাচিত হন।

বৈদেশিক নীতি

ব্রিটিশ-আফগান সম্পর্ক ঃ লর্ড লিটনের আফগান নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রতি বিরূপভাবাপন্ন হয় এবং ইংল্যান্ডে সরকার পরিবর্তনের ফলে লিটনের ভাইসরয়ের পদ বাতিল হয়ে যায়। লিটন আবদুর রহমানকে নতুন আমীর হিসেবে স্বীকৃতি দানের পূর্বেই তাকে প্রত্যাহার করে লর্ড রিপনকে ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, লিটনের 'ফরওয়ার্ড নীতির' ব্যর্থতায় এবং রুশ আগ্রাসন নিরসনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ স্বার্থের সমর্থনকারী একজন ব্যক্তির সন্ধানে ছিলেন। ব্রিটিশদের বন্ধুভাবাপন্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে আবদুর রহমানকে আমীরের মর্যাদা দেওয়া হয় কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে। আবদুর রহমান সম্বন্ধে গ্রিফিন বলেন যে, "তিনি ১৮৮০ সালে একজন চল্লিশ বছর বয়স্ক বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী এবং সদাচারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সকল বারাখজাই সর্দারদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী ছিলেন।" গ্রিফিন যখন ১৮৮০ সালের ৪ঠা আগস্ট আবদুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন তখন মনোভাব ব্রিটিশদের অনুকূলে ছিল বলে উল্লেখ করেন। আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সম্পর্ক মধুর ছিল এবং এই দুটি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মধ্যে যে শর্তাবলীর ভিত্তিতে মিত্রতা স্থাপিত হয় তা হচ্ছে–

www.pathagar.com

১. ব্রিটিশ সরকার আবদুর রহমানকে আফগানিস্তানের কান্দাহার ছাড়া সমগ্র অঞ্চল হস্তান্তর করবে।
২. ব্রিটিশ সরকার কাবুল থেকে তার রেসিডেন্টকে প্রত্যাহার করবে।
৩. শের আলীর দ্বিতীয় পুত্র আয়য়ুব খানের দখলে হিরাত নগরী আবুদর রহমানকে হস্তান্তর করতে হবে।
৪. ইংল্যান্ড ব্যতীত আফগানিস্তান অপর কোন বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে মিত্রতা বা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।
৫. আফগানিস্তান যদি ব্রিটিশ অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতি পালন করে তবে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ব্রিটেন সাহায্য করবে।
৬. আফগানিস্তান একটি মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (buffer state) হিসেবে পরিগণিত হবে।
৭. আবদুর রহমান ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত বার্ষিক ভাতা লাভ করবেন।

পট পরিবর্তন ঃ ১৮৮০ সালের ব্রিটিশ ও আফগান রাজনৈতিক পট দ্রুত পরিবর্তনের মূলে কতিপয় কারণ ছিল; ব্রিটেনে ১৮৮০ সালের ২৮শে এপ্রিল সরকার পরিবর্তিত হলে ডিসরেলীর স্থলে গ্লাডস্টোন প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং ডিসরেলী ও সলসবেরী অনুসৃত ব্রিটিশ 'ফরওয়ার্ড নীতি'র ঘোর বিরোধ গ্লাডস্টোন আফগানিস্তানে নিরপেক্ষ ও অহেতুক হস্তেক্ষেপ নীতি (interference) বর্জন করেন। ভাইসরয় হিসেবে লর্ড লিটনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন লর্ড রিপন। 'ফরওয়ার্ড নীতি' বর্জিত হলে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ থেকে ব্রিটিশ সরকার বিরত থাকে।

অপরদিকে আমীর আবদুর রহমান ব্রিটেন কর্তৃক প্রদত্ত সকল শর্ত মেনে নিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। কারণ, আফগানিস্তান তখন বিদেশীদের দখলে ছিল এবং ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। উপরন্তু, তিনি সহজেই উপলব্ধী করেন যে, ব্রিটিশ সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া ক্রমবর্ধমান রুশ আগ্রাসনের হুমকীর মোকাবেলা করতে পারবেন না। অন্যদিকে আপাতঃদৃশ্যে তিনি ব্রিটিশ সমর্থন লাভ করলেও তিনি কখনই ব্রিটিশ কর্তৃত্ব আফগানিস্তানে স্থায়ী হোক এটি চাননি। তিনি গোপনে দক্ষিণাঞ্চলে ভ্রমণ করে আফগানদের সমর্থন লাভের যেমন প্রয়াস পান, অন্যদিকে নম্র ভাষায় ব্রিটিশ প্রতিনিধির সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। উল্লেখ্য যে, ক্ষমতালাভের বার দিনের মধ্যে কাবুল থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। খায়বার গিরিপথ ও কারাকোরাম উপত্যাকা ভারতীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দখলে থাকে।

কাবুল ও কান্দাহার ত্যাগ ঃ আমীর আবদুর রহমান একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে সন্তুষ্ট করে আফগানিস্তানের স্বার্থ বজায়ের নীতি অবলম্বন করেন। ১৮৮০ সালের জুলাই মাসে তিনি আমীর নির্বাচিত হওয়ার ১২ দিনের মধ্যে কাবুল থেকে ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করা হলেও কান্দাহারে ব্রিটিশ বাহিনীর

www.pathagar.com

উপস্থিতি আফগানদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, লর্ড লিটনের 'ফরওয়ার্ড নীতি'র প্রেক্ষিতে আফগানিস্তানকে তিনটি অংশে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়। যেমন-হিরাত ও সিসতান পারস্যকে অর্পন করা, কান্দাহারকে সদোজাই গোত্রের কর্তৃত্বাধীনে রেখে পৃথক রাষ্ট্র গঠন এবং কাবুলসহ অপর অংশ ব্রিটিশ অধিকারে রাখা। কিন্তু লিটনকে প্রত্যাহার করা হলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। পারস্য হিরাত দখল করতে পারেনি এবং যখন আবদুর রহমান আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন শের আলীর দ্বিতীয় পুত্র আয়য়ুব খান হিরাত থেকে কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হয়ে আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ব্রিটিশ বাহিনী জেনারেল বারোজের নেতৃত্বে মায়ওয়ান্দের যুদ্ধে আয়য়ুব খানকে পরাস্ত করে। পরবর্তী পর্যায়ে জেনারেল রবার্টস এক বাহিনী নিয়ে কান্দাহারে প্রবেশ করলে ব্রিটিশ অবস্থান সুদৃঢ় হয়। আবদুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব সুদৃঢ় করার জন্য কাবুল, কান্দাহার ও হিরাতে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। কাবুল থেকে লর্ড রিপনের নির্দেশে ব্রিটিশ বাহিনী অপসারিত হয়। অনুরূপভাবে হিরাতে আবদুর রহমান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠান করেন। মায়ওয়ান্দের যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার কান্দাহারে ব্রিটিশ বাহিনী রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয় এবং ১৮৮১ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে কান্দাহার থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। অবশ্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ খায়বার গিরিপথ, কোরাম মালভূমি, পিসন এবং কোয়েটার সীমান্ত পথ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (buffer state) ঃ ফ্রেজার-টাইটলার আফগানিস্তান থেকে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর প্রত্যাহারে বিশেষভাবে আশঙ্কিত হয়ে বলেন যে, উত্তরাঞ্চলে রুশ আগ্রাসন এবং রাশিয়ায় বার বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করে আবদুর রহমানের সম্ভাব্য রুশ প্রীতির প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ বাহিনীর কাবুল, কান্দাহার ও হিরাত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করে না এবং এ ধরনের উদার কূটনৈতিক দৃষ্টান্ত 'নেতিবাচক রাজনীতির পরিচায়ক' ('a typical piece of liberal statesmanship')। লর্ড রিপনের শাসনামলে 'ফরওয়ার্ড নীতি'র বর্জিত হয় এবং আফগানিস্তান বিদেশী সৈন্যদের অবস্থান থেকে মুক্তি পায়। অপরদিকে, উত্তরাঞ্চলে রুশ সাম্রাজ্য, পশ্চিমে বিশাল পারস্য (কাযার) সাম্রাজ্য এবং পূর্বাঞ্চলে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত আফগানিস্তান একটি মধ্যবর্তী রাষ্ট্র বা buffer state-এ রূপান্তরিত হয়। ১৮৮১ সালে এই অঞ্চল মধ্যবর্তী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে এবং দীর্ঘ চল্লিশ বছর (১৯২১ সাল পর্যন্ত) ব্রিটিশ-আফগানিস্তানের মধ্যে এই মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। মহাজন বলেন যে, "আব্দুর রহমানের রাজত্বকালে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আফগানিস্তানের সুসম্পর্ক বজায় থাকে।"

মার্ভ দখল এবং পানজদে (Panjdeh) ঘটনা ঃ আফগানিস্তানের ব্রিটিশ বাহিনীর তৎপরতায় আশঙ্কিত হয়ে রাশিয়া আখাল মরুদ্যানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং রুশ সম্রাট সমগ্র মধ্য-এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করার প্রয়াস পান। তাদের রাজ্যের সীমান্ত সুদৃঢ় করার জন্য রুশ বাহিনী আকস্মিকভাবে ১৮৮৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি মার্ভ

www.pathagar.com

দখল করে। রুশ আগ্রাসনে শঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। মার্ভ দখলের ফলে দু'টি বৃহৎ শক্তি মুখামুখি সংঘর্ষের পর্যায়ে এসে পড়ে। আবদুর রহমান এই রাজনৈতিক সঙ্কটের মোকাবেলা করেন এবং রুশ আগ্রাসন নিরসনের জন্য কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাশিয়া তার সীমান্ত মার্ভ থেকে হিরাতের নিকটবর্তী অঞ্চলে স্থাপনের প্রচেষ্টা করে এবং তুর্কমান ও পানজদের সাবিকদের উপর প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস পেলে ব্রিটিশ সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে। মার্ভের উপর রুশ হামলায় আমির উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লে ব্রিটিশ সরকার রুশ সরকারের সাথে কমিশনারদের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব দেয়। ১৮৮৪ সালের শরৎকালে স্যার পিটার লামসডেনকে প্রতিনিধি হিসেবে মার্ভে পাঠান হয় কিন্তু রুশ প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে আলোচনা বানচাল হয়ে যায়। এতে রুশ আগ্রাসন নীতি প্রতিফলিত হয় এবং রুশ বাহিনী হরীরুদ নদীর পূর্ব প্রান্তে উপস্থিত হয়। ক্রমশ রুশ সীমান্তরক্ষীরা মার্ভের দক্ষিণ দিকে বাদগীজ প্রদেশে প্রবেশ করে। লামসডেন আফগান বাহিনীকে অভিযান না করে সংযম অবলম্বনের পরামর্শ দেন এবং আপোষে সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করেন। বলাই বাহুল্য, হিরাতের অন্তর্গত বাদগীজ আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বহু যুগ ধরে সাবিক তুর্কীগণ আফগানিস্তানের শাসককে নজরানা দিয়ে আসছিল। যাহোক, একথা নিশ্চিত যে, পানজদে দখল করে রুশ সরকার আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানে। ১৮৮৪ সালের নভেম্বরে রুশ বাহিনী আগটোপেতে উপস্থিত হলে ব্রিটিশ সরকার আমীর আবদুর রহমানের সমর্থনে রুশ সরকারের নিকট চরমপত্র দেয় এই মর্মে যে, রুশ বাহিনী পানজদে অধিকার করলে তা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণার সামিল হবে। ১৮৮৫ সালের ৩০শে মার্চ রুশ বাহিনী আফগান বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়; অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অদক্ষ আফগান বাহিনী রুশ বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে মুরুচাকে আশ্রয় নেয় এবং রুশ বাহিনী পানজদের মরুদ্যান দখল করে। রুশ বাহিনী আফগান সীমান্তের পঁচিশ মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। রুশ-আফগান সংঘর্ষে দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। আফগানিস্তানে রুশ আক্রমণকে গ্লাডস্টোন অনভিপ্রেত আগ্রাসন (unprovoked aggression) বলেছেন। যাহোক, ভাইসরয় লর্ড ডাফরীনের মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়নি। এ যুদ্ধে আবদুর রহমান সংযমের পরিচয় দেন। রাশিয়া পানজদে দখলে রাখে এবং আফগানিস্তানকে সুল রাকীফ গিরিপথ দেওয়া হয়। ১৮৮৭ সালে রাশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।

অভ্যন্তরীণ নীতি ঃ

ডুরান্ড লাইন ঃ পানজদের ঘটনার পর আমীর আবদুর রহমান আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে উপজাতীয়দের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। পূর্বাঞ্চলে সিরওয়ানীগণ এবং উত্তরাঞ্চলের হাজারাগণ কাবুলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। এ ছাড়া গীলজাই গোত্রও বিদ্রোহ করে। এই সমস্ত বিদ্রোহ বিচক্ষণতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আবদুর রহমান নির্মূল করেন। শাসক হিসেবে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেন, কূটনীতিতেও অনুরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। আফগানিস্তানকে মধ্যবর্তী রাষ্ট্র বা buffer state হিসেবে সৃষ্টি করে

তিনি একদিকে যেমন বৈদেশিক আক্রমণ ও আগ্রাসন রোধে সফলকাম হন অন্যদিকে সমগ্র দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি এককভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির বাস্তবায়নে সফলকাম হন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তাঁর রাজত্বে ১৮৯৩ সালে আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সীমান্ত রেখা নির্ধারিত হয়, যা 'ডুরান্ড লাইন' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, উত্তরে পামির থেকে পারস্য মরুভূমি পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে দীর্ঘ ১২০০ মাইল সীমারেখা অনির্ধারিত ছিল। এই দীর্ঘ এলাকায় আবদুর রহমান তাঁর উপজাতীয়দের মধ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে শক্তিশালী ব্রিটিশ ভারতের অবস্থিতিতে তিনি কিছুটা শঙ্কিত ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বোলান গিরিপথ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে আবদুর রহমান আশঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং ওয়াজিরিস্তান, দিব ও রাজাউরের উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ১৮৯৩ সালে স্যার মার্টিমার ডুরান্ডকে আফগানিস্তানে পাঠান হয়। ডুরান্ড এবং আবদুর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক স্থির হয় যে,

১. উভয় দেশের কমিশনারদের মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিত হবে।
২. আবদুর রহমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিরত্রিল, সওয়াত, রাজাউর অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করবেন না।
৩. ডুরান্ড লাইন আফগানিস্তানের পূর্ব এবং দক্ষিণ সীমান্ত নির্ধারিত করবে।
৪. উভয় পক্ষ ডুরান্ড কর্তৃক চিহ্নিত লাইনকে আন্তর্জাতিক সীমারেখা হিসেবে গণ্য করবেন।
৫. আমির কর্তৃক অস্ত্র ক্রয়ে ব্রিটিশ সরকার বাধা দিবে না।
৬. আমিরের বার্ষিক ভাতা ১২ লক্ষ থেকে বর্ধিত করে ১৮ লক্ষ করা হয়।

সমালোচনা ঃ ডুরান্ড লাইন আপাতঃদৃষ্টিতে ব্রিটিশ-ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ নিরসন করলেও এর প্রতিক্রিয়া ছিল মারাত্মক। সমালোচকদের মতে, ডুরান্ড লাইন ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিচার বিবেচনার উর্ধ্বে একটি ভৌগোলিক সীমারেখা মাত্র। ফ্রেজার-টাইটলার স্পষ্টতঃ বলেন যে, "নৃতাত্ত্বিক, কূটনৈতিক, এমন কি ভৌগোলিক দিক থেকে এই লাইন ছিল নিরর্থক। (It is illogical from the point of view of ethnography, of strategy and of geography)। এই লাইন সিন্ধু উপত্যকাকে এমনভাবে বিভক্ত করে যেন একটি জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। উপরন্তু, এই লাইনের উভয় পার্শ্বে এক উপজাতীয় জনপদ বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে চুক্তিতে হস্তক্ষেপ নীতির যে শর্ত ছিল তা পালিত হয়নি। 'জিরগা' বা উপজাতীয় কাউন্সিলের সদস্যগণ ডুরান্ড লাইনের উভয় পার্শ্বে অবস্থান করতে থাকেন। ডুরান্ড লাইনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, এই সীমান্ত ব্যবস্থা আফগানিস্তানের সঙ্গে ব্রিটিশ-ভারতের শান্তিপূর্ব সহঅবস্থানে সহায়ক ছিল।

www.pathagar.com

আবদুর রহমানের কৃতিত্ব বিচার ঃ ১৮৮৩ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত আবদুর রহমান আফগানিস্তানের আমীর হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র হাবিবুল্লাহ আমীর নির্বাচন হন। স্যার মর্টিমার ডুরান্ড এবং লর্ড কার্জন আবদুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এই মহান আফগানের চারিত্রিক গুণাবলী সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। কার্জনের ভাষায়, "আবদুর রহমান ছিলেন একজন করিৎকর্মা এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক, যিনি একাধারে খুবই নম্র, ভদ্র, সভ্য হতে পারেন, আবার অপর দিকে বর্বর এবং নিষ্ঠুরও হতে পারেন।" তিনি বিচক্ষণ ছিলেন এবং কঠোর হস্তে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সরকারের দফতরসমূহ কেন্দ্রীয়করণ করে তিনি প্রশাসনিক কাঠোমোতে আমূল পরিবর্তন সাধিত করেন। তিনি কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করেন এবং সমগ্র দেশের গুপ্তচর প্রথা প্রবর্তিত করে গোপনে বিদ্রোহের খবরাখবর রাখেন। বিদ্রোহীদের তিনি নিশৃংসভাবে হত্যা করতেন। দস্যুদের খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখতেন এবং পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দিতেন। অসৎ ব্যবসায়ীদের তাদের দোকানের দরজায় আবদ্ধ করে রাখতেন। ফ্রেজার-টাইটলার বলেন, "এরূপ উৎপীড়নমূলক আইন ছাড়া একটি উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে সুসংবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। তিনি রাজস্ব বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ইউরোপীয় প্রকৌশলী নিযুক্ত করে বিভিন্ন কলকারখানা নির্মাণ এবং জলসেচের ব্যবস্থা করেন। তিনি যাতায়াতের সুবন্দোবস্তের জন্য সড়ক নির্মাণ করেন এবং রাহাজানি ও লুটতরাজ বন্ধের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা স্থাপন করেন। বলাই বাহুল্য যে তিনি আফগানিস্তানকে একটি সুসংবদ্ধ ও একতাবদ্ধ জাতিতে রূপান্তরিত করেন, যা পূর্বে তাঁর পিতামহ দোস্ত মুহম্মদের রাজত্বে ছিল না। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ হাবিবুল্লাহ ও আমানুল্লাহ আফগানিস্তানকে একটি আদর্শস্থানীয় ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস পান।"

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আমীর আমানুল্লাহ্ ও তাঁর সংস্কারসমূহ

আমানুল্লাহর ক্ষমতালাভ ঃ ১৯১৯ সালে আমীর হাবিবুল্লাহ লাগমান জেলার কালা-ই-গুসে ক্যাম্পে অবস্থানকালে আততায়ীর হস্তে নিহত হলে তাঁর তৃতীয় পুত্র আমানুল্লাহ কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। হাবিবুল্লাহ হত্যার অন্তরালে কাদের ষড়যন্ত্র ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় যে, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালান হয়। আমীর হাবিবুল্লাহই প্রথম মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম আফগানিস্তানে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবর্তনের প্রয়াস পান। তাঁর রাজত্বকালেই পশ্চাত্যের স্বাধীকার ও গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করে, যা তাঁর রক্ষণশীল ও সংস্কারবিরোধী জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। সুতরাং গণঅসন্তোষও যে তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। আমির হাবিবুল্লাহর মৃত্যুর সময় তাঁর ভাই নসরুল্লাহ্ জালালাবাদে অবস্থান করছিলেন এবং আমীরের মৃত্যুর পর তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন। নসরুল্লাহ তাঁর উত্তরাধিকারের প্রচেষ্টায় হাবিবুল্লাহর দুই পুত্রের সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু অপর পুত্র আমানুল্লাহ্ চাচার এককভাবে ক্ষমতা দখলে বিরোধিতা করেন। আমানুল্লাহ্ রাজধানী কাবুলে অবস্থান করায় সেনাবাহিনী ও অস্ত্রগারের উপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। ফলশ্রুতিতে, নসরুল্লাহ্ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আমানুল্লাহ্কে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। বুদ্ধিদীপ্ত, উচ্চাভিলাষী, তেজস্বী ও জনপ্রিয় নেতা হিসেবে আমানুল্লাহ্ খ্যাতি অর্জন করেন এবং হাবিবুল্লাহ্ মৃত্যুতে যে রাজনৈতিক শূন্যতা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয় তা রোধ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

রাষ্ট্র নীতি ঃ ১৯১৯ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে ভার্সাই চুক্তির সম্পাদিত হয় তখন আমানুল্লাহ্ আফগানিস্তানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতালাভ করে তিনি বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগে তাঁর চাচাকে বন্দী করেন। ধর্মভীরু ও ধর্মপ্রাণ নসরুল্লাহর কারাবরণে সাধারণ আফগানবাসী ও ধর্মীয় গোষ্ঠী আমানুল্লাহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এছাড়া আফগানিস্তানের প্রভাবশালী মুসাহিবান পরিবারের সদস্যদের মুক্তি দিলে সামরিক বাহিনী অসন্তোষ প্রকাশ করে। এই রাজনৈতিক সঙ্কট কাটাবার জন্য আমানুল্লাহ্ দুটি পন্থা অবলম্বন করলেন। প্রথমটি হচ্ছে, যুদ্ধপ্রিয় আফগান উপজাতিদের সন্তুষ্ট করার জন্য এবং যুদ্ধে লিপ্ত রাখার জন্য পার্শ্ববর্তী ভারতীয় ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে যুদ্ধে লিপ্ত হননি, যা তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার (political astuteness) পরিচায়ক। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ধর্মভীরু ও রক্ষনশীল আফগানদের খুশী করার জন্য অমুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানান। সেই সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ধনসম্পদের ('মাল-ই-গনীমত') প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথাও

www.pathagar.com

ফলাও করে বলেন। এ প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, আমানুল্লাহ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁর পূর্বপুরুষ দোস্ত মুহম্মদ অথবা পিতামহ আবদুর রহমানের মত নতজানু পররাষ্ট্র নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না।

আফগান-ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সংঘর্ষ ঃ স্বাধীনচেতা ও জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ আমানুল্লাহ ব্রিটিশ 'ফরওয়ার্ড নীতির' ঘোর বিরোধীই ছিলেন না; বরং নিরপেক্ষতা ও অহেতুক হস্তক্ষেপ নীতিকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি আফগানিস্তানকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান এবং এই উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার জন্য বিদেশী প্রভাব ও বিদেশীদের অবস্থানের মূলে কুঠারাঘাত করেন। সিংহাসনে আরোহণের পরেই পূর্ব সীমান্তের খায়বার গিরিপথ, যা পূর্ববর্তী চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে ছিল, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বে ও সংঘর্ষের লক্ষ্যবস্তু (bone of contention) হয়ে দাঁড়ায়। আমানুল্লাহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতের নাজুক অবস্থায় কথা বিবেচনা করে পেশওয়ার দখলের জন্য গোলাম হায়দার নামের একজন আফগান এজেন্টের মাধ্যমে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ বিরোধী ভারতীয় বিপ্লবী কমিটির সাহায্যে গোলাম হায়দার ৭০০০ সন্ত্রাসীসহ সেনানিবাস ও বেসামরিক নিবাস ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এ ধরনের বিদ্রোহ বিক্ষোভের সংবাদ পূর্বাহ্নে লাভ করে পেশওয়ারের ব্রিটিশ কমিশনার স্যার কেপেল শহরের ফটক বন্ধ করে দেন। ফলে বিদ্রোহ কার্যকরী না হওয়ায় দোস্ত মুহম্মদ এবং আবদুর রহমানের মত তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। আফগান বাহিনী লান্ডি কোটালে আক্রমণ পরিচালনা করে ব্যর্থ হয়। এ ছাড়া আফগানিস্তোনের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিক্ষোভ অব্যহত থাকে। সীমান্তবর্তী এলাকায় অরাজকতা দূরীকরণের জন্য আমানুল্লাহ ব্রিটিশ সরকারের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি (armistice) সম্পাদন করেন। ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র ছিল আফগানিস্তানকে একটি মধ্যবর্তী রাষ্ট্রে (buffer state) পরিণত করা এবং চার বছর ব্যাপী আফগান-ব্রিটিশ যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। ব্রিটিশ ও আফগানদের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তৃতীয় আফগান যুদ্ধ আমানুল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত হয়। আমানুল্লাহর প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল আফগানিস্তানকে ব্রিটিশ প্রভাব থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিনত করা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার তেজদীপ্ত, স্বাধীনচেতা ও তরুণ আফগান নেতা আমীর আমানুল্লাহকে আফগানিস্তানের স্বাধীন শাসক হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৯ সালে সম্পাদিত রাওয়ালপিন্ডি চুক্তির মাধ্যমে। এই চুক্তিতে ব্রিটিশ সরকার রাওয়ালপিন্ডিতে আগত আফগান প্রতিনিধিদলকে জানিয়ে দেয় যে, আফগানিস্তান ব্রিটিশ সরকারের উপর পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে মুখাপেক্ষী হবে না; বরং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং স্বাধীনভাবে কার্যবিধি নিরূপণ করবে। ফ্রেজার-টাইটলার বলেন যে, "১৯১৯ সালের ইঙ্গ-আফগান রাওয়ালপিন্ডি চুক্তি একটি স্থায়ী চুক্তি ছিল না বরং উভয় দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক নিরূপণের ইঙ্গিতবহ নির্দেশিকা ছিল মাত্র।" স্যার হেনরী ডবের নেতৃত্বে কাবুলে ১৯২১ সালে আগত ডেলিগেশন ১৯১৯ সালে সম্পাদিত রাওয়ালপিন্ডি চুক্তির প্রকৃত বাস্তবায়ন এবং স্থায়ীকরণ (ratification) করে।

www.pathagar.com

আমানুল্লাহর কূটনীতি ঃ এই আমীর আমানুল্লাহ রাজা আমানুল্লাহ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ব্রিটিশ নৃপতি পঞ্চম জর্জ তাঁকে His Majesty বা 'মহামহিমান্বিত' বলে আখ্যায়িত করেন। এর মূল কারণ এই যে, তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত ভাতা বর্জন করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে আফগানিস্তানকে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মত একটি স্বাধীন, প্রগতিশীল, নিরপেক্ষ এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিনত করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আমানুল্লাহ প্রমাণ করেন যে, তিনি হিন্দুকুশ অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি। দোস্ত মুহম্মদ ও আবদুর রহমানের নতজানু ও পরনির্ভরশীল কূটনীতি বর্জন করে প্রমাণ করেন যে, তিনি মধ্য-এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক। তিনি পায়েন্দা খানের বংশধর হিসেবে স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি জনমঙ্গলকর কার্যে পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং দেশ প্রেমিক হিসেবে আফগানিস্তানকে আধুনিক বিশ্বের একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেন। তিনি কথায় ও কাজে খুব পরিমিতি পালন করতেন এবং শাসনকার্যে দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেন। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি প্রথমবারের মত বিদেশে ভ্রমণ করে ইউরোপীয় উন্নতি ও প্রগতিতে মুগ্ধ হন। তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতার প্রধান দিক ছিল এই যে, তিনি একগুয়ে ছিলেন এবং বিচার-বিবেচনা ছাড়াই পরামর্শদাতা নিযুক্ত করতেন, যা তাঁর জন্য ছিল আত্মঘাতী স্বরূপ। এছাড়া ফলাফল বিচার না করে তিনি যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করেন তার ফলেই তাঁর ভাগ্য বিপর্যয় হয় এবং ১৯২৯ সারে দেশ থেকে তাঁকে বিতাড়িত হতে হয়।

সংস্কারক হিসেবে আমানুল্লাহ ঃ আমানুল্লাহর অসামান্য কৃতিত্ব ছিল ১৯১৯ এবং ১৯২১ সালের চুক্তি মোতাবেক আফগানিস্তানকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করা। তিনি আফগান জাতির স্বাধীন সত্ত্বা ও উদার চেতনার প্রতি সজাগ ছিলেন। কারণ কাবুলে বার্নস ও ক্যাভাগনারীর হত্যা দ্বারা আফগানদের বৈদেশিক প্রভাব বিরোধী মনোভাব প্রমাণিত হয়। তিনি একটি উগ্র, অশিক্ষিত, স্বাধীনচেতা ও সম্ভাবনাময় জাতিকে সুসমৃদ্ধ, প্রগতিশীল ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রে পরিনত করার স্বপ্ন দেখেন। আফগানিস্তান অনুন্নত হলেও বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত ছিল না। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও প্রয়োগ করে আফগানিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল। এর ফলে নাগরিকদের জীবনের মান বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি লাভ করে। কিন্তু এই সমস্ত সংস্কারের প্রধান বাধা ছিল গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় 'জিরগা', (উপজাতীয় কাউন্সিল), ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ উপজাতীয়দের দুর্বার স্পৃহা ও প্রগতিবিরোধী মনোভাব এবং সর্বোপরি প্রাকৃতিক দুর্ভেদ্যতা। ক্ষমতালাভ করে আমানুল্লাহ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। তিনি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রথমেই কতকগুলো বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন; (১) তিনি সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস করেন এবং সেনাবাহিনীতে যোগদানের উপর বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। ব্রিটিশ ভাতা বন্ধ হলে আমানুল্লাহ অভ্যন্তরীণ সম্পদ উন্নয়ন দ্বারা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে পারেননি। উপরন্তু, রাজস্ব এমন সমস্ত পরিকল্পনায় ব্যয় করা হয় যাতে সাধারণ আফগান জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের কোন সম্ভাবনা ছিলনা। ১৯২১ সালের ইঙ্গ-আফগান চুক্তির পরে আমানুল্লাহ সার্বভৌম রাষ্ট্রের দুতাবাস প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মাত্রাধিক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে তিনি

www.pathagar.com

লন্ডনে আফগান দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাবুলেও ব্রিটিশ মিশন খোলায় অনুমতি দেন। বিদেশ থেকে অপরিকল্পিতভাবে অর্থ ব্যয় করে বিশেষজ্ঞ আনা হয় এবং তাদের কোন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত করা হয়নি। আমানুল্লাহর যাতায়াত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত করার চেষ্টা করেন কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। তাঁর পরিকল্পিত উত্তর ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের মধ্যে নির্মিয়মান সড়ক এবং ভারতীয় সীমান্ত পর্যন্ত কাবুল নদী বরাবর সড়ক অসামপ্ত রয়ে যায়। উপরন্তু, আফগানিস্তানের মত অনুন্নত পশ্চাদপদ দেশে আঙ্কারা ও দিল্লীর মত একটি সমৃদ্ধশালী উপশহর তৈরি করে তিনি অর্থ অপচয় করেন। এ জন্য ফ্রেজার-টাইটলার বলেন যে, "যে দেশের বার্ষিক আয় হচ্ছে তিন মিলিয়ন পাউন্ড সে দেশে উন্নয়নমূলক অবাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ মূর্খতার পরিচায়ক।" আমানুল্লাহ প্রবর্তিত সংস্কারসমূহের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল ছিল ১৯২৩ সালে নতুন প্রশাসনিক কোর্ড প্রণয়ন ও জারী, যা ধর্মভীরু ও রক্ষণশীল সুন্নী আফগানদের কাছে অনৈসলামিক বলে মনে হয়। সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা হ্রাসের ফলে প্রবর্তিত আইন মাফিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা ছিল দুরূহ ব্যাপার। এই কারণ প্রশাসনিক সংস্কারও কার্যকরী হয়নি। উপরন্তু, পুরুষশাসিত আফগান সমাজে তিনি সর্বপ্রথম নারী শিক্ষা প্রবর্তন করেন ১৯২৪ সালে। গোঁড়াপন্থী ও রক্ষণশীল সমাজে এ ধরনের উদার শিক্ষানীতিকে অপরিণামদর্শী বলা হয়েছে।

পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতা ঃ উচ্চাভিলাষী, উদারপন্থী, স্বাধীনচেতা এবং দেশপ্রেমিক শাসক হিসেবে আমানুল্লাহ খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি সংস্কার আন্দোলন ও পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগে ব্যর্থ হন। রাজত্বের শুরুতেই তিনি নিজেকে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ও রক্ষক হিসেবে জাহির করতে থাকেন। সেই সাথে তিনি অপরাপর দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠির আত্ম-নিয়ন্ত্রনের অধিকারের প্রবক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। ১৯২২ সারে ফরগনা ও বুখারায় তুরস্কের ইউনিয়ন ও প্রগ্রেস পার্টির নেতা এনভার পাশা বলশেভিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন যাতে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসী স্বাধীকার লাভ করে। এই সুযোগে আমানুল্লাহ উত্তরাঞ্চলের সীমান্তে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। রুশ সরকার আমানুল্লাহর সামরিক অভিযানে শঙ্কিত হয়ে আফগান বাহিনী প্রত্যাহারের চাপ দেয়। ইত্যবসরে এনভার পাশার মৃত্যু হলে প্যান-তুরানীয় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং আমানুল্লাহ তাঁর বাহিনী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। ১৯২৩ সালে বুখারার আমীরকে বিতাড়িত করা হলে তিনি আফগানিস্তানে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। এরপর আমানুল্লাহ উত্তরাঞ্চল হতে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে দৃষ্টি নিবন্ধন করেন। আমীর আবদুর রহমানের রাজত্বে সম্পাদিত ডুরান্ড লাইন ছিল খুব নাজুক ভৌগোলিক সীমারেখা। এই রেখার উভয় পার্শ্বে একই উপজাতীয় লোকেরা বসবাস করত এবং সীমান্তে গোলযোগ অব্যহত ছিল। ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানের উপর এই অঞ্চলে নিরপেক্ষতা বজায় ও অহেতুক হস্তক্ষেপের কার্যবিধি পালনের জন্য চাপ দেয়। স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা (territorial integrity) নীতি মেনে চলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমানুল্লাহ ১৯২৩ সালে সীমান্ত পরিদর্শন করেন এবং জালালাবাদের জিরগায়

www.pathagar.com

উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। কিন্তু ১৯২৩ সাল ধরে সীমান্ত অঞ্চলে যে অসন্তোষ ও লুটতরাজ চলতে থাকে তা আমানুল্লাহ দমন করতে পারেন নি। ব্রিটিশ ভারতীয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অনুপ্রবেশ করে আফগান উপজাতীয় লোকেরা রাহাজানি করে আফগানিস্তানে আত্মগোপন করতে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রতিবাদ সত্ত্বেও কোন সমাধান না হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে ব্রিটিশ মিশন বন্ধ করে দেওয়ার হুমকী দেয়। অতঃপর ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে আফগান সরকার উচ্ছৃঙ্খল উপজাতীয়দের দমন করে। এর ফলে আপাতঃদৃশ্যে কূটনৈতিক সঙ্কট সমাধান হলেও স্বাধীনচেতা ও গোঁড়াপন্থী আফগান উপজাতীয়গণ আমানুল্লাহর দমন নীতিতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ছিল খোস্ত (Khost) উপজাতীয়দের বিদ্রোহ।

খোস্ত বিদ্রোহ ঃ রাজা আমানুল্লাহর রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক রাজনৈতিক অরাজকতার সূচনা হয় দক্ষিণ আফগানিস্তানের খোস্ত অঞ্চলে। ১৯২৪ সালের মার্চ থেকে ১৯২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এই আত্মঘাতী খোস্ত বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন লামে মোল্লা। সমগ্র দক্ষিণ আফগানিস্তানের উপজাতীয়গণ এই বিদ্রোহে জড়িত হয়ে পড়ে; এমন কি গিলজাই উপজাতীয়দের উপরেও এই বিদ্রোহের প্রভাব পড়ে। এই বিদ্রোহ এমন মারাত্মক আকার ধারণ করে যে কাবুলের ৩৫ মাইলের মধ্যে বিস্তার লাভ করে রাজধানীতে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। আমানুল্লাহ বলিষ্ঠ হস্তে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী খোস্ত বিদ্রোহীদের দমন করেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। উপরন্তু, ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে দুটি উড়োজাহাজ ক্রয় করে উপদ্রুত অঞ্চলে বোমা বর্ষণ করার ব্যবস্থা করেন। দুর্ধর্ষ খোস্ত বিদ্রোহীগণ উড়োজাহাজের গর্জনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আমানুল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে। খোস্ত বিদ্রোহের অবশ্যম্ভাবী ফল হয় এই যে, রাজা ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে 'লয়ী জিরগা' (Loe Jirga) বা মহাসভা আহ্বানে বাধ্য হন। এই জিরগার গোঁড়াপন্থী নেতৃবৃন্দ রাজার উপর চাপ সৃষ্টি করে বলপূর্বক সেনাবাহিনীতে সৈন্য ভর্তির আইন শিথিল করেন এবং বিশেষ করে নারীদের অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা সংক্রান্ত সাংবিধানের শর্তাবলী পরিবর্তন করতে বাধ্য করেন। নারী শিক্ষা সার্বজনীন না করে ১২ বছরের কম বয়স্ক বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। খোস্ত বিদ্রোহ দমন করলেও আমানুল্লাহ জিরগার কাছে নতী স্বীকার করে মর্যাদা হারান। খোস্ত বিদ্রোহ সমগ্র আফগানিস্তানের সংস্কার বিরোধী আন্দোলনের সুত্রপাত করে এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলে কুঠারঘাত হানে, যার ফলশ্রুতিতে চার বছরের মধ্যে (১৯২৪-১৯২৯) আমানুল্লাহর পতন হয়। রাজনৈতিক সঙ্কটের পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিপর্যয় আফগানিস্তানকে প্রায় দেউলিয়া করে দেয়। ব্রিটেন কর্তৃক প্রদত্ত দুটি উড়োজাহাজের মূল্য নগদ অর্থে প্রদানে ব্যর্থ হয়ে রাজা চামড়ায় পরিশোধ করার প্রয়াস পান। এক বছরের কম সময় ব্যাপী সংঘটিত খোস্ত বিদ্রোহ দমনে আফগান সরকারকে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থাৎ বার্ষিক রাজস্বের দ্বিগুণ ব্যয় করতে হয়। শাসন ক্রমশ দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়ে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়নি। সেনাবাহিনী আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ছিল না এবং কোন

www.pathagar.com

মিলিটারী একাডেমী স্থাপিত হয়নি। জামাল পাশা এবং কতিপয় জার্মান কর্মকর্তা আফগান বাহিনীকে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও তা কার্যকরী হয়নি। দেশের রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সঙ্কট যখন চরম আকার ধারন করে তখন আকস্মিকভাবে ১৯২৭ সালে আমানুল্লাহ স্বস্ত্রীক ইতালি সরকারের আমন্ত্রণে ইউরোপ ভ্রমণে বের হন।

আফগানিস্তানের আধুনিকীকরণ বা ইউরোপীয়করণ

বিদেশ ভ্রমণ ঃ রাজা আমানুল্লাহ ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে ইউরোপে যাত্রা করেন। তিনি ভারতীয় সীমান্ত চামন অতিক্রম করে ১৯২৮ সালের জুলাই-এ পারস্য থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দীর্ঘ সাত মাসে তিনি তাঁর স্ত্রী ও ভ্রমণসঙ্গীদের নিয়ে ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজধানীগুলো সফর করেন। এ ছাড়া তিনি তিনটি মুসলিম রাষ্ট্র মিশর, তুরস্ক এবং পারস্য ভ্রমণ করে সে দেশের মহান নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আমানুল্লাহর বিদেশ ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, রাষ্ট্র এবং জাতি হিসেবে আফগানিস্তানকে বিশ্বে পরিচিত করার প্রয়োজনেই এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই ভ্রমণ ইউরোপীয় রাজধানীসমুহে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল কিনা বলা যায় না; তবে এই ভ্রমণের ফলে আমানুল্লাহ ও তাঁর ভ্রমণ সঙ্গীরা ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করে এবং তারা পরবর্তী পর্যায়ে এইগুলো অন্ধ অনুকরণের প্রয়াস পান। ফ্রেজার-টাইটলার বলেন যে, "ইউরোপীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমানুল্লাহ আফগানিস্তানের মত মধ্যযুগীয় গোঁড়া ও রক্ষণশীল সুন্নী সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করে সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনেন।" তাঁর ভাষায়, "এই ভাবধারার অতি ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইউরোপীয় পোশাকের প্রতি রাজার আগ্রহ।" কাবুল ত্যাগের পূর্বে তিনি ও তাঁর ভ্রমণসঙ্গীগণ ভারত থেকে ইউরোপীয় পোশাক তেরি করেন যাতে ইউরোপ ভ্রমণকালে দৃষ্টিকটু না হয়। তিনি অবশ্য দেশে প্রত্যাবর্তন করে ইউরোপীয় পোশাক বর্জন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সর্বাপেক্ষা হাস্যকর ছিল তাঁর উঁচু টুপি (top hat) এবং ফ্রক কোর্ট। কায়রো পৌঁছে তিনি দেশীয় পোশাক ত্যাগ করে টপ হ্যাট ব্যবহার শুরু করেন। উল্লেখ্য আছে যে, 'টপ হ্যাটে'র প্রতি তিনি এতই আকৃষ্ট ছিলেন যে ধর্মভীরু ও গোঁড়া মুসল্লীদের সামনে কায়রোর আল-আযহার মসজিদে টপ হ্যাট্সহ নামায আদায় করেন। নিঃসন্দেহে এ ধরনের ঘটনা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে।

বিলাস ব্যাসন ঃ ইউরোপীয় ভ্রমণে পাশ্চাত্যের ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য, বৈভব ও বিলাসিতার প্রতি আমানুল্লাহ প্রবলভাবে আকর্ষণ বোধ করেন। এ ছাড়া সাহিত্য, শিল্পকলা, বাক স্বাধীনতা, স্বাধীকার, সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শনাদির সঙ্গে রাজা পরিণত হন। ভ্রমণকালে তিনি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করলেও তার মানসপটে যে রঙ্গিন দৃশ্য ভেসে ছিল দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিশেষ করে তিনি তুরস্ক ও পারস্যের মত দুটি মুসলিম রাষ্ট্রে ইউরোপীয় প্রভাবে আধুনিকীকরণের যে প্রয়াস দেখতে পান তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আফগানিস্তানের সেরূপ সংস্কার প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা করেন। আমানুল্লাহ প্রথমে ইতালি ভ্রমণ করেন সরকারি আমন্ত্রণে। তারপর তিনি ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড

www.pathagar.com

এবং জার্মানী পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি ইংল্যান্ড সফর করেন এবং রানী ভিক্টোরিয়া বাকিংহাম প্রাসাদে তাঁর সম্মানে রাজকীয় ভোজ দেন। ইংল্যান্ড থেকে তিনি সরাসরি ওয়ারস যান এবং সেখান থেকে মস্কো গমন করেন। তাঁর রাশিয়া সফর সফল হয়; কারণ তিনি সোভিয়েট সরকারের নিকট থেকে ১৩টি উড়োজাহাজ এবং গোলাবারুদ লাভ করেন। দক্ষিণে সিবাসটোপোল থেকে তুরস্কের বসফোরাস হয়ে আঙ্কারায় প্রবেশ করেন। কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ তিনি তাঁর আধুনিকীকরণ নীতিতে কামালকে আদর্শস্থানীয় মনে করেন। আফগানিস্তান ও তুরস্কের মধ্যে মৈত্রী ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়। তুরস্ক থেকে পারস্যে আগমন করে তেহরানে রেজা শাহ পাহলভীর সঙ্গে তিনি মিলিত হন। অতঃপর তিনি হিরাত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফেজার-টাইটলার মন্তব্য করেন যে, "তুরস্ক ও পারস্য ভ্রমণ করার ফলে আমানুল্লাহর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে।" ("These two final visits to Turkey and Persia sealed Amanullah's fate.")

আধুনিকীকরণের প্রতিক্রিয়া ঃ ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে কাবুলে প্রত্যাবর্তন করে আমানুল্লাহ্ তাঁর ইউরোপীয় ভ্রমণের সাফল্য সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করেন। তাঁর অবর্তমানে রাজপ্রতিনিধি হিসেবে সর্দার মুহম্মদ ওয়ালী খান শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাজার বিদেশে ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা রকমের গুঞ্জন শুরু হয় এবং যখন রাজা ও রানী ইউরোপীয় পোশাক প্রীতির কথা প্রকাশ পায় তখন গোঁড়াপন্থী মোল্লা শ্রেণীর আফগানদের মধ্যে ঘৃণার ভাব জন্মে। রানী প্রকাশ্যে মস্তকাবরণ বা ঘোমটা (veil) ব্যতীত চলাফেরা করতে থাকেন এবং ইউরোপীয় সান্ধ্য পোশাক গাউন ব্যবহার করেন। কান্দাহারের 'জিরগা'য় এই বেহায়াপনার সমালোচনা করা হয়। ১৯২৮ সালের জুন মাসে সমগ্র দেশে অস্বাভাবিক শান্তি বিরাজ করে যেমন ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতি শান্ত থাকে। মুলতঃ রাজা ও রানীর ইউরোপীয় সফর আফগানিস্তানের স্বার্থরক্ষা করেনি, বরং এতে প্রচুর অর্থ অপচয় হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যহত হলে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয় এবং রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। কান্দাহার ও কাবুলে আগমন করে আমানুল্লাহ্ ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সংস্কারমূলক কর্মসূচি ঘোষণা করেন। মূলতঃ তিনটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা যায়– যথা, (১) নারীজাতির সামাজিক মর্যাদা ও মুক্তি; (২) যাতায়াতের সুব্যবস্থা; (৩) শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন। বিদেশে ভ্রমণের পরে তিনি বিলাসপ্রিয় হয়ে পড়েন এবং তাঁর 'দার আল-আমান' প্রাসাদের জন্য জার্মান আসবাবপত্র ক্রয় করেন, যার ফলে প্রচুর অর্থ অপচয় হয়। তাঁর ভ্রমণে এক মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় হয়, যার ভার আফগানিস্তানের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে বহন করা সম্ভব ছিলনা। উপরন্তু, বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি জাপান, মিশর, ফিনল্যান্ড, লাটভিয়া, সাইবেরীয়া, সুইজারল্যান্ড এবং পোলান্ডে দূতাবাস স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

আমানুল্লাহর ব্যর্থতা ঃ ১৯২৮ সালে আমানুল্লাহ যে মারাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার ফলশ্রুতিতেই তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। ইঙ্গ-আফগান চুক্তি ১৯২১ সালে সম্পাদিত হয়, যা আফগানিস্তানকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিনত করে এবং সকল প্রকার বৈদেশিক (রুশ-ইঙ্গ) হস্তক্ষেপ থেকে প্রথমবারের মত আফগানিস্তান মুক্তি

www.pathagar.com

পায়। এই চুক্তি সম্পাদনার বার্ষিকী উৎযাপন উপলক্ষ্যে আমানুল্লাহ্ দেশবাসীর নিকট তাঁর সংস্কারের বিস্তারিত পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজস্ব পার্লামেন্ট বা লোয়ে জিরগার বৈঠক আহ্বান করেন। ১৬ই আগস্ট কাবুলে অনুষ্ঠিত এই সভায় রাজকীয় প্রতিনিধি (Regent) উপস্থিত ছিলেন এবং রাজা পাগমানে অবস্থান করছিলেন। আমানুল্লাহ্ পাগমানে তাঁর উদ্ভাসিত সংস্কারসমূহের প্রথম নিরীক্ষা শূরু করে পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে যে (১) কোন মহিলা পাতলা বোরখা পরিহিত না হয়ে জনসমক্ষে চলাচল করতে পারবে না এবং এই আদেশ লঙ্ঘনকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করবে; (২) প্রত্যেক পুরুষকে ঠিলা পায়জামার পরিবর্তে ইউরোপীয় পাতলুন পরিধান করতে হবে এবং লম্বা চুল রাখা নিষিদ্ধ করা হয়। আমানুল্লাহ্ যখন পাগমানে পাশ্চাত্য প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদেশী লেবাস প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন তখন সমগ্র দেশে ও জিরগাসমূহে সংবাদ প্রচারিত হল যে রাজা ধর্মভীরু ও সংরক্ষণশীল আফগানদের রাতারাতি ইউরোপীয়দের সমকক্ষ করার প্রচেষ্টা করছেন। আমানুল্লাহর বলপূর্বক ইউরোপীয়করণ নীতির লোয়ে জিরগায় তীব্র সমালোচনা হয়। বলাই বাহুল্য যে, মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় অনুন্নত আফগানিস্তানে বিদেশী প্রভাব বর্জিত হয় এবং জিরগার ১০০০ জন সদস্য আমানুল্লাহর আদেশে ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করলে তাদের 'জোকারে'র মত মনে হচ্ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ক্ষমতাশালী গিলজাই, মানগালসহ বর্ধিষ্ণু উপজাতীয়দের প্রতিনিধি ছিলেন। যাহোক, এই সভায় রাজা ১৫০ সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা জাতীয় এসেমব্লী গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। জাতীয় পরিষদ গঠিত হলে একনায়কত্ব ও স্বৈরতন্ত্রের স্থলে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। পোশাক পরিবর্তন ব্যতীত আমানুল্লাহ্ নারীজাতির মুক্তির ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার মধ্যে ছিল মহিলাদের শিক্ষা লাভ, বহু বিবাহ রদ, রাষ্ট্র থেকে ধর্মীয় সংস্থাগুলি পৃথকীকরণ। গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় নেতাদের বিরোধিতা নির্মূল করার জন্য রাজার আদেশে শোর বাজারের হযরত শাহেব এবং তাঁর ভ্রাতৃষ্পুত্রকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তারা গোপনে আমানুল্লাহ্ প্রবর্তিত সংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে জনগণের সমর্থন বা স্বাক্ষর আদায় করছিলেন। গোঁড়াপন্থী আফগান ধর্মীয় নেতাগণ আমানুল্লাহর পাশ্চাত্যকরণ নীতিকে ইসলামবিরোধী ও শরিয়তের পরিপন্থী বলে ফতোয়া দেন। ফলে, নিপীড়ন ও দমননীতির আশ্রয় নিয়ে অসংখ্য ধর্মীয় নেতা, মোল্লা ও জিরগার সর্দারদের আটক করা হয়।

বিদ্রোহ ও পতন ঃ ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমগ্র আফগানিস্তানে বিদ্রোহ দেখা দিল। বহু যুগব্যাপী প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনে রক্ষণশীল আফগানগণ তাদের চিরাচরিত রীতিনীতি বর্জন করতে পারেনি এবং আমানুল্লাহ্ বলপূর্বক সমাজ সংস্কার করার ব্যর্থ প্রয়াস পান। তিনি সেনাবাহিনীর সহায়তায় এই সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ বিরাজ করছিল। তারা নিয়মিত বেতন পেত না এবং উচ্ছৃঙ্খল ছিল। ফলে সমগ্র দেশে আমানুল্লাহর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং বিদ্রোহ ও অসন্তোষ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দাঙ্গা শুরু হয় কাবুলের উত্তরের কোহী-ই-দামানে। এখানে হাবিবুল্লাহ্ খান

www.pathagar.com

ওরফে 'বাচ্চা-ই-সাকা' বা ভিস্তীর ছেলের নেতৃত্বে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু হয়। সাময়িকভাবে এই বিদ্রোহ প্রশমিত হলেও আমানুল্লাহর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ জারি থাকে। ১৪ই নভেম্বর পূর্বাঞ্চলে সিরওয়ানী উপজাতি আমানুল্লাহর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে জালালাবাদ দখল করে। তারা রাজার প্রাসাদ ধ্বংস করে এবং ব্রিটিশ কনসুলেট অগ্নিদগ্ধ করে। অসন্তোষ ও বিদ্রোহ মুহম্মদ গোত্রের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এরপর খোস্ত, জাদরান, জাজিসে বিক্ষোভ শুরু হয় এবং সরকারি সম্পত্তি বিধ্বস্ত হয়। পরিস্থিতি মারাত্মক অবনতি হলে স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রির পরামর্শে রাজা তাঁর পররাষ্ট্র মন্ত্রী গোলাম সাদেককে বিদ্রোহীদের সঙ্গে বৈঠকে বসার নির্দেশ দেন। বিদ্রোহীগণ ডিসেম্বরের বৈঠকে যে সমস্ত শর্ত আরোপ করে তা হচ্ছে ঃ (১) ইউরোপীয়করণের যে নীতি প্রবর্তিত হয়েছে তা বর্জন করা; (২) বলপূর্বক সৈন্যদলে ভর্তির জন্য যে 'হাসত নাফারী' প্রথা চালু আছে, তা বাতিল করা; (৩) উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপে প্রেরিত আফগান মহিলাদের দেশে ফিরিয়ে আনা; (৪) বিদ্রোহীদের সাধারণ ক্ষমা প্রদান। আলোচনা চলাকালীন সময়ে বিদ্রোহ আরও ছড়িয়ে পড়ে এবং সরকারি বাহিনী বিদ্রোহী বাহিনীর নিকট বিপর্যস্ত হতে থাকে। এমনকি কাবুলও বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। রাজধানীতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা শুরু হয়।

'বাচ্চা-ই-সাকা' ঃ ১৯২৮ সালের শেষার্ধে সমগ্র আফগানিস্তানে বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়লে হাবিবুল্লাহ খান ওরফে 'বাচ্চা-ই-সাকা' নামে একজন দুর্ধর্ষ বীরের আবির্ভাব হয়। তিনি তাজিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি আফগান সেনাবাহিনীতে যোগদান করে আঠারো মাস কর্মরত ছিলেন। পরে তিনি সেনাবাহিনী ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে জীবন শুরু করেন। এক সময়ে তিনি পেশওয়ারে চা-বিক্রেতার কাজ করেন। চৌর্য বৃত্তির জন্য তার একবার এগার মাস কারাবরণ হয়। আমানুল্লাহর সংস্কার বিরোধী আন্দোলনে তিনি জড়িয়ে পড়েন এবং প্রথম দিকে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে না পারলেও পরবর্তী পর্যায়ে তিনি রাহাজানি করে ধনসম্পদ সঞ্চয় করেন এবং কাবুলের উপর হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি কাবুলের উত্তরে অবস্থান করে সমস্ত পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন। সিরওয়ানীদের বিদ্রোহের সময় তিনি নিষ্ক্রীয় ছিলেন এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে যখন অসন্তোষ দেখা দিল তখন তার বাহিনীসহ প্রথমে জাবাল-উস-সিরাজ দখল করেন। এই স্থানে সরকারি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং 'বাচ্চা-ই-সাকা' সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আটক করেন। ১৪ই ডিসেম্বর তিনি উত্তর থেকে দক্ষিণে কাবুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ব্রিটিশ মিশনের পাশ দিয়ে তিনি কোহ-ই-লুলা দুর্গ দখল করেন। এর ফলে কাবুলের সন্নিকটে আসমাই পর্বতে তিনি অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হন। কিন্তু রাজকীয় বাহিনী ব্রিটিশ মিশনে বোমা বর্ষণ করে বিদ্রোহী হাবিবুল্লাহর গতিরোধ করে। ফলে তিনি জাবাল-উস-সিরাজে গিয়ে শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীগণ এই শহরে অবস্থিত পানি-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিধ্বস্ত করলে কাবুলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৯ সালের ৩রা জানুয়ারি রাজকীয় বাহিনী কাবুল থেকে সৈন্যবাহিনীসহ কোহী-ই-দমন উপত্যাকায় বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করেন। কিন্তু রাজকীয় বাহিনী পরাস্ত হলে 'বাচ্চা-ই-সাকা' কাবুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের মারাত্মক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে শঙ্কিত হয়ে আমানুল্লাহ ৫ই জানুয়ারি তাঁর প্রবর্তিত সকল প্রকার সংস্কার বাতিল করেন এবং প্রভাবশালী মোল্লাদের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেন। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ বিদ্রোহ প্রশমিত করেনি কারণ ১৩ই জানুয়ারির মধ্যে আফগান সেনাধ্যক্ষ বিদ্রোহীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আত্মসমর্পনে বাধ্য হন। ১৪ই জানুয়ারি সমগ্র কাবুল এবং বিমান বন্দন 'বাচ্চা-ই-সাকার' দখলে আসে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে রাজা আমানুল্লাহ ১৯১৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি তাঁর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ইনায়েতুল্লাহ হস্তে শাসনভার অর্পণ করে সিংহাসন ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মাত্র তিন দিন শাসনকার্য পরিচালনা করার পর ১৭ই জানুয়ারি কাবুল বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কাবুল দুর্গ, প্রাসাদ, রাজকোষ, অস্ত্রাগার বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়। আমানুল্লাহ স্বপরিবারে কান্দাহারে আশ্রয় গ্রহণ করে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু তার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ২৩শে মে আমানুল্লাহ চমন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং বোম্বাই থেকে ইতালির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আশ্চর্যের বিষয় যে, মাত্র এক বছরের অর্থাৎ ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে সংস্কার প্রবর্তন করতে গিয়ে আমানুল্লাহ সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাজিক গোত্রের একজন ভিস্তিরপুত্র দৌর্দণ্ডপ্রতাপ দূররানী বংশের সিংহাসন দখল করে। কিন্তু 'বাচ্চা-ই-সাকা'র রাজনৈতিক অভিলাষ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি (মে থেকে অক্টোবর); কারণ কাবুলের সিংহাসনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুহম্মদজাই গোত্রের প্রতিনিধি ও পায়েন্দা খানের বংশধর নাসির শাহ উপবেশ করেন।

আমানুল্লাহর সংস্কার নীতির ব্যর্থতা ঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ মুসলিম বিশ্বে তিনজন ক্ষণজন্মা নেতার আবির্ভাব হয়; ইরানে রেজা শাহ পাহলভী, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক এবং আফগানিস্তানে আমানুল্লাহ। এই তিনজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে; বিশেষ করে তাদের পাশ্চাত্যপ্রীতি এবং সংস্কার প্রবণতা। এই তিনজন ইউরোপীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের দেশের আধুনিকীকরণের যে প্রয়াস পান তা মূলত ইউরোপীয় আচার রীতি, ভাবধারা, সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। কিন্তু লক্ষনীয় যে, কামাল আতার্তুক ব্যতীত অপর দুজন তাঁদের দেশে সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তনে ব্যর্থ হন। আফগানিস্তানে আমানুল্লাহর সংস্কারের ব্যর্থতায় মূলে নিম্ন বর্ণিত কতিপয় কারণ ছিল ঃ

১. সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, সমাজ ছিল রক্ষণশীল প্রগতিবিরোধী এবং কোন প্রকার অভিনবত্বের ঘোর বিরোধী।

২. সমাজ জীবন ছিল মধ্যযুগীয় এবং এর ভিত্তি ছিল 'জিরগা', যা গোঁড়াপন্থী সুন্নী মোল্লা সরদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারা সকল প্রকার সংস্কারের বিরোধী ছিলেন; এই কারণে শোর বাজারের হযরত সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়।

৩. অনুন্নত ও অশিক্ষিত আফগান সমাজ পুরুষ শাসিত ছিল এবং বহু বিবাহে অভ্যস্ত ছিল। এই সমাজে নারী স্বাধীনতা, প্রগতি ও মুক্তির কোন স্থান ছিল না। নারীশিক্ষাকে সাধারণ আফগানরা সন্দেহের চোখে দেখত। এই কারণে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষন ছাড়াই মহিলাদের প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করা হয়।

www.pathagar.com

৪. ইউরোপীয় পোশাক প্রবর্তনে ইসলামের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এবং মোল্লাগণ এই রীতিকে শরিয়ত বিরোধী বলে ফতোয়া দেন।

৫. রক্ষণশীল সমাজে নারীর সম্ভ্রম সর্বদা মর্যাদা পেয়ে আসছে কিন্তু প্রকাশ্যে স্বল্প পোশাক পরিহিত মহিলাগণ নাটক ও শারীরিক কসরত দেখালে বয়স্ক গোঁড়াপন্থী আফগানদের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

৬. আমানুল্লাহ মাত্র এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২৮ সালে ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে অনেকটা বলপূর্বক আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা তার অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। অন্যদিকে কামাল আতাতুর্ক দীর্ঘ সময় ধরে একটির পর একটি সংস্কার প্রবর্তন করেন।

৭. আমানুল্লাহ নিজেকে একজন বিপ্লবী সংস্কারক হিসেবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন; কারণ তার কোন সমর্থক ছিলনা; অন্যদিকে ইসমত ইনোনুসহ বহু সমর্থক লাভ করে কামাল আতাতুর্ক সংস্কার আন্দোলনে সাফল্য অর্জন করেন।

৮. আমানুল্লাহ যদি কামালের মত সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ তাঁর 'কমিটি অব ইউনিয়ন ও প্রগেসের' মত সংস্থার মাধ্যমে সংস্কার প্রবর্তন করতেন তা হলে হয়ত গোঁড়াপন্থী আফগানগণ তাঁর সংস্কারসমূহ সাদরে গ্রহণ করত। কিন্তু তিনি তাঁর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া জনগণের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাদশাহ্ নাদির শাহের অভ্যুত্থান

নাদির শাহের উত্থান (১৯২৯-৩৩)

পটপ্রেক্ষিতে ঃ রাজা আমানুল্লাহর রাজত্বের শেষার্ধে সংস্কার বিরোধী আন্দোলন যখন সমগ্র দেশে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অরাজকতা বিস্তার করে তখন 'বাচ্চা-ই-সাকা' ক্ষমতা দখল করে কাবুলে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২৯ সালে আমানুল্লাহ সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে নির্বাসনে যান। উপজাতীয়দের বিদ্রোহ, অর্থনৈতিক সংস্কার, সামাজিক অনাচার, সেনাবাহিনীর অসহায় অবস্থা, গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় নেতাদের সরকার বিরোধী প্রচারণা, পাশ্চাত্যপ্রীতি, ইসলাম বিরোধী আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তনের ফলে আফগানিস্তানে এক বিস্ফোরণমুখী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ১৯২৮ সালের ২৪শে নভেম্বর স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রী রাজা আমানুল্লাহকে জানান যে, তার প্রবর্তিত সংস্কারসমূহ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সরকার বিরোধী করে তুলছে। মোল্লা, ধর্মপ্রচারক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, কৃষক, ব্যবসায়ী, এমনকি সেনাবাহিনী সংস্কারের কুফলে শঙ্কিত হয়ে বিদ্রোহ করে। এই নাজুক পরিস্থিতির সুযোগে ১৯২৯ সালের মে মাসে আমানুল্লাহ দেশত্যাগ করলে 'বাচ্চা-ই-সাকা' কাবুলে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। আমানুল্লাহর ভাগ্য বিপর্যয়ে আফগানিস্তানে তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উদ্ভব হয়। উত্তরে রুশ সাহায্যপুষ্ট মস্কোর প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত গোলাম নবীর বাহিনী। তিনি মাযার শরীফ পর্যন্ত অভিযান করে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। পশ্চিমে 'বাচ্চা-ই-সাকা'র সমর্থক আবদুর রহিম অভিযান করে হিরাত দখল করেন। সেখানে তিনি সাময়িকভাবে একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'বাচ্চা-ই-সাকা'র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বিরত থাকেন। দক্ষিণাঞ্চলে আফগানিস্তানের প্রভাবশালী মুসাহিবান গোত্রভুক্ত সর্দার নাদির খান এবং তাঁর ভ্রাতাগণ তাঁদের অবস্থান সুদৃঢ় করে কাবুলের দিকে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

'বাচ্চা-ই-সাকা'র শাসন ঃ ১৯২৯ সালের মে মাসে হাবিবুল্লাহ খান ওরফে 'বাচ্চা-ই-সাকা' আফগানিস্তানের অধিপতি হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন; কিন্তু ভিস্তির ছেলে হাবিবুল্লাহ কোহ-ই-দামান উপত্যকার তাজিক উপজাতীয় থাকায় পাঠানদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন। ফ্রেজার-টাইটলার বলেন যে, তিনি যদি পাঠান হতেন তা হলে আফগানিস্তানে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন; যদিও দূররানী ব্যতীত অপর কোন বংশের স্থায়ীভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করার সম্ভাবনা ছিল খুব কম। 'বাচ্চা-ই-সাকা' পাঠানদের উপর মাত্র কয়েক মাস কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে গিলজাই গোত্র তাকে সমর্থন করলেও আমানুল্লাহর সিংহাসনচ্যুতির পর তারা 'বাচ্চা-ই-সাকা'র প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেন। মূলতঃ কাবুল এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ব্যতীত 'বাচ্চা-ই-সাকা'র প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেন। মূলতঃ কাবুল এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ব্যতীত বাচ্চা-ই-সাকার ক্ষমতা বিস্তার লাভ করেনি। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল প্রায় স্বাধীন ছিল এবং

www.pathagar.com

পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের পাঠান গোত্রসমূহ একজন তাজিককে সমর্থন দান করেনি। এমতাবস্থায় আফগানিস্তানে নেতৃত্বে শূন্যতা (leaderless and masterless) দেখা দেয়। এরূপ বিস্ফোরণমুখী রাজনৈতিক পরিস্থিতি আন্তর্জাতিকভাবে মারাত্মক হুমকী স্বরূপ ছিল; কারণ রুশ ও ব্রিটিশ পরাশক্তি তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য সদা প্রস্তুত ছিল। ১৯২৪ সাল থেকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও বৈমানিকদের উপস্থিতিকে ব্রিটিশ ভারত সুনজরে দেখেনি। ১৯২৬ সালে আফগানিস্তানের সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী ও নিরপেক্ষ নীতির উপর ভিত্তি করে চুক্তি হয় এবং ১৯২৭ সালে কাবুলের সাথে তাসখন্দের বিমান পথে যাতায়াতের চুক্তি হয়। রাশিয়া ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে আফগানিস্তানকে মধ্যবর্তী রাষ্ট্র বা buffer state হিসেবে যে মর্যাদা দেওয়া হয় ১৯২৯ সালে আমানুল্লাহর দেশত্যাগের ফলে তা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। রাজনৈতিক শূন্যতাই ছিল এর মূল কারণ। পূর্ববর্তী ঈঙ্গ-আফগান যুদ্ধের ফলাফল বিচার করে ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানের নাজুক পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপে আগ্রহী ছিল না। কারণ আফগানিস্তানকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ব্রিটেন স্বীকৃতি দেয় এবং রাষ্ট্রদূত বিনিময় হয়। 'বাচ্চা-ই-সাকা' ব্রিটিশ সরকারকে আফগানিস্তানের বৈধ শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দানের আহ্বান জানান কিন্তু তা প্রত্যাখ্যা করা হয়।

নাদির খানের ক্ষমতা দখল ঃ আমানুল্লাহর শাসনামলে জেনারেল নাদির খান তাঁর পরিবারসহ ভারতে অবস্থান করছিলেন কিন্তু আমানুল্লাহর পতনের পর তিনি পরিস্থিতির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন। তিনি ১৯২৯ সালের ৮ই মার্চ ভারত থেকে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি দুর্ধর্ষ খোস্ত অঞ্চলের উপজাতীয়দের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। নাদির খানের লোক ও অর্থবল কিছুই ছিল না। তবুও অদম্য মনবল এবং বীরত্বের সঙ্গে তিনি স্বীয় অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। তিনি কয়েকবার লোগার উপত্যাকা দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় তিনি ভারতীয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওয়াজিরিস্তান থেকে উপজাতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে কাবুলের অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি ছাড়াই তিনি সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপের ঘোর বিরোধী ছিল। কারণ তারা হস্তক্ষেপ করলে রাশিয়ারও হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে তারা নিরপেক্ষতা নীতি বজায় রাখে; যদিও ব্রিটিশ সরকার সহজেই উপলব্ধি করে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে দুররানী পরিবারের একজন নির্ভিক ও প্রভাবশালী সদস্যই আফগানিস্তানকে সঙ্কট থেকে রক্ষা করতে পারবে। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে নাদির খান তাঁর বাহিনীসহ লোগার উপত্যাকায় প্রবেশ করেন। ১০ই অক্টোবর নাদির খানের ভাই সরদার শাহওয়ালী খান চারাসিয়ায় 'বাচ্চা-ই-সাকা'কে পরাজিত করে কাবুল দখল করেন। ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে 'বাচ্চা-ই-সাকা' কাবুল ত্যাগ করলে তার নয় মাসের শাসনের অবসান হয়। কাবুলে সুরক্ষিত আরগ-দুর্গ ওয়ালী খান দখল করেন। ১৬ই অক্টোবর জেনারেল নাদির খান কাবুলে প্রবেশ করে মহারাজাধিরাজ (His Majesty) নাম ধারণ করে আফগানিস্তানের অধিপতি হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন।

www.pathagar.com

নাদির শাহের বংশ পরিচয় ঃ নাদের শাহ আফগানিস্তানের প্রখ্যাত দুররানী উপজাতীর মুহম্মদজাই পরিবারভুক্ত ছিলেন। সেদিক থেকে তিনি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা পায়েন্দা খানের বংশধর। নাদির শাহের পিতা মুহম্মদ ইউসুফ খানকে আবুদর রহমান ভারতে নির্বাসিত করেন এবং নাদির শাহ ও তাঁর ভায়েরা উত্তর প্রদেশের দেরাদুনে জন্মগ্রহণ করেন। নাদির শাহের পরিবার মুসাহিবান পরিবার নামে পরিচিতি ছিল এবং আবুদর রহমানের মৃত্যুর পর আমীর হাবিবুল্লাহ কাবুলের সিংহাসনে উপবেশন করলে এই পরিবারকে আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হয়। হাবিবুল্লাহর সরকারে তারা অংশ গ্রহণ করেন কিন্তু আমীরের মৃত্যুতে তাদের হস্তক্ষেপ থাকার সন্দেহে তাদের গ্রেফতার করা হয়। রাজা আমানুল্লাহর শাসনামলে মুসাহিবান পরিবার সম্মানজনক পদমর্যাদা লাভ করে এবং নাদির খানকে সৈনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। নাদির খান তেজস্বী সেনাপতি হিসেবে তৃতীয় আফগান যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং তাঁর বাহিনী নিয়ে খোস্ত থেকে কুররাম উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অভিযান করে খায়বার থেকে গোমাল পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ হন। দুররানী পরিবারের একজন স্বনামধন্য সদস্য হিসেবে তিনি প্রশাসন, সৈন্য পরিচালনা ও সামাজিক কার্যক্রমে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন।

নাদির শাহের পূর্ব অভিজ্ঞতা ঃ ১৯২৯ সালে নাদির শাহ সিংহাসনে উপবেশন করলেও তাঁকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তাঁকে কালাতিপাত করতে হয়। আমানুল্লাহ তাঁকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেও তাঁর অসাধারণ সামরিক মেধা, ব্যক্তিত্ব ও উপজাতীয়দের মধ্যে প্রভাবে তিনি ঈর্ষান্বিত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। নাদির খান সর্বদা ব্রিটিশ ফরওয়ার্ড নীতির বিরোধিতা করেন এবং ডুরান্ড লাইন বরাবর উভয় পার্শ্বের বসবাসকারী উপজাতীয়দের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। ব্রিটিশ সরকারের সন্তুষ্টির জন্য আমানুল্লাহ মূলত ১৯২৪ সালের এপ্রিলে নাদির খানকে সেনাধ্যক্ষের পদ থেকে অব্যাহতি দেন। কিন্তু এর ফলে আমানুল্লাহর বিপর্যয় নেমে আসে। ফ্রেজার-টাইটলার বিশ্লেষণ করে বলেন যে, "নাদির খানের ভাগ্য বিপর্যয় এবং রাজনৈতিক পটভূমি থেকে তাঁর নির্বাসন আফগান ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা" (significant landmark)। নাদির খানের পদচ্যুতির মূল কারণ ছিল সমরমন্ত্রী সর্দার মুহম্মদ ওয়ালীর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ। সামরিক এবং বেসামরিক ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন্দল পক্ষান্তরে আফগানিস্তানে ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। আমানুল্লাহও নাদির খানের প্রভাবে আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। মূলত দক্ষিনাঞ্চল থেকেই তিনি স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করে আমানুল্লাহর পতনের পর 'বাচ্চা-ই-সাকা'র বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেন। নাদির খানের পদচ্যুতি তার জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়; কারণ পরবর্তী পর্যায়ে তিনি একজন অনুগত, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আফগান প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপে অবস্থান করে কূটনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। আমানুল্লাহর পতনের পর তিনি ভারত হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে 'বাচ্চা-ই-সাকা'কে বিতাড়িত করে আফগানিস্তানের সিংহাসনে বসেন।

www.pathagar.com

শাসন ব্যবস্থা ও সংস্কারবিদ ঃ

রাজনৈতিক ঃ ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে কাবুলে প্রবেশ করে নাদির খান ক্ষমতা দখল করার পর রাজনৈতিক অচলাবস্থা এবং তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হন। 'বাচ্চা-ই-সাকা' রাজকোষসহ পলাতক থাকায় নাদিরের কোন নগদ অর্থ ছিল না, যা দিয়ে তিনি সৈন্যবাহিনীর বেতন দিতে পারেন; কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ বাহিনী ছিল না, যার সাহায্য তিনি শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারেন। এ ছাড়া যে অসংখ্য উপজাতীয়দের সহায়তায় তিনি ক্ষমতা দখল করেন, তাদের দাবি পূরণের মত যথেষ্ট সম্পদ তাঁর কাছে ছিল না। তাদের চাহিদা পূরণের সামর্থ না থাকায় নাদির শাহ বাধ্য হয়ে লুটতরাজের অনুমতি দেন। ফলশ্রুতিতে সরকারি সম্পদ-প্রাসাদ (দিলখুশা), এমনকি ফরাসী দূতাবাস লুট হয়ে যায়। উপজাতীয়দের রাহাজানি বন্ধ হলে নাদির শাহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিন্যাসের দিকে মনোযোগ দেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি কতিপয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ববর্তী শাসকগণের অনুসৃত নীতি বর্জন করেন এবং আমানুল্লাহর সংস্কার আন্দোলনকে বর্জন করেন। উপজাতীয়দের সমর্থন লাভের চেষ্টায় তিনি ১৬ই অক্টোবর সেনাবাহিনী এবং কাবুলের অধিবাসীদের সমর্থনে সিংহাসনে বসেন। রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের জন্য তিনি 'বাচ্চা-ই-সাকা'র মৃত্যুদণ্ড দেন। 'বাচ্চা-ই-সাকা' তার অনুচরদের দ্বারা পরিত্যক্ত হলে আত্মসমর্পণ করেন। সেনাবাহিনীর দাবিতে 'বাচ্চা-ই-সাকা'কে হত্যা করা হয়।

শাসন নীতি ঃ মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় লালিত অনুন্নত ও অধিকাংশ অশিক্ষিত গোঁড়াপন্থী সুন্নী উপজাতীয় আফগান অধিবাসী সর্বদা সংস্কারবিমুখী ছিল। যাদুর স্পর্শে আমানুল্লাহ এই জাতিকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা করে ব্যর্থই হননি পক্ষান্তরে তাঁর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। এ কথা স্মরণ করে নাদির শাহ ১৯২৯ সালের নভেম্বরে ইসলামী শরিয়তের অনুকূল শাসননীতি প্রবর্তনের চিন্তা-ভাবনা করেন। হানাফী সুন্নী বিধান অনুযায়ী আইন প্রণীত হয় এবং আমানুল্লাহ প্রবর্তিত সমস্ত সংস্কার বাতিল বলে ঘোষিত হয়। এর ফলে নাদির শাহ প্রভাবশালী মোল্লা গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করেন। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের জন্য তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেন। গোঁড়াপন্থীদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে নাদির শাহ উন্নতি ও প্রগতির সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এক ফরমানে তিনি শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড হিসেবে প্রাধান্য দেন। তিনি সামরিক স্কুলসহ বেসামরিক স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্রাগার ও কারখানা নির্মিত হয়।

সংসদ গঠন ঃ প্রশাসনিক কাঠামো সুষ্ঠুভাবে বিন্যাস এবং শাসনকার্য দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য নাদির শাহ দশ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তবে সর্দার হাশিম খান প্রধানমন্ত্রী এবং অপর ভাই শাহ মাহমুদ সমরমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের তার নিজস্ব পরিবার অথবা বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধব থেকে নিযুক্ত করেন। আমানুল্লাহর কোন রাজকর্মী তার মন্ত্রীসভায় স্থান পায়নি। তিনি ২৮৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় সংসদ গঠন করেন। প্রদেশ ও উপজাতীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এই সংসদ গঠিত হয়। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংসদ আনুষ্ঠানিকভাবে

www.pathagar.com

আমানুল্লাহর সিংহাসনচ্যুতি এবং নাদিরের সিংহাসনরোহণ অনুমোদন করে। ২৮৬ সদস্যের মধ্য থেকে ১০৫ জন নির্বাচিত সদস্যের দ্বারা একটি জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের কার্যনির্বাহ হত একজন প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে। ১৯৩১ সালে ২৭ জন জ্ঞানী-গুনী-দূরদর্শী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উচ্চ পরিষদ গঠন করা হয়। কাউন্সিলের প্রধান কাজ ছিল পরামর্শ দান এবং আইন প্রণয়ন করা। উল্লেখ্য যে, আইন প্রণয়নকারী (Legislative) সংস্থা বা কাউন্সিলের সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (Executive) কোন বিরোধ ছিল না। যার ফলে নাদির শাহ্ প্রকৃত অর্থে একটি সুসংহত কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। তিনি সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রেও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি আমানুল্লাহ্ প্রণীত লিখিত সংবিধান বাতিল করে ১৯৩১ সালের অক্টোবরে একটি নতুন সংবিধান তৈরি করেন। এই সংবিধানের ভিত্তিতেই তাঁর উত্তরাধিকারীগণ দেশ শাসন করেন।

বিদ্রোহ দমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা ঃ দেশপ্রেমিক ও সমরনেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও নাদির শাহ্ সুশাসক ও জনহিতৈষী হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ক্ষমতা দখলের অল্প সময়ের মধ্যেই নাদির শাহ্ পূর্বাঞ্চলের প্রদেশ ও কান্দাহারে বিদ্রোহ দমন করেন। 'বাচ্চা-ই-সাকার' ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত কোহ-ই-দমন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মকালে রাজধানীতে অবস্থানকারী উচ্ছৃঙ্খল উপজাতীয়গণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে কঠোর হস্তে তা দমন করা হয়। কাবুলে অবস্থানকারী এই সমস্ত আফগানকে তাদের নিজস্ব এলাকায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। ১৯৩০ সালের শেষার্ধে হিন্দুকুশ পর্বতমালার দক্ষিণাঞ্চলে আফগানিস্তানে বিদ্রোহ প্রশমিত হলে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। একমাত্র খোস্ত 'বাচ্চা-ই-সাকার' এলাকা থাকায় সেখানে বিশৃঙ্খলা অব্যাহত ছিল। হিরাতের শাসক আনুগত্য স্বীকার করেন। উত্তরাঞ্চলের কোথাও কোথাও অরাজকতা বিদ্যমান ছিল, যেমন রুশ সীমান্তে ফরগনার অধিবাসী ইব্রাহিম বেগ ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ আইন অমান্যকারী বাসমাচী দস্যু। ইব্রাহিম আফগান সীমান্ত থেকে রুশ এলাকায় রাহাজানি করতে থাকে এবং আফগান সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় রুশ বাহিনী আমুর দরিয়া (Oxus) অতিক্রম করে উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করে। রুশ বাহিনী দক্ষিণে ৪০ মাইল পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করলে আফগান সীমান্ত লঙ্ঘিত হয়। প্রধান সেনাপতি শাহ্ মাহমুদ কোহ-ই-দমনে বিদ্রোহ দমন করে ইব্রাহিম বেগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে ইব্রাহিম আমুর দরিয়ার ওপারে বিতাড়িত হলে সে রুশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। বাদশাহ নাদির শাহের কূটনৈতিক ক্ষমতা এবং মাহমুদ শাহের কলা-কৌশলের ফলে সমগ্র দেশে শান্তিই প্রতিষ্ঠিত হলনা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হল এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি পালিত হর।

'দি গ্রেট নর্থ রোড' ঃ

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ নাদির শাহ্ আফগানিস্তানের মত অনুন্নত দেশকে একটি আধুনিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস পান। সমগ্র দেশে বিদ্রোহের কালোছায়া পড়লে তা দমনের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের প্রয়োজন পড়ে

www.pathagar.com

এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে সড়কের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নাদির শাহের প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল হিন্দুকুশ পর্বতমালার মধ্যদিয়ে একটি দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ, যা 'দি গ্রেট নর্থ রোড' নামে খ্যাত ছিল, নির্মান। ফ্রেজার টাইটলার এই সড়ক নির্মাণকে 'প্রশাসনিক মেধার', 'মূর্ত প্রতীক' (hall-mark of administrative genius) বলে অভিহিত করেছেন। এই রাস্তা নির্মাণের পূর্বে উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহী উপজাতীয়দের দমনের জন্য কান্দাহার ও হিরাত ঘুরে যেতে হত; উত্তরে কোন সরাসরি রাস্তা ছিল না। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করে এবং সমগ্র আফগানিস্তানকে একটি রাজনৈতিক কাঠামোতে আবদ্ধ করার জন্য তিনি বামিয়ানের নিকটবর্তী সীবার গিরিপথের মধ্য দিয়ে একটি সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। 'উত্তর সড়ক' নামে পরিচিত এই সড়কটি কেবলমাত্র প্রশাসনিক দক্ষতা ও একাগ্রতা এবং প্রকৌশলীদের নৈপুণ্যের প্রতীকই ছিল না। বরঞ্চ এটি উত্তরাঞ্চলে তুর্কীস্থান ও আমুর দরিয়া পর্যন্ত যাতায়াতের পথ সুগম করে। দাবা-ই-শিকারী গিরিশৃঙ্গ কেটে এই পথ নির্মাণ শেষ হয় ১৯৩৩ সালে নাদির শাহের মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে। উল্লেখ্য যে, আমানুল্লাহ এই গিরিপথ নির্মাণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে নাদির শাহই সর্বপ্রথম আমুর দরিয়ার সাথে সিন্ধু উপত্যকার সড়কযোগে সংযোগ স্থাপনে কৃতিত্ব অর্জন করেন।

পররাষ্ট্র নীতি ঃ বাদশাহ নাদির শাহ নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির অবলম্বন করেন এবং আফগানিস্তানকে একটি 'মধ্যবর্তী রাষ্ট্রের' (buffer state) মর্যাদা দেন। তিনি শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অনধিকার হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। তিনি আমানুল্লাহ মত সময়ের প্রয়োজনে দোদুল্যমান পররাষ্ট্রনীতি বর্জন করেন; কারণ তিনি প্রয়োজনে রুশ এবং প্রয়োজনে ব্রিটিশদের সমর্থন কামনা করেন। এই দ্বৈত নীতির স্থলে নাদির শাহ ভারসাম্যতা বজায় রাখার উপর জোর দেন। এই কারণে তিনি সেনাবাহিনী থেকে সমস্ত রুশ সৈন্য বা বৈমানিক প্রত্যাহার করেন এবং তার রাজ্যে কোন ব্রিটিশ নাগরিককে চাকরি দেননি। তিনি স্কুলে ইংরেজি পড়ানোর জন্য ভারতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

নাদির শাহের হত্যা ঃ নাদির শাহের রাজত্বের শেষার্ধে চারখাই উপজাতীয় নেতা এবং আমানুল্লাহর শাসনামলে মস্কোয় নিযুক্ত আফগান রাষ্ট্রদূত গোলাম নবী সরকার উৎখাতের এক ঘৃণ্য চক্রান্ত করেন। উল্লেখ্য যে, উপজাতীয় আফগান নেতৃবৃন্দ সর্বদা ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আমানুল্লাহর পতনের পর তাঁরই বিশ্বস্ত অনুচর গোলাম নবী রুশ সরকারের সমর্থনে আমুর দরিয়া পার হয়ে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে অভিযান করেন। কিন্তু তিনি মাজার-ই-শরীফ পার হয়ে কাবুল অভিমুখে যাত্রা করতে পারেন নি। ফলে ক্ষমতা দখলের প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ১৯২৯ সালের পর গোলাম নবী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। নীতিজ্ঞানবর্জিত গোলাম নবী ১৯৩২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বিদেশে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তিনি অনুতপ্ত হয়ে নাদির শাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে তার আনুগত্য স্বীকার করেন এবং কাবুলে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি চান। অক্টোবর মাসে তিনি শাহের দরবারে উপস্থিত হন। কিন্তু

www.pathagar.com

তার আচরণ ও কার্যকলাপে শাহ সন্দেহভাজন হন। তাকে অবসর ভাতা দিয়ে দেশত্যাগের নির্দেশ দেন কিন্তু গোপনে তিনি দক্ষিনাঞ্চলে শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিতে থাকেন। গোলাম নবীকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। এই মৃত্যুদন্ডের ফলে পাঠানদের দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী উপজাতি চারখাই এবং মুসাহিবানদের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হয়। আমানুল্লাহর সমর্থক গোলাম নবীর সহচরেরা শাহের ব্রিটিশপ্রীতি ও স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ফলে শাহ দমননীতি দ্বারা বিপ্লবীদের রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ বন্ধের চেষ্টা করেন। এদিকে নাদির শাহের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত ১৯৩৩ সালের ৮ই নভেম্বর দিলখুশা প্রাসাদের একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের সময় তিনি গোলাম নবীর এক পুত্রের গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।

কৃতিত্ববিচার ঃ ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ নাদির শাহ, যিনি আমানুল্লাহর মত 'His Majesty' উপাধি গ্রহণ করেন, আফগানিস্তানের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণকারী সময়ে আবির্ভূত হন। আমানুল্লাহর সিংহাসন ত্যাগে 'বাচ্চা-ই-সাকার' প্ররোচনায় যে অস্বাভাবিক রাজনৈতিক অচলাবস্থায় বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার সূচনা হয় ঠিক সেই মুহূর্তে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনে তিনি কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালীন সময়ে আফগানিস্তানে তাঁর মত যোগ্য ও অভিজ্ঞ বেসামরিক এবং সামরিক কার্যকলাপে দক্ষ ব্যক্তি ছিলনা। অভিমানী দেশপ্রেমিক পাঠানগণ 'বাচ্চা-ই-সাকার' মত একজন তাজিককে (তাজাকিস্তানের অধিবাসী) নেতা হিসেবে গ্রহণ করেনি। অপরদিকে দূররানী বংশের সুনাম থাকায় তিনি আফগানদের নিকট থেকে সমর্থন লাভ করেন। পায়েন্দা খানের উত্তরাধিকারী হিসেবে দূররানী বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তিনি আফগানিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাই আনেননি বরং দূররানী বংশের শাসনকে সুদূরপ্রসারী করেন; কারন তাঁর মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র জহির শাহ কাবুলের অধিপতি নির্বাচিত হন। সংগঠক ও প্রশাসক হিসেবে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনঃবিন্যাস করেন এবং বিদ্রোহ দমন করে সমগ্র দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা কায়েম করেন। তিনিই প্রথম জাতীয় সংসদ, পরামর্শ সভা ও মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করেন। সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন না করে তিনি শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হন, সামরিক বাহিনীকে সুগঠিত করেন এবং যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নতিকল্পে সড়ক বিশেষ করে 'উত্তর সড়ক' নির্মাণ করেন। তিনি ইসলামের পরিপন্থী কোন সংস্কার প্রবর্তন করেননি এবং মোল্লাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। ইসলাম বিশেষ করে হানাফী সম্প্রদায় তাদের মর্যাদা ফিরে পান। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষতা এবং ভারসাম্যতাকে গুরুত্ব প্রদান করেন কারণ তিনি আফগানিস্তানকে একটি মধ্যবর্তী (buffer) স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিনত করতে চান। তিনি বিদেশী ঋণের উপর নির্ভরশীল ছিলেননা। আফগানিস্তানের উন্নতি, প্রগতি ও স্থিতিশীলতার মূলে নাদির শাহের পাশাপাশি দেশপ্রেমিক তার ভাইদের অবদানও কম ছিলনা, বিশেষ করে ওয়ালী খান, হাশিম খান ও শাহ মাহমুদের।

www.pathagar.com

নাদির শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে ফ্রেজার টাইটলার যে মন্তব্য করেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, একটি পতনোন্মুখ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনগ্রসর জাতিকে একটি প্রগতিশীল ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার কৃতিত্ব অর্জন করেন তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক এবং পারস্যে রেজা শাহ্ পাহ্লভী। অবশ্য রেজা শাহ্ এবং আফগানিস্তানের আমানুল্লাহ্র আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশের জন্য ফলপ্রসূ হয়নি। যে অর্থে একজন শাসককে 'মহান' বলা যায় যে অর্থে নাদির শাহ্কেও 'মহান' বলা যেতে পারে যদিও তিনি সমসাময়িক ইতিহাসে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি। ফ্রেজার টাইটলার এজন্য আক্ষেপ করে বলেন যে, "তৃতীয় ইসলামী রাষ্ট্রে (আফগানিস্তানে) তুরস্ক এবং ইরানের পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এমন এক ক্ষণজন্মা ব্যক্তির আবির্ভাব হয় যিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অনগ্রসর জাতিকে ধীরে ধীরে সবার অলক্ষ্যে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেন।" (The world has never noticed the fact that there was a third Islamic country whose ruler in his quiet, methodical, far-seeing way was rescuing it in the early thirties from disruption and laying within it firm foundations for the structure of a modern state and for the maintenance of the peace of Central Asia.)

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

বাদশাহ্ জহির শাহের শাসন

জহির শাহের সিংহাসনরোহণ ঃ ১৯৩৩ সালে আততায়ীর হস্তে নাদির শাহ্ নিহত হলে তার উনিশ বৎসর বয়স্ক পুত্র জহির শাহ্ সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি ফ্রান্সে শিক্ষা লাভ করে ১৯৩০ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু রাজকার্যে অনভিজ্ঞতার জন্য তিনি তার চাচা প্রধানমন্ত্রী সর্দার হাশিম খানের অধীন ছিলেন। মূলত হাশিম খান ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের একচ্ছত্র শাসক ছিলেন।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ হাশিম খান প্রশাসনিক মেধা এবং কূটনৈতিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সাথে নাদির শাহের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থার মোকাবেলা করেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে নাদির শাহ্। যখন তাঁর গৌরবের সোপনে আরোহণ করছিলেন ঠিক সেসময়ে একজন আতাতায়ীর বুলেটে তার জীবনাবসান ঘটে। তাঁর সুযোগ্য ও প্রশাসনে অভিজ্ঞ ভাই হাশিম খান ১৯৩৫ সালে নাদির শাহের অনুসৃত নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রয়াসী হন। রাজপ্রতিনিধি এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্দার হাশেম মূলতঃ দু'টি নীতি অবলম্বন করেন ঃ

১. একটি শক্তিশালী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী গঠন করে রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা কায়েম করা।

২. উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দেশের রাজস্ব ব্যবস্থার বিন্যাস। এই উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য শিক্ষার বিস্তার, ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ, সামরিক বিদ্যালয় এবং কারিগরি ইনসষ্টিটিউট স্থাপন। এছাড়া জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে চিকিৎসা শিক্ষার প্রসার ও চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন। সঠিক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে জলসেচ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কৃষি উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য জলসেচ, বিশেষ করে জলবিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রবর্তন রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে প্রাধান্য পায়। নাদির শাহ্ যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে সড়ক বিশেষ করে 'উত্তর সড়ক' নির্মাণ করেন। বিদ্রোহদমনে সেনাবাহিনীর তড়িত গড়িতে অভিযান করার সুবিধার্থে সড়ক নির্মাণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রচলন করা হয় এবং অর্থনৈতিক প্রগতির লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

পররাষ্ট্রনীতি ঃ আবুদর রহমান এবং হাবিবুল্লাহর ব্রিটিশ সরকারের ভাতা লাভ করলেও আমানুল্লাহ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ভাতা গ্রহণ করেননি। আফগানিস্তানকে একটি মধ্যবর্তী রাষ্ট্রে (buffer state) পরিণত করার জন্য বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বিরোধী নীতি অবলম্বন করা হয়। ডুরান্ড লাইন বরাবর সীমান্ত রেখা লঙ্ঘিত হয়নি এবং নাদির শাহের পররাষ্ট্র নীতি তার ভাই প্রধানমন্ত্রী সর্দার হাশেম অনুসরণ করেন। জহির শাহের শাসনামলে আফগানিস্তানে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে বিশেষ

www.pathagar.com

পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গঠনমূলক ও জনহিতকর সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আফগান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সামরিক বাহিনী পুনঃগঠনের জন্য নাদির শাহ ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে ১০,০০০ রাইফেল এবং ১৮০,০০০ পাউন্ড নগদ অর্থ লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি আর কোন বৈদেশিক সাহায্য লাভ করেননি। জহির শাহের রাজত্বকালে সর্দার হাশিম ব্রিটিশ এবং রুশ সরকারের সাহায্য গ্রহণ না করে জার্মানীর অর্থ ও কারিগরি সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৯৩৫ সালে এই পদক্ষেপ যে কত বিপদজনক ছিল তা ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার প্রাক্কালে প্রতীয়মান হয়। আফগান সরকারের আহবানে ১৫০ জন জার্মান প্রকৌশলী ও কর্মী পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করে। এছাড়া বস্ত্র ও পশম কারখানা নির্মাণে তারা সাহায্য করে। উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তানের সর্বাপেক্ষা লাভজনক রপ্তানি ছিল কারাকুল বা ভেড়ার পশম। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা, রক্ষণশীল মনোভাব এবং মূলতঃ উপজাতীয়দের প্রভাব আফগানিস্তানের শিল্পায়নকে ব্যহত করে। এই কারণে সর্দার হাশেম ধীরগতিতে প্রভাবশালী ধর্মীয় গোষ্ঠীর (মোল্লা) বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে আফগানিস্তানকে একটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিনত করার প্রয়াস পান।

শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ রক্ষণশীল আফগান জাতি আধুনিক ও অভিনব সংস্কারসমূহের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন ছিল এইজন্য যে, তাদের ধারণা ছিল শিল্পায়ন, আধুনিকীকরণ, ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, যোগাযোগ, টেলিগ্রাফ ও ব্যবসা বাণিজ্য তাদের স্বার্থের হানি করতে পারে। এতদসত্ত্বেও জহির শাহের শাসনামলে আফগানিস্তানে শুল্ক ব্যবস্থা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম শুল্ক অফিস ও আদায় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। গিলজাই উপজাতীরা এর বিরোধীতা করলে সরকার বাণিজ্য পথে সুরক্ষিত দুর্গ বা নিয়ন্ত্রণ টাওয়ার নির্মাণ করেন। ১৯৩৭ সালে দুর্ধর্ষ গিলজাই সম্প্রদায় বিদ্রোহ করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ধর্মীয় নেতাগণ আফগানিস্তানে আধুনিক শিক্ষার বিরোধিতা করলেও জহির শাহের রাজত্বকালে বিভিন্ন শহরে স্কুল ও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে চিঠি আদান-প্রদান বা মেইল চালু হয়। অভ্যন্তরীণ চিঠি আদান-প্রদান ও টেলিগ্রাম ও টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয়।

উপজাতীয় বিদ্রোহ ঃ প্রধানমন্ত্রী হাশিম খানের দূরদর্শিতায় আফগানিস্তান একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হতে থাকে। কিন্তু উন্নতি, প্রগতি ও আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা উপজাতীয় বিদ্রোহের দরুন ব্যহত হয়। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিদ্রোহের সূচনা হয় গিলজাই সম্প্রদায়ের মধ্যে। সাদ আল-ফাইলানী ওরফে শামী পীর একজন প্রভাবশালী উপজাতীয় নেতা ছিলেন। আমানুল্লাহর সমর্থক হিসেবে তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ওয়াজিরিস্তানে গমন করে উপজাতীয়দের ক্ষিপ্ত করে তোলেন। আফগান সরকার ভারতীয় সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানায়। এতদসত্ত্বেও শামী পীর মাহমুদ ও ওয়াজিরী উপজাতীয়দের সমর্থনে তার শক্তি বৃদ্ধি করে জহির শাহকে বলপূর্বক সিংহাসনদখলকারী (usurper) হিসাবে ফতোয়া দেন। ব্রিটিশ সরকার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিদ্রোহ আশঙ্কিত হলে আফগান সরকারের সঙ্গে কোন প্রকার

www.pathagar.com

মুখোমুখি সংঘর্ষে না গিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও অর্থ-প্রদান করে। শামী পীরকে ডুরান্ড লাইন অতিক্রম করে আফগানিস্তানে প্রবেশ থেকে বিরত রাখেন। শামী পীরের মত ইপির ফকীর উপজাতীরা বিদ্রোহের প্রয়াস পান। কিন্তু তাকে নিরস্ত করা হয় এবং সীমান্তবর্তী দূর্গসমূহে আরও সৈন্যসামান্ত পাঠিয়ে সুরক্ষিত করা হয়।

রাজতন্ত্রের অবসান ঃ ১৯৩৩ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বাদশাহ্ জহির শাহ আফগানিস্তানের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি খুবই দুর্বল, ক্ষমতাহীন, অযোগ্য শাসক ছিলেন এবং এ কারণে তিনি শাসনভার তার নিকট আত্মীয়দের উপর ন্যস্ত করেন। তার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন যুবরাজ মোহাম্মদ দাউদ। দাউদ জহির শাহের চাচাতভাই এবং শ্যালক ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তার সম্বন্ধে থমাস, টি. হ্যামণ্ড বলেন, "Daoud was a fairly enlightened, forward looking administrator, who built up the economy and expanded education." তিনি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সংবিধানসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। তিনি বাদশাহ্ জহির শাহের নিকট অসংখ্য পত্রে এই সমস্ত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান। কিন্তু তা রাজা গ্রাহ্য করেননি। ফলে জাহির শাহের সঙ্গে দাউদের মত বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের মূল কারণ ছিল পুশতুনিস্তান ইস্যু এবং রাশিয়ার সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক। এর ফলে তিনি ১৯৬৩ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেন এবং নির্ভৃতে আফগানিস্তানের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। দাউদের পদচ্যুতিকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, রাজা জহির শাহ দাউদকে পদচ্যুত করেন; কারণ তিনি ক্রমশঃ উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু হতে থাকেন। উল্লেখ যে, দাউদকে অপসারিত করে জহির শাহ্ জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য দাউদ কর্তৃক সুপরিশকৃত সংস্কারসমূহ প্রবর্তন করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে তিনি তথাকথিত "নতুন গণতন্ত্র নীতিমালা" (New Democracy Program) জারী করেন। এই প্রোগ্রামে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ (১) সংবিধান, (২) পরিষদ, (৩) নির্বাচন, (৪) সংবাদপত্র-এর স্বাধীনতা, (৪) রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা।

রাজনৈতিক দল ঃ বাদশাহ্ জহির শাহের উদারনীতির প্রতিফলনে আফগানিস্তানে নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "পিপলস ডেমোক্রাটিক পাটি অব আফগানিস্তান" (PDPA)। ১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারি এই দল গঠিত হয় এবং এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নূর মোহাম্মদ তারাকী, যিনি আফগানিস্তানের প্রথমে কমিউনিষ্ট সরকারের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। PDPA-এর অপর প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন হাফিজুল্লাহ্ আমীন। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, আমীন তারাকীর স্থলাভিষিক্ত হন। তৃতীয় বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন বারবাক কারমাল। তিনি কট্টরপন্থী কমিউনিষ্ট ছিলেন এবং কথিত আছে যে, তাকে কারমাল বলা হত "Karl Marx Lenin" (Karmal) থেকে। তিনি সম্ভবত KGB নামক সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশ সংস্থার সদস্য ছিলেন। জহির শাহের ঘোষিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সুযোগ PDPA খালিক (Khaliq) নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশ করে। এই পত্রিকার ১৯৬৬ সালে ১১

www.pathagar.com

এপ্রিল থেকে ১৬ই মে পর্যন্ত মোট ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭ সালে PDPA এ বিভক্ত হয়ে দু'টি দলে পরিণত হয়ে যায়। একটি মূল 'খালক'-এর নেতা ছিলেন তারাকী এবং অপরটি পারচাম (Parcham)-এর নেতৃত্ব দেন বারবাক। আদর্শগত প্রভেদ না থাকলেও তারাকীর 'খালক' সোভিয়েত ঘেঁসা ছিল। অপরদিকে 'খালক' অপেক্ষা 'পারচাম' জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ছিল। উপরন্তু, 'খালক'-এর সদস্য ছিল অধিকাংশ পুশতু ভাষাভাসী জনগোষ্ঠী, অন্যদিকে পারচাম পারস্য ঘেঁষা ছিল।

জহির শাহের পদচ্যুতি ও দাউদের ক্ষমতালাভ ঃ রাজা দাউদের "নতুন গণতন্ত্র" প্রোগ্রাম ছিল একটি রাজনৈতিক চাপ এবং এর কার্যকারিতা প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬৫-৬৯ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভোটারদের সংখ্যা ছিল খুবই স্বল্প। ১৯৬৪ সালের সংবিধান বাদশাহের অসীম ক্ষমতাকে হ্রাস করেনি। গণ পরিষদের কার্যকরি সংহতি ও ঐক্যের অভাবে ব্যাহত হয়। এই সংবিধানের একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, রাজ পরিবারের কোন সদস্য উচ্চপদে সমাসীন হতে পারবেনা। দাউদ এই অনুচ্ছেদটি জহির শাহের ব্যক্তিগণ আক্রোশ হিসেবে চিহ্নিত করেন। দাউদ দশ বছর প্রশাসনিক সংগঠনে অসামান্য অবদান রাখেন। কিন্তু এই অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনি রাজ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হন। ফলে তিনি বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেন। তিনি সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের সমর্থন লাভ করেন। দাউদকে সামরিক বাহিনীর সমর্থনের পিছনে কতকগুলি কারণ ছিল ঃ (১) দাউদ নিজেও একজন লেঃ জেনারেল ছিলেন; (২) তার সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর ছিল; (৩) সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তিনি সামরিক বাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র আনেন। দাউদ আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। এদের মধ্যে 'খালক', 'পরাচাম' ও সামরিক বাহিনী অন্যতম। ১৯৭৩ সালের ১৭ই জুলাই বাদশাহ জহির শাহ ইসচিয়াতে (Ischia) যখন কাদা গোসলে (Mud bath) ব্যস্ত ছিলেন তখন দাউদ সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতা দখল করেন। তিনি কযেক ঘন্টার মধ্যে একটি রক্তপাতহীন 'ক্যু' (bloodless coup) সংঘটিত করেন। দাউদ কাবুলের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক ঘাঁটিসহ দখল করে ঘোষণা করেন যে, "আফগানিস্তানকে" একটি ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শ ভিত্তিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করা হবে। তিনি সমাজ থেকে সকল দুর্নীতি নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধারে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং আফগান প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা লাভ করেন। এর ফলে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়। সমালোচকদের ভাষায়, দাউদ আফগানিস্তানের মত রক্ষনশীল ও দ্বিধাবিভক্ত সমাজের ঐক্যের প্রতীক রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে একটি মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল (blunder) করেন। অবশ্য তিনি রাজবংশের সদস্য হিসেবে নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষনা দিতে পারতেন।

বাদশাহ মোহাম্মদ জহির শাহের পতনে দোস্ত মোহাম্মদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর উত্তরসূরী মোহাম্মদ জাই গোত্রের হলেও তিনি রাজতন্ত্রের পরিবর্তে আফগানিস্তানে একটি প্রজাতন্ত্র কায়েম করেন, যদিও তা রুশ প্রভাবান্বিত কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র এবং সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপে নির্মূল হয়ে যায়।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

সরদার দাউদ খানের শাসন

সরদার দাউদ (১৯৭৩-৭৮) ঃ ১৯৭৩ সালে দাউদ ক্ষমতালাভ করে রাজনেতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হন। বলপূর্বক ক্ষমতালাভে সমর্থন করে পারচাম পার্টি এবং স্বাভাবিক কারণেই তিনি এই দলের সদস্যদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা দেন। এর ফলে 'খালক' ও 'পারচাম' দলের মধ্যে বিদ্বেষ সুদূরপ্রসারী হয়। ক্রমশঃ দাউদের শাসনামলে কমিউনিষ্ট পন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। দাউদ যদিও ডানপন্থী রাজনীতি পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৯৭৭ সালে তিনি একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কিন্তু নির্ধারিত সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রী গ্রহণ না করে তার রাজপরিবার বন্ধু-বান্ধব ও চাটুকারদের মধ্যে থেকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। এছাড়া এই সংবিধানে একটি পার্টির শাসনের নীতিমালা ছিল, বহু পার্টি (multi-party) নহে। ফলে কেবলমাত্র "জাতীয় রেভল্যুশনারী পার্টি" (National Revolutionary Party) বহাল ছিল। দাউদ এই কমিটির কেন্দ্রীয় পরিষদে নিজে মনোনয়ন দান করে অগনতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

পররাষ্ট্র নীতি ঃ সরদার দাউদ ক্ষমতা লাভ করে পররাষ্ট্র নীতির আমূল পরিবর্তন করেন। পূর্বে আফগানিস্তান সোভিয়েত প্রীতির উপর পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে, কিন্তু দাউদ রাশিয়ার প্রভাব হ্রাস করার জন্য পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন করে পাকিস্তান ও ইরানের দিকে ঝুঁকে পড়েন। অবশ্য প্রথম দিকে তার সাথে পুশতুন সমস্যাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ বাধে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে সমঝোতা করে পুশতুন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। ক্রমশ তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দেন এবং ক্রমশ পাশ্চাত্য ঘেঁসা হতে থাকেন। এই সময়ে দাউদ ইরানের শাহের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করেন। শাহ আফগানিস্তানকে রুশ প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য সাহায্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। অবশ্য এই সম্পর্ক পরিশেষে দাউদের পদচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়াই। ওয়াশিংটন পোষ্টের রিপোর্টার হ্যারিসন বলেন, "The Shah, not the Kremlin, touched off Afghan coup"। ১৯৭৮ সালে দাউদ দেশীয় কমিউনিষ্ট তথা রুশ বিরোধী কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার ফলে তার বিপর্যয় ঘটে। যে সমস্ত কারণে দাউদের পতন হয় তা নিম্নে বর্ণিত হল।

দাউদের পতনের কারণ ঃ

১. দাউদ মিশর, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠান, অবশ্য রাশিয়ায়ও পাঠান হত; কিন্তু দাউদের পাশ্চাত্য প্রীতি এই পদক্ষেপে প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

২. তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই নীতি মস্কোর ক্রেমলিনের শাসকদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি কারণ তারা সর্বদা আফগানিস্তানকে তাদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করে।

৩. ১৯৭৮ সালে দাউদ ভারত, মিশর, লিবিয়া, তুরস্ক, পাকিস্তান সফর করেন। এছাড়া তিনি সাউদী আরব, কুয়েত, সফর করেন। দাউদ শাহ্‌কে কাবুলে আমন্ত্রণ জানান এবং নিজে ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট কার্টারের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তার উদ্দেশ্যে ছিল রাশিয়ার প্রভাব থেকে আফগানিস্তানকে দূরে রাখা।

৪. চীনের শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের সাথে আফগানিস্তানের বাণিজ্যিক ও যোগাযোগ রক্ষার জন্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইলে ক্ষুব্ধ হয়।

৫. ১৯৭৮ সালের পদচ্যুতির কিছুদিন পূর্বে দাউদ সাউদী আরবে সফরকালে একটি যৌথ ইস্তেহারে বলেন, যে ইথিওপিয়া এবং সোমালিয়ার সমস্যা আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির ছায়ায় সমাধান করতে হবে। এই ঘোষণায় রুশ প্রশাসন বিচলিত হয়ে পড়ে।

একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, দাউদ কর্তৃক পররাষ্ট্রনীতি ক্রমশ আফগানিস্তানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর থেকে নির্ভরশীলতাকে হ্রাস করে (increasingly independent of the Soviet Union)।

রুশ-আফগান দ্বন্দ্ব ঃ আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি রুশ বিরোধী এবং পাশ্চাত্য ঘেঁসা মনে হলেও দাউদের পক্ষে ক্ষমতা রক্ষা করা ছিল খুবই দুষ্কর। এতদসত্ত্বেও তিনি রুশ-আফগান দ্বন্দ্বের অবসানকালে ১৯৭৭ সালে তুরস্কে সফর করেন এবং চুক্তি স্বাক্ষর করেন (Treaty on Development of Economic Cooperation)। রুশ প্রধানমন্ত্রী ব্রেজনেভ আপাতঃদৃশ্যে দাউদের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হলেও প্রকাশ্যে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

সামরিক অভ্যুত্থানের (ক্যু) কারণ ঃ পররাষ্ট্রনীতি ব্যতিরেকে দাউদ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। তিনি ক্রমশ স্বৈরাচারী হয়ে উঠেন এবং তার বিভ্রান্তিকর গণতান্ত্রিক নীতি (Pseudo-democracy–PDP) বিফল হয়। ১৯৭৮ সালের সোভিয়েত সমর্থিত 'ক্যু'র এর মূলে কতকগুলো কারণ ছিল ঃ

১. দাউদের পতনকে ত্বরান্বিত করার জন্য 'খালক' ও 'পারচাম' দল সংঘবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। দাউদের একনায়কত্ব প্রমাণিত হয় ন্যাশনাল রেভল্যুশনারী পার্টির গঠনে।

২. রুশ সরকার আফগানিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির মাধ্যমে পাশ্চাত্য ঘেঁসা দাউদের উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করে।

৩. দাউদ মুসলিম ব্রাদারহুদ দলের সদস্যদের কার্যকলাপ বন্ধ করে রক্ষণশীল ও গোঁড়াপন্থী মুসলিম গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হন।

www.pathagar.com

৪. অর্থনৈতিক মন্দা ও সঙ্কট এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, আফগানিস্তান দেউলিয়া হয়ে যায়; ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকে না এবং অসংখ্য আফগান চাকরির অন্বেষায় মধ্যপ্রাচ্যে যেতে বাধ্য হয়।

৫. দাউদের স্বজনপ্রীতি ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি মন্ত্রী সভায় নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়োগ করেন এবং তার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করে।

'ক্যু', ১৯৭৮ ঃ এই সমস্ত কারণে দাউদকে উৎখাতের জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়। PDPA এর সদস্যবর্গ সংঘবদ্ধভাবে দাউদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর সাহায্য ও সমর্থনে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এই ষড়যন্ত্রের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন তারাকি ও হাফিজুল্লাহ আমীন। ১৯৭৮ সালের ১৯শে এপ্রিল এই ষড়যন্ত্রের শুরু হয়। যখন PDPA প্রখ্যাত কমিউনিষ্ট নিহত নেতা মির আকবর খায়বারের শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই শোকসভায় কমিউনিষ্টদের সংখ্যা এবং আমেরিকা বিরোধী শ্লোগানে দাউদ বিচলিত হয়ে আমীন, তারাকীসহ প্রধান বিদ্রোহী নেতাদের গ্রেফতার করেন। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, সেনা ও বিমান বাহিনীর সদস্যবর্গ ষড়যন্ত্রকারীদের সমর্থন দান করছে। মূলত এই সামরিক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন কর্ণেল আসলাম ওয়াতানজা এবং কর্নেল আবদুল কাদের। ২৭শে এপ্রিল ট্যাংক দ্বারা প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ পরিবেষ্টিত হয়। প্রাসাদে বোমা বর্ষণ করা হয়। ইত্যবসরে ষড়যন্ত্রকারীরা সামরিক ও বেসামরিক ঘাঁটি দখল করে রেডিওর মাধ্যমে প্রচারিত হয় যে, মুহম্মদ জাই গোত্রের সালতানাত চিরকালের জন্য উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং ক্ষমতা এখন জনগণের হস্তে ন্যস্ত। ১৯৭৮ সালের ২৮শে এপ্রিল প্রাসাদ রক্ষাকারী রিপাবলিকান গার্ড আত্মসমর্পণ করে। দাউদ আত্মরক্ষার সর্বশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা সপরিবারে নিহত হন। আফগানিস্তানের শাসনভার একটি 'রেভলিউশনারী কাউন্সিলের' উপর ন্যস্ত হয়। এই কাউন্সিলের প্রধান ছিলেন তারাকী। এভাবে দাউদকে উৎখাত করা হয়। যদিও তারাকী বলেন যে, 'এটি সামরিক অভ্যুত্থান নয়' ("Not a putsch or a coup but a revolutionary act of reason")। তবুও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, দাউদের পতনের আফগানিস্তানের সোভিয়েত আধিপত্য, শাসন ও একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারাকী, কারমাল ও আমীন রুশ প্রতিষ্ঠিত ক্রীড়ানক ছিলেন মাত্র। এটি প্রমাণিত হয় ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে রুশ বাহিনীর আফগানিস্তানে অভিযান ও আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে।

একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর আগ্রাসন নীতির ফলেই আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিলীন হয়ে এটি একটি রুশ শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। রুশপন্থী কমিউনিষ্ট নেতৃবর্গ ষড়যন্ত্র করে আফগানিস্তানের রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করে একে রাশিয়ার একটি satellite state বা তাবেদার রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

তালেবান সরকার ও মার্কিন আগ্রাসন (১৯৯৬-২০০১)

রোজনামচা (ডেটলাইন)

১৯৩৩-৭৩ ঃ বাদশাহ জহির শাহ (প্রেক্ষাপট)

পৃথিবীর অন্যকোন দেশে আফগানিস্তানের মত এত দ্রুত ও ঘন ঘন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়নি। বিংশ শতাব্দরি মধ্যভাগে পিতার মৃত্যুর পর জহির শাহ ১৯৩৩ সনে সিংহাসনে বসলেও উনিশ বছর বয়স্ক যুবকের পক্ষে শতধাবিভক্ত আফগানিস্তানে শাসনভার গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়নি। এ কারণে ১৯৫৩ সন অর্থাৎ বিশ বছর তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়। এ সময়ে তার চাচারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বিশ বছর অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে চাচারা শাসনকাজ নির্বাহ করার ফলে পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্রের সাথে আফগানিস্তান সংঘর্ষে জড়িত হয়নি বা বৈদেশিক আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ সন পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ মোহাম্মদের সময়ে আফগানিস্তানে নিরপেক্ষ নির্বাচন ও মুক্ত সাংবাদিকতার প্রচলন হয়। এর মধ্যে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে তথাকথিত সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধবাজ উপগোত্রীয় আফগানদের জন্য এটা ছিল সুসময়, যদিও গোত্রীয় কোন্দল অব্যহত ছিল।

১৯৫৩ সালে বাদশাহ জহির শাহের উচ্চাভিলাষী চাচাত ভাই এবং সেনাবাহিনীর প্রধান সরদার দাউদ রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ এবং ধর্মীয় নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর ফলে বাদশাহ নামে মাত্র শাসকে পরিণত হন। প্রধানমন্ত্রী দাউদ বাদশাহ জহির শাহকে পাশকাটিয়ে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে থাকেন।

সরদার দাউদের শাসনামলে শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং মহিলাদের অবরোধ (বোরকা) প্রথা মানা বাধ্যতামূলক ছিলনা। আফগান বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দ্বারা আধুনিকীকরণের জন্য আফগান সৈন্যদের রাশিয়ায় পাঠান হয়, দাউদের শাসনামলে পাকিস্তানের সাথে আফগানিস্তানের 'পাকতুন' সমস্যা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এর ফলে পাকিস্তান সীমান্ত পথ বন্ধ করে দিলে আফগানিস্তানে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। সোভিয়েত রাশিয়া পাক-আফগান বিরোধের সুযোগে উত্তর দিকে সালাং গিরিপথ হয়ে আমুর দরিয়া পর্যন্ত সড়ক নির্মাণে রাশিয়া এগিয়ে আসে। তারা সুড়ঙ্গপথ ও অসংখ্য পুল নির্মান করে কাবুলের সাথে সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করে। এর ফলেই পরবর্তীকালে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন সম্ভবপর হয়। পাকিস্তানের সাথে বৈদেশিক সম্পর্কের

www.pathagar.com

অবনতি, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং বাদশাহ্ জাহির শাহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন প্রভৃতি কারণে দাউদকে ইস্তফা দিতে হয়। এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, আত্মীয়তার সুযোগে (চাচাত ভাই) সরদার দাউদ ক্ষমতা কুক্ষীগত করেন। জহির শাহ্ শাসনতন্ত্রের কিছু কিছু পরিবর্তন আনেন। প্রথমত, ২১৬ সিটের জাতীয় সংসদের সরাসরি নির্বাচন। এ ছাড়া আফগানিস্তানের প্রধান উপগোত্রীয় সদস্যদের জন্য ৮৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ সভা (আপার হাউস), যা 'হাউস অব এলডারস' নামে পরিচিত গঠিত হয়। বাদশাহ্ জহির শাহের শাসনামলে রাজনৈতিক ও সংসদীয় সংকট দেখা দেয়। ১৯৬৪ সালে জাতীয় সংসদ শাসনতন্ত্র পাশ করলে ১৯৬৫ এবং ১৯৬৯ সালে দু'বার নির্বাচন হয়। নির্বাচনে দুটি পরস্পরবিরোধী দল সংঘাতের পর্যায়ে পড়ে– একটি কট্টর ইসলামপন্থী এবং অপরটি সোভিয়েত সমর্থিত সোসালিষ্ট পার্টি। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পাঁচজন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সোসালিষ্ট পার্টির মধ্যে দুটি দল ছিল একটি 'পারচম' এবং অপরটি 'খালক'। তারা পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পি. ডি. পি) নামে এক দলের সাথে নির্বাচনী জোট করে। 'খালক' পার্টির প্রধান ছিলেন নূর মোহাম্মদ তারাকি এবং পারচাম পার্টির প্রধান ছিলেন বারবাক কারমাল। নূর মোহাম্মদ তারাকি সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে এবং সংসদের বাইরে থেকে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস পান। অন্যদিকে বারবাক কারমাল রাজতন্ত্র উৎখাত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। ইসলামীপন্থী জোট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত হয়। কম্যুউনিষ্ট বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর বোরহানউদ্দীন রাব্বানী। ইসলামপন্থী দলে যোগ দেন গুলবদিন হিকমতিয়ার, দীন মোহাম্মদ, আহমদ শাহ মাসুদ, কাজী আমীন প্রমুখ। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক মেরুকরণ দেশটির জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। ইসলামপন্থী এবং কম্যুউনিষ্টপন্থী দুটি পরস্পরবিরোধী দলের মধ্যে সংঘাত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে রূপ নেয়।

১৯৫৩ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সরদার দাউদ প্রধানমন্ত্রী থাকার পর পদচ্যুত হন। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে রাজনৈতিক অরাজকতা দেখা দেয়। বিরাজমান রাজনৈতিক ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ যখন চরমে উঠল তখন বাদশাহ্ জহির শাহের বিদেশে অবস্থানের সুযোগে পদচ্যুত ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী এবং বাদশাহের চাচাত ভাই সরদার দাউদ সেনাবাহিনী নিয়ে জহির শাহের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে জহির শাহের রাজবংশ উচ্ছেদ করেন। ১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান (ক্যু) দ্বারা রাজবংশের অবসান হয়। দাউদ আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করলে বাদশাহ্ আফগানিস্তানে ফিরে আসেননি। বর্তমানে ৯০ বছর বয়সে ইতালিতে সপরিবারে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন।

১৯৭৩-৭৮ ঃ সরদার দাউদ

১৯৭৩ সালে ক্ষমতা দখল করে সরদার দাউদকে রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। এ সময়ে আফগানিস্তানে তিনটি রাজনৈতিক দল ছিল। প্রথমটি হচ্ছে দাউদ সমর্থিত মাওপন্থী বাম দল 'শোলো-ই-জায়িদ' দ্বিতীয়টি ইসলামপন্থী দল এবং তৃতীয়টি

পি.ডি.পি। দাউদের মস্কোপন্থী দল ইসলামপন্থীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে ইসলামপন্থী দলনেতা হিকমতিয়ার দাউদ কর্তৃক বন্দী হয়ে কারাবরণ করেন। দাউদের ছত্রছায়ায় কেজিবি নামের রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থা সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারে আফগানিস্তানে তৎপর হয়ে উঠে। ইসলামপন্থী নেতাদের নির্বিচার গ্রেফতার করে জেলে দেয়া হয়। অনেকে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য পাকিস্তানে আত্মগোপন করেন। দাউদের মস্কো ঘেঁসা পররাষ্ট্রনীতি পাকিস্তানকে হতাশ করে এবং পাকতুন সমর্থক দুই দেশের মধ্যে বৈরিতা বৃদ্ধি করে। পাকিস্তান গোপনে আফগানিস্তানের ইসলামপন্থী সংগঠনগুলোকে সক্রিয় সহযোগিতা দিতে থাকে। পাকতিয়া এবং নানগাহার প্রদেশে ইসলামী জঙ্গী তৎপরতা শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে মস্কোপন্থী এবং ইসলামপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ চরম আকারে দেখা দেয়। মস্কোপন্থীরা উত্তরে মাজার-ই-শরীফ এবং পাঞ্জশীর উপত্যকায় প্রাধান্য বিস্তার করে। অন্যদিকে পাকিস্তান ও সাউদী আরবের সহায়তায় ইসলাপন্থীগণ দক্ষিণ কান্দাহার এলাকায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে।

সরদার দাউদের স্বৈরাচারী শাসনের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায় যখন তিনি ইসলামপন্থী নেতাদের গ্রেফতার ও অপদস্থ করেন। ১৯৭৮ সাল চরমপন্থী এক নেতাকে হত্যা করা হয়। এর ফলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে দাউদ সরকার 'খালক' পার্টির নেতা নূর মোহাম্মদ তারাকি এবং হাফিজউল্লাহ আমীনকে গ্রেফতার করে। প্রতিহিংসা বশত দাউদ সরকার নূর মোহাম্মদ তারাকিকে গ্রেফতার করে প্রকাশ্যে চোখ বেঁধে হাতকড়া লাগিয়ে কাবুলের রাস্তায় প্যারেড করায়। এর ফলে মস্কোপন্থীর সাথে ইসলামপন্থীর দাঙ্গা বেঁধে যায়। ১৯৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল পিডিপি ('খালক' ও 'পারচাম') এর নেতৃত্বে এক অভ্যুত্থানে সরদার দাউদ ও তার পরিবার বিদ্রোহীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। এর ফলে দাউদের ক্ষমতার লিপ্সা মাত্র পাঁচ বছর স্থায়ী ছিল। এরপর ক্ষমতায় আসেন খালকপন্থী অপমানিত নেতা নূর মোহাম্মদ তারাকি। তিনি একাধারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বারবাক কারমাল প্রথম ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী এবং হাফিজউল্লাহ আমীন দ্বিতীয় ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই তিন নেতা 'গ্রেট সত্তর রেভলিউসান'-এর সূত্রপাত করেন। এই অভ্যুত্থানে সরদার দাউদ ক্ষমতাচ্যুতি ও নিহত হয়। লক্ষণীয় যে, যে প্রক্রিয়ায় সরকার দাউদ তাঁর চাচাত ভাই বাদশাহ জহির শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজক্ষমতা গ্রহণ করেন সেই একই প্রক্রিয়ায় তিনি ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। বাদশাহ জহির শাহ এখনও জীবিত আছেন এবং বৃদ্ধ বয়সে ইতালিতে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন।

১৯৭৮-৭৯ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তান

মস্কোপন্থী তারাকি, কারমাল ও আমীন দাউদকে উৎখাত করে ক্ষমতায় সমাসীন হলেও বেশিদিন আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি। তাদের বিরোধী ইসলামপন্থী দল বোরহানউদ্দীন রাব্বানীর নেতৃত্বে রুশ প্রভাব নিশ্চিহ্ন করার জন্য পি.ডি.পি-কে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নতুন সরকার উৎপীড়নমূলক কৃষি নীতি গ্রহণ করলে হাজার হাজার আফগান কৃষক নির্যাতনের স্বীকার হয়। ভূমি সংস্কারের নামে জমি রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্তকরণ ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বলে আখ্যা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

অত্যাচারের মাত্রা এমন বৃদ্ধি পায় যে, বহু আফগান পার্শ্ববর্তী ইরান ও পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। এই ঘটনা একদিকে যেমন রুশ প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভকে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযানে উৎসাহিত করে অন্যদিকে পাকিস্তানে আশ্রয়প্রাপ্ত আফগান উদ্বাস্তুদের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রদানের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এগিয়ে আসেন। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে রুশ ভালুকের ছায়াকে সীমিত পর্যায়ে রাখা। বাহ্যিকভাবে এই দুই পরাশক্তি সল্ট-২ চুক্তি করলেও রাশিয়া আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান পাঠাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

সরদার দাউদের পতন আফগানিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বহু কাঙ্ক্ষিত সুযোগ করে দিলেও রাজনৈতিক অনৈক্য ও সংঘাত আফগানিস্তানে রুশ অভিযানকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৭৮ সাল সংস্কারপন্থী আফগান সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রধানমন্ত্রী নূর মোহাম্মদ তারাকি আফগানিস্তানে প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে রুশ পরিদর্শক ও উপদেষ্টা নিয়োগ করতে থাকেন। কে. জি. বি. নামে রুশ গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের প্রকাশ্যে কাবুলের রাস্তায় দেখা যেতে থাকে। আফগানিস্তানে সংস্কারপন্থীদের দাপট বাড়তে থাকে। তারাকির সময় থেকে এবং এর বিপরীতে ইসলামপন্থীগণ পাকিস্তানের সহায়তায় গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এদিকে পি.ডি.পি-র দুটি প্রতিষ্ঠান 'খালক' ও 'পারচাম'-এর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। এ ধরনের টানা-পোড়নের মধ্যে কাবুলে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের প্রধান রাষ্ট্রদূত এডলফ ডাবসকে প্রথমে অপহরণ এবং পর হত্যা করা হয়। এর ফলে পরিস্থিতি পালটে যায়। এই হত্যাকান্ডের জন্য আফগানিস্তানে অবস্থানরত কে. জি. বি.-র সদস্যদের দায়ী করা হয়। তারাকির অধীনে দ্বিতীয় ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী হাফিজউল্লাহ আমীন আইন ব্যবস্থার সংস্কার করতে গিয়ে জনপ্রিয়তা হারান। তখন রুশ সেনাসদস্যগণ কাবুলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে আফগানিস্তানের সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। বারবাক কারমালকে মস্কোতে আফগান রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানো হয় ১৯৭৮ সালের ২৮ মার্চ। তারাকি রাষ্ট্র প্রধান থাকেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ হাফিজউল্লাহ আমীনের অনুকূলে ছেড়ে দেন। হাফিজউল্লাহ আমীন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলে রাষ্ট্রপতি নূর মোহাম্মদ তারাকির সাথে দ্বন্দ্ব বাঁধে। অর্থাৎ পি.ডি.পি-এর দুই সংস্থা পরস্পর বিরোধী শিবিরে পরিণত হয়। খালক এবং পারচামদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি তারাকি কিউবা সফর শেষে হাভানা থেকে মস্কো যান। সেখানে তিনি সোভিয়েত নেতাদের সাথে আলোচনা করে হাফিজউল্লাহ আমীনকে অপসারণের জন্য অনুমোদন লাভ করেন। কিন্তু কাবুলে ফিরে এসে তার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। এর ফলে হাফিজউল্লাহ ১৯৭৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনী নিয়ে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ আক্রমণ করে তারাকিকে হত্যা করেন। ক্ষমতালোভী আমীনের পর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সকল ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করেন। মস্কোপন্থী রুশদের 'পরম বন্ধু' তারাকির মৃত্যু এবং আমীনের ক্ষমতা দখল এবং কুক্ষিগতকরণে সোভিয়েত রাশিয়া খুশী হতে পারেনি। এ কারণে ১৯৭৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর পূর্বে স্বাক্ষরিত মৈত্রী চুক্তির বশবর্তী হয়ে রাশিয়া আফগানিস্তানে সমরাভিযান করে। রুশ আগ্রাসন একটি স্বার্বভৌম দেশের শান্তি,

www.pathagar.com

নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা বিঘ্নিত হয়। রাশিয়ার তৈরি আমুরদরিয়ার উপর নির্মিত 'মৈত্রী পুল' পার হয়ে রুশ বাহিনী সরাসরি আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। যে রাতে রুশ সেনাবাহিনী ট্যাংক সহকারে কাবুলে প্রবেশ করে সে রাতে রাজধানীতে তিন ফুট বরফ পড়েছিল। 'ক্রিসমাস ডে' বা বড়দিনে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে পরাশক্তি রাশিয়া এক ন্যাক্কারজনক আগ্রাসনের ইতিহাস রচনা করে। ২৭ ডিসেম্বর বর্বরোচিতভাবে রুশ বাহিনী প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে প্রবেশ করে হাফিজউল্লাহ আমীনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তারাকি ও আমীন মৃত্যুবরণ করলে তিন নায়কের এক নায়ক বারবাক কারমাল, যিনি মস্কোতে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, আফগানিস্তানে এসে রেভ্যলিউশনারি কাউন্সিলের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পি. ডি. পি. এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৭৯-৮৯ ঃ আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য আফগানিস্তানে পরাশক্তির খপ্পরে পড়ার সবসময় সম্ভাবনা ছিল। পূর্ব ও দক্ষিণে পাকিস্তান, পশ্চিমে শিয়া অধ্যুষিত ইরান এবং উত্তরে কম্যুউনিষ্ট রাশিয়ার অবস্থানের ফলে স্থলপরিবেষ্টিত আফগানিস্তান খুবই বেকায়দায় পড়ে। মূলত ইরান ও আফগানিস্তান খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ দেশ হওয়ায় পরাশক্তির নজর এ দুই দেশে সব সময় ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুনজরে না দেখলেও অবস্থানগত সুবিধার জন্য রাশিয়ার মত বৃহত্তর পার্শ্ববর্তী দেশ সব সময় আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকে। মস্কোপন্থী সরকার আফগানিস্তানে শাসকের ভূমিকায় থাকলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অতি সহজে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে–এ ধারনার বশবর্তী হয়েই নূর মোহাম্মদ তারাকিকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হতে চাইতেন। দুটি দ্বিধা-বিভক্ত রাজনৈতিক শিবির ইসলামপন্থী এবং মস্কোপন্থী আফগানিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনকে উত্তপ্ত করে রাখে। এতদসত্ত্বেও অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাশিয়ার ভাল্লুকের ছায়া আফগানিস্তানে দীর্ঘায়িত হতে থাকে। এর অনেকগুলো কারণ ছিল, যেমন রুশ আফগান মৈত্রী চুক্তি, আফগানিস্তানের অবকাঠামোর উন্নয়নে রাশিয়ার অবদান, সেনাবাহিনী, প্রশাসন, সড়ক ও পুল, বিদ্যুৎ, গিরিপথ (সালাং) নির্মাণ। সরদার দাউদের সময় থেকে রুশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কে.জি.বি নামের রুশ গোয়েন্দা সংস্থার আফগানিস্তানে অবস্থান ও তাদের অপকীর্তি চলতে থাকে। কে. জি. বি. আফগান বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা করে। দাউদের রুশ প্রীতি তার জন্য কাল হয়ে দাড়ায়। তাছাড়া তিনি মস্কোপন্থী 'শোলো-ই-জায়িদ' পার্টিকে সমর্থন দিলে ইসলামপন্থী দল দাউদের রুশ প্রীতির জ্বলন্ত প্রমাণ পায়। হিকমতিয়ার ও হাফিজউল্লাহ আমীন দাউদের মস্কো নীতির প্রচন্ড বিরোধিতা করেন। ১৯৭৮ সাল দাউদ নিহত হলেও আফগানিস্তানে রুশ প্রভাব আরও তীব্র হয় কারণ মস্কোর তাবেদার নূর মোহাম্মদ তারাকি ক্ষমতাসীন হন। তারাকি আমীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে আমীন সামরিক অভ্যুত্থানে তারাকিকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন। পাশ্চাত্য ঘেষা ও হার্ভাডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমীন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব লাভ করলে রাশিয়ার টনক নড়ে। আমীন

www.pathagar.com

রাশিয়ার সঙ্গে সবসময় দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেন। এর ফলে আমীনকে উৎখাত করার জন্য রুশ নির্মিত সালাং গিরিপথ ধরে রুশ বাহিনী ১৯৭৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। আমুরদরিয়ার নদীর উপর নির্মিত পুলটি 'মৈত্রী পুল' নামে পরিচিত। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের ন্যাক্কারজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়। আফগানিস্তানে রুশ অভিযানের মাত্র তিন দিনের মাথায় অর্থাৎ ২৭ ডিসেম্বর প্রাসাদে প্রেসিডেন্ট হাফিজউল্লাহ আমীন নৃশংসভাবে নিহত হন। কাবুল দখলের পরে মস্কোতে অবস্থানরত আফগান রাষ্ট্রদূত বারবাক কারমানকে তাবেদার সরকারের প্রধান করা হয়।

রুশ আগ্রাসনের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির সমতা (Balance of power) মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। আফগানিস্তানে রুশ ভাল্লুকস্বরূপ সোভিয়েত বাহিনীর অবস্থানে একদিকে শিয়াপন্থী আয়াতুল্লাহ খোমেনীর কট্টরপন্থী ইরানী ইসলামিক রিপাবলিক সরকার অন্য দিকে সুন্নীপন্থী পার্শ্ববর্তী পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের মুরব্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশ বেকায়দায় পড়ে। জিমি কার্টার তেহরানে মার্কিন দূতাবাসে অবরুদ্ধ কর্মকর্তাদের মুক্ত করার চেষ্টায় ঝটিকা বাহিনী পাঠিয়ে মারাত্মক ভুল করেন। এ সঙ্কট কাটতে না কাটতেই আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীর উপস্থিতি রুশ-মার্কিন সম্পর্ককে আরও সঙ্কটজনক করে তুলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রুশ প্রতিপত্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য পাকিস্তানকে সমর্থনই করেনি, নানাবিধ সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। এ সময় ইরাক-ইরান যুদ্ধ (১৯৮০-৮৮) চলতে থাকায় ইরান আফগানিস্তানের দিকে বিশেষ মনযোগ দিতে পারেনি। এদিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ও প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পদচ্যুতি ও ফাঁসি দ্বারা হত্যা পাকিস্তানের মৌলবাদী প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের জন্য এক দুর্ভাগ্যজনক ঐতিহাসিক ঘটনা, যার জন্য পাশ্চাত্যে তিনি নিন্দিত হন। কিন্তু আফগানিস্তানে রুশ-আগ্রাসনের ফলে হাজার হাজার আফগান শরনার্থীর পাকিস্তানে আশ্রয়গ্রহণ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির জন্য অনুকূল ছিল না। জিয়াউল হক ঘৃণ্য ব্যক্তি হলেও রুশ বিরোধী মনোভাবের জন্য তিনি আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার পাকিস্তানে আফগান শিবির পরিদর্শন করেন এবং সকল প্রকার অনুদান প্রদানের অঙ্গীকার করেন। এ কারণে পাশ্চাত্যের কাছে পাকিস্তানী একটি ফ্রন্ট লাইন স্টেট হিসেবে পরিণত হন।

আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের অন্তরালে বিশেষ কয়েকটি কারণ ছিল। জারের সময় থেকে বিশেষ করে মহান পিটার এবং রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথেরীনের শাসনামল থেকে বরফে আবৃত রাশিয়া সবসময় তার নৌচলাচলের জন্য উষ্ণ পানির বন্দরের (warm water port) সন্ধানে থাকে। আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা ক্ষীন আশা ছিল যে হয়তো বা আরব সাগরে তারা passage বা যাতায়াতের রুট পাবে। এছাড়া সাম্রাজ্যবাদী নীতির বশবর্তী হয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ মস্কোপন্থী দাউদ সরকারের সাথে সখ্যতা স্থাপনে আগ্রহী হন। কিন্তু দাউদের মৃত্যুর পর নূর মুহম্মদ তারাকি ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে রুশ প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারাককির মৃত্যুর পর হাফিজউল্লাহ আমীন ক্ষমতা লাভ করলে ১৯৭৯

www.pathagar.com

সালে ৫ই ডিসেম্বরে রুশ-আফগান বন্ধুত্ব চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং এর উনিশ দিনের মাথায় সোভিয়েত বাহিনী মস্কো থেকে অভিযান করে কাবুলে প্রবেশ করে। কাবুল দখলের তিন দিন পরেই প্রসাদে হাফিজউল্লাহ আমীনের লাশ পাওয়া যায়। এরপর নতুন সরকার হিসেবে মস্কো বারবাক কারমালকে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগকারী।

সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত এবং স্বাধীনচেতা আফগানদের উপর কমিউনিষ্ট রাশিয়ার আধিপত্য মোটেই সুখকর ছিলনা। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তিতে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রসমূহে যেমন কাজাগিস্তান তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামী বিপ্লব ছড়ালে মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। এ কারণে সোভিয়েত সরকার আফগানিস্তান দখল করে বিপ্লবের গতিকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইরাক-ইরান যুদ্ধ, আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন এবং ইরানে মার্কিন বিরোধী বিপ্লবী সরকার, যারা আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে Great Satan বলে অভিহিত করে, গঠনের ফলে মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব প্রাচ্যে আমেরিকা খুবই নাজুক অবস্থায় ছিল। আমেরিকার রুশ বিরোধী কার্যকলাপ দুই পরাশক্তির মধ্যে দীর্ঘদিনের রেশারেশির ফল। কৌশলগত কারণে আমেরিকা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ১৯৭৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর রুশ বাহিনীর কাবুল দখল ইসলামপন্থীদের জেহাদ ঘোষণার ঘন্টাধ্বনি ছিল। যে সমস্ত ইসলামী গোষ্ঠী রুশ আগ্রাসনে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাদের "মুজাহেদীন" বলা হয়। এ সমস্ত মুজাহিদদের পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে থাকে। মিশর ও সাউদী আরব অর্থ দিয়ে আফগান মুজাহিদদের সাহায্য করে।

আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন মার্কিন মুলুকের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত এটি মর্যাদার (Prestige issue) লড়াই; দ্বিতীয়ত সমরাস্ত্রের প্রতিযোগিতার লড়াই এবং তৃতীয়ত কূটনৈতিক ও আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। সোভিয়েত বাহিনীর তুলনায় সংখ্যায় কম থাকলেও ইসলামপন্থী মুজাহিদদের মনোবল ছিল খুবই উঁচুতে। কৌশলগত (strategic) সুবিধা অবশ্যই রুশ বাহিনীর ছিল; কারণ তারা আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ছিল। অন্যদিকে রাইফেল নিয়ে গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় মুজাহিদ বাহিনী। মনঃস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মুজাহিদগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সাউদী আরব ও পাকিস্তানের সমর্থন ও সাহায্য লাভ করে। ১৯৭৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর রুশ বাহিনী কাবুল দখল করার চার দিন অর্থাৎ ২৮ ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট লিওনার্ড ব্রেজনেভকে একটি পত্রে আফগানিস্তান থেকে রুশ বাহিনী প্রত্যাহার ও আফগানে শরানার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দানের আহ্বান জানান। প্রত্যুত্তরে ব্রেজনেভ জানান যে, আফগানিস্তানের সাথে রাশিয়ার একটি মৈত্রী চুক্তির আওতায় আফগানিস্তানের অরাজকতাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য রুশ বাহিনী কাবুলে পৌছেছে। ব্রেজনেভ বলেন, "আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত চুক্তির অধীনে নেয়া দ্বি-পাক্ষিক কোন ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে তৃতীয় দেশের (আমেরিকা) উদ্বেগের কারণ নেই।" ব্রেজনেভের অপমানজনক জবাবে কার্টার খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সি আই. এ. সহ তার

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদের সোভিয়েত বিরোধী কার্যকলাপে মুজাহিদদের সাহায্য সহযোগিতা দানের নির্দেশ দেন। কার্টারের এই বিরোধী দলকে A. Team (টি. ভি. সিরিজেও ব্যবহৃত) বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ স্বার্থে এই জেহাদী আন্দোলনে সমর্থন দেয় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এ সমস্ত মুজাহিদদেরকে পরে সন্ত্রাসী তালেবান বলা হয়েছে।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, বৈদেশিক (পাশ্চাত্য) সহযোগিতা ব্যতীত আফগান মুজাহিদগণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তান থেকে দখলদার রুশ আগ্রাসন বাহিনীকে বিতাড়িত করা ছিল অসম্ভব। অবশ্য এর জন্য দীর্ঘ দশ বছর তাদের ধৈর্য ধারণ এবং আত্মাহুতি দিতে হয়। অবশ্য মিশর, সাউদী আরব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের সামরিক ও আর্থিক সাহায্য অব্যহত ছিল। এ কারণে অনেক সমালোচক আফগান রুশ যুদ্ধকে ছায়া যুদ্ধ বা Shadow war বলেছেন। এ প্রসঙ্গে চীনও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে আফগানদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। আফগানদের সহযোগিতা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে সমঝোতায় আসে। আমেরিকা পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে ৪০০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিবার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু জেনারেল জিয়া প্রকৃত খেলোয়াড় সুলভ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে এ সামান্য সাহায্যকে চীনা বাদাম বা Peanut-এর সঙ্গে তুলনা করেন। এর ফলে রুশ বিরোধী অভিযানে মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য আমেরিকা পাকিস্তানকে দশ বছর (১৯৭৯-৮৯) পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়। সি. আই. এর মাধ্যমে এই অর্থ দ্বারা মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদান করা হয়। তবে সরাসরি না করে তারা পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই. এম. আই.-এর মাধ্যমে করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। জেনারেল জিয়া আমেরিকাকে এমনও শর্ত দেন যে, রুশ বাহিনী বিতাড়িত হলে কাবুল কি ধরনের সরকার গঠিত হবে তা নির্ধারণে পাকিস্তানের ভূমিকা থাকবে। কিন্তু ১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট জেনারেল জিয়া বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।

জেনারেল জিয়ার মৃত্যু মুক্তিকামী আফগান মুজাহিদদের জন্য ছিল একটি প্রচন্ড আঘাতস্বরূপ। নৈতিক ও অর্থনৈতিক ছাড়া অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে সরবরাহ হত। আফগানিস্তানে মস্কোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং কমিউনিষ্ট প্রভাবে হারামাইনের রক্ষণাবেক্ষণকারী সাউদী আরবের বাদশাহ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ কারণে আমেরিকার সি. আই. এর মাধ্যমে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য সাউদী আরব 'জেহাদ ফান্ডে' অনুদান দেয়। মিশরও আফগান মুজাহিদদের সাহায্য করে। বিভিন্ন দেশের এবং সংস্থার মাধ্যমে রুশ আগ্রাসন নিরসন করতে আফগান মুজাহিদগণ গেরিলা যুদ্ধের জন্য যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে তার মধ্যে এ. কে.-৪৭ (AK-47), আর পি. জি (RPG), এস এ-৭ (SA-7) এবং ১২২ মিমি কামান ছিল প্রধান। এ ছাড়া অসংখ্য মাইন, দাহ্যবস্তুও (Explosive) এম্যুনিশনও ছিল। মুজাহিদদের দ্বারা পরিচালিত রুশ বিরোধী আফগান যুদ্ধে কেবল আফগানগণই সামিল ছিল না, বিভিন্ন মুসলিম দেশের জাগ্রত জনতা রুশ আগ্রাসন ঠেকাতে জেহাদে যোগদান করেন। এদের মধ্যে সাউদী আরব, বসনিয়া, চেচনিয়া, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, মিশর, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, আফগানিস্তানে জেহাদকে কেন্দ্র করে আল-কায়দার অবিংসবাদী নেতা মার্কিন

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদীর নির্ভিক প্রতিরোধকারী সাউদী নাগরিক ওসামা বিন লাদেনের আর্বিভাব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৮৮ সাল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর মাত্র এক বছরের মধ্যে ১৯৮৯ সাল আফগান মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে রুশ বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। একদিকে কূটনৈতিক চাপ, অন্যদিকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলেই রুশ বাহিনী অপসারিত হয়। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত জিহাদের খতিয়ান নিলে প্রতীয়মান হবে যে, রুশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে বহুজাতিক যোদ্ধা জেহাদের নামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং আত্মাহুতি দেন। জেনারেল জিয়ার মৃত্যুর পর ১৯৮৮ সালের ১২ ডিসেম্বর পাকিস্তানে গণভোটের মাধ্যমে বেনজীর ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বেনজীর ভুট্টোর শাসনামলে পাকিস্তানের আফগান নীতির পরিবর্তন হয়নি। রাশিয়ার মত পারমানবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ পরাশক্তির সঙ্গে বন্ধুক নিয়ে যুদ্ধে মুজাহিদগণ অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন (অব) তার সুলিখিত ও তথ্যবহুল 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা : আফগানিস্তান হতে আমেরিকা' গ্রন্থে বলেন, "আফগানিস্তানে পৃথিবীর চোখে সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশ হতে পারে, তবে বুজদিলদের দেশ নয়...।" আন্তর্জাতিক নিন্দা ও চাপ এবং মুজাহিদদের আমরণ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বিপুল সমরাস্ত্রে সজ্জিত রুশ বাহিনী ১৯৮৮ সালের শেষের দিক থেকে ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। অসংখ্য রুশ সৈন্য চোরাগুপ্তা আক্রমণে নিহত হয়, অসংখ্য টি-৬৯ ট্যাংক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জাতিসংঘের মহাসচিক পেরেজ ডি কুইয়ারকে আফগান সঙ্কট সমাধানের জন্য ১৯৮১ সালে দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত জেনেভায় বহুবার বৈঠক হয় এবং সর্বপরি ১৯৮৮ সালের ১৪ এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করে সৈন্য অপসারণের অঙ্গিকার করে। এরপর থেকে পর্যায়ক্রমে রুশ সৈন্যবাহিনী আফগানিস্তানে থেকে দেশে ফিরে যেতে থাকে। ১৫ আগস্টের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে রুশ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে।

রুশ বাহিনী সৈন্য প্রত্যাহার করার পূর্বে রাশিয়া আফগান মুজাহিদদের নিকট কাবুলে বর্তমান মস্কোপন্থী সরকার পরিবর্তন না করার দাবী জানায়। কিন্তু বিদেশী সৈন্য অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু হলে পাকিস্তানের পেশওয়ারে মুজাহিদদের দ্বারা প্রভিশনাল সরকার গঠনের উদ্রোগ গ্রহণ করা হয়। রাশিয়া এর তীব্র প্রতিবাদ করে। এরপর ১৯৮৮ সালের ২৮ নভেম্বর ইসলামাবাদে রুশ রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আফগান মুজাহিদদের সাথে বৈঠক করেন। কিন্তু তিক্ততা ও অবিশ্বাসের কারণে এই বৈঠক সফল হয়নি। রুশ প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভের নমনীয় মনোভাব সোভিয়েত বাহিনীকে আফগানিস্তান ছেড়ে যেতে সাহায্য করে। এর কিছু দিন পর সাউদী সরকারের মধ্যস্থতায় তায়েফে ১৯৮৮ সালের ৩-৪ ডিসেম্বর রুশ সরকার ও মুজাহিদদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর সমঝোতা হয় এবং রাশিয়া রুশ-বাহিনীর নিরাপত্তা দাবী করে। উল্লেখ্য যে, উত্তরাঞ্চলে বুরহানউদ্দীন রাব্বানী এবং কমান্ডার আহমদ শাহ মাসুদ সালাং গিরিপথ ও পাঞ্জশীর উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিলেন। তাঁরা উত্তরের যোগাযোগ

www.pathagar.com

রক্ষাকারী মাজার-ই-শরীফও দখলে রাখেন। রুশ বাহিনীর নিরাপদ নির্গমন (safe passage) নিশ্চিত করা হয়। গর্ভাচেভ সোভিয়েত বাহিনী অপসারণের পর কাবুলে কি ধরনের সরকার গঠিত হবে তা নিয়ে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি জাতিসংঘকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বলেন এবং রুশ বাহিনী চলে যাবার পর আফগানিস্তানকে একটি অসামরিক এলাকা (demilitarized zone) হিসেবে ঘোষণা করার দাবী জানান। গর্বাচেভের নির্দেশে রুশ রাষ্ট্রদূত প্রাক্তন বাদশাহ জহির শাহকে কাবুলে গিয়ে সরকার গঠনের অনুরোধ জানান। কিন্তু জহির শাহ এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাননি। রাষ্ট্রদূত 'তেহরান এইট' বলে শিয়া গোষ্ঠীর নেতা মোহাম্মদ করিম খলিলীর সাথে বৈঠক করেন। কিন্তু খলিলী রুশ রাষ্ট্রদূতের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। আন্তর্জাতিকভাবে কোনঠাসা হলে রুশ বাহিনীর এবং দশ বছরে যে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ও সামরিক ক্ষতি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে মস্কোতে রুশগণ বিক্ষোভ করে। গর্বাচভ, যিনি 'প্রেসত্রইকা' (নমনীয়তা) এবং 'গ্লাসনটস' (ছাড়) এর প্রবক্তা ছিলেন, এক তরফাভাবে রুশ বাহিনী প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর রুশ প্রেসিডেন্ট ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দিলে রুশ বাহিনীর শেষ কলামগুলো আফগানিস্তান ছেড়ে যেতে থাকে। মুজাহিদদের তরফ থেকে কোন যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দেয়া হয়নি বরং রুশ প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভের ঘোষণা মুজাহিদগণ প্রত্যাহার করে। পাকিস্তানে মুজাহিদ সংগঠনগুলো মজলিস-ই-সূরায় বসে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রুশ বাহিনী অপসারণের পর কাবুলে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন এবং পরবর্তীকালে লোয়া জিরগার মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল ও গ্রহণযোগ্য সরকার গঠন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে অপমানজনক পরিস্থিতি সহ্য করা সম্ভবপর না হওয়ায় ১৯৮৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি নিলজ্জ কাপুরুষের মত মস্কো বাহিনী রাশিয়ায় ফিরে যেতে থাকে। নয় বছর উনিশ দিন আফগানিস্তানে দখলদারিত্ব শেষে রুশ বাহিনীর শেষ কলাম জেনারেল বরিশ গ্রোমোভের নেতৃত্বে কাবুল থেকে উত্তরে মাজার-ই-শরিফে এসে পৌঁছে। পরের দিন আন্তর্জাতিক প্রেস এবং টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে সোভিয়েত বাহিনীর শেষ দলটি আমুরদরিয়া নদীর অতিক্রম করে 'ফেন্ডশিপ ব্রীজ' পার হয়, যে ব্রীজ রাশিয়া তৈরি করেছিল। সাথে সাথে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের সমাপ্তি ঘটে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী আফগানিস্তানে ১৩,৩১০ রুশ সৈন্য নিহত হয় এবং ৫৩,৪০৮ সৈন্য গুরুতরভাবে আহত হয়। রুশ-আফগান সংঘর্ষে দশ বছরে আফগানিস্তানের ১৫ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়।

১৯৮৯-৯৬ ঃ আফগান গৃহযুদ্ধ

প্রায় দশ বছর দৌদন্ডপ্রতাপে আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীর অবস্থান মুজাহিদদের পরিচালিত জেহাদকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু রুশ বাহিনীর প্রত্যার্পণের ফলে আফগানিস্তানে রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দেয়। যুদ্ধ বিধস্ত আফগানিস্তান সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু হয়ে পড়ে। রুশ বাহিনীর অপসারণে পাকিস্তান, আমেরিকা, সাউদী আরব ও মিশর, যারা অর্থ ও অস্ত্র জোগান দিত, খুশী হয়। কিন্তু রুশ বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে যাবার সময় কাবুলে মস্কোপন্থী সরকার বজায়

www.pathagar.com

ছিল। রাশিয়া বারবাক কারমালকে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করে তাদের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা করে। ব্রেজনেভের মৃত্যুর পর মিখায়েল গর্বাচেভ রাশিয়ার ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে তার শাসনামলে মস্কোপন্থী কাবুল সরকারের পরিবর্তন হয়। কারমালকে সরিয়ে আহমেদজাই পুশতুন গোত্রের নজিবুল্লাহকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্ক রাখার জন্য পুশতুন গোত্র থেকে নজিবউল্লাহকে রাষ্ট্রপ্রধান করা হয়। ১৯৮৮ থেকে ১৯৮৯ সাল রুশ সৈন্য প্রত্যাহারের যখন মহড়া চলছিল তখন থেকে মস্কো সমর্থিত কাবুল সরকারের সঙ্কট শুরু হয়। রাশিয়ার সমর্থন হারিয়ে নজিবউল্লাহ নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। দশ বছর দখলদারীত্বের পর রুশ সৈন্যবাহিনীর শেষ দলটি আফগানিস্তান ছেড়ে গেলে দেশে নানা সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধরত বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রের মুজাহিদগণ বা মিলিশিয়ারা দলত্যাগ করে বড় বড় দলে যোগদান করে তাদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করে। অনেকে উত্তরের 'নর্দান এলায়েন্সের' বুরহানউদ্দীন রাব্বানী ও আহমদ শাহ মাসুদের সাথে যোগ দেয়। অন্যরা দক্ষিণে কান্দাহারে ঘাঁটি স্থাপন করে হিকমতিয়ারের সাথে মিলিত হয়। বিভিন্ন জাতি ও দেশের অসংখ্য মুজাহিদগণ দশ বছর যুদ্ধাবস্থায় ছিল। রুশ বাহিনীর অপসারণে তারা দিকভ্রান্ত (disoriented) হয়ে পড়ে। এ ধরনের অস্থিরতা ক্ষমতার লড়াই এবং গোত্রীয় প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় ১৯৮৯ অর্থাৎ রুশ বাহিনীর অপসারণ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তালেবানদের আবির্ভাব পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ যেমন ছিল আফগানদের জন্য আত্মঘাতী তেমনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক মহা বিপর্যয়। ভাবতে অবাক লাগে যে, রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যে শতধা বিভক্ত আফগান ও অ-আফগান সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে জেহাদে লিপ্ত হয় রুশ বাহিনীর প্রত্যার্পণের পর তারাই স্বার্থান্বেষী হয়ে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। উপরন্তু, বিভিন্ন দেশ থেকে প্রেরিত কোটি কোটি ডলারের যে সাহায্য আসত তা বন্ধ হয়ে গেলে স্বাভাবিক কারনে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিল। উপরন্তু, আমেরিকা, পাকিস্তান, সাউদী আরব ও মিশর সমর্থিত আফগান মুজাহিদগণ জেহাদের পরিসমাপ্তিতে দিশেহারা হয়ে পড়ে। আফগানিস্তানে এ সময় অসংখ্য অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, লক্ষ লক্ষ টন পরিত্যক্ত গোলাবারুদ পড়েছিল। রুশ সহায়তায় আফগানিস্তানের অবকাঠামোর উন্নতি হয়। তারা আফগানিস্তানে অসংখ্য সড়ক, গিরিপথ, পুল, কলকারখানা নির্মাণ করে। মুজাহিদদের কাছে তখন ছিল স্টিংগার মিসাইল, যা আমেরকা সরবরাহ করে। এছাড়া মুজাহিদগণ লাভ করে আরবি ও ফারসি ভাষায় তরজমাকৃত সি. আই. এর স্পেশাল ফোর্সের তৈরি আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের ম্যানুয়াল। নাশকতামূলক কাজ করার নির্দেশিকা ছিল এগুলোতে। রুশ বাহিনীর আপসারণ যেমন ছিল বিবদমান মুজাহিদ গোত্রগুলোর মধ্যে গৃহযুদ্ধের অশনি সংকেত তেমনি অন্য দিকে ঘৃণ্য ও বর্বর মোল্লাতন্ত্রী তালবানদের অভ্যুত্থানের পূর্ব ঘোষণা। রুশ বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। রুশ ভল্লুকের অবর্তমানে আফগানিস্তানে ক্ষমতার লড়াই-এ আবিভূত হয় তিনটি শক্তি–প্রথমটি কাবুলে মস্কোপন্থী নজিবুল্লাহ সরকার সমর্থিত উজবেক গোত্রের নেতা আবদুর রশিদ দোস্তামের সরকারী বাহিনী।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় উত্তরে বোরহানউদ্দীন রাব্বানী সমর্থিত আহমদ শাহ্ মাসুদের জামাত-ই-ইসলামী। তৃতীয়ত দক্ষিণে হেকমতিয়ারের হিজব-ই-ইসলাম। আধিপত্য বিস্তারের জন্য তাজিক গোত্রের মাসুদের সাথে পুশতুন গোত্রের হিকমতিয়ারের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। অন্তঃদ্বন্দ্ব, কলহ ও গৃহযুদ্ধের মাত্রা যোগ করে পাকিস্তানের পেশওয়ারে গঠিত প্রবাসী আফগান সরকারের অস্তিত্ব নিয়ে। প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সিবগাতউল্লাহ মুজাদ্দিদী কোনঠাসা হয়ে পড়েন। আমেরিকা সি. আই. এ এবং ইউ. এস. এ্যাইডের মাধ্যমে মধ্যস্থতা করতে ব্যর্থ হয়। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক শূন্যতা গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। আফগানিস্তানে মুজাহিদদের মধ্যে শীয়া ও সুন্নী গোষ্ঠীর কোন সমঝোতা ছিল না। এ ধরনের অস্থিরতা ও রাজনৈতিক অরাজকতার ফলে দল-বদলের পালা শুরু হয়। রুশ বাহিনীর সমর্থন না থাকায় মস্কোপন্থী কাবুলের নজিবউল্লাহ্ সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। তার উপর কাবুল সরকারের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাহনেওয়াজ তানাই সদলবলে হিকমতিয়ারের বাহিনীতে যোগদানের জন্য কান্দাহারে চলে যান। এ সময় রাজধানী কাবুল দখলের জন্য উত্তর থেকে মাসুদ এবং দক্ষিণ থেকে হিকমতিয়ার অভিযান করেন। এ সময় নজিবউল্লাহ্র সমর্থক দোস্তাম সরকারের সমর্থন ত্যাগ করে মাসুদের সাথে যোগ দেন। এভাবে মাসুদ ও হিকমতিয়ার তাদের সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে গৃহযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, যা আফগানিস্তানের জন্য ছিল ভীষণ বিপদজনক।

১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ সাল তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের দাবানল জ্বলছিল। পাকিস্তান ও আমেরিকা গৃহযুদ্ধের অবসানে বহু পন্থা ও প্রক্রিয়া প্রবর্তন করলেও গৃহযুদ্ধ যুদ্ধবাজ গোত্রীয় প্রভুদের (Tribal overlords) বৈরিতার জন্য থামেনি। পেশওয়ারে গঠিত অস্থায়ী আফগান সরকার অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সিরগাতউল্লাহ মুজাদ্দিদী ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। সুন্নী দেশে শিয়াদের প্রাধান্য বৃদ্ধি গৃহযুদ্ধে নতুনমাত্রা যোগ করে। কাবুল দখলকে কেন্দ্র করে মাসুদ ও দোস্তমের সাথে হিকমতিয়ার ও রাব্বানীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বহু আফগান মৃত্যুবরণ করেন। বিস্ফোরনমুখী পরিস্থিতি সামাল দিতে বিবদমান গোত্রগুলোর দলপতিদের পাকিস্তানের চিত্রলে কাউন্সিলের এক মিটিং-এ যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। ১০টি মুজাহিদ কমান্ড কাউন্সিলের ৩০০ কমান্ডার চিত্রলে সভায় যোগদান করলেও যুদ্ধরত গোত্রগুলোর বৈষম্য ও মতানৈক্য থাকায় মিটিং-এ কোন সুফল হয়নি। হিকমতিয়ার ও মাসুদের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠে। মাসুদ এ মিটিং-এ যোগদান করলেও মতানৈক্য হওয়ায় চিত্রাল ছেড়ে চলে যান। ১৯৯১ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত কাবুল দখল নিয়ে প্রচন্ড যুদ্ধ হয় এবং কাবুলে পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে পড়ে। কাবুলে রকেটের আঘাতে বহু ঘরবাড়ী ধ্বংস হয় এবং বহু লোকক্ষয় হয়। হিকমতিয়ারের বাহিনী কাবুলে প্রবেশ করতে পারেনি। অন্যদিকে মাসুদ-দোস্তম বাহিনী কাবুল শহরে প্রবেশ করে। নজিবউল্লাহ্ রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। কাবুলের পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে রাতে এটি হিকমতিয়ারের দখলে চলে যেত এবং দিনে মাসুদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকত। এহেন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নজিবউল্লাহ্ স্বীয় নিরাপত্তার জন্য কাবুলের জাতিসংঘের দফতরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাবুল সরকারবিহীন হয়ে পড়লে

www.pathagar.com

পাকিস্তানে মুজাহিদদের সম্মেলনে সিরগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদীকে তিন মাসের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান করা হয়। স্থির হয় তিনি 'লোয়া জিরগার' নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিন মাস পর বুরহানউদ্দীন রব্বানী রাষ্ট্রপ্রধান হবেন এরূপ সিদ্ধান্ত হয় পেশওয়ারের সভায়। নজিবউল্লাহর মস্কোপন্থী সরকারের অবসানে মুজাদ্দিদী রাষ্ট্রপ্রধান, আহমদ শাহ মাসুদ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। আপাত দৃশ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসলেও হিকমতিয়ার বাহিনীর কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। হিকমতিয়ার ও দোস্তম তাদের বাহিনী নিয়ে কাবুলের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। তাজিক ও পুশতুনদের মধ্যে সংঘর্ষে বহু পুশতুন নিহত হয়। মুজাদ্দিদীর অস্থায়ী সরকার তিন মাস ক্ষমতায় থাকে। এরপর শর্তানুযায়ী রাব্বানী রাষ্ট্রপ্রধান হন। পুশতুনের উপর তাজিকদের প্রাধান্য পুশতুন নেতা হিকমতিয়ার বরদাস্ত করেননি। এছাড়া মাসুদের দল ত্যাগ করে উজবেক নেতা দোস্তম কাবুল ছেড়ে যান। এভাবে অরক্ষিত কাবুল রাতে ভুতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়। কাবুলের বাসিন্দাদের জান ও মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ আফগানিস্তানের বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যে অস্ত্র বিরতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন আফগানিস্তানকে নিয়ে বৃহত্তর পাকিস্তান কনফেডারেশন গঠনের। আফগান গৃহযুদ্ধ পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানের জন্য নানা সমস্যার সৃষ্টি করে; বিশেষ করে অগণিত আফগান শরাণার্থীদের বাসস্থান ও নিরাপত্তা বিধানে। এ সমস্ত শরনার্থী শিবির জন্ম দেয় মাদক ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার। এর ফলে জন্ম নেয় সন্ত্রাসী গ্রুপের। ইতোমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং জন্ম নেয় রাশিয়ান ফেডারেশনের। আমেরিকা ও রাশিয়া আফগানিস্তানে গৃহ যুদ্ধ বন্ধের জন্য সমস্ত প্রকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। আফগানিস্তানের এই ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকার ইতালিতে নির্বাসিত বৃদ্ধ ও গদিচ্যুত বাদশাহ জহির শাহকে কাবুলে ফিরে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু জহির শাহ এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। হিকমতিয়ার কাবুলে জহির শাহের প্রত্যাবর্তনে বিরোধিতা করেন।

রাব্বানী রাষ্ট্রপ্রধান হলে কাবুলে সাময়িকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কাবুলে অবস্থিত রাব্বানী, হেকমতিয়ার ও মাসুদের ত্রয়ী শক্তি কিছুদিনের জন্য যুগ্ম সরকার গঠন করে শাসন পরিচালনা করে। কাবুলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রত্যান্ত অঞ্চলে বিবদমান গোত্রসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ পুশতুন নেতা হিকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রীত্ব দিবার পরেও তার বাহিনীকে শান্ত করা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে উচ্চাভিলাষী হিকমতিয়ার রাষ্ট্রপতির আসন পাবার আশা করেন। ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে রাব্বানীর সাথে পুশতুন প্রধান দলগুলোর বিশেষ করে হিকমতিয়ারের সাথে নতুন করে দ্বন্দ্ব ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। আফগান গৃহযুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, প্রধান তিনটি গোত্রের-তাজিক, উজবেক এবং পুশতুনদের মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ ছিল না। বরঞ্চ তা অসংখ্য আন্তগোত্র এবং উপগোত্রীয় মুজাহিদদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ সমস্ত আফগান গোত্র ও উপগোত্রগুলো ঘোলা পানিতে মাছ

www.pathagar.com

শিকারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি, নিরাপত্তাহীনতা, খুন-জখম, রাহাজানী, চাঁদাবাজী, অপহরণ, নারী নির্যাতন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি জনজীবনকে অসহনীয় করে তুলেছিল। এ সমস্ত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, যারা জেহাদ করে পরাশক্তি রাশিয়াকে আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত করে, লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এর ফলে তারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা হারাল। ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন যথার্থই বলেন, "১৯৯৪ এর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে দু'বছরের মধ্যে আফগানিস্তানের রাজনীতিতে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে তা এতদঅঞ্চলের ইতিহাসের অস্বাভাবিক ঘটনা (তালেবানদের অভ্যুত্থান) বললে অতুক্তি করা হবে না। তালেবানদের ভুঁইফোঁড় উৎপত্তি (Mushroom growth) মনে হলেও তেমনটি কিন্তু নয়। এ শক্তির পেছনে সোভিয়েত উত্তর আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ, অরাজকতা এবং মুজাহিদ নেতাদের নৈতিক স্খলন ইত্যাদি বলে মনে হলেও এর প্রধান কারণ ছিল ইসলামপন্থী একটি স্থিতিশীল সরকারের অনুসন্ধান। তালেবানদের প্রতিভূ মোল্লা ওমর ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা দখল করলেও গৃহযুদ্ধের পটপ্রেক্ষিতে একটি দৈব শক্তির আবির্ভাব অত্যাবশ্যকীয় ছিল। এই তৃতীয় দৈবশক্তিই তালেবান, যাদের ইতিহাস অম্লমধুর।"

১৯৯৬-২০০১ ঃ মোল্লা ওমর ও তালেবান স্বেচ্ছাচারিতা

ইসলামের ইতিহাসে তথা পৃথিবীর ইতিহাসে তালেবান শব্দটি নতুন। ১৯৯৪-৯৬ সালের পূর্বে বিশ্বকোষে এ শব্দটি পাওয়া যাবে না। তালেবানদের আবির্ভাব যেমন উল্কাপিন্ডের মত তেমনি তাদের পতন ও খুবই দ্রুতগতিতে হয়েছিল। তালেবান শব্দের অর্থ ছাত্র (তালেব), বিশেষ করে মাদ্রাসায় যারা মৌলবাদী শিক্ষা- কুরআন, হাদিস, শরিয়া, ফিকাহ প্রভৃতি গ্রহণ করে। জোব্বা পরা মাথায় কাল চাদর ঢাকা তালেবানদের পটভূমি খুবই চমকপ্রদ। মাদ্রাসার শিক্ষায় শিক্ষিত এ সমস্ত ছাত্রদল কিভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে মাত্র দুই ১৯৯৪-৯৬ বছরে মাসুদ-দোস্তাম-হিকমতিয়ারের মত ঝানু সেনাদের সাথে মোকাবেলা করে ক্ষমতায় আসে তা রহস্যজনক। দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধের অবসান আফগানবাসী আশা করেছিল যে, সোভিয়েত উত্তর আফগানিস্তানে রাজনেতিক স্থিতিশীলতা, নাগরিক নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ক্ষমতা গ্রাসে উন্মত্ত উপজাতীয় মুজাহিদগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দেশ ও জাতির স্বার্থের কথা চিন্তা না করে নিজেদের স্বার্থের জন্য গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আফগানিস্তানকে শ্মশান বানিয়ে ফেলে। এই অসহনীয়, ভীতিকর ও বিস্ফোরণমুখী পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য দুর্নীতিমুক্ত, সুশৃঙ্খল, ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক একটি সমাজ ও সরকার গড়ে তোলার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। স্থিতিশীলতা আনার জন্য মোল্লা ওমর নামে এক অখ্যাত যুবকের প্রবহমান অ-ইসলামিক এবং আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তালেবানদের অভ্যুত্থান।

তালেবান মূলত পাকিস্তানের গুপ্তচর বাহিনী আই এস. আই এর সৃষ্টি। হিকমতিয়ার সরকারের ব্যর্থতা ও মাসুদ-হিকমতিয়ার-দোস্তমের ত্রিমুখী লড়াই যখন চরমে পৌঁছল তখন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করেন যে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে এক মৌলবাদী শক্তি দ্বারা আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশ

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সিল্করুট দিয়ে মধ্য-এশিয়ায় পাকিস্তানের যে বাণিজ্যপথ ছিল আফগান গৃহযুদ্ধে তা বিঘ্নিত হয়। এর ফলে আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সঙ্কট পাকিস্তানে প্রকট আকারে দেখা দেয়। বেনজির ভুট্টো কান্দাহার ও কাবুলের পাশ কাটিয়ে হিরাত দিয়ে মালামাল পাঠাবার চেষ্টা করেন এবং এক্ষেত্রে তালেবান গোষ্ঠী তাকে সহযোগিতা করে। মূলত তালেবানদের আবির্ভাব হয় পাকিস্তানের পেশওয়ার ও কোয়েটা অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলোতে। এখানকার ছাত্ররা বা তালেবানগণ মৌলবাদী ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করে। এ সময় আরব ধনকুবের আল-কায়দার প্রতিষ্ঠাতা, যোদ্ধা ও ধর্মীয় নেতা ওসামা বিন লাদেন, যিনি সালাং গিরিপথে রুশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, বেশ কয়েক বছর পাকিস্তানে অবস্থান করেন। তিনি পেশওয়ারে নিজের ঘাঁটি স্থাপন করে তালেবান ও আল-কায়দার সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেন। ১৯৯৪ সালের আফগান গৃহযুদ্ধ যখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিকে এগুচ্ছিল তখন কান্দাহারের এক দরিদ্র পরিবারের যুবক মৌলবাদী আদলে উদ্বুদ্ধ হয়ে তালেবান গোষ্ঠীতে প্রভাব যোগাতে থাকে। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মাত্র ১৬ জন জঙ্গী সহচর নিয়ে তালেবান নামে ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন গড়ে তুলেন। তিনি ১৯৯৪ সালের শেষের দিকে ১০০ জন নিয়ে হিকমতিয়ার ও মাসুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে অবতীর্ণ হন এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যে এ সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়ায়। বেনজীর ভুট্টোর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে তালেবানদের অভ্যুত্থান হয়। তিনি জে. ইউ আই অর্থাৎ জামায়েত উল-উলামা আল-ইসলাম সংগঠনের নেতা ও ধর্মমন্ত্রী মওলানা ফজলুর রহমানকে মোল্লা ওমরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে বলেন। ধর্মমন্ত্রী ফজলুল রহমান এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রাক্তন জেনারেল নাসিরুল্লাহ বাবর তালেবানদের আফগানিস্তানে নতুন ও গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত করার জন্য সহায়তা ও পরামর্শ দেন। তালেবানদের অস্ত্র জোগান দিত পাকিস্তান, আল-কায়দা এবং পরে আমেরিকা ও চীন। তালেবান গঠিত হলে যুদ্ধরত গোত্রীয় থেকে অনেক যোদ্ধা এই সংগঠনে যোগাদান করে। হিজব-ই-ইসলামীর নেতা ইউনুস খালিশ হিকমতিয়ারের সঙ্গে থাকলেও তালেবান সংগঠনে যোগ দেন এবং অস্ত্র সরবরাহ করেন। এছাড়া মুজাহিদ কমান্ডার হাজী বশির এবং আবদুল গাফফার আখন্দাজাদ মোল্লা উমরের দলে যোগদেন। এছাড়া তালেবানদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত কয়েকজন প্রখ্যাত কমান্ডার, যেমন– নজবিউল্লাহর এককালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাহনেওয়াজ তানাইয়ের যোদ্ধারা। এছাড়া দোস্তামের বাহিনীর এক অংশও মোল্লা ওমরের তালেবানে যোগ দেয়। পাকিস্তানের সহায়তায় অল্প দিনের মধ্যে তালেবান এক দৃঢ় চিত্ত এবং অপ্রতিরোদ্ধ বাহিনীতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে তালেবান পরাশক্তি আমেরিকার সাথে দীর্ঘ দুই মাস ধরে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

ধর্মভীরু মোল্লা ওমর কান্দাহারের একজন সাধারণ অধিবাসী। কিন্তু তরুন বয়সে আফগানিস্তানে বিরাজমান নৈরাজ্য দেখে তিনি তালেবানে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক কোন্দল বন্ধের প্রয়াস পান। গৃহযুদ্ধ চলাকালে প্রাক্তন মুজাহিদগণ দিশেহারা হয়ে নানা প্রকার অনৈতিক ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। তারা রাষ্ট্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে

www.pathagar.com

রাহাজানি, চাঁদাবাজী, ডাকাতি শুরু করে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে থাকে। আফগানিস্তানে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায়ের জন্য মোল্লা ওমর প্রথমে কান্দাহারের যুবকদের প্রশিক্ষণ দেন। অরাজকতা বন্ধের জন্য মোল্লা ওমরের সাথে তার এলাকা কান্দাহারের 'সিংগেসারের' প্রায় সকল যুবক তালেবানে যোগ দিলে মোল্লা ওমর রাহাজানী বন্ধের অভিযানে নামেন। এ সমস্ত তালেবান বহু বছর পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে শিবিরে শরনার্থী ছিলেন এবং সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তাদের সমবেত চেষ্টায় কান্দাহার থেকে হেরাতের রাজপথ দুবৃত্ত মুক্ত হয়। এরপর তালেবানদের শক্তি বৃদ্ধি পেলে মোল্লা ওমরে নেতৃত্বে তারা দক্ষিণাঞ্চল মুক্ত করার চেষ্টা করে। তারা সংঘবদ্ধভাবে হিকমতিয়ারের কান্দাহার ঘাঁটিতে হানা দিয়ে যুদ্ধবাজ পুশতুন নেতা হিকমতিয়ারকে বিতাড়িত করে ১৯৯৫ সালে। তালেবানদের অভূতপূর্ব সামরিক বিজয় জনগণের সমর্থন লাভ করে। আস্তে আস্তে তারা আফগানিস্তানের দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলে অভিযান করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ দখল করে। হিকমতিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে মোল্লা ওমর স্পিন বলদাকের মত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থান দখল করেন এবং পাশা নামক স্থানে রক্ষিত অস্ত্রভান্ডার হস্তগত করেন। তালেবানদের অগ্রাভিযানে হিকমতিয়ার এবং দোস্তমের বাহিনী পিছু হটে যায়। ১৯৯৬ সালের মধ্যেই তালেবানরা সালাং গিরিপথের দক্ষিন এবং উত্তরে মাজার-ই-শরিফস্থ বিভিন্ন স্থান দখল করে। এরপর মোল্লা ওমর তার বাহিনী নিয়ে কান্দাহার ও হেলমন্দসহ দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহ দখল করে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেন। এ সময়ে ১৯৯৬ সাল সুদান থেকে বিতাড়িত হয়ে ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে এসে মোল্লা ওমরের আশ্রয়ে থাকতে শুরু করেন। লাদেন যে তালেবানদের অর্থ সাহায্য ও সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এরপর মোল্লা ওমর উত্তরে অভিযান করে রাব্বানী এবং আহমদ শাহ মাসুদকে বিতাড়িত করে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে রাজধানী কাবুল দখল করেন। ১৯৯৬ সালে অভ্যুত্থানের পর মাত্র দুই বছর অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের শেষভাগে এত দ্রুত সামরিক অভিযানে তালেবানদের বিজয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই অল্প সময়ে উত্তরে সালাং গিরিপথের দক্ষিণ থেকে আফগানিস্তানের ৯০ ভাগ অঞ্চল তালেবানদের অধিকারে আসে। পাকিস্তান সরকারের সমর্থন ব্যতীত তালেবানদের এতে সহজে সাফল্য আসতে পারত না। আফগানিস্তানে তালেবানদের সামরিক তৎপরতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দিকে সমর্থন দিলেও তালেবানদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দানের অজুহাতে মার্কিন প্রশাসন বৈরী মনোভাব প্রকাশ করে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা খুবই সত্য যে, আফগানিস্তানের ভাগ্য ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। এর মূল কারণ মোল্লা ওমর। সুদান থেকে আফগানিস্তানে গোপন আস্তানা স্থাপনে তিনি লাদেনকে সহযোগিতা করেন। ওসামা সাউদী আরবের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও রাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং ইরাকে প্রথম মার্কিন হামলার পর থেকে সাউদী আরবে মার্কিন ঘাঁটি (১৯৯১) স্থাপনে বিদেশী বিধর্মী বাহিনীর অবস্থানে বিরোধিতা করেন। ধনকুবের ওসামা ইসলাম বিরোধী সকল সংগ্রামে অর্থ জোগান দেন, অস্ত্র সরবরাহ করেন এবং সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করেন। সি. আই. এ-র রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে, তিনি কাশ্মীর, চেচনিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, প্যালেষ্টাইনে গেরিলা যোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা করছেন। ১৯৯৮ সালে ৭ আগস্ট কেনিয়ার নাইরোবীতে আমেরিকান দূতাবাসের পেছনে একটি আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরিত হলে ১২ জন মার্কিন নাগরিক নিহত হয়। এর একঘন্টা পর তানজানিয়ার রাজধানী দার-উস-সালামে অনুরূপ বোমা হামলায় অনেক লোক মারা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্থানে অবস্থানরত ওসামা বিন লাদেনকে এই আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী করে। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের নির্দেশে ১৯৯৮ সালে ২০ আগস্ট সুদানের খার্তুমে লাদেনের আস্তানা হিসেবে পরিচিত একটি ঔষধের কারখানায় আক্রশবশে ক্রজ মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। ঠিক একই সময় আরব সাগরে অবস্থিত যুদ্ধ জাহাজ থেকে আর একটি ক্রজ মিসাইল কান্দাহারের খোস্ত নামক স্থানে লাদেনের তথাকথিত ঘাঁটিতে নিক্ষেপ করা হয়। লাদেনের ২০ জন দেহরক্ষী নিহত হলেও তিনি সে যাত্রায় প্রাণে রক্ষা পান। এফ. বি. আই এবং সি. আই-এর রিপোর্টে লাদেনকে অভিযুক্ত করা হলে তার বিরুদ্ধে আমেরিকা আন্তর্জাতিক গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করে। বিল ক্লিনটন লাদেনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য না পেলেও মোল্লা ওমরের নিকট লাদেনকে হস্তান্তরের দাবী জানান। ১৯৯৮ সালের ঘটনাবলী খুবই মর্মান্তিক। লাদেন মোল্লা ওমরকে বিপন্ন করতে রাজী ছিলেননা। এ কারণে তিনি আফগানিস্তান ছেড়ে নিরুদ্দেশে যাবার প্রস্তাব দিলে মোল্লা ওমর বলেন "কোন ক্রমেই নয়। আপনি আমাদের মেহমান– আপনজন। তাই আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন।" উল্লেখ্য যে, ১৯৮৫-৮৬ সালে পাকিস্তানের করাচী শহরের এক মসজিদে যখন মোল্লা ওমর ইমামতি করতেন তখন লাদেনের সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৯৯৮ সালে সমগ্র আফগানিস্তানে মোল্লা ওমর তালেবানদের অবিংসবাদী নেতা–ধর্মগুরু হয়ে উঠেন। অন্যদিকে বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়, তিনি 'ধর্মীয় ফ্যাসিষ্ট' হয়ে ধর্মের নামে আফগানদের উপর অকথ্য নিপীড়ন ও নির্যাতন করেন। প্রথম দিকে (১৯৯৬-৯৮) তালেবান মৌলবাদী সরকারের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন থাকলেও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশেষ করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন-টাওয়ার বিধ্বস্ত হবার পর লাদেনকে দোষারোপ করে আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা চালায়। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ঐ ঘটনার সাথে লাদেন আদৌও জড়িত ছিলেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলতে পারেনি।

আফগানিস্তানে তালেবানদের পতনের কাউন্ট ডাউন শুরু হয় মার্কিন বোমারু বিমানের 'কার্পেট বোম্বিং'-এর মাধ্যমে নয় বরং তাদের হিংস্র ধর্মীয় উৎপীড়ন এবং ফ্যাসিস্ট মনোভাবের ফলে। অতিদ্রুত ক্ষমতালাভ করে মাত্র দুই বছর (১৯৯৪-৯৬) তথাকথিত 'আমরুিল মুমেনীন' অখ্যাত কান্দাহারের দরিদ্র বাসিন্দা তালেবান সংগঠনের একচ্ছত্র নেতায় পরিণত হন। মাসুদ, হিকমতিয়ার, রব্বানী ও দোস্তমের মত প্রবীন যুদ্ধবাজ যোদ্ধাদের বিতাড়িত করে তিনি রাতারাতি জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে (১৯৯৬-২০০১) প্রতীয়মান হয় যে, তালেবানদের পতনের প্রধান কারণ তাদের নির্বিচারে হত্যাকান্ড, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, স্বেচ্ছাচারিতা, মানবাধিকার আইন

www.pathagar.com

লঙ্ঘন এবং নারী জাতির প্রতি প্রচণ্ড অবজ্ঞা। মোল্লাতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আফগানিস্তানে ১৯৯৬ সালে এবং মোল্লা ওমর ইসলামী শরিয়া শাসন প্রবর্তন করে কঠোর হাতে তা বলবৎ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে নিজের দেশের অধিবাসীদের উপর নিজেদের দেশের নেতাদের অত্যাচারেও এমন ভয়াবহ নজির পাওয়া যাবেনা, যা মোল্লা ওমর উন্মাদের মত আফগানিস্তানে আচরণ করেন। ইরানে আয়াতুল্লাহ খোমেনী যে শিয়া ইসলামী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তেমনি আফগানিস্তানে সুন্নী ইসলামী বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন মোল্লা ওমর। শুধু প্রভেদ এই যে, খোমেনী উৎপীড়ন করেননি, কিন্তু মোল্লা ওমর আফগানিস্তানে চেঙ্গিসখান ও তৈমুর লঙের মত অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছিলেন। উগ্র মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে তালেবান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একথা অবশ্য সমালোচকেরা বলবেন যে, শতধা বিভক্ত আফগানদের দমন করে অরাজকতাপূর্ণ পরিবেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তালেবানগণ উৎপীড়ন শুরু করে, কিন্তু এই দমন ও নির্যাতন নীতি বুমেরাং হয়ে তাদেরকেই ধ্বংস করে। ইসলামের নামে তারা যে বর্বরতায় অংশ নেয় ইতিহাসে তার কোন নজীর নেয়। ধর্মীয় গোড়ামীর (fanaticism) বশবর্তী হয়ে ক্রমশ তারা ধর্মীয় ফ্যাসিস্টে পরিণত হয়। বদরুদ্দীন ওমরের ভাষায়, "বর্তমানে তারা আফগানিস্তানের বামিয়ানের সুউচ্চ দুটি প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করে নিজেদের ইসলামের পাবন্দ প্রমাণ করার যতই চেষ্টা করুক এদের এই ইসলাম প্রীতি এক প্রকার অন্ধতার থেকেই সৃষ্টি, যে অন্ধতা নিরীহ নয়। নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা এবং নিকৃষ্টতম সমাজ বিরোধিতা হলো এই অন্ধত্বের অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ।" সংস্কৃতিবিমুখ গোঁড়াপন্থী তালেবানগণ আফগানিস্তানে হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস করে ধিকৃত হয়েছেন।

রুশ বাহিনী অপসারণের সাথে সাথে আফগানিস্তানে যে ক্ষমতার শূন্যতার (power vaccum) সৃষ্টি হয় সে সুযোগেই মুক্তিকামী মুজাহিদগণ ক্ষমতার লড়াই-এ অন্তদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। তারাও মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সংঘাত ও প্রতিকূল অবস্থার দরুন তা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু তালেবানদের সহজ বিজয়ে তারা উন্মুক্ত হয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা প্রদর্শন করে দেশ শাসন করতে চেষ্টা করে। এই উন্মাদনা সমাজের সবক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়–পারিবারিক, ব্যক্তিগত, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নজিবউল্লাহকে জাতিসংঘে দফতর থেকে গ্রেফতার করে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে। জাতিসংঘ দফতরে নিরপদ আশ্রয়ে নজিবউল্লাহ থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলেন কিন্তু ১৯৯৬ সালে কাবুল দখল করে মোল্লা ওমর তাকে দৈহিক নির্যাতন করে জনসমক্ষে ফাঁসী দেন। নজিবউল্লাহ এবং তাঁর ভাই-এর লাশ বহুদিন কাবুলের প্রধান রাস্তার পাশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। চেঙ্গিস খানও এভাবে বহু শত্রুকে ফাঁসী দিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখেন। এই অনৈসলামিক ও অমানবিক কাজটি তালবানদের প্রতি ঘৃণার জন্ম দেয় এবং পৃথিবীর সকল দেশে তিনি ধিকৃত হন।

১৯৯৮ সালে ৮ আগস্ট মাজার-ই-শরীফ দখল করে উম্মত্ত তালেবানগণ হত্যাযজ্ঞের তাণ্ডবলীলা শুরু করে। বিনা উস্কানীতে তারা মাজারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে হত্যা করে।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে তালেবানদের পতনে গণঅভ্যুত্থানে তাদেরও নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। সুন্নী কট্টরপন্থী তালেবানগণ শিয়া হাজারা গোত্রের অসংখ্য লোককে নিধন করে, যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। হাজার হাজার হাজরাদের মাজার-ই-শরীফের জেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে স্থান সঙ্কুলান না হলে মালবাহী কন্টেইনারে গাদাগাদি করে ভরে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে ঘোষণা দেয়া হয় যে, শিয়াদের সুন্নী হতে হবে এবং যারা এ নির্দেশ মানবে না তারা ইরানে চলে যাবে। অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ইরানে পাড়ি জমায়। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যে প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার শিয়া মাত্র দুদিনের ব্যবধানে ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংসভাবে নিহত হয়। তালেবান উগ্রপন্থী নেতারা শিয়াদের উপর বর্বরোচিত আচরণ করে। কাবুলে তারা ইরানী কনসুলেট দখল করে অনেক শিয়া কূটনীতিককে বন্দী করে। এ সমস্ত লোকদের পরে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তালেবানগণ স্বীকার করেন যে, ইরানী দূতাবাসের ১২ জনকে হত্যা করা হয় এবং ৪৫ জন অপহৃত শিয়া ট্রাক ড্রাইভারকে মুক্তি দেয়া হয়। ইসলামের নামে এ ধরনের বর্বরতা নিকৃষ্ট মানবতার পরিচায়ক। মোল্লা দোস্ত মোহাম্মদ এই অমানবিক কাজের জন্য দায়ী ছিলেন এবং মোল্লা ওমরের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। শিয়াদের উপর সুন্নী অত্যাচার ethnic cleansing বা জাতিগত বিরোধের ফলশ্রুতি বলা হয়েছে। আরও সংবাদ আসে যে, প্রায় চারশত শিয়া হাজারা মহিলাদের অপহরণ করা হয়। এ সমস্ত মহিলাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালান হয় এবং তাদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তালেবানদের নারী নির্যাতন আফগানিস্তানের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। ১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মোল্লা ওমরের বাহিনী হিরাত দখল করার পূর্বে এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের ৪৫টি স্কুল ছিল এবং এখানে ৫০,০০০ শিক্ষার্থী বিদ্যাঅর্জন করত। কিন্তু তালেবান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে ছাত্রীদের স্কুলগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ছাত্রীদের শিক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। কেবলমাত্র বালকদের স্কুল চালু থাকে। মহিলা ও ছাত্রীদের উপর নানা রকম বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। যে কয়েকটি মেয়েদের স্কুল চালু ছিল সে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জানালার কাঁচ কাল রঙের প্রলেপ দিতে বলা হয় যাতে মেয়েরা বাইরের কোন দৃশ্য দেখতে বা বাইরের পুরুষেরা ভিতরের মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দিতে না পারে। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আট হাজার ছাত্রীর শিক্ষা জীবনের অবসান ঘটে এবং অসংখ্য শিক্ষিকা ও অধ্যাপিকা চাকুরীচ্যুত হন। মহিলাদের উপর চাকুরী গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। কোন মহিলা রাস্তায় একা যাতায়াত করতে পারতেন না। তালেবান গুপ্তচরেরা (মিলিশিয়া) এদিকে কড়া নজর রাখত। তাদের সাথে তাদের স্বামী বা ভাইকে থাকতে হত। বিদেশী মহিলাদের বোরখা পরতে হত। আফগান মহিলাদের আপাদমস্তক নীল রংয়ের বিশেষ বোরখায় শরীর ঢেকে রাস্তায় প্রকাশ্যে বের হতে হত। মহিলাদের প্রসাধনী ব্যবহার নিষিদ্ধ হয় এবং 'হাই হিল' পরে শব্দ করে রাস্তায় চলাফেরাও বন্ধ করা হয়। যারা এ সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করতেন তাদের বেত্রাঘাত করা হত।

www.pathagar.com

তালেবান স্বেচ্ছাচারিতা আফগানদের মধ্যযুগে নিয়ে যেতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয় পাঠ নিষিদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তালেবান সরকার পরিচালিত হয় অল্প শিক্ষিত গোঁড়াপন্থী মোল্লাদের দ্বারা। তালেবানদের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মোল্লা সৈয়দ গিয়াসউদ্দীন অশিক্ষিত ছিলেন। তবে তিনি সোভিয়েত বিরোধী জেহাদে অংশগ্রহণ করেন। কাজেই অশিক্ষিত মোল্লাপন্থী শিক্ষামন্ত্রীর কাছে উদারতা আশা করা যায় না। তাছাড়া যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করায় মুজাহিদের বিরুদ্ধে জেহাদ শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। অপর এক তথ্যে জানা যায় যে, তৎকালীন তালেবান বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন এককালীন কার্পেট ফেরিওয়ালা। তার নামও মোল্লা সাদেক আখন্দ।

তালেবান সরকার পুরুষদের জন্য দাঁড়ি রাখা বাধ্যতামূলক করে। শুধু তাই না কত ইঞ্চি লম্বা দাঁড়ি রাখতে হবে তাও নির্ধারিত করে। মসজিদ জামাতে নামাজ আদায় নিশ্চিত করার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করা হয় এবং মসজিদ হাজিরা খাতা রাখা হয়। যারা শরিয়তের নিয়ম ভঙ্গ করত তাদের দোররা বা চাবুক মারা হত এবং তাদের তাৎক্ষণিক বিভিন্ন দন্ডে দন্ডিত করা হত। দাঁড়ি রাখা প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয় যা রীতিমত হাস্যকর। কাঁচি দিয়ে দাঁড়ি কাটতে গিয়ে এক আফগান একটু বেশি কেটে ফেলেন। তখন ধরা পড়ার ভয়ে তিনি দাঁড়ি কামিয়ে ফেলেন। পরে তাকে এ কারণে এক মাস জেল খাটতে হয়। এক মাসে দাঁড়ি বড় হলে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। তালেবানগণ ধর্মীয় উম্মাদনা প্রদর্শন করতেন। এ ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করে কাবুলের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এক গুপ্তচর মিলিশিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি ফজরের নামাজ পড়েছেন কিনা। তিনি পড়েছেন বললেও তালেবান উগ্রপন্থী মিলিশিয়ার বিশ্বাস হয়নি এবং এ কারণে তাকে আবার ফজরের নামাজ পড়তে হয়। তালেবান সরকারে সকল প্রকার বিনোদন বন্ধ করে দেন। টেলিভিশন, সিনেমা, সিডি, গান-বাজনা, খেলাধূলা, ছবি তোলা বা বিক্রি, ছবি সম্বলিত বই বাজেয়াপ্ত, ধূমপান, নাচ-গান, ময়ূর পালা, ঘুড়ি উড়ানো নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এ সমস্ত কারণে তালেবান সরকার অস্ত্রের দাপটে সামরিক শাসন বজায় রাখে, যা মানবাধিকারের প্রচণ্ড লঙ্ঘন। তালেবান ঘোষিত আইন বলবৎ করার জন্য বিশেষ ধরনের এক পুলিশ বাহিনী গঠিত হয় যার, প্রধান ছিলেন কট্টরপন্থী মোল্লা দ্বীন, ক্বারী দীন মোহাম্মদ, মৌলভী কামালউদ্দীন।

কাবুলসহ আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহর গোত্র কলহ ও সংঘর্ষে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা খাদ্য সরবরাহ করে। এছাড়া কোন বিদেশী সাহায্য তালেবান শাসনামলে পাঁচ বছরে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আসেনি। উপরন্তু, তালেবানদের ধর্মীয় নিপীড়ন ও ধর্মান্ধতা, নির্যাতন এবং মহিলাদের উপর অসদাচরণের ফলে তালেবানগণ জনপ্রিয়তা হারায়। প্রাক্তন মুজাহিদদের সঙ্গে তালেবানদের সংঘর্ষ অব্যহত থাকে। এছাড়া আফগান এবং অ-আফগান তালেবানদের মধ্যে বিরোধ ছিল। সমগ্র আফগানিস্তানের ৯০ ভাগ তালেবানদের দখলে থাকলেও সামরিক শক্তি দিয়ে দেশে

www.pathagar.com

প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন সম্ভবপর হয়নি। ১৯৯৬ সালে ৪ এপ্রিল কান্দাহারের বাসভবনে মোল্লা ওমর 'আমিরুল মুমেনীন' উপাধি ধারণ করে আফগানিস্তানকে 'ইসলামিক এমিরেট অব আফগানিস্তান' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এর পাঁচ বছরের মাথায় নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসে আশ্রয়গ্রহণকারী ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে পরিচালিত মার্কিন আগ্রাসন তালেবান সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করে। শত সহস্র চাপের মুখে মোল্লা ওমর লাদেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সমর্পন করেননি। এটি তার মৌলিক ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। কিন্তু এই ঘটনা তালেবানদের ধ্বংস করে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলা

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মূল ভূখণ্ডে ভয়াবহ শ্বাসরুদ্ধকর হামলা হয়। আমেরিকার মতে, ওসামা বিন লাদেন এই সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করেন। মার্কিন সরকার অভিযোগ করে যে, নিউইয়র্কে টুইন-টাওয়ারে দুটি আত্মঘাতী যাত্রী বিমান দ্বারা ধ্বংস করার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, অপর একটি যাত্রী বিমান দ্বারা ওয়াশিংটনের পেন্টাগন নামক সামরিক দফতর এবং চতুর্থ পেনসিলভেনিয়ার আকাশে বিধ্বস্ত যাত্রীবাহী অপর একটি বিধ্বস্ত বিমান দ্বারা আমেরিকায় আগ্রাসন আল-কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেনের কাজ। এই আক্রমণে ১৯ জন আত্মঘাতী আরব তরুন, বিমান চালক ও ক্রু এবং অসংখ্য যাত্রীসহ টুইন টাওয়ারে অবস্থানরত অসংখ্য লোক মৃত্যুবরণ করে। এ অভূতপূর্ব ঘটনায় সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর আধুনিক প্রযুক্তি ও সমরাস্ত্রে সজ্জিত রাষ্ট্রকে মূল ভূখণ্ডে কিভাবে আঘাত হানতে পারে তা মোটেই বোধগম্য ছিল না; যাহোক, এই সন্ত্রাসী জেহাদী ঘটনার ফলাফল ছিল ভয়াবহ। আমেরিকা সরাসরি আফগানিস্তানে তালেবান মোল্লা ওমরের আশ্রয়ে থাকা ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে। আমেরিকা তার মিত্রদের কাছে প্রমাণাদিসহ হাজির করল তাদের বক্তব্য। ইউরোপীয় মিত্ররা বিশেষ করে ব্রিটেন আমেরিকার সাথে সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। দরিদ্র অনগ্রসর তৃতীয় বিশ্বের একটি রাষ্ট্রের উপর সন্দেহবশে পরাশক্তির আক্রমণ নেক্কারজনক সাম্রাজ্যবাদী হামলা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে, যেমন পারমানবিক গণবিধ্বংসী হাতিয়ার (weapon of mass destruction) থাকার মিথ্যা অভিযোগে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাকে মার্কিন হামলা পরিচালিত করেন।

২৭ অক্টোবর ২০০১ ঃ বিমান হামলা

আমেরিকার আফগানিস্তানে বিমান হামলা এবং সামরিক অভিযানের পটপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে, এটি একটি সাজানো নাটক। তালেবানগণ যখন আফগানিস্তানের ৯০ ভাগ অঞ্চল যুদ্ধবাজ মুজাহিদদের বিতাড়িত করে দখল করে তখন মার্কিন প্রশাসনের টনক নড়ে। প্রথম দিকে রুশ বাহিনীর অপসারণে মুজাহিদদের আধিপত্য বিস্তারে খুশী হলেও পরবর্তীতে গৃহযুদ্ধ ও তালেবানদের ভুঁইফোড়ের মত আবির্ভাব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মার্কিন প্রশাসন নিশ্চুপ ছিল। কাবুল দখলের পর শারিয়া আইন জারী করে তালেবানগণ যে বরর্বতা প্রদর্শন করে তা মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে বুশ প্রশাসন অভিহিত করে। অথচ ১৯৯৬ সালে কাবুল দখলের পর তালেবানদের প্রসঙ্গে

www.pathagar.com

জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে মার্কিন প্রতিনিধি মিস রবিন রাফায়েল বলেন, "তালেবানরা দেশের দুই-তৃতীয়াংশ অনুশাসনে এনেছে। এ বাহিনী আফগানিস্তানেরই নাগরিকদের দ্বারা গঠিত এবং তারা ক্ষমতা ধরে রাখার শক্তি রাখে। যদিও তালেবানরা ধর্মের নামে নানা ধরনের জোর জবরদস্তি করছে তবুও বেশির ভাগ জনগণের সমর্থন তাদের পক্ষে রয়েছে এবং দেশে পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শান্তির পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়। কাজেই তালেবানদের এক ঘরে করে রাখা আমাদের এবং আফগানিস্তানের স্বার্থের অনুকূলে নয়।" এই মতবাদ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় জেহাদী হামলার পর কার্যকরী হয়নি। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, তালেবানদের সাথে সখ্যতা রাখার জন্য মার্কিন তেল কোম্পানি UNOCAL আমেরিকার ওমাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে আফগান স্টাডিজ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১ মিলিয়ন ডলার দান করে। এমন কি ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে কানা মোল্লা গাউসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল টেক্সাসে গিয়ে উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এতদসত্ত্বেও এত দ্রুত মার্কিন আফগানিস্তানের বৈদেশিক সম্পর্কে চিড় কেন ধরল বলা কঠিন। সম্ভবত তালেবানদের সামরিক বিজয়ের ধারা ও তাদের নৃশংসতায় মার্কিন মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। অনেকের মতে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পূর্বেই 'নর্দান জোট' এর সাথে সিআইএ সংযোগ স্থাপন করে বিমান হামলার পরিকল্পনা করে। মার্কিন সরকার কর্তৃক তালেবানদের উৎখাত করার তথ্য ২০০১ সালের ২১ মার্চ তারিখে সংবাদ প্রকাশিত একটি পত্রিকায় পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক নিরাপত্তা বিষয়ক সাপ্তাহিকী 'জেনস্ ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি' তে প্রকাশিত খবরে প্রকাশ যে, বুশ প্রশাসন তালেবান সরকারকে উৎখাতের জন্য ভারত ও রাশিয়ার সাথে এক জোট হয়েছে এবং আফগানিস্তানের 'নর্দান এ্যালায়েন্সকে' সাহায্য সহযোগিতা দিচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আফগানিস্তানের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে ২০০১ সালের ২৭ অক্টোবর কাবুলে মার্কিন বোমারু বিমানগুলো উপর্যুপরি বিমান হামলা শুরু করে। প্রতিরক্ষা সচিব এবং জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ জেনারেল মায়ার দাবী করেন যে, তালেবানদের কমান্ড কন্ট্রোল টাওয়ার ধ্বংস করে দিয়েছেন। মার্কিন আগ্রাসনের পর পরই ইতালিতে অবস্থিত প্রবাসী বাদশাহ জহির শাহকে নিয়ে কাবুলে একটি গ্রহণযোগ্য সরকার গঠন এবং 'লোয়া জিরগার' পুনঃগঠনের জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু তালেবান সরকার জহির শাহের আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন ও সরকার গঠনে তীব্র বিরোধিতা করে। আমেরিকা তালেবান উত্তর আফগানিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ একক দক্ষ ও অভিজ্ঞ পুশতুন নেতার সন্ধানে থাকে।

নভেম্বর, ২০০১ ঃ কার্পেট বোম্বিং

আমেরিকার বোমারু বিমানগুলো তালেবানদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করার জন্য কাবুলসহ বিভিন্ন শহরে কার্পেট বোম্বিং শুরু করে। দিনে ও রাতে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমানগুলো আফগানিস্তানের আকাশ এসে ছেয়ে ফেলে এবং নির্বিচারে বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। বোমাবাহী বিমানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বি-৫২। এ সমস্ত জঙ্গী বিমানগুলো বোমা মেরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে ফেলে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সি-১৩০ বিমানগুলো 'ডেইজি কার্টার' নামে ১৫০০০ পাউন্ডের বোমা আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিতে নিক্ষেপ করে। এর ফলে উত্তরে নিয়োজিত তালেবান যোদ্ধাদের মধ্যে

www.pathagar.com

আতঙ্ক ও হতাশার সৃষ্টি হয়। বহু তালেবান সৈন্য নিহত ও আহত হয়। তালেবানগণ চোরা গুপ্তা আক্রমণে অভ্যস্থ। কারণ তাদের আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত নিয়মিত বাহিনী ছিল না। এ কারণে উত্তর জোটে তারা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয। উত্তর দিকে মার্কিন বোমা হামলার সুযোগে উজবেক নেতা আবদুর রশিদ দোস্তম চার হাজার মিলিশিয়া নিয়ে মাজার-ই-শরিফ দখল করেন ২০০১ সালের ৯ নভেম্বর। এই শহরটির স্টাটিজিক বা কৌশলগত গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, কারণ মধ্য-এশিয়ার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী মৈত্রী ব্রীজ এখানে অবস্থিত ছিল। তাছাড়া উত্তর জোটের জন্য মাজার-ই-শরিফ ছিল একমাত্র সরবরাহ পথ। মাজার-ই-শরিফের পতনে তালেবানগণ দিকভ্রান্ত হয়ে পশ্চাদোপসরন করতে থাকে এবং তারা গেরিলা যুদ্ধের জন্য আত্মগোপন করতে থাকে। উত্তর দিকে যখন বোমা নিক্ষেপ হতে থাকে তখন আমেরিকা সি.আই.এ-র মাধ্যমে দক্ষিনাঞ্চলের পুশতুন এলাকায় তালেবান বিরোধী যুদ্ধবাজ নেতাদের সংগঠিত করে।

১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে আগ্রাসন তালেবানদের পতনের পূর্ব সংকেত হিসেবে কাজ করে। নভেম্বর ২০০১ মাসে ক্রমাগত বোমা বর্ষণ তালেবান শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ছিল। উত্তর দিকে তালেবান বিরোধী মুজাহিদ বাহিনী যেমন পুনরায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করে উত্তরাঞ্চলে মাজার-ই-শরিফ দখল করে এবং কাবুলের সড়ক নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি দক্ষিণে সি. আই. এ.-র তৎপরতায় তালেবান বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে একতাবদ্ধ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। মূলত ১৯৯৭ সালের গোড়ার দিক থেকেই এই তৎপরতা শুরু হয়। এক্ষেত্রে কমান্ডার আবদুল হকের অবদান ছিল। অপরদিকে কাবুলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই ১৯৯৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিন বছর তালেবান বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে আসছিলেন। ১২ নভেম্বর উত্তর জোটের নিকট কাবুলের পতন হয়। সোভিয়েত বিরোধী মুজাহিদগণ যারা জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছিল, তারা স্ব স্ব বাহিনী নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ক্ষমতার লড়াইয়ের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ অবস্থান গ্রহণ করে। আফগানিস্তান থেকে রুশ বাহিনীকে বিতাড়ন পরবর্তী গৃহযুদ্ধ এবং তালেবানদের অভ্যুত্থান ও সশস্ত্র সংগ্রামে আফগানের বহু উপদল ছাড়াও আফগান যোদ্ধা-মার্দ মোমেনীগণ অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে বাংলাদেশী, সাউদী, কাশ্মিরী, পাখতুন, ইরানী, চেচনীয়, বসনীয়, ইরাকী ও মিশরীয় ছিল। শুধু তাই নয় জন ফিলিপ ওয়াকার নামে এক তরুন আমেরিকা ধর্মান্তরিত হয়ে তালেবান বাহিনীতে যোগদান করেন। সানফ্রানসিসকোর অধিবাসী জন সোলায়মান নাম ধারণ করে ইসলামী শিক্ষা লাভ করেন। এই যুবক ইয়েমেনে আসেন ও ২০০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এডেনে অবস্থানকারী ইউ. এস. এস. কোল নামের এক যুদ্ধ জাহাজে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অংশগ্রহণ করেন। এই হামলায় ১৭ জন মার্কিন নাবিকের মৃত্যু হয়। মার্কিন সরকার জন ওরফে সোলায়মানকে সন্দেহ করলে সে প্রথমে পাকিস্তান এবং পরে আফগানিস্তানের উত্তরে কুন্দুজ নামক স্থানে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। জন পরে তালেবানদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করেন। যাহোক, ১৪ নভেম্বর আফগানিস্তানের কাবুলসহ উত্তরাঞ্চলের সমস্ত এলাকা উত্তর জোটের হস্তগত হলেও কুন্দুজে তখনও তালেবান

www.pathagar.com

যোদ্ধাদের সাথে জোটের তুমুল যুদ্ধ চলছিল। কিন্তু তালেবানদের সামরিক শক্তি হ্রাস পেলে তারা কুন্দুজ দখলে রাখতে পারেনি। উত্তর জোট তালাখন্দসহ অতি সহজে কুন্দুজ ঘিরে ফেলে। ২০ নভেম্বর তালেবান নেতা রশিদ দোস্তম কুন্দুজ ছেড়ে চলে যেতে রাজী হন। কিন্তু এখানে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। কুন্দুজের যুদ্ধে তালেবানের পক্ষে আফগান ও অ-আফগান যোদ্ধা অংশ গ্রহণ করে। ধারণা করা হয় যে, প্রায় ৩০,০০০ বিদেশী তালেবান যোদ্ধা আফগানিস্তানের বিভিন্ন রণাঙ্গনে সশস্ত্র সংঘর্ষ করে আসছিল। উল্লেখ্য যে, কুন্দুজের যুদ্ধে অসংখ্য অ-আফগান যোদ্ধা নিহত হয়। কুন্দুজের যুদ্ধে জন ওয়াকারও অংশ গ্রহণ করেন এবং আমেরিকান তালেবানের যুদ্ধ অংশ গ্রহণ সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ২৫ নভেম্বর কুন্দুজে উত্তর জোট বাহিনী প্রবেশ করে দখল করে। এর ফলে সমগ্র উত্তরাঞ্চল থেকে তালেবান আধিপত্য নির্মূল হয়। রশিদ দোস্তাম প্রাণভয়ে তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একমাত্র কুন্দুজেই ৩,০০০ তালেবান সৈন্য নিহত এবং ৩,৬০০ বন্দী হয়। কুন্দুজে বন্দী তালেবানদের কিলা জঙ্গীতে রাখা হয়। কিন্তু একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে সেখান রক্তপাত ঘটে। আমেরিকার স্পাই মাইক স্পেস এবং তার সহকর্মী ডেভ যখন বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তখন সন্দেহবশে একজন বন্দী কাপড়ের নিচে লুকিয়ে রাখা অস্ত্রের সাহায্যে স্পেস ও ডেভকে হত্যা করে। এর ফলে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যবাহিনী কিলা জঙ্গী অবরোধ করে অমানবিকভাবে হত্যাকাণ্ড চালায়। পরাজিত যুদ্ধবাজ নেতা দোস্তামের তালেবান সৈন্যদের আত্মসমর্পন এবং প্রায় দু'শত পঞ্চাশ জন বন্দীদের প্রতি অমানুষিক আচরণের ফলে বন্দীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। যুদ্ধবন্দীরা দুর্গে রাখা অস্ত্র নিয়ে উত্তর জোট তথা ব্রিটিশ আমেরিকান বাহিনীকে আক্রমণ করে। কিন্তু তারা বিফল হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বিমান দ্বারা রকেট নিক্ষেপে বহু বন্দীদের হত্যা করা হয়। এমন কি দুর্গের কক্ষগুলোতে দাহ্যপদার্থ ঢেলে আগুনে বহু বন্দীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ২০০১ সালের ২৯ নভেম্বর বি. বি. সি আমেরিকান সৈন্যদের হত্যাকান্ড টেলিভিশনে প্রচার করে। সুড়ঙ্গ থেকে অর্ধ মৃত অবস্থায় যাদের উদ্ধার করা হয় তাদের মধ্যে আমেরিকান তালেবান জন ওয়াকারও ছিল। এটি ছিল আফগানিস্তানের রক্তঝরা ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

নভেম্বরের শেষে সমস্ত আফগানিস্তানে তালেবান যোদ্ধারা তাদের ঘাঁটি হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। উত্তর ও দক্ষিণে তাদের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়। রাজধানী কাবুল হাতছাড়া হয়ে গেলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তথাকথিত 'আমিরুল মুমেনীন' মোল্লা ওমর পশ্চিমাঞ্চলে কান্দাহারে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। মাত্র পাঁচ বছরে তাদের অভ্যুত্থান যেমন ছিল রোমাঞ্চকর তেমনি তাদের পতনও অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত। তালেবানদের পতনে উত্তর জোট আমেরিকা, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের সরকার একটি গ্রহণযোগ্য অস্থায়ী প্রশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে কাবুলে। কিন্তু প্রধান সমস্যা আফগানিস্তানের প্রধান চারটি গোষ্ঠীর উজবেক, তাজিক, পুশতুন ও হাজারা মধ্যে সমঝোতার অভাব। স্থির হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ পুশতুনদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করা হবে। এই চার গোষ্ঠীর নেতা জার্মানীর বন শহরে মিলিত হন। এই সভার উদ্যোগ গ্রহণ করেন জাতিসংঘের আফগান বিষয়ক বিশেষ দূত ফ্রান্সিস ভেন্ড্রেন এবং

www.pathagar.com

আলজিরিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাখতার ব্রাহিমি। এই আলোচনায় আফগানিস্তানের চারটি বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছাড়াও গতিচ্যুত ও প্রবাসে আশ্রয়গ্রহণকারী বাদশাহ জহির শাহের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ পুশতুনদের মধ্য থেকে একজন প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হবে। লক্ষনীয় যে, পুশতুনদের অনেক উপ-গোত্র যেমন দূররানী (আহম্মদ শাহ আবদালী বা দূররানী এবং জহির শাহ্) খিলজাই, পুপুলাজাই এবং কাকরাস ছিল। গদিচ্যুত জহির শাহের শাসনামলে আফগানিস্তানে লোয়া জিরগার মাধ্যমে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় ছিল। কিন্তু ক্ষমতালোভী সরদার দাউদের সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে এই স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায় এবং শুরু হয় আফগানিস্তানের ইতিহাসে জঘন্যতম রক্তপাতের অধ্যায়। ১৯৭৩ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সাঁতাইশ বছরের ইতিহাস রক্তঝরা ইতিহাস। সর্বসম্মতিক্রমে পুশতুন পুলাজাই উপগোত্রের হামিদ কারজাইকে অন্তবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হয়।

২২ ডিসেম্বর ২০০১ ঃ প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই

হামিদ কারজাই-এর নাম আফগান জিহাদ পরবর্তীকালে গৃহযুদ্ধ ও তালেবান শাসনের সময়ে বিশেষ প্রাধান্য পায়নি ঠিকই তবে উচ্চশিক্ষিত এবং অনর্গল ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত কারজাই-এর দাদা জহির শাহের দরবারে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তার বাবা আব্দুল আহাদ কারজাই এক সময় আফগান পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। পেশওয়ারে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হন। ভারতের শিমলাই হামিদ কারজাই পড়াশুনা করেন। এরপর অল্প কিছুদিন সোভিয়েত বিরোধী জেহাদে তিনি পেশওয়ারে অবস্থান করে সহযোগিতা করেন। মুজাহিদদের ক্ষমতালাভের পর সিবকাতুল্লাহ মুজাদ্দিদীর শাসনামলে তিনি উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আফগানিস্তান ক্ষমতালিপ্সু গোত্রগুলোর মধ্যে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ শুরু হলে কারজাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছুকাল বসবাস করেন।

বনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, আফগানিস্তানের অন্তবর্তীকালীন সরকার ২৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে এ সরকার কাবুলে শাসনকার্য পরিচালনা করবে। নতুন অস্থায়ী সরকারে সকল গোত্রের প্রতিনিধি থাকবে। তাছাড়া দু'জন মহিলাকে এই সরকারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যা তালেবানদের নারী বিদ্বেষী মতবাদের লজ্ঘন। উল্লেখ্য, আফগানিস্তানের ইতিহাসে মহিলাদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের নজির এই প্রথম। আফগানিস্তানের অন্তবর্তীকালীন সরকারকে বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা অনুদান দিবে। এছাড়াও আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, ছয় মাস পার হলে প্রবাসে অবস্থানরত বাদশাহ জহির শাহের নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হবে। তার এই নিয়োগ 'লোয়া জিরগা' বা গোত্রীয় সংঘ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। ১৭৪৭ সাল থেকে আহম্মদ শাহ আবদালীর শাসনামলে লোয়া জিরগার মাধ্যমে বিবদমান আফগান গোত্রসমূহের মধ্যে ঐক্য বজায়ের এক সুচতুর প্রক্রিয়া চলে আসছিল। স্থির হয় জহির শাহ 'লোয়া জিরগার' বৈঠক ডেকে দেশের শাসনতন্ত্রকে বৈধতা দিবেন। শাসনতন্ত্রের আলোকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং গণ প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে। অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের আড়াই বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

www.pathagar.com

২০০১ সালের ২২ ডিসেম্বর হামিদ কারজাই কাবুলে অন্তবর্তীকারীন সরকারের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব লাভ করেন। কাবুলে শপথ গ্রহণ করে তিনি আফগানিস্তানে পাঁচ বছরের তালেবান দুঃশাসনের অবসান ঘটান। মন্ত্রী সভায় বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফাহিম এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইউনুস কানুনী। এই নতুন মন্ত্রীসভার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যুদ্ধবাজ গোত্রীয় নেতাদের যেমন রাব্বানী, দোস্তাম, হিকমতিয়ার, স্থান ছিল না। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, এ সমস্ত যুদ্ধবাজ নেতাগণ সুযোগের অপেক্ষায় ক্ষমতা গ্রাসের জন্য বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মাজার-ই-শরিফে দোস্তাম, হেরাতে ইসমাইল খান, জালালাবাদে আব্দুল কাদের এবং কান্দাহারে গুল আগা। তবে কাবুলে শান্তি বাহিনীর অবস্থান এবং জাতিসংঘের তদারকীতে যুদ্ধপ্রিয় এ সমস্ত নেতারা নিস্ক্রিয় ছিলেন।

মোল্লা ওমরের অর্ন্তধ্যান

২০০১ সালের শেষ মাস ডিসেম্বরে তালেবানদের পতনের শেষ দৃশ্যপট রচিত হয়। তালেবানদের স্বেচ্ছাচারিতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা ছাড়াও পতনের যুগে তালেবান দল থেকে অসংখ্য সদস্য অন্য দলে যোগদানের ফলে তালেবানদের শক্তি হ্রাস পায়। এ কারণে উত্তর ও দক্ষিনাঞ্চলে তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কান্দাহারে সর্বশেষ ঘাটিতে অবস্থান নেয়। উল্লেখ্য যে, কান্দাহারের পুশতুন গোত্রেই মোল্লা ওমরের জন্ম হয় এবং এখানেই তার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহন করে হামিদ কারজাই কান্দাহারে দূত পাঠিয়ে মোল্লা ওমরকে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, তিনি এখন ক্ষমতাহীন এবং তালেবানদের পতন ঘটেছে। এছাড়া আল-কায়দার প্রতিষ্ঠাতা ওসামা-বিন-লাদেনের আফগানিস্তানে অবস্থান জনগণ শুধু সহ্যই করছেন না, আফগানিস্তান বিশ্ব জনমতের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে। সম্মিলিত শক্তির উপস্থিতি ও চাপের মুখে কারজাই মোল্লা ওমরকে কান্দাহার ছেড়ে যেতে অনুরোধ করেন। ২০০১ সালের ৭ ডিসেম্বর তালেবানদের আধ্যাত্মিক নেতা এবং ধর্মীয় উম্মাদনা সৃষ্টিধারী সন্ত্রাসী তার পছন্দমত পুশতুন কমান্ডার মোল্লা নকিবুল্লাহ বাহিনীর হাতে কান্দাহার ছেড়ে দিয়ে অর্ন্তধ্যান করেন। বর্তমানে তিনি ও লাদেন কোথায় আছেন তা জানা যায় না। একই সময় কারজাই সমর্থিত পুশতুন কমান্ডার গুল মোহাম্মদ আগা কান্দাহারে প্রবেশ করে শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বিনা সংঘর্ষে গুল মোহাম্মদ কান্দাহারে প্রবেশ করেন। তাঁকে কান্দাহারের গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং মোল্লা ওমরের দোসর মোল্লা নকিবুল্লাহকে কমান্ডার নিয়োগ করা হয়।

তোড়াবোড়ায় বোমা বর্ষণ

মোল্লা ওমরের সামান্য অবস্থান থেকে তালেবানদের আধ্যাত্মিক নেতা ও 'আমিরুল মুমেনীন' উপাধী গ্রহণ এবং তার সংগঠন দ্বারা আফগানিস্তানের ৯০ ভাগ এলাকা দখল এবং পাঁচ বছর (১৯৯৬-২০০১) একচ্ছত্র শাসন ঐতিহাসিকদের চমৎকৃত না করে পারেনা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে. কি এমন চুম্বক শক্তি কানা মোল্লা ওমরের ছিল যার

www.pathagar.com

দ্বারা তিনি স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী শাসন পরিচালনা করতে সক্ষম হন। ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেনের ভাষায়, "আফগান ইতিহাসে তালেবানদের মত কট্টারবাদী ইসলামবাদী বলে পরিচিত শক্তির উত্থান এবং পাঁচ বছরের এক নৈরাজ্যজনক অব্যবস্থার শাসন এক অতি আশ্চর্য এবং অনুসন্ধিৎষুর বিষয় হয়ে থাকবে।" তালেবানদের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে আমেরিকানদের কোন বিরোধ ছিল না। আমেরিকা অন্য কোন স্বার্বভৌম দেশে সামরিক অভিযান পরিচালনা করার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু টুইন-টাওয়ার ধ্বংসে ওসামা বিন লাদেনের জড়িত থাকার অজুহাতে মোল্লা ওমরের আশ্রয়ে থাকায় আমেরিকা আফগানিস্তানে তালেবানদের ধ্বংসের জন্য উম্মাদ হয়ে পড়ে। জালালাবাদের দুর্গম পার্বতাঞ্চল সাদা পাহাড় নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি তোড়াবোড়া নামেও অভিহিত। এর অর্থ কালো খিড়কি। আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা এফ. বি. আই-এর তথ্য মতে, এই পাহাড়ে উসামা-বিন লাদেন লুকিয়ে আছে। পুশতুন কমান্ডারগণ আমেরিকার বাহিনীর সহায়তায় এখানে অভিযান চালায়। উল্লেখ্য যে, রুশ-বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত জেহাদে আফগানগণ এখানে একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি নির্মাণ করে। পাহাড় কেটে গুহার মধ্যে তৈরি করা হয়েছে অসংখ্য কুঠরী। এটি যেন পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হোটেল। এখানে রশদ রাখার জন্য অসংখ্য কুঠরী রয়েছে। জেনারেটরের সাহায্যে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা ছিল এবং পানি সরবরাহেরও ব্যবস্থা করা হয়। আমেরিকার প্রদত্ত অর্থে এটি তৈরি হয় কারণ উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তান থেকে রুশ বাহিনীকে বিতাড়িত করা। এই তোড়াবোড়া এমন মজবুত করে তৈরি করা হয় যে; মাসের পর মাস ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করে এটি ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। এই গুহার নকশা আমেরিকানদের কাছে ছিলনা। পাকিস্তানের গুপ্তচর বাহিনী আই. এস. ই-এর হাতে ছিল গুহার নকশা। সাধারণ বোমা ফাটিয়ে যখন ধ্বংস করা গেল না তখন আমেরিকা গুহা বিধ্বংসী এক নতুন ধরনের বোমা তৈরি করে। পেন্টাগণ এর নাম দেয় 'বেরিক থারমাল বোমা' এই বোমার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিস্ফোরনের পর এটি শুধু ছড়িয়ে যাবে না, এর প্রচন্ড তাপ এবং বাতাসের চাপ সমস্ত অক্সিজেন টেনে বের করতে সক্ষম হবে। এর ফলে অক্সিজেনের অভাবে প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে।

ওসামা বিন লাদেনকে অন্যায়ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুশ সরকারি এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তার মাথার দাম নির্ধারণ করেছে পঁচিশ মিলিয়ন ডলার। আফগানিস্তানকে একটি অকৃতকার্য রাষ্ট্র (a failing state) বানাবার জন্য আমেরিকার এই আগ্রাসন। জিঘাংসা বশে অসংখ্য বোমা নিক্ষেপ করেও ওসামার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তালেবান নেতা মোল্লা ওমর চমক দিয়ে যেমন এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ করে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছেন। কিন্তু ওসামা বিন লাদেন তার মার্কিন বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছেন।

www.pathagar.com

চতুর্থ পর্ব

আধুনিক মিশর ও আরব রাষ্ট্রসমূহ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক মিশর

১. মিশর এবং নেপোলিয়ন

পটভূমি

আলী'বে ঃ মুসলিম বিশ্বের মানচিত্রে মিশরের সংযোজন হয় দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের সময়ে। ৬৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে আমর-ইবন-আল-আসের নেতৃত্বে বিজয় হবার পর হতে মিশর মুসলিম শাসনে আওতাধীন হয়। উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমী আয়য়ুবী আমলে মিশর একটি সুসমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হয়। আয়য়ূবী বংশের পর মিশরে মামলুকগণ দু'ই শতাব্দী পর্যন্ত (১২৫০-১৫১৭ খ্রি.) রাজত্ব করে। সিরকাসিয়ান মামলুকদের অনাচার ও স্বৈরাচারে মিশরে যখন মারাত্মক রাজনৈতিক সংকট ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় শুরু হয় তখন ১৫১৭ সালে তুর্কী সুলতান সেলিম মার্জদাবিকের যুদ্ধে কানসুল গৌরীকে পরাজিত করে মিশরকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কানসুল গৌরীর উত্তরসূরী তুমান বে ও সেলিমের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। মিশরের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয় এবং এটি তুরস্ক সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে রূপান্তরিত হয়। ষষ্ঠদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল মিশর তুরস্কের সুলতান কর্তৃক গভর্নর বা 'পাশা' দ্বারা শাসিত ছিল। ক্রমশঃ মিশরে তুর্কী আধিপত্য ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে এবং এর সুযোগে মামলুকগণও তাদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে থাকে। তুরস্কের আধিপত্য খর্ব করার জন্য কতিপয় স্থানীয় নেতা (শেখ-উল-বালাদ) বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে আলী'বে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলী'বে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে স্বীয় ক্ষমতা সুসংহতকরে মামলুক সুলতানদের সহায়তায় ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করেন। তিনি ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে হেজাজ এবং পরের বছর সিরিয়া দখল করেন। কিন্তু তাঁর সেনাপতি ও জামাতা আবু সিহাব বিশ্বাসঘাতকতা করে তুরস্কের প্ররোচনায় আলী'বে-কে হত্যা করে ১৭৭২ সালে মিশরের সিংহাসন অধিকার করেন।

তুরস্কের অধীন ঃ ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের মহানায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কর্তৃক মিশর অধিকারের পূর্বে মিশরের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। অটমান তুরস্কের সুলতানের সরাসরি কোন কর্তৃত্ব না থাকায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বৈরাচারী হয়ে উঠেন। তাদের উচ্চাভিলাষ ও বিলাস-বাসনে মিশরের চরম বিপর্যয় ঘটে। মামলুক এবং তুর্কী পাশাদের কলহ-বিরোধ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ডলওয়েল বলেন, "বিচার ছিল উৎকোচের বশবর্তী, সম্পত্তি ছিল

www.pathagar.com

স্বজনপ্রীতির আওতাভুক্ত এবং জীবন ছিল সৌভাগ্যের পরশমণি।" ভলনীর মতে, "এই সময় মিশর কতকগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, বিশাল শূন্যতা ও অগ্নিদগ্ধ ঘরবাড়ির সমষ্টিতে পরিণত হয় এবং সেখানে প্রতিবাদহীন জুলুম, চাবুকাঘাত ও নৃশংস হত্যা ব্যতীত কোন কিছুই ছিল না।"

নেপোলিয়নের মিশর বিজয় ঃ প্রাচ্য পরিকল্পনা ঃ মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন চরম সংকটময় হয়ে পড়ে তখনই নেপোলিয়ন মিশর অভিযানের পরিকল্পনা করেন। ১৭৯৮ সালের জুলাই মাসে আকস্মিকভাবে নেপোলিয়ন আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে অবতরণ করেন। তিনি প্রচার চালান যে, মিশরে তুরস্কের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মিশরে অভিযান পরিচালনা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদী নীতির মূলে কুঠারাঘাত করবার জন্য ভারত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে বিদ্যমান নৌপথটি বন্ধ করা। নেপোলিয়ন অনুধাবন করেন যে, ইংল্যান্ডকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে না পারলে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রাচ্যে সম্প্রসারণ করা যাবে না। তার 'মহাদেশীয় ব্যবস্থায়' মূল উদ্দেশ্য ছিল "দোকানদারের জাত" ('a nation of shop keepers') ইংল্যান্ডকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করা। ইংল্যান্ডের শক্তিশালী নৌবহর থাকায় নেপোলিয়ন অতর্কিতে মিশর আক্রমণ করে প্রাচ্যদেশে বিশেষভাবে ভারতের সঙ্গে নৌবাণিজ্য বন্ধের প্রচেষ্টা করেন। এমনকি নেপোলিয়ন ভারতের মারাঠা অধিপতি ও মুসলিম বীর টিপু সুলতানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। অতঃপর ইংল্যান্ডের উপর নৈতিক আঘাত হানা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য নেপোলিয়ন মিশর দখল করেন। তিনি তিনশত জাহাজ, অসংখ্য সৈন্য, কামান, কারিগর, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, দো-ভাষী, শিল্পী, মুদ্রাকরসহ মিশরে গমন করেন।

নেপোলিয়নের পরাজয় ঃ আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণের সময় মুরাদ বে এবং ইব্রাহীম বে সুলতানের করদ রাজ্য হিসেবে মিশর শাসন করছিলেন। মামলুকগণ ফরাসী বাহিনীর নিকট ১৭৯৮ সালের জুলাই মাসে সংঘটিত 'পিরামিডের যুদ্ধে' পরাস্ত হয়। সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল ফরাসী বাহিনীর মোকাবেলা করার মত সাহস ও উদ্যম মিশরীয়দের ছিল না। ঐতিহাসিক রিফাত বে'র মতে, "এটি ছিল অসম যুদ্ধ। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ একপক্ষে ছিল সামরিক শৃঙ্খলাবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সাহসিকতার, পরিকল্পিত বিজ্ঞানের সাথে আদিম প্রথার।" মিশরে মামলুকদের আধিপত্য চিরতরে বিলুপ্ত হলে ফরাসী শাসন কায়েম হয়। কিন্তু নেপোলিয়নের এই বিজয়গৌরব ছিল ক্ষণস্থায়ী। কারণ দুর্দমনীয় ইংরেজি নৌশক্তির নিকট ফরাসী নৌবহর ১৭৯৮ সালের ১লা আগস্ট আবুকীরের যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়। এই যুদ্ধ 'নীলনদের যুদ্ধ' নামেও পরিচিত। ইংরেজ নৌ-অধ্যক্ষ এডমিরাল নেলসন অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে এই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। অতঃপর ফরাসী নৌবাহিনী একরেতে এবং ১৮০১ সালের ২১ শে মার্চ আলেকজান্দ্রিয়ায় পরাজিত হয়। এটি 'এমবাবার যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই সকল যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে নেপোলিয়নের 'প্রাচ্যদেশীয় পরিকল্পনা' ব্যর্থ হয় এবং তাঁকে সেনাবাহিনীসহ ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

www.pathagar.com

মিশরের আধুনিকীকরণের ফরাসীদের অবদান ; ফরাসী প্রভাব ঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, নেপোলিয়নের মিশর অভিযান এবং সাময়িক দখল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফরাসী বাহিনীর আগমন ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তমসাচ্ছন্ন মিশর নেপেলিয়নের বাহিনীর পদচারণায় যেন জেগে উঠে রিফাত বে (The Awakening of Modern Egypt) বলেন, ফরাসীদের কামানের গর্জনে ও গোলাবারুদের গন্ধে মিশর সুদীর্ঘকালের অজ্ঞানতার তন্দ্রাচ্ছন্নতা হতে জেগে উঠে।" হিট্টি বলেন, 'The Napoleonic expedition turned Europe's eyes to the somewhat forgotten land route to India and set in motion a chain reaction which made the Near East the storm center of European intrigue and diplomacy' ভি. জে. ভাটিকিউটিস (The Modern History of Egypt) বলেন যে, ১৭৯৮ সালের নেপোলিয়নের মিশর বিজয় মূলতঃ দু'টি কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঃ (১) এই অভিযান মিশরে মামলুক বে-দের রাজনৈতিক ক্ষমতার সারশূন্যতাকে প্রমাণিত করে এবং একটি প্রদেশ হিসেবে অটমান সাম্রাজ্যের সাথে দীর্ঘ দিনের যোগসূত্র ছিন্ন করে; (২) এই ঘটনা শিক্ষিত মিশরীয়দের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা প্রচারে সহায়তা করে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, ধর্ম নিরপেক্ষতার (secularism) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা গোঁড়াপন্থী মিশরীয় ধর্মীয় গোষ্ঠী বা মোল্লা শ্রেণীর নিকট মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। মামলুক সামরিক ক্ষমতা ধুলিস্যাৎ করে নেপোলিয়ন মিশরে একটি প্রশাসনিক অবকাঠামো সৃষ্টির প্রয়াস পান। এই কারণে তিনি স্থানীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবী, উদারমনা ব্যক্তি, তথা মোল্লা শ্রেণীর সহযোগিতা কামনার জন্য তিনি 'বিসমিল্লাহ আর রহমান-আর-রহিম' উল্লেখ্যপূর্বক একটি ঘোষণাপত্র জারী করেন। উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন সব সময় উদার ছিলেন এবং তিনি বলেন যে, "মিশরে আমি একজন মুসলমান ছিলাম এবং ফ্রান্সে একজন খ্রিস্টান ক্যাথলিক" ("I was a Mohammedan in Egypt, I shall be a catholic in France")। এই মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায় মিশর বিজয়ের পর তার অনুসৃত নীতিতে। ভাটিকিউটিস যথার্থই বলেন যে, নেপোলিয়নের মিশর দখলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মামলুক জালিমদের ধ্বংস করা, যারা এতকাল মিশরবাসীর অধিকার হরণ করে রেখেছিল, ইসলাম ধর্মে কুঠারঘাত করা নয়।" ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র- স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে মিশরীয়গণ তাদের নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলবে এটিই ছিল নেপোলিয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রাজনৈতিক ফলাফল ঃ নেপোলিয়নের অভিযানের ফলে সর্বপ্রথম প্রাচীন মিশরীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রতি ইউরোপীয়দের নজর পড়ে। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার দ্বার উন্মোচিত হয় নেপোলিয়নের মিশর বিজয়ের ফলে; অপরদিকে মিশরীয়গণ সর্বপ্রথম ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি হয়। মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ফরাসী বিপ্লবের অবদান অনস্বীকার্য। বলাই বাহুল্য

www.pathagar.com

যে, মিশরীয় রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতিতে ইউরোপীয় প্রভাবের ফলে মিশরীয়দের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। বলা বাহুল্য যে, মোহাম্মদ আলী পাশা, সাঈদ পাশা ও খদিভ ইসমাইলের সংস্কারমুখী কার্যকলাপ, যা ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে সূচিত হয়, মিশরে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উন্মেষে সহায়ক ছিল। ইংরেজি ও ফরাসীয় ভাষায় শিক্ষা, পাশ্চাত্য রীতিতে স্কুল-কলেজ স্থাপন ও শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে মিশরীয়গণ ইউরোপীয় সভ্যতা, কৃষ্টি ও ভাবধারায় সংস্পর্শে আসে।

সাংস্কৃতিক ফলাফল ঃ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন মিশরে অভিযানে আসেন তখন তার সাথে ছিল প্রত্নতত্ত্ববিদ, আবিষ্কারক, দো-ভাষী, শিল্পী, মুদ্রাকর এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীবৃন্দ। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী সর্বপ্রথম বৃটিশ যাদুঘরে রক্ষিত "রোজেটা" পাথরের সন্ধান পায় এবং ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ ও শিলালিপি বিশেষজ্ঞ স্যাম্পোলিও এই রোজেটা পাথরে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠোদ্ধার করে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার দ্বারোঘাটন করেন। এর ফলেই সৃষ্টি হয়েছে মিশরীয়তত্ত্ব (Egyptology), যা পূর্বে ছিল না। প্রাচীন মিশরের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার ও গবেষণায় ফরাসী স্থপতি, শিল্পী, কারিগর ও গবেষকদের অবদান অনস্বীকার্য। তারাই প্রথম গির্জার পিরামিড ও স্ফিংসের রহস্য উৎঘাটন করেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশীয় গবেষকগণ মিশরীয়তত্ত্বের বিভিন্ন দিক ও বিশ্ব সভ্যতার প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। শুধুমাত্র প্রাচীন মিশরীয়ই নয় মিশরের ইসলামী ঐতিহ্য ফরাসীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। ফরাসী প্রশাসক ও কর্মচারীবৃন্দ ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাস থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট পর্যন্ত মিশরে অবস্থানকালে স্থানীয় বুদ্ধিজীবী, মোল্লাশ্রেণী ও শাসকগোষ্ঠীর সহচর্যে আসেন এবং দীর্ঘ দিনের ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করেন যে, বলপূর্বক বিজাতীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এতদসত্ত্বেও উদারনৈতিক মনোভাব এবং সমঝোতার মধ্য দিয়ে মিশরে ফরাসী প্রভাবের ফলে প্রাচীন ঘুনে ধরা সমাজ পরিবর্তিত হতে থাকে।

প্রশাসনিক ফলাফল ; পূর্বাবস্থা ঃ নেপোলিয়ন বেনোপার্টের মিশর বিজয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনে। প্রাচীন শাসনব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করে ইউরোপীয় শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়। মামলুক বংশের পতনে সমগ্র মিশর অটমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু প্রদেশ হিসেবে মিশরে কতিপয় মামলুক শাসনকর্তা অথবা বে অটমান ভাইসরয়ের অধীনে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। অটমান সাম্রাজ্যের ক্ষমতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে হ্রাস পেলে মিশরের মামলুক শাসনকর্তাগণই প্রকৃতপক্ষে মিশরের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা হয়ে উঠেন। কায়রোর প্রধান মামলুককে বলা হত "শেখ-আর-বালাদ"। নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের প্রাক্কালে মিশর দ্বৈত শাসনের ফলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা, প্রশাসনিক সঙ্কট ও অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৭৬৩ সালে আলী বে 'শেখ-আল-বালাদ' নিযুক্ত হলে তিনি অটমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মিশরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন এবং ১৭৮৯ সালে মিশর মুরাদ ও ইব্রাহিম নামক দু'জন মামলুক বে কর্তৃক

www.pathagar.com

শাসিত ছিল। এসময় মিশরের জনসংখ্যা ছিল আড়াই মিলিয়ন এবং প্রধানত; দু'টি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল মুসলমান ও খ্রিস্টান কপট। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন কপট সম্প্রদায়; শাসকগোষ্ঠী অবশ্যই মুসলমান ছিল।

নেপোলিয়নী সংস্কার ঃ মিশর ফরাসীদের দখলে আসার পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাসে মিশরীয়গণ সর্বপ্রথম একটি সুসংঘবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত হয়। ফরাসী শাসনকর্তা এই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কতিপয় প্রদেশ সৃষ্টিকরে শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাস করা হয়। ভাটিকিউটিস বলেন, "মিশরীয়দের পক্ষ থেকে যেমন সাড়াই পাওয়া যাক না কেন নেপোলিয়ন কর্তৃক জারীকৃত আদেশ নামায় স্থানীয় সরকারের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণরূপে অভিনব ছিল। নেপোলিয়ন সহজেই উপলব্ধি করেন যে, উত্তর আফ্রিকার একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ফরাসী শাসন বলবৎ করতে হলে স্থানীয় উলেমা ও শেখ সম্প্রদায়ের সহযোগিতা অবশ্যই কাম্য। স্থানীয় সরকার গঠনে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অংশ গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন প্রশাসনকে সুদূরপ্রসারী করা হয় অন্যদিকে স্থানীয় নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমও জাগরিত হয়। স্থানীয় প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রশাসনিক কাউন্সিল বা 'দিওয়ান' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৭৯৮ সালে একটি ডিক্রী জারী করে নেপোলিয়ান এই 'দিওয়ান' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সদস্যদের মধ্য থেকে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নির্দেশ দেন। এই 'দিওয়ান' কায়রোর বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল, যদিও এর ক্ষমতা ছিল সীমিত। ফরাসী সামরিক গভর্নর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সামরিক গভর্নর দিওয়ানের প্রধান কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করতেন এবং দিওয়ান নিম্নতর কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন। উল্লেখ্য যে, দিওয়ানের কোন ফরাসী কর্মকর্তা ছিল না, কারণ নেপোলিয়ন স্থানীয় প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করেন নি। ফরাসীদের প্রবর্তিত কেন্দ্রীয় সরকার ছিল খুবই ক্ষমতাশালী এবং রাজধানী কায়রোর প্রশাসন এই সরকার পরিচালনা করত। রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় সরকার গঠিত হয়। প্রদেশে কাউন্সিলের প্রধান দায়িত্ব ছিল স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা করা। এই কাউন্সিলে স্থানীয় ও ফরাসী প্রতিনিধি নিযুক্ত হত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের জন্য নেপোলিয়ন ১৭৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলে সদস্যদের মধ্যে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন। সাধারণভাবে এই সভা 'দিওয়ান-ই-আম' নামে পরিচিত ছিল।

সাধারণ সভা ('দিওয়ান-ই-আম') নেপোলিয়ন বোনাপার্টের প্রশাসনিক সংস্কারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রশাসনের সাথে স্থানীয় নেতৃত্বের সংযোগ রক্ষা করা। এই কারণে স্থানীয় প্রভাবশালী উলেমা ও শেখদের তিনি উপদেষ্টা কাউন্সিল এবং প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকারের সঙ্গে জড়িত করতেন। ভাটিকিউটিস নেপোলিয়নের এই যুগান্তকরী, উদার ও গণতন্ত্রপন্থী প্রশাসনিক নীতির ভুয়াসী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, ফরাসী সম্রাট কর্তৃক প্রবর্তিত প্রশাসনিক সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যে ছিল; (১)

www.pathagar.com

গণ প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় সরকার গঠন; (২) মিশরীয়দের উপযোগী বেসামরিক ও অপরাধমূলক আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ; (৩) উত্তরাধিকার সম্পর্কিত (Law of Inheritance) আইন প্রণয়ন; (৪) জমিদার প্রথা, জমি জরীপ এবং সুষ্ঠু কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, অটমান সুলতানদের অধীনস্থ মিশরের স্থানীয় অধিবাসী ও নাগরিকদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে এ ধরনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী প্রশাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করা। প্রখ্যাত মিশরীয় ঐতিহাসিক আবদুর রহমান আল-জাবারতী বলেন যে, "দিওয়ান-ই-খাসের তিনটি প্রধান দায়িত্ব ছিল; বিশেষ করে (১) ধর্মীয় বা শারিয়া কোর্ট এবং বিচারালয়; (২) জমিদার প্রথা এবং (৩) উত্তরাধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে।" ১৭৯৮ সালের অক্টোবর মাসে দিওয়ান-ই-আমের প্রথম বৈঠকে তিনি বলেন যে, মিশর প্রাচুর্যের দেশ এবং সকল রাষ্ট্রের শৈল দৃষ্টি এই দেশের উপর রয়েছে। এ ছাড়া তিনি নির্যাতনমূলক অটমান শাসনের উল্লেখ করেন। এর ফলে অটমান সুলতান নেপোলিয়নের বিরোধিতা করে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তা লাভ করেন। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, নেপোলিয়নের মিশর বিজয় তাঁর বহুল আলোচিত "প্রাচ্য পরিকল্পনার বহিঃপ্রকাশ এবং ইংল্যান্ডকে ধ্বংস করার জন্য মহাদেশীয় (অর্থনৈতিক অবরোধ) ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহণ করেন। তার ধারণা ছিল মিশর দখল করতে পারলে ইংল্যান্ডের বাণিজ্য পথ রুদ্ধ হবে। তিনি ইংল্যান্ডের সম্ভাব্য আক্রমনের আশঙ্কায় স্থানীয় মিশরীয়দের সঙ্গে সৌহার্দ্যভাব গড়ে তোলেন। সুতরাং তাঁর প্রশাসনিক সংস্কার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল। এতদসত্ত্বেও, প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকার, পরামর্শ কাউন্সিল, গোপন ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন প্রভৃতি ফরাসী প্রশাসনের অবদান বলা যায়।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্কার ; মিশরীয় ইনষ্টিটিউট ঃ ভাটিকিউটিস মন্তব্য করেন, "মিশরে নেপোলিয়নের অভিযান সামরিক দিক থেকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও মিশর ও ইউরোপের জন্য বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে তাঁর অভিযানের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী (monumental)।" সরকার গঠনেই নেপোলিয়ন এক অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি, তিনি শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলার চর্চা ও গবেষণার জন্য একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপন করেন। এই মিশরীয় ইনষ্টিটিউটটি মূলতঃ নেপোলিয়নের সঙ্গে মিশরে আগত বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক, কারিগর, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের জন্য সৃষ্টি করা হয়। ১৭৯৮ সালের ২২শে আগস্ট তারিখে তিনি একটি ডিক্রী জারি করে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করেন; (১) মিশর সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গবেষণা; (২) মিশর সম্পর্কিত প্রাকৃতিক, শিল্প, কল-কারখানা এবং ঐতিহাসিক তথ্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান; (৩) সরকারি নীতি নির্ধারণে সরকারকে পরামর্শ দান। নেপোলিয়ন তাঁর উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার জন্য মিশরীয় ইনষ্টিটিউটকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেন; (১) অঙ্কশাস্ত্র; (২) পদার্থবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান; (৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি; (৪) সাহিত্য ও শিল্পকলা। এই ইনষ্টিটিউটকে প্রতি তিন মাস অন্তর তাদের গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী ঃ নেপোলিয়ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইনষ্টিটিউটটি মিশরীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। মিশরের আধুনিক করণের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই ইনষ্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নেপোলিয়ন মিশরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার প্রবর্তন করেন। ফরাসী প্রকৌশলীগণ সর্বপ্রথম মিশরীয় সম্পদের একটি জরীপ করেন এবং তেল (fuel), জল বিদ্যুৎ এবং কল-কারখানায় ব্যবহারযোগ্য কাঁচামালের অনুসন্ধান করেন। তারাই সর্বপ্রথম বারুদ তৈরির জন্য কাঁচামালের সন্ধান পান। মিশরে ফরাসী উদ্যোগে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হল যার ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। রিফাত বে ('The Awakening of Modern Egypt') বলেন, "এগুলি মিশরীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শক্তির প্রয়োগ ও সাংগঠনিক তৎপরতায় নতুন বিশ্ব সম্বন্ধে তাদের চক্ষু উন্মোচিত করে।" ইনষ্টিটিউট কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা করে বিভিন্ন কৃষি পণ্য উৎপাদনে পরামর্শ দেয়, যেমন আঙ্গুর ও গম। মরুভূমিতে পাইপ বসিয়ে সেচের ব্যবস্থা করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠান জীব ও উদ্ভিদ সম্পদের উপর গবেষণা পরিচালনা করে। ভৌগোলিক জরীপ দ্বারা খনিজ সম্পদ, উর্বর ভূমি, হ্রদ, মরুদ্যানের সন্ধান দ্বারা এই ইনষ্টিটিউট মিশরীয় অর্থনীতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এই প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাসায়নিক ও পদার্থবিদ্যার গবেষণার জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ইনষ্টিটিউট মিশরীয় অর্থনীতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এই প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাসায়নিক ও পদার্থ বিদ্যার গবেষণার জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ইনষ্টিটিউটটের অবদান অনস্বীকার্য। ফরাসী শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয় এবং দেশের সর্বত্র স্কুল বা (Lyceum) প্রতিষ্ঠা করা হয়। কলেজ, কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্র ও গণস্বাস্থ্য উন্নতির জন্য হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ফরাসীরা মিশরে সর্বপ্রথম একটি সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উন্নয়নে ফরাসীগণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিশেষ করে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার দ্বারোদ্ঘাটন করেন নেপোলিয়ান। তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পুরাকীর্তির একটি জরিপ করেন এবং অসংখ্য গ্রন্থে তাঁদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রত্নতত্ত্বের উদ্ভাবন হয় ফরাসী বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা। তাঁরাই প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, জরীপ ও অনুসন্ধানের পথিকৃত ছিলেন।

মুদ্রণযন্ত্র ও প্রকাশনা ঃ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফরাসীগণ মিশরে সর্বপ্রথম আরবি মুদ্রণ যন্ত্র প্রবর্তনকরেন। এ ছাড়া তারাই মিশরে সর্বপ্রথম প্রকাশনা শুরু কলে। ফরাসী ভাষার চর্চার পাশাপাশি জাতীয় ভাষা আরবি চর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র (Printing Press) অনন্য ভূমিকা রাখে। মুদ্রণের প্রচলন হলে মিশরে ফরাসীগণ একটি সরকারি প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করে। তারাই প্রথম একটি রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে, যার নাম ছিল "Courier del' Egypte"। এ ছাড়া মাসিক একটি অর্থনীতি সংক্রান্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যা "L Decade Egyptienne" নামে পরিচিত ছিল। মুদ্রণযন্ত্র প্রসঙ্গে বলা যায় যে, নেপোলিয়ন ভ্যাটিকান থেকে আরবি মুদ্রাক্ষর সংগ্রহ করেন এবং মারসে (Marcel) নামে একজন প্রাচ্যবিদকে (Orientalist) এই প্রেসের পরিচালক নিযুক্ত করেন। এই প্রেস থেকে আরবি ভাষায়

www.pathagar.com

ফরাসী সরকারের নির্দেশ নামা ছাপা ও প্রকাশিত হত। মুদ্রণযন্ত্র ও প্রকাশনা পরবর্তীকালে মিশরীয়দের জ্ঞান বিস্তার ও রাজনৈতিক চেতনাবোধের উন্মেষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে মোহাম্মদ আলীর শাসনামলে মিশরে সর্বপ্রথম সরকারি প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। যা, "বুলাক মুদ্রণ যন্ত্র" (Bulaq) নামে পরিচিত ছিল। ১৮২২ সালে 'বুলাক' নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত এই মুদ্রণ যন্ত্রটি নিঃসন্দেহে নেপোলিয়ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণ যন্ত্রের পূর্বসূরী।

ধর্মীয় সংস্কার ঃ ফরাসীদের আগমনে মিশরীয়দের মনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়। রাজনৈতিক চেতনাবোধের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কারে তাদের উদার মনোভাব প্রকাশ পায়। রোমের পোপ ও মাল্টার নাইটদের পরাজিত করে নেপোলিয়ন মিশরীয় মুসলমানদের মনে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। ধর্মীয় বৈষম্য দূর করে সহনশীলতার নীতি প্রচারিত হয়। মিশরে নেপোলিয়নের শাসনামলে উলেমাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং অনেক মসজিদ স্থাপিত হয়। অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থে নেপোলিয়ন উলামাদের প্রাধান্য স্বীকার করেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ নেপোলিয়নীয় নীতির পরিপন্থী ছিল এবং তিনি নিজেকে মিশরে গিয়ে একজন মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেন। অবশ্য তাঁর ইসলাম প্রীতি ক্ষণস্থায়ী ছিল। কারণ যখন তিনি অটমান সুলতানের বিরোধিতা করেন তখন নেপোলিয়নকে মিশর থেকে বিতাড়িত করার জন্য সুলতান ব্রিটিশদের সাহায্য কামনা করেন। ১৮৯৯ সালে একরে দখল করতে ব্যর্থ হলে নেপোলিয়ন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু তাঁর ফরাসী গভর্নর জেনারেল মেন (Menou) ফরাসী বাহিনীতে নেতৃত্ব দেন। অবশেষে ব্রিটিশ প্রতিরোধ এবং স্থানীয় মিশরীয় উলামাদের বিরোধিতায় তিনি তাঁর সৈন্য সামন্তসহ ১৮০১ সালের সেপ্টেম্বরে মিশর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফরাসীদের মিশর ত্যাগের ফলে যে রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় তার ফলেই আধুনিক মিশরের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলীর আবির্ভাব হয়। তিনিই মিশরকে মধ্যযুগীয় একটি অটমান প্রদেশ থেকে আধা-ইউরোপীয় আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন। ১৮০১ সালে ফরাসীদের প্রত্যাগমনে মিশরীয় ইনষ্টিটিউট বন্ধ হয়ে গেলেও জোমার্দের (Jomard) নেতৃত্বে ১৮৫৯ সালে আলেকজান্দ্রিয়ার এই প্রতিষ্ঠানটি পুনঃজীবিত হয়। রিফাত বে বলেন, "এটি ফরাসীবাসীদের নিশ্চিত গর্ব যে তারা মিশরে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিফল হলেও রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধুনিক মিশরের দ্বার উন্মোচন করেন।"

উপসংহার ঃ নেপোলিয়নের মিশর বিজয় মিশরীয়দের জন্য আশির্বাদ স্বরূপ ছিল।

২. মোহাম্মদ আলী পাশা (১৮০৫-১৮৪৯)

ক্ষমতালাভ ঃ ১৮০১ সালে ফরাসিদের মিশর ত্যাগের পরেই সেখানে পুনরায় তুর্কী মামলুকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তুর্কী ও মামলুকদের মধ্যে বৈরী মনোভাব, বিভিন্ন তুর্কী গোত্রের মধ্যে মনোমালিন্য ও কোন্দল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে মিশরে একটি অরাজকতাপূর্ণ যুগের সৃষ্টি হয়। মিশর অটমান তুরস্কের সরাসরি শাসনে

www.pathagar.com

চলে গেলে সুলতান মোহাম্মদ আলী নামক একজন উচ্চাভিলাষী ও দক্ষ আলবেনীয় সামরিক অফিসারকে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তুর্কী সুলতানের অধীনে শাসনকার্য নির্বাহ করলেও তিনি স্বাধীনভাবে মিশরে রাজত্ব করেন।

প্রাথমিক জীবন ঃ মোহাম্মদ আলী এজিয়ান সাগরে তীরবর্তী কাভাল্লা নামক একটি ক্ষুদ্র মেসিডোনীয় বন্দরে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা ছিলেন খুবই দরিদ্র এবং তিনি কাভাল্লায় বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি একজন ফরাসী তামাক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ করেন। তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়ে সামরিক স্কুলে যোগদান করেন। নেপোলিয়নের মিশর অভিযানকালে তিনি তুর্কী সুলতানের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তুরস্ক যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে স্বীয় দক্ষতা, শৌর্য ও বিচক্ষণতার জন্য মোহাম্মদ আলী সেনাপতির পদে পদোন্নতি লাভ করে। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে আমেন্সের চুক্তি মোতাবেক যখন ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড মিশর ত্যাগ করে তখন তিনি তুর্কী সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত মিশরের পাশার অধীনে কর্মরত ছিলেন। উচ্চভিলাসী মোহাম্মদ আলী তুর্কী ও মামলুক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে একটি নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করেন এবং পরিশেষে তুর্কী শাসনকর্তা খুরশীদ পাশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। মিশরীয় জনগণের সমর্থন লাভ করে তিনি শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী সুলতান তাঁকে শাসনকর্তা বা পাশা (গভর্নর) হিসেবে স্বীকৃতি দেন। বলা বাহুল্য যে, মিশর হতে ফরাসীদের বিতাড়িত করার জন্য যে বিদ্রোহ হয় তাতে তিনি বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ করেন। এই কারণে সুলতান তাঁর পদোন্নতি অনুমোদন করেন।

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ঃ ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ আলী গভর্নর নিযুক্ত হলেও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সুযোগে তিনি মিশরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। এই কারণে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী সুলতান নৌ-অধ্যক্ষ সালেহ পাশার নেতৃত্বে একটি নৌবহর মিশরে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের মধ্যস্থতায় মামলুকগণ সুলতানের সঙ্গে একটি আপোষ এবং মোহাম্মদ আলীকে পদচ্যুত করার পরিকল্পনা করে। ইত্যবসরে মিশরে জাতীয়তাবাদীগণ মোহাম্মদ আলীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মামলুক ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তিনি উলামা ও শেখ সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করেন। সুলতান মোহাম্মদ আলীকে স্যালোনিকায় বদলি করলে জাতীয়তাবাদী দল এর বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদ আলীকে সুলতান 'পাশা' হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। মিশরের শাসনকর্তা হিসেবে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মোহাম্মদ আলী একটি মারাত্মক সঙ্কটের সম্মুখীন হন। মামলুক নেতা আলফী বে'র সঙ্গে ইংল্যান্ডের একটি গোপন চুক্তির ফলে একটি ব্রিটিশ নৌবহর মিশর আক্রমণ এবং আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করে। আলফীর মৃত্যু এবং মোহাম্মদ আলীর 'পাশা' হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পরেও এই ঘৃণ্য বৈদেশিক আক্রমণ রোধের জন্য জাতীয়বাদীগণ সংঘবদ্ধ হয়। রোজেটা আক্রমণকালে ইংরেজ বাহিনী মিশরীয়দের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং মামলুকগণ জাতীয়তাবাদী

www.pathagar.com

দলের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়। মোহাম্মদ আলী ইংরেজগণকে মিশর হতে বিতাড়িত করার জন্য একটি বিশাল বাহিনী গঠন করেন। ইংরেজগণ পরাজিত হয়ে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। মিশরীয়দের সামরিক বিজয় মোহাম্মদ আলীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তিনি মিশরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে পরিগণিত হন। বৈদেশিক শত্রুর কবল হতে মিশরকে রক্ষা করে মোহাম্মদ আলী স্বাধীন মিশরের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা লাভ করেন।

সংস্কারসমূহ ; আধুনিক মিশরের প্রতিষ্ঠাতা ঃ রিফাত বে বলেন, "মোহাম্মদ আলী সংস্কার এবং প্রগতির একটি সমুজ্জ্বল একনায়কত্বের ভূমিকা পালন করেন এবং অটমান সাম্রাজ্যের একটি সামান্য প্রদেশকে তার মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে জাতীয়তাবাদী অধিকার পুষ্ট সভ্য রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সমতুল্য একটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন।" মোহাম্মদ আলীকে আধুনিক মিশরের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা যায়, ঠিক যেভাবে কামাল আতাতুর্ক আধুনিক তুরস্কের জন্মদাতা ছিলেন। হিট্টি বলেন, "তিনি যে প্রকারের পদক্ষেপ, কর্মদক্ষতা এবং দূরদর্শিতা প্রদর্শন ও প্রয়োগ করেন তা তাঁর মুসলমান সমসাময়িকদের মধ্যে তুলনাহীন।" অতি সাধারণ অবস্থা থেকে মোহাম্মদ আলী মিশরের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হন। প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ধুলিস্যাৎ করে তিনি মধ্যযুগীয় অটমান পরিবেশের মূলে কুঠারঘাত করেন। পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি মিশরকে একটি আধুনিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস পান। তিনি ফ্রান্স থেকে প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ, সেনাধ্যক্ষ, আইনজ্ঞদের স্বদেশে আমন্ত্রণ জানান। এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম বিশ্বে প্রগতিবাদী চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব প্রবর্তনের প্রয়াসী হন।

ভূমিসংস্কারের নীতিমালা ঃ মোহাম্মদ আলী একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কার ছিলেন। তিনিই ইসলামী বিশ্বের প্রথম শাসক যিনি ক্ষমতালাভ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন জনহিতকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মধ্যযুগীয় অর্থনীতিকে আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্রের উপযোগী করে বিভিন্ন সংস্কারমূলক নীতি গ্রহণ করেন। মিশরীয় অর্থনীতির রূপান্তরে তাঁর প্রখ্যাত ও জনমঙ্গলকর ভূমিসংস্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি ছিল প্রাচীন কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দ্বারা কৃষি উৎপাদন ও রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি। ক্ষমতালাভের অর্থাৎ ১৮০৫ সালের পূর্বে মিশরের সমস্ত জমি ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকার নিয়ন্ত্রিত জমি জায়গীর দেওয়া হত যা tax-farming নামে পরিচিত। মিশরীয় ভাষায় 'ইলতিযাম' নামে পরিচিত এই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী জায়গীরদার বা 'মোলতাসিম'গণ অনির্দিষ্টকালের জন্য জমি ভোগ দখল করতে পারত এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক কর দিত সরকারকে। এই সমস্ত 'মোলতাসিম'গণ নির্যাতন করে কৃষকদের নিকট থেকে ইচ্ছামত কর আদায় করতে পারত। এভাবে কৃষককুল নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক ক্লেষের সম্মুখীন হয়। পূর্বে জায়গীর সাময়িকভাবে দেওয়া হলেও ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পর আজীবন জায়গীর দেওয়া শুরু হয়। উল্লেখ যে,

www.pathagar.com

এই জায়গীর ভোগ করতেন গ্রামের জোতদার শ্রেণী, প্রভাবশালী কর্মকর্তা, সামরিক বাহিনীর সদস্যবর্গ এবং তারা শোষণ নীতির বশবর্তী হয়ে কৃষককুলকে নিঃস্ব করে ফেলে। মোহাম্মদ আলী পাশার ভূমি সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তুর্কী ও মামলুকদের প্রদত্ত সমস্ত জমি রাষ্ট্রীকরণ করা হয়।

রাষ্ট্রীয়করণ নীতি ঃ মোহাম্মদ আলী অর্থনৈতিক সঙ্কট দূরীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করার চিন্তা-ভাবনা করেন এবং এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য জোতদারী, জায়গীরদারী ও স্বত্বভোগী শ্রেণীদের নিকট বরাদ্দকৃত ভূমি রাষ্ট্রীয়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিশরের সমগ্র ভূমি জরিপের নির্দেশ দেন। ভূমি সংস্কার নীতি বাস্তবায়নে তিনি মূলতঃ দুটি সমস্যা চিহ্নিত করেন; (১) জোতদারী (tax-farming) রাষ্ট্রকে ভূমি থেকে প্রাপ্য সরকারের প্রকৃত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করে; (২) জোতদারী কৃষকদের উপর নির্যাতন চালিয়ে বিত্তশালী হবার সুযোগ দেয় এবং জোতদারগণ ক্রমশঃ মিশরের উপর পাশার একচ্ছত্র ক্ষমতার হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। মোহাম্মদ আলী উলামা শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার জন্য শঙ্কিত হয়ে উঠেন এবং মনে করেন যে এর প্রধান কারণ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'ওয়াক্‌ফ' এবং রিযাক আব্বাসীয়া' (waqf and rizaq abbasiyya) থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব, যা থেকে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে। এই কারণে পাশা পূর্বে বরাদ্ধকৃত রাজস্ব আদায়কৃত জমি রাষ্ট্রীয়করণ, ব্যক্তিগত পর্যায় বরাদ্ধকৃত জমি বাজেয়াপ্ত এবং ধর্মীয় সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ('ওয়াকফ') সরকারী নিয়ন্ত্রণ আনেন।

রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে মোহাম্মদ আলী মামলুকদের কায়রোর দুর্গে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের ক্ষমতা চিরতরে বিলুপ্তই করেন নি বরং তাদের জমি-জমা বাজেয়াপ্ত করেন। 'ইলতিযাম' বা জোতদারী উচ্ছেদ করা হয় এবং 'মোলতাসিম'দের দখলে সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তিনি এমন কি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানসমূহে বরাদ্দকৃত জমি বা 'ওয়াক্‌ফ' সম্পত্তির উপর কর নির্ধারণ করেন। অবশ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন বাগান এই করের বহির্ভুত ছিল। ১৮০৯ থেকে ১৮১৪ সালে পর্যন্ত মোহাম্মদ আলী তাঁর নীতিতে অটল ছিলেন। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উপর রাজস্ব ধার্য করা হলে উলেমাগোষ্ঠী, এমন কি আল-আযহারের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। ভূমি সংস্কারের নীতি বাস্তবায়নের জন্য তিনি ১৮১৪ থেকে ১৮১৬ সালের মধ্যে দেশব্যাপী জমি সংক্রান্ত জরিপ (cadastral survey) পরিচালনা করা হয়। নতুন নীতি প্রবর্তনে রাষ্ট্রীয়কৃত বাজেয়াপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত সমস্ত জমি এক একটি গ্রামীণ সম্প্রদায়কে বরাদ্ধ করা হয় এবং এই সম্প্রদায় সরকারকে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকত। এই নিয়মানুযায়ী ভূমিহীন কৃষক বা 'ফেলাহীন' জমির মালিক না হলেও সে বংশপরম্পরায় একই জমি চাষ করতে পারত। রাষ্ট্রীয়করণের ফলে নির্যাতীত ও শোষিত কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং এর ফলে একদিকে সরকারের যেমন রাজস্ব বৃদ্ধি পায় অন্য দিকে কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। ১৮০৫ থেকে ১৮১৬ সালের মধ্যে মাত্র ১০ বছর তিনি ভূমি সংক্রান্ত সংস্কারের (agrarian reform) দ্বারা সমগ্র মিশরের জমি রাষ্ট্রীয়করণে সমর্থ হন।

www.pathagar.com

ভূমিবন্টন ঃ মোহাম্মদ আলীর ভূমি সংস্কার সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। তাঁর শাসনামলে সমগ্র মিশরকে একটি বিরাটকার কৃষি উপযোগী ভূ-সম্পত্তি বলে মনে করা হত। ("Thus Egypt became nearly one great farm held at nominal rental of the state")। 'ইলতিযাম' পদ্ধতি বিলুপ্ত করে মোহাম্মদ আলী গ্রামের প্রধান এবং কৃষকদের মধ্যে সরাসরী জমি বন্টনের ব্যবস্থা করেন। তিনি জমির স্বত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করেন যাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূ-স্বামী শ্রেণীর (Private ownership) উদ্ভব না হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁর নীতি পরিবর্তিত করে ১৮২৯-৩০ সালে রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পতিত ও অকর্ষিত জমি বন্টন করেন। এই ব্যবস্থার একটি শর্ত ছিল যে, জমির মালিককে ভূমিকর্ষণ দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সরকারকে পর্যাপ্ত রাজস্ব প্রদান করতে হবে। এই ব্যবস্থা 'ইবাদিয়া' (Ibadiyya) নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় প্রথম দিকে জমির মালিক ভূমি স্বত্ব লাভ করত না, কেবল জমি চাষের অধিকার ছিল কিন্তু ১৮৩৬ সালে সন্তান পিতার জমির প্রকৃত মালিক হয়ে পড়ে। ১৮৪২ সালে এই সমস্ত জমির মালিক স্বত্বাধিকারী হয়ে যায়। ১৮৪৬ সালে আইনসঙ্গত ভাবে জমির মালিক জমি বন্ধক, বিক্রি অথবা হস্তান্তর করার অধিকার লাভ করে। মোহাম্মদ আলীর ভূমি সংস্কারে অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভূমি বন্টন ব্যবস্থা এবং তিনি তিন প্রকার পন্থার উদ্ভাবন করেন। প্রথমতঃ 'ইবাদিয়া', দ্বিতীয়তঃ 'সিফতলিক' (Ciftlik) এবং তৃতীয়তঃ 'উহদা' (Uhda)। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে মোহাম্মদ আলী ব্যক্তিগত মালিকানা বিরোধী হলেও, প্রাচীন অটমান রীতি অনুযায়ী তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে জমি বন্টন করেন। এই পদ্ধতি 'সিফতলিক' নামে পরিচিত। এই পদ্ধতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে সমগ্র মিশরের চাষ উপযোগী জমির এক-ষষ্ঠাংশ তার পরিবারের দখলে চলে যায়। তৃতীয় পদ্ধতিতে সমগ্র গ্রাম বা অঞ্চল উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী, গভর্নর, সামরিক, অফিসার, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়, যার ফলে নিয়মিতভাবে সরকার রাজস্ব আদায় করতে পারতেন। 'উহদা' নামে পরিচিত এই ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাচীন জায়গীর প্রথা 'ইলতিযাম'-এর প্রভেদ হচ্ছে এই যে, পাশা এই সমস্ত জমিতে রাজস্ব নির্ধারিত করতেন এবং জমির মালিক অধিক হারে কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করতে পারতেন না। যাহোক, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মোহাম্মদ আলীর শাসনামলে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। জমির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচের ব্যবস্থা ছিল। উৎপাদিত শস্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ধান, আখ, গম, তুলা ও নীল। নীল নদের মোহনা থেকে খাল কেটে শুষ্ক ভূখণ্ডে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়।

সামরিক সংগঠন ঃ সামরিক বাহিনী গঠন ঃ মোহাম্মদ আলী তাঁর শাসনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি শক্তিশালী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সামরিক বাহিনী গঠন করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তুর্কী ও মামলুক বাহিনী দ্বারা রাষ্ট্র সংগঠন এবং নিরাপত্তা রক্ষা সম্ভব হবে না। এই কারণে তিনি তুরস্কের সুলতান তৃতীয় সেলিম এবং

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মাহমুদের মত মোহাম্মদ আলী তাঁর শাসনকালের স্থায়িত্বের জন্য এবং নতুন যুগের সূচনায় একটি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়াস পান। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসন এবং বিদেশে যুদ্ধাভিযানের জন্য তাঁর একটি বিশাল সেনাদলের প্রয়োজন ছিল। তিনি ইংরেজ নৌবহরের তৎপরতা এবং স্থলবাহিনীর দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিশরীয় বাহিনী গঠনে মনস্থ করেন। এই সামরিক সংগঠনের অন্তরায় ছিল মামলুকগণ এবং এই কারণে মহিলা ও শিশু ব্যতীত প্রায় সকল মামলুককে নিধন করা হয়। ১৮২০ সালে পাশার সেনাবাহিনীতে ছিল অনিয়মিত ও উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদল। তিনি এই বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দ্বারা সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী বাহিনীতে রূপান্তরিত করতে ব্যর্থ হলে তিনি এই বাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে একটি নতুন ও ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন নৌবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ইউরোপীয় প্রশিক্ষক নিযুক্ত করে এবং আধুনিক ইউরোপীয় সমরাস্ত্রে একটি আধুনিক মিশরীয় বাহিনী গঠন করেন। ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নী সাম্রাজ্যের পতন হলেও মিশরে বসবাসকারী ফরাসী প্রকৌশলী ও সামরিক কর্মকর্তা বসবাস করতে থাকেন। মোহাম্মদ আলী সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফরাসী কর্নেল সেভেস (Seves) এই ফরাসী সেনাধ্যক্ষ মিশরীয় বাহিনীর আধুনিকীকরণে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সোলায়মান পাশা আল-ফারানেসাভী (ফরাসীবাসী) নাম ধারণ করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও দক্ষতায় মিশরীয় বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হয় এবং এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় এক লক্ষে।

সামরিক প্রশিক্ষণ ঃ কর্নেল সেভেসের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মিশরীয় বাহিনীর প্রথম ব্যাচ আসওয়ানে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সামরিক স্কুলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। মোহাম্মদ আলী পাশার দূরদর্শিতায় মিশরে যে আধুনিক সেনাবাহিনী গঠিত হয় তাতে তুর্কী ও আলবেনীয়দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; কারণ তারা দুর্ধর্ষ ও উশৃঙ্খল ছিল। তিনি সেনাবাহিনীতে কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করেন; কারণ এর ফলে কৃষি উপাদন ব্যাহত হবে। নতুন ক্যাডেট সংগ্রহের জন্য (Conscription) বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে ভর্তি করা হত এবং মোহাম্মদ আলী নতুন সৈন্য সংগ্রহের জন্য সুদানে অভিযান করেন। সুদানের কোরদোফান এবং সেন্নার অঞ্চল থেকে মোট ২০,০০০ সুদানী সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় তাদের সংখ্যা কমে যায়। অতঃপর তিনি মিশরীয়দের নিয়েই মিশরীয় বাহিনী গঠনের মনস্থ করেন। ১৮২৩ সালের মধ্যে এরূপ আটটি ব্যাটলিয়ন গঠিত হয়। এর ফলে মিশরীয় বাহিনী একটি অপরাজেয় সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। এর ফলে এশিয়া ও ইউরোপের রণাঙ্গনে তাঁরা সুখ্যাতি অর্জন করেন। ফরাসী পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ লাভ করে মিশরীয় বাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়। কঠোর শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে সৈন্যদের থাকতে হত এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ডেমিট্টায় পদাতিক বাহিনীর স্কুল, গির্জায় অশ্বারোহী বাহিনীর স্কুল, তুরায় গোলন্দাজ বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খানকায় স্টাফ কলেজ এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় নৌ-বাহিনীর কলেজ স্থাপিত হয়। রিফাত বে বলেন যে, "১৮৩৯ সালের মধ্যে মোহাম্মদ

www.pathagar.com

আলীর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২,০০,০০০-এ দাঁড়ায়; এর মধ্যে ১,৩০,০০০ সৈন্য ছিল নিয়মিত।" আধুনিক সমর বিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিশরীয় বাহিনীর সমরবিজয় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মোহাম্মদ আলী সুদান অভিযানের সাফল্যের পর তাঁর পুত্র ওমর তুসুনের নেতৃত্বে মিশরীয় বাহিনীকে আরবদেশের ওয়াহাবীদের দৌদণ্ডপ্রতাপ ধ্বংসের জন্য একটি সেনাবাহিনী পাঠান। ইবনে সাউদ তুসুনের বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করলে মোহাম্মদ আলী স্বয়ং হেজাজে গমন করেন। তুসুনের মৃত্যুর পর মিশরীয় বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন তদীয় ভ্রাতা ইব্রাহিম। ইব্রাহিম ওয়াহাবীদের রাজধানী দারিয়া দখল করেন। ১৮১১ থেকে ১৮২৩ সালের মধ্যে মোহাম্মদ আলী আবরদেশের সমরাভিযান প্রেরণ করেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে আবদুল্লাহ ইবনে সাউদকে প্রথমে বন্দী করেন এবং পরে তিনি ইস্তাম্বুলে নিহত হন। ক্রমশঃ হেজাজের অবস্থিত পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা ও হারামাইন মিশরীয় পাশার অধীনে আসে। মোহাম্মদ আলী স্বীয় পুত্র ইব্রাহিমকে আরবদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৮২০ সালে সেনাবাহিনীতে ক্যাডেট লাভের জন্য এবং খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য সুদানে মিশরীয় বাহিনী অভিযান করে। সুদানের রাজধানী খার্তুম শহরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনি সিরিয়ায় অভিযান করেন এক বিরাট নৌবহরের সহায়তায়।

নৌবহর ঃ মোহাম্মদ আলী পাশা বিশাল সেনাবাহিনী গঠনের পাশাপাশি একটি শক্তিশালী নৌ-বহর গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে নৌ-বাহিনী ব্যতীত শক্তিশালী ইংরেজ, তুর্কী ও গ্রীকদের নৌ-বহরের সঙ্গে মোকাবেলা করা সম্ভবপর নয়। মোহাম্মদ আলী নৌ-বাহিনী পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করার জন্য তুলোবাসী ফরাসী নৌধ্যক্ষ লেফেবর দ্যা কেরিসীকে (Lefebure de Cerisy) দায়িত্ব দেন। কেরিসীর নেতৃত্বে ভূমধ্যসাগরে মিশরীয় নৌবহর গঠিত হয়। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় ১৮২৯-৩০ সালে একটি নৌ-বিদ্যার কলেজ এবং গোলাবারুদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই নৌ-বন্দর নৌসেনার শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোহাম্মদ আলী কামানসহ ১১টি নৌ-তরী, ৬টি ফ্রিগেড এবং অসংখ্য রণতরী নির্মিত হয়। সামরিক কারখানায় বিদেশীদের নিয়োগ করা হয় বিশেষ করে ফরাসী-ইতালীয় ও গ্রীকদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। ড. ব্রাউন বলেন, "পোশাক ব্যতীত মিশরীয় নৌ-বাহিনীকে সুশৃঙ্খল ইউরোপীয় নৌ-বাহিনীর সঙ্গে পার্থক্য করা যায় না।" বলা বাহুল্য, সেনাবাহিনী সংগঠন, জাহাজ নির্মাণ, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানা মোহাম্মদ আলীকে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় যুদ্ধাভিযানে সহায়তা করে। তাঁর পুত্র ইব্রাহিম ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ক্রীট এবং মোরিয় দখল করেন। অবশ্য ১৮২৭ সালে নাভারিনোর যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ নৌ-ভিযানের ফলে তিনি পরাজয় বরণ করেন।

প্রশাসনিক সংস্কার ; কেন্দ্রীয় সরকার ঃ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসে মোহাম্মদ আলীর বিশেষ অবদান ছিল। প্রাচীন অন্তঃসারশূন্য অটমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে মধ্যযুগীয় প্রশাসন উচ্ছেদ করা হয়। ভাতিকিউটিস বলেন, "মোহাম্মদ আলীর সরকার এবং প্রশাসনের মূলনীতি ছিল কঠোর ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

প্রশাসন।" অটমান সুলতান কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা মোহাম্মদ আলী কুক্ষিগত করেন। তিনি পূর্ববর্তী প্রাদেশিক গভর্নর বা 'শেখ-আল-বালাদের' মত সুলতানের উপর মুখাপেক্ষী ছিলেন না এবং স্বীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দ্বারা মিশরে একটি 'পাসালিক' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সুলতানের সহায়তায় আরবদেশে সৈন্য প্রেরণ করেন সত্য, কিন্তু স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর পুত্র ইব্রাহিমের অটমান সাম্রাজ্যভুক্ত সিরিয়ায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ১৮৩৩ সালে তিনি তুরস্কের সুলতানের নিকট থেকে উনকাইর স্কেলেসীর সন্ধি অনুযায়ী একরে নেবলুস, দামেস্ক, আলেপ্পো ও আদানার পাশা নিযুক্ত হন। এমনকি তিনি কনস্টানটিনোপল দখলের হুমকী দেন। যা'হোক তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন না। কারণ, তিনি অটমান সুলতানকে বার্ষিক নজরানা দিতেন। তিনি ১৮৪১ সালে তুর্কী সুলতানের নিকট থেকে একটি ফরমানের মাধ্যমে মিশরের ভাইসরয়ের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি মিশরে মূলতঃ একটি স্বাধীন পাসালিক স্থাপন করেন, যা ছিল বংশানুক্রমিক।

প্রশাসনিক বিন্যাস ঃ একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মোহাম্মদ আলী একজন প্রতিভাবান ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন এবং কঠোর হস্তে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। তিনি প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাসে সর্বাধিক দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁর চার পুত্র–তুসুন, ইব্রাহিম, ইসমাইল এবং সাঈদের উপর। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের সর্বময় ক্ষমতা তাদের ছিল। শুধু তাই নয়, মিশরের প্রশাসন তাঁর বংশের সদস্যদের উপর অর্পিত হয়। ইব্রাহিম পাশা সুদানে অভিযান করেন এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ক্রীট ও মোরিয় দখল করেন। ইব্রাহিম ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে অভিযান করে তাদের রাজধানী দখল করেন। আরব দেশের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা মোহাম্মদ আলীর দখলে আসে এবং ইব্রাহিম আরব দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর পুত্র ইসমাইল পাশা পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। সাঈদ পাশা নৌ-বহরের অধিনায়ক ছিলেন। পৌত্র আব্বাস কায়রোর গভর্নর নিযুক্ত হন। মোহাম্মদ আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্রদের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক পদে নিযুক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি সমগ্র দেশকে কয়েকটি গর্ভনেট প্রদেশ, বিভাগ, জেলা ও মহকুমায় বিভক্ত করেন। তিনি গ্রামকে প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে গণ্য করেন। সমগ্র দেশকে ৭টি প্রদেশে এবং প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করা হয়। মামলুক আমলের ২৪টি প্রদেশ ছিল কিন্তু প্রশাসনিক সুবিধার্থে সেগুলো ভেঙ্গে ৭টি প্রদেশে পরিণত করা হয়। মিশরে মোট ৬১টি জেলা ছিল প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে গভর্নর থেকে সাধারণ সরকারি কর্মচারী কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত করতেন এবং মোহাম্মদ আলী স্বীয় হস্তে কঠোরভাবে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায়ের জন্য ফরমান জারী করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা 'মুদির' নামে পরিচিত ছিলেন।

মন্ত্রণালয় ঃ কেন্দ্রীয় প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মিশরের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয় এবং মোহাম্মদ আলী প্রাথমিক স্তরে ৬টি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করেন। যথা– স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, অর্থ, সমর, বাণিজ্য এবং নৌ-বাহিনী। ১৮৩৩ সালে

www.pathagar.com

আধুনিক শিমরের ইতিহাসে সর্বপ্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গঠিত হয় এবং এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন আর্মেনীয় বগুস বে (Boghos Bey)। ১৮৩৭ সালে অপর পাঁচটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান ছিলেন খ্রিস্টান হাবীব এফেন্দী সামরিক বাহিনী সুগঠিত করার জন্য মোহাম্মদ আলী একটি সামরিক 'দফতর' বা 'নিযামতে-ই-হারবীয়া' এবং যুদ্ধসংক্রান্ত কাউন্সিল বা 'দিওয়ান-আল-জিহাদিয়া' গঠন করেন। ফরাসী সামরিক সংগঠনের অনুকরণে মিশরের সমর মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনী গঠন, গোলাবারুদের কারখানা স্থাপন, সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ (logistic) ইত্যাদি। মোহাম্মদ আলীর প্রশাসনিক সংস্কারের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি ফরাসী শাসনকর্তাদের প্রবর্তিত আইন এবং পরামর্শ পরিষদ (legislative and consultative) বাতিল করেন, যেমন কায়রো কাউন্সিল বা 'দিওয়ান' প্রাদেশিক ও সাধারণ কাউন্সিলসমূহ। এর স্থরে উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারী ও মন্ত্রীদের নিয়ে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত কাউন্সিল গঠন করেন। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে তিনি তার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম হন। প্রশাসনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ফরাসী শাসনামলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নেপোলিয়ন উলেমা ও মোল্লা শ্রেণীকে পরামর্শ ও অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন। কিন্তু আধুনিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে মোহাম্মদ আলী ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখেন এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না। তারা শরিয়ত বিষয়ে পরামর্শ ও বিচার করতে পারতেন।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ঃ মোহাম্মদ আলীর শাসনকাল ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি, সদ্ভাব ও সখ্যতার ইতিহাস। বলাই বাহুল্য যে, মিশরকে আধুনিকীকরণে বিদেশী প্রকৌশলী, কারিগর, ডাক্তার, সামরিক ও বেসামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হয়। নেপোলিয়নের মিশর বিজয় থেকে প্রশাসনে ফরাসী কর্মকর্তাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ মিশরের সেনাবাহিনী গঠনে বিশেষ অবদান ছিল ফরাসী কর্নেল সেভেসের (Seves), যিনি অবশ্য পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ফরাসী ধরনের লাইসী স্কুলও ফরাসী শিক্ষকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করা হয় ফরাসী ডাক্তার ক্লট বে-র তত্ত্বাবধানে। আলেকজান্দ্রিয়ায় নৌ-বহর ও নৌ-বিদ্যার কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন লেফেবর দ্যা কেরিসী। কাগজের মিল প্রতিষ্ঠিত করেন ইটালীয় ক্যাময়াগী (Camiagi)। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দেশে সাম্প্রদায়িক সমঝোতা কায়েমের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অনুসৃত হয়। মোহাম্মদ আলী খ্রিস্টান, আর্মেনীয় গ্রীক ও ফরাসী, ইটালীয় কপটিক কর্মচারী নিয়োগ করেন। ভ্যাটিকিওটিসের ভাষায়, "A feature of the pashas insistence upon public order and security was his policy of religious tolerance."

শিক্ষা-সংস্কার ; আধুনিক শিক্ষা ঃ মোহাম্মদ আলী পাশা আধুনিক সভ্যতার আলোকে মিশরকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়াস পান। তিনি শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তিনি

www.pathagar.com

ইউরোপীয় রীতিতে আধুনিক শিক্ষাক্রম চালু করেন। আল-আযহারসহ ধর্মীয় মাদ্রাসা, মক্তব ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা-কুরআন, হাদিস ও ফেকাহ দেওয়া হত। অপরদিকে রাষ্ট্রীয়, উদ্যোগে ফরাসী পদ্ধতিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ ধরনের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন মিশরের জন্য একটি অবিনব ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। (a revolutionary innovation) বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল মিশরে স্বদেশীয় শিক্ষিত সমাজ (a native educated elite) সৃষ্টি করা। কেবলমাত্র বিদেশী প্রকৌশলী, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসকের উপর নির্ভর করে জাতি গঠন সম্ভবপর নয় বিবেচনা করে মোহাম্মদ আলী দেশীয় শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন।

প্রশিক্ষণ ও জাতীয় জাগরণ : মোহাম্মদ আলীকে আধুনিক মিশরের স্রষ্টা বলা হয়। এর মূল কারণ এই যে, তিনি জাতিগঠনমূলক অসংখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করেন। মোহাম্মদ আলীর পরিকল্পিত "নতুন সমাজ ব্যবস্থার (New order) মূলে ছিল শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি ছাপাখানা স্থাপন করেন। ফরাসী শাসনামলে যদিও ছাপাখানা প্রথম চালু হয় তবুও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে হিসেবে ছাপার প্রসারতা ঘটে। এই ছাপাখানা থেকে সামরিক ও বেসামরিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাপা হত। ১৮০৯ থেকে ১৮১৬ সালের মধ্যে ইউরোপে ছাপাখানার প্রযুক্তি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণের জন্য মিশরীয় মিশন পাঠান হয় এবং ১৮২২ সালে বুলাকে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে মোহাম্মদ আলী তুর্কী ভাষায় প্রশাসন পরিচালনা করলেও পরবর্তী কালে ১৮৪৫ সালে আরবি ভাষা তুর্কী ভাষার স্থান দখল করে। ফলে স্থানীয় মিশরীয় আরবগণ উচ্চ পদে সমাসীন হয়। ইউরোপীয় ভাষা থেকে আরবি ভাষায় অনেক গ্রন্থ অনুদিত হয় এবংএর ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে মিশরীয়গণ আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। মোহাম্মদ আলী একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক ছিলেন। ১৮১৬ সালে তিনি সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার জন্য ইটালী, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে মিশরীয়দের প্রেরণ করেন এবং তা ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত অব্যহত থাকে। মনে করা হয় যে, কমপক্ষে ৩১১ জন মিশরীয় বিদেশে প্রশিক্ষণ লাভ করে। প্যারিসে থাকাকালীন তাদের নিজস্ব একটি ছাত্রাবাস ছিল। এই নব্য মিশরীয়গণ প্রকৌশল, চিকিৎসা, শিল্পকলা, সামরিক, নৌবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে। আরবি ভাষার পাশাপাশি ফরাসী ভাষা প্রচলিত ছিল। জন স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করার জন্য ১৮২০ সালে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ফরাসী চিকিৎসক ক্লট বে-র (Clot Bey) তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত এই মেডিক্যাল কলেজটিতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত এবং রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। ১৮১৬ সালে একটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

যাতায়াত ব্যবস্থা : মোহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নতি সাধন করা হয়। আরবদেশ, সুদান, ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপাঞ্চল জয় করে তিনি বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করেন। উত্তমাশা অন্তরীপ

www.pathagar.com

হয়ে ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ সালে ভারতবর্ষে সমুদ্রাভিযান করার ফলে মিশরে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। এ বিপর্যয় এড়াবার জন্য তিনি ভারতবর্ষ ও দূরপ্রাচ্যে স্থলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। তিনি লোহিত সাগরের জলদস্যুদের দমন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন। কায়রো থেকে সুয়েজখাল পর্যন্ত উটের যানবাহন প্রবর্তিত হয়। ১৮১৯ সালে মিশরীয় প্রকৌশলী নূর এফেন্দী পাশার তত্ত্বাবধানে আলেকজান্দ্রিয়ার সঙ্গে নীলনদের রোজেটা শাখার সংযোগ রক্ষাকারী মোহাম্মদীয়া খাল খনন করা হয়। উটের সাহায্যে দ্রুত যোগাযোগ ও টেলিগ্রাম ব্যবস্থা চালু করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সংকেত টাওয়ারের মাধ্যমে (signal tower) কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা হয়। কিছু দিনের মধ্যে স্টীম বোটের প্রচলন হয় এবং এর ফলে যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজের প্রসার ঘটে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পায়ন ঃ মোহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলে মিশরের ব্যবসা-বানিজ্য সম্প্রসারিত হয় এবং দেশে প্রথম শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মিশরের আধুনিক পদ্ধতিতে কলকারখানা চালু হয় নেপোলিয়নের সময় থেকে। তাঁর Commission des Arts গ্রন্থে ১৭৯৯-১৮০০ সালের যে রিপোর্ট লিপিবদ্ধ রয়েছে তাতে মিশরের প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ রয়েছে। এই রিপোর্টে মিশরের সুপ্ত সম্পদ সম্বন্ধে প্রথম ইঙ্গিত দেওয়া হয়– যেমন তেল (পেট্রোলিয়াম), তুলা, মৃৎশিল্প, মাদক দ্রব্য (আঙ্গুরজাত), সুগন্ধি এবং চিনি। এই রিপোর্টে কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং স্বল্পকালীন অবস্থানে (১৭৯৮-১৮০১) ফরাসীগণ মিশরে গোলা-বারুদ, মদ, টুপি, চামড়া, গম ভাঙ্গাবার জন্য বায়ুচালিত মিল (wind mill) স্থাপন করে। বস্তুতঃ ফরাসীগণ কায়রোকে প্রাচ্যের মানচেষ্টারে পরিণত করতে চান। কারণ, মিশরে পর্যাপ্ত তুলা উৎপন্ন হয়, যা দিয়ে বস্ত্র শিল্প স্থাপন করা সম্ভব। মোহাম্মদ আলী ফরাসী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্পজাত পণ্য তৈরির জন্য কলকারখানাকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দেন। তিনি এইসমস্ত মিল-ফ্যাক্টরিতে বিদেশী উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। মিশরে তুলা ছিল এক চেটিয়া সম্পদ এবং ফরাসী বিশেষজ্ঞ জুমেলের (Jumel) সহায়তার তুলার উৎপাদনই বৃদ্ধি পেল না, বস্ত্র শিল্পও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। বস্ত্র শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় ১৮৩০-৩২ সালে এবং ১৮৩২ সালে বস্ত্র শিল্প নিয়ন্ত্রকের দফতর এবং শিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠার ফলে মিশরে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। ফলে বিদেশে বস্ত্র রফতানী হতে থাকে এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। মিশরে প্রতিষ্ঠিত কারিগরী সংস্থা বা guild গুলি উচ্ছেদ করে সরকার শিল্প নীতির বাস্তবায়ন শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেন। শিল্প বিপ্লব শুরু হলে বিদেশী বণিক, বিনিয়োগকারী ও শিল্পপতি মিশরে আগমন করেন। বিশেষত গ্রীক, ইটালীয় এবং ফরাসীবাসীদের বিভিন্ন কলকারখানায় নিয়োগ করা হয়।

কৃতিত্ব ঃ মোহাম্মদ আলী পাশা নিঃসন্দেহে আধুনিক মিশরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে মোহাম্মদ আলী পাশাকে মিশর যেমন সৃষ্টি করেছিল তেমনি মোহাম্মদ আলী পাশাও মিশরকে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন। ১৮০৫ সালে ক্ষমতালাভ করে মোহাম্মদ আলী মিশরে ফরাসী দখলাদার বাহিনী কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন

www.pathagar.com

সংস্কারের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করেন। মিশরের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের দ্বার উন্মোচন করেন ফরাসী প্রকৌশলী ও বুদ্ধিজীবীগণ। মোহাম্মদ আলী এই সমস্ত সম্পদের প্রয়োগ করে নব জাগরণ আনেন। এই কারণে বলা হয়েছে যে মোহাম্মদ আলী মিশরের নিকট যতটুকু ঋণী মিশরও আধুনিকীকরণে মোহাম্মদ আলীর নিকট ততটুকু ঋণী। মিশরীয় ইতিহাসে মোহাম্মদ আলী পাশার অবদান সম্বন্ধে নানা রকম অভিমত রয়েছে। লেনপুল মোহাম্মদ আলীর শাসনামলে মিশরে অবস্থান করেন (১৮৩৪-৩৫) এবং তার কৃতিত্বের প্রশংসা করলেও ভূমিসংস্কার নীতি সমালোচনা করেন। কারণ পূর্ববর্তী 'ইলতিযাম' (জায়গীর প্রথা) রোহিত করলেও তিনি ভূ-স্বামীদের যে শ্রেণী বিভাগ করেন তার ফলেই স্বত্বভোগকারী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যা তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনেরা ভোগ করত। অবশ্য ব্রকম্যান এবং জর্জ ইয়ং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ব্রকম্যানের ভাষায়, "তিনি আধুনিক ইসলামের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।" ইয়ং-এর মতে, "মোহাম্মদ আলীকে আধুনিক মিশরের আসল স্রষ্টা এবং প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা উচিত।" তিনিই মন্তব্য করেন যে, "মিশর যেমন মোহাম্মদ আলীকে সৃষ্টি করেছিল তেমনি মোহাম্মদ আলীও মিশরকে সৃষ্টি করেছিলেন।" এম. সাবরী বলেন যে, "মোহাম্মদ আলীর শাসন আধুনিক মিশরের আবির্ভাবে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।" হেনরী ডডওয়েল সম্ভবত তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি মোহাম্মদ আলী পাশাকে "Universal master, Universal landlord universal merchant" বলে অভিহিত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মিশরকে ইউরোপীয় সামরিক বিদ্যা শিক্ষা, অর্থনীতি এবং অপরাপর আধুনিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। লর্ড ক্রোমারের ভাষায়, "তিনি মিশরীয়দের মধ্যে আত্ম নিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাসের শক্তি দিয়েছিলেন।" এই গুণাবলিই পরবর্তীকালে মিশরীয়দের জাতীয়বোধের সৃষ্টি করে এবং ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে মিশরকে মুক্ত করে।

হিট্টি যথার্থই বলেন, "The history Egypt for the first half of the nineteenth century is virtually the story of this one man. Founder of the dynasty that is still ruling in the valley of the Nile (King Faruq, dethroned) Muhammad Ali has been rightly called the father of his country; at least in its modern phrase. The initiative, energy and vision he displayed and exercised find no parallel among any of his Moslem contemporaries."

৩. খোদিভ ইসমাইল পাশা

ক্ষমতালাভ ঃ জনৈক ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আলী পাশাকে একজন "আধুনিকীকরণবাদী স্বৈরাচারী" এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল পাশাকে একজন "অসহিষ্ণু ইউরোপীয়করণবাদী" বলে আখ্যায়িত করেছেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ আলী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র ইব্রাহিম চার মাস ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আলীর পৌত্র এবং তুসুনের পুত্র প্রথম আব্বাস শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত শাসন করেন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংস্কারবিরোধী কার্যকলাপের জন্য তিনি জনগণের সমর্থন হারান। আব্বাসের মৃত্যুর পর তাঁর চাচা এবং মোহাম্মদ আলীর অপর পুত্র সাঈদ শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তিনি খাল খনন ও রেলপথ নির্মাণ করে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি করেন। তাঁর আমলে ১৮৫৫ সালে একজন ফরাসী প্রকৌশলীকে সুয়েজ খাল খননের অনুমতি দেওয়া হয়। এই প্রকৌশলী ছিলেন ফার্ডিন্যান্ড ডি লেসেপস। ১৮৬৩ সালে সাঈদ পাশার মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইল পাশা নিযুক্ত হন। ১৮৬৩ সাল থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং ১৮৬৬ সালে অটমান সুলতান কর্তৃক খোদিভ উপাধী লাভ করেন। এই খোদিভ উপাধী তাঁকে একজন স্বাধীন সুলতানের মর্যাদা দান করে।

রাজ্যশাসন ঃ

অসহিষ্ণু ইউরোপীয়করণবাদী ঃ মোহাম্মদ আলীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে ইসমাইল পাশা পিতার অনুসৃত নীতি পালন করেন। পিতার শাসনামলে ইসমাইল একজন নির্ভীক যোদ্ধা ও দক্ষ শাসক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। তিনি সুদানে অভিযান করে মিশরীয় সামরিক বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। মোহাম্মদ আলী আধুনিকীকরণের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা সুদূরপ্রসারী করেন তাঁর পুত্র ইসমাইল। ইসমাইল সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি উগ্র আধুনিকীকরণের ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং ঐতিহাসিকগণ তাঁকে একজন অসহিষ্ণু ইউরোপীয়করণবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মোহাম্মদ আলী আধুনিকীকরণ প্রয়াসী ছিলেন কিন্তু তাঁর পুত্র যিনি বহুবার ইউরোপ সফর করেন এবং দূত হিসেবে অটমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুল গমন করেন ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে তিনিই যোগসূত্র স্থাপন করেন। তিনি মিশরকে একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রে এবং কায়রোকে একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ ইউরোপীয় নগরীতে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পান। তিনি বলতেন, "আমার দেশ আফ্রিকার মহাদেশে নয়, ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত।" তাঁর শাসনামলে তিনি নিজেকে একজন ইউরোপবাদী (Pro-European) এবং অটমান বিরোধী (anti-ottoman) হিসেবে পরিচয় দিতে থাকেন। তিনি মিশরে ইউরোপীয় বিনিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দ্রুততর হয়। ভ্যাটিকিওটিস বলেন, "তাঁর শাসনামলে সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে এবং শিল্প সাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত মিশরীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর গোড়াপত্তন হয়। ("provided the basis for genesis of a Europeanized Egyptian elite in government, education and letter")। ইসমাইলের মাত্রাধিক পাশ্চাত্য প্রেমের পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ; কারণ বিংশ শতাব্দীতে বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিশরীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণী তারই বংশধর রাজা ফারুককে ১৮৫২ সালে সিংহাসনচ্যুত করে। সুতরাং বলা যায় যে, ইসমাইলের উদার

www.pathagar.com

ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতির (forward-looking policy) ফলে মিশরের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। কিন্তু পরিশেষে তাঁর প্রতিষ্ঠিত খদিব রাজবংশ গতিচ্যুত হয়।

সংস্কারসমূহ ; সংবিধানিক সংস্কার ঃ মোহাম্মদ আলী পাশা আধুনিক মিশরের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্রষ্টা ছিলেন। অপরদিকে তাঁর পৌত্র ইসমাইল পাশা পিতামহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর অনুসৃত নীতি বাস্তবায়ন এবং গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গুলোকে সুদূরপ্রসারী করেন। মিশরীয়দের জীবনধারার এমন কোন দিক ছিল না যা, ইসমাইল তার বলিষ্ঠ ও উদার নীতি দ্বারা কার্যকরী করতে ইতস্তত করেন। কিন্তু ১৮৫৯ সালে মোহাম্মদ আলী মৃত্যুর পর ইব্রাহিম, প্রথম আব্বাস ও সাঈদের শাসনামলে সংস্কার আন্দোলনের বিশেষ অগ্রগতি হয় নি। ডডওয়েল ("The Founder of Modern Egypt") বলেন যে, ১৮৩৩ সালে ইসমাইল যখন ক্ষমতালাভ করেন তখন প্রকৃতপক্ষে দেশে সংস্কারমূলক কোন সামাজিক কাঠামো বা প্রতিষ্ঠান ছিল না; পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে কতকগুলো নকল প্রতিষ্ঠান ছিল, যা সমাজের মূল্যবোধের অন্তরায় ছিল। কোন উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয় নি; জনগণের স্পৃহা ও ভাবধারার বিশেষ অগ্রগতি হয় নি। অপরদিকে দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র প্রশাসনে সঙ্কট সৃষ্টি করে; কৃষকশ্রেণী নির্যাতিত হয় এবং সাধারণ লোকের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতন সৃষ্টি হয় নি। ইসমাইল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধের সৃষ্টির জন্য ১৮৬৬ সালে মিশরে প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিষদ (Legislative Assembly) গঠন করেন। এই পরিষদ ভবিষ্যতে সমাজ উন্নয়নমূলক অনেক আইন পাস করে।

ভূমি সংস্কার ঃ মোহাম্মদ আলীর সময়ে মিশরে কৃষি বিপ্লব সংঘটিত হয় বলা যায় এবং ভূমি সংস্কার দ্বারা সমগ্র মিশরে অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। বিশেষ করে জাতীয় পণ্য তুলার উৎপাদন ও বাজারজাত করণের ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে। ইসমাইল ক্ষমতালাভ করে নগদ বৈদেশিক পণ্য (Cash export crop) হিসেবে তুলার চাষের উন্নতি বিধান করেন। তুলা চাষ সম্প্রসারিত হয়। অসাধারণ ধীশক্তি, দূরদর্শিতা, একাগ্রতা এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসমাইল, যিনি নিজেও ভূস্বামী ছিলেন, মিশরকে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তুলা উৎপাদনকারী এবং ইউরোপের বস্ত্র শিল্পের সর্ববৃহৎ কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করেন। ১৮৬৫ সালে মিশরে তুলা রপ্তানির পরিমান দাঁড়ায় ২.৫ মিলিয়ন কানার (kantar), যার মূল্য দাঁড়ায় ১,৫৪৪,৩১২,০০০ পিয়াস্তায়। তুলার পাশাপাশি ইক্ষু চাষেও উৎসাহ দেওয়া হয়।

সেচব্যবস্থার উন্নতি ঃ কৃষি কার্যের উন্নতি বিধানকল্পে ইসমাইল বিভিন্ন সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কৃষি কাজের জন্য খাল খনন, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও বাঁধ নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ইসমাইল অসংখ্য জনহিতকর কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির জন্য তিনি সর্বমোট ৮,৪০০ মাইল ব্যাপী ১১২টি খাল খনন করেন। মূলত এই সমস্ত খাল সেচ ব্যবস্থার সুবিধার্থে খনন

www.pathagar.com

করা হয়। এই সমস্ত খালের মধ্যে সর্ববৃহৎ খালটি 'ইব্রাহিমীয়া খাল' নামে পরিচিত। এই খালটি দক্ষিণ মিশরের আসুয়িতে নীল নদ থেকে কাটা হয়। এ ছাড়া নীল নদের সঙ্গে সুয়েজ খাল সংযোগকারী ইসমাইল খালও ছিল দীর্ঘ। এ সমস্ত খালের উপর পুল নির্মিত হয় সর্বমোট ৪০০টি নির্মিত পুল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুদূরপ্রসারী করে। নীল নদের উপর নির্মিত প্রখ্যাত পুলটি হচ্ছে কসর-ই-নীল পুল। এই পুলটি কায়রো শহরের সঙ্গে গেজিরার সংযোগ স্থাপন করে।

শিক্ষা সংস্কার ঃ ইসমাইল পাশা পিতামহ মোহাম্মদ আলী পাশার মত পাশ্চাত্যকরণ নীতি অনুসরণ করেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ এবং শিক্ষা-সংস্কার আইন পাস করে শিক্ষা খাতে পৃথকভাবে বাজেট অর্থ বরাদ্দ করেন। পিতামহের শিক্ষা নীতির অনুসরণে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গৃহীত হয়। মোহাম্মদ আলী্বেং সাঈদ পাশার শাসনামলে প্রশাসন, সমরবিদ্যা ও জনহিতকর কর্মসূচিতে ফরাসীগণ অংশগ্রহণ করে কিন্তু ইসমাইলের সময়ে শিক্ষাবিস্তারে ও প্রশাসনে আব্বাসীয়দের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করা হয়। তাঁর শাসনামলে সর্বপ্রথম মিশরে ধর্ম প্রচারের জন্য ক্যাথলিক মিশন স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। ফরাসী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Sisters of the Bon Pasteurs, the Jesuits, the sisters of Saint-vincent-De-Paul. এই সমস্ত বিদেশী মিশনারী সংস্থা মিশরের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব এতই প্রকট ছিল যে, ব্রিটিশদের পঁচাত্তর বছরের দখলদারীতে সে প্রভাব সহজে দূর করা সম্ভব হয় নি। মোহাম্মদ আলী ফরাসী স্কুলে (Lyceum) মডেলে মিশরে রাষ্ট্র পরিচালিত আধুনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে ইসমাইল ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দেন নি। তিনি মিশরীয়দের রাষ্ট্র পরিচালিত আধুনিক উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্য উৎসাহ দান করেন এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ইসমাইলের পাশ্চাত্যপ্রীতি এবং উগ্র ইউরোপীয়করণ নীতির ফলে মিশরে বিদেশীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৬০ সালে যেখানে মাত্র কয়েক হাজার ইউরোপীয় ছিল সেখানে ১৮৭৬ সালে তা এক লক্ষে পৌঁছে যায়। বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অসংখ্য মিশরীয় ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্থপতি ও কারিগর মিশরের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেন। ইসমাইলের সময়ে সর্বপ্রথম একটি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সাধারণ কারিগরী বালিকা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছাড়াও সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিশরে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়। বিশেষ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে আইন, ভাষা, ধর্মীয়, প্রকৌশল, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কারু শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ইসমাইল সুইস ডোর বে-কে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং প্রসারের দায়িত্ব দেন। ১৮৭৫ সালের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা লক্ষ্যধিক হয়।

সাহিত্য শিল্পকলার চর্চা ঃ ইসমাইল পাশার শাসনামলে শিল্পকলা ও সাহিত্যের চর্চার এক নতুন দিগন্তের সুচনা করে। ইউরোপীয় রীতিতে তিনি প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য,

www.pathagar.com

সঙ্গীত, কবিতা, গ্রন্থাগার, যাদুঘর, গবেষণা কেন্দ্র ও বুদ্ধিজীবী সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি শিল্পকলার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফরাসী উদ্যোগে যে ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়। ইসমাইল তা পুনর্জীবিত করেন এবং প্রাচীন মিশরীয় পুরাকীর্তির (Egyptology) অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রকাশনার জন্য নির্দেশ দেন। ১৮৭৫ সালে তিনি মিশরে প্রথম ভূগোল সমিতি (Geographical Society) স্থাপন করে মিশরীয় ভৌগোলিক, ঐতিহাসকি ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এক বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর অসামান্য কীর্তির মধ্যে কায়রো ও বুলাকে একটি যাদুঘর এবং রাজধানীতে একটি মানমন্দির ও জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসমাইলের প্রচেষ্টায় মিশরীয় সমাজে বিবর্তন শুরু হয় এবং পুরাতত্ত্বের প্রতি তিনি এরূপভাবে আকৃষ্ট ছিলেন যে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ম্যারিটা পাশাকে (Mariette Pasha) পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, মোহাম্মদ আলীর শাসনামলে ১৮২২ সালে প্রাপ্ত রোজেটা পাথরের শিলালিপি ফরাসী বিশেষজ্ঞ স্যাম্পোলিও (Champollion) পাঠোদ্ধার করেন। মিশরীয় পুরাকীর্তি ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরার জন্য ১৮৬৭ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রদর্শনীতে মিশর অংশগ্রহণ করে।

শাসনব্যবস্থার সংস্কার ঃ পিতামহ মোহাম্মদ আলীর মত ইসমাইল প্রশাসনকে কেন্দ্রীভূত করেন। তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস ছিলেন। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা 'মুদীর'-এর পদ বিলুপ্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন শাসনকার্য নির্বাহ করেন। তাঁর নির্দেশে 'কোড নেপোলিয়ন' ফরাসী ভাষা থেকে আরবি ভাষায় অনুদিত হয়। এটি মিশরের দেওয়ানী আইনের (Civil Code) প্রধান উৎস ছিল। তিনি বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠু সংস্কার ও উন্নয়ন দ্বারা প্রকৃত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পান। সুপ্রীম কোর্ট, সংমিশ্রিত কোর্ট ও জাতীয় কোর্ট–এই তিন ধরনের আদালত ছিল।

জনহিতকর কার্যকলাপ ঃ ইউরোপীয় রীতি-আচার ব্যবহারের প্রতি ইসমাইল এমনভাবে আকৃষ্ট ছিলেন যে তিনি তাঁর প্রজাদের পাশ্চাত্যের চাল-চলন গ্রহণের উৎসাহিত করতেন। তার প্রচেষ্টায় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারী কর্মকর্তাগণ ইউরোপীয় পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশ্য তিনি পোশাকের পরিধান আফগানিস্তানের আমানুল্লাহ এবং ইরানের প্রথম রেজা শাহের মত বাধ্যতামূলক করেন নি। জনমঙ্গলকর কার্যকলাপ গ্রহণ করে ইসমাইল যশস্বী হয়ে রয়েছেন। খদিভ ইসমাইল মিশরের শহরগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য অসংখ্য অনন্যসুন্দর ইমারত নির্মাণ করেন। এছাড়া আধুনিক পয়ঃপ্রণালী, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ও গ্যাস সরবরাহ করে আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা নগরবাসীদের দেন। তাঁর সময়ে কায়রো একটি তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত হয়। দেশের প্রত্যান্ত অঞ্চলে বাসগৃহ, বাগান, মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং নির্মিত হয়। দেশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য অসংখ্য সেতু, রেলপথ, পোতাশ্রয় নির্মিত হয়। তিনি রেলপথকে সম্প্রসারিত করে সমগ্র দেশে যাতায়াতের সুযোগ করে দেন। এগারো শত মাইল রেলপথ মিশরের সমুদ্র বন্দর, নগর ও গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। তিনিই প্রথম মিশরে জাতীয় পোস্টাল

www.pathagar.com

সার্ভিস চালু করেন এবং মিশরীয় পোস্টাল বিভাগ আন্তর্জাতিক পোস্টাল ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করে। এ ছাড়া টেলিফোন ব্যবস্থাও চালু হয়। তিনি সর্বপ্রথম জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭ সালে জারীকৃত একটি আইনের বলে ইসমাইল দাস ব্যবসা বন্ধ করেন এবং নারী ও পুরুষদের সমানাধিকার দেওয়া হয়।

পররাষ্ট্র নীতি ঃ ইসমাইল পাশা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে উদারপন্থী ও প্রগতিবাদী কর্মসুচি গ্রহণ করেন। তিনি ইস্তাম্বুল ও প্যারিসে ভ্রমণ করেন এবং অটমান সুলতান আবদুল আজীজ ১৮৫০ সালে তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মিশরের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। তাঁর চাচা সাঈদ পাশা তাকে কূটনৈতিক মিশনে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের নিকট প্রেরণ করেন। ১৮৬৩ সালে ক্ষমতালাভ করে ইসমাইল তাঁর পররাষ্ট্র নীতির প্রথম সোপান হিসেবে অটমান সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব থেকে মিশরকে মুক্ত করে স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করার প্রয়াস পান রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা ইসমাইলকে তাঁর অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করে। তিনি তাঁর পিতামহ মোহাম্মদ আলীর বৈদেশিক নীতিকে সমর্থন করেন এবং সম্প্রসারণবাদের অংশ হিসেবে তিনি সুদানসহ মিশরকে একটি শক্তিশালী আফ্রিকান সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পান। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও মিশরে তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বলাই বাহুল্য যে, মিশর ছিল অটমান সুলতানদের শাসিত একটি প্রদেশ এবং মোহাম্মদ আলী ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড ও তুরস্কের সম্মিলিত বাহিনীতে যোগদান করে ১৮০১ সালে মিশরে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি মিশরের পাশা বা ভাইসরয় নিযুক্ত হন। অটমান সুলতান ১৮৪০ এবং ১৮৪১ সালে ডিক্রী জারী করে মিশরকে তুরস্কের অধীনস্থ একটি প্রদেশে পরিণত করেন। ইসমাইল ক্ষমতালাভ করে মিশরের এই অধীনতাকে অস্বীকার করেন এবং মিশরকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। তাঁকে একই সঙ্গে বৃহৎ শক্তি-ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে এবং তুর্কী সাম্রাজ্যের (Porte) মোকাবেলা করতে হয়। ইসমাইল তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তুরস্কের সুলতান আবদুল আজীজের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন।

কূটনৈতিক তৎপরতা ঃ ইসমাইল পাশা একজন অসাধারণ কূটনৈতিক মেধাসম্পন্ন শাসক ছিলেন। তুর্কী সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মিশরকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি সুলতান কর্তৃক জারীকৃত ১৮৪১ সালের ফরমানকে অবজ্ঞা করতে থাকেন। ক্ষমতালাভ করে তিনি ১৮৬৩ সালে সুলতান আবদুল আজীজকে মিশর সফরে আমন্ত্রণ জানান। ১৫১৭ সালে প্রথম সেলিম কর্তৃক মিশর বিজয়ের পর মিশরে অপর কোন সুলতান আসেন নি। মিশরের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কের উন্নতিকল্পে ইসমাইল আবদুল আজীজকে কায়রোতে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তিনি সুলতান এবং তাঁর সফর সঙ্গীদের প্রভাবান্বিত করে মিশরের উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। মোহাম্মদ আলীর শাসনামল প্রাচীন অটমান উত্তরাধিকার নীতি (Law of Succession) প্রচলিত ছিল, যার ফলে ভাইসরয়ের মৃত্যুর পর তাঁর

www.pathagar.com

পরিবারে বয়ঃজ্যেষ্ঠ পুরুষসদস্য উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতায় সমাসীন হন। ইসমাইল এই নীতি পরিবর্তন করে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্য সুলতান ও তার সফর সঙ্গীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। এই নীতি Law of Primogeniture এর ফলে ইসমাইলের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ মিশরে রাজত্ব করার সুযোগ পান। ইসমাইল প্রায় তিন মিলিয়ন পাউন্ড স্টারলিং উৎকোচ দিয়ে তুর্কী সুলতানের সভাপসদদের সমর্থন লাভ করেন। ফলশ্রুতিতে ১৮৬৬ সালে সুলতান একফরমান জারী করে ইসমাইলের বংশদরদের বংশানুক্রমিকভাবে মিশরে শাসন করার অধিকার দেন। পক্ষান্তরে ইসমাইল তুরস্কের রাজকোষে বার্ষিক ৭৫০,০০০ পাউন্ড স্টারলিং নজরানা দেবার অঙ্গিকার করেন।

'খদিভ' ইসমাইল ঃ ১৮৬৬ সালে তুর্কী সুলতান এক ফরমান জারী করে মিশরের শাসনকর্তা ইসমাইল পাশাকে 'খদিভ' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'খদিভ' অর্থ স্বাধীন সুলতান। আধুনিক মিশরের ইতিহাসে ইসমাইলের এই উপাধি লাভ মিশরের সাথে ১৫১৭ সাল থেকে তুরস্কের প্রশাসনিক নির্ভরশীলতা ও অধীনতাকে ছিন্ন হয় এবং মিশরে একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। খদিভ ইসমাইল ১৮৬৬ সালের ডিক্রির বলে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন। তিনি তাঁর প্রয়োজন মত সৈন্যবাহিনী সম্প্রসারিত করার ক্ষমতা অর্জন করেন। পূর্বে তুরস্কের সুলতানের অধীনস্থ মিশরের ওয়ালী মুহম্মদ আলী পাশার শাসনামলে সুলতানের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেন এবং তুর্কী বাহিনীকে ১৮৩৯ সালের নিযিবের যুদ্ধে (Battle of Nizib) পরাজিত করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তুর্কী সামরিক ও নৌবাহিনী ক্রমশঃ দুর্বল ও শক্তিহীন হতে থাকে। ইসমাইলের শাসনামলে মিশরের সঙ্গে তুরস্কের কোন সংঘর্ষ হয়নি কিন্তু তুর্কী সুলতানের দুর্বলতা ও নিষ্ক্রীয়তার সুযোগ তিনি সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন। এ ছাড়া তিনি স্বীয় নামে মুদ্রা ছাপান এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ রাজকীয় অনুষ্ঠানে খেতাব ও খেলাত দিতেন। এর দ্বারা ইসমাইলের সার্বভৌমত্ব প্রমাণিত হয়। ১৮৬৬ সালের ডিক্রির ফলে ইসমাইলের ভাই মোস্তফা ফাজিলের স্থলে তাঁর পুত্র তৌফিক উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, ইসমাইল মোস্তফাকে ইস্তাম্বুলে ট্রেজারী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অপসারণের জন্য সুলতানকে প্ররোচিত করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মোস্তফাকে তুরস্ক থেকে বিতাড়িত করা হয়। ১৮৬৬ সালের ফরমান অনুযায়ী ইসমাইল বিদেশী শক্তি বা কোম্পানির সাথে বাণিজ্যিক শুল্ক সংক্রান্ত বিবিধ চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার লাভ করেন। ভাটিকিওটিসের মতে, এই ফরমানের বলে তুরস্কের অধীনস্থ একজন ওয়ালী রাজকীয় সম্মানের সমতুল্য খদিভের পদে সমাসীন হন এবং এই পদবী লাভের ফলে তিনি মিশরে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কার্যতঃ স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা পান। এই ফরমান তাঁকে প্রশাসনিক বিচার ও অর্থনীতির উন্নয়নে এককভাবে সুলতানের মুখাপেক্ষী না হয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ দেয়।

সার্বভৌম ক্ষমতা ঃ ১৮৬৬ সালের ফরমান খদিভ ইসমাইলকে অপরিসীম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দান করে এবং এই ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে ইসমাইল একদিকে যেমন ইউরোপীয় শক্তি, অন্যদিকে তুর্কী সুলতানের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে

পড়েন। সুদানে অভিযান, সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন, সেনাবাহিনীর সম্প্রসারন ও আধুনিকীকরণ, বার্ষিক বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ এবং সর্বোপরি সুয়েজ খাল খননের ফলে তুর্কী সুলতান খদিভ ইসমাইলের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েন। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খনন সম্পন্ন হলে তুর্কী সুলতান আবদুল আজীজ এক ফরমান জারী করে ১৮৬৬ সালের ফরমানে প্রদত্ত সুবিধাদি হ্রাস করেন। সুলতান খদিভের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এই কারণে যে, তিনি তাঁর বিনা অনুমতিতে বিদেশী ঋণের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছেন এবং এক তরফা ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরিকল্পনা করছেন। সুলতানের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের জন্য ইসমাইল তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ইসমাইল পাশা সাদকে ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী নুবার পাশাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্তাম্বুল গমন করেন। ১৮৭২ সালের এই সফর ছিল খুব জাঁকজমকপূর্ণ এবং ইসমাইল সভাসদদের মূল্যবান উপঢৌকন ও উৎকোচ প্রদান করেন। অতঃপর ১৮৭৩ সালের জুন মাসে তিনি সুলতানের নিকট থেকে একটি নতুন ফরমান লাভ করেন। এই ফরমান অনুযায়ী ১৮৬৬ সালের ফরমানে প্রদত্ত সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খদিভের বংশ পরম্পরা উত্তরাধিকার নিশ্চিত হয়। কিন্তু এই ফরমান বিশেষ কার্যকরী হয় নি। কারণ মাত্র ছয় বছরের মধ্যে ১৮৭৯ সালে ইউরোপীয় বিশেষ করে ব্রিটিশ শক্তির সহায়তায় সুলতান খদিভ ইসমাইলকে গদিচ্যুত করেন। ব্রিটিশ সরকার ফরাসী প্রকৌশলী দ্বারা খননকৃত সুয়েজ খাল এবং ফরাসীদের আর্থিক সুবিধা (ফরাসী জয়েন্ট স্টক কোম্পানি) প্রদানে খদিভের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। অপরদিকে অটমান তুরস্কের অখণ্ডত্ব বজায় ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্র নীতির মূল চাবিকাঠি ছিল। এমতাবস্থায় খদিভ যখন সুয়েজ খাল খনন করে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ও অপরিমিত ব্যয়ের ফলে দেওলিয়া হয়ে গেলেন তখন মিশর ইউরোপীয় শক্তির কবলে পড়ে।

কৃতিত্ব ঃ দক্ষ সমরনেতা, অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ ও উদারপন্থীশাসক হিসেবে খদিভ ইসমাইল মিশরের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মোহাম্মদ আলী পাশা আধুনিক মিশরের জন্মদাতা হলেও ইসমাইল আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণের প্রক্রিয়াকে সুদূরপ্রসালী করে মিশরে স্থায়ী রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত করেন। তাঁর অর্থনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও তিন প্রকৃত অর্থ একজন "অসহিষ্ণু ইউরোপীয়করণবাদী" ("impatient Europeanizer") হিসেবে আধুনিক মিশরের উত্তোরণের প্রভাবশালী নায়ক ছিলেন। চালর্স ইসায়ী বলেন, Ismail Pasha by a lavish use of bribes and presents secured the title of Khedive and full legislative and fiscal autonomy within the framework of the Ottoman laws and by 1875 Egypt had practically became an independent Kingdom". অবশ্য ১৮৭৯ সালে তুর্কী সুলতান ইসমাইলকে পদচ্যুত করে তার স্থলে তৌফিক পাশাকে খদিভ নিযুক্ত করেন। ইসমাইল নেপলসে নির্বাসিত হলে সেখানে বাকী জীবন কাটান।

www.pathagar.com

৪. ওরাবী আন্দোলন

পটভূমি ; মিশরের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঃ জনদরদী, বিশিষ্ট সংস্কারক, আধুনিকীকরণের প্রবক্তা ও প্রগতিবাদী খদিভ ইসমাইল (১৮৬৩-১৮৭৯) তাঁর শাসনামলের শেষার্দ্ধে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। সংস্কারসমূহ বাস্তবায়ন করতে তাঁকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। কৃষিপ্রধান দেশ মিশরে সহসা শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত করা যায় নি। সংস্কার আন্দোলনকে কার্যকর করার জন্য ইসমাইল বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেন। এই ঋণের অর্থ তাকে ৮% সুদে পরিশোধ করতে হয়। আর্থিক সঙ্কট দেখা দিলে ঘৃণ্য 'মুকাবালা আইন' (Muqabalah Law) জারী করে ভূমি কর দ্বিগুণ করায় কৃষকগণ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে; উপরন্তু, স্বাধীনতা লাভের আশায় তুর্কী সুলতানকে উৎকোচ ও বার্ষিক ৭৫০,০০০ পাউণ্ড স্টারলিং প্রদানের ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। এর ফলে দেশের বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে ১৮৭৩ সালে যেখানে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৯১,০০০,২০০ পাউণ্ড তা ১৮৭৬ সালে গিয়ে পৌছায় ১৮ মিলিয়ন পাউণ্ডে। এর ফলে মিশর ক্রমশঃ ইউরোপীয় শক্তির কবলে পড়ে। Hans Kohn বলেন, "Financial dependence led to political dependence and the loss of the country's independence". খোদিভ ইসমাইল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূলে ছিল তাঁর অদূরদর্শিতা ও উগ্র পাশ্চাত্যনীতির প্রতি প্রগাঢ় মোহ। তাঁর এই বিপর্যয় এড়াবার জন্য তিনি সুয়েজ খালের শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চতুর সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী ব্রিটিশ সরকার এই সুযোগ হেলায় হারাল না। প্রধানমন্ত্রী ডিসরেলী চার মিলিয়ন পাউণ্ড দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের জন্য সুয়েজ খালের শেয়ার ক্রয় করেন। এভাবে ফরাসী ও মিশরীয় সরকারের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার সুয়েজের সরাসরি মালিকানাসত্ত্ব লাভ করে। এছাড়া সুয়েজ খাল পরিচালনা ছেড়ে তিনজন ব্রিটিশ পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। ক্রমশঃ তারা শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বোর্ডের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ লাভ করে।

ঋণ পরিষদ কমিশন ঃ ভাটিকিওটিস বলেন, "১৮৭৫ সালে মিশরের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা (turning point) যাতে সংবিধানিক আন্দোলন প্রতিফলিত হয় এবং এর প্রভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের নতুন ধারার সূচনা হয়। এর ফলে ১৮৭৫ সালের মধ্যে খদিভ ইসমাইল দেউলিয়া হয়ে পড়েন এবং তাঁর ঋণ গ্রহণের কোন ক্ষমতাই থাকে না। সুয়েজ খালের ১৭৬,৬০২ শেয়ার চার মিলিয়ন পাউন্ড স্টারলিং-এর বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকারকে বিক্রি করে অর্থ সঙ্কট এক বছরের জন্য ঠেকাতে পারলেও, পরিশেষে এই ত্রুটিপূর্ণ পদক্ষেপ ইসমাইলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করে। অপরদিকে চতুর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেলী অর্থের বিনিময়ে মিশরে সম্প্রসারণবাদকে কায়েম করেন। ব্রিটিশ কর্তৃক শেয়ার ক্রয়ের ফলে প্রধানত দু'টি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; (১) এর ফলে মিশরে ফরাসীদের পাশাপাশি সরাসরি ব্রিটিশদের স্বার্থ প্রতিফলিত হয়; (২) এই পদক্ষেপ মিশরে ফরাসী প্রভাবকে হ্রাস করে, কারণ ব্রিটেনই এখন সুয়েজ খাল কোম্পানির সর্ববৃহৎ শেয়ারহোল্ডার হিসেবে

www.pathagar.com

আত্মপ্রকাশ করে। ভাটিকিওটিসের ভাষায়, "সামান্য চার মিলিয়ন পাউন্ড স্টারলিং মূল্যের বিনিময়ে ইংল্যান্ড গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিজয় লাভ করে।" মারাত্মক অর্থ সঙ্কট থেকে নিরসনের জন্য খদিভ ইসমাইল ব্রিটিশদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ব্রিটিশ সরকার স্টীভেন কেভ নামের একজন এম. পি.-কে মিশরে অনুসন্ধান ও জরীপের জন্য প্রেরণ করেন। কেভ তাঁর রিপোর্টে মিশরীয় অর্থনীতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কন্ট্রোল কমিশন গঠনের সুপারিশ করেন। এই কমিশনের প্রধান থাকবেন একজন ব্রিটিশ নাগরিক এবং খদিভ ও ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই কমিশন অনুমোদিত হবে। এদিকে খদিভের আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল যে, ঋণের সুদ প্রদানের অবস্থাও রইল না। তখন ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার দেউলিয়া (Insolvency) অবস্থার আশঙ্কায় গসচেন (Goschen) এবং জোবার্ট (Joubert) নামে দু'জন অর্থনীতিবিদকে মিশরে পাঠান। ঋণ পরিষদের জন্য একটি সংস্থা গঠিত হল যার নাম ছিল Caisse de'la Dettel। ১৮৭৬ সালে গঠিত এই ঋণ পরিশোধ সংস্থায় ব্রিটিশ প্রতিনিধি ছিলেন মেজর এভেলিন বেয়ারিং, যিনি পরে লর্ড ক্রোমার নামে পরিচিত ছিলেন। কৃষকদের উপর অতিরিক্ত চাপ দিয়ে কর আদায়ের ফলে ফেলাহীনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। অপরদিকে, মিশরের ক্রমশঃ বিদেশী শক্তির উপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা যে দাসত্বের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে তা মিশরীয় বুদ্ধিজীবী, উলেমা ও স্বাধীনতা প্রিয় সেনাবাহিনী তাদের কর্ম তৎপরতা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের দ্বারা দেশবাসীকে সচেতন করে তোলেন।

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বৈত শাসন ঃ ঋণ পরিষদ কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক ঋণ যথাযথভাবে পরিশোধের ব্যবস্থা করা। কিন্তু খদিভের সরকার এ ক্ষেত্রে বিশেষ তৎপরতা দেখাতে না পারায় একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। ১৮৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে খদিভ ইসমাইল যে কমিশন গঠন করেন তাতে ম্যাচ রিভার উইলসন এবং মেজর বেয়ারিং সদস্য ছিলেন। এই কমিশনে খদিভের প্রতিনিধিত্ব করেন রিয়াদ পাশা। এই কমিশনকে যে কোন বিভাগের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এমনকি রেকর্ড-লেজার বাজেয়াপ্ত করার অধিকার দেওয়া হয়। ভাটিকিওটিসের মতে, "এ ধরনের ক্ষমতা ইউরোপীয়দের দ্বারা মিশরের সার্বভৌমত্বকে নিশ্চিহ্ন করার সুযোগ দেয়।" ("implies the dilution of Egyptian sovereignty by Europeans") কমিশনের ক্ষমতা এতই অসীম ছিল যে খদিভেরও ব্যক্তিগত ও তাঁর পরিবারের সম্পত্তি ক্রোক করার অধিকার ছিল। এ ধরনের পরোক্ষ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে খদিভ শঙ্কিত হয়ে নুবার পাশাকে মিশরের ইঙ্গ-ফরাসী দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে রোধ করার আহ্বান জানান। নুবার পাশা ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে যে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন তাতে ফরাসী ও ব্রিটিশ প্রতিনিধি ছিল। প্রধানমন্ত্রী নুবার পাশার মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার রিভার্স উইলসন নামে একজন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হন এবং ফরাসী সদস্য এম. দ্যা ব্লিগনিয়াস (M. de Blignieres) জনকল্যাণ দফতরের মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। ফলে মিশরে একটি জাতীয় সরকারের স্থলে মিশর-ব্রিটেন-ফ্যান্স সম্মিলিতভাবে একটি

www.pathagar.com

সরকার গঠন করে অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটাবার চেষ্টা করেন। কন্টোল কমিশনের কার্যপ্রণালী এমন বিস্তার লাভ করে যে একমাত্র ভূমি জরিপ বিভাগেই ৩০ জন ব্রিটিশ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য দফতরে মিশরীয়দের স্থলে বিদেশীদের চাকরিতে নিয়োগ করলে জনসাধালন, বুদ্ধিজীবী ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। যাহোক, রাজতন্ত্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের স্থলে নুবার মন্ত্রীসভা সর্বপ্রথম মিশরের ইতিহাসে একটি নির্বাহী মন্ত্রীপরিষদ (মজলিস-আন-নুবয়ার) গঠন করেন। ফলে খদিভের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পায়।

তৌফিক-মন্ত্রীপরিষদ ঃ নুবার পাশার মন্ত্রীসভা বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। মাত্র পাঁচ মাসব্যাপী এই মন্ত্রীপরিষদ কার্য নির্বাহ করে। ১৮৭৯ সালে খদিভ ইসমাইল এই মন্ত্রী পরিষদ ভেঙ্গে দেন। কারণ খদিভের রাজনৈতিক, নির্বাহী বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোন প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। মন্ত্রী পরিষদের সভায় খদিভের স্থলে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। ফলে খদিভ এবং বিদেশী সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীসভার মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ বাধে এবং পরিশেষে নুবার পাশার মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে খদিভ ইসমাইল তাঁর ভাই যুবরাজ তৌফিক পাশার নেতৃত্বে একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করার নির্দেশ দেন। মিশরীয় সচেতন নাগরিকবৃন্দও খদিভের স্বৈরশাসন এবং বিদেশী দ্বৈত শাসনের বিরোধিতা করতে থাকে এবং ১৮৭৮ সালে তুরস্কে প্রবর্তিত মিদহাত পাশার সংবিধান মিশরীয় জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রেরণা জোগায়। নুবার পাশার মন্ত্রীসভার পতনের অন্যতম কারণ এই যে, তিনি ব্যয় সংকোচনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের (২৫০০) বেতন হ্রাস করে তাদের বিরাগভাজন হন। লতিফ বে সেলিমের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল মিছিল এবং সরকার বিরোধী বিক্ষোভ করে। যাহোক, নুবার পাশার পতনের পর তৌফিক পাশা যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন তাতেও ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধি ছিল। মিশরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ ও আধিপত্য নিরসনের জন্য মিশরীয় সাংবাদিকগণ ১৮৭৬ থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত তাদের পত্রিকার মাধ্যমে মিশরের অর্থনৈতিক পরাধীনতার কথা প্রচার করতে থাকেন। ১৮৭৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সেনাবাহিনীর মধ্যে গুপ্ত সমিতি গঠন এবং পরিষদ সদস্যদের জাতীয় সংগঠন মিশরীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেনাবাহিনীর গুপ্ত সমিতির নেতৃত্ব দেন ওরাবী পাশা (Orabi Pasha) এবং জাতীয় পার্টি বা হেলওয়ান সোসাইটির (Helwan Society) প্রধান মোহাম্মদ শরিফ পাশা। এ দু'টি সংগঠনের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা না থাকলেও মিশরের গণ আন্দোলনে তারা বিশেষ অবদান রাখেন।

শরিফ মন্ত্রী পরিষদ ঃ ১৮৭৮ থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত মিশরীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বৈপ্লবিক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ভাটিকিওটিস বলেন, "নুবার মিশ্রিত মন্ত্রিপরিষদ (মিশরীয় ও অমিশরীয়) মিশরের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগসন্ধিক্ষণকারী ঘটনা।" ১৮৭৮ সালে খদিভ স্বয়ং বিদেশী নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশাসনে অতিষ্ট হয়ে মিশরকে ইউরোপীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য প্রথমে নুবার পাশা, পরে তৌফিক পাশা এবং শরিফ পাশাকে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের আমন্ত্রণ জানায়। অপরদিকে বিদেশী প্রভাবাধীন ও

www.pathagar.com

ক্রীড়ানক খদিভ ইসমাইলকে অপসারণের জন্য জাতীয়তাবাদী, ইসলাম পন্থী, গুপ্ত সমিতি; গোপনে আন্দোলন শুরু করে; (১) সাংবাদিক আদিব ইসহাক, ইব্রাহিম আল-সাক্কানী, আবদুল্লাহ আল-নাদিম, (২) আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন জাতীয়তাবাদী ছাত্র শেখ মোহাম্মদ আবদুহু, সা'দ জগলুল পাশার, (৩) বিশ্ব ইসলামবাদী জামালউদ্দীন আফগানীর মতাদর্শে তার অনুযায়ী ইসলামপন্থী ওলামাগণ আবদুল-সালাম, আল-মুয়ায়হিল এবং (৪) গুপ্ত সেনা সমিতির সদস্যবৃন্দ-লতিফ বে সালিম, মোহাম্মদ সামী পাশা, আল-বারুদী এবং ওরাবী পাশা। উল্লেখ্য যে, ১৮৭১ সালে জামালুদ্দীন আফগানী মিশরে আসেন এবং দীর্ঘ ৮ বছর বসবাসের পর তৌফিক পাশা কর্তৃক বিতাড়িত হন। ১৮৭৯ সালে ক্রমশঃ রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত হতে থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও তারা মিশরকে বৈদেশিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হন। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে মোহাম্মদ শরিফ পাশার নেতৃত্বে জাতীয় সোসাইটি (পার্টি)। তারা প্রকাশ্যে ইউরোপীয় মন্ত্রীদের বহিষ্কার করে জাতীয় মন্ত্রী পরিষদ বা সরকার গঠনের জন্য নীতিমালা ঘোষণা করে আন্দোলন শুরু করে। শরিফ পাশা স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং ব্রিটিশ-ফরাসী দ্বৈত শাসনের বিরোধিতা করেন। তিনি ইউরোপীয় ঋণ কমিশনের দাবীকে অগ্রাহ্য করেন এবং ক্রমশঃ ইউরোপ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। তিনি 'জাতীয় সংস্কার প্রজেক্ট' গঠন করে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রশাসনে সীমাবদ্ধ করতে চান। ১৮৭৯ সালের মার্চ-এপ্রিলে দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হতে থাকে। খদিভ ইসমাইল জনসমর্থন লাভ করে ঘোষণা করেন যে, তিনি স্যার রিভার্স উইলসন কর্তৃক মিশরকে দেউলিয়া ঘোষণার প্রস্তাব মানেন না এবং বলেন যে, স্বয়ং সকল ঋণদাতাদের ঋণ পরিষদ করার ব্যবস্থা করবেন। তিনি তাঁর পুত্র তৌফিক পাশার মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে জাতীয় সোসাইটির (পার্টি) প্রধান মোহাম্মদ শরিফ পাশাকে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের আমন্ত্রণ জানান। সংবিধান পন্থী শরিফ ১৮৭৯ সালে জাতীয় সরকার গঠন করেন। ৪৯টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত একটি খসড়া সংবিধানও প্রণীত এবং পরিষদে পেশ করা হয়। জাতীয় পার্টি ও সংবিধানপন্থীদের আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও ঋণদাতা ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তি খদিভ ইসমাইলেল চরম বিরোধিতা করে।

খদিভ ইসমাইলের পদচ্যুতি ঃ ১৮৭৯ সালে খদিভ ইসমাইলের জন্য ছিল ক্রান্তিলগ্ন ঃ কারণ একদিকে আর্থিক সঙ্কট, অপরদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ রাজনীতিবিদদের ইউরোপ বিরোধী প্রচারণা ও বিক্ষোভ এবং সেনাবাহিনী ও কৃষকদের (ফেলাহীন) অসন্তোষ পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। তিনি তৌফিক মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে শরিফ মন্ত্রী পরিষদ গঠনের মাধ্যমে সঙ্কট নিরসনের চেষ্টা করেন। এই রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য তিনি (১) ঋণদাতাদের ঋণের সুদের হার হ্রাস করে এবং (২) বিদেশী প্রভাব বিরোধী পদক্ষেপ দ্বারা উলেমা, জাতীয়তাবাদী ও সেনাবাহিনীর গুপ্ত সংগঠনের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। এমন কি তিনি তাঁর ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জাতীয় বাজেটের প্রস্তাব দেন। কিন্তু এসমস্তই ছিল তাঁর রাজনৈতিক ভোজবাজী, যা

www.pathagar.com

মোটেই কার্যকরী হয় নি। তাঁর রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলি আপাতঃদৃষ্টিতে খুব চমৎকার মনে হলেও, আসলে ছিল নিছক প্রতারণামূলক এবং কৌশলগত দিক থেকে ব্যর্থ (poor strategy)। খদিভ তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর শরিফ পাশার নেতৃত্বে একটি তথাকথিত জাতীয় সরকার গঠন করে স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টা করেন কিন্তু জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীর একটি গোষ্ঠী তাঁর দূরভিসন্ধি সম্বন্ধে অবহিত ছিল। উপরন্তু, বিতাড়িত নুবার পাশা এবং রিয়াদ পাশা ফ্রান্সে গিয়া ফরাসী সরকারকে খদিভের অকর্মন্যতা সম্বন্ধে প্ররোচিত করে তাঁর পদচ্যুতির জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকেন। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসে যখন ইউরোপীয় ঋণদাতা দেশ ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড তাদের স্বার্থে খদিভকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের খদিভকে পদচ্যুত করার কোন ক্ষমতা ছিল না। ফলে তারা তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদকে প্রাক্তন তুর্কী প্রদেশে মিশরের শাসনকর্তা বা পাশার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। তাদের যুক্তি ছিল যে, খদিভকে ইউরোপীয় শক্তিদ্বয় পদচ্যুত করলে তুর্কী সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বে আঘাত হবে। অপরদিকে সুলতান খদিভের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় আশঙ্কিত হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করার মনস্থ করেন। তিনি প্রথমে ১৮৭৩ সালে জারিকৃত ফরমান, যার বলে খদিভ বিদেশী শক্তির সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি করেন, বাতিল ঘোষণা করেন; যদিও পরে ১৮৭৯ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটেন ও ফ্রান্সে চাপে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় শক্তিদ্বয়ের প্ররোচনায় সুলতান আবদুল হামিদ ১৮৮৯ সালের ২৬শে জুন ইসমাইলকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র তৌফিক পাশাকে খদিভ নিযুক্ত করেন। ইসমাইল মিশর ত্যাগ করে নেপলসে প্রবাস জীবন শুরু করেন। সেখানে ১৮৯৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

খদিভ তৌফিক পাশা (১৮৭৯-৯২) ঃ খদিভ তৌফিক পাশা মিশরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে শরিফ পাশাকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। শরিফ উদার সংবিধান প্রণয়নে পক্ষপাতী ছিলেন এবং সংসদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু তৌফিক সন্ধিহানবশে তাঁর মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে প্রবাসী রিয়াদ পাশাকে স্বদেশে এসে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের আহ্বান জানান। তৌফিক পাশার রাজত্বে ইউরোপীয় শক্তিদ্বয় ১৮৮০ সালে 'দেউলিয়া আইন' (Law of Liquidation) জারী করে। এর ফলে সাময়িকভাবে মিশরীয় সরকারের সাথে ইউরোপীয় ঋণদাতা দেশ দু'টির সঙ্কট মিটে গেলেও ঋণ পরিষদের জন্য সৃষ্ট সামগ্রিকভাবে মিশরের অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক কমিশনের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ অব্যহত থাকে। রিয়াদ পাশা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সংস্কার, বিশেষ করে কর সংক্রান্ত, সূচিত করলেও তিনি শরিফ পাশার সংবিধানপন্থী ছিলেন না। এর ফলে ১৮৮২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে খদিভ তৌফিক ও তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল প্রধানমন্ত্রী রিয়াদ পাশার বিরুদ্ধে আহমদ ওরাবীর নেতৃত্বে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। রিয়াদ পাশা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন (censorship) এবং 'মিশর' (Misr) এবং 'তিযারা' (tijara) নামে দু'টি পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। অতঃপর শরিফ পাশা প্যারিস থেকে রিয়াদ বিরোধী পত্রিকা 'মিশর আল-কাহির' (Misr-al-Qahira) প্রকাশ করতে থাকেন।

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঃ

ভূমিকা ঃ মিশরীয় রাজনীতি সমাজ ও অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান ইউরোপীয় আধিপত্য মিশরীয়দের মনে জাতীয়তাবাদের চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এই জাতীয়তাবোধের উন্মেষে একটি শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর অবদান অনস্বীকার্য। তারা 'এফেন্দী' নামে পরিচিতি। বলা বাহুল্য যে, মোহাম্মদ আলী পাশা, সাঈদ পাশা এবং খদিভ ইসমাইলের সংস্কারমুখী কার্যকলাপ মিশরে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সহায়ক ছিল। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা পাশ্চাত্য রীতিতে স্কুল, কলেজ স্থাপন, শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রারণ প্রভৃতির মাধ্যমে মিশরীয়গণ ইউরোপীয় সভ্যতা ও ভাবধারার সংস্পর্শে আসে। পাশাদের শাসনে মিশরীয়গণ উপকৃত হয় এবং ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ মিশরীয়গণ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে মিশরকে ইউরোপীয় শক্তির কবল থেকে রক্ষায় প্রয়াসী হয়। খদিভ ইসমাইল নিজেও প্যারিসে শিক্ষালাভ করেন কিন্তু তাঁর মাত্রাধিক পাশ্চাত্য প্রীতিতে মিশরীয়গণ বিক্ষুব্ধ হয়। মুদ্রালয় স্থাপন এবং সংবাদপত্র প্রকাশনা মিশরীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বিস্তারে সহায়তা করে এই কারণে তারা ('মিশর' ও 'তিযারা') নামে দুটি পত্রিকা ১৮৭৭ সালে প্রকাশ করে। খদিভ অর্থনৈতিক দেউলিয়া ও ইউরোপীয় শক্তির আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। অবশ্য পরে রিয়াদ পাশা সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ইসমাইলও ফরাসী ভাষায় 'Monitor Egyptien' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে উলেমা, জাতীয়তাবাদী, সংবিধান পন্থীদের সমর্থন কামনা করেন। কিন্তু তা কার্যকরী হয় নি। রিয়াদ পাশার প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে সমাজের সকল স্তরের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নিরন্ন কৃষক শ্রেণী বা ফেলাহীন করের বোঝা লাঘব করার জন্য বিক্ষোভ শুরু করে। ১৮৮১ সালের এই প্রচণ্ড কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন কর্নেল আহমদ ওরাবী, যিনি নিজেও কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইউরোপীয় আধিপত্যবাদ এমন এক পর্যায়ে পৌছায় যে এক পর্যায়ে মিশরীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে ১৪০০ ইউরোপীয় কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। এটি ছিল মিশরীয়দের জন্য চরম লজ্জা, ক্ষোভ ও হতাশা, যা থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়।

ওরাবী পাশা ঃ

প্রথম জীবন ঃ মিশরের জাতীয় আন্দোলনে প্রথম নেতৃত্ব দেন আহম্মদ ওরাবী পাশা। উত্তর মিশরের এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কৃষক সন্তান হলেও তিনি অসাধারণ মেধা, কর্মদক্ষতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দেন। আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করে তিনি ক্রমশঃ স্বীয় উদ্দম ও সামরিক মেধার ফলে অতি অল্প সময়ে কর্নেল পদে উন্নীত হন। মিশরীয় বাহিনীতে যখন তুর্কী ও সিরকাসিয়ান মামলুকদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার প্রতিবাদে মুষ্টিমেয় মিশরীয় সামরিক অফিসারদের নিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করা হয়, যা পরে একটি সংস্কার আন্দোলনে রূপ লাভ করে। ওরাবী পাশা একজন প্রখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। প্যান-ইসলামের প্রবক্তা সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানীর জ্বালাময়ী বক্তৃতার ফলে

www.pathagar.com

মিশরীয়গণ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে এবং জাতীয়তাবাদী মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়। বিদেশী দ্বৈত শাসন খদিভের স্বৈরাচার, কৃষকদের নিপীড়ন প্রভৃতির কারণে ওরাবী পাশা আধুনিক মিশরের ইতিহাসে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন।

সেনা বিদ্রোহ ঃ ওরাবী পাশা সর্বপ্রথম মিশরীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক গুপ্ত দল গঠন করেন। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, খদিভ ইসমাইল এবং তৌফিকের শাসনামলে সেনাবাহিনী অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুণ ক্ষুব্ধ হয়। জাতীয়তাবাদী দল এবং মিশরীয় সেনাবাহিনীর একাংশ দ্বৈত-শাসন ও অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মিশরকে মুক্ত করার জন্য ওরাবী পাশার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হল। মিশ্রিত মন্ত্রী পরিষদ, যাতে একজন ফরাসী ও একজন ইংরেজ সদস্য ছিল, দেউলিয়া থেকে মিশরকে রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর আড়াই হাজার সদস্যের মাসিক বেতন অর্ধেক করা হয়, সামরিক স্কুলের অর্থ বরাদ্দ হ্রাস করা হয় এবং অনেক সক্ষম মিশরীয় অফিসারকে বলপূর্বক অবসর দেওয়া হয়। এ ছাড়া তুর্কী, সিরকাসিকান ও মিশরীয়দের দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনী সুসংঘবদ্ধ ছিল না। কারণ, মিশরীয় অফিসারদের তুলনায় তুর্কী ও সিরকাসিয়ান অফিসার ও সৈন্যরা কম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। সেনাবাহিনীতে জাতীয় বেতনক্রম ও পদোন্নতির সুষ্ঠু নীতিমালার অভাব এবং সামাজিক মর্যাদার বৈপরিত্য মিশরীয় সদস্যদের ক্ষুদ্ধ করে তোলে। লতিফ বে সালিম এবং মোহাম্মদ সামী পাশা আল-বারুদী এবং ওরাবী পাশা সেনাবাহিনীর বৈষম্য দূর করার জন্য খদিভ তথা নুবার সরকারে বিরুদ্ধে গোপন সমিতি গঠন করেন। নুবার পাশার মন্ত্রীসভা বাতিল হলে ইসমাইল যুবরাজ তৌফিক পাশাকে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করতে বলেন। কিন্তু তৌফিক পাশা বেশি দিন মন্ত্রীত্ব করতে পারেন নি। তারপর শরিফ পাশা প্রধানমন্ত্রী হন। ইসমাইল পদচ্যুত হলে বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের সাহায্যে তৌফিক পাশাকে খদিভ নিযুক্ত করা হয় এবং তৌফিক পাশা ক্ষমতালাভ করে প্রথমে উদারপন্থী শরীফ পাশা এবং পরে রিয়াদ পাশাকে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের আহ্বান জানান। ওরাবী পাশা জামালউদ্দীন আফগানীর বিশ্ব-ইসলামবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মিশরকে বিদেশী দখলদারদের কবল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের জন্য সংগ্রাম করেন। তৌফিক পাশা আফগানীকে ১৮৭৯ সালে বিতাড়িত করলেও ইসলামী মূল্যবোধে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেনা বাহিনীর ক্ষুদ্র গুপ্ত দলটি ১৮৮১ সালে সর্বপ্রথম ওরাবী পাশার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। এই বিপ্লবটি ছিল খদিভ তৌফিক এবং প্রধানমন্ত্রী রিয়াদ পাশার বিরুদ্ধে। ওরাবী বিচক্ষণতার সঙ্গে উদারপন্থী শরিফ পাশার নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় সোসাইটির (পার্টি) সঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে এই বিপ্লব পরিচালনা করেন। এর ফলে মিশরীয় সেনাবাহিনীতে দু'টি দলের সৃষ্টি হল। একটি মিশরীয়, অপরটি তুর্কী ও সিরকাসিয়ান। শেষোক্ত দলটি সেনাবাহিনীর গুপ্ত দলটিকে 'হিযর-আল-ফেলাহীন' বা কৃষক দল নামে ধিক্কার দিলেও আসলে এই দলটি 'আল-হিযব-আল-ওয়াতান-আল আহমী' অথবা 'জাতীয় গণতান্ত্রিক দল' নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য

www.pathagar.com

একথা সত্য যে, ওরাবী পাশা করাভাবে (কর্ভী) জর্জরিত ফেলাহীনদের মিশর সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেন।

মিশরীয়দের জন্য মিশর ঃ তোফিক পাশা খদিভ নিযুক্ত হলে তিনি তার স্বৈরাচারী নীতির প্রতিফলনের জন্য রিয়াদ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। রিয়াদ কর্ভীসহ নির্যাতনমূলক কর রোহিত করলেও ফেলাহীনদের দুর্দশা লাঘব হয় নি। অপরদিকে সংবিধানবিরোধী মনোভাবের জন্য ১৮৮২ সালে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত সঙ্কটের জন্য খদিভ তৌফিক রিয়াদ পাশাকে দায়ী করেন। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সঙ্কট, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সেনাবাহিনীতে বিরাজমান অসন্তোষ এমন এক পর্যায়ে পৌছে যে ওরাবী পাশা ১৮৮২ সালে সেনাবাহিনীর সদস্য, জাতীয়তাবাদী ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করেন। তিনি ইউরোপীয় আধিপত্যবাদ নিরসন করে 'মিশরীয়দের জন্য মিশর' (Egypt for Egyptians) এই দাবী তোলে বিদ্রোহ শুরু করেন। এই প্রচণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে রিয়াদ পাশা সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এদিকে ওরাবী পাশা পরিষদের যে সমস্ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন তারা ছিলেন সুলতান পাশা, সুলায়মান আবজা, মাহমুদ ফাহমী। খদিভ বিরোধী সেনাদলের প্রধান ওরাবী পাশা তাঁর সহকর্মী আবদ-আল-আল-হিলমী এবং আলী ফাহমীর সাথে একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। একটি ম্যানিফেস্টোতে এই দল খদিভ ইসমাইলের পদচ্যুতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তৌফিক পাশার অনুসৃত অর্থনৈতিক আধিপত্য থেকে রক্ষা করে স্বাধীনতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দানের দাবী জানায়। এই পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী দল সামরিক বাহিনীর একাংশের সঙ্গে একতাবদ্ধ হলে আন্দোলন আরও জোরদার হয়। ফলে, তুরস্কের সুলতান তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রকাশের জন্য ইসমাইলের স্থলে তাঁর পুত্র তৌফিককে খদিভ নিযুক্ত করেন। ওরাবী আন্দোলনকারীরা খদিভের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় কারণ তাঁরা তাকে ফরাসী-ব্রিটিশ শক্তির একজন ক্রীড়ানক মনে করে। ওরাবী পাশা তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তৌফিক পাশার সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন।

সামাজিক বিদ্রোহ ঃ সরকারের সঙ্গে সেনাবাহিনীর যে বিরোধ ইসমাইলের রাজত্বকালে শুরু হয় তা তৌফিক পাশার আমলে সুদূরপ্রসারী হয়। উল্লেখ যে, সমর মন্ত্রী হিসেবে ওসমান রিফকী নামে একজন সিরকাসিয়ানকে সেনাবাহিনীর সদস্যকে মিশরীয় সদস্যগণ মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। উপরন্তু, ১৮৮০ সালের জুলাই মাসে জারীকৃত একটি ফরমানে খদিভ সামরিক সার্ভিস চার বছরে সীমাবদ্ধ করেন।

ওরাবী পাশা এই চক্রান্তমূলক ফরমানের বিরোধিতা করে বলেন যে, মাত্র চার বছরে কোন মিশরীয় কমিশন অফিসারের পক্ষে পদোন্নতি করে জেনারেলের পদে যাওয়া সম্ভবপর নয়। বিদ্বেষভাবাপন্ন সিরকাসিয়ান সমরমন্ত্রী সেনাবাহিনীতে ওরাবী পন্থীদের প্রভাব ও ক্ষমতা হ্রাসের জন্য পাইকারীভাবে পদোন্নতি দিয়ে তাদের বদলী করতে থাকেন। মূলতঃ এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল রাজধানী কায়রো থেকে ওরাবীদের বিতাড়িত করা। এমতাবস্থায় বিধান পরিষদের সদস্যদের সমর্থন লাভ করে ওরাবী পাশা

www.pathagar.com

তাঁর আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করে প্রধানমন্ত্রী রিয়াদ পাশার নিকট একটি আবেদন পত্র পাঠিয়ে সিরকাসিয়ান সমরমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং তাঁর স্থলে একজন মিশরীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করার দাবী জানান। ওরাবীপন্থীরা সমরবাহিনী সদস্য মাহমুদ শামী পাশা আল-বারুদীকে সমরমন্ত্রীর যোগ্য প্রার্থী হিসেবে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু স্বৈরাচারী তৌফিক সরকার ১৮৮১ সালের জানুয়ারি মাসে সেনাবাহিনীর এহেন দাবীকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জন্য সামরিক বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত করে। তৌফিক সরকার দরখাস্তকারী ওরাবীপন্থীদের গ্রেফতারের পরিকল্পনা করলে ওরাবী পাশা আর্মি ইউনিটসমূহকে গ্রেফতার ও কোর্ট মার্শাল করার জন্য যে কোন প্রকার প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে বিদ্রোহ (mutiny) করার নির্দেশ দেন। যখন তিনজন কর্নেলকে গ্রেফতার করে কোর্ট মার্শাল বিচার করা হচ্ছিল তখন সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেড সমর মন্ত্রণালয় আক্রমণ করে সামরিক বিচারকদের গ্রেফতার করে এবং সহকর্মীদের মুক্ত করেন। ওসমান রিফকির স্থলে আল-বারুদীকে সমর মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। তিনি সেনাবাহিনীকে সুযোগ-সুবিধা দেন কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ায় সেনা বিক্ষোভ শুরু হলে বিদ্রোহী সৈন্যদের শাস্তি দেওয়া হয়। বিদ্রোহীরা আল-বারুদীকে খদিভের নিকট প্রতিবাদ জানাতে বলেন। এতে খদিভ আল-বারুদীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ভগ্নীপতি দাউদ পাশা ইয়েকিন।

ওরাবী প্রভাব ঃ আল-বারুদীর পদচ্যুতি ওরাবীপন্থীদের সাময়িকভাবে হতবুদ্ধ করলেও তারা তাদের সংকল্পে একতাবদ্ধ ছিল। ওরাবী পাশা সমর্থন লাভের জন্য পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন এবং একটি সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন। মিশরবাসী ইউরোপীয় আধিপত্যবাদ, খদিভের স্বৈরাচার এবং সেনাবাহিনী আন্দোলন সম্বন্ধে সচেতন ছিল। মিশরকে বিদেশী কবল থেকে রাহুমুক্ত করার জন্য ওরাবী ফরাসী কনসুল-জেনারেলের সহায়তা ও পরামর্শ কামনা করেন। ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারির সাফল্যজনক সামরিক কু' খদিভ সরকারের শক্তিহীনতাকে প্রমানিত করে। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে ওরাবী পাশার নিকট বিরাট সামরিক সাফল্য। যাহোক, দাউদ পাশা সমরমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলকে স্তব্ধ করার জন্য কতকগুলো ঘৃণ্য ও নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দাউদ পাশা তৃতীয় রেজিমেন্টকে কায়রোর দুর্গ থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিলে ওরাবী পাশা সেনাবাহিনীকে তা অগ্রাহ্য করার জন্য বলেন। ওরাবীপন্থীরা ইউরোপে তৌফিক সরকারের সেনাবাহিনী বিরোধী নীতির সমালোচনা করে এবং ওরাবী ক্রমশঃ ক্ষমতা সংহত করতে থাকেন। ১৮৮১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর আবেদীন প্রাসাদে আয়োজিত একটি বিক্ষোভ মিছিল ওরাবীগণ খদিভের অনুসারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করলে একদিকে যেমন খদিভের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিপর্যস্ত হয় অন্যদিকে ওরাবী নিজেকে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে মিশরীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য বিদেশী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার ক্ষমতা লাভ করেন। ভাটিকিওটিস 'এই ঘটনাকে ওরাবীর ক্ষমতা দখলের সঙ্গে তুলনা করেছেন' (a usurpation of power by Orabi)।

www.pathagar.com

খদিভের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকলে তুর্কী সুলতান মিশরে দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সুলতানের এহেন পদক্ষেপে ব্রিটেন শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং ওরাবীদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ন করার জন্য সংসদ সদস্যদের সঙ্গে ওরাবীদের বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করে কিন্তু ওরাবী পাশার প্রভাব ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী শরিফ পাশা এবং খদিভ এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের নিরব স্বাক্ষী ছিলেন। ওরাবী পাশা ১৮৮১ সালের অক্টোবরের জাকাজিগের এক জনসভায় বলেন যে, সংস্কার দ্বারা মিশরে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন এবং তা করতে হলে বিদেশীদের মিশর থেকে বিতাড়িত করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, মিশরকে প্রকৃত অর্থে বিদেশী প্রভাব মুক্ত করে স্বাধীন করতে হলে প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ব্যবহার করবেন।

সমরমন্ত্রী ঃ ১৮৮১ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর খদিভ তৌফিক পাশা রাজনৈতিক সঙ্কট দূরীকরণের জন্য পরিষদের সভা আহ্বান করেন। কিন্তু শরিফ সরকারের সঙ্গে ওরাবীপন্থীদের বিরোধী নিরসন হয় নি। বরং ওরাবী পাশা বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসে ফ্রান্স ও ব্রিটেন খদিভের নিকট একটি 'যৌথ নোট' (Joint Note) প্রেরণ করে খদিভকে সমর্থন জানায়। ওরাবীগণ এই পদক্ষেপ মিশরের সার্বভৌমত্বে আঘাতস্বরূপ মনে করে। কারণ তাদের ধারণা হয় বিদেশী শক্তির মদদপুষ্ট হয়ে খদিভের একনায়কত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি তৎপর হয়েছে। এই 'নোট' একদিকে যেমন পরিষদের সদস্যদের ওরাবীদের দলে আকৃষ্ট করে, অন্যদিকে শরিফ সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করে। এই 'নোট' অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপীয় সামরিক হস্তক্ষেপকে নিশ্চিত করে। এই 'নোট' শরিফের পতন ঘটিয়ে ওরাবী বিজয়কেও সুনিশ্চিত করে; কারণ শরিফের পদচ্যুতিতে মিশরের রাজনৈতিক ও সামরিক অঙ্গনে একমাত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন ওরাবী। তৌফিক পাশা শরিফের স্থলে ওরাবীর প্রার্থী আল-বারুদীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং ওরাবী স্বয়ং সমর মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সরকারে যোগদান করে ওরাবী সেনাবাহিনী পুনঃগঠিত করেন এবং সরকারী চাকরিতে নিয়োজিত বিদেশীদের চাকরিচ্যুত করার জন্য আল-বারুদী ওরাবীর জন্য ঝাঁড়ুদারের কাজ করেন (used as the broom for the Orabist clean-up campaign) ওরাবী পাশা যখন তাঁর আরাদ্ধ লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন তখন তুর্কী সিরকাসিয়ান সেনাদল তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু শাস্তির দণ্ড নিয়ে খদিভ তৌফিকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আল-বারুদীর বিরোধ বাধে। ইউরোপীয় শক্তিদ্বয় খদিভকে সমর্থন করেন কিন্তু দণ্ড হ্রাস করতে আল-বারুদী অস্বীকার করেন। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ওরাবী ও আল-বারুদী পরিষদের সভা আহ্বানের জন্য খদিভকে বলেন কিন্তু খদিভ অস্বীকার করলে প্রধানমন্ত্রী আল-বারুদী পদত্যাগ করেন। কিন্তু ওরাবী পাশাসহ অপরাপর মন্ত্রী পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলে খদিভ সরকার তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

ভাগ্য বিপর্যয় ঃ ১৮৮২ সালের মাঝা-মাঝি ওরাবীপন্থীদের সঙ্গে খদিভ সরকারের যে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয় তার ফলে তুরস্কের সুলতান এবং ইঙ্গ-ফরাসী সরকার

www.pathagar.com

বিচুলিত হয়ে পড়ে। ইঙ্গ-ফরাসী সরকার সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তাবও খদিভকে দেয় এবং মিত্র বাহিনীর নৌবহর ভূমধ্যসাগরে প্রেরণ করে। সমর মন্ত্রী হিসেবে ওরাবী পাশা বিদেশী সামরিক হস্তক্ষেপের তাঁর বিরোধিতা করেন। ইঙ্গ-ব্রিটিশ সরকার ১৮৮২ সালের ২৫শে মে খদিভের নিকট দাবী করেন যে, মিশরীয় সরকারের পতন না হলে এবং ওরাবী ও তাঁর সঙ্গীদের মিশর থেকে বিতাড়িত না করলে তারা নৌ-বাহিনীর অবরোধ তুলে নিবে না। পরিস্থিতি উপলব্ধি করে এবং স্বীয় নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ওরাবী পাশা আত্মগোপন করেন কিন্তু গোপন ইস্তেহারে সেনাবাহিনী ও দেশবাসীকে বিদেশী শক্তির আগ্রাসন ও খদিভের বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রচার করতে থাকেন। ওরাবী তৌফিককে (traitor) বা দেশদ্রোহী নামে আখ্যায়িত করেন। ১৯৮২ সালের ২৬শে মে সরকার পদত্যাগ করলে প্রমাণিত হয় যে, মিশর বিদেশী শক্তির কবলে রয়েছে। ফলে মিশরে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। মে-জুন মাসে সমগ্র দেশে বিক্ষোভ শুরু হল এবং সেনাবাহিনী ওরাবীকে পুনরায় সমরমন্ত্রী নিযুক্তির দাবী জানায়। পরিষদের সদস্যগণ গোপনে ওরাবীর বাসায় মিলিত হয় এবং ওরাবী তাঁর বাহিনীসহ আবেদীন প্রাসাদ আক্রমণের হুমকী দেন। যাহোক, ২৭শে মে ওরাবী সমরমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় শপথ নিলে ৩১শে মে খদিভ তৌফিক ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় গমন করে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে সমরমন্ত্রী ওরাবী সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করলেন এবং কায়রোর গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওরাবীর ক্ষমতা দখলে খ্রিস্টান সম্প্রদায় আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে কায়রো থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পলায়ন করতে থাকে। ফলে ১৮৮২ সালের জুন মাসে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে উভয় সম্প্রদায়ের বহুলোক নিহত হয়।

মিশর-ব্রিটিশ সংঘর্ষ ঃ মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপে জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। আলেকজান্দ্রিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ব্রিটিশ নৌ-বহরের উপস্থিতিতে ওরাবী পাশা সমর প্রস্তুত গ্রহণ করেন। মিশর সমর মন্ত্রী ওরাবী পাশার কর্তৃত্বাধীন থাকাকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আলেকজান্দ্রিয়ায় বোমাবর্ষণের হুমকী দেয়। ১৮৮২ সালের ১১ই জুলাই ফ্রান্স নিষ্ক্রিয় থাকলেও ব্রিটিশ নৌবহর স্যার সিমুরের নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ায় বোমা বর্ষণ করে। ওরাবী পাশার নেতৃত্বে মিশরীগণ বিদেশী হামলার মোকাবেলা করার চেষ্টা করেন কিন্তু শক্তিশালী ব্রিটিশ নৌবহর এবং সেনাবাহিনীর যৌথ আক্রমণে ওরাবী পাশাসমূহ বিপদের সম্মুখীন হন। তিনি সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন এবং একটি ডিগ্রী জারী করে সমগ্র দেশপ্রেমিক মিশরীয়দের বিদেশী আগ্রাসন প্রতিরোধ করার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদানের নির্দেশ (Conscription) দেন। ওরাবী পাশা তৌফিকের বিশ্বাসঘাতকের জন্য আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখের নিকট থেকে একটি ফতোয়া আদায় করে তৌফিককে বিদেশী শক্তির মদদকারী দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তার পদচ্যুতি দাবী করেন। অপরদিকে খদিভ ও ওরাবীকে বিদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করেন, যিনি বলপূর্বক সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। ১৮৮২ সালের আগস্ট মাসে স্যার

www.pathagar.com

গারনেট উলসলের নেতৃত্বে ২০,০০০ ব্রিটিশ সৈন্য মিশরে অবতরণ করে। প্রথমে তারা আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। এ সময়ে মিশরের দ্বৈত সরকার ছিল; আলেকজান্দ্রিয়ায় ব্রিটিশ আশ্রিত খদিভের সরকার এবং কায়রোসহ মিশরের অন্যান্য প্রদেশসমূহে ওরাবী সরকার। সমগ্র দেশে অরাজকতা ও রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এই দ্বৈত-শাসনের ফলে। উলসলে ওরাবী সরকারকে উৎখাত করার জন্য সমরাভিযান করেন। ব্রিটিশ বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ইসমাইলিয়ায় আগমন করে। ১৮৮২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তেল-আল-কবীরের যুদ্ধে মুষ্টিমেয় ওরাবী সৈন্য বিশাল ইংরেজ বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়।

ওরাবী পাশার নির্বাসন ঃ যুদ্ধে পরাস্ত হলে ওরাবী আন্দোলন ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। ব্রিটিশ বাহিনী খদিভের বাহিনী হিসেবে পরিগণিত হয় এবং খদিভ তৌফিকের লুপ্ত ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কায়রোসহ সমগ্র মিশরে ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েম হয় এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। ১৮৮২ সালে ওরাবী পাশা সিংহলে নির্বাসিত হন। সেখানে তিনি দীর্ঘ আঠারো বছর অতিবাহিত করেন।

কৃতিত্ব ঃ আহম্মদ ওরাবী পাশা মিশরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন পথিকৃত ছিলেন। তাঁর আন্দোলন ব্যর্থহলেও তাঁর দূরদর্শিতা, অসামান্য সামরিক, প্রশাসনিক দক্ষতা মিশরীয়দের মনে নব জাগরণের সৃষ্ট করে। তিনিই প্রথম 'মিশরীয়দের জন্য মিশর' মন্ত্রে মিশরীয়দের উদ্বুদ্ধ করেন। বিদেশী শোষকদের করাল গ্রাস থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য তিনিই সশস্ত্র বিপ্লব করেন। ১৮৮২ সালে তাঁর পরাজয়ের পর থেকে মিশর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে থাকে। এই কারণে ভাটিকিওটিস বলেন যে, "ওরাবীর পরাজয় একটি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে আধুনিক মিশরীয় ইতিহাসে পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা করে।" প্রকৃতপক্ষে মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তিনটি স্তরে পরিচালিত হয়। প্রথমটি, ওরাবী পাশার নেতৃত্বে দ্বিতীয়টি, মোস্তফা কামিল ও তৃতীয়টি শেখ আবদুহু ও জগলুল পাশার নেতৃত্বে। ওরাবী আন্দোলনের বিফলতা সম্বন্ধে লূইস আওয়াদ বলেন যে, "ওরাবীগণ নির্যাতন, উৎপীড়ন, অবিচার (জুলুম) প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে; স্বাধীকার ও স্বাধীনতার জন্য নয়।" আওয়াদের এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ ওরাবী জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো সমন্বিত করতে সক্ষম হন এবং এক পর্যায়ে সর্বময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ইমামুদ্দীনের ভাষায়, "His achievement lies in the fact that he made his countrymen understand that Egypt was theirs and compelled the foreign powers to recognize the Egyptians as a nation.

৫. সা'দ জগলুল পাশা

ব্রিটিশ আধিপত্যবাদ ঃ ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ বাহিনীর নিকট ওরাবী পাশার পরাজয় মিশরে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক ছিল। মিশরীয় বাহিনী এবং অর্থনীতির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি স্থায়ী ব্রিটিশ বাহিনী মিশরে রাখা হয়। স্যার এভেলিন

www.pathagar.com

বেরিংকে, যিনি পরবর্তীকালে লর্ড ক্রোমার নামে পরিচিত ছিলেন, কনসুল-জেনারেল এবং স্যার অকল্যান্ড কোলভিনকে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়। এই দু'জন ব্রিটিশ কর্মকর্তা খদিভ তৌফিকের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে মিশরকে পদানত করে রাখেন। লর্ড ক্রোমারের স্বেচ্ছাচারিতায় মিশরে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৮৮২ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৫ বছর তিনি মিশরে প্রশাসন, বিচার, সামরিক বাহিনী, পুলিশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত করলেও, মিশরীয়গণ বিদেশী দখলদার বাহিনীর প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে খদিভের কোন প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না, তিনি ছিলেন ক্রীড়ানক মাত্র। ক্রোমার মিশরকে একটি ব্রিটিশ শক্তির ঘাঁটিতে পরিণত করেন, যদিও তিনি জানতেন মিশর ব্রিটিশ সাম্রাজের কোন আশ্রিত প্রশাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে মিশরীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে তিনি মিশরীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত করতে পারেন নি। তিনি মিশরীয় শাসনকে পুনঃগঠিত করে দুর্নীতিমুক্ত ও সচল করেন মাত্র।

ক্রোমারের তথাকথিত সংস্কার ঃ ব্রিটিশ প্রশাসনিক সংস্কারে মিশরীয়গণ যে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল তা বলা যায় না; বরং লর্ড ক্রোমারের অনুসৃত দ্বৈত-নীতির ফলে মিশরীয় ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের মূলোচ্ছেদ করার জন্যই মিশরীয় জাতীয়তাবাদীগণ দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করে। ইসলামের মর্যাদাহানী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় মিশরীয়গণ ইংরেজ শাসকদের বিরোধিতা করেন। মিশরীয়দের তুলনায় খ্রিস্টানদের অধিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত। শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দ কম থাকায় শিক্ষার প্রসার হয় নি। উপরন্তু, ইংরেজদের শিল্পনীতি মিশরীয়দের স্বার্থে আঘাত লাগে। মিশর থেকে কাঁচা তুলা আমদানি করে ইংরেজগণ অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য উচ্চ মূল্যে সুতীবস্ত্র বিক্রি করত। বৈষম্য ও বিতর্কিত নীতির ফলে মিশরীয়দের মধ্যে পুনরায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ হয়। এই দ্বিতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মোস্তফা কামিল, মুহম্মদ আবদুহ ও ফরিদ বে প্রমুখ।

দ্বিতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঃ ১৮৯২ সালে তৌফিক পাশার মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আব্বাস হিলমী (১৮৯২-১৯১৪) খদিভ নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন নাবালক ও প্রশাসনে অনভিজ্ঞ। ফলে মিশরে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় প্যারিসে আইন শাস্ত্র অধ্যয়নরত মোস্তফা কামিল নামে এক বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ সংবাদপত্রের মাধ্যমে মিশরে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের অবসান দাবী করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি 'হিযাবুল ওয়াতান' নামে একটি জাতীয় দল গঠন করেন। ১৮৯৬ সালে প্যারিস থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সংবাদপত্র ও স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র প্রচার করতে থাকেন। ১৯০৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর 'হিযাবুল ওয়াতানে'র নেতৃত্ব দেন তাঁর সহকর্মী মোহম্মদ ফরিদ বে। প্রথম ও দ্বিতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে তুলনা করলে প্রতীয়মান হবে যে ওরাবী পাশার নেতৃত্বে প্রথম যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় তা মূলতঃ ছিল গ্রাম ও

www.pathagar.com

কৃষকভিত্তিক, যার শিকড় ছিল খুব গভীরে। অপরদিকে, দ্বিতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটি ছিল বিশেষতঃ নগর ও কতিপয় বুদ্ধিজীবীভিত্তিক। মধ্যবৃত্ত শ্রেণী থেকে উদ্বুদ্ধ এই আন্দোলনটি জনগণের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয় এবং এই কারণে এটি সহজেই ব্যর্থ হয়। ১৮৮২ সালে মিশরে ব্রিটিশ নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনীর তৎপরতার ফলে মিশরে ব্রিটিশ আধিপত্য সুদৃঢ় হয়। মিশরে ব্রিটিশ বাহিনীর তৎপরতায় ফরাসী সরকার বিচলিত হয় এবং অবশেষে ১৯০৪ সালের একটি চুক্তির মাধ্যমে মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভুত্ব সুপ্রিতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, মরক্কো ব্রিটিশ সরকার ফরাসী আধিপত্য স্বীকার করে নিলে মিশরে ব্রিটিশদের একচেটিয়া প্রভাবে ফ্রান্স-বিরোধিতা করে নি। ১৮৮২ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত মিশর ব্রিটেনের দখলে ছিল, যদিও ব্রিটেনের কোন আইনসঙ্গত অধিকার (legal right) ছিল না।

তৃতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

মোহম্মদ আবদুহু ঃ মিশরে ব্রিটিশ আধিপত্য সুদৃঢ় হলে তৃতীয়বারের মত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মিশরের দু'জন কৃতী সন্তান শেখ মোহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫) এবং সা'দ জগলুল পাশা (১৮৫৭/৬০-১৯২৮)। ওরাবী পাশার মত আবদুহু একটি কৃষক (ফেলাহীন) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭২ সালে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বিশ্ব ইসলামবাদের প্রবক্তা শেখ জামালউদ্দীন আফগানীর সংস্পর্শে আসেন এবং তার মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ক্রমে তিনি মিশরে একজন উদার ইসলামপন্থী সমাজ সংস্কারক ও ধর্মীয় নেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ওরাবী পাশার সহচর ছিলেন এবং সা'দ জগলুল পাশার স্বতীর্থ ছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'হিযাবল উম্মা' দল তার মতবাদ প্রচার করে। আবদুহুর লেখনীর মধ্যে কুসংস্কার ও গোঁড়ামির উর্ধ্বে একটি ধর্মীয় সংস্কারের আভাষ পাওয়া যায়। তিনি ইবন তায়মিয়ার মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তফসির আল-কুরআন আল-হাকিম' ধর্মীয় পান্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে। তিনি ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মিশরের 'গ্রাণ্ড মুফতীর' পদ অলঙ্কৃত করেন। মোহাম্মদ আবদুহু কে ঊনবিংশ শতাব্দীর মিশরের ইতিহাসে প্রথম ও প্রভাবশালী ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

সা'দ জগলুল পাশা

সংগ্রামী জীবন ঃ বিশ্ব-ইসলামবাদী সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর একজন কৃতী ছাত্র এবং আবদুহুর সহপাঠী ও সহকর্মী সা'দ জগলুল পাশাকে প্রকৃত অর্থে আধুনিক মিশরের প্রতিষ্ঠাতা (Father of modern Egypt) বলা হয়ে থাকে। তিনি ১৮৫৭/৬০ সালে ডেল্টা অঞ্চলের আবিয়ানা গ্রামের এক নিরন্ন কৃষক (ফেলাহীন) পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গ্রাম প্রধান ছিলেন এবং সে কারণে তিনি খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। মক্তবের পাঠ শেষ করে সা'দ ১৮৭১ সালে আল-আযহার

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হন। এ সময়ে তিনি তাঁর সহপাঠী আবদুহ্‌সহ আফগানীর প্রভাবাধীনে আসেন। তিনি আবদুহুর ১৮৮০ সালে অফিসিয়াল গেজেট পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেন। তিনি ফরাসী ভাষায় আইনশাস্ত্র অধ্যয়নকরে একজন কৃতী আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৯২ সালে সা'দ আপীল কোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন এবং শারিয়া কোর্ট এবং বিচার ব্যবস্থার সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রিটিশপন্থী প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা ফাহ্‌মীর কন্যাকে বিবাহ করার ফলে তিনি মিশরের উচ্চ ও অভিজাত মহলে চলাফেরা করতে পারেন। তিনি সংস্কারপন্থী ছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। তীক্ষ্ম মেধা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা জগলুল পাশা একাধারে ছিলেন বাগ্মী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ। তিনি ১৮৯২ সাল মোহাম্মদ আবদুহ্‌-র সঙ্গে 'মুসলিম বেনেভোলেন্ট সোসাইটি' গঠন করেন। এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে ব্রিটিশ সমর্থক 'উম্মা পার্টির' বা 'হিযাবুল উম্মা' সঙ্গে সংযোগ ছিল। এ কারণে তিনি লর্ড ক্রোমারের সুপারিশে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ সরকারি পদ অলঙ্কৃত করেন; কিন্তু ১৯০৬ সালের দিন সাওয়াই ঘটনা তাঁর জীবনের ধারাকে পাল্টে দেয়। যাহোক, সা'দ জগলুলের জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রখর ছিল এবং তিনি ১৮৯৫ সালে মোস্তফা কামিল প্রতিষ্ঠিত 'হিযাবুল ওয়াতান' নামক রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দেন। মোস্তফা কামিলের মৃত্যুর পর সা'দ জগলুল 'হিযাবুল ওয়াতান' নেতৃত্ব দেন।

দিনসাওয়াই ঘটনা ঃ ভাটিকিওটিস বলেন, "দিনসাওয়াই ঘটনা কেবলমাত্র ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মিশরীয়দের জাতীয় বিক্ষোভকেই অনুপ্রাণিত করে নি, উপরন্তু, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় কিংবদন্তি সৃষ্টি হয় এবং পরিশেষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়।" ১৯০৬ সালে কায়রো থেকে আলেকজান্দ্রিয়া গমন করে কয়েকজন ব্রিটিশ অফিসার মিনওফিয়া নামক স্থানে অবস্থান করেন। তারা পার্শ্ববর্তী দিনসাওয়াই গ্রামে পাখি শিকারে বের হয় এবং ঘটনাচক্রে শিকারের সময় স্থানীয় একজন ইমামের স্ত্রী গুলিবদ্ধ হয়ে আহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় গ্রামবাসী ব্রিটিশ শিকারীদের ঘিরে ফেলে হামলা চালায়। এই আক্রমণে দু'জন ব্রিটিশ অফিসার আহত হয়। অফিসারগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাতে থাকে এবং আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছোঁড়ে। পথিমধ্যে একজন আহত অফিসারের মৃত্যু হয় এবং অপরজন ক্যাম্পে ফিরে আসে। উত্তেজিত ব্রিটিশ সৈন্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে একজন স্থানীয় লোককে হত্যা করে। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা প্রায় বায়ান্নজন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। সিরিন-আল-কুম নামক স্থানে ১৮৯৫ সালে জারীকৃত ব্রিটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য জারীকৃত আইনের বিধান অনুসারে আদালতে বিচার হয়। ভুট্রস গালী পাশা নামক একজন খ্রিস্টান বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী বিচার কাজ পরিচালনা করেন। ১৯০৬ সালের ২৭ শে জুন গ্রেফতারকৃত গ্রামবাসীদের মধ্যে চারজনকে ফাঁসী দেওয়া হয়; অনেকে কারাবরণ এবং বেত্রাঘাতের দণ্ড লাভ করে। এই সাজা প্রকাশ্যে এবং নৃশংসভাবে দেওয়া হলে মিশরীয়দের জাতীয় মর্যাদায় আঘাত হানে। এই ঘটনা শেখ আলী ইউসুফ এবং মোস্তফা কামিলকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মিশরীয়দের উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

বর্বরতা ও নৃশংসতার জন্য মোস্তফা কামিল মিশর থেকে ব্রিটিশদের প্রত্যাবর্তনের দাবী জানান। এই ঘটনাটি সাধারণ আইন সভায় আলোচিত হয় এবং দাবী করা হয় যে, বন্দীকৃত দিনসাওয়াই লোকদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক। উপরন্তু, পার্লামেন্টারী সরকার গঠন, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ইউরোপীয় কোম্পানিদেরকে প্রদত্ত সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বাতিলের দাবীও করা হয়। বৈদেশিক শাসনের মূলে কুঠারাঘাত করার জন্য যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তাই জাতীয়তাবাদপুষ্ট।

ক্রোমার-গোর্স্ট-কিচেনার ঃ তুরস্কের নব্য-তুর্কী আন্দোলনের (১৯০৮) প্রভাবে মিশরীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সুদূরপ্রসারী করেন। জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলে লর্ড ক্রোমারকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে স্যার এলডন গোর্স্টকে মিশরের শাসনকর্তা বা রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ শাসকবর্গের দমন নীতির ফলে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ চলতে থাকে। জাতীয়তাবাদী ও সাংবাদিকদের নির্বাসিত করা হয় এবং সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ১৯১০ সালে নব নিযুক্ত কপটিক খ্রিস্টান প্রধানমন্ত্রী ভুট্রস গালী পাশা নিহত হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে থাকে। এলডন গোর্স্টের উদারনীতি সমস্যা নিরসন করতে পারে নি। তিনি কনসুল-জেনারেল হিসেবে ১৯০৮ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেন। ১৯১১ সালে লর্ড কিচেনার গোর্স্টের স্থলাভিষিক্ত হন কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশঃ আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে থাকে। ব্রিটিশ শাসক লর্ড ক্রোমার (১৮৮২-১৯০৭), এলডন গোর্স্ট (১৯০৭-১১) এবং লর্ড কিচেনার (১৯১১-১৯১৪) এর শাসনামলে মিশরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রান্তি লগ্নে পৌঁছায়।

জগলুলের কর্মজীবন ঃ ১৯০৬ সালে যখন দিনসাওয়াই ঘটনাটি সংঘটিত হয় তখন লর্ড ক্রোমার ব্রিটিশ এজেন্ট হিসেবে মিশরে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। মিশরের শক্তিহীন নাবালক খদিভ দ্বিতীয় আব্বাস শুধু নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৬ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত মিশরের রাজনৈতিক অঙ্গন দ্রুত পট পরিবর্তিত হতে থাকে এবং এই পট পরিবর্তনে জগলুল পাশা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ক্রোমারের সুপারিশে খদিভ দ্বিতীয় আব্বাস সা'দ জগলুল পাশাকে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তাঁর শ্বশুর প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা ফাহামী পাশার মন্ত্রী সভার ১৯০৬ সালে যোগদান করেন। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত করেন। সা'দ জগলুলের মন্ত্রিত্ব দিনসাওয়াই ঘটনার তিক্ততাকে নিরসনের জন্য না শাসন ব্যবস্থায় মিশরীয়দের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ দানের জন্য তা বলা দুষ্কর। এতদসত্ত্বেও ভাটিকিওটিসের ভাষায় একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, "সা'দ জগলুলের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর পদে নিযুক্তি শাসনব্যবস্থার মিশরীয়করণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ" (Egyptianization of administration)। উপরন্তু, এই নিযুক্তি উদারপন্থী সেকুলর রাজনীতিবিদদের প্রশাসনে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেয়। ১৯০৬ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত সা'দ জগলুল পাশা মিশরের শিক্ষার অবকাঠামো তৈরি করেন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য কুতুবখানা বা মক্তব প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করেন এবং বয়স্কদের জন্য নৈশ স্কুল স্থাপন করেন। তিনি ইংরেজির স্থলে আরবিকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে চালু করেন এবং স্কুল পরিদর্শক হিসেবে অধিক সংখ্যক মিশরীয়দের নিয়োগ করেন। ১৯১০ সালে তিনি আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করে আইনের সংস্কার করেন। শারিয়া বিচারকদের প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল স্থাপিত হয়। তিনি বিচারের ক্ষেত্রে খদিভের ক্ষমতাহ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৩ সালে লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় সা'দ জগলুল মন্ত্রীত্বে ইস্তফা দেন। ১৯১২ সালে লর্ড কিচেনার এবং খদিভকে হত্যার একটি ষড়যন্ত্র ফাঁস হলে ব্রিটিশ এজেন্ট কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু গণ-আন্দোলনের ফলে কিচেনার সংবিধানকে গণতন্ত্রমুখী করতে বাধ্য হন। তিনি উচ্চ ও নিম্ন পরিষদ একীভূত করে একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠন করেন। ১৯১৩-১৪ সালে কিচেনার কর্তৃক সৃষ্ট নতুন ব্যবস্থাপক সভায় জগলুল সমর্থকেরা নির্বাচনে বিপুল ভোটে সদস্য নির্বাচিত হন এবং জগলুল সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯১৪ সালে এসেমবেলী (Asembly) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সামরিক আইন জারী করা হয়। ফলে সদস্যপদ হারিয়ে তিনি ব্রিটিশ আধিপত্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বিরোধী দল গঠন করেন। যাহোক, স্বল্পকালীন সময়ে (জুন, ১৯১৪) তিনি ব্যবস্থাপক সভার নেতা হিসেবে শিক্ষা, সমাজ, জনকল্যাণকর, সংস্কারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভাটিকিওটিস যথার্থই বলেন যে, সা'দ জগলুলের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক অভিজ্ঞতায় এমন একটি নিশ্চিত জাতীয় বুদ্ধিজীবী (elite) শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে যার ফলে ১৯১৯ সালের ব্রিটিশ বিরোধী গণ বিক্ষোভ ও আন্দোলন জোরদার হয়। ফলে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী শাসনের স্থলে সাংবিধানিক সরকার (constitutional government) প্রবর্তন করতে বাধ্য হন।

ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য মিশর ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগদান করায় মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেন ঘাঁটি শক্ত করার জন্য মিশরকে ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্যে (protectorate) পরিণত করা হয়। ১৯১৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বরে মিশর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। সামরিক আইন জারী করা হল; আইন পরিষদ স্থগিত ঘোষিত হল; সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হল এবং সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মিশরের রাজনৈতিক পট দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। মোহাম্মদ আলীর সময় থেকে তুরস্কের সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সহায়তায় তুরস্ক মিশরে আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেও জার্মানির পক্ষে (Axis power) তুরস্কের যোগদানে মিশর ব্রিটিশ প্রটেকটরেটে পরিণত হলে অটমান সুলতানদের মিশরে কোন ক্ষমতাই থাকল না। এমন কি খদিভের নিযুক্তিও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে চলে যায়। ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাদের স্বার্থে দ্বিতীয় আব্বাস হিলমীর (১৮৯২-১৯১৪) স্থলে তাঁর চাচা হোসেন কামিল পাশাকে (১৯১৪-১৭) গদিতে বসান। ১৯১৭ সালে কামিল পাশাকে সুলতানের মর্যাদা দেওয়া হয়। ফলে খদিভের পদ বিলুপ্ত হল। ব্রিটিশ সরকার আসন্ন যুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৯) মধ্য-প্রাচ্যে মিশরের গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

ভৌগোলিক অবস্থান এবং সুয়েজ খালের নিরাপত্তার জন্য মিশরকে প্রটেকটরেটে রূপান্তরিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিশরীয়গণ ব্রিটিশদের পক্ষে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। তাদের সমর্থন দান করে অসংখ্যা ফেলাহীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দান করে যে, যুদ্ধের পর মিশরের স্বাধীনতার প্রশ্ন বিবেচনা করা হবে। মিশরকে পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তির জন্য মোস্তফা কামিলের জাতীয় পার্টি আন্দোলন চালাতে থাকে কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য তা সম্ভবপর হয় নি। ১৯১৪ সালে লর্ড কিচেনার যুদ্ধকালীন ব্রিটেনের সমর মন্ত্রী নিযুক্ত হলে মিশরে তার স্থলে স্যার হেনরী ম্যাকামোহন কনসুল-জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সালে ম্যাকামোহনের স্থলাভিষিক্ত হন স্যার রেজিনাল্ড উইনগেট। তিনি হোসেন কামিল পাশার মৃত্যুতে ১৯১৭ সালে তাঁর ভ্রাতা এবং ইসমাইলের পুত্র ফুয়াদকে সিংহাসনে বসান।

জগলুলের নেতৃত্ব ঃ ১৯১৪ সালে জারীকৃত প্রটেকটরেট ঘোষণায় (Protectorate Declaratin) ব্রিটিশ সরকার সাংবিধানিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে ১৯১৭ সালে রাজা প্রথম ফুয়াদ এবং প্রধানমন্ত্রী রুশদী পাশা জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ক্যাপিচুলেশন নিরসন করে সাংবিধানিক সংস্কার প্রবর্তনের জন্য চাপ দেন। এর ফলে মিশরের ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী গণবিক্ষোভ ও আন্দোলনের আশঙ্কায় ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে একটি বিশেষ কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে স্যার উইলিয়াম ব্রায়নযেটের নেতৃত্বে একটি রিপোর্ট প্রণীত হলেও তাতে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতার দরুন মিশরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শূন্যতা দেখা দিলে জগলুল পাশা তাঁর নব গঠিত 'উম্মা' পার্টির মাধ্যমে নব-জাগরণের চেষ্টা করেন। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হলে মিশরীয়গণ সংবিধান প্রণয়ন ও স্বায়ত্বশাসনের প্রবর্তনে আন্দোলন শুরু করে। নতুন খদিভ প্রথম ফুয়াদের স্বৈরাচারী নীতি ও ব্রিটিশ শাসকদের আধিপত্যবাদের জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিঘ্নিত হলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়নে বাধ্য হয়। একটি নতুন মন্ত্রীসভাও গঠিত হয় রুশদী পাশার নেতৃত্বে, কিন্তু ব্রিটিশদের বিরোধিতায় জগলুলকে মন্ত্রীপরিষদ থেকে বাদ দেওয়া হয়। মিশরের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে সা'দ জগলুলকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মারাত্মক ভুল করে। কারণ মিশরীয় জনগণ জগলুলকে তাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে। এর পরিণতিতে সমগ্র দেশের বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়। এই পরিস্থিতি নিরসনের জন্য জগলুল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান এবং ব্রিটেনে সঙ্কট নিরসনের জন্য একটি জাতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণের প্রস্তাব দেন। এই পর্যায়ে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জগলুল পাশা মিশরের অবিসংবাদী জননেতায় পরিণত হন এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞায় বিচলিত হয়ে পড়ে। তিনি

www.pathagar.com

সর্বদলীয় সমর্থন লাভ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আবদুল আজীজ ফাহামী এবং আলী শাহ সাবায়ীসহ একটি জাতীয় প্রতিনিধি দল গঠন করেন। তিনি ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও রেসিডেন্ট স্যার রেজিনাল্ড উইনগেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর ডেলিগেটদের ব্রিটেনে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই ডেলিগেশনের উদ্দেশ্যে ছিল ব্রিটিশ সরকারের সাথে সরাসরি আলাপ করে সঙ্কট নিরসন করা। কিন্তু দমন নীতির ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জগলুলের প্রার্থনা মঞ্জুর করে নি। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী রুশদী পাশাও একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ব্রিটেনে যেতে চান কিন্তু তাঁকে পাসপোর্ট না দেওয়া হলে তিনি ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে পদত্যাগ করেন। ফলে মারাত্মক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

'ওয়াফদ পার্টি' ঃ স্যার রেজিনাল্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জগলুল ও তাঁর প্রতিনিধিরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধের পর মিশরকে বিদেশী দখলদার বাহিনী থেকে মুক্ত করে সংবিধান প্রদান, স্বাধীকার ও স্বাধীনতা প্রদানের অঙ্গিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রেজিনাল্ড জগলুলের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিনিধিদলকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি এবং আলোচনাও ফলপ্রসূ হয় নি। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট তাঁকে জনপ্রতিনিধি এবং মুখপাত্র হিসেবে স্বীকার করেন নি। উপরন্তু, সরকারি তরফ থেকে রুশদী পাশা ডেলিগেশন পরিচালনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাও নামঞ্জুর করা হয়। ফলে একই সাথে দু'টি ডেলিগেশন প্রেরণের প্রস্তাব বিভ্রান্তির সৃষ্টি করার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় জগলুল উপলব্ধি করেন যে, যদি তাঁর নেতৃত্বে জন সমর্থন লাভ করে কোন প্রতিনিধিদল পরিচালিত করতে হয় তাহলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত একটি 'অফিসিয়াল ডেলিগেশন' গঠন বাঞ্ছনীয়। তিনি বুঝতে পারেন যে, 'অফিসিয়াল ডেলিগেশন' গঠনের ফলে সরকার বা সুলতানের তরফ থেকে অন্য কোন প্রতিনিধিদল প্রেরণের সম্ভাবনা থাকবে না। উপরন্তু, সর্বজন সমর্থিত অফিসিয়াল ডেলিগেশনের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার আলাপ আলোচনায় বসতে রাজী হবে। অতপর জগলুল ১৯১৮ সালের ১৩ই নভেম্বর 'ওয়াফদ পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। স্থায়ী প্রতিনিধি দলটি 'আল-ওয়াফদ-আল-মিশর' অথবা মিশরীয় ডেলিগেশন নামে পরিচিত ছিল। এই প্রতিনিধি দলে পূর্ববর্তী আইন সভার দু'একজন সদস্য ব্যতীত প্রায় সকলেই সভ্য ছিল। এই ওয়াফদ পার্টির সংবিধানে দু'টি অনুচ্ছেদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঃ (১) এই দলের প্রধান লক্ষ্য হল ব্রিটিশ সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আইনসঙ্গত এবং শান্তিপূর্ণভাবে মিশরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন; (২) এই দলের প্রধান শক্তি হচ্ছে জন সমর্থন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য দরখাস্ত স্বাক্ষর সংগ্রহ করার অভিযান পরিচালিত হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চাপ দেয়। সমস্ত হ্যান্ডবিল ও দরখাস্ত বাজেয়াপ্ত হলে জগলুল প্রধানমন্ত্রী রুশদীর নিকট প্রতিবাদ করেন। উত্তরে প্রধানমন্ত্রী জানান যে, সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালীন এ ধরনের কার্যকলাপ বেআইনী। আপাতঃদৃশ্যে জগলুলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফর না হলেও গণপ্রতিনিধিত্ব দ্বারা 'ওয়াফদ পার্টির' সৃষ্টি মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক।

www.pathagar.com

জগলুলের ভাগ্য বিপর্যয় ঃ নভেম্বর মাসের (১৯১৮) শেষার্দ্ধে সা'দ জগলুল পুনরায় ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট লন্ডনে ডেলিগেশন প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু নিরাপত্তার অজুহাতে ব্রিটিশ রেসিডেন্সী অনুমতি প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর ওয়াফদ পার্টি ব্রিটিশ দখলদার বাহিনীর কুকীর্তি ও দমননীতি প্রকাশের জন্য মিশরের বিভিন্ন বিদেশী দুতাবাসে, এমন কি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উডরো উইলসনের নিকট পত্র প্রেরণ করে। এই কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনসমর্থন ও বিদেশী সরকারের সহানুভূতি আকর্ষণ করে আশ্রিত রাজ্য মিশরে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে নাজেহাল করা। যাহোক, ব্রিটিশ রেসিডেন্সী ওয়াফদ পার্টিকে ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডন অথবা প্যারিসে গমনে বাধা দান করতে সমর্থ হয়। ১৯১৯ সালে ১৮ই জানুয়ারি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এই চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে 'ওয়াফদ পার্টি' তাদের দাবী উপস্থাপনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। ১২ই জানুয়ারি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সিরিয় ডেলিগেশনকে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে যোগদানের অনুমতি দেয় কিন্তু মিশরীয় ডেলিগেশনকে বাধা দান করলে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়। অতঃপর ১৩ই জানুয়ারি জগলুল পাশা হামদ পাশা নামের একজন সদস্যের বাসায় 'ওয়াফদ পার্টির' সাধারণ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় সকল সদস্য বলিষ্ঠ কণ্ঠে মিশরকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করার দীপ্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। জগলুল যুক্তি দ্বারা বক্তব্য রাখেন যে, মোহাম্মদ আলীর সময় তুরস্কের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে মিশর স্বাধীন ছিল যা ১৮৪০ সালে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ স্বীকার করে। কিন্তু খদিভদের বৈরীতায় মিশর ইঙ্গ-ব্রিটিশদের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়। 'ওয়াফদ পার্টি' তাদের দাবীর সমর্থনে ১৯১৯ সালের ৩১শে জানুয়ারি মাসে গণবিক্ষোভের আয়োজন করলে ব্রিটিশ বাহিনীর জেনারেল ওয়াটসন তা নস্যাৎ করে দেন। ৮ই ফেব্রুয়ারি জগলুল তাঁর দাবীতে অটল ছিলেন এবং ১লা মার্চ রুশদীর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে সুলতান ফুয়াদ (১৯১৭-৩৬) সংবিধান ও জাতীয়তা বিরোধী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন। একদিকে ওয়াফদ পার্টির ক্রমবর্ধমান গণ আন্দোলন, অপরদিকে মিশরের রুশদী সরকারের পতন এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় ৬ই মার্চ জেনারেল ওয়াটসন জগলুল পাশা ও তাঁর সঙ্গীদের সামরিক দফতর ডেকে তাদের সাবধান করে দেন। এ ধরনের অহেতুক নিপীড়ন ও হয়রানিতে জগলুল পাশা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের নিকট একটি তারবার্তা পাঠান। এহেন বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়ে সামরিক শাসকবর্গ 'ওয়াফদ পার্টির' কার্যকলাপ বন্ধের জন্য জগলুল পাশাসহ কতিপয় নেতাকে গ্রেফতার করে ৮ই মার্চ মাল্টায় নির্বাসিত করে।

গণ-আন্দোলন ঃ জননেতা সা'দ জগলুল পাশার নির্বাসন সুপ্ত বারুদে অগ্নিস্ফূরণের মত প্রতিক্রিয়া হয়। সমগ্র মিশরবাসী ব্রিটিশ দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং শহর, বন্দর ও গ্রামে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়। স্কুল থেকে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সংঘবদ্ধভাবে মিশর থেকে ব্রিটিশ

www.pathagar.com

আধিপত্য উৎপাঠনের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করে। মিশরের জাগ্রত জনতা টেলিগ্রাফের লাইন কেটে দেয়, রেল ও সড়কপথ ধ্বংস করে যাতায়াতের বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তারা ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনপুষ্ট সংবাদপত্র 'আল-মুকাত্তামের' দফতর পুড়িয়ে ফেলে। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট সামরিক আইন জোরদার করে অসংখ্য আন্দোলকারীকে গ্রেফতার ও নির্যাতন করতে থাকে। অসংখ্য নিরীহ ও নিরপরাধ মিশরীয়কে হত্যা করা হয়। দমননীতি চরমে উঠলে বিক্ষুব্ধ মিশরীয়গণ ১৮ই মার্চ আসওয়ান থেকে কায়রো গামী একটি ট্রেন হামলা চালিয়ে আট জন ব্রিটিশ অফিসার ও কর্মচারীকে হত্যা করে। এর ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। সা'দ জগলুল পাশার অবর্তমানে 'ওয়াফদ পার্টির' নেতৃত্বে ছিলেন আলী পাশা সারায়ী। এই গণবিক্ষোভে মহিলা (হুদা হানুম সারাভী) এবং কৃষকশ্রেণী যোগদান করে। সমগ্র দেশে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং অনেক শহরে অস্থায়ী সরকারও গঠন করা হয়। মার্চ মাসের শেষার্দ্ধে প্রতীয়মান হয় যে, রুশদী সরকারের পতনে 'ওয়াফদ পার্টি' ব্যতীত অপর কোন সর্বজনস্বীকৃত রাজনৈতিক দল নেই। এমন কি খ্রিস্টান কপটগণও এই দলকে সমর্থন করে।

জেনারেল এলেনবে ও লর্ড মিলনার ঃ ১৯১৯ সালের ২৫শে মে উইনগেটের স্থলে জেনারেল এলেনবে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করে গণ আন্দোলন দমনের চেষ্টা করেন। তিনি দমন নীতির স্থলে বুদ্ধিজীবী, উলেমা ও 'ওয়াফদ পার্টি'র সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। কিন্তু গণতন্ত্রী জাতীয়তাবাদীগণ এলেনবের প্রতি আস্থাবান ছিলেন না। ফলে হরতাল শুরু হয় এবং একাদিক্রমে তিনদিন সরকারি দফতর বন্ধ থাকে। এমতাবস্থায় আলাপ-আলোচনার জন্য এলেনবে প্যারিস অথবা লন্ডনে 'ওয়াফদ পার্টি'র সদস্যদের গমনে অনুমতি দেন। ১৯১৯ সালের ৭ই এপ্রিল জগলুল পাশাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি প্যারিসে গমন করেন। মিশরের রাজনৈতিক অসন্তোষ পরীক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ সালে লর্ড মিলনারের নেতৃত্বে একটি কমিশন কায়রোতে পাঠান। আপাতঃদৃশ্যে মনে হবে যে, জাতীয়তাবাদীদের সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকার নমনীয় ভাব গ্রহণ করে। কিন্তু কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রটেকটরেটকে সুরক্ষিত করার জন্য ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকরণে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। উল্লেখ্য যে, এই কমিশনটি ছিল একতরফা; কোন মিশরীয় সদস্য এই কমিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইত্যাবসরে এলেন বে সা'দ জগলুলের প্রতিপক্ষ মোহাম্মদ সাঈদ পাশাকে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের আহ্বান জানান। তিনি ১৯১৯ সালের ২১শে মে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। সাঈদ পাশার নিযুক্তিকে মিশরীয়গণ জাতীয়বাদীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির একটি জঘন্য চক্রান্ত বলে মনে করেন। সাঈদ পাশা মিশরে বিদেশী কমিশন আনার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই তিনি মিলনার তদন্ত কমিশনের বিরোধিতা করেন। ফলে, তাকে পদচ্যুত করে ইউসুফ ওয়াহ্‌বা নামে একজন খ্রিস্টানকে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাঈদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মিলনার মিশরে এসে রাজনৈতিক সঙ্কটের কারণ ও তার সমাধানের জন্য তদন্ত শুরু করেন। কতিপয় সরকারি কর্মচারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিলনার কমিশনের সহযোগিতা করে। 'ওয়াফদ পার্টি'র

www.pathagar.com

সদস্যগণ নগর ও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে মিলনারকে কোন প্রকার সহযোগিতা থেকে বিরত থাকার জন্য প্রচারণা চালায়। অসহযোগিতার জন্য মিলনার কমিশন ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯২০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তদন্ত পরিচালনায় ব্যর্থ হয় এবং মিলনার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মিলনার মিশনের জানা ছিল যে, 'ওয়াফদ পার্টি'র সহযোগিতা ব্যতীত তাদের কার্যক্রম সফল হবে না। মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যহত থাকে এবং ব্রিটিশ শাসনগোষ্ঠী উপলব্ধি করে যে, 'ওয়াফদ পার্টি'র সাথে আলাপ-আলোচনা ব্যতীত রাজনৈতিক সঙ্কট দূর করা যাবে না। সা'দ জগলুল পাশা লন্ডনে অবস্থানকালে রুশদী পাশা ও আদলী ইয়েকেনের পরামর্শে ১৯২০ সালের জুন মাসে মিলনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলাপ শুরু হয় এবং একটি খসড়া মেমোরান্ডাম প্রস্তুত করা হয়। জগলুল এই মেমোরান্ডাম অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু প্রবাসে অবস্থানকালে স্বদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতেন না এবং তাঁর সন্দেহ ছিল যে মিশরের তাবেদার সরকার গোপনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। যা হোক ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মিলনার কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে মিশরের বৃহত্তর স্বার্থে 'প্রটেকটরেট স্ট্যাটাস' অনতিবিলম্বে বাতিল করার সুপারিশ ছিল। এদিকে আলাপ আলোচনার জন্য এলেন বে সুলতানকে একটি সরকারি প্রতিনিধি দল প্রেরণের পরামর্শ দেন। ১৯২১ সালের মার্চে জগলুলের সমর্থনে আদলী ইয়েকেন মন্ত্রীসভা গঠন করলে আদলী জগলুলকে প্রতিনিধিত্ব করতে বলেন। জগলুল স্পষ্টত বলেন যে, সামরিক আইন এবং প্রটেকটরেট স্টাটাস বাতিল ঘোষণা করলে তিনি আলোচনায় বসবেন। এই শর্ত প্রকাশিত হলে তিনি ১৯২১ সালে ৫ই এপ্রিল মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বায়ত্ব শাসন ঃ সা'দ জগলুল স্বদেশে ফিরে আদলী সরকারের সঙ্গে বিরোধের সম্মুখীন হন। কারণ, তার শর্ত পূরণ না হলে মিলনার মিশন রিপোর্টের উপর আলোচনার জন্য লন্ডনে যেতে অস্বীকার করেন। ফলে সা'দ জগলুলের সমর্থকদের সঙ্গে মিশরীয় সরকারের বিরোধ বাধে ও সংঘর্ষ হয়। ১৯২১ সালের ১লা জুলাই মাসে ডেলিগেশন লন্ডনে পৌঁছে কিন্তু আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হয়। ফলে আদলী সরকারের পতন হয়। অন্তঃবর্তীকালীন সরকার গঠন করেন প্রাক্তন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আবদুল খালেক সারওয়াত পাশা। কিন্তু এলেন বে রাজনৈতিক সঙ্কটের আশঙ্কায় জগলুলকে গ্রেফতার করে প্রথমে এডেন এবং পরে সিসিলি দ্বীপ নির্বাসিত করেন। সা'দ জগলুল পাশা নির্বাসিত হলে ব্রিটেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করে। এলেন বে ১৯২০ সালের আগস্ট থেকে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ব্যাপী ব্রিটিশ সরকারের সাথে যোগাযোগ করে মিশরকে আংশিক স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। ব্রিটিশ সরকার জেনারেল এলেন বের সুপারিশক্রমে একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এদিকে জননেতা জগলুল পাশার নির্বাসনে সমগ্র মিশরে বিক্ষোভ, হরতাল ও তীব্র আন্দোলন শুরু হয় এবং 'ওয়াফদ পার্টি'র সন্ত্রাসী সদস্যগণ তৎপর হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় রেসিডেন্ট এলেন বে

স্বয়ং লন্ডনে গমন করে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে স্পষ্টভাবে জানান যে, মিশরের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জগলুল পাশার নেতৃত্বে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে হলেও মিশরীয়গণ মিশরকে ব্রিটেনের আশ্রিত রাজ্যের ঘৃণ্য স্ট্যাটাস থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করবে। লর্ড মিলনারের রিপোর্টের আলোকে এলেন বে এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে আলোচনার পর মিশরকে চারটি শর্তে আংশিকভাবে স্বাধীনতা প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। শর্তগুলো হচ্ছে ব্রিটেন কর্তৃক অর্পিত চারটি সংরক্ষিত বিষয় (Four Reserved Points)। ব্রিটেনের সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না এই শর্তে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ব্রিটেন চাপ দেয় ঃ (১) মিশরে ব্রিটিশ যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ; (২) সুদান ও মিশরে ব্রিটিশদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান; (৩) বিদেশী আগ্রাসন থেকে মিশরকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব; (৪) মিশরে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং বিদেশীদের সম্পত্তি সংরক্ষণ। ১৯২২ সালের মার্চ মাসে মিশরের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সুলতান প্রথম ফুয়াদকে জানানো হয়। এই ঘোষণার পর সারওয়াত পাশা মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন।

কূটনৈতিক প্রহসন ঃ ভাটিকিওটিস বলেন, “১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ ঘোষণায় মিশরকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার অঙ্গিকার ছিল। কিন্তু ১৯২০ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত যে রাজনৈতিক পত্রালাপের (Political transaction) মাধ্যমে একতরফাভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় তা ছিল অশুভ সংকেত (inauspicious)।” ঘোষণার সঙ্গে যে শর্তগুলো আরোপ করা হয় তা একদিকে যেমন সুষ্ঠু সাংবিধানিক গণতন্ত্রের উত্তোরণে অন্তরায় ছিল তেমনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সার্বজনীন ভোটাধিকারের অধিকার খর্ব করা হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের স্বার্থে মিশরের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে আধিপত্যবাদের বশবর্তী হয়ে। উপরন্তু, সুয়েজ খালের মুনাফাসহ বিদেশীদের স্বার্থ রক্ষার শর্তটিও মিশরের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অপমানজনক। রাজনৈতিক অচলাবস্থা প্রমাণিত হয় ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নির্দেশে একটির পর একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠন। মিশরীয় জনগণ সহজে উপলব্ধি করে যে, আংশিক স্বাধীনতা ঘোষণা একটি সুপরিকল্পিত কূটনৈতিক প্রহসন ছাড়া আর কিছুই না। আহম্মদ সাফী পাশা ব্রিটিশ স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বন্ধে বলেন যে, “মিশরীয় জনগণ যেমন ব্রিটিশ সরকারকে অবিশ্বাস করেন, ব্রিটিশগণও তাদের প্রতি মিশরীয় সদিচ্ছা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল।” ১৯২২ সালের পরেও সুয়েজে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী থেকে যায় এবং মিশর ও সুদানে সামরিক কর্তৃত্ব বজায় থাকে। উপরন্তু, ব্রিটিশ ঘোষণায় স্পষ্টভাবে স্বাধীন মিশরীয় সরকার গঠন, নির্বাচিত সংসদ, সংবিধান প্রণয়নের মত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কোন উল্লেখ ছিল না। এর ফলে সারওয়াত সরকার মন্ত্রী সভা গঠন করলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বৈরিতা ও মিশরীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দলগুলোর, বিশেষ করে ‘ওয়াফদ পার্টি’র বিরোধিতায় তাঁর পক্ষে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয় নি। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, নির্বাসিত জগলুল পাশার সহায়তা ও সমর্থন ছাড়া মিশরে

www.pathagar.com

প্রকৃত অর্থে বিদেশী শক্তির কবল থেকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করা যাবে না। অপরদিকে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নির্বাসিত খদিভ আব্বাস হিলমীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে হোসেন কামিলকে সুলতান উপাধি দান করে তাবেদার করে রাখে। হোসেন কামিলের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই প্রথম ফুয়াদকে 'রাজা' উপাধি দান করে ব্রিটিশ কমিশনার শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। সুতরাং একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৯২২ সালের ব্রিটিশ ঘোষণাটি ছিল রাজনৈতিক প্রহসন।

জগলুল পাশার প্রধানমন্ত্রীত্ব ঃ সারওয়াত সরকার ১৯২২ সালে সরকার গঠন করলেও মিশরীয়গণ তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি। সারওয়াত পাশা ওয়াফদপন্থীদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে সংবাদপত্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। সংবিধান প্রণয়নে তিনি ব্যর্থ হন। অসহযোগিতার জন্য তিনি বাধ্য হয়ে ১৯২২ সালের নভেম্বরে পদত্যাগ করেন।তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন মোহাম্মদ তৌফিক নাসিম পাশা। কিন্তু ব্রিটিশদের উপর সন্ত্রাসীদের আক্রমণ ও সুদান প্রশ্নের মতবিরোধ হলে তিনি তিন মাস পরে পদত্যাগ করেন। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট অরাজকতা দমনের জন্য সামরিক আইন জোরদার করেন। যে এলেন বে ব্রিটিশ ঘোষণার নেপথ্য নায়ক ছিলেন তিনি উৎপীড়ন শুরু করলেন এবং 'ওয়াফদ পার্টি'র সদর দফতর (bayt-al-umara) বন্ধ করে দেন। এক মাস (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯২৩) মিশরে কোন সরকার ছিল না। এদিকে মিশরীয় জনগণ এবং সংবাদ মিশরের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে জগলুল পাশাকে দেশের প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে থাকে। ১৯২৩ সালের ১৫ই মার্চ উদারপন্থী বিচারক ইয়াহইয়া ইব্রাহিম পাশা সরকার প্রধান হলে তিনি জগলুল পাশাকে মুক্তির নির্দেশ দেন। জগলুল পাশা ১৯২৩ সালে প্রত্যাবর্তন করেন। সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয় এবং ১৯২৩ সালের ১৯শে এপ্রিল নতুন সংবিধান ঘোষিত হয়। ৩০শে এপ্রিল সাধারণ নির্বাচনের আইন অনুমোদিত হয় এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে মিশরে সর্বপ্রথম নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং 'ওয়াফদ পার্টি'র সদস্যগণ বিপুল ভোটাধিক্যে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তাদের এই বিজয় সাফল্যের জন্য জগলুল পাশার অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগই দায়ী। 'ওয়াফদ পার্টি' যেখানে ২১৪টি আসন লাভ করে সেখানে উদারপন্থী সংবিধানপন্থীগণ এবং জাতীয় পার্টি মাত্র দু'টি করে আসন লাভ করে। ফলে জগলুল পাশার নেতৃত্বে 'ওয়াফদ পার্টি' সরকার গঠনের সুযোগ পায়। জগলুল পাশা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। ১৯২৪ সালের ২৮শে জানুয়ারি প্রথম ওয়াফদ সরকার গঠিত হয়। ১৫ই মার্চ রাজা ফুয়াদ সংসদের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

ওয়াফদ সরকার ঃ ১৯২৪ সালে জগলুল পাশা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম ওয়াফদ সরকার গঠন করেন। তিনি ছিলেন মিশরের সর্বজনস্বীকৃত নেতা। তাঁর সহকর্মী আহম্মদ শফি তাকে বলতেন, "জায়েম-আল-উম্মা" বা 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় বীর'। তিনি ক্ষমতা

www.pathagar.com

লাভ করেই মিশরকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। তাঁর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত নীতি ছিল "ইশতিকলাল-আল-তাম" অর্থাৎ "পূর্ণ স্বাধীনতা"। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তিনি সংসদে মোট ২১৪ আসনের মধ্যে ১৯৫ টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করেন এবং মাত্র নয়জন তথাকথিত বিরোধী গ্রুপকে বিশেষ গ্রাহ্য করেন নি। সংসদে স্বীয় ক্ষমতা ও প্রভাব সুদৃঢ় করে জগলুল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অপসারণ দাবী করেন। কারণ দখলদার বাহিনীর অবস্থান সার্বভৌমত্বে হানীকর। উপরন্তু, সংরক্ষিত পয়েন্টে (Reserved point) উল্লিখিত সুদান প্রশ্নেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জগলুল একমত ছিলেন না। তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে সমস্যা সমাধান করতে চান, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের জন্য আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হয়। অতঃপর ১৯২৪ সালের জুন মাসে পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে মিশর সরকার মিশরে অবস্থানরত ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যয় ভার বহন করবে না এবং সুয়েজখালের নিয়ন্ত্রণ 'লীগ অব দি নেশনস'-এর উপর অর্পিত হবে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও রাজনৈতিক জটিলতার জন্য তা কার্যকরী করা যায়নি। যাহোক, ১৯২৪ সালের নভেম্বরে মিশরের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান (Sirdar) কায়রোতে আততায়ীর হাতে নিহত হলে জগলুল পাশার সরকার সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ব্রিটেনের টোরী সরকার এই হত্যাকাণ্ডের জন্য জগলুল সরকারের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করে ক্ষতিপূরণসহ অন্যান্য দাবী পেশ করে। দাবীগুলো ছিল– (১) পূর্বের মত ব্রিটিশ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে; (২) সুদান থেকে সব মিশরীয় সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে; (৩) নীল নদীর পানি দিয়ে সুদানের সেচ ব্যবস্থা অব্যহত রাখতে হবে; (৪) হত্যার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জগলুল পাশা ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০০,০০০ পাউন্ড স্টারলিং প্রদানে সম্মত হলেও অপর তিনটি ঘৃণ্য শর্ত মানতে রাজী হলেন না। ফলে, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া কাস্টমস হাউস দখল করে জগলুলকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। ১৯২৪ সালের ২৮শে জানুয়ারি থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত নয় মাস ওয়াফদ সরকার বলবৎ ছিল। সিনেটের প্রথম প্রেসিডেন্ট আহমদ জিওর পাশা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলে তিনি ব্রিটিশ কর্তৃক আরোপিত সকল শর্ত মেনে নেন। শুধু তাই নয় নির্বাচনের বিধিমালা এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যাতে ১৯২৫ সালে পরবর্তী নির্বাচনে 'ওয়াফদ পার্টি' যোগদান করতে না পারে।

প্রেসিডেন্ট পদে জগলুল ঃ ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লিবারাল, জাতীয়তাবাদী, ইত্তেহাদী, ওয়াফদ পার্টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ সম্মিলিতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল সংখ্যক ভোটে পুনরায় বিজয় লাভ করে। মোট ২১৪টি আসনের মধ্যে ১১৬টি আসন তারা লাভ করে। নব গঠিত পার্লামেন্টে জগলুল পাশা নির্বাচিত হন। তিনি মিশরের প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদা লাভ করেন এবং তিনটি দল থেকে (জাতীয়তাবাদী, ওয়াফদ এবং লিবারাল) তিনজনকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। জগলুল পাশার ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ সরকার সুনজরে দেখে নি। তারা শঙ্কিত

www.pathagar.com

হয়ে লর্ড এলেনবে-র স্থলে নিযুক্ত নতুন ব্রিটিশ হাইকমিশনার লর্ড লয়েড আলেকজান্দ্রিয়ার একটি যুদ্ধ জাহাজ নোঙ্গর করার নির্দেশ দেন। সা'দ জগলুল পাশা বার্ধক্যহেতু সরকারি দায়িত্ব লিবারাল পার্টির নেতা আদলী পাশার উপর ন্যস্ত করেন। সক্রিয় অংশগ্রহণে ব্যর্থ হলেও জগলুল মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃত ছিলেন এবং তাঁরই অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের ফলেই মিশর স্বাধীনতা লাভ করে। তিনি ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে মৃত্যুবরণ করেন। সা'দ জগলুল পাশার মৃত্যুর পর 'ওয়াফদ পার্টি'র নেতৃত্বে ছিল মোস্তফা নাহাস পাশা।

ওয়াফদ পার্টি সম্বন্ধে দু'জন ফরাসী গ্রন্থকার Jean and Simone Lacouture বলেন, "The Wafd was the expression of the entire people of which in the fullest sense it was the delegate. Any attempt at defining it would involve a complete description of Egypt. It contained all the generosity, intellectual mood, good nature, contradictions and megalomania of the millions of supporters."

৬. ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি, ১৯৩৬

পটভূমি (১৯২৭-৩০) ঃ ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে লিবারাল পার্টির নেতা আদলী ইয়েকেন পাশা পদত্যাগ করলে তাঁর সহকর্মী আবদুল খালেক সারওয়াত মিশরে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। তাঁর সময়ে পার্লামেন্টের সদস্যগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সেনাবাহিনীর 'সিরদার' বা প্রধান হিসেবে একজন মিশরীয় সামরিক বাহিনীর সদস্যকে নিয়োগ করতে হবে। ফলে ২৭শে মে ব্রিটেন আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি নৌবহর প্রেরণ করে। ১৯২৭ সালে জগলুল পাশার মৃত্যু হয় এবং 'ওয়াফদ পার্টি' তার সহকর্মী নাহাস পাশাকে নেতা নির্বাচিত করে। সারওয়াত পাশা রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের জন্য ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য লন্ডনে গমন করেন। সারওয়াত-চেম্বারলেন আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং সারওয়াত মন্ত্রী থেকে ইস্তফা দেন। পার্লামেন্টের নির্বাচিত স্পীকার নাহাস পাশাকে পরবর্তী সরকার গঠনের আহ্বান জানান হয়। ১৯২৮ সালের ১৮ই মার্চ দ্বিতীয় ওয়াফদ সরকার গঠিত হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী রাজা ফুয়াদ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ২৫শে জুন নাহাস মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করেন। এরপর মোহাম্মদ মাহমুদ সরকার গঠন করে ১৯শে জুলাই পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাজা ফুয়াদ রাজনৈতিক সংকট দূরীকরণের জন্য পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন তিন বছরের (১৯২৮-৩০) জন্য স্থগিত করেন। ১৯২৯ সালে ব্রিটেনের নির্বাচনে কনসারভেটিভ সরকারের ভরাডুবী হয় এবং লিবারাল পার্টি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। লিবারাল পার্টি ব্রিটিশ সরকার গঠনে মিশরীয়দের মনে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের আশা সঞ্চারিত হয়। নির্বাচন পরিচালনার জন্য আদলী একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারিতে

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নাহাস পাশার নেতৃত্বে 'ওয়াফদ পার্টি' সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রীসভা গঠন করে। উল্লেখ্য যে, এটি ছিল তৃতীয় ওয়াফদ মন্ত্রী পরিষদ।

১৯৩০-৩৬ ঃ ১৯৩০ সালে নাহাস পাশা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করার পর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সুদান এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মিশরে ব্রিটিশ সৈন্য রাখার প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরোধ বাধে। নাহাস পাশা এ ধরনের ঘৃন্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর মন্ত্রীসভার পতন হয় ১৭ই জুন। রাজা ফুয়াদ তাঁর স্থলে তাঁর ভক্ত ইসমাইল সিদকীকে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের আহ্বান জানান। তিনি ১৯২৩ সালের সংবিধান বাতিল এবং নির্বাচন স্থগিতই করলেন না, ব্রিটিশ তাবেদারীতে দেশ শাসন ও 'ওয়াফদ পার্টির' প্রভাব ও প্রতিপত্তি খর্ব করার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় এবং সভা-সমিতির উপর কড়াকড়ি আরোপিত হয়। সিদ্‌কী পাশা 'ওয়াফদ পার্টির' সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাসের জন্য নির্বাচনী আইন পরিবর্তন করেন যাতে কৃষকশ্রেণী (ফেলাহীন) 'ওয়াফদ পার্টির' প্রার্থীকে ভোট দিতে না পারে। নিষ্পেষণ ও নির্যাতন চলতে থাকে এবং সিদ্‌কী পাশা 'ওয়াফদ পার্টির' জনপ্রিয়তা হ্রাসের জন্য 'হিযব-আল-সাব' বা জনগণের দল গঠন করেন। এর ফলশ্রুতিতে লিবারাল ও ওয়াফদ পার্টি ১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চ একটি জাতীয় চুক্তিকে স্বাক্ষর করে সংঘবদ্ধ হয়। সিদ্‌কী পাশা রাজনৈতিক সঙ্কটের পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন, যা রোধ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি সিদ্‌কী পাশা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। রাজা ফুয়াদ তাঁর স্থলে একটি রাজকীয় মন্ত্রীসভা গঠন করার দায়িত্ব অর্পণ করেন আবদুল-ফাতাহ ইয়াহইয়ার উপর। এই সরকার বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। আবদুল ফাতাহকে অপসারণ করে তৌফিক নাসিমকে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করতে আহ্বান জানান। ১৯৩৪ সালের প্রধান হিসেবে নাসিম ১৯২৩ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে এবং ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে একটি রাজকীয় ফরমানের মাধ্যমে সংবিধান পুনরায় কার্যকরী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ইতালী ১৯২৫ সাল লিবিয়া এবং ১৯৩৬ সাল অবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) দখল করে। নাসিম ক্রমশঃ ফুয়াদের আস্থা হারাতে থাকেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়। তিনি একটি তত্ত্বধায়ক সরকার গঠনের মাধ্যমে একটি নতুন নির্বাচনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু স্বৈরাচারী রাজা তাঁকে ১৯৩৬ সালের ২২শে জানুয়ারি পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। নাসিমের স্থলে প্রধান রাজকীয় চেম্বারলেন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে। এই সরকার নির্বাচন তদারক করে এবং নির্বাচনে নাহাস পাশা সংখ্যাধিক্য আসন লাভ করেন। ইতোমধ্যে রাজা ফুয়াদ ১৯৩৬ সালের ২৮শে এপ্রিল মৃত্যুবরণ করলে ৬ই মে তাঁর পুত্র এবং সর্বশেষ মিশরীয় রাজা ফারুক সিংহাসনে বসেন। ১০ই মে নাহাস পুনরায় ক্ষমতায় আসেন এবং তৃতীয় বারের মত মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯৩৬ সালে সম্পাদিত ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি এবং সুদান প্রশ্নে নাহাসের সঙ্গে রাজার বিরোধ বাধে এবং ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি অপসারিত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন মোহাম্মদ মাহমুদ পাশা।

www.pathagar.com

ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি, ১৯৩৬

পটপ্রেক্ষিত ঃ ১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি ইতালী অবিসিনিয়া দখল করলে ব্রিটিশ সরকার মিশরের সঙ্গে সমঝোতা করার আগ্রহ প্রকাশ করে। Axis Power-এর আধিপত্য উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করলে মিত্র শক্তি মিশরকে সুরক্ষিত করে একটি ঘাঁটিতে পরিণত করার প্রয়াস পায়। আর্থার গোল্ডস্মিড বলেন, "১৯৩৫-৩৬ সালের কতকগুলো সৌভাগ্যজনক ঘটনা মিশরে ক্ষমতার লড়াই এর গতি পরিবর্তন করে।" ("A series of fortuitous events in 1935-36 altered the nature of the power struggle in Egypt") লিবিয়া ও আবিসিনিয়ায় ইতালীদের অবস্থিতিতে মিশরে ব্রিটিশ সরকারের প্রভাব ও স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার উপক্রম হয়। এই ঘটনা উভয় দেশকে নিকটতর করে এবং ব্রিটিশ সরকার দমননীতি পরিহারে বাধ্য করে। কায়রোতে ছাত্র বিক্ষোভ, গণ আন্দোলন ও রাজনৈতিক অচলাবস্থা পরিস্থিতিকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলে। এ সমস্ত কারণে ব্রিটিশ সরকার নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার মিশরীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। এই সম্মেলনে ছিলেন মিশরীয় পক্ষে তের জন, যার মধ্যে সাত জন 'ওয়াফদ পার্টির' এবং অপরাপর অন্যান্য দলভুক্ত ছিলেন। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারে প্রতিনিধিত্ব করেন কমিশনার মাইলস ল্যামসন (Miles Lampson)। ব্রিটিশ ও মিশরীয় প্রতিনিধি দল আলাপ-আলোচনা করে একটি চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হন। মিশরীয় দলের নেতা নাহাস পাশা মিশরীয় সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন এবং ব্রিটিশ কমিশনার ল্যামসন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর দেন। ১৯৩৬ সালের ২৬শে আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইঙ্গ-মিশর চুক্তি অনুমোদন করে। পরে মিশরীয় পার্লামেন্টে এই চুক্তিটি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হয় এবং তা অনুমোদিত হয়।

ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির শর্তাবলী ঃ ১৯৩৬ সালে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির মেয়াদ ছিল বিশ বছর কিন্তু প্রয়োজনে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে দশ বছর পরে এই চুক্তিটি পরিবর্তন করা যাবে এরূপ শর্তও ছিল। এই চুক্তির শর্তাবলী হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(১) মিশর এবং ব্রিটেনের মধ্যে বিশেষ করে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগিতা (military alliance) রক্ষা করা হবে। এই সহযোগিতা বিশ বছর পর্যন্ত বজায় থাকবে এবং প্রয়োজনে উভয় পক্ষ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির শর্তাবলী রদবদল করতে পারবে। যুদ্ধকালীন সময়ে উভয় পক্ষ একে অপরকে সাহায্য করবে। জরুরী অবস্থা দেখা দিলে এবং আন্তর্জাতিক সঙ্কট উপস্থিতি হলে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটেন প্রয়োজনে মিশরের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সামরিক আইন জারী এবং সংবাদ পত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে। মিশর ও ব্রিটেন চুক্তির বরখেলাপ করে তাদের বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করতে পারবে না।

(২) মিশর যত দিন না সুয়েজ খাল স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে পারে ততদিন ব্রিটেন এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। মিশর সরকার মিশরে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করবে এবং সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে নৌ চলাচল করার স্বাধীনতা ব্রিটিশ সরকারকে দান করবে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার সুয়েজ খালের নিরাপত্তার জন্য ব্রিটিশ বাহিনী মোতায়েন করতে পারবে। ব্রিটেন সুয়েজ অঞ্চলে ১০,০০০ পদাতিক এবং ৪০০ রয়াল এয়ার ফোর্সের বিমান চালককে রাখতে পারবে। সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ মওজুত করার অধিকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ লাভ করবে। মিশর সামরিক তৎপরতার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ করবে এবং সুয়েজ খাল ও পশ্চিম মরুভূমি অঞ্চলে রেলপথের উন্নতি সাধন করবে। যতশীঘ্র এই সমস্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে তত তাড়াতাড়ি মিশর থেকে ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে। অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণে ব্রিটিশ নৌবহর আট বছরের অধিক আলেকজান্দ্রিয়া নৌ-বন্দর ব্যবহার করবে না। মিশরীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য একটি সামরিক বাহিনী মিশর প্রেরণ করবে এবং প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করবে।

(৩) সুদানে পুনরায় মিশরীয় বাহিনী, কর্মকর্তা এবং দেশত্যাগীরা অনুপ্রবেশ করবে। অবশ্য মিশর সুদানকে কেন্দ্র করে ১৮৯৯ সালে যে ইঙ্গ-মিশরীয় কনডোমিনিয়াম (Anglo-Egyptian Condominium) স্বাক্ষরিত করে তার শর্তাবলীতে মিশর আপত্তি জানায়, কারণ ১৯২২ সালে মিশরকে আংশিক স্বাধীনতা দিলেও ব্রিটিশ সরকার সুদানকে দখলে রাখে। মিশর সুদানের স্বাধীনতা লাভে এবং ইঙ্গ-ব্রিটিশ প্রভুত্ব নিরসরণে আগ্রহী ছিল। ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির দ্বারা স্থির হয় যে, যদি সুদানীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব হয় তা হলে ব্রিটেন ও মিশরীয় কর্মচারীদের সুদানে নিয়োগ করা যাবে অর্থাৎ সুদানের অবস্থা পূর্বের মত থাকবে, অর্থাৎ দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণাধীন।

(৪) মিশরে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদের জান ও মালের নিরাপত্তা মিশরীয় সরকার নিশ্চিত করবে। ক্যাপিচুলেশন আইন (Capitulation law) বাতিল ঘোষিত হবে অর্থাৎ বিদেশীগণ এখন থেকে মিশরীয় আইনের আওতায় আসবেন। ১৯৩৭ সালে Montreux Convention দ্বারা বাতিল চূড়ান্তকরণ করা হয়।

(৫) এই চুক্তির বলে মিশরে ব্রিটিশ কনসুল বা রেসিডেন্ট বা এজেন্টের স্থলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হবেন।

সমালোচনা ঃ ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির মেয়াদ ১৯৫৬ সাল অর্থাৎ বিশ বছর পর্যন্ত মেয়াদ ছিল; (১) এই চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে ভার্সাই শান্তি চুক্তি সম্পাদনার পূর্বে ১৩ই জানুয়ারি সা'দ জগলুল পাশা প্রকাশ্যভাবে মিশরের স্বাধীনতা প্রদানের জন্য দাবী জানান। এরপর থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সতের বছর আলাপ-আলোচনার পর মিশরের স্বাধীনতা প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদের মতামত ব্যক্ত করে। এই চুক্তির সুফল বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, যদিও এই চুক্তি মিশরকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের অঙ্গিকার করে নি, তবুও এই চুক্তির ফলে মিশর স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য রক্ষিত মর্যাদা লাভ করে, যেমন রেসিডেন্ট এজেন্ট বা কনসুল জেনারেলের স্থলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের মিশরে অবস্থান ভাটিকিওটিস বলেন যে, এই চুক্তির ফলে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ, পক্ষান্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে মিশরকে স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা দান করে। ব্রিটিশ হাই কমিশনার H. M. Ambassador নামে আখ্যায়িত হন। উপরন্তু, মিশর সরকার প্রশাসনকে মিশরীয়করণের সুযোগ লাভ করে। যেমন মিশরীয় সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ ইন্সপেক্টর জেনারেলের অবসর গ্রহনের পর একজন মিশরীয় তার স্থলাভিষিক্ত হন। এ ছাড়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মিলিটারী একাডেমীতে অধিক সংখ্যক মিশরীয় সামরিক অফিসার প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে থাকেন। (২) চতুর্থ শর্ত ক্যাপিচুলেশন প্রথা Montreux Convention কর্তৃক রোহিত হলে মিশরে একই আইন বলবৎ হয়। বিদেশীদের জন্য পৃথক আইন মধ্যপ্রাচ্যে চালু ছিল কিন্তু চুক্তির শর্তানুযায়ী বার বছর পর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে রদবদল করার যে সুযোগ ছিল তারই প্রেক্ষিতে বার বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ট্রাইবুনাল রোহিত করা হয়। তাছাড়া ১৯২৩ সালের ল্যুসেন চুক্তি অনুযায়ী প্রাক্তন অটমান সাম্রাজ্যের অঞ্চলসমূহ যেমন সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, প্যালেস্টাইনে ক্যাপিচুলেশন রোহিত হয়ে যায়। সুতরাং মিশরেও এই আইন বাতিল হয়ে যায়। (৩) ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তিতে মিশর থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের যে স্পষ্ট শর্ত ছিল তা দখরদার বাহিনী থেকে মিশরের মুক্তির একটি সনদপত্র বলে মনে করা হয়। অবশ্য ব্রিটিশ স্বার্থে যুদ্ধকালীন অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সুয়েজ খালের রক্ষনাবেক্ষণের জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি ব্রিটিশ নৌবহর অবস্থান করে। (৪) পরোক্ষভাবে এই চুক্তি সুয়েজ খাল কোম্পানিতে দু'জন মিশরীয় ডিরেক্টর নিয়োগের পথ-সুগম করে। মিশরীয় রয়ালটির পরিমাণ ৩০০,০০০ মিশরীয় পাউন্ডে বৃদ্ধি পায় এবং এই কোম্পানিতে কর্মরত শ্রমিকদের শতকরা ৩৫% মিশরীয় নিয়োগের সুযোগ লাভ করে। উপরন্তু, এই চুক্তি কোম্পানিতে সুয়েজ থেকে পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণে বাধ্য করে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি মিশরীয় স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করেছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তিটি ছিল ব্রিটিশদের প্রণীত ব্রিটিশ রক্ষার্থে কূটনৈতিক প্রহসন। জি. ই. কার্ক বলেন, "These concessions were made only because both parties were acutely aware of the menace to the respective interests from Italy, now an aggressive Mediterranean and Red sea power and there was no reason to suppose that, it this menace were removed. Egyptian Nationalist sentiment would not once more compel its leaders to seek to achieve complete independence by obtaining evacuation of the British forces, freedom to follow a foreign policy untrammelled by the alliance with Britain and the reasserting in fact of Egypt's sovereignty over the Sudan" ১৯৩৬ সালের Survey of International Affairs উদ্বৃত বিখ্যাত Times পত্রিকায় বলা হয়েছে, "It is natural enough that the technical advisers of H.M.

www.pathagar.com

Government should recommend such a military agreement as would achieve an ideal security for his country's interests for ever but the military ideal of 100 percent security takes no account of the political side of the question. An alliance, if it is to have any real value, must be based on respect for national feeling. It must be freely negotiated, not dictated and one of its primary conditions ... is that it is inspired by a spirit of mutual trust." ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির ব্যর্থতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই চুক্তি স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে নি। পক্ষান্তরে, উভয় দেশের মধ্যে চরম বিরোধ বাধে। মিশরে বৈদেশিক অবস্থান এবং সুদান প্রশ্নে বিরোধ চরম আকারে দেখা দেয়। স্বৈরাচারী শাসক ফারুক চুক্তির মিশরীয় প্রতিনিধি দলের নেতা নাহাস পাশাকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে মোহাম্মদ মাহমুদ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মিশরীয় রাজনৈতিক সঙ্কট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় মিশর ব্রিটিশ আশ্রিত ছিল, কিন্তু ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ভাটিকিওটিসের মতে, 'to deal with the resolution of matters concerning Anglo-Egyptian relations that had been left outstanding by the Four Reserved Points of 1922'. ১৯৩৬ থেকে ১৯৫০ সালে 'ওয়াফদ পার্টি'র পুনরায় ক্ষমতা লাভ পর্যন্ত রাজনৈতিক সঙ্কট চরমে উঠে।

১৯৫০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 'ওয়াফদ পার্টি' সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে এবং প্রধানমন্ত্রী নাহাস পাশা ক্ষমতালাভের দু'মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের সাথে স্থগিত ও পুরাতন বিষয়গুলো (outstanding matters) পুনরায় আলাপ-আলোচনার দাবী জানান। ১৯৩৬ থেকে চৌদ্দ বছর পর হতে মিশরের স্ট্যাটাস পরিবর্তিত হয় নি অথচ শর্ত অনুযায়ী দশ বছর পরে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে শর্তাবলী রদবদল করার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের স্বদিচ্ছার অভাবে তা সম্ভবপর হয় নি। এ কারণে নাহাস পাশা মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেই নয় মাস ধরে ব্রিটিশ সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনা ও চিঠিপত্র আদান প্রদান করেন। কিন্তু সমস্যা যখন ব্যর্থ হল তখন নাহাস পাশা ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি বাতিলের দাবী জানান। এই চুক্তির বাতিলের দাবীতে সমগ্র মিশরে গণমিছিল ও বিক্ষোভ শুরু হয়। অতঃপর ১৯৫০ সালের ৮ই অক্টোবর নাহাস পাশার নেতৃত্বে মিশরীয় পার্লামেন্টে ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় এবং ১৮৯৯ সালের সুদান কনডোমিনিয়াম চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে। এমন কি একতরফাভাবে পার্লামেন্টে ১৯৫০ সালের মে মাসে সামরিক আইনও বাতিল করে। মিশরীয় সরকার একতরফাভাবে সামরিক আইন ও চুক্তি দু'টি বাতিল করলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বেআইনী বলে অভিহিত করে। ব্রিটিশ বিরোধী গণ-বিক্ষোভ উপেক্ষা করে রাজা ফারুক নাহাশ পাশাকে পদচ্যুত করেন এবং গণ-আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করতে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিশরের রাজনৈতিক পট দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৫০ সালের জুলাই

www.pathagar.com

মাসে নাটকীয়ভাবে জেনারেল মোহাম্মদ নগীব এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসেন। স্বৈরাচারী রাজা ফারুক তাঁর শিশুপুত্রের আনুকূল্যে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে নির্বাসিত হন। ১৯৫৩ সালে নগীব মিশরকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং স্বয়ং প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই চুক্তিতে ব্রিটেন সুদানের ভবিষ্যৎ সুদানীদের নির্ধারণে অঙ্গিকার করে। ফলে ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির ব্যর্থতা প্রমানিত হয়। উপরন্তু, একতরফাভাবে প্রজাতন্ত্র ঘোষণায় উক্ত চুক্তির কোন কার্যকারিতা থাকেনা। ১৯৫৪ সালে নগীবকে এক সামরিক অভ্যুত্থানে অপসারিত করে জেনারেল নাসের ক্ষমতা লাভ করেন এবং মিশরীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি একজন আদর্শ জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন এবং আরব জাতীয়তাবাদের (Arab Nationalism) প্রবক্তা ছিলেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যকে রোধ করার জন্য একতরফাভাবে ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করেন। এর ফলে মিশর ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে মুক্তি পায়।

৭. নগীব-নাসের দ্বন্দ্ব

১৯৫১ সালে ১৫ই অক্টোবর নাহাস পাশার সরকার ১৯৩৬ সালে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি বাতিল ঘোষণা করলে মিশরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়। পার্লামেন্ট কর্তৃক এই অসাধারণ ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ একদিকে যেমন সমাজতান্ত্রিক ডেমোক্রেটিক পার্টি অন্যদিকে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন দলসমূহ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এই আন্দোলনে যোগ দেয়। বিশেষ করে ১৯৪৫ সালে উগ্রপন্থী ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠন যেমন ওয়ার্কাস কমিটি ফর ন্যাশনাল লিবারেশন, ন্যাশনাল কমিটি অব স্টুডেন্টস এন্ড ওয়ার্কাস ফেডারেশন অব ইজিপ্টিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন শহরে ও বন্দরে ব্রিটিশ বিরোধী দাঙ্গা ও সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। এমনকি সুয়েজ খাল অঞ্চলে গেরিলা বাহিনী ব্রিটিশ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে হামলা চালায়। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে মিশরীয় সরকার শ্রমিকদের সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত (lay off) করে।

ফলে সমগ্র দেশে শ্রমিক ও ছাত্র বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। ১৯৫২ সালের ১৯শে জানুয়ারি সুয়েজ খাল অঞ্চলে অবস্থিত ইসমাইলিয়ায় দাঙ্গা হয় এবং ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। তারা মিশরীয় আধা সামরিক বাহিনী 'বুলুক নিযাম'কে (Buluk Nizam) নিরস্ত্র করে। ফলশ্রুতিতে কায়রোসহ অন্যান্য মিশরীয় শহরে দাঙ্গা বিস্তার লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারিতে সংঘটিত হরতাল ও দাঙ্গায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়, ৫৫২ জন জখম হয় এবং ৭৯৯টি বাণিজ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, যার বেশি ভাগই ছিল বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত, অগ্নিদগ্ধ করা হয়। এই দিনটিকে 'কাল শনিবার' বা (Black Saturday) বলা হয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি আয়ত্ত্বের বাইরে চলে গেলে নাহাস পাশা সামরিক বাহিনী তলব করেন। ব্রিটিশদের প্ররোচনায় রাজা ফারুক ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি নাহাস পাশার সরকারকে

www.pathagar.com

বাতিল করেন। নাহাসের পরিবর্তে আলী মেহেরকে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের জন্য বলা হয়। এই পরিষদটি ছিল 'ওয়াফদ পার্টি' বিরোধী এবং এর ফলে ছয় মাস পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হতে থাকে এবং চার বার মন্ত্রীসভার রদবদল হয়। উল্লেখ্য যে, চতুর্থ কেবিনেটের মেয়াদকাল ছিল মাত্র দু'দিন ২২ শে জুন থেকে ২৩ শে জুন, ১৯৫২।

নগীবের অভ্যুত্থান

মিশরীয় সামরিক বাহিনী ঃ ১৯৫২ সালে সমগ্র মিশরে রাজনৈতিক সঙ্কট, শান্তি ও নিরাপত্তার অভাবে এবং সরকারী দুনীর্তি মুদ্রাস্ফীতির দরুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় যখন চরমে পৌঁছায় তখন মিশরের সামরিক বাহিনীর কতিপয় দুরন্ত ও দুর্বার অফিসার একটি গুপ্ত সংগঠন সৃষ্টি করেন। ১৯৫২ সালের ২৯শে মার্চ ওয়াফদ সরকারের পতনের পর প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দেয়। কারণ, কোন একটি দল কোয়ালিশন ছাড়া এককভাবে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়। এই নাজুক পরিস্থিতিতে মিশরের রাজনীতিতে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। জগলুল পাশার শাসনামলে ব্রিটিশ আশ্রিত মিশরে খদিভ সুলতান মিশরীয় বাহিনীকে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন। এমন কি তাদের বেতনের কিয়দংশ কেটে নেওয়া হয়। তা ছাড়া সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদে মিশরীয়গণ নিযুক্ত হতে পারতেন না। মিশরীয় সামরিক বাহিনীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে কর্নেল আহম্মদ ওরাবীর সময়ে ১৮৮২ সালে পুরাতন মিশরীয় বাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হয়। মোহাম্মদ আলী প্রতিষ্ঠিত ও খদিভ ইসমাইল কর্তৃক পুর্নগঠিত সামরিক স্কুলগুলো ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দখলদারী নীতির ফলে বহু পূর্বেই বন্ধ করে দেয়া হয়। উপরন্তু, সুদানে মাহদীর বিরুদ্ধে মিশরীয় বাহিনী প্রেরণের ফলে সামরিক দিক থেকে মিশরীয় বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। স্যার লীস্টাক পাশা, যিনি ব্রিটিশ 'সিরদার' বা প্রধান সেনাপতি ছিলেন, সর্বপ্রথম ১৫০০ সদস্য নিয়ে মিশরীয় বাহিনী গঠন করেন। খদিভ আব্বাস (দ্বিতীয়) হিলমীর শাসনামলে মিশরীয় বাহিনী সম্প্রসারিত হয়। কারণ তিনি মিশর থেকে ব্রিটিশ আধিপত্য নিরসনের পক্ষাপাতী ছিলেন। এমন কি তিনি তরুণ ও নির্ভীক মিশরীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের ব্রিটিশ কর্তৃত্ব অস্বীকার করে সেনা-বিদ্রোহ (Mutiny) করার অনুপ্রেরণা দেন। ১৯২৩ সালে আংশিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করার পর মিশরীয় সরকার সেনাবাহিনীকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্রিটিশ নৌবাহিনী ১৯২২ সালের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯২৭ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় বোমা বর্ষণ করে। ১৯৩৬ সালে ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল মিশর থেকে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী অপসারিত হবে কিন্তু মিশরীয় বাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ ব্রিটিশ সামরিক মিশর পাঠাবে। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী সুয়েজ অঞ্চল থেকে অপসারিত হয় নি; উপরন্তু, সামরিক মিশনের কর্তৃত্ব মিশরীয় বাহিনীর উপর ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

গুপ্ত সামরিক সংস্থা ঃ ১৯৩৬ সালে ঘৃন্য ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে মিশরীয় জাতীয় মর্যাদার হানি হয় এবং মিশরীয় সামরিক বাহিনী এই চুক্তির সামরিক শর্তগুলো,

www.pathagar.com

যেমন-সুদান প্রশ্ন এবং সুয়েজখালে ব্রিটিশ বাহিনীর অবস্থান–সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। অবশ্য ব্রিটিশ সামরিক প্রশিক্ষকগণ নবীন মিশরীয় সামরিক অফিসারদের স্বদেশে এবং ব্রিটেনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৬ সালের চুক্তি মোতাবেক ব্রিটিশ সৈন্য ১৯৪৮ সালের মধ্যে সুয়েজ অঞ্চল ছাড়া মিশরের অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করা হয়। ১৮৮২ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মিশর দীর্ঘকাল ব্যাপী ব্রিটিশ দখলদার বাহিনীর ইতিহাস। এই বাহিনী অপসারণের জন্য গণ-বিক্ষোভ হয়েছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যাহার করা হলে রাজনৈতিক সঙ্কট দূরীকরণে যে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন ছিল তার অভাবে পরিলক্ষিত হয়। অন্য কথায় সামরিক বাহিনীর শূন্যতায় ১৯৫০ সালে সমগ্র দেশ ব্যাপী দাঙ্গা শুরু হলে তা দমন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। উপরন্তু, প্যালেস্টাইন যুদ্ধে মিশরীয় বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় তাদের দুর্বলতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে প্রমাণিত করে। ব্রিটিশ আধিপত্য, ফারুকের স্বৈরাচারী নীতি, দেশে বিরাজমান এবং ক্রম অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মিশরীয় সামরিক বাহিনীর কতিপয় তরুণ ও তেজদীপ্ত অফিসার ১৯৩৮ সালে মানকাবাদে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করে। এই সমিতির সদস্য ছিলেন কতিপয় তরুণ মুক্তি অফিসারবৃন্দ (Secret society of Free Officers)। ১৯৪২ সালে এই গুপ্ত সমিতি পুনঃজীবিত করা হয় এবং ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন যুদ্ধের পর এর বিশেষ তৎপরতা শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থে ১৯৪২ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি নাহাস পাশাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণে বাধ্য করে। নাহাস পাশা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই পদ গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ সরকার তাদের ক্রীড়ানক রাজা ফারুককে পদচ্যুত বা নির্বাসনের হুমকী দিয়ে ওয়াফদ সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। ভাটিকিওটিসের মতে, "৪ঠা ফেব্রুয়ারির ঘটনার প্রতিক্রিয়া মিশরের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ছিল সুদূর প্রসারী। এই ঘটনা রাজা ও 'ওয়াপদ পার্টি'র মধ্য বিরোধ সম্প্রসারিত করে এবং রাজার মর্যাদাহানী হয়।" যুদ্ধকালীন অবস্থায় মিশরের এই ত্রিসঙ্কট (১) সিংহাসনের সঙ্গে ওয়াফদ পার্টির, (২) ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজার, (৩) ওয়াফদ পার্টির সঙ্গে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সম্পর্কের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মিশরের সার্বভৌমত্ব, আন্তর্জাতিক মান মর্যাদা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, কতিপয় দেশপ্রেমিক মিশরীয় তরুণ অফিসার গুপ্ত সমিতি গঠন করে।

গুপ্ত সমিতির সদস্যবৃন্দ ঃ ১৯৪২ সালে উত্তর মিশরীয় পরিস্থিতি অবনতি হলে গামাল আবদুল নাসের নামীয় একজন জাতীয়তাবাদী তরুণ সামরিক অফিসার তাঁর কতিপয় সহকর্মীদের সাথে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ছিলেন আজিজ আলী আল-মিশরী নামে একজন প্রাক্তন আর্মি চিফ অব স্টাফ। এই সময়ে ১৯২৮ সালে শেখ হাসান আল-বান্না কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আল-ইখওয়ান আল-মুসলেমীন (Muslim Brethren) নামের এক গোঁড়া রক্ষণশীল ইসলামী গোষ্ঠী ব্রিটিশ আধিপত্য নিরসনের জন্য আন্দোলন করে আসছিল। এই

www.pathagar.com

ভ্রাতৃসংঘের মতবাদেও অনেক নবীন আর্মি অফিসার উদ্বুদ্ধ হন। এই গুপ্ত সমিতির সদস্যবর্গ মোটামুটি সকলের অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, কারণ তারা একই মিলিটারী একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এই সমস্ত অফিসারদের মধ্যে যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় তারা হচ্ছেন (১) লে. কর্নেল গামাল আবদুল নাসের, (২) মেজর আবদুর হাকিম আমের, (৩) কর্নেল আনওয়ার সা'দাত, (৪) মেজর সালাহ সালেম, (৫) উইং কমান্ডার গালাম সালেম, (৬) স্কোয়াড্রন লীডার হাসান ইব্রাহিম, (৭) মেজর খালেদ মহিউদ্দীন, (৮) উইং কমান্ডার আবদুল লতিফ আল-বাগদাদী এবং (৯) মেজর কামাল উদ্দীন হুসাইন। এই নয়জন অফিসার ১৯৪৯ সালে 'ফ্রি অফিসার'দের পরিচালিত আন্দোলনের সদস্য ছিলেন এবং গামাল আবদুল নাসের এই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। নাসেরের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তীক্ষ্ণ মেধা ও নির্ভিকতার ফলে তিনি ১৯৫১ এবং ১৯৫২ সালেও এই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। নবগঠিত গুপ্ত সমিতির সদস্যগণের মধ্যে সমঝোতা, সখ্যতা এবং একাত্মতা ছিল এবং তাদের পারিবারিক ও সামরিক পটভূমির মধ্যেও বিশেষ সামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়। চল্লিশের অনূর্দ্ধ এই সমস্ত তরুণ সামরিক অফিসার মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং সামরিক একাডেমীতে সম্ভবত তারাই উচ্চ ও সুবিধাভোগকারী 'এলিট' ক্লাসের বিপরীতে middle class সামাজিক স্তর থেকে আসেন। এই সমস্ত পরিবার ছিলেন ভূ-স্বামী অথবা সরকারি কর্মচারী। ১৯৫২ সালে গঠিত এই গুপ্ত সামরিক সমিতির, যার সদস্যগণ নিজেদের 'ফ্রি অফিসার' হিসাবে পরিচয় দিতেন, দু'বছরে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের মধ্যে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চারশ'তে পৌঁছায়। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল রাজা ফারুককে উৎখাত করে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য গোপনীয়ভাবে গুপ্ত সমিতি প্রচারপত্র বিলি করে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা উদারপন্থী রাজতন্ত্রবিরোধী সাংবাদিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করে। গুপ্ত সমিতির পাশপাশি সরকার অনুমোদিত আর্মি অফিসার্স ক্লাব গঠনের জন্য তারা আন্দোলন করে। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর অফিসার্স ক্লাবের নির্বাচনে তারিখ ঘোষিত হয় কিন্তু স্বৈরাচারী রাজা ফারুক ভীত ও শঙ্কিত হয়ে এই নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন। এতদসত্ত্বেও তরুণ অফিসারগণ নির্ধারিত দিনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। রাজাদেশ অবজ্ঞা করে অফিসার্স ক্লাবের নির্বাচনে রাজা বিচলিত হয়ে পড়েন। ফারুক ফ্রি অফিসারদের নির্বাচনে জয়লাভকে পক্ষান্তরে তার নিয়ন্ত্রিত সামরিক বাহিনীর উপর হুমকী স্বরূপ মনে করেন। তরুণ অফিসারদের সাফল্যকে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহিতার পূর্বাভাস (prelude to sedition) মনে করেন এবং তার ধারণা হল যে, তাকে উৎখাত করার জন্য সামরিক বাহিনীর কতিপয় তরুণ 'ফ্রী অফিসার' একটি গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন।

সামরিক ক্যু, ১৯৫২ ঃ ১৯৫২ সালের ২৬ শে জানুয়ারি কায়রোতে মারাত্মক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হলে নাহাস পাশার সরকারকে ২৭শে জানুয়ারি বরখাস্ত করে 'ওয়াফদ পার্টি' বিরোধী সরকার গঠনের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় আলী মেহেরের উপর। কিন্তু আলী

www.pathagar.com

মেহের মন্ত্রীসভার ১লা মার্চ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এরপর নাগীব হিলালী একটি স্বতন্ত্র অরাজনৈতিক সরকার গঠন করেন। হিলালীর ক্ষমতা লাভে রাজনৈতিক দলের ধারণা হল যে, রাজা তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধি দ্বারা প্রাসাদ নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হিলালীর পক্ষে সরকার পরিচালনা বেশি দিন সম্ভব হয় নি। ২৮শে জুন হিলালী সরকারের পতন হলে হোসেন সিরি ২রা জুলাই নতুন সরকার গঠন করেন। সিরি সরকারের শাসনামলে মিশরে ২৩শে জুলাই, তরুণ 'ফ্রি অফিসার'দের দ্বারা সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালিত হয়। হিলালী ক্ষমতালাভ করে রাজা এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিরাজমান মতবিরোধ দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি রাজা ফারুককে জেনারেল নগীবকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত করার পরামর্শ দেন। নগীব পদাতিক বাহিনীর একজন অধিনায়ক (commander) ছিলেন এবং প্যালেস্টাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যদিও তাঁর বয়স চল্লিশের উর্ধ্বে ছিল তবুও তাঁর দীর্ঘ দিনের সামরিক অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের জন্য তিনি তরুণ 'ফ্রি অফিসারদের' মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি ১৯৫১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত অফিসার্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। রাজা ফারুক সিরি কর্তৃক উপস্থাপিত জেনারেল নগীবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিয়োগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ২২শে ডিসেম্বর তাঁর ভগ্নীপতি ইসমাইল শিরিনকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পন করেন। কর্নেল শিরিন 'ফ্রি অফিসারদের দলভুক্ত ছিলেন না এবং অন্যান্য অফিসারদের তুলনায় তার পদমর্যাদাও ছিল নিম্নমানের। শিরিনের নিযুক্তিকে 'ফ্রি অফিসার'গণ সামরিক বাহিনীর উপর রাজার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা গুপ্ত সমিতি বিলোপ ও 'ফ্রি অফিসার'দের গ্রেফতারের আশঙ্কা করেন। কিন্তু হেলালীর কোন রাজনৈতিক দল না থাকায় তাঁর জনসমর্থনও ছিল না, কারণ তিনি একটি স্বতন্ত্র অরাজনৈতিক সরকারের প্রধান ছিলেন। নবীন সামরিক অফিসারগণ ১৯৫২ সালের জানুয়ারি থেকে ক্রমশঃ অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে পড়েন, কারণ তারা লক্ষ্য করেন যে জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত মিশরে পর পর চারটি মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয় অর্থাৎ ছয় মাসে চারজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন, আলী মেহের, নাগীব হিলালী, হোসেন সিরি এবং সর্বশেষে নাগীব হিলালী।

জেনারেল নাগীবের ক্ষমতালাভ ঃ রাজা ফারুক প্রধানমন্ত্রী হোসেন সিরির প্রতিরক্ষা দফতরের মন্ত্রী হিসাবে জেনারেল নগীবের নাম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ২০শে জুলাই সিরি সরকার পদত্যাগ করে। রাজা তাঁর স্থলে পুণরায় নাগীব হিলালীকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। ২২শে জুলাই দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাজনৈতিক অরাজকতা ও অচলাবস্থার সম্মুখীন হন। এমতাবস্থায় 'ফ্রি অফিসার'গণ ক্ষিপ্রগতিতে সামরিক অভ্যুত্থান বা 'ক্যু' সংঘটিত করার পরিকল্পনা করেন। ১৯৫২ সালের ২২-২৩ শে জুলাই রাতে পদাতিক ও যান্ত্রিক ডিভিশনের (Infantry and Armoured division) প্রায় ৩০০০ সদস্য এবং ২০০ অফিসার আব্বাসীয়ায় অবস্থিত আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের ব্যারাক দখল করে। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন তেজদীপ্ত সামরিক

www.pathagar.com

অফিসার মেজর আবদুল হাকিম আমের। এই সময়ে আর্মি হেড কোয়াটার্সের চিপ অব স্টাফ জেনারেল মোহাম্মদ ফরিদ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে একটি জরুরী বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সহ সকল সিনিয়র অফিসারদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় জি.ও.সি. জেনারেল মোহাম্মদ হায়দার আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করেছিলেন। 'ফ্রি অফিসার'গণ সামরিক ছাউনী দখল করে, সরকারি দফতর ডাক ও তার বিভাগ, রেলপথ, বিমানবন্দর, কায়রোর বেতার ভবন সমস্ত বিদ্রোহী সেনাদের দখলে চলে যায়। ২২শে জুলাই-এর রাত ১২টা থেকে ২৩শে জুলাই-এর সকাল সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ও বিনা রক্তপাতে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। লেঃ কর্নেল আনওয়ার সা'দাত সামরিক অভ্যুত্থান সংবাদ বেতারে প্রচার করেন। 'ফ্রি অফিসার'গণ অতঃপর দেশে নিরাপত্তা বিধানের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সভা সমিতি নিষিদ্ধ হয়। ব্রিটিশ বাহিনী সুয়েজ খাল অঞ্চল থেকে রাজার সাহায্যে কায়রোতে যাতে না আসতে পারে তার জন্য একটি মিশরীয় সামরিক দলকে মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হয়। তরুণ অফিসারগণ সামরিক অভ্যুত্থান সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করে তাদের অধিনায়ক জেনারেল মোহাম্মদ নগীবকে সামরিক তত্ত্বাবধানে সামরিক ছাউনীতে আনে। তাকে সর্বসম্মতিক্রমে সামরিক বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। ইতোপূর্বে তাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্তির সুপারিশ করা হয় কিন্তু রাজা ফারুক শঙ্কিত হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। জেনারেল নগীবকে সর্বাধিকনায়ক নিযুক্তির অন্তরালে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও দূরদর্শী সামরিক অফিসারের হাত ছিল তিনি হচ্ছেন লেঃ কর্নেল গামাল আবদুল নাসের।

ফারুককে সিংহাসনচ্যুতি ঃ ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই আধুনিক মিশরের ইতিহাসের দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হল। গুটিকয়েক তরুণ ফ্রি অফিসারের সামরিক অভ্যুত্থানে শতাব্দীর পাশা-খেদভ, সুলতান ও রাজাদের শাসনের (১৮০৬-১৯৫২) অবসান হয়। মিশরে এক নতুন রাজনৈতিক দিগন্ত উন্মোচিত হয়। রক্তপাতহীন সামরিক বিপ্লবের ফলে নগীব-হিলালী সরকারের পতন হয়। এগারজন 'ফ্রি' অফিসার পরিষদ গঠন করে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নগীবকে সামরিক বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয় এবং আলী মেহের পাশা নামক একজন অভিজ্ঞ বেসামরিক অফিসারকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে রাজা ফারুক আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করেছিলেন। সামরিক অভ্যুত্থানে ব্রিটেন ও আমেরিকা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে নি। ২৩শে জুলাই নগীব এক বাহিনীসহ রাজপ্রাসাদে অভিযান পরিচালনা করেন। ইতিমধ্যে মিশরীয় বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনে; ফলে ব্রিটিশ নৌবহর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ২৫শে জুলাই নগীব রাজা ফারুককে তাঁর নাবালক পুত্র যুবরাজ দ্বিতীয় আহম্মদ ফুয়াদের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ২৬শে জুলাই ফারুককে স্বদেশ ত্যাগ করে ইতালীতে নির্বাসিত হন। নতুন রাজা ফুয়াদের জন্য একটি রিজেন্সী গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৮৮২ সালে তৌফিকের বিরুদ্ধে ওরাবী পাশা এক সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালিত করেন কিন্তু ব্রিটিশ শক্তির হস্তক্ষেপের ফলে তা ব্যর্থ হন।

www.pathagar.com

'রেভলিউশনারী কম্যান্ড কাউন্সিল' (রে.ক.কা) ঃ ১৯৫২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর মিশরের বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পিত হল সামরিক বাহিনীর উপর। নতুন সামরিক সরকার বা জান্তা (Junta) একটি 'রেভলিউশনারী কম্যান্ড কাউন্সিল' গঠন করে এবং এ কাউন্সিলে চেয়ারম্যান ছিলেন গামাল আবদুল নাসের। আলী মেহেরের সরকার ওয়াফদ ও অন্যান্য দলের অসহযোগিতায় বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। ফলে ৭ই সেপ্টেম্বর মেহের সরকারের পতন হলে নগীব প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন। পুরাতন রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়া হয়, রেজেন্সী বিলুপ্ত হয় অক্টোবরে। সামরিক জান্তা ১০ই ডিসেম্বর ১৯২৩ সালের সংবিধান বাতিল এবং সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সংবিধান বাতিল হলে নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং গামাল নাসেরের নেতৃত্বে এগার সদস্য বিশিষ্ট একটি কংগ্রেস গঠিত হয়। এই কংগ্রেসের দায়িত্ব ছিল নতুন সংবিধান প্রণয়ন। কর্নেল নাসেরের নেতৃত্বে গঠিত এই কংগ্রেসই 'রেভলিউশনারী কমান্ড কাউন্সিল' নামে পরিচিত ছিল। প্রশাসনিক দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে রে. ক. কা. বিভিন্ন সংস্কার ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। রে. ক. কা. ১৯৫২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ভূমি সংস্কার আইন (Agrarian Reform law) জারী করে নিরন্ন ও নিঃস্ব ফেলাহীনদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে। নির্যাতনমূলক সামন্তবাদ উচ্ছেদ করে সামাজিক ভারসাম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভূস্বামীদের জন্য ২০০ একর পর্যন্ত জমির বরাদ্ধ সীমাবদ্ধ করা হয়। এর অতিরিক্ত জমি সরকার ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত ওয়াকফ (আহল ওয়াকফ) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়; কেবলমাত্র দাতব্য সংস্থাগুলোর জন্য ওয়াকফ (ওয়াকফ খাইরী) বলবৎ থাকে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য কলকারখানা নির্মিত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। সামরিক জান্তা প্রাচীন প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে নতুন প্রশাসন গঠনের জন্য প্রথমতঃ রিজেন্সী বিলুপ্ত করেন এবং পরে পুরাতন সরকারি ও প্রাসাদের কর্মরত কর্মচারী ও কর্তাবৃন্দকে বরখাস্ত করেন। মন্ত্রীপরিষদ গঠনেও তারা নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে নমনীয়তা ও সহনশীলতা (flexibility) প্রদর্শন করেন। জেনারেল নগীবের শাসনকালে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হলেও তিনি ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন। ফলে তাঁর পতন হয়।

নগীবের পতনের কারণ ঃ ১৯৫২ সালের ২৫শে জুলাই ক্ষমতালাভ করে জেনারেল নগীব শাসনভার পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তিনি জনসাধারণ ও তরুণ আর্মি অফিসার বা অভ্যুত্থানকালী বিপ্লবী 'ফ্রি অফিসার'দের আস্থা হারাতে থাকেন। এর মূলে কতকগুলো কারণ ছিল ঃ যেমন—

(১) ১৯৫২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর নগীব সরকার ভূমি সংস্কার আইন জারী করে সামন্তবাদ উচ্ছেদের প্রয়াস পান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু বছর ধরে ভোগদখলকারী ভূস্বামীগণ ২০০ একর জমির মালিকানার সীমাবদ্ধতায় সন্তুষ্ট ছিল না। উপরন্তু, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন করে কৃষককুল উপকৃত হয় নি কারণ ছোট ছোট জোতদারীর ব্যবস্থাপনায় ছিল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দুর্নীতিবাজ কো-অপারেটিভসমূহ।

www.pathagar.com

জি. ই. ক্লার্ক বলেন, "যদিও পাঁচ বছর ব্যাপী ভূমি সংস্কার সাফল্যের দাবী রাখে তবুও একথা নিশ্চিত যে, মিশরের অগণিত গ্রামবাসী ও কৃষকশ্রেণী এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। উল্লেখ্য যে, জল সেচ দ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য আসওয়ান বাঁধের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এই বাঁধ সৃষ্টি করে তিন মিলিয়ন কৃষক ফেলাহীনদের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয় নি।"

(২) ১৯৫২ এবং ১৯৫৩ সালে নগীব সরকার বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ দ্বারা দেশে শিল্প বিপ্লব শুরুর প্রয়াস পায়। কিন্তু মধ্যযুগীয় সমাজ ববস্থার কোন উন্নতি হয় নি। বরং বিভিন্ন কল-কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ রাজনৈতিক পরিবেশকে দূষণীয় করে তোলে। ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে ডেল্টা অঞ্চলে মিশরীয় তুলা কোম্পানিতে হরতাল হয় বিভিন্ন দাবীর প্রেক্ষিতে। কিন্তু সামরিক বাহিনী নৃশংসভাবে এই বিক্ষোভ ও হরতাল বন্ধ করে বহু শ্রমিক নিহত হয় ও কারাবরণ করে। উপরন্তু, নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্টপন্থী 'ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট ফর ন্যাশনাল' লিবারেশনের (MDLN) সদস্য সন্দেহে প্রায় ৩০ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়। ফলে শ্রমিক শ্রেণী সামরিক জান্তাকে সামরিক একনায়কত্ব হিসাবে আখ্যায়িত করে।

(৩) নগীব সরকার প্রাসাদ কর্মচারীদের শুদ্ধিকরণ (purge) নীতি পরিচালনা করে জনপ্রিয়তা হারান। একদিকে অক্টোবরে রিজেন্সী বাতিল ঘোষিত হলে মোহাম্মদ আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের শাসনের পরিসমাপ্তি হয়। অন্যদিকে পাইকারীভাবে অসংখ্য সরকারি কর্মচারীদের আটক করে, যাদের মধ্যে অনেককেই দু'মাস পরেই ছেড়ে দেওয়া হয়, আমলাদের বিরাগভাজন হন। সেপ্টেম্বরে (১৯৫২) ৪৫০ জন সামরিক অফিসারদের অবসর প্রদান করা হয়। উপরন্তু রে. ক. কা. সামরিক বিপ্লবকে সুদূরপ্রসারী করার জন্য মন্ত্রী পরিষদের রদবদল করে, যাতে পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থান না হয়। ফলে বেসামরিক ও সামাজিক অফিসারগণ নগীবের দমননীতির তীব্র বিরোধিতা করে।

(৪) সামরিক নেতা নগীব রাজনীতিতে ছিলেন অনভিজ্ঞ এবং মিশরীয় রাজনীতির যে অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে সামরিক অভ্যুত্থান হয় সেই রাজনীতি ব্যক্তিগত ও দলীয় কোন্দল, ঈর্ষা, বিদ্বেষ দ্বারা কলুষিত ছিল। জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ, গোঁড়া ইসলাম রক্ষণশীল মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ (Muslim Brethren) প্রভৃতি রাজনৈতিক দল আপাতদৃষ্টিতে মিশর থেকে রাজতন্ত্রের অবসানে সামরিক জান্তাকে অভিনন্দন জানায়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুয়েজে ব্রিটিশ বাহিনীর অবস্থানের ফলে মিশর প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিল না। সামরিক জান্তাও সার্বভৌম ছিল না। সামরিক জান্তা ১৯২৩ সালে জগলুল সরকার পাশা কর্তৃক অনুমোদিত সংবিধান বাতিল করলে ওয়াফদ পার্টি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল পূর্বের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী জানায়। উল্লেখ্য যে, পূর্বে সিদকী সরকার ১৯২৩ সালের যে সংবিধান ১৯৩০ সালে বাতিল করেন তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলেই নগীব ১৯৫২ সালের ১০ই ডিসেম্বর ১৯২৩ সালের সংবিধান পুনরায় বাতিল করেন। সুতরাং সংবিধানপন্থী দেশপ্রেমিক নাগরিকবৃন্দ মুসলিম

www.pathagar.com

ভ্রাতৃসংঘসহ সকল গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষিত হয় ও ১৯৫২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দেশ ব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়। নগীব দুর্নীতি ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মচারীদের বিচারের ব্যবস্থা করেন। এ সমস্ত পদক্ষেপ নগীবের পতনের জন্য দায়ী।

(৫) নগীব পুরাতন ও জটিল ইঙ্গ-মিশরীয় সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হন। সামরিক অভ্যুত্থানকালে ১৯৩৬ সালে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি অনুযায়ী দ্বিতীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে সুয়েজ অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত হয়নি। উপরন্তু, সুদান প্রশ্নেও ব্রিটেনের সাথে জটিলতার নিরসন হয় নি। ১৯৫৩ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারি ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির মাধ্যমে সুদানকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

ভ্রান্তিকর নীতি ঃ ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই নগীব সামরিক জান্তার প্রধান হিসাবে মিশরের শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু কতকগুলো বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপে তিনি জনগণ, রাজনীতিবিদ এবং তার রে. ক. কা. এর তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। নভেম্বর-ডিসেম্বরে 'ওয়াফদ পার্টি' ১৯২৩ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের দাবীতে সারা দেশে আন্দোলন ও বিক্ষোভ পরিচালিত হলে নগীব জনসমর্থন লাভের জন্য সফরে বের হন এবং ফাতী রাদওয়ানের নেতৃত্বে জাতীয় উপদেশ মন্ত্রণালয় (National Guidance) গঠন করেন। কিন্তু দমনমূলক পদক্ষেপ, যেমন দুর্নীতি ট্রাইবুনাল গঠন নগীবের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তোলে। এতদস্বত্ত্বেও তিনি ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য বিপ্লব কাউন্সিল গঠন করেন। পঞ্চাশ সদস্য বিশিষ্ট এই কাউন্সিলের প্রধান ছিলেন আলী মেহের। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক নিয়ে গঠিত এই কাউন্সিল কার্যত সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থ হয়। কোন প্রকার খসড়া সংবিধান তৈরির বদলে নগীব সরকার নির্যাতন ও উৎপীড়ন দ্বারা সমগ্র দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৫৩ সালের ৭ই জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং তাদের সম্পদ আটক করা হয় এবং স্বৈরাচারী পদক্ষেপ খদিভ বা রাজার একনায়কত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর প্রধান এবং সরকার প্রধান হিসেবে নগীব এই ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করেন। মূলতঃ সমগ্র দেশ এক 'রেভলিউশনারী কমান্ড কাউন্সিলে'র দ্বারা পরিচালিত এবং এই কাউন্সিল প্রাথমিক স্তরে ১৯৫৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি থেকে ১৯৫৬ সালের ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত তিন বছর শাসন পরিচালনা করবে। সাময়িকভাবে একটি সংবিধান প্রস্তুত করা হবে।

মিশর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঃ সামরিক জান্তার প্রতি জনগণের সমর্থন লাভের জন্য রে. ক. কা. বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কর্নেল নাসেরের নেতৃত্বে প্রকাশ্য মিছিল দ্বারা জনমত সংগ্রহের জন্য লিবারেশন র‍্যালী নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। দেশের বিরাজমান অসন্তোষ দূরীকরণে এই পদক্ষেপ ছিল সময়োপযোগী। মাত্র ছয় বছরের মধ্যে ১৯৫৩ সালের ১৮ই জুন তারিখে মিশরকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হল।

www.pathagar.com

নগীব একাধারে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। নাসের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। আবদুল হাকিম আমীরকে সেনাবাহিনীর প্রধান ও সমরমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। সামরিক সংবিধান প্রণীত হয় এবং জনগণের মতামতের জন্য ১৯৫৬ সালের ১৬ই জুন প্রকাশিত হয় এবং গণভোটে (Plebiscite) অনুমোদিত হয়। রে. ক. কা. এর সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশে দাঁড়ায় এবং প্রভাবশালী সদস্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইত্যবসরে সিংহাসনচ্যুত রাজা ফারুকের ব্যক্তিগত ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। রে. ক. কা. তিনজন উচ্চপদস্থ সদস্য নিয়ে একটি বিপ্লবী ট্রাইবুনাল গঠন করে। আবদুল লতিফ আল-বাগদাদী এই টাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং আনওয়ার সা'দাত এবং হাসান ইব্রাহিম সদস্য ছিলেন। এই সংগঠনের দায়িত্ব ছিল দুনীতিবাজ দেশদ্রোহী রাজনীতিবিদদের বিচার করা। ১৯৫৩ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রতীয়মান হয় যে, রে. ক. কা রাজতন্ত্র ধুলিস্যাৎ করে প্রজাতন্ত্র কায়েম করলেও সামরিক জান্তা জনগণ এবং রাজনীতিবিদদের সমর্থন লাভে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে উগ্রপন্থী রক্ষণশীল মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কর্নেল নাসের এই ভ্রাতৃসংঘের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে (power base) আঘাত হেনে তাদের নির্মূল করার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ১৯৫৪ সালের ১২ই জানুয়ারি এই ভ্রাতৃসংঘ কায়রোতে জান্তা সমর্থক ছাত্র সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে বিপ্লবী কাউন্সিল মুসলিম ভ্রাতৃসংঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর কার্যকলাপে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। ফলে প্রকাশ্য রাজনীতি ছেড়ে সংঘের সদস্যগণ গোপন (underground) রাজনীতি পরিচালিত করতে থাকে। ক্রমশঃ এই ভ্রাতৃসংঘ সামরিক জান্তার একটি অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

নাসেরের ক্ষমতা লাভ ঃ বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলে দু'টি ভিন্নমুখী রাজনৈতিক ধারার উদ্ভব হয়। একটি বিচ্ছিন্ন দলের (splinter group) নেতৃত্বে ছিলেন কর্নেল নাসের এবং অপরটি প্রেসিডেন্ট ও সর্বাধিনায়ক জেনারেল নগীব পরিচালনা করেন। যদিও নগীব মূল 'ফ্রি অফিসার' ক্লাবের সদস্য ছিলেন না তবুও নগীবের সামরিক দক্ষতা ও প্রজ্ঞা মিশরীয় বাহিনীতে অসামান্য প্রভাব ফেলে। মিশরীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ১৯৫৩ সালের জুন থেকে দেশ শাসন করেন। তিনি কতিপয় দমন নীতির (Corruption Tribunal) আশ্রয় নিলেও তিনি সাংবিধানিক সরকার গঠনে পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই কারণে নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করেন। তিনি প্রশাসনে বিপ্লবী কাউন্সিলের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন এবং রাজনীতিবিদদের উপর বিপ্লবী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জারীকৃত শাস্তির সমালোচনা করেন। প্রেসিডেন্ট এবং বিপ্লবী কাউন্সিল রাজনৈতিক নিষ্পেষণ পরিচালিত করে এবং সেনাবাহিনী বিরোধী সকল তৎপরতা স্তব্ধ করে দিতে চেষ্টা করে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পরবর্তী পর্যায়ে মিশরীয় রাজনীতিতে রে. ক. কা.-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে এই

www.pathagar.com

কাউন্সিল নাসেরের নেতৃত্বে নগীবকে প্রেসিডেন্ট করে তাদের উদ্দেশ্য চারিতার্থ করে। এই কাউন্সিল মন্ত্রী পরিষদ থেকে বেসামরিক মন্ত্রীদের অপসারণ করে সামরিক অফিসারদের নিয়োগ করলে জনগণ ও রাজনৈতিক দল ক্ষুব্ধ হয়। শুধুমাত্র বেসামরিক কর্মকর্তা নয় বিপ্লব বিরোধী সামরিক অফিসারদের অপসারণ করা হয় অথবা অবসর দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালের নগীব-নাসেরে মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম স্তর ঃ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ঃ সেনাবাহিনীর প্রধান ও প্রেসিডেন্ট হিসাবে নগীব রেভলিউশনারী কমান্ড কাউন্সিল ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে নগীব স্বাভাবিকভাবে তাঁর প্রভাব বলয় বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। তিনি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে চেষ্টা করলে তরুণ ও বিপ্লবী 'ফ্রি অফিসার'গণ শঙ্কিত হয়ে উঠেন। এমতাবস্থায় বিপ্লবের প্রধান নেপথ্য নায়ক নাসেরে সামরিক ক্যুর ফলে নগীব ক্ষমতাচ্যুত হন। কিন্তু নগীবের জনপ্রিয়তার জন্য এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ সামরিক নেতা হিসাবে তাঁর মর্যাদার জন্য তিনি এ ধরনের অপ্রত্যাশিত অভ্যুত্থান সাদরে গ্রহণ করেন নি। ফলে বিপ্লবী কাউন্সিল এবং নগীবের মধ্যে সমঝোতা হয় যে নগীবকে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে পুনর্বহাল করা হয়। নাসের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল থাকবেন।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এপ্রিল-মে ঃ বিপ্লবী কাউন্সিল দ্বিতীয় বারের মত নগীবের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণের চেষ্টা করে। এই পর্যায়ে নগীব প্রেসিডেন্ট এবং নাসের প্রধানমন্ত্রী এবং বিপ্লবী কাউন্সিলে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

তৃতীয় স্তর ঃ সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ঃ এ স্তরের মধ্যবর্তী সময়ে মিশরে এক মারাত্মক রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। এই সঙ্কট সেপ্টেম্বরে সেনাবাহিনীর কতিপয় বামপন্থী সদস্যদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের ফলে শুরু হয়। অপরদিকে মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে নৈরাজ্য দেখা দেয়। ১৯৫৪ সালের ২৬শে অক্টোবর আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী গামাল আবদুল নাসের একটি সভায় বক্তৃতা প্রদানের সময় মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের সদস্য মাহমুদ আবদুল লতিফ কর্তৃক আক্রান্ত হন। এই সভাটি ইঙ্গ-মিশরীয় নতুন চুক্তির সম্পাদনার উপলক্ষ্যে আহ্বান করা হয়। নিরাপত্তা রক্ষীরা আততায়ীকে গ্রেফতার করে এবং গোঁড়াপন্থী মুসলিম ব্রাদারহুডের সুপরিকল্পিত চক্রান্ত আবিষ্কার করে। এই চক্রান্তে কেবলমাত্র ব্রাদারহুডের সদস্যগণই জড়িত ছিল না কতিপয় বিপ্লবী বিরোধী বিপথগামী সামরিক অফিসারগণও অংশ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন লেঃ কর্নেল আবদুল মোমেন। তাঁকে গ্রেফতারের পূর্বেই তিনি আত্মগোপন করেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হতে থাকলে বিপ্লবী কাউন্সিল একটি সামরিক আন্দোলন গঠন করে তাৎক্ষণিক (summary) বিচারের ব্যবস্থা করে। এই আদালতকে বলা হত 'গণ-আদালত'। উইং কমান্ডার গামাল সালেম সভাপতি এবং আনওয়ার সা'দাত এবং হোসাইন আল-সাফী এই আদালতের সদস্য ছিলেন। এই গণ-

www.pathagar.com

আদালতে ৮৭৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার করা হয় এবং এর মধ্যে অনেক সামরিক অফিসারও ছিলেন। ছয়জন মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্যকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। দমন নীতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে ১৯৫৫ সালের মধ্যে ৩০০০ রাজনৈতিক বন্দী কারাবরণ করে। এই আদালতের বিচার কার্য পরিচালনার সময় প্রতীয়মান হয় যে, ব্রাদারহুডের সন্ত্রাসী আন্দোলনে প্রেসিডেন্ট নগীবের হাত ছিল। ফলে বিপ্লবী কাউন্সিল ১৯৫৪ সালের ১৪ই নভেম্বর জেনারেল নগীবকে পদচ্যুত এবং গৃহবন্দী করে। ১৯৫৪ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৫৬ সালের জুন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য ছিল এবং এই সময়ে নগীবের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক 'ক্যু'র নেতা গামাল আবদুর নাসের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১৯৫৬ সালের ১৬ই জুন নতুন মিশরীয় সংবিধান প্রণীত হয়। এই সংবিধানের একটি অনুচ্ছেদে মিশরকে একটি প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব ছিল। প্রস্তাব অনুযায়ী গামাল নাসের ১৯৫৬ সালের জুন মাসে মিশরীয় প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি আরব জাতীয়তাবাদের অবিসংবাদী নেতা ও আধুনিক মিশরের স্রষ্টা।

নগীব-নাসের দ্বন্দ্ব মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সঙ্কটজনক করে তোলে; কিন্তু নাসেরের অভ্যুদয় আরব বিশ্বে আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

সুয়েজ খাল জাতীয়করণ

সুয়েজ খাল খনন ঃ সাঈদ পাশার শাসনামলে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ফার্ডিন্যান্ড ডি. লেসেপ্স নামক একজন প্রখ্যাত ফরাসি প্রকৌশলীকে সুয়েজ খাল খননের অনুমতি দেওয়া হয়। মিশরের ইতিহাসে সুয়েজ খাল খনন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর পূর্বে কয়েকজন তুর্কী সুলতান এমনকি নেপোলিয়নও ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে লোহিত সাগর তথা ভারত মহাসাগরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী এই খাল খননের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। উল্লেখ্য, এই খাল খননের সম্ভাব্যতা পরীক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় এবং সাঈদ তা অনুমোদন করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী 'ইউনিভার্সেল সুয়েজ মেরিটাইম ক্যানাল কোম্পানি' নামে একটি ফরাসি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নিরানব্বই বছরের জন্য সুয়েজের উপর আধিপত্য লাভ করে। নির্ধারিত হয় যে, ফরাসি কোম্পানি ৬০% এবং মিশর ৪০% মূলধন নিয়োগ করবে। ১৮৫৬ সালের নভেম্বরে চূড়ান্তভাবে চুক্তি অনুমোদিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে ফরাসি প্রভাব বিস্তারে শঙ্কিত হয়ে ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন তুর্কী সুলতানের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেন। এতদসত্ত্বেও খদিভ ফরাসি কোম্পানিকে খাল খননের সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে থাকেন। ১৮৬৬ সালের পূর্বে তুর্কী সুলতান চূড়ান্ত অনুমোদন না দিলেও ১৮৫৯ সালে খাল খননের কাজ শুরু হয়। সর্বমোট ৮০ লক্ষ পাউন্ড মূলধন নির্দিষ্ট করা হয়। এর ৬০ ভাগ ফরাসি কোম্পানি এবং বাকী ৪০ ভাগ খদিভ প্রদান করবেন। উপরন্তু, তিনি ২৫,০০০ মিশরীয় শ্রমিককে ডি. লেসেপ্স-এর কর্তৃত্বাধীনে দেন। খাল খননের কাজ শুরু হয় সর্বপ্রথম ভূমধ্যসাগর এবং মেনজালা হ্রদের মধ্যবর্তী স্থানে। এই কোম্পানিতে

www.pathagar.com

শেয়ার ছিল ফরাসি ও ইংরেজদের। এখানে ক্রমশঃ একটি শহরতলী গড়ে উঠে এবং সাঈদ পাশার নামানুসারে পোর্ট সাঈদ বন্দর স্থাপিত হয়। কিন্তু আকস্মিকভাবে ১৮৬৪ সালে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ ইস্তাম্বুলে ব্রিটিশ দূত প্রতিবাদ করেন যে, মিশরীয় শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়। অপরদিকে ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন অভিযোগ করেন যে, সাঈদের সময়ে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী মিশরীয় শ্রমিক নিয়োগ করা হয় কিন্তু আকস্মিকভাবে তাদের কাজ স্থগিত রাখায় ফ্রান্সকে ৩০ লক্ষ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যা হউক বিরোধের নিষ্পত্তি হলে সুয়েজ খাল খননের কাজ পুরাদমে চলতে থাকে।

খালের দ্বার উদ্‌ঘাটন ঃ ১৮৬৯ সালের নভেম্বরে ১০০ মাইল দীর্ঘ এবং ৭২ ফুট প্রশস্ত সুয়েজ খাল খনন সম্পন্ন হয়। এটি খনন করতে সর্বমোট দু' কোটি পাউন্ড ব্যয় হয়। ১৮৬৯ সালে খদিভ ইসমাঈল মহাসমারোহে সুয়েজ খাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ১৯২২ সালে এই খালের প্রশস্ততা দাঁড়ায় ১৪৭ ফুটে এবং গভীরতা ৩০ ফুট।

গুরুত্ব ঃ হিট্টি সুয়েজ খালের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেন, "The opening of the Suez Canal in 1869, enhanced the strategic importance of these lands and accelerated their re-entry upon the scene of world trade and world affairs. The canal soon became an integral part of the life line of international communication and compensated for the loss sustained through the discovery of the route around the Cape of Good Hope." প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যোগসূত্র রক্ষাকারী এই খাল ছিল বিভিন্ন কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও এই খাল সামরিক দিক থেকে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ইংল্যান্ড এই খাল খননের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে ইংরেজগণই এর দ্বারা লাভবান হয়। ফ্রান্সের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছাড়া সুয়েজ খাল সম্পন্ন হত না। পক্ষান্তরে মিশর রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সমর্থন লাভ করে।

ফরাসি কোম্পানি এবং মিশর সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী এই খালের কর্তৃত্ব ফরাসি জয়েন্ট স্টক কোম্পানির উপর থাকবে দীর্ঘ নিরানব্বই বছর এবং এর পর মিশরীয় সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। স্থির হয় যে, সুয়েজ খাল এবং এর বন্দরগুলো সকল জাতির জাহাজের অবাধ যাতায়াতের জন্য খোলা থাকবে এবং কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এবং তুরস্ক ও মিশরের খেদিভের উপস্থিতিতে ইস্তাম্বুলে 'সুয়েজ খাল কনভেনশন' নামে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। সাত বছর ব্যাপী এই চুক্তি দ্বারা সুয়েজ খাল একটি আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের জন্য ১৮৮৮ সাল থেকে ব্যবহৃত হতে থাকে। সুয়েজ খাল থেকে কোম্পানির বছরে আয় হয় এক কোটি ডলার এবং এর মধ্যে মাত্র ১০ ভাগ অর্থাৎ দশ লক্ষ ডলার রয়ালটি মিশরীয় সরকার লাভ করে। বাকি অংশ কোম্পানি ও এর অংশীদারগণ ভোগ করে। এই অংশীদারদের মধ্যে সিংহভাগ লাভ করত ফরাসি ও ইংরেজগণ।

www.pathagar.com

ব্রিটিশ কর্তৃত্ব ঃ ইংল্যান্ড সুয়েজ খাল খননের বিরোধিতা করলেও এই খাল মূলতঃ ছিল ব্রিটেনেরই নিয়ন্ত্রণাধীনে। তারা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত; সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে মধ্যপ্রাচ্যে তারা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। প্রথম মহাসমরের সময় ব্রিটিশ কর্তৃত্ব এই অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে মিশরীয়গণ সুয়েজ অঞ্চল হতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অপসারণ দাবী করে। ফলে ব্রিটিশ বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৩৬ সালে ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি সম্পাদিত হলে সুয়েজ অঞ্চলে ব্রিটেন ১০,০০০ সৈন্য রাখার অনুমতি পায়। দ্বিতীয় মহা সমরের সময়েও এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্যের অবস্থিতি অব্যাহত ছিল। সুদান ও মিশরের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে অর্থনৈতিক কারণেই ব্রিটেন সুয়েজ অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। মধ্যপ্রাচ্যে তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এই ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালে মিশরীয় পার্লামেন্টে এককভাবে ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি বাতিল ঘোষণা করলে মিশরের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সম্পর্কের অবনতি হয়।

সুয়েজ খাল জাতীয়করণ

ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি ঃ বাদশাহ ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করে জেনারেল নগীব ১৯৫২ সালের ২৫শে জুলাই ক্ষমতা দখল করেন। তিনি মিশরকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং তিনিই এই প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৫৪ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে কর্নেল নাসের নগীবকে অপসারিত করে মিশরের প্রেসিডেন্ট হন। জেনারেল নগীব প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সুয়েজ খাল প্রশ্নে ব্রিটিশদের সাথে কোন যোগাযোগ করেন নি। কিন্তু তাঁর উত্তরসুরী ১৯৫৪ সালে ক্ষমতা দখল করে ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে মিশরকে মুক্ত করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি ব্রিটিশ দখলদার বাহিনীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চান এবং তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল সুয়েজ খাল অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর অপসারণ। ১৯৪৭ সালে ইংল্যান্ডের সঙ্গে মিশর সুয়েজ প্রশ্ন নিয়ে একটি চুক্তিতে পৌছায়। কিন্তু সে আলোচনার কোন অগ্রগতি হয় নি। মিশরীয় বিপ্লবের (১৯৫২) পর নাসের ডিপুটি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলে ১৯৬৩ সালের ১১ই এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিশর আমেরিকা ও ব্রিটেনের পরিকল্পিত অকমিউনিস্ট মধ্যপ্রাচ্য নিরাপত্তা সংস্থায় যোগ দিবে না। উপরন্তু, মিশরীয় টেকনিসিয়ানদের অভাবে খালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্রিটিশ কারিগরদের প্রয়োজন ছিল। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিশরের সাথে ব্রিটেনের ১৯৫৩ সালে ২৭ শে এপ্রিল আলোচনা হয়। কিন্তু তা অচিরেই নিষ্ফল হয়। আলোচনা ভেঙ্গে গেলে নবগঠিত বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ে। নাসের এই কারণে সেনাবাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় রাখেন। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ২৭শে জুলাই মিশর এবং ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তি (ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি) সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) চুক্তি সম্পাদনের বিশ মাসের মধ্যে মিশর থেকে ব্রিটিশ বাহিনীকে অপসারণ করতে হবে।

www.pathagar.com

(২) সুয়েজ খাল অঞ্চলে অবস্থিত ঘাঁটিগুলো সাত বছর পর্যন্ত ব্রিটিশ টেকনিসিয়ান দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

(৩) মিশরের উপর সামরিক আক্রমণ হলে ব্রিটিশ বাহিনী সুয়েজ খাল অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারবে।

ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি ১৯৫৪ সালের ১৯শে অক্টোবর অনুমোদিত হয়। এই চুক্তির ফলে ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি বাতিল হয়। এর পরিণতিতে ব্রিটিশ বাহিনী মিশর থেকে ৭৫ বছর পর অপসারিত হতে থাকে এবং সাইপ্রাসে একটি নতুন ঘাঁটি স্থাপন করেন। ১৮৮৮ সালে সম্পাদিত ইস্তাম্বুল কনভেনশন অনুযায়ী সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক নৌ-পথ হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং মিশরীয় সরকার রাজস্ব পেতে থাকে। ১৯৫৪ সালের চুক্তি মোতাবেক ১৯৫৬ সালের ১৩ই জুন সর্বশেষ ব্রিটিশ সেনাবহর সুয়েজ খাল অঞ্চল ত্যাগ করে। এর ফলে সমগ্র দেশে বিশেষ করে কায়রোতে আনন্দ মিছিল বের হয়।

সুয়েজ খাল কোম্পানি ঃ ১৯৩৬ সালে সম্পাদিত ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে বাতিল ঘোষিত হয় সত্য কিন্তু ব্রিটিশদের প্রদত্ত সুয়েজ খালের কনসেশনের বর্ধিত মেয়াদ ছিল ১৯৬৮ সালের ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত। ১৯৩৬ সালের চুক্তি অনুযায়ী বিশ বছর অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের এই কনসেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার কথা। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সুযোগ-সুবিধায় মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থ অব্যহত থাকে। নবগঠিত সুয়েজ খাল কোম্পানিতে যে ৩২ জন পরিচালক ছিলেন তার মধ্যে ১৬ জন ফরাসি, ৯ জন ব্রিটিশ, ৬ জন মিশরীয়, এক জন দিনেমার এবং একজন আমেরিকান। ভারতবর্ষ, প্যালেস্টাইন এবং মিশরের খাল অঞ্চলে থেকে ব্রিটিশদের এবং মরক্কো ও তিউনিসিয়া থেকে ফরাসি বাহিনী অপসারিত হলে প্রেসিডেন্ট নাসের সুয়েজ খালকে জাতীয়করণের দৃঢ় সঙ্কল্প করেন। নাসের সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে ইসরাইলী জাহাজ পারাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন এবং তাদের জাহাজ আটক করা হয়। জাতিসংঘ এবং ১৮৮৮ সালের ইস্তাম্বুল চার্টারের শর্ত উপেক্ষা করে তিনি ইসরাইলী জাহাজ আটক রাখেন। বিদেশী নাবিকদের যাতায়াতের জন্য ভিসা প্রদান বন্ধ করা হয়। বিদেশী নাবিকদের স্থলে মিশরীয় নাবিক ও পাইলট নিযুক্ত করা হয়। নাসের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করে ক্রমশঃ জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর (Non-Aligned movement) দিকে ঝুঁকে পড়েন। যাহোক, নাসের একজন দেশপ্রেমিক ও কট্টরপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি মিশরীয় স্বার্থ ১৯৫৬ সালে ১৩ই জুন খাল জাতীয়করণ করেন এবং দীর্ঘ ৭৫ বছর অবস্থানের পর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর শেষ দলটি ১৩ই জুন পোর্ট সৈয়দ বন্দর ত্যাগ করে। ১৮ই জুন নাসের আনুষ্ঠানিকভাবে পোর্ট সাঈদের নৌভবনে মিশরীয় পতাকা উড্ডয়ন করেন। নাসের ২৩ই জুলাই একটি ঘোষণার মাধ্যমে সুয়েজ খাল কোম্পানিকে জাতীয়করণ করে মিশরের নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদকে মিশরীয়দের জন্য সংরক্ষিত করেন।

www.pathagar.com

সুয়েজ যুদ্ধ ১৯৫৬

পটভূমি ঃ প্রেসিডেন্ট নাসের ক্ষমতালাভ করে মিশরের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি কল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আসওয়ান বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনায় বিদেশী, বিশেষ করে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থ মঞ্জুরি ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি মিশরের সাথে বিশ্ব ব্যাংকের আলাপ-আলোচনায় ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশরকে কমিউনিস্ট ব্লক থেকে পৃথক রাখার জন্য ঋণ দানে সম্মত হয়। মিশর ইতিমধ্যেই ১৯৫৫ সালে ১৪-২৪ই এপ্রিল বানদুঙ্গে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদান করে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা ধনতন্ত্রপন্থী দেশের প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। উপরন্তু, পশ্চিমা শক্তিবর্গ বিশেষ করে ব্রিটেন ও আমেরিকা অস্ত্র সরবরাহে অসম্মতি জানালে মিশর ১৯৫৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর চেকোস্লোভাকিয়ার সাথে অস্ত্রচুক্তি (Arms Deal) সম্পন্ন করে। এর ফলে চেকোস্লোভাকিয়ার মাধ্যমে মিশর রুশ ট্যাংক ও বোমারু বিমান লাভ করে। মিশর ১৯৫৬ সালের ১৬ই মে চীনের সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনকরে। ইসরাইলী আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য মিশরের অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত বাগদাদ চুক্তি (Baghdad Pact) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে মিশরের কোন ভূমিকা নেই। নাসের ব্রিটিশ প্রভাবান্বিত বাগদাদ চুক্তিকে আরব বিশ্ব থেকে মিশরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি গভীর ষড়যন্ত্র মনে করেন। বিশ্ব ব্যাংক আসওয়ান বাঁধের জন্য ঋণ দিতে স্বীকার করলেও ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মিশরের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয় তারই প্রেক্ষিতে ব্রিটেন ও আমেরিকা তাদের তহবিল থেকে মোট ৭০ মিলিয়ন ডলার ঋণ মঞ্জুরি স্থগিত রাখে। বানদুঙ্গ কনফারেন্স থেকে প্রত্যাবর্তন করে নাসের ব্রিওনির এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, তিনি বৃহৎ শক্তির বলয় থেকে মিশরকে দূরে রেখে সুস্পষ্ট নিরপেক্ষতা (Positive neutrality) বজায় রাখবেন এবং অস্ত্র-শস্ত্রে মিশরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিদেশী প্রভাব ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিরসন করবেন। ব্রিটেন ও আমেরিকার বিশ্বাসঘাতকতায় হতবুদ্ধ হয়ে নাসের ১৯৫৬ সালের ২৬শে জুলাই সুয়েজ খাল কোম্পানি জাতীয়করণ করেন। কোম্পানির সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং মিশরীয় আর্মি প্রকৌশলী মাহমুদ ইউনুসকে মিশরীয় সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের প্রধান নিযুক্ত করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে মিশরের যে সামরিক সংঘর্ষ হয় তা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে 'সুয়েজ যুদ্ধ' নামে পরিচিত। মিশরীয় ইতিহাসে ১৯৫৬ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত সংঘর্ষ মিশরের বিরুদ্ধে ত্রি-মুখী আগ্রাসন (Tripartite Aggression) নামে অভিহিত। এই আগ্রাসনে অংশগ্রহণ করে ইসরাইল, ব্রিটেন ও ফ্রান্স।

পূর্বাভাস ঃ সুয়েজ যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে প্রায় তিন মাস ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তির সঙ্গে মিশরের মারাত্মক বৈরিতা ও দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। ২৬শে জুলাই থেকে ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত মিশরের সঙ্গে ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এরূপ অবনতি ঘটে যে মিশরের

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট নাসেরকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এন্থনী ইডেন একজন দূরভিসন্ধিজনক একনায়ক হিসাবে চিহ্নিত করেন। নাসেরের একতরফা জাতীয়করণকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সহজে মেনে নেয় নি। তারা এই জাতীয়করণকে ১৮৮৮ সালের চুক্তির ভর খেলাপ বলে অভিযোগ করে। উল্লেখ্য যে সুয়েজ খাল কোম্পানির সুবিধা প্রদানের জন্য বছরে ৭০ মিলিয়ন টন তেল নিয়ে ভূমধ্যসাগর থেকে লোহিত সাগর হয়ে সহজে ভারত মহাসাগরে ট্যাংকার প্রবেশ করতে পারত। আকস্মিকভাবে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তি শঙ্কিত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় এন্থনী ইডেন ৩০ শে জুলাই সুয়েজ খালের পাশ্ববর্তী অঞ্চলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। সুয়েজ সঙ্কট নিরস্নের জন্য আমেরিকা বিদেশ সচিব ডালেস ১৯৫৬ সালের ১৬ই আগস্ট লন্ডনে গ্রীস ও মিশরসহ ২২টি দেশের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু গ্রীস ও মিশর এই সম্মেলনে যোগদান করে নি। পাকিস্তান, ইরান এবং ইথিওপিয়াসহ ১৮টি দেশ সম্মেলনে যোগদান করে। ২৩শে অক্টোবর সম্মেলন শেষ হলে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় যে, সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক নৌ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। ডালেস প্রস্তাব করেন যে, সুয়েজ সঙ্কট দূরীকরণের জন্য কায়রোতে একটি মিশন পাঠানো হবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আর. জি. মেনজিস কায়রোতে প্রতিনিধি দল নিয়ে গিয়ে নাসেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু মিশরের সার্বভৌমত্বের উপর হানিকর এই প্রস্তাব নাসের ৯ই সেপ্টেম্বর বাতিল করেন। তিনি সুয়েজের প্রশাসনের ক্ষেত্রে কোন নমনীয়তা প্রদর্শন করেন নি। অবশ্য তিনি আশ্বাস দেন নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করে সকল দেশের নৌযান সুয়েজের মধ্যে দিয়ে অবাধে চলাচল করতে পারবে। ১২ই সেপ্টেম্বর এন্থনী ইডেন ঘোষণাকরেন যে, আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাথে একজোট হয়ে 'ব্যবহারকারী সংঘ' (Users organisation) গঠন করা হবে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মিশরীয় নাবিক ও পাইলটগণ সুয়েজের মধ্য দিয়ে নৌচলাচল নিয়ন্ত্রণ শুরু করে। মেনজিস মিশনের ব্যর্থতায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ফ্রান্স সাইপ্রাসে সেনাদল প্রেরণ করে। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ আমেরিকার সাথে একত্রে ১৯শে থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর লন্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলনে সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সমিতি (Users Association ও SCUA) গঠন করে। যা হোক আমেরিকা শক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু সমিতির মূল সদস্যদ্বয়-ফ্রান্স-ব্রিটেন এই সমিতির কার্যকারিতায় সন্দিহান হয়ে ২৩শে সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করে। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিপূর্ণভাবে সুয়েজ সঙ্কট (Suez Crisis) নিরসনের আহ্বান জানায়।

জাতিসংঘের ভূমিকা ঃ সুয়েজ খালকে কেন্দ্র করে যখন একটি বিস্ফোরণমুখী আন্তর্জাতিক সমস্যা দেখা দিল তখন জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ডাগ হ্যামারশোলজ মিশর পরিদর্শন করে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করেন। তিনি ব্রিটেন, মিশর ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ছয় দফার ভিত্তিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শর্তগুলো হচ্ছে; (১) নির্বিঘ্নে যাতায়াতের সুযোগ দান; (২)

www.pathagar.com

সুয়েজ অঞ্চলে মিশরীয় সার্বভৌমত্ব স্বীকার; (৩) মিশর এবং ব্যবহারকারী দেশের মধ্যে আপোষ করের (টোল) মাত্রা নির্ধারণ; (৪) আদায়কৃত করের কিয়দংশ সুয়েজ খালের উন্নয়নে ব্যয়; (৫) সালিসের মাধ্যমে সংঘাত নিরসন; (৬) রাজনীতি থেকে সুয়েজকে দূরে রাখা। এই প্রস্তাবসমূহ নিরাপত্তা কাউন্সিলের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদ সুয়েজ পরিচালনার জন্য সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সমিতির উপর দায়িত্ব অর্পন করার প্রস্তাব করলে জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর নেতা যুগোস্লাভিয়া আপত্তি জানায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ভেটো' প্রদান করে। এর ফলে সুয়েজ সঙ্কট নিরসন না হয়ে আরও জটিল আকার ধারণ করে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মিশর এক নাজুক অবস্থার মধ্যে পড়ে।

যুদ্ধ ঃ সুয়েজ যুদ্ধের সূচনায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মদদপুষ্ট নব-গঠিত ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলই দায়ী। ব্রিটেন ও ফ্রান্স চুক্তির মাধ্যমে তাদের আধিপত্য বিস্তারে ব্যর্থ হলে শক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনা করে। তবে তারা তাৎক্ষণিকভাবে সামরিক হস্তক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তারা ইসরাইলকে সুয়েজ সিনাই (Sinai) অঞ্চল আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করে। আরব রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ইহুদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পশ্চিমা শক্তির সমর্থন ব্যতীত বিপন্ন হত। ইসরাইল আরব লীগের সদস্যদের একত্রিত হয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করতে বাধা দানের জন্য এবং সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে ইসরাইলী নৌ-চলাচল নিশ্চিত করার জন্য ১৯৫৬ সালের ২৯শে অক্টোবর সিনাই অঞ্চলে অভিযান করে। উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইসরাইলী বাহিনী অতি সহজে মিশরীয় বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে গাজা, সারমল-আল-সাঈখ সহ আকাবা উপসাগরের তিরান প্রণালী দখল করে। মাত্র ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাইল মিশরের বিপুল সামরিক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত করে এবং সহস্রাধিক সৈন্য বন্দী হয়। ইসরাইলী বাহিনী অগ্রসর হয়ে সুয়েজ খাল অঞ্চলে প্রবেশ করে। মিশরীয় নৌবহর ইব্রাহিম আল-আওয়াল বিধ্বংস হয়। মিশর-ইসরাইলী যুদ্ধে (২৯শে সেপ্টেম্বর-৪ঠা অক্টোবর) ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিচলিত হয়ে ৩০শে অক্টোবর ইসরাইল ও মিশরের নিকট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চরমপত্র পাঠায়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মদদ পুষ্ঠ ইসরাইল যুদ্ধ বন্ধ করে কিন্তু মিশর এই পত্র প্রত্যাখ্যান করে। কারণ সুয়েজ ও সিনাই অঞ্চল ইসরাইলী দখলে চলে গেলে তার সার্বভৌমত্ব্যের প্রতি বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ইসরাইলী আগ্রাসী রাষ্ট্র হলেও ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাদের প্রতি নির্বিকার থাকে। উপরন্তু, তারা পোর্ট সাঈদ, ইসমালীয়া ও সুয়েজের উপর ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীর কর্তৃত্বাধীনে হস্তান্তরের দাবী জানায়। কিন্তু নাসের অযৌক্তিক ও অপমান করে দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। ফলশ্রুতিতে ৩১শে অক্টোবর ইঙ্গ-ফরাসি বোমারু বিমানগুলো মিশরের গোলাবর্ষণ শুরু করে। বিমান বন্দর ও তেল ক্ষেত্র ধ্বংস করে। ৫ই নভেম্বর ইঙ্গ-ফরাসি ছত্রবাহিনী পোর্ট সাঈদে অবতরণ করে। মাত্র দুদিনে তারা দক্ষিণ দিকে তিরিশ মাইল অতিক্রম করে সুয়েজ খাল অঞ্চলে এসে পৌঁছায়। প্রায় এক সপ্তাহ যুদ্ধ চলে; তবে এই সংঘর্ষ সিনাই ও সুয়েজ খালের উত্তরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল।

www.pathagar.com

ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী প্রত্যাহার ঃ ছয় দিনের যুদ্ধে মিশর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আরব লীগ মিশরের সাহায্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমন কি যে সিরিয়া মিশরের সঙ্গে ১৯৫৫ সালে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠন করে সে সিরিয়া সুয়েজের যুদ্ধে মিশরকে কোন সাহায্য করেনি। রাশিয়া সামরিক সরঞ্জাম এবং বোমারু বিমান প্রদানের অঙ্গিকার করলেও মিশর তা থেকে বঞ্চিত হয়। এই যুদ্ধে একতরফাভাবে লাভবান হয়েছিল ইসরাইল। কারণ ১৯৫৬ সালে থেকে ১৯৯৪ সালের মে মাস পর্যন্ত তারা গাজা অঞ্চল স্বীয় দখলে রাখে। অবশ্য অধিকৃত সিনাই তারা মিশরকে হস্তান্তর করে। এই যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে Lencezowski বলেন, "As self-appointed guardians of the peace Britain and France clamied that their action was motivated by solicitude for the Sashty and availability of the Suez canal. In reality their ultimatum, if successful would have rewarded the aggressor by concedung to him the still occupied areas of the Sinai Peninsula upto ten miles from the canal, while penalizing victim of acual aggression by demanding total evacuation of Egyptian troops to the western side of canal." ইসরাইল, ব্রিটিশ ও ফ্রান্স কর্তৃক মিশরের সামরিক পরাজয়ে আরব লীগের সদস্যগণ বিচলিত হয়ে পড়ে। কারণ তারা এক সময় ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের আশ্রিত বা মান্ডেটারী রাষ্ট্র ছিল। ইসরাইলকে মদদ প্রদানের জন্য সউদী আরব ব্রিটেন ও ফ্রান্সে একতরফাভাবে তেল রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। সিরিয়া তার তেল পাইপ লাইন কেটে দেয়। সুয়েজ খাল দিয়ে তেলবাহী জাহাজের পথ রুদ্ধ করার জন্য খালে নৌযান ডুবিয়ে দেওয়া হয়। উপরন্তু সিরিয়া, মিশর ও সউদী আরব ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ইরাক, সুদান এবং জর্দান ফ্রান্সের সঙ্গে সকল সম্পর্কচ্ছেদ করে। ইরাক বাগদাদ চুক্তি সম্মেলনে যোগদান থেকে বিরত থাকে এবং জর্দান তার ভূখণ্ডে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীকে অবতরণ করতে বাধা দান করে। আন্তর্জাতিক জনমত ব্রিটিশ ও ফরাসি দখলদার বাহিনীর সুয়েজ থেকে অপসারণ দাবী করে। জাতিসংঘ, আমেরিকা এবং রাশিয়া সুয়েজ থেকে বিদেশী সৈন্যের প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেয়। পারতপক্ষে তেল রপ্তানি বন্ধ হলে আর্থিকভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাহোক, ৬ই নভেম্বর জাতিসংঘ অস্ত্রবিরতি (Ceasefire) ঘোষণা করে এবং কানাডা কর্তৃক প্রস্তাবিত একটি জাতিসংঘ ইমারজেন্সী বাহিনী (UNEP) প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ১৯৫৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী সুয়েজ খাল অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করা হয়। গাজা অঞ্চল ব্যতীত ইসরাইল ১৯৫৭ সালের ৮ই মার্চ নিঃশর্তভাবে মিশর থেকে তাকে সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

ফলাফল ঃ ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী সুয়েজ অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করার পর ৩রা নভেম্বর মিশরীয় সরকার শুদ্ধি আন্দোলন পরিচালনা করে। মিশর থেকে ফরাসি ও ব্রিটিশ নাগরিকদের বিতাড়িত করা হয়। এমন কি ইহুদী, মাল্টা ও সাইপ্রাসবাসীদের মিশর ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ব্রিটিশ কোম্পানি বাণিজ্য সংস্থা ও তাদের ব্যাংক ব্যালেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়। যুদ্ধের পর জাতিসংঘের উদ্ধার বহর (salvage fleet) জেনারেল হুইলারের নেতৃত্বে সুয়েজ খালে নিমজ্জিত নৌযানগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু ইসরাইলী বাহিনীর শেষ সৈন্য মিশরীয় ভূখণ্ড ত্যাগ না করা পর্যন্ত মিশরীয় সরকার এই উদ্ধার কাজের অনুমতি দেয়নি। এরপর সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সমিতি (S.C.U.A) তাদের নিজস্ব স্বার্থে ও ব্যয়ে মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে নিমজ্জিত জাহাজগুলো উদ্ধার করে সুয়েজ খালকে নৌ-চলাচলের উপযোগী করে আনুষ্ঠানিকভাবে তা উদ্বোধন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ১৮৮৮ সালের চুক্তি অনুযায়ী সকল দেশ ও রাষ্ট্রের নৌযান ও ট্যাংকার যুদ্ধ অথবা শান্তির সময়ে যাতায়াত করতে পারবে। এর জন্য নির্দিষ্ট হারে ডলার অথবা সুইস ফ্রাঙ্কে টোল প্রদান করতে হবে। ইসরাইলের সঙ্গে যেহেতু মিশরের যুদ্ধকালীন অবস্থা (State of war) বিরাজ করছিল সেহেতু সুয়েজ খাল দিয়ে ইসরাইলী জাহাজ পারাপারে নিষেধাজ্ঞা অর্পিত হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে সুয়েজ যুদ্ধে সামরিক দিক থেকে মিশরের পরাজয় হলেও দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল বিচার করলে মিশর বিশেষ কয়েকটি সুফল লাভ করে। মিশরের বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনঃগঠনে তেল সমৃদ্ধ সউদী আরবের সহানুভূতি লাভ করে অর্থ মঞ্জুরী পায়। যুদ্ধে পরাজিত হলেও ইসরাইলী, ফরাসি ও ব্রিটেনের মত আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীকে সুয়েজ খাল ও সিনাই তথা মিশরের ভূখণ্ড থেকে অপসারিত করে মিশর আরব বিশ্বে অভূতপূর্ব মর্যাদা লাভ করে।

নাসেরের অবদান ঃ নাসেরের দৃঢ়তা, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, অনমনীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সর্বপরি তাঁর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনা সকল আরব নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিশর আরব লীগের একটি প্রভাবশালী সদস্যই হল না জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদান করে নাসের নেহেরু ও টিটোর সমকক্ষ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নেতার মর্যাদা লাভ করেন। ঈর্ষাপরায়ণ পশ্চিমা রাজনীতিবিদেরা নাসেরকে অবদমিত বীর (subdued hero) বলে আখ্যায়িত করলেও নিঃসন্দেহে তিনি মিশরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অবিসংবাদী নেতা, যিনি আরব সমাজতন্ত্র (Arab socialism) এবং আরব জাতীয়তাবাদের (Arab Nationalism) জন্মদাতা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরব রাষ্ট্রসমূহ

১. সিরিয়া : সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র

পটপ্রেক্ষিত

সামরিক চুক্তি ঃ মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদুল নাসের ১৯৫৫ সালে ২০ অক্টোবর সিরিয়ার সঙ্গে সর্বপ্রথম একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদিত করেন। এই চুক্তির মুখ্য উদ্দেশ্যে ছিল এই যে, ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত বাগদাদ চুক্তির ফলে ব্রিটিশ প্রভাবিত এই চুক্তি একদিকে যেমন তুর্কী ও ইরাককে মধ্যপ্রাচ্যে প্রাধান্য দান করে, অন্যদিকে মিশরকে আঞ্চলিক সামরিক ভারসাম্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে। বাগদাদ চুক্তি মিশরকে ব্রিটেনের প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রমাণিত করে এবং কমিউনিস্ট ব্লকে যোগদানে অনুপ্রেরণা দেয়। ভাটিকিওটিস বলেন, "Other developments which followed the conclusion of the Baghdad pact indicated Egypt's search for alternative collective security arrangements within the Arab Middle East." এর ফলেই মিশর সিরিয়ার সঙ্গে একটি যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি (Joint Defence Agreement) স্বাক্ষরিত করে। এক বছরের অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে মধ্যেই এই চুক্তির শর্তানুযায়ী সিরিয়ায় মিশরীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

মিশরীয় ইউনিয়ন ঃ মিশর ও সিরিয়ার সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে উভয় দেশের মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টি হয়। মিশরের অবিসংবাদী নেতা গামাল আবদুল নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদী এবং প্যান-আরব মতবাদ বিশেষভাবে সিরিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৫৬ সালে উভয় দেশের মধ্যে নিজেদের স্বার্থে এবং আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিকল্প হিসেবে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে উভয় দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার বিশেষ অগ্রগতি না হলেও উভয় দেশ একই ধরনের রাজনৈতিক গতিধারার দিকে অগ্রসর হয়। এই গতিধারা পশ্চিমা ইউরোপীয় শক্তির বিপরীতে রুশ কমিউনিস্ট ব্লকের অনুকূল্যে প্রবাহিত হয়। মূলতঃ নাসের নিরপেক্ষ রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। অবশেষে মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে বাণিজ্য শুল্ক বিষয়ক ক্ষেত্রে যৌথ সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে সিরিয়ার পার্লামেন্টে যৌথ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয় এবং মিশরীয় গণ-প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতে সিরিয় পার্লামেন্ট মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে একটি ইউনিয়ন বা যৌথ রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে মিশরীয় পার্লামেন্টে

www.pathagar.com

একই সিদ্ধান্তে গৃহীত হয়। ফলে সিরিয়া ও মিশর যৌথ রাষ্ট্র কায়েমের সাংবিধানিক অনুমোদনে আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। অতঃপর ১৯৫৮ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি দামেস্ক থেকে সিরিয় প্রেসিডেন্ট এবং কায়রো থেকে মিশরের প্রেসিডেন্ট একই সময়ে ঘোষণা দেন। এরপর থেকেই উভয় রাষ্ট্র সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র অথবা, 'United Arab Republic' নামে পরিচিত হয়।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (UAR) ঃ ১৯৫৮ সালে সিরিয়া ও মিশর সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৫ই ফেব্রুয়ারি উভয় দেশ সতেরটি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান অনুমোদনের জন্য তাদের সংসদে পেশ করে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিরিয়ার সমস্ত রাজনৈতিক দল বাতিল করা হয় এবং মিশরের অনুরূপ একটি জাতীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি উভয় দেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং রেফারেনডামের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উভয় দেশকে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। ভোটে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এই নব গঠিত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হবেন গামাল আবদুল নাসের। প্রেসিডেন্ট নাসেরের উপর এই রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পিত হয়। নাসের একটি নতুন সরকার গঠন করেন। যার মধ্যে চারজন ভাইস প্রেসিডেন্ট, একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। দুটি আঞ্চলিক মন্ত্রী পরিষদ গঠনেরও ব্যবস্থা ছিল। চারজন ভাইস প্রেসিডেন্টের মধ্যে দুজন মিশর এবং দুজন সিরিয়া থেকে গ্রহণ করার শর্ত ছিল। আঞ্চলিক পরিষদ দু'টি মিশর ও সিরিয়ায় গঠিত হয়। ১৯৫৮ সালের ৫ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে নাসের সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের (UAR) সতের অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি সংবিধান ঘোষণা করেন। উভয় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কল্পে কতিপয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। UAR-এর মুখ্য উদ্দেশ্যে ছিল একই প্রেসিডেন্ট, একটি সংবিধান, একটি ব্যবস্থাপক পরিষদ, একই সেনাবাহিনী এবং একটি যৌথ পতাকার মাধ্যমে দু'টি পার্শ্ববর্তী দেশ প্রতিরক্ষাসহ সকল বিষয়ে সংঘবদ্ধভাবে কার্য নির্বাহ করবে। প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থাপক সভা গঠনের জন্য নির্দেশ দিলে তা বাতিল ঘোষিত হয়। মিশরের 'জাতীয় এসেমবলী' এবং সিরিয়ার 'চেম্বার অব ডেপুটি' থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে এই ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও উভয় দেশের সরকারের গঠনের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি এবং উভয় দেশ নিজস্ব ভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত; অবশ্য যৌথভাবে কূটনৈতিক মিশন প্রেরণেরও ব্যবস্থা ছিল। যা হোক, রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে মিশরের ২৪ মিলিয়ন এবং সিরিয়ার ৪ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী একতাবদ্ধ হয় এবং UAR এর নাগরিক হিসেবে পরিচিত হয়।

সুপ্রিম কাউন্সিল ঃ UAR-এর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মিশর এবং সিরিয়া এক বছর অন্তর অন্তর সুপ্রিম কাউন্সিলে সভাপতিত্ব করবে। এই সুপ্রিম কাউন্সিলকে সাহায্য করার জন্য উভয় দেশ থেকে সামন সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি

www.pathagar.com

ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হবে। প্রথম ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং দু'টি আঞ্চলিক নির্বাহী কাউন্সিল ১৯৫৮ সালের ৬ই মে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হয়। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন নাসের এবং মিশর থেকে দুজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেনারেল আবদুল হাকিম আমের, আবদুল লতিফ বাগদাদী, সিরিয়া থেকে সাবরী আন-আসালী এবং আকরাম হুররানী। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নাসের UAR-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দামেস্কে আগমন করেন এবং সিরিয় সরকার গঠনে পরামর্শ দেন। উল্লেখ্য যে, প্রশাসনিক রদবদলের ফলে সিরিয়ার উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, যেমন জেনারেল আরিফ বিজরী, যিনি চিফ অব স্টাফ ছিলেন, বাদ পড়েন।

ইয়েমেনের যোগদান ঃ UAR-এর সঙ্গে ইয়েমেনের যোগদান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৫৬ সাল থেকে ইয়েমেন মিশরের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং UAR-এর গঠনের ফলে সামাজিক, সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ইয়েমেনে ১৯৫০ সালের ৮ই মার্চ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। ফেডারেল ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকরী হয় যখন নাসেরের সঙ্গে ইয়েমেনের যুবরাজ সাইফ আল ইসলাম মোহাম্মদ আল-বদর একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেন। মিশর ও সিরিয়ার সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে ইয়েমেনের যোগদানের ফলে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র সংঘের সৃষ্টি হয় এবং আঞ্চলিকভাবে তিনটি দেশেই তাদের নিজস্ব সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে।

আরব ফেডারেশন ঃ নাসেরের অসাধারন কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও মেধার ফলেই আরব ঐক্য জোট সৃষ্টি হয়। প্যান-আরববাদের (Pan Arabism) মূল মন্ত্র ছিল আরব জাতীয়তাবাদী (Arab nationalism) চিন্তাধারা ও চেতনাবোধ। UAR-রে গঠনের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য আরব রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়, যদি আরব লীগ সমস্ত আরব রাষ্ট্রসমূহকে একই ছত্রছায়ায় আনার চেষ্টা করে। UAR-এর প্রতিষ্ঠায় বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক (Bathist) রাজনৈতিক গতিধারা ইরাককে অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে পৃথক করতে থাকে এবং বাগদাদ চুক্তির (১৯৫৫) সম্পাদনে মিশরসহ কতিপয় আরব রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও বিচলিত হয়ে উঠে। যা হোক, UAR-এর বিপরীতে ইরাক জর্দানের সঙ্গে একটি আরব ফেডারেশন গঠন করে। UAR-এর অনুকরণে ইরাক মিশরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ইরাকের রাজা বাগদাদ ও আম্মানের সরকার প্রধান হলেন এবং ছয় মাস অন্তর ইরাক ও জর্দানের সংসদে কর্তৃত্ব করেন। উল্লেখ্য যে, UAR-এর অনুকরণে আরব ফেডারেশন অন্যান্য আরব রাষ্ট্রসমূহকে এই সংঘে যোগদানের আহ্বান জানায়। কিন্তু আরব ফেডারেশনের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র পাঁচ মাস (১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ই জুলাই, ১৯৫৮) যদিও উভয় দেশে হাশেমী রাজবংশ রাজত্ব করে তবুও বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারা ইরাক ও জর্দানের মধ্যে বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

নাসেরের কূটনীতি ঃ বলাই বাহুল্য যে, UAR-এর স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন আরব জাতীয়তাবাদের অবিসংবাদী নেতা গামাল আবদুল নাসের। তিনি UAR সৃষ্টি করে

www.pathagar.com

সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহে তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিস্তারের চেষ্টা করেন। UAR ছিল তাঁর একটি রাজনৈতি হাতিয়ার মাত্র। সুয়েজ সঙ্কট কাটিয়ে উঠার পর তিনি একজন আদর্শ জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেন। তিনি এক দিকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করে ইহুদীবাদ (Zianism) নির্মূল, অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের ঘোর বিরোধিতা করেন। UAR প্রতিষ্ঠার ফলে তাঁর আন্তর্জাতিক মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি বাগদাদ চুক্তির বিপরীতে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লক সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ইরাকের প্রতি বৈরী মনোভাব অনেক আরব ও অনারব রাষ্ট্রের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ইরাকে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং কর্নেল কাসেম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। একই সময়ে প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁর প্রভাব বলয় বিস্তারের জন্য বিভিন্ন এজেন্ট, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মাধ্যমে রাজতন্ত্র ধ্বংসের জন্য প্ররোচনা শুরু করেন। তিনি সাউদী আরবের রাজা সাউদ এবং তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট বরগুইবার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক প্রচারণা শুরু করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আরব বিশ্বে একচ্ছত্র এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার মর্যাদা লাভ। এর ফলে নাসেরের বিরুদ্ধে সাউদী সরকার প্রতি বিপ্লব শুরু করে এবং মিশরীয় কর্নেল সারাজকে উৎকোচ দিয়ে UAR-কে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। নাসের লেবাননের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করেন। ইরাকের সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে UAR-এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কারণ সিরিয়া ছিল ইরাকের পার্শ্ববর্তী দেশ। নাসের তাঁর কূটনৈতিক অভিজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে হঠাৎ মক্কা সফর করেন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি ইরাকের অভ্যুত্থানের পর UAR-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাগদাদ থেকে ইরাক প্রজাতন্ত্রের একটি প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। ইরাক ও UAR আরব লীগের ছত্রছায়ায় একটি সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত করে। লেবাননে নাসেরের প্যান-আরব মতবাদ বিশেষ কার্যকরী হয়নি। তার মূল কারণ সে দেশের জনগণ এবং বিশেষ করে আমেরিকান সামরিক প্রশাসন UAR-এর আধিপত্যবাদকে প্রতিহত করে। অনুরূপভাবে ব্রিটিশদের সহায়তায় রাজা সউদ সাউদী আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কাঠামোতে সকল প্রকার পরিবর্তনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। মূল কথা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি উগ্র জাতীয়তাবাদের চেতনায় প্রত্যেক আরব রাষ্ট্র তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে রক্ষার চেষ্টা করে। উপরন্তু, একটি আরব দেশ অপর একটি পার্শ্ববর্তী আরব দেশকে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার অথবা তাদের সম্পদে হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করেনি। আরব রাষ্ট্রসমূহ কখনই সম্পূর্ণ একীভূত (merger) হতে চায়নি বরং তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে একটি ফেডারেশনের পক্ষপাতী ছিল।

UAR-বিরোধী আন্দোলন ঃ ১৯৫৮ সালে সিরিয়া ও মিশরের সংযুক্তিকরণ ছিল একটি তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রয়াস। নাসের সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে UAR সৃষ্টি করেন মিশরের স্বার্থে। ফলে সিরিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিরিয়ার জনগণ বিশেষভাবে রক্ষণশীল দল, বণিক ও শ্রমিক শ্রেণী মিশরের সাথে এই সংযুক্তিতে সন্তুষ্ট ছিলনা।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে সিরিয়ায় কমিউনিস্টপন্থীদের প্রভাব পরিলক্ষিতও হতে থাকে এবং তারা UAR-র ঘোর বিরোধী ছিল। সিরিয়া ও ইরাকে বাথ পার্টির (Bathist) আবির্ভাব বামপন্থী রাজনীতির সুত্রপাত করে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ইরাকে বাথ পার্টির ছত্রছায়ায় যে সামরিক অভ্যুত্থান হয় তাতে নাসের বিচলিত হয়ে UAR-র সরকার থেকে বাথ পার্টির সদস্যদের অপসারণ করে তাদের স্থলে রক্ষণশীল সদস্যদের প্রাধান্য দেন। যদিও চুক্তি মোতাবেক দামেস্কে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক সিরিয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ছিল কিন্তু স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য নাসের তা হতে দেননি। ফলে ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে সিরিয় ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসেইনী সহ অনেক বাথ পন্থীদের UAR সরকার থেকে নাসের অপসারণ করেন। এমন কি অনেক দায়িত্বপূর্ণ সিরিয় পদগুলো মিশরীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা পূরণ করা হয়। যা হোক, নাসের UAR-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে নমনীয় নীতির পরিচয় দেন এবং প্রথম দিকে ১৯৫৯ সালে সিরিয়ার সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও UAR-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আবদুল হাকিম নাসেরকে UAR-এর সিরিয় অঞ্চলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। অবশ্য ১৯৬০ সালে নাসেরের অনুরক্ত কর্নেল আবদুল হামিদকে সিরিয় নির্বাহী কাউন্সিলের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

সিরিয়ার স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ ঃ প্রেসিডেন্ট নাসের UAR সৃষ্টির ফলে মিশরীয় সমাজতন্ত্র সিরিয়ায় চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয়করণ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন এবং ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রীয়করণ করেন। সংবাদপত্রসমূহ জাতীয় ইউনিয়ন পার্টির নিয়ন্ত্রণে আনেন। ইমামুদ্দীনের ভাষায়, "Nasser wanted to build up a social, democratic and co-operative society of the Arabs beginning with those in Egypt and Syria." এভাবে নাসের সমগ্র মিশর ও সিরিয়ায় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। এর প্রমাণ হচ্ছে তিনি ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে প্রথম UAR-এর জাতীয় পরিষদের মোট ৬০০ সদস্যের মধ্যে সিরিয়া থেকে ১৫০ জন সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলেও মাত্র ৩৭ জন সদস্য গ্রহণ করা হয়।

নাসেরের পররাষ্ট্র নীতি ঃ UAR-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজেকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে নাসের পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি রাশিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। কারণ, ইতিপূর্বেই রাশিয়া মিশরকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করে এবং আসওয়ান বাঁধ নির্মানের জন্য অর্থ মঞ্জুরি দেয়। এর ফলে UAR-এর সঙ্গে USSR-এর ১৯৫৮ সালের এপ্রিলে একটি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাহ্যিকভাবে নাসের বামপন্থী কমিউনিস্ট সমর্থন লাভ করলেও তিনি মিশরের বামপন্থী রাজনীতিবিদদের কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে পোর্ট সাঈদের এক জনসভায় মিশর ও সিরিয়ার কমিউনিস্টদের আরব জাতীয়তাবাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন। নাসেরের ভাষণে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুসচেভ ক্ষুণ্ন হলেও রাশিয়া মিশরের মাধ্যমে তার প্রভাব বলয় বিস্তারের জন্য মিশরকে আসওয়ানে বাঁধের জন্য অর্থ মঞ্জুরী, পাঁচটি বিমান ঘাঁটি এবং কলকারখানা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

সামগ্রী প্রদানে অঙ্গীকার করে। ১৯৬০ সালের মধ্যে রাশিয়ার সাহায্যে আলেকজান্দ্রিয়ার জাহাজ নির্মাণ ও ছয়টি ইস্পাত তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। নাসেরের দ্বৈত নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মর্যাদা হানী করে, বিশেষ করে রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ক্রুসচেভ তাঁর প্রতি বিরাগভাজন হন। উপরন্তু, অপর একটি কমিউনিস্ট ব্লক চীনের সাথেও UAR-এর বৈদেশিক সম্পর্ক সন্তোষজনক ছিল না। এর প্রধান কারণ ছিল এই যে, সিরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা খালিদ বাগদাস নির্বাসিত হয়ে পিকিং-এ গমন করে চীনের জাতীয় উৎসবে যোগদান করেন। ইসরাইলকে সমর্থন এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যে দানের ফলে UAR-এর সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের অবনতি হয়। উপরন্তু, লেবাননে UAR-এর হস্তক্ষেপ আমেরিকা বরদাস্ত করেনি। ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে UAR সহ আরব রাষ্ট্রসমূহ লেবানন ও জর্দান থেকে আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য জাতিসংঘে দাবী জানায়। সুয়েজ খাল জাতীয়করণের পর ব্রিটিশ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে মিশরের সম্পর্কের অবনতি হয় কিন্তু ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর UAR-এর সঙ্গে ব্রিটেনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ১৯৬১ সালের জানুয়ারিতে স্থাপিত হয়। আরব জাতীয়তাবাদী নেতা গামাল আবদুল নাসের পরিচালিত আফ্রিকা নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশবাদ নির্মূল করে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। তিনি এই সমস্ত দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সহায়তা দেন। কায়রোতে আলজিরিয়া ও মরক্কোর রাজনীতিবিদেরা তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দফতর স্থাপন করে। এর ফলে ১৯৬১ সালের মধ্যে মরক্কো ও আলজিরিয়াসহ অনেক আফ্রিকার রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। নাসের পশ্চিমা আধিপত্যবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং রাজনৈতিক জোটে বিশ্বাসী ছিলেন না। এই কারণে তিনি যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো এবং ভারতে নেহেরুর সাথে এক জোট হয়ে 'জোট নিরপেক্ষ সংঘ' সৃষ্টি করেন। ইমামুদ্দীন নাসেরের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে যথার্থই বলেন, "He followed the foreign policy of Arab liberation, positive neutralism and non-alignment."

UAR বিলুপ্ত ঃ ১৯৫৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি মাসে মিশর ও সিরিয়া কর্তৃক যৌথভাবে ঘোষিত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (UAR) ১৯৬১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বিলুপ্ত হয়। তিন বছর ব্যাপী সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র উভয় দেশকে একই সুত্রে গ্রথিত করে রাখলেও বিভিন্ন কারণে UAR-র পতন হয়।

(১) নাসেরের একনায়কত্ব ঃ UAR প্রতিষ্ঠার পর থেকে গামাল আবদুল নাসের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আধিপত্য ও একনায়কত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেন। তিনি নিজেকে UAR-এর প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে সমস্ত কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। নিয়োগ পত্র দান, চাকরিচ্যুত, সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি নাসেরের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাসের আফ্রিকার এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রতি যে পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করেন তার ফলেই আরব বিশ্বে তাঁর অসামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যা সিরিয়ার জন্য ঈর্ষার কারণ ছিল।

www.pathagar.com

(২) বাণিজ্যিক ও সামাজিক বৈষম্য ঃ আরব জাতীয়তাবাদী নেতা নাসের তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতার কোন প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করেননি। এই কারণে তিনি কমিউনিস্টপন্থী ও বাথ পার্টির সদস্যদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। ইরাকে সামরিক অভ্যুত্থান ও বাথ পার্টির অভ্যুদয়ে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে সিরিয় রাজনীতিবিদেরা সিরিয়ার বৈষম্যমূলক নীতির তীব্র সমালোচনা করে। তারা সিরিয়ায় মিশরীয় রীতিতে প্রবর্তিত ভূমি সংস্কার এবং সামাজিক সংস্কারের বিরোধিতা করে। ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণের ফলে মিশর অপেক্ষা সিরিয়া বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে সিরিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যহত হয়।

(৩) প্রশাসনিক ও সামরিক বৈষম্য ঃ UAR প্রতিষ্ঠার ফলে প্রশাসনিক ও সামরিক বৈষম্য মাত্রাধিকভাবে বৃদ্ধি পায়। জাতীয় পরিষদে মিশরীয়দের তুলনায় সিরিয় সদস্যদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। ৬০০ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদে ১৫০ জন সিরিয় সদস্য থাকার ব্যবস্থা থাকলেও, মাত্র ৩৭ জন সদস্য নিযুক্ত করা হয়। চাকরির ক্ষেত্রেও মিশরীয়গণ প্রাধান্য লাভ করে। এমন কি সিরিয়ার নির্বাহী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মিশরীয় কর্নেল আবদুল হামিদ। এক পর্যায়ে নাসের UAR-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সিরিয়াবাসী ফিল্ড মার্শাল আবদুল হাকিমকে অপসারণ করেন। এই সমস্ত বৈষম্যমূলক পদক্ষেপে সিরিয়াবাসী UAR-এর বিরোধিতা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। UAR-এর রাজধানী কায়রোতে অবস্থিত হওয়ায় সিরিয়বাসী কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ভূমিকা রাখতে পারতনা। সিরিয় সদস্যদের পরামর্শ ছাড়াই মন্ত্রী পরিষদ আইন জারী করতে পারত এবং ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা থাকায় এই সাংবিধানিক কর্মকাণ্ডে তাদের কোন অংশগ্রহণে সুযোগ ছিলনা। উপরন্তু, মিশরীয় তদন্ত সংস্থার কর্ণেল সাবরাজের নেতৃত্বে সমগ্র সিরিয়ায় UAR বিরোধী কার্যকলাপ কঠোর হস্তে দমন করা হয়। ১৯৬১ সালে সিরিয়ার কর্মরত মিশরীয় উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০,০০০-এ। এ সমস্ত মিশরীয় কর্মকর্তাগণ সিরিয় অফিসারদের তুলনায় অধিক বেতন পেতেন।

(৪) অর্থনৈতিক বৈষম্য ঃ তুলনামূলকভাবে উদার বাজার নীতি (Free market) এবং সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে মিশর অপেক্ষা সিরিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান ছিল অনেক উন্নত। নাসেরের সমাজ ও অর্থনৈতিক সংস্কারের বিরোধিতার কারণে সিরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর এবং সিরিয়ার চেম্বার অফ কর্মাস-এর প্রেসিডেন্ট অবাধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সিরিয়বাসী সংযুক্ত রাষ্ট্রের স্থলে ফেডারেল রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট আকারে দেখা দেয় যখন নাসের ১৯৬১ সালে একতরফাভাবে কতকগুলো ডিক্রী জারী করে রাষ্ট্রীয়করণ নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি সমগ্র UAR-এর সিরিয় ও মিশরীয় পাউন্ডের স্থলে আরব দিনারকে মুদ্রা হিসেবে চালু করেন। উপরন্তু, নাসের মিশর ও সিরিয়ায় পূর্বে যে আঞ্চলিক সরকার ছিল, তা বিলুপ্ত করে প্রশাসনকে একটি কেন্দ্রীয় অবকাঠামোর মধ্যে আনেন। কায়রোতে অবস্থিত এই কেন্দ্রীয় সরকার একাধিপত্য বিস্তার করে এবং সিরিয়ার বণিক, বুর্জোয়া শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী এবং

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদেরা বৈষম্যমূলক নীতিতে নাসেরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের পক্ষে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। সিরিয়ায় যে UAR বিরোধী আন্দোলন দানা বাধে তাতে সিরিয় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করে।

(৫) সামরিক বৈষম্য ঃ নাসের সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মিশরীয় সেনা অফিসারদের সিরিয়ায় এবং সিরিয় সামরিক কর্মকর্তাদের মিশরে নিযুক্ত করেন। মিশরীয় সামরিক কর্মকর্তাদের সংখ্যা অধিক ছিল এবং তাদের উন্নতমানের টেলিকমিউনিকেশন ছিল। ফলে তারা সহজে কায়রোতে আর্মি হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারত। ১৯৬১ সালে সিরিয়া থেকে মিশরীয় আর্মি কমান্ড কতিপয় ভারী অস্ত্র কায়রোতে স্থানান্তরিত করার প্রচেষ্টায় সিরিয় বাহিনী তীব্র প্রতিবাদ করে এবং সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ হিসেবে গণ্য করে। ফলে সিরিয় বাহিনী মিশরীয় বাহিনীর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে।

সিরিয় আরব প্রজাতন্ত্র ঃ সিরিয় বাহিনীর অসন্তোষ প্রশমিত করার জন্য নাসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আবদুল হাকিম আমেরকে জরুরী ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি সিরিয়ায় সাবরাজের বৈষম্যমূলক শাসনে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিরিয় মিশরীয় বাহিনীর মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ১৯৬১ সালে যখন কর্নেল সাবরাজকে দামেস্ক থেকে কায়রোতে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণের জন্য বদলী করা হয় তখন সিরিয় সামরিক বাহিনী নাসেরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তারা দামেস্কে একটি সামরিক অভ্যুত্থানে ফিল্ড মার্শাল আমেরকে গ্রেফতার করে কায়রোতে প্রেরণ করে। ১৯৬১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর উচ্চ আরব বিপ্লবী কমান্ড সিরিয়াকে UAR থেকে বিচ্ছিন্ন করে ড: মামুন খুজবারীর নেতৃত্বে সিরিয় আরব প্রজাতন্ত্রী প্রতিষ্ঠা করে। ড: মামুন একটি বেসামরিক সরকার গঠন করেন। উল্লেখ্য যে, রক্তপাতহীন এই সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে UAR বিলুপ্ত হয়। নাসের সিরিয়ার এই একতরফা প্রজাতন্ত্র ঘোষণায় সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে দেন। পরবর্তী পর্যায়ে সিরিয়ায় অবস্থানরত মিশরীয় বাহিনীকে আত্মসমর্পণ (surrender) করতে নির্দেশ দেন। ভগ্ন হৃদয়ে নাসের বলেন, "It is an act which affects our long struggle for our Arabism and for Arab Nation."

২. সুদান-মিশর যুগ্ম শাসন

পটপ্রেক্ষিত ঃ সুদান শব্দের অর্থ 'কালদের দেশ' বা 'বিলাদ আল-সুদান।' মিশরের দক্ষিণে অবস্থিত সুদান নীল নদী দ্বারা সংযুক্ত এবং উত্তর সুদানের বসবাসকারীদের জাতিগত, ভাষা, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় চেতনার দিক থেকে মিশরের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। আধুনিক মিশরের স্রষ্টা মোহাম্মদ আলী সর্বপ্রথম সুদানে অভিযান করে তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য সৈন্য সংগ্রহ (conscription) করেন। ১৮২০ সালে মোহাম্মদ আলী তাঁর পুত্র ইসমাইলের নেতৃত্বে একটি বাহিনী সুদানে পাঠান। ১৮২২ সালে সুদানের রাজধানী খার্তুম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই শহরটি সাদা ও নীল নদীর মোহনায় অবস্থিত।

www.pathagar.com

১৮৩০ সালে সুদানে প্রথম মিশরীয় গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ইসমাইলের (১৮৬৩-৭৯) রাজত্বকালে সুদানে মিশরীয় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর সময়ে স্যামুয়েল বেকেট পাশা নামীয় একজন ইংরেজ সুদানে অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন প্রখ্যাত ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ জেনারেল গর্ডন পাশা। এই সময়ে জেনারেল স্টোন নামে একজন আমেরিকান অফিসার সুদানের ভৌগোলিক মানচিত্র তৈরি করেন। তৌফিক পাশার (১৮৭৯-৯১) রাজত্বকালে সুদানে মিশরীয় আধিপত্য ক্ষীণ হতে থাকে। এর মূল কারণ ছিল মাহ্দী বিপ্লব। সুদানের একজন গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় নেতা যিনি মাহ্দী নামে পরিচিতি ছিলেন। ১৮৮৪-৮৫ সালে সুদানের মিশরীয় আধিপত্য নিরসনের জন্য তিনি বিদ্রোহ করেন। মাহ্দী জেনারেল গর্ডনকে হত্যা করে তার বিপ্লবী বাহিনী নিয়ে খার্তুমে গর্ডনের প্রাসাদ দখল করেন। সেখানে তিনি তাঁর নিজস্ব পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি সুদানে ১৮৮৪-৮৫ সাল থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু খদিভ তৌফিক পাশা ব্রিটিশ বাহিনীর সহায়তায় ওমদুরমানের যুদ্ধে (Battle of Omdurman) মাহ্দীকে পরাজিত করে সুদান দখল করেন। মাহ্দী বিপ্লব মিশরীয় অর্থে এবং ব্রিটিশ সামরিক অভিযানের ফলে দমন করা হয়। এর ফলে সুদানে ১৮৯৯ সালের ১৯শে জানুয়ারি মিশর এবং ব্রিটেনের মধ্যে একটি যৌথ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইঙ্গ-মিশরীয় কনডোমিনিয়াম (Anglo-Egyptian Condominium) নামে পরিচিত এই চুক্তি দ্বারা সুদান ব্রিটিশ ও মিশরের যৌথ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

ইঙ্গ-মিশরীয় কনডোমিনিয়াম (১৮৯৯) ঃ মাহ্দী বিপ্লবের পরিসমাপ্তিতে ব্রিটেন ও মিশর সুদানের উপর যৌথভাবে কর্তৃত্ব করতে থাকে। এই যৌথ চুক্তি বা কনডোমিনিয়ামের শর্তাবলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) এই চুক্তির শর্তানুযায়ী সুদানের উপর ব্রিটেন এবং মিশরের যৌথ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। সুদান একটি কনডোমিনিয়ামে রূপান্তরিত হবে। এই শব্দটি লর্ড ক্রোমার প্রথম ব্যবহার করেন।

(২) ব্রিটিশ সরকারের সুপারিশক্রমে মিশরের খদিভ সুদানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করবেন।

(৩) ক্যাপিচুলেশ পদ্ধতিতে মিশরে বিদেশীগণ যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত সে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সুদানকে দেওয়া হবে না।

(৪) প্রথম দিকে সুদানের প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ ছিলেন ব্রিটিশ; পরবর্তী পর্যায়ে মিশরীয় ও সুদানীগণ এই সমস্ত পদ দখল করেন।

(৫) দাসত্বপ্রথা বিলোপ করা হয়। পূর্বে এই অঞ্চল থেকে দাস সংগ্রহ করে বিদেশে পাচার করা হত। পরবর্তীকালে গেজিরা (Gezira) পদ্ধতিতে দাসত্ব থেকে মুক্ত স্বাধীন সুদানীগণ (Freedment) শ্রমিকের কাজে নিয়োজিত হয়।

১৮৯৯ সালে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিশরীয় কনডোমিনিয়াম সুদানে যৌথ নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত করে। এই সময়ে মিশরের খদিভ ছিলেন দ্বিতীয় আব্বাস (১৮৯২-১৯১৪)। মিশরীয়

www.pathagar.com

সরকারের তরফ থেকে চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন খ্রিস্টান প্রধান মন্ত্রী ভুট্রস পাশা গালী। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট লর্ড ক্রোমার এই চুক্তির নামকরণ করেন। ১৯২২ সালে জগলুল পাশা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ব্রিটিশ সরকার মিশরকে আংশিক স্বাধীনতা দান করে। ১৯২২ সালের মার্চে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি Four Reserved Points বা চারটি সংরক্ষিত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এই চারটি বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল সুদান ও মিশরে ব্রিটিশদের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, ১৯২২ সালে মিশরকে আংশিক স্বাধীনতা দেওয়া হলেও সুদান ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে রয়ে যায়। মূল কথা যত দিন মিশরে ব্রিটিশদের আধিপত্য বজায় ছিল ততদিন সুদানও ব্রিটিশ প্রশাসন অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মিশর আংশিক স্বাধীনতা লাভ করার পর সুদান থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত করার চেষ্টা করে। ১৯২৪ সালে সুদানে একটি সামরিক বিপ্লব (mutiny) হয় এবং সুদানের সঙ্গে মিশর একটি ইউনিয়ন বা সংঘবদ্ধ যুগ্ম রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস পায়। মিশরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথিকৃত নাহাস পাশা ব্রিটিশদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত করেন। ১৯৩৬ সালের ২৬শে আগস্ট লন্ডনে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির (Anglo-Egyptian Treaty) শর্তানুযায়ী সুদানের অবস্থা পূর্বের মত (Status quo) থাকবে অর্থাৎ দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণাধীন। অবশ্য এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে, সুদানের ভাগ্য সুদানীগণ নির্ধারণ করবে। তারাই স্থির করবে যে তারা একটি জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করবে না ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির স্বাক্ষরদানকারী একটি দেশের সঙ্গে আনুগত্য স্বীকার করে পরাধীন থাকবে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঃ সুদান ইঙ্গ-মিশরীয় কনডোমিনিয়ামের আওতায় দু'টি দেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে এই দেশটির আবির্ভাব অন্যান্য আফ্রিকার দেশের মত সহজতর হয়নি। ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে খার্তুমে বিক্ষোভ ও বিপ্লব চলতে থাকে। ১৯৪২ সালে এই বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করলে সুদান থেকে মিশরীয় কর্মকর্তা প্রত্যাহার করা হয় এবং মিশরীয় পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়। এর ফলে প্রকৃত অর্থে সুদান ব্রিটিশ দখলদার বাহিনীর কর্তৃত্বাধীনে থাকে। ১৯৫০ সালে নাহাস পাশার নেতৃত্বে ওয়াফদ পার্টি যখন ক্ষমতা লাভ করে তখন সমগ্র মিশরে ঘৃণ্য ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি বাতিলের জন্য গণ বিক্ষোভ শুরু হয়। ইতিপূর্বে ১৯৪৭ সালে মিশর নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুদান প্রশ্ন উত্থাপন করে। কিন্তু কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। অতঃপর নাহাস পাশার সরকার ১৯৫১ সালে এককভাবে ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি বাতিল করেন। এই চুক্তি বাতিল হলে সুদানের উপর যৌথ নিয়ন্ত্রণের শর্তও উপেক্ষিত হয়। ফলে সুদানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতি সঞ্চারিত হয়। চুক্তি বাতিলের ফলে সুদানে মিশরীয় কর্তৃত্ব দূরীভূত হলেও ব্রিটিশ আধিপত্য অক্ষুণ্ণই থাকে। কনডোমিনিয়ামের আওতায় সুদানে প্রথম বিশ বছর (১৮৯৯-১৯১৯) আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়। এই সময়ে সুদানে শিক্ষিত সমাজ সচেতন ও জাতীয়তাবাদী মতবাদে উদ্বুদ্ধ কতিপয় নেতার আবির্ভাব হয়। মিশরীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাব সুদানে পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য আলী আবদুল লতিফ। ১৯২২ সালে

www.pathagar.com

সরকার বিরোধী প্রচারপত্র মুদ্রণের জন্য তিনি গ্রেফতার হন। মুক্তি লাভ করে তিনি White Flag League বা 'সাদা পতাকা লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালে এই দল বিক্ষোভ পরিচালনা করলে তাদের নেতাদের আটক করা হয়। ১৯২৪ সালে কায়রোতে ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ স্যার লী স্টক আততায়ীর হস্তে নিহত হলে সুদান থেকে সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালে ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময় সুদানকে পরামর্শ করা হয়নি। এতে সুদানীগণ ক্ষুব্ধ ছিল এবং তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করে তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবী জানায়। ১৯৩৭ সালে Graduates General Congress স্থাপিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের পর এই সংস্থা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট ১২ দফার একটি আরজি পেশ করে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সুদানের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে এই কংগ্রেসকে স্বীকার করতে অস্বীকার করে মেমোরেন্ডাম বাতিল করে। তবে সরকারে সুদানীদের অংশ গ্রহণের অঙ্গীকার করে। এর ফলে Graduates General Congress দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দাবী করে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে; অপর সন্ত্রাস, বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মাধ্যমে মিশরের সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটি Nile Valley Union গঠনের চেষ্টা করে। এদিক থেকে তারা নিজেদের মিশরের সাথে জাতিগতভাবে একাত্মতা ঘোষণা করে। এ কারণে তারা 'আসিকা' (Ashiqa বা blood-brother, kinsmen) হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়।

রাজনৈতিক দল ঃ ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে শান্তি চুক্তির জন্য যখন যোগাযোগ চলছিল তখন সুদানে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়। একটি হচ্ছে আবদুর রহমান আল-মাহদীর নেতৃত্বে পরিচালিত উম্মা পার্টি (Umma Party); অপরটি হচ্ছে জাতীয় ফ্রন্ট (National Front)। দ্বিতীয় দলটি কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের সমষ্টি। যেমন আসিকা, উদারপন্থী, (Liberal), ইউনিয়নিস্ট (Unionists) এবং সাঈদ আলী আল-মিরগানী পরিচালিত খাতমিয়া গোষ্ঠী। উল্লেখ্য যে, ১৯৫১ সালের ৮ই অক্টোবর মিশরের জাতীয় পরিষদ সুদান কনডোমিনিয়াম চুক্তি (Anglo-Egyptian Condominium) একতরফাভাবে বাতিল করে। ফলে সুদানে ১৯৫১ সালের পর থেকে জাতীয়তাবাদী শক্তির গতিসঞ্চার হয়। ১৯৫২ সালে মিশরের প্রভাবে সংযুক্তিকরণে (মিশর ও সুদান) Pro-Unionist groups সংঘবদ্ধভাবে জাতীয় ইউনিয়নিস্ট পার্টি (National Unionist Party) গঠন করে। এই পার্টি ১৯৫৩ সালে সুদানে আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক সরকার গঠনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই রাজনৈতিক আন্দোলনে কেবলমাত্র উত্তর সুদান অংশগ্রহণ করে এবং দক্ষিণ সুদান জাতীয় ভাষাও সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক বিধায় বিচ্ছিন্ন থাকে। ১৯৫৩ সালে সুদানের সঙ্কট নিরসনের জন্য ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অবশ্য দক্ষিণে লিবারাল পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। সুতরাং কনডোমিনিয়াম বাতিল ঘোষিত হলেও উত্তর সুদানে ইঙ্গ-মিশরীয় কর্তৃত্ব অব্যহত থাকে।

www.pathagar.com

স্বায়ত্তশাসন ঃ যুদ্ধোত্তর আফ্রিকায় আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব আফ্রিকা থেকে বিশেষ করে লিবিয়া ও ইথিওপিয়া থেকে ইতালির মুসোলীনীর কর্তৃত্ব ধুলিস্যাৎ হয়। অপরদিকে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উত্তর সুদানের অধিবাসীগণ বিশেষ অগ্রগতি লাভ করে। এ ক্ষেত্রে সুদানের ব্রিটিশ গভর্নর স্যার ডগলাস নিউরোলেটরের অবদান অনস্বীকার্য। যাহোক, স্বাধীকার ও স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে সুদানী প্রতিনিধিদল যোগদান করে কিন্তু এতে তাদের সঙ্কট দূর হয়নি। ব্রিটিশ সরকার স্বাধীকার না দিলেও কেন্দ্রীয় সরকারে সুদানীদের চাকরিতে নিয়োগ করে এবং স্থানীয় সরকারে (local council) তারা নির্বাচিত হয়। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের কাউন্সিলে সুদানীদের অংশগ্রহণের ফলে তাদের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়। ১৯৪৪ সালে উত্তর সুদানের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয় এবং এই পরিষদে আটজন মনোনীত সদস্য ছিল। আঠারো জন প্রাদেশিক কাউন্সিল নির্বাচিত হন। সুদানে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ সুদানে নির্বাহী কাউন্সিল, ব্যবস্থাপক সভা ও প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠিত হয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। উম্মা পার্টির সচিব আবদুল্লাহ খলিল ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সুদানে সমাজ সচেতনতা, রাজনৈতিক মূল্যবোধ, সুদানী জাতীয়তাবাদের চেতনার উদ্ভব হয়, যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভে সহায়ক হয়।

ক্ষমতা হস্তান্তর ঃ ১৯৫২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিশরের রাজা ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করে জেনারেল নগীব ক্ষমতা গ্রহণ করেন। মিশরে রাজতন্ত্রের পতনে এবং সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে নগীবের আবির্ভাব সুদানের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক। কারণ, জেনারেল নগীব একজন সুদানী মাতার সন্তান ছিলেন এবং খার্তুমে তাঁর জন্ম হয়। তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম সুদান প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন এবং 'Nile Valley Union' বা নীল উপত্যাকা মিশর-সুদানের একত্রিকরণের বিরোধী ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সুয়েজ খাল সমস্যাকে সুদান প্রশ্ন (Sudan Issue) থেকে পৃথক করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সুদানের স্বাধীনতা অর্জনকে প্রাধান্য দেন। সুদানের ক্ষমতা হস্তান্তরের আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কারণ, ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে সংবিধান খসড়া কমিশন (Constitution Amendment Commission) গঠিত হয় এবং 'আসিকা' দল ব্যতিত সকল রাজনৈতিক দলকে এই কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫২ সালের মে মাসে একটি নতুন সরকার গঠনের প্রয়োজনে এই কমিশন একটি নতুন খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে। এই সরকার কেবলমাত্র সুদানী মন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত হবে এবং দু'টি ব্যবস্থাপক সভা সম্বলিত আইন পরিষদ (bicameral legislature) গঠনের সুপারিশ করে। দক্ষিণ সুদানের তিনটি প্রদেশের ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের শাসন বজায় ছিল এবং ব্রিটিশ সরকার ১৯৫২ সালের অক্টোবরে তা অনুমোদন করেন। কিন্তু উত্তর সুদানের মন্ত্রী পরিষদকে পার্লামেন্টের নিকট জবাবদিহি করতে হত। সুদানবাসী মিশরের সামরিক

www.pathagar.com

নেতা জেনারেল নগীব ক্ষমতার লাভ করে সুদানী রাজনীতিবিদদের সাথে এক বৈঠকে বসেন এবং ব্রিটিশ সরকারে নিকট সুদানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে, অন্তবর্তীকালীন সময়ে তিন বছরের জন্য স্বায়ত্তশাসন (Home Rule) প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং এই সময়ে গভর্নর জেনারেলকে মিশর কর্তৃক নিযুক্ত পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক কমিশন প্রশাসনে সাহায্য করবে। এই সময়ের মধ্যে সুদানীগণ স্থির করবে যে, তারা মিশরের সঙ্গে সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন করবে না একটি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করবে। এই প্রস্তাবসমূহ উম্মা পার্টির প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষরিত করে। সালা সালেম এবং শেখ বাগুরী সুদানের প্রত্যান্ত অঞ্চলে সফর করে সমর্থন ও স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে এই তথ্যাদি ও আবেদনপত্রসমূহ একত্রিত করা হয়। কেবলমাত্র উত্তর সুদানই নয়, দক্ষিণ সুদানেও অনুরূপ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা গৃহীত হবার প্রস্তাব ছিল। মিশরীয় সরকার সুদানী প্রস্তাবসমূহ নিরীক্ষা করে ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত হয়, যখন মিশর এবং ব্রিটেন একটি চুক্তিতে (Anglo-Egyptian Agreement, 1953) স্বাক্ষর দেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তিন বছর অন্তবর্তীকালীন সময়ে সুদান একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের দ্বারা শাসিত হবে এবং সুদান যদি স্বাধীনতা লাভের আশা করে তবে সাংবিধানিক পরিষদ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে। এই সময়সীমা পার হলে সুদান থেকে ব্রিটিশ ও মিশরীয় বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে এবং এর ফলে সুদান পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করবে।

প্রথম মন্ত্রীসভা ঃ ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিন বছরের সুদানের রাজনৈতিক ইতিহাস স্বাধীনতা লাভের ঐক্যবদ্ধ এবং নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির আওতায় সুদানে ১৯৫৩ সালের ২রা নভেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল ইউনিয়নিস্ট পার্টি (NUP) মিশরীয় জাতীয়তাবাদীদের সমর্থনপুষ্ট পুরাতন 'আসিকা' দল এবং সৈয়দ আলীর 'খাতমিয়া' গোত্র (Khatmiyah) যৌথভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তারা নিম্ন পরিষদে (Lower House) মোট ৯৭টি আসনের মধ্যে ৫২টি এবং সিনেটে ৩০টির মধ্যে ২১টি আসনে জয়লাভ করে। NUP-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আশাতীত (landslide) জয়লাভের মূলে ছিল গোঁড়া ধর্মীয় নেতা সাঈদ আবদুর রহমান আল-মাহদী পরিচালিত আনসার দলের প্রতি জনগণের অনাস্থা এবং বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিতৃষ্ণা। ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারি 'আসিকা' এবং 'খাতমিয়া' দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে NUP-এর প্রেসিডেন্ট ইসমাইল-আল-আযহারী একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। সুদানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আল-আযহারী মাহদী বিরোধী এবং ব্রিটিশ ও মিশর সমর্থক দলের মধ্যে সমঝোতা আনার চেষ্টা করেন। আল-আযহারী সরকার গঠনকরার পর প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে মনোনিবেশ করেন– (১) বেসামরিক প্রশাসনকে জাতীয়করণ; (২) সুদান থেকে ব্রিটিশ ও মিশরীয় বাহিনী প্রত্যাহার এবং (৩) আত্মনিয়ন্ত্রণ।

www.pathagar.com

বেসামরিক প্রশাসনের জাতীয়করণ ঃ ১৯৫৪ সালে আল-আযহারী প্রথম মন্ত্রীসভা গঠন করার পর ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের প্রভাবাধীন প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়ার যে শর্ত উল্লিখিত ছিল তার বলে প্রশাসনিক কাঠামো বিলুপ্ত করেন। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রতিরক্ষা ও পুলিশ বাহিনীতে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের স্থলে সুদানীদের নিযুক্ত করা হয়। নীতিগতভাবে প্রশাসনকে সুদানীকরণ (Sudanization of administration) করা যতটা সহজ ছিল কার্যক্ষেত্রে তত সহজ হয়নি। কারণ, সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের স্থলে অনভিজ্ঞ তরুণ প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ করার ফলে প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। যার ফলে স্থির হয় যে, ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে প্রাদেশিক ব্রিটিশ গভর্নরের অধীনস্থ কর্মচারীদের পর্যায়ক্রমে ছাঁটাই করা হবে। উপরন্তু, প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশ বিচারক এবং প্রকৌশলীদের পদচ্যুত করা হয়নি। এতদসত্ত্বেও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, সুদানের প্রশাসনে সুদানীদের অন্তর্ভুক্ত ও অংশগ্রহণের ফলে তাদের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনা, স্বাতন্ত্রবোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণের স্পৃহা জাগে। ১৯৫৫ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় ব্যতীত সুদানী সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম সুদানীদের উপর ন্যস্ত হয় এবং স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ফলে স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম হয়। ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে মিশর ও ব্রিটিশ বাহিনী সুদান ত্যাগ করে। প্রশাসনকে সুদানীকরণ এবং সুদান থেকে বিদেশী সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ফলে সুদানের নিযুক্ত ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল পদত্যাগ করেন এবং তার স্থলে পাঁচ জন নেতৃস্থানীয় সুদানীকে প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সুদান প্রজাতন্ত্র ঃ ১৯৫৩ সালে ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৯৫৬ সালে সুদান একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালের ৮ই অক্টোবর ইঙ্গ-মিশরীয় কনডোমিনিয়াম বাতিল ঘোষিত হয় এবং ১৯৫৩ সালে ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সুদান একটি নবগঠিত স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হতে থাকে। এই পূর্ণাঙ্গতা আসে ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী আলবী আযহারী পার্লামেন্টে মিশর এবং ব্রিটেনের স্বীকৃতপত্র পাঠ করে শুনান। ইঙ্গ-মিশরীয় কনডোমিনিয়াম থেকে মুক্তি লাভ করে ১৯৫৬ সালে সুদান একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

৩. মরক্কোর স্বাধীনতা আন্দোলন

ফ্রাঙ্কো-স্পেনীশ দখলে ঃ সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানগণ উত্তর আফ্রিকায় অভিযান করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের পর অন্যান্য উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ যেমন তিউনিসিয়া, লিবিয়া ও আলজিরিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও মরক্কো স্বাধীন ছিল। ১৫৪৪ সাল থেকে আলী সারিফি সা'দী এবং হাসানী ফিলালী বংশ মরক্কোয় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তিবর্গ উত্তর আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করে। উত্তর আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। ১৮৪৮ সালে ফ্রান্স তার উপনিবেশবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড, ইতালী, স্পেন ও জার্মানীকে পরাভূত করে মরক্কো দখল করে। সামরিক ও

www.pathagar.com

কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় এই দখল কায়েম হয়। ১৯০২ সালে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে এক সমঝোতায় ব্রিটেন, মিশর এবং ফ্রান্স মরক্কোয় আধিপত্য বিস্তার করে। স্পেন মরক্কোর উত্তর-পশ্চিমাংশে এক-দশমাংশ অঞ্চল দখল করে। ১৯০৪ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে স্পেনের এক চুক্তি হয়। কিন্তু মরক্কোর সুলতানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চুক্তি হয়নি। যার ফলে স্পেন অধিকৃত অঞ্চলে বলপূর্বক দখলের প্রশ্ন রয়ে যায়। মরক্কোর সুলতান মৌলে হাসানের (১৮৭৩-৯৪) মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র আবদুল আজীজ ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁর প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে ফরাসি আধিপত্য মরক্কোয় বিস্তার লাভ করে। ১৯০১ সালে ফরাসি উপনিবেশবাদী বাহিনী মরক্কো দখল করে এবং আবদুল আজীজের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯০৩ সালে ফরাসি শাসক দেলকাসে মরক্কোয় সংস্কার প্রবর্তন করেন। ১৯০৭ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে মরক্কোর ফরাসীর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে সুলতান আবদুল আজীজকে পদচ্যুত করে তার ভাই আবদুল হাফিজ ১৯০৮ সালে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯১২ সালে ফ্রান্স ও স্পেনের দখলে যাবার পর মরক্কো ৪৪ বছর ইউরোপীয় শক্তির বলয়ে থাকে। আবদুল হাফিজ দুর্বল সুলতান ছিলেন এবং ১৯১২ সালে তিনি ফেজের চুক্তি স্বাক্ষরিত করতে বাধ্য হন। ফরাসি দখলদার বাহিনী সামরিক শাসন প্রবর্তন করে সংস্কারমূলক কার্যকলাপ শুরু করে এবং ফরাসি রেসিডেন্ট জেনারেল সুলতানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বিদেশী আগ্রাসন থেকে মরক্কোকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ফরাসি সামরিক প্রশাসন রেসিডেন্ট মার্শাল লাউটে (Lyautey)। মরক্কোর ২০,০০০ মাইল সড়ক ১,০০০ মাইল রেলপথ এবং ১০০ বিমানবন্দর ও নৌবন্দর নির্মাণ করে মরক্কোর অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন।

রিফ সংঘর্ষ ঃ মরক্কো বিদেশী শাসনাধীনে আসার পর সর্বপ্রথম দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করেন রিফের কাজী মুহাম্মদ আবদুল করিম। ১৯১৯ সালে তিনি মরক্কোর স্বাধীনতাকামী জনগণকে স্পেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি স্পেনীশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল সিলভেস্টরকে পরাজিত করেন এবং জেনারেল প্রিমো দ্যা রিভেরাকে বিতাড়িত করেন। এরপর তিনি ১৯২১ সালে অধিকৃত অঞ্চলে রিফ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৫ সালে স্পেনীশ বাহিনী আবদুল করিমের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করে কিন্তু উপনিবেশ বিরোধী জনতার সমর্থনে আবদুল করিম তা প্রতিহত করেন। অবশেষে স্পেন ও ফ্রান্স মাদ্রিদের বৈঠকে রিফ এবং জাবালা উপজাতীয় অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। কিন্তু আবদুল করিম কেবল স্বায়ত্তশাসনে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ফলে ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত বাহিনী আবদুল করিমের বাহিনীকে ১৯২৬ সালে সেপ্টেম্বরে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে। ১৯২৬ সালে উদজায় (Ujda) এক সম্মেলন আহ্বান করা হয় কিন্তু তা বিফল হয়। ফলে ১৯২৬ সালের ২৭শে মে আবদুল করিম ফরাসি ও স্পেনীশ যৌথ বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালের মে পর্যন্ত কারাবরণ করেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আবদুল করিম একজন জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন।

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ; বৈষম্য ঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মরক্কো স্পেনীশ-ফরাসি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করে। আবদুল করিমের মত স্বাধীনচেতা, নির্ভীক ও দেশপ্রেমিক দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে রিফ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তাঁর ভাগ্য বিপর্যয় হয় তবুও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মরক্কোর জনগণ জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দু'টি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; প্রথমতঃ মরক্কোকে বিদেশী উপনিবেশবাদে পুষ্ট দখলদার বাহিনীর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ সাংবিধানিক সরকার গঠন করা। ১৯১২ সালের মার্চ থেকে ১৯৩০ সালের মে পর্যন্ত সমগ্র মরক্কোতে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হয়। স্পেনীশ-ফ্রেঞ্চ সামরিক বাহিনীকে উৎখাত করার জন্য বিভিন্ন শহর, নগর ও বন্দরে বিক্ষোভ ও আন্দোলন মিছিল পরিচালিত হতে থাকে। প্রচারপত্র বিলি করে মরক্কোবাসীদের এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অসন্তোষ, অচলাবস্থা ও নৈরাজ্যের ফলে ফরাসি সরকার দমন নীতি প্রয়োগ করে। জেনারেল লুউটের (Lyautey) স্থলে এম. স্টিগ (Steeg) রেসিডেন্টের পদে স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি উপনিবেশবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সমগ্র মরক্কোয় ফরাসি আধিপত্য প্রসারের জন্য স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং কলকারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু মরক্কোবাসীদের সাথে ইউরোপীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য প্রকট আকারে দেখা দেয়। উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় মরক্কোর ছাত্রদের স্পেন অথবা ফ্রান্সে যেতে হত। উচ্চশিক্ষা লাভ করেও মরক্কোবাসীরা দায়িত্বপূর্ণ সরকারি পদ পেত না। এই সমস্ত কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ হয়।

বুদ্ধিজীবীদের অবদান ঃ আবদুল করিমের সমগ্র বিপ্লব অঙ্কুরে বিনষ্ট হলে নির্যাতন ও নিপীড়নের ভয়ে মরক্কোর বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র নেতারা দেশ ত্যাগ করে বিদেশে আত্মগোপন করেন। ফ্রান্সে বসবাসকারী মরক্কোর ছাত্ররা বিদেশী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯২৫ সালে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে তারা মরক্কোর স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের জন্য শপথ গ্রহণ করে। বিদেশে দখলদার উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য মরক্কোর বহিষ্কৃত নেতারা ইস্তাম্বুলে প্যান-ইসলামিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ১৯১৭ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত একটি ইসলামী কংগ্রেসে তুরস্কের সুলতান এবং 'পার্টি অব ইউনিয়ন এণ্ড প্রগেস' উত্তর আফ্রিকার প্রতিনিধিবর্গকে মরক্কো থেকে ফরাসিদের বহিষ্কারের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এই ইসলামী কংগ্রেস উত্তর আফ্রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কে প্রতিনিধিদল পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ইসলামী কংগ্রেসে শেখ-আল-আতাবী মরক্কোর প্রতিনিধিত্ব করেন। এই অসাধারণ বুদ্ধিজীবীর প্রচারপত্র ও বক্তৃতা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয় এবং ফ্রান্স ও ফরাসি অধিকৃত আফ্রিকার দেশসমূহে বিতরণ করা হয়। এর ফলে তিনি ফরাসি সরকারের বিরাগভাজন হন এবং তাঁর অবর্তমানে সামরিক আদালতে তার বিচার হয়। তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাকে স্বদেশে

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্তন করতে বাধা দেওয়া হয়। তুর্কীর নৈতিক ও সামরিক সমর্থন কার্যকরী হয়নি কারণ তুর্কী সুলতান হেজাজ ও সিরিয়ায় ১৯১৬ সালের জুন মাসে মরক্কোর শরিফের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।

বার্বার আন্দোলন ঃ স্বাধীনচেতা বার্বার উপজাতি বিদেশী আগ্রাসন ও উপনিবেশবাদের ঘোর বিরোধী ছিল। তারা তাদের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করত না। ১৯১৬ সালে ফরাসি রেসিডেন্ট মার্শাল ল্যুউটে বিদ্বেষমূলকভাবে বার্বার মহিলাদের প্রাক-ইসলামী যুগের সামাজিক রীতি, আচার, অনুষ্ঠান পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, যা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল মারাত্মক দূষণীয়। একটি বার্বার ডিক্রী বা 'দাহির' এর মাধ্যমে প্রাক-ইসলামী উপজাতীয় সংস্থা বা 'জা'মার' পুনরায় আবির্ভাব হয়। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ফরাসি উপনিবেশবাদীরা মরক্কোকে অন্যান্য উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এই ঘৃণ্য নীতির সমালোচনা করে জনৈক লেখক বলেন, "Whatever practical value may have had it was undoubtedly intended to emphasize the difference between Berber speaking and Arabic speaking Moroccans and to prepare the way for the growth of a Berber sentiment which could be used as a counter-weight to Arab sentiment" যাহোক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জারীকৃত এই 'দাহির' বা আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। প্রথমত 'জামুর' আল-শাল-এর বার্বার মহিলাগণ এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে ফরাসি সামরিক সরকার তা বাতিল করতে বাধ্য করে। এই ঘৃণ্য আইনের বিরুদ্ধে মরক্কোসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম রাজধানীতে যেমন কায়রো, দামেস্ক, বাগদাদে বার্বারগণ বিক্ষোভ মিছিল করে। জনগণ সামাজিক পৃথকীকরণ (sequestration) নীতিরও বর্জন দাবী করে। প্রথম রেসিডেন্ট ল্যুউটে তার কর্মচারীদের আরবি ভাষা, ধর্ম শিক্ষা এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেন। ফরাসি দখলদার বাহিনী ধর্ম বহির্ভূত সামাজিক সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করে। বার্বারদের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসকারীদের থেকে পৃথক করার নীতির ফলেই মরক্কোর নবীন জাতীয়তাবাদীগণ ১৯১২ সালের ফেজ চুক্তি মোতাবেক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার করে সরাসরি শাসন নিরসনের দাবীকরে। তারা ফরাসিদের সমতুল্য পৌরসভায় আসনের জন্য আন্দোলন করে এবং সমান সামাজিক পদমর্যাদা দাবী করে। রাবাতে মুনাফার উপর কর আরোপিত হলে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। এই বিক্ষোভ কঠোর হস্তে দমন করা হয় এবং আন্দোলনকারীদের নির্বাসিত করা হয়। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত নিপীড়িত কৃষক শ্রেণী ফরাসি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। নতুন প্রেসিডেন্ট স্টাগ বলপূর্বক ভূমি দখলদারীত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার ও তাদের অনেককে ফাঁসি দেন। ফরাসি সরকার ১৯১২ সালে স্বাক্ষরিত প্রটেক্টরেট চুক্তির খেলাপ করলে ১৯২৬ সালে মরক্কোতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়।

www.pathagar.com

গণ-সশস্ত্র আন্দোলন ঃ ফরাসি সামরিক সরকার কর্তৃক অনুসৃত ভূমি সংস্কার নীতির কুফল এরূপ মারাত্মক আকারে প্রকাশ পেল যে শান্তিপূর্ণ গণ প্রতিরোধ সশস্ত্র বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়। মরক্কোবাসী ফরাসি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক দল গঠন করে। ১৯২৭ সালে আল্লাল আল-ফাসী এবং হাজী আহম্মদ বালাফ্রেজ নামক দু'জন তরুণ ছাত্র মরক্কোবাসী ফেজ এবং রাবাতে পৃথকভাবে দু'টি জাতীয়তাবাদী সংঘ গঠন করেন। অন্যদিকে মরক্কোর জনগণ ফরাসি অফিসারদের অপহরণ, হত্যা এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করতে থাকে। সুলতান মৌলে ইউসুফ প্রকাশ্যভাবে উৎপীড়ক রেসিডেন্ট স্টাগের অপসারণ দাবী করেন। এই আন্দোলনকে প্রশমিত করার জন্য ফরাসি সামরিক সরকার মরক্কো-ফরাসি সমিতি গঠনের প্রস্তাব দেয় কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।

সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলন ঃ স্পেনীশ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মরক্কোবাসী যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করে তার পশ্চাতে সামাজিক ও ধর্মীয় বিবর্তন অনেকাংশে দায়ী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবীতে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের লক্ষ্যে মরক্কোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কুতলাত-আল-আমাল-আল-ওয়াতানী' (Block for National Action)। উত্তর আফ্রিকায় আহমদ ইবন হাম্বল 'সালাফিয়া' বা Fundamentalist আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেন তা মরক্কোসহ উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে প্রবল প্রভাব ফেলে। সুলতান মৌলে সুলায়মানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা শেখ আবদুল্লাহ্ আল-সানুসীর প্রেরণায় ইসলামী রক্ষণশীল আন্দোলন জোরদার হয় এবং মিশরের অবিসংবাদী রাজনৈতিক নেতা আবদুহুর সঙ্গে যোগসাজসে গতিশীল হয়। এই সানুসী আন্দোলনের মূল মন্ত্র হচ্ছে দু'টি (১) সকল অপবিত্রতা থেকে ইসলামকে শুদ্ধ করে মুসলমানদের জীবনে এবং সমাজে আলোড়ন আনা এবং ধর্ম বহির্ভুত (secular) সকল চিন্তাধারা থেকে মুক্ত থেকে শরিয়ত মোতাবেক আত্মসংযম এবং শৃঙ্খলার দ্বারা জীবন গড়ে তোলা; (২) বিদেশী শাসনের পরিবর্তে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করা। ১৯৩৭ সালে আলজিরিয় শেখ সানুসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সানুসী ভ্রাতৃসংঘ (Sanusi Brotherhood) একদিকে যেমন ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনঃ জাগরণের আন্দোলন; অন্যদিকে এটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রকটভাবে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কোন অগ্রগতি হয়নি। দক্ষিণ ও পশ্চিম মরক্কোয় স্পেনীশ ও ফরাসি দমন নীতির ফলে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৩১ সালে স্পেনীশ মরক্কোতে শ্রমিক আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে কিন্তু স্পেনীশ পুলিশ বাহিনী Servicode Intervenciones মরক্কোর পুলিশ বাহিনী Makhzaniya-এর সহায়তায় স্পেনীশ পুলিশ প্রধানের নেতৃত্বে এই আন্দোলন নির্মূল করে। অন্যদিকে ১৯৩০ সালে ফেজ নগরীতে একটি ধর্মীয় সমাবেশে ফরাসি-স্পেনীশ দখলদার বাহিনী উৎখাতের জন্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দেন; কিন্তু দখলদার বাহিনী এই ধর্মীয় সমাবেশ ভেঙ্গে দেয়, বহু মুসল্লীকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করে। এতদসত্ত্বেও ১৯৩৫ সালে মরক্কো

www.pathagar.com

'জাতীয় একসন কমিটি' (Moroccan National Action Committee) (আল-হিযব আল-ওয়াতানী) গঠিত হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন চরমে উঠে তখন মরক্কো থেকে দু'টি জাতীয়তাবাদী মিশন মাদ্রিদে পাঠান হয়। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। মরক্কোর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস একটু জটিল। এর কারণ এই যে, এই মুসলিম অধ্যুষিত দেশটির উত্তর-পশ্চিমাংশ স্পেন এবং পূর্বাঞ্চল ফ্রান্সের দখলে ছিল। সুতরাং মরক্কো জাতীয়তাবাদীদের দুই ফ্রন্টে আন্দোলন করতে হয়।

মরক্কোর রাজনৈতিক দল (১৯৩৬) : স্পেন ও ফরাসি অধিকৃত মরক্কোয় স্বাধীনতাকামী জনগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে তাদের স্বাধীকার ও স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন পরিচালিত করে। সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম মরক্কো রাজনৈতিক দল হচ্ছে আবদুল খালেক টোরেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আল-ইসলা' (al-Islah) এবং এই সংগঠনের মুখপত্রের নাম ছিল 'আল-হুররীয়া' (Freedom)। আবদুল খালেকের সহকারী মাক্কী-আল-নাসিরীও একটি দল গঠন করেন এবং তার প্রকাশিত সংবাদপত্রের নাম 'আল-ওয়াহাদা আল-মাগরীবীয়া' (Moroccan Unity)। এই দু'টি রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যকলাপ জাতীয় সংগ্রাম ব্লক (National Action Block) ('কুতলা-আল-আমাল আল-ওয়াতানী') অপেক্ষা গতিশীল ছিল। আবদুল খালেকের প্রভাব ও ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে তাঁকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। মোহাম্মদ দাউদ, একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করেন। কিন্তু আবদুল খালেক এবং দাউদ উভয়ে স্বৈরাচারী নীতির ফলে পদত্যাগ করেন। স্পেনে গৃহযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মরক্কোর স্বাধীনতা আন্দোলন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। ১৯৪০ সালে টানজিয়ারে স্পেনীশ বাহিনী অবতরণ করলে মিত্রশক্তি প্রচণ্ড আপত্তি তোলে। ১৯৪০ সালে ফ্রান্স জার্মানীর দখলে চলে গেলে মিত্রশক্তি (Allies) মরক্কোর প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং সুলতান মোহাম্মদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়। যা'হোক স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল মোহাম্মদ ইবন আল-হাসান আল-ওয়াজানী প্রতিষ্ঠিত 'আল-হারাকাত আল-কাউমিয়া' (Popular movement)। ১৯৪৪ সালের মধ্যে জাতীয়তাবাদী বালাফ্রেজ (Balafrez) এবং আল্লাল আল-ফাসী প্রতিষ্ঠিত 'ইসতিকলাল পার্টি' (Istiqlal) মরক্কোর স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আল-ফাসী সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদের পরেই একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এই সংগঠনটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে; (১) 'হিযব আল-ইসতিকলাল' (Independent Party) এবং 'হিযব-আল-সুরা ওয়াল-ইসতিকলাল' (Party of Democratic Independence)। 'ফরাসি দখলদার বাহিনী আল-ফাসীর প্রভাবে শঙ্কিত হয়ে তাকে ফরাসি কলোনী গ্যারোতে নির্বাসিত করে। তিনি সেখানে নয় বছর নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করেন।

www.pathagar.com

পঞ্চম মোহাম্মদের অবদান

ক্ষমতা লাভ ঃ মরক্কোর স্বাধীনতা আন্দোলনে সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদের অবদান ছিল অপরিসীম। ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তির করতলগত মরক্কোর জনগণ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করে। দখলদার বাহিনী মরক্কোয় যে স্বৈরতন্ত্র পরিচালিত করে তার ফলেই সন্ত্রাসী আন্দোলন শুরু হয়। যদিও মরক্কো একটি প্রটেকটরেট ছিল তবুও সুলতান সিদি মোহাম্মদ ইবন ইউসুফ তার প্রাসাদে মুক্তিকামী মরক্কোবাসীদের জন্য সঙ্গোপনে আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯১২ সালে ফেজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর মৌলে আবদুল হাফিজ অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ভাই মৌলে ইউসুফ। ১৯২৭ সালে ইউসুফের মৃত্যু হলে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ সালতানাত লাভ করেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ধর্মভীরু হলেও আধুনিক ও প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি সন্ত্রাস অপেক্ষা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি ফরাসি দখলদার বাহিনীকে সমর্থন করলেও ১৯৪২ সাল থেকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ফরাসি সরকারের বিরোধিতা শুরু করেন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে যখন চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। মরক্কোর সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত কাসাব্লাঙ্কায় রুজভেল্ট এবং চার্চিল তাদের সামরিক উপদেষ্টাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন এবং এই বৈঠকেই রুজভেল্টের সঙ্গে পঞ্চম মোহাম্মদের সাক্ষাত হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ ১৯৪২ সালে ঘোষিত আটলান্টিক চার্টার এবং ফরাসি কলোনী মরক্কোর ব্রিটিশ ও আমেরিকান সেনাবাহিনীর অবস্থান এবং আরবি ভাষায় প্রচারণার ফলে মরক্কোর জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। জাতীয়তাবাদীগণ একটি ম্যানিফেস্টোতে তাদের দাবী পেশ করে। সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদ, ফরাসি রেসিডেন্ট জেনারেল জুইন (Juin) এবং মিত্র বাহিনীর কনসুল জেনারেলের নিকট দাবী পেশ করা হয়। ১৯৪৪ সালের ১১ই জানুয়ারি পেশকৃত এই ম্যানিফেস্টোই সাংবিধানিক আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ এবং এই আবেদনে জাতীয়তাবাদীগণ সুলতানকে ফরাসি প্রটেকটরেট চুক্তি বাতিলের দাবী জানায়। এ ছাড়া তারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের স্থলে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদের নিকট আবেদন জানায়। 'ইসতিকলাল' দলের মহাসচিব জাতীয়তাবাদী দলের নেতা আহম্মদ বালাফ্রাজকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে তিনি নির্বাসিত হন। এই ঘটনায় রাবাত ও ফেজ-এ দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৪৬ সালে ফরাসি সামরিক শাসক রেসিডেন্ট জেনারেল নির্বাসিত নেতা আল-ফাসীকে মুক্তি দেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। দেশে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া ফরাসি ভাষায় শিক্ষা সম্প্রসারণ করা হয় এবং স্থানীয় সরকারের সভায় সদস্য নির্বাচনের অনুমতি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং দখলদার বাহিনী থেকে মরক্কোকে মুক্ত করে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সুলতানের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ১৯৪৭ সালে

www.pathagar.com

তানজিয়ার সফরকালে সুলতান মরক্কোবাসীদের পূর্ণাঙ্গ সার্বভৌমত্বের অধিকার সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। তাঁর পুত্র যুবরাজ মৌলে হাসানও স্বাধীনতার স্বপক্ষে বক্তৃতা দেন। সুলতান মরক্কোকে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করার পক্ষপাতী ছিলেন। এ ধরনের ঘোষণায় ফরাসি রেসিডেন্ট বিচলিত হয়ে পড়ে।

সংগ্রামের ধারা ঃ মরক্কোয় ফরাসি উপনিবেশ এরূপ সম্প্রসারিত হয় যে ৮,৫০০,০০০ মুসলিম জনসংখ্যার পাশাপাশি প্রায় ৩০০,০০০ ফরাসি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী বসবাস করতে থাকে। এই বিরাট বিদেশী জনগোষ্ঠী ফরাসি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি ফ্রাঙ্কো-মরক্কো স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে কায়েমের চেষ্টা করেন। এর ফলে মরক্কোয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবার সম্ভাবনা ছিল না। মরক্কোর স্বাধীনতা আন্দোলনে কতিপয় বিপথগামী ফরাসি উপনিবেশের সমর্থক ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ফেজ-এর শরিফ আবদুল হাই কাত্তানী এবং মারাক্কেসের পাশা তিহামী আল-কালায়ী। কিন্তু তাঁদের জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপ কঠোর হস্তে দমন করা হয়। ফরাসি দখলদার বাহিনী আল-কালায়ীকে সমর্থন করায় মরক্কোবাসী ফরাসি আধিপত্য নির্মূল করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবে অবতীর্ণ হয়। যাহোক, 'ইসতিকলাল পার্টি' জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সুদূরপ্রসারী করার চেষ্টা করে। ১৯৪৬ সালে আবদুল খালেক মিশরে গমন করে উত্তর আফ্রিকার নির্বাসিত জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। আবদুল খালেক কায়রোতে নব গঠিত মগরীব ইউনিট অফিস স্থাপন করে জাতীয়তাবাদী শক্তি সংহত করেন। প্রথম রাজনৈতিক দল 'আল-ইসলাহ'-এর প্রধান হিসেবে তিনি আল-ফাসী পরিচালিত 'ইসতিকলাল পার্টি'র কর্মপদ্ধতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। যাহোক, ১৯৪৭ সালে মাহদী বেনোউনা (Mahdi Bennouna) নিউইয়র্কে গমন করে জাতিসংঘে মরক্কোর স্বাধীনতার প্রশ্ন আলোচনা করেন। ১৯৪৮ সালে ফরাসি ও স্পেনীশ কর্তৃপক্ষ সম্মিলিতভাবে মরক্কোর স্বাধীনতার প্রশ্ন আলোচনা করে। আলোচনাকারী দলকে মরক্কোয় প্রত্যাবর্তন করতে দেওয়া না হলে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টেটউনে (Tetuon) দাঙ্গা বাধে এবং কতিপয় সংগ্রামী ব্যক্তি শহীদ হয়। এরপর ফরাসি ও স্পেনীশ দখলদার বাহিনী নির্যাতন শুরু করে। গ্রেফতারকৃত আন্দোলনকারীদের ১৯৫১ সাল পর্যন্ত আটক রাখা হয়। যাহোক, স্পেনীশ ছোট লাট গারসিয়া ভেলিনো আবদুল খালেককে মিশর থেকে মরক্কোয় প্রর্ত্যাবর্তনের অনুমতি দেন। জাতীয়তাবাদীগণ 'আল-উম্মা' (al-Umma) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে তাদের আন্দোলনকে সুদূরপ্রসারী করে। স্পেনীশ অঞ্চলে আন্দোলন কার্যকরী হয় এবং আবদুল খালেককে মন্ত্রী সভার সদস্য নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীগণ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে থাকে। ইতিমধ্যে সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদ জাতীয়তাবাদীদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর নিজস্ব কোন রাজনৈতিক দল না থাকলেও ১৯৫০ সালে 'ইসতিকলাল পার্টি' থেকে কয়েকজনকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেন। সুলতান তাঁর নব গঠিত মন্ত্রীসভার ইস্তেহার ফরাসি সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। ১৯৫২ সালের ৩০শে মার্চ তিনি ফরাসি প্রেসিডেন্ট এরিউল

www.pathagar.com

(Auriol)-এর নিকট পত্র পাঠান। ফরাসি রেসিডেন্ট এই পদক্ষেপে শঙ্কিত হলেও তিনি নির্বিকার ছিলেন। ক্রমশঃ সমগ্র মরক্কোর ফরাসি ও স্পেনীশ অধ্যুষিত অঞ্চলে সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদ জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেন এবং তাঁর জনপ্রিয়তায় ফরাসি সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে।

দমন নীতি ঃ সুলতানের সিংহাসনচ্যুতি ঃ সুলতান মোহাম্মদ এবং ফরাসি সরকারের মধ্যে বিরোধ অবসম্ভাবী হয়ে পড়ে। সুলতান একটি স্বাধীন মরক্কো সরকার গঠন করার পরিকল্পনা করেন। অপরদিকে ফ্রান্স মরক্কোকে একটি উপনিবেশ হিসেবে রাখতে চায়। ফলে রেসিডেন্ট জুইন (Juin) তাঁর পদাতিক বাহিনী নিয়ে প্রাসাদ অবরোধ করে ইসতিকলাল পার্টির সদস্যদের দ্বারা গঠিত কাউন্সিল বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য করেন। এই দমন নীতির ফলে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। ১৯৫২ সালে কাসাব্লাঙ্কায় শ্রমিকদের দাঙ্গা হয়। এই সমস্ত ঘটনা আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত হলে ১৯৫২-৫৩ সালে জাতিসংঘে আরব রাষ্ট্রসমূহ মরক্কোর স্বাধীনতা প্রশ্নে আলাপ-আলোচনার জন্য দাবী জানায়। সাধারণ পরিষদে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই একটি খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর ফলে মরক্কোয় 'ইসতিকলাল পার্টির' সদস্যদের গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। ফরাসি রেসিডেন্সী প্রকাশ্যে সুলতানকে ফরাসি বিরোধী ও কমিউনিস্ট পন্থী (crypto-communist) বলে আখ্যায়িত করে। এ ছাড়া সুলতানের প্রধান শত্রু মরক্কোশের পাশা প্রভাবশালী উপজাতীয় নেতা তিহামী আল-কালাউয়ী ফরাসি রেসিডেন্সীর সঙ্গে রাজতন্ত্রের অবসানের জন্য ষড়যন্ত্র করেন। সুলতানের বিরুদ্ধে জন সমাবেশ আয়োজিত হয়। পরিশেষে পঞ্চম মোহাম্মদকে ১৯৫৩ সালের ২০শে মার্চ সিংহাসনচ্যুত করে স্বপরিবারে কর্সিকা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে মাদাগাস্কারে স্থানান্তরিত করা হয়। সিদি মোহাম্মদ ইবন আরাফা সাময়িকভাবে সিংহাসন দখল করেন। এই সময়ে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হয়। সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদের পদচ্যুতির ফলে সমগ্র মরক্কোতে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায় এবং মরক্কোবাসীগণ ফরাসিদের উপর হামলা করে। ফরাসি কর্তৃপক্ষ সুলতানকে পদচ্যুত করে ফ্রাঙ্কো-মরক্কো রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করে। কিন্তু স্বাধীনচেতা রাজনৈতিক দলসমূহ স্বাধীন ও সার্বভৌম মরক্কো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ দিন যাবৎ আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। এরূপ নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতি দখলদার বাহিনী এবং মরক্কোবাসীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ফরাসি ঔপনিবেশিকগণ ফরাসি কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করেনি। কারণ তারা দমন নীতির বিরোধী ছিল। কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্রে একজন ফরাসি শিল্পপতি এম.লেমগরে দুরবিউলকে (M. Lemaigre Durbeuil) রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে হত্যা করা হয়। ১৯৫৪ সালে পরিস্থিতি বিস্ফোরণমুখী হয়ে উঠলে ফরাসি সরকার এম. গ্রানভালকে (M. Grandval) নতুন রেসিডেন্ট জেনারেল নিযুক্ত করেন। ফরাসি অধিকৃত অঞ্চলে বিক্ষোভ ও দাঙ্গা পরিচালিত হলেও স্পেনীশ অধিকৃত এলাকায় কর্তৃপক্ষের নমনীয় মনোভাবের জন্য অপেক্ষাকৃত শান্তি বিরাজ করে। উপরন্তু, স্পেনীশ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুল খালেক তার আন্দোলনে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার

www.pathagar.com

সম্মুখীন হননি। এতদসত্ত্বেও মরক্কো বিদেশী দখলদার বাহিনীর অধিকারে ছিল এবং সুলতানের অবর্তমানে পরিস্থিতি ক্রমশঃ অবনতি হতে থাকে।

জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ঃ ফরাসি সরকারের স্বৈরাচারী ও নির্যাতনমূলক নীতির ফলে মরক্কোবাসী স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এবং তারা সংঘবদ্ধভাবে সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েমের প্রয়াস পান। কিন্তু নতুন রেসিডেন্ট-জেনারেল কঠোর হস্তে সকল প্রকার বিক্ষোভ, মিছিল, আন্দোলন নিষিদ্ধ করেন। জনগণের এবং ফরাসি উপনিবেশিকদের চাপে তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদের সিংহাসন চ্যুতির দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাদলায় আয়োজিত সভায় দাঙ্গা শুরু হয় এবং অনেক ফরাসিবাসী নিহত হয়। ১৯৫৫ সালের ১লা নভেম্বর লিবারেশন আর্মি রিফ এবং মিডল আটলাসের ফরাসি ছাউনী আক্রমণ করে। জনগণ এবং উপজাতীয় নেতারা সুলতানের প্রত্যাবর্তনের দাবী জানায়। এমন কি সাময়িকভাবে সিংহাসন দখলকারী মারাক্কোসের পাশা তিহামি আল-কালাউয়ি সুলতানের অনুকূলে পদত্যাগ করতে রাজি হন। মরক্কোর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ফরাসি কলনিষ্টগণ (colonists) বা ঔপনিবেশিকগণ সমর্থন দান করে এবং ফলে ফরাসি সরকার জাতীয়তাবাদীদের দাবী পরীক্ষার জন্য আইলা বেন-এ (Aix-les-Bains) একটি সভা আহ্বান করেন। মূলতঃ গ্রামাঞ্চলে লিবারেশন আর্মি এবং শহরাঞ্চলে ইসতিকলাল পার্টির প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলেই মরক্কো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।ফরাসি কর্তৃপক্ষ একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনে সম্মত হন এবং ফেজের পাশা বেন স্লিমান (Ben Slimane) এবং ডেমোক্রাটিক ইনডিপেনডেন্ট পার্টির হাসান ওয়াযানী এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত হন। এদিকে ইসতিকলাল পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়নিস্টগণ সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদের প্রত্যাবর্তন এবং স্বাধীনতা দাবী করে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসেও বিক্ষোভ ও আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ইত্যবসরে আর্মি কমিশনের প্রেসিডেন্ট এবং মরক্কোর প্রতিনিধিদলের নেতা সিদি মোহাম্মদ ইবন আরাফাতের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফরাসি উপনিবেশদল রেসিডেন্ট-জেনারেলের নিকট দাবী জানায় যে, তারা যেন সুলতানের নিকট থেকে তাঁর অনুমোদন লাভ করেন। জন বিক্ষোভের চাপে সুলতানকে দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়। রাজনৈতিক নিষ্পেশন, দমননীতি, জনবিক্ষোভ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সুলতান মোহাম্মদকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ফরাসি সরকার অনুমতি দেয়।

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৫৫ সালের ১৮ই নভেম্বর সিংহাসনচ্যুত ও নির্বাসিত সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদ রাবাতে ফিরে আসেন। তিনি সম্রাট (His Majesty) নামে আখ্যায়িত হন এবং একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অবশ্য অনেকাংশে ফরাসি সরকারের উপর মরক্কো নির্ভরশীল ছিল। সুলতানের বিরোধী দলগুলো এবং ব্যক্তিবর্গ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; ইসতিকলাল পার্টি সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৬ সালের ২রা মার্চ মরক্কোকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সুলতান একাধিক্রমে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। স্বাধীনতা ঘোষণায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হল। মরক্কো একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। (Constitutional Monarchy replaced the Theocratic autocracy—an innovation in the political history of Morocco"—S.M. Imamuddin)। স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কো ১৯৫৬ সালের ৭ই এপ্রিল একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে মরক্কোর স্বাধীনতাকে স্বীকার করেন।

মরক্কোর স্বাধীনতা আন্দোলনের নেপথ্য কাহিনী হচ্ছে এই যে, নির্বাসিত সুলতানকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব করা হলে সুলতান একটি বিদেশী দখলদার বাহিনীর প্রটেকটরেটের সুলতান হিসেবে নয় বরং একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মরক্কোয় প্রত্যাবর্তন করতে চান। ফলে ফরাসি সরকার মরক্কো থেকে প্রটেকটরেট বাতিল করতে বাধ্য হয় এবং মরক্কো একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

৪. আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন

অটমান সাম্রাজ্যভুক্ত ঃ ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আলজিরিয়া অটমান বা তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এই দীর্ঘ সময় আলজিরিয়ায় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলে এবং আধিপত্য পাশাদের কাছ থেকে ক্রমশঃ আগা (Agha) এবং পরে দে-দের (Deys) নিকট হস্তান্তরীত হয়। দে-দের দু'টি ইউরোপীয় শক্তির মোকাবেলা করতে হয়–একটি জেনেসারী বা আনাতোলিয় 'ওযাক' (Ojacs), যাদের সংখ্যা সপ্তদশ শতাব্দীতে ৫০০০-তে কমে আসে, অপরটি "তেযফাত-আল রাইস" বা Corporation of Corsair Captains"। কর্পোরেশন রাজস্ব ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। অটমান যুগে আলজিরিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় বহু ইউরোপীয় রাষ্ট্রের। প্রশাসন পরিচালিত করত প্রাদেশিক গভর্নরেরা বা বে-রা (Beys)

ফরাসি উপনিবেশ ঃ উত্তর আফ্রিকায় আলজিরিয়া ছিল ফরাসিদের সর্ববৃহৎ কলোনী। আলজিরিয়া ফ্রান্সকে গম সরবরাহ করত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ফরাসি সরকার প্রধান সম্রাট দশম চার্লস মূল্য পরিশোধ না করে দে-হোসেনের (Dey Husain) বিরুদ্ধে একটি নৌ-বহর পাঠান। ১৮৩০ সালের ১৪ই জুন ফরাসি নৌবহর আলজিরিয়ায় নোঙ্গর করে। ৩৭,০০০ জন নৌযোদ্ধাসহ ফরাসি নৌবহরটি আক্রমণ পরিচালিত করে এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেও দে-হোসেন ফরাসি আগ্রাসন রোধ করতে পারেননি। ৫ই জুলাই তিনি পরাজয় বরণ করলে ১৫,০০০ জেনিসারীসহ তাঁকে এশিয়া মাইনরে পাঠান হয়। দে ফরাসি বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এই শর্তে যে, আলজিরিয়ায় ইসলাম ধর্ম, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার অব্যহত থাকবে। ১৯৪৭ সালে 'Statute of Algeria' তে অন্তর্ভুক্ত হলেও ধর্ম নিরপেক্ষতা পালিত হয়নি।

বিপ্লবী আন্দোলন ঃ আলজিরিয়ায় ফরাসি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৩০ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা সম্প্রসারণ

www.pathagar.com

নীতির বশবর্তী হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এই সম্প্রসারণবাদকে প্রতিহত করার জন্য আহমদ তিজান্নী (Ahmed Tijanxni) একটি সংগঠন তৈরি করেন। তিজান্নী ব্রাদারহুড নামে এই সংগঠনটির মাধ্যমে ফরাসি সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিজান্নীর ব্রাদারহুডের একজন নবীন ও বিপ্লবী সদস্য ছিলেন পশ্চিম আলজিরিয়বাসী আমীর আবদুল কাদির। তিনি ১৮৩২ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছর ফরাসি দখলদার ও হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি শক্তিশালী ফরাসি বাহিনীর কাছে বিপর্যস্ত হয়ে নির্বাসিত হন। এরপর আলজিরিয়ার জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠে এবং ১৮৫০ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত কাবিলিয়ায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৯০১ সালে দক্ষিণ ওরানে (Oran) এই প্রতিরোধ আন্দোলন চলতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফরাসি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষ অব্যহত থাকে এবং এই বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আবদুল কাদের মোকরাণী বোয়ামামা এবং লাল্লা ফাতেমা। ফরাসি বাহিনী নৃশংসভাবে এই আন্দোলন দমন করে।

অর্থনৈতিক শোষণ ঃ আলজিরিয়ায় ইউরোপীয়দের আগমনে বিদেশী দখলদার বাহিনী অর্থনৈতিক শোষণ শুরু করে। জনসংখ্যার হার বিচার করলে ১২ জন আলজিরিয়ার বরাবর মাত্র ১ জন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক ছিল, কিন্তু স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী আলজিরিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ জমি ভোগ দখল করত এবং দ্রাক্ষা ক্ষেত্রগুলোও তাদের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত আলজিরিয়ায় ফরাসি, ইতালী, স্পেনীস, মাল্টাবাসী বিদেশীগণ স্বায়ত্তশাসিত কোলনে (colon) বা অঞ্চলে বসবাস করত। ১৯৫৩ সালে ৭০ জন ভূস্বামী কোলনে বসবাস করত এবং তারা প্রায় ৫০০,০০০ একর জমির মালিক ছিল। এই সমস্ত ভূমি পূর্বে তুর্কী ও আগাদের অধিকারে ছিল কিন্তু ফরাসি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর এগুলো ফরাসি সৈন্য ও কর্মকর্তাদের দখলে চলে যায়। তারা দীর্ঘ পাঁচ বছর সরকারকে কোন রাজস্ব প্রদান না করে ভোগ দখল করে। এই ভূস্বামী শ্রেণী আলজিরিয়ার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। তারাই ব্যাংক ও সিপিং পরিচালনা করত। ক্রমশঃ এই সুবিধাভোগকারী গোষ্ঠী অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠে এবং ফরাসি সরকারের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আলজিরিয়া ফরাসি দখলদার বাহিনী কর্তৃক শোষিত হয়। কোলনগুলোই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে। এসব বিপ্লবী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই সমস্ত বিদেশী দখলদার বাহিনীর করাল গ্রাস থেকে দেশকে রক্ষা করা। ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী নীতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, তা ঐতিহ্যবাহী আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হতে থাকে। শুধুমাত্র সরকারি কাজের জন্য বিদেশী ভাষা হিসেবে ফরাসি শাসকগোষ্ঠী আরবি প্রচলন অব্যাহত রাখে। যে সমস্ত স্কুলে ফরাসি ও আলজিরিয় ছাত্রদের সংখ্যানুপাত ছিল ১ ঃ ১০ অথবা ১ ঃ ১২ কেবলমাত্র সেখানেই আরবি ভাষার চর্চা হত। অবাধ শিক্ষা ও ব্যহত হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে ফরাসিগণ এক ঘৃণ্য নীতি অবলম্বন করে যার ফলে আলজিরিয়গণ

www.pathagar.com

তাদের বংশ পরিচয় ও প্রাচীন ইতিহাস ভুলে যেতে থাকে। তাদেরকে বলা হত যে তারা 'গল' (Gaul) জাতি থেকে উদ্ভুত। ফরাসি কোলন হিসেবে আলজিরিয়া ছিল খুবই সমৃদ্ধ এবং ফরাসি সরকার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করে শোষণের এক ঘৃণ্য অধ্যায়ের সূচনা করে। ফরাসি সরকার বাহ্যিকভাবে একটি গণ পরিষদ গঠন করে যাতে ৫০% ছিল ফরাসি ঔপনিবেশিক এবং বাকী ৫০% আলজিরিয় মুসলমান, যদিও জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ১ ঃ ১২। ফরাসি সরকার আলজিরিয়াকে ফ্রান্সের অংশ মনে করত এবং জাতিগত বৈষম্যের জন্যই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক আন্দোলন শুরু হয়।

আলজিরিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঃ

আদি সংগঠন ঃ সাম্রাজ্যবাদী ফরাসি সরকারের শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতির ফলেই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আলজিরিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯২০ সালে এই আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ফরাসি রিজেন্সীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীগণ অস্ত্র ধারণ করে। ফরাসি ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে প্রধানত কয়েকটি অভিযোগ ছিল; (১) বলপূর্বক দখল; (২) অর্থনৈতিক শোষণ; (৩) আরবি ভাষা ও সংস্কৃতিক প্রতি অনুদার মনোভাব; (৪) আরবির স্থলে ফরাসি ভাষার প্রাধান্য; (৫) আলজিরিয়দের জাতিগত মর্যাদা লোপের চেষ্টা (depersonalization); (৬) জাতীয় আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি (denationalization); (৭) ফরাসি এবং আলজিরিয় মুসলমানদের জাতিগত বৈষম্য। ১৯২১ সালে আলজিরিয়ায় দীর্ঘ দিন পরে আবদুল কাদিরের পৌত্র আমির খালিদ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। দেশপ্রেমিক খালিদ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুষ্টিমেয় কতিপয় আলজিরিয় মুসলমান নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সরকারের শোষণ নীতি এবং সামন্তবাদী সমাজের অনাচার সম্বন্ধে জনগণকে অভিহিত করতে থাকেন। তিনি তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য ১৯২৩ সালে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। Etoile Nord Africaine অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকা সংস্থা আলজিরিয়ায় স্থাপিত হয় এবং এর অনুকরণে ১৯৩৬ সালে প্যারিসে আলজিরিয় শ্রমিকবৃন্দ Parti Populaire Africaine অর্থাৎ পপুলার আফ্রিকান পার্টি গঠিত হয়।

সর্বদলীয় প্রতিনিধিত্ব ঃ ফরাসি বিরোধী আলজিরিয় আন্দোলনের শুরু হয় প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৬ সালে যখন ড. বেন জালুলের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের সমাবেশে একটি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাসভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ফরাসি সরকারের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হবে এবং বিভিন্ন দাবী পেশ করা হবে। এই সমস্ত দাবীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য (১) অধিক সংখ্যক আলজিরিয় মুসলমানদের পার্লামেন্টে সদস্য নির্বাচিত করতে হবে এবং বর্তমানের মুসলিম ও ফরাসিদের ৫০-৫০ ভাগ কোটা বিলুপ্ত করতে হবে; (২) আরবিকে একমাত্র আলজিরিয়ার রাষ্ট্রীয় ও সরকারি ভাষার মর্যাদা দিতে হবে; (৩) প্রশাসনিক অবকাঠামো পুনর্গঠিত করতে হবে। প্যারিসে অবস্থানকালে এই প্রতিনিধিদল ফরাসি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী লুউ ব্লুম (Leon Blum) ধৈর্য্য সহকারে তাদের দাবীর

www.pathagar.com

কথা শ্রবণ করেন কিন্তু সেগুলো মেনে নেননি। বরং স্বৈরাচারী ও দমন নীতির বশবর্তী হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলে কুঠারঘাত করেন। ১৯২৫ সালে উত্তর আফ্রিকায় বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য আলজিরিয়া, মরোক্কা ও তিউসিনিয়া সংঘবদ্ধভাবে স্বাধীনতা ও স্বাধীকার আন্দোলন পরিচালিত হয়। উত্তর আফ্রিকা স্টার (North Africa Star) নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেরণা দেয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ফরাসি সরকার এই সংগঠনটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অতঃপর ১৯৩৭ সালে আলজিরিয় গণতন্ত্রী দল (Algerian Peoples Party) গঠিত হয়। ফরাসি সরকার দু'বছর পর এটি বিলোপ সাধন করেন।

যুদ্ধকালীন সময়ে আলজিরিয়া ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আলজিরিয় মুসলমানগণ স্বৈরাচারী ভিকি (Vichy) শাসনামলে নির্যাতিত হয়। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মেজর জেরাল্ডা অসংখ্য আলজিরিয় অধিবাসীদের নিধন করেন। উল্লেখ্য যে, মিত্র পক্ষের সাহায্যে বহু আলজিরিয় সৈন্য বিশ্বযুদ্ধ অংশগ্রহণ করে এবং নাযী জার্মানীর কবল থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধারের জন্য ফরাসিদের পাশাপাশি সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ১৯৪৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর জেনারেল চার্লস ডি গল (De Gaulle) আলজিরিয় মুসলমানদের অবদানের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন। ফ্রান্স স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৪৪ সালে ৭ই মার্চ এক আইন জারী করে কতিপয় মুসলমানদের ফরাসি নাগরিকত্ব দান করে এবং ১৯৪৬ সালে ঘোষিত আইন বলে মুসলমানদের জন্য ফরাসি জাতীয় পরিষদে ১৫টি সাধারণ আসন এবং ফরাসি রিপাবলিকান কাউন্সিলে ৭টি সিনেটরের পদ সংরক্ষিত হয়। ১৯৪৫ সালের ৮ই মে বিজয় উৎসবকালে ৫০,০০০ আলজিরিয় মুসলমান সাটিফে আলজিরিয় পতাকাসহ মিছিল বের করলে ফরাসি কর্তৃপক্ষ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মুসলিম আন্দোলনকারীগণ এই বর্বরতায় ক্ষিপ্ত হয়ে প্রায় একশত ফরাসি নাগরিকদের হত্যা করে। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ফরাসি কর্তৃপক্ষ নির্যাতনমূলক হামলা করে প্রায় ১০,০০০ মুসলমান গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এর ফলে গণবিক্ষোভ ও বিদ্রোহ শুরু হয় যা মরক্কোয় রিফ যুদ্ধের পরেই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই গণবিক্ষোভ বর্বরতার সাথে দমন করা হলেও ১৯৫৪ সালে পুনরায় রাজনৈতিক গোলযোগ মারাত্মকভাবে প্রকাশ পায়। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ফরাসি সরকার ১৯৪৬-৪৭ সালে আলজিরিয়ায় সাংবিধানিক পরিবর্তনের অঙ্গিকার করে এবং অচিরেই একটি আলজিরিয় গণপরিষদ গঠিত হয়। ফরাসি সরকার আলজিরিয়দের ফরাসি নাগরিকত্ব প্রদান করতে চাইলে ফরাসি ঔপনিবেশিকগণ বাধা দান করে।

রাজনৈতিক সংগঠন ঃ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আলজিরিয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাধে। যে সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতাকামী দল গণআন্দোলনে শরিক হয় তাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বিশেষ কয়েকটি দল। ১৯২৩ সালে আবদুল কাদিরের পৌত্র আমির খালেদ Etoile Nord Africaine (ENA) নামে প্যারিসে একটি সংগঠন তৈরি করে প্রবাসী আলজিরিয়দের সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস পান। এরপর কামাল আতাতুর্কের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে প্যারিসে ১৯৩৬

www.pathagar.com

সালে Parti-Populaire Africaine (PPA) গঠিত হয়। কিন্তু তাদের আন্দোলন উপ নিবেশবাদী ফরাসি সরকারের নির্যাতনের ফলে বিশেষ কার্যকরী হয়নি। দীর্ঘ নয় বছরে স্বাধীনতা আন্দোলন স্তব্ধ ছিল। এরপর ১৯৪৬-৪৭ সালে আলজিরিয় গণপরিষদ গঠিত হলে ফরহাত আব্বাস নামে একজন আলজিরিয় নেতা Union Democratique du Manifeste Algerien (UDMA) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনি প্যারিসের জাতীয় সাংবিধানিক পরিষদে আলজিরিয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। এই রিপাবলিকটিকে একটি ফেডারেল ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয় কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। অবশ্য ফরাসি জাতীয় পরিষদ Statute of Algeria বা আলজিরিয় সম্পর্কিত আইন ১৯৪৭ সালে পাস করা হয়, যাতে সামান্য অর্থনৈতিক ক্ষমতাসহ একটি পরিষদ গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর ১৯৫৪ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬২ সালের মার্চ পর্যন্ত আলজিরিয়ার ফরাসি দখলদার বাহিনী ও সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড এবং নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন চলতে থাকে। ফরাসি গভর্নর জেনারেল জ্যাকুইস সসটেল (Jacques Soustelle) এই বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও সশস্ত্র আন্দোলন ১৯৫৫ সালে দমন করতে পারেননি। এরপর আরও দুটি রাজনৈতিক সংগঠন আন্দোলনকে গতিশীল করার চেষ্টা করে যথা Section Francaise del internationale Quvriere (SFIQ) এবং The Algerian Communist Party (CMA) কিন্তু জনসমর্থনের অভাবে এই দু'টি দল তাদের কার্যক্রম সুদূরপ্রসারী করতে পারেনি। এর মূল কারণ তারা উগ্রপন্থী (Radical) এবং কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিল। ফরাসি ঔপনিবেশবাদ (Colonialism) সমগ্র উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহে শিকড় গাঁড়ে, বিশেষ করে আলজিরিয়া, মরক্কো আলজিরিয়া এবং তিউনিসিয়ায় ফরাসি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়। আলজিরিয়ার এই আন্দোলনের মূল প্রেরণা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ফরাসি সরকারকে উচ্ছেদ করে প্রাচ্য ঐতিহ্য ও কৃষ্টি ভিত্তিক এবং ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন। Mouvement Pourle Triomphe des Libertes Democratiques (M.T.L.D) অর্থাৎ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত আন্দোলনটি পাশ্চাত্য ঘেষা ফরহাদ আব্বাসের UDMA-এ বিপরীত প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৯৩৬ সালে ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তন করে মিসালী হাজী ENA এর স্থলে Parti Populaire Algerien (PPA) নামে একটি সংগঠন স্থাপন করে। কিন্তু হাজী গণ-সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন এবং ১৯৩৯ সালে তার সংগঠনটি বিলুপ্ত হয়। বাতিল ঘোষিত হলেও হাজী MTLD-এর ছত্রছায়ায় ১৯৪৮ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জাতীয় পরিষদে কয়েকটি আসন লাভ করেন। আলজিরিয় গণতন্ত্রী পার্টির মূল অবদান ছিল সার্বজনীন নির্বাচনের ভিত্তিতে একটি সংবিধানিক পরিষদ গঠনের দাবী। ১৯৫০ সালে স্বাধীনতাকামী একটি গুপ্ত সংগঠন আবির্ভূত হয় যার নাম ছিল Organisation Secrete (OS) এই সংগঠন ফরাসি আধিপত্য নিরসনের জন্য সন্ত্রাসী আন্দোলন পরিচালনা করে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট চার্লস দ্যা গল ১৯৪৪ সালের ৭ই মার্চ একটি আইন

www.pathagar.com

জারী করে অফরাসিদের ফরাসি নাগরিকত্ব দানের অঙ্গীকার করেন। ১৯৪৬ সালে ফরাসি জাতীয় পরিষদে আলজিরিয়দের জন্য ১৫টি এবং সিনেটের কাউন্সিলে ৭টি আসন সংরক্ষিত হয়। সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ফরহাত আব্বাস Aims du Manifests Ect la Libererte (AML) গঠন করেন এবং দু'বছরের মধ্যে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৫,০০,০০০ এ দাঁড়ায়। এরপর তিনি UDMA প্রতিষ্ঠা করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সুদূরপ্রসারী করেন। UDMA ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে সংবিধান পরিষদের ১৩টির মধ্যে ১১টি এবং জাতীয় পরিষদে ১৫টির মধ্যে ১০টি আসন লাভ করে।

যৌথ ফ্রন্ট ঃ ফরাসি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য আলজিরিয়ার কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন যৌথভাবে ফ্রন্ট গঠন করে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫১ সালে MTLD এবং UDMA, PPA এবং উলেমা সংস্থার সাথে একত্রিত হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ফরাসি সরকারি প্রভাবে তারা উপযুক্ত সংখ্যক আসন গ্রহণে ব্যর্থ হলে ১৯৫২ সালে এই ফ্রন্ট বিলুপ্ত হয়। আলজিরিয় রাজনৈতিক গগনে রক্ষণশীল উলেমা সম্প্রদায়ের উদয় হয় এবং এই সংস্থার ১৯৩৫ সালে শেখ আবদুল হামিদ বিন বাদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। শুদ্ধিকরণ নীতি বশবর্তী হয়ে আলজিরিয়ায় প্রাচীন ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ রক্ষা এবং আরবি ভাষার সার্বজনীন প্রচলনের জন্য উলেমা দল বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি ধর্মীয় নেতা শেখ বশির ব্রাহিমী কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই সংগঠন আলজিরিয়া, মরক্কো ও তিউনিসিয়ায় জাতীয়তাবাদীদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করে। এই সংস্থার উপদেষ্টা ছিলেন প্রখ্যাত লেখক ও চিন্তাবিদ তৌফিক মাদানী। ১৯৫২ সালে যৌথ ফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবার পর ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা ও অসহযোগিতার ফলে আলজিরিয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্যহত হয়। ১৯৫৪ সালে কতিপয় নবীন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি সংগঠন স্থাপন করেন। Comittee Revolutionaired Unite etd (CRUA)-এর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল নয়জন, যার মধ্যে ছিলেন হোসেন আহম্মদ, আহমদ বেন বেল্লা, মোহাম্মদ লাবরী বেন ম'হিন্দী, মুহম্মদ বুদায়েফ, মোস্তফা বিন বুদায়েফ, রাবাত বিতাত ও আরও অনেকে। ১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বর এই সংগঠনের প্ররোচনায় আওরেস (Aures), কনসস্টানটাইন এবং কাবিলা অঞ্চলে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। এই বিপ্লব কঠোর হস্তে দমন করা হলে আলজিরিয় জাতীয়তাবাদীগণ ফরাসি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম আরও জোরদার করে। এই সময় কমিউনিস্টদেরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে আলজিয়ার্সে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের (রাশিয়া) কনসুলেট সরকারের বিরোধিতার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফরাসি সরকারের অনমনীয় মনোভাব এবং পরবর্তী মুসলিম দেশসমূহের বিশেষ করে মরক্কোয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে আলজিরিয়গণ যৌথ ফ্রন্ট গঠন করেন।

www.pathagar.com

FLN ঃ ১৯৫৪ সালে The Front de Liberation Nationale (FLN) নামে পরিচিত এই যৌথ রাজনৈতিক সংস্থা গেরিলা পদ্ধতিতে ফরাসি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই ফ্রন্টের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আলজিরিয়া থেকে বিদেশীদের বিতাড়িত করে আলজিরিয়ায় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম সরকার গঠন। ১৯৫৫ সালের মধ্যে প্রায় ৫০,০০০ গেরিলা এই সংস্থায় যোগদান করে। ১৯৫৬ সালের মধ্যে আলজিরিয় বুদ্ধিজীবীরাও এই সংগঠনকে সমর্থন করে। এই সংস্থার প্রধান দফতর স্থাপিত হয় কায়রোতে। FLN-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয় যা Army Liberation Nationale (ALN) নামে পরিচিত ছিল। এই দুটি সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়, যার নাম ছিল Committee of Co-operation and Executive (CCE)। ফরাসি কর্তৃপক্ষ কঠোর হস্তে এই সংগঠনের কার্যকলাপ দমন করার চেষ্টা করে। কিন্তু FLN-এর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে সমর্থন লাভ করে। FLN দামেস্ক ও জাকার্তা ছাড়াও নিউইয়র্ক এবং হেলসিংকিতে তথ্য দফতর স্থাপন করে। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার ১৯৫৬ সালে গণপরিষদ বাতিল করে সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে। এর ফলেই FLN তার অঙ্গ সংস্থা ALN-এর মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়।

গেরিলা যুদ্ধ ঃ সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হলে FLN-এর পক্ষে একমাত্র গেরিলা যুদ্ধের পথই উন্মুক্ত থাকে। তিউসিন ও মরক্কোর জাতীয়তাবাদীদের কর্মপ্রণালী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কায়রোতে অবস্থিত CRUA-এর মিসালী সদস্যবর্গ গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ১৯৫৪ সালে ১লা নভেম্বর (All Saints Day) তারা সশস্ত্র বিপ্লবে অবতীর্ণ হবে। এই সিদ্ধান্ত আলজিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত FLN এবং ALN গ্রহণ করে। উক্ত তারিখের মধ্যরাতে তিউনিসিয়ার সীমানা থেকে ওরান পর্যন্ত সমগ্র আলজিরিয়া বারুদের মত বিক্ষোভে জ্বলে উঠে। এক সাথে প্রায় ত্রিশটি ফরাসি ঘাঁটি, সংস্থা, বাণিজ্য কেন্দ্র পুলিশ দফতরে আক্রমণ চালান হয়। গেরিলা কায়দায় প্রতিটি দলের প্রায় ১ থেকে ৩০০০ সশস্ত্র বিপ্লবী রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফ, রেলপথ ধ্বংস করে, যানবাহন অগ্নিদগ্ধ করে এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে আক্রমণকরে হত্যা করে। রাটনায় দশজন ইউরোপীয় নিহত হয়। পোস্টঅফিস, কৃষি খামার, পেট্রোল পাম্প জ্বালিয়ে দিলে এক অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। ঐ রাত্রে একটি প্রচারপত্র বিলি করে ফরাসি কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সার্বভৌম আলজিরিয় রাষ্ট্রের দাবী জানান হয়। তারা আরব লীগ এবং ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের সঙ্গে একাত্বতার জন্য Unity of North Africa ঘোষণা করে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ফরাসি সরকার বর্বরোচিতভাবে MTLD-কে দায়ী করে আন্দোলন নির্মুল করার চেষ্টা করে। MTLD বিলুপ্ত করা হয় এবং নৃশংসভাবে ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় ২০,০০০ আলজিরিয়দের হত্যা করা হয়। সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়। এই

www.pathagar.com

গণ-বিক্ষোভ ফরাসি সরকারকে বিচলিত করে এবং নতুন রেসিডেন্ট জেনারেল জ্যাকুস সাউসটল (Jacques Soustelle) দায়িত্বভার গ্রহণ করে সংগ্রাম প্রশমিত করার চেষ্টা করেন। তিনি অসংখ্য জাতীয়তাবাদী আলজিরিয়কে গ্রেফতার করে বন্দী শিবিরে (Concentration camp) আটক রাখেন। তাদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয় এবং এই নির্যাতন তদন্তের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিটি আলজিরিয়ায় আসে। মানবাধিকার আইন লংঘন বিষয়ে তারা তদন্ত চালায়। এই ১৯৫৪ সালের গেরিলা আন্দোলন ফরাসি স্বৈরাচারের ফলে সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়।

আলজিরিয় বিপ্লব ঃ ফরাসি দখলদার বাহিনীর উৎপীড়ন এবং বৈষম্যমূলক প্রশাসন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে ১৯৫৫ সালের ২০শে আগস্ট FLN পুনরায় ইউরোপীয়দের উপর আক্রমণ চালায়। আইন আবিদ এবং আল-হারাই খনি অঞ্চলের ফরাসিদের হত্যা করা হয়। প্রায় ৩৭৪ জন ফরাসি দিউফে (Djeurf) এবং ৬০০ বেল গাফারে (Bel Ghafer)-এ নিহত হয়। ফরাসি নৌ ও বিমান বহর আলজিরিয়ার সৈকতে অবস্থিত ও নগরসমূহে বোমা বর্ষণ করে এবং এমন কি তারা বিষাক্ত গ্যাসও ব্যবহার করে। এরূপ নির্যাতন সত্ত্বেও FLN এবং ALN ১৯৫৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত গেরিলা পদ্ধতিতে সংগ্রাম পরিচালনা করে। এরপর অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন MTLD, UDMA এবং ওলেমা দল FLN-এর সঙ্গে যোগদান করে। এই দলসমূহ সংঘবদ্ধভাবে আলজিরিয় বিপ্লবী জাতীয় কাউন্সিল (National Council of the Algerian Revolution–CNRA) গঠন করে। এই কাউন্সিল বিদেশে গোপন কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করে এবং মরক্কো ও তিউনিসিয়া সীমান্ত দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করে। CNRA-এর মোট পূর্ণাঙ্গ সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭ এবং সহ-সদস্য ছিল ১৭। প্রথমে আলজিরিয়ার সোম্মামেতে এটি প্রতিষ্ঠিত হলেও অবস্থার প্রেক্ষিতে তা তিউনিসে স্থানান্তরিত হয়। ক্রমশঃ এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা ৫৪-তে পৌঁছায়। উল্লেখ্য, যে আলজিরিয়ায় ১৮০,০০০ ফরাসি সৈন্য অবস্থান করলেও তারা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন আলজিরিয় সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কোন সাফল্যজনক অভিযান চালাতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু, ফরাসি উপনিবেশ মরক্কো এবং তিউনিসিয়া একই সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালিত হলে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় গণ-বিক্ষোভ ও সন্ত্রাস দমন সম্ভবপর হয়নি। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে রিপাবলিকান ফ্রন্ট ফ্রান্সে ক্ষমতালাভ করলে সমাজতন্ত্রী ল্যাকসটা (Lacoste) প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। আলজিরিয় রেসিডেন্ট গ্যা মলে (Guy Mollet) মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তারা উভয়ে সংঘর্ষের পথ বর্জন করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পক্ষপাতী ছিলেন। তারা (১) যুদ্ধ বিরতি (২) অবাধ নির্বাচন এবং (৩) আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে চান। কিন্তু বিপ্লবীগণ তাদের প্রতি আস্থাবান ছিল না। ফলে, সন্ত্রাসী আন্দোলন ও গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। যাহোক, ১৯৫৬ সালের ২০শে নভেম্বর তিউনিসিয়া, মরক্কো এবং আলজিরিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতাদের একটি সম্মেলন তিউনিসে আহ্বান করা হয়।

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ঃ তিউনিসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আলজিরিয়া থেকে পাঁচজন জননেতা যোগদান করেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাবশালী ছিলেন আহমদ বেন বেল্লা। বেন বেল্লা মরক্কোর ওরানে জন্মগ্রহণ করেন এবং যোদ্ধা হিসেবে ইতালি এবং উত্তর আফ্রিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু ফরাসি উপনিবেশিক সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি ১৯৫০ সালে কায়রোতে আত্মগোপন করেন। তিনিই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথিকৃত এবং আলজিরিয়ায় স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি মিশরে MTLD-র দফতর প্রতিষ্ঠা করে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে তিউনিসে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি সহ অপর চারজন আলজিরিয় প্রতিনিধি একটি বিমানে রাবাত থেকে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে ফরাসি বিমান চালক ফরাসি গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশে বিমানটি ছিনতাই করে আলজিয়ার্সে নিয়ে যায়। সেখানে বেন বেল্লাসহ অন্যান্য প্রতিনিধিদের গ্রেফতার করা হয়। এই দুঃখজনক ও নীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপের ফলে (kidnapping, abduction) সমগ্র আলজিরিয়ায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয় এবং বিশেষ করে মেকনেসের অধিবাসীগণ এমনই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে যে তারা তাদের এলাকায় বসবাসরত ৪০ জন ফরাসি ঔপনিবেশিকদের হত্যা করে। মরক্কো সরকার প্রতিবাদ স্বরূপ প্যারিস থেকে তাঁর রাষ্ট্রদূত আবদুর রহিম চোয়াবিদকে প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর আলজিরিয় নেতৃবৃন্দ ফরাসি প্রধানমন্ত্রী গ্যা মলে (Guy Mollet), তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী হাবীর বরগুইবা এবং মরক্কোর রাজা পঞ্চম মোহাম্মদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। এতদসত্ত্বেও স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন অগ্রগতি হয়নি। সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে CCE (Committee of Co-ordination and Execution-CCE) আলজিয়ার্সে একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করে।

সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঃ FLN, ALN এবং CCE সংগঠন এর সমগ্র আলজিরিয়ায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ফরাসি দখলদার বাহিনীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে। ১৯৫৬ সালের শেষার্ধে তারা আলজিয়ার্সে একটি মিল্কবার এবং ক্যাফেটারিয়ায় বোমা ফাটিয়ে তিনজনকে হত্যা এবং ৪৬ জনকে আহত করে। সমগ্র দেশে বোমা বিস্ফোরণ হতে থাকে। FLN ইতিমধ্যে কাসাব্লাঙ্কা দখল করে সেখানে একটি বোমা তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। FLN ক্রমশ তার প্রভাব বলয় বিস্তার করে সংবাদ ও প্রচার পত্রের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলে। FLN সমগ্র দেশে ১৯৫৭ সালের ২৮শে জানুয়ারি থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আট দিন ব্যাপী হরতাল ডাকে। এদিকে ফ্রি আলজিরিয়া রেডিও গোপনীয়ভাবে প্রচার কাজ চালাতে থাকে। ফরাসি সরকার কর্তৃক অস্ত্র বিরতির আহ্বান অস্বীকার করে FLN সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাতে থাকে এবং দাবীকরে যে যতদিন স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা না করা হবে ততদিন কোন আলাপ-আলোচনা বসবে না। যাহোক, আলজিরিয় রাজনৈতিক দল FLN জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি মেনে নেবার প্রস্তাব করে, কিন্তু কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্যা নিরসন হয়নি। উপরন্তু, ফরাসি সরকার সন্ত্রাস দমনের জন্য উৎপীড়ন আইন

www.pathagar.com

জারি করে আলজিরিয়দের উপর অমানুষিক নির্যাতন করে। এমন কি ফরাসি প্যারাট্রুপার গ্রামাঞ্চলে নেমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ১৯৫৭ সালের মে মাসে মধ্য আলজিরিয়ার মেলোজা (Melouzze) গ্রামের ৩০০০ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য FLN স্বৈরাচারী ফরাসি সরকারকে দোষারোপ করে, অন্যদিকে ফরাসি কর্তৃপক্ষ FLN-কে দোষী সাব্যস্ত করে। FLN তাদের কার্যকলাপ সমগ্র দেশব্যাপী প্রচারের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতদারী (fief maquis) সৃষ্টি করে। ১৯৫৭ সালের শেষার্ধে FLN ফরাসি সামরিক দফতর ও ঘাঁটির উপর হামলা চালায়। কিন্তু ফরাসি কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসমূলক আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করার জন্যে তিউনিসের সীমানায় কাঁটাতারের বেড়া দেয়, যাতে অস্ত্রশস্ত্র পাচার হতে না পারে। এ ছাড়া রাডার ও গোলন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। আলজিরিয়া সঙ্কট দূরীকরণের জন্য জাতিসংঘ একটি প্রস্তাব (Enabing Act) করে কিন্তু আন্দোলনকারীগণ তা প্রত্যাখ্যান করে।

জাতিসংঘের ভূমিকা ঃ আলজিরিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য আফ্রো-এশিয়ান সদস্যদের চাপে সাধারণ পরিষদ ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে একটি সভা আহ্বান করে। FLN সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে আলজিরিয়ায় ফরাসি আধিপত্য বিলুপ্ত বলে ঘোষণা প্রদানের জন্য জাতিসংঘকে অনুরোধ করে। ব্রিটেনের বিরোধী দল আলজিরিয়াকে স্বাধীনতা প্রদানের জন্য চাপ দেয। ১৯৫৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদ আলজিরিয়ার অনুকূল একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন ALN এর সংগঠন অধিকতর সংখ্যক সদস্যের অন্তর্ভুক্তিতে আরও শক্তিশালী ও সুসংগত হয়। ১৯৫৮ সালের গোঁড়ার দিকে ALN ৬,০০,০০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সন্ত্রাসী দল গঠন করতে সমর্থ হয়। এই সন্ত্রাসী দল ক্রমশঃ নিয়মিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেনাদলে রূপান্তরিত হয়। এই বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের ৭৫% ফরাসি সেনাবাহিনীতে হামলা করে সংগৃহীত হয়। জল ও স্থল পথে আরব দেশসমূহ ও ইউরোপ থেকে আলজিরিয়ায় অস্ত্র পাচার হতে থাকে। ফ্রান্সে সরকার পরিবর্তন হলে এম. ফিলমলিন (M. Pfilmilin) প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি আলজিরিয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সঙ্কট মোচনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা বিফল হয়। ১৯৫৮ সালে দ্যা গল ফ্রান্সের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। ১৯৫৮ সালের এপ্রিলে এক্রেতে যে স্বাধীন আফ্রিকা রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন অধিষ্টিত হয় তাতে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবীকে সমর্থন জানানো হয়। একই বছর তানজিয়ারে অনুষ্ঠিত মগরিবী রাষ্ট্রসমূহের যে সম্মেলন হয় তাতে FLN যোগদান করে এবং FLN কে আলজিরিয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র প্রতিনিধি দল হিসেবে স্বীকার করা হয়। এ সম্মেলন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, আলজিরিয়া থেকে ফরাসি দখলদার বাহিনী অপসারিত করতে হবে এবং স্বাধীন আলজিরিয় সরকার গঠনের সুযোগ দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ফরাসি কোলনগুলো তিউনিসিয়া, মরক্কো এবং আলজিরিয়া সংঘবদ্ধভাবে একটি ব্লক

www.pathagar.com

(North African Block-Maghrib Unity) হিসেবে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা দাবী করে। অন্যদিকে আলজিরিয়ার ফরাসি ঔপনিবেশিকগণ আলজিরিয়াকে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে একীভূত করার দাবী জানায়। ফরাসি কোলনগুলো (colon) আলজিরিয় স্বাধীনতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

স্বাধীনতা অর্জন ঃ চার্লস দ্যা গল ফরাসি ঔপনিবেশিকদের সমর্থন করে আলজিরিয়াকে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের অধীনস্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে পরিণত করতে চান কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের মন্ত্র-স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বে (Liberty, Equality and Fraternity) উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদীগণ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দাবী করে। পূর্বে গঠিত CCE-এর যুদ্ধ সম্পর্কিত কাউন্সিল (War Council) সদস্যগণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বস্তুত এই কাউন্সিলের নয়জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন সামরিক অফিসার। ফ্রান্সের রিপাবলিকান ফ্রন্টের মত আলজিরিয় ফ্রন্ট গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে ইসলামী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করা। এই ফ্রন্ট ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি গঠন করে, যার সদস্য সংখ্যা ৬৫,০০০ তে পৌঁছায়। ১৯৫৮ সালের ১৯ই সেপ্টেম্বর আলজিরিয় বিপ্লবের জাতীয় কাউন্সিল, যা ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় (CNRA) আনুষ্ঠানিকভাবে ফরহাত আব্বাসকে প্রধানমন্ত্রী করে আলজিরিয় প্রজাতন্ত্রের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে। একদিকে সাংবিধানিক ও শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন, অন্যদিকে গেরিলাদের সন্ত্রাসী তৎপরতায় ফরাসি সরকার নাজেহাল হয়ে পড়ে। চার্লস দ্যা গল আলজিরিয়ার মুসলিম আন্দোলনকারীদের সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যেমন ৪০০,০০০ নতুন চাকুরি ১০,০০,০০০ জনের জন্য বাসস্থান ও শিক্ষায়াতন নির্মাণ এবং কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন। কিন্তু ১৯৫৮ সালের দ্যা গল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। অতঃপর তিনি গোপনীয়ভাবে মধ্যপন্থীদের সহায়তার গেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন; এমন কি তিনি FLN-এর সদস্যদের প্যারিসের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু FLN-এর সদস্যগণ সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আলজিরিয় সঙ্কট আলোচিত হয় এবং আলজিরিয়দের স্বাধীনতা দাবীকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তটি সদস্যদের ভোটের জন্য উপস্থাপিত হলে সংখ্যাধিক ভোটের অভাবে তা বাতিল হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে আমেরিকা ভোট দিতে বিরত থাকে। ফরাসি পরিষদের জন্য আলজিরিয়ায় যখন নির্বাচন শুরু হয় তখন বলপূর্বক মুসলিম ভোটারদের নির্বাচন কেন্দ্রে আনা হয়। কিন্তু এতে কোন সুফল হয়নি। যাহোক, অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ফরাসি সরকার কোন গুরুত্ব দেয়নি। ফলে গেরিলা যুদ্ধ পুনরায় শুরু হয় ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত গেরিলাদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালান হয়। ফলে তারা তিউনিসিয়া এবং মরক্কোর সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থান গ্রহণ করে। উপায়ন্তর না দেখে ফরাসি প্রেসিডেন্ট দ্যা গল ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করেন যে, আলজিরিয়ার অধিবাসী ফরাসি

www.pathagar.com

সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তিনি গেরিলাদের অস্ত্র বর্জন না করা পর্যন্ত তাদের সাথে আলাপ করতে অস্বীকার করেন। দ্যা গলের ঘোষণা ফরাসি ঔপনিবেশিকদের ক্ষুব্ধ করে এবং ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে আলজিয়াসের দাঙ্গায় ২৫ জন ফরাসিবাসী নিহত এবং ১৩৬ জন আহত হয়। এই ঘটনায় ফরাসিদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং দ্যা গল রেফারেন্ডামের দ্বারা প্রাদেশিক নির্বাচিত হলে ক্রমশঃ আলজিরিয়ায় একটি স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্যা গল ১৯৬০ সালের শেষের দিকে আলজিরিয়া সফর করেন। ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মুসলিম গেরিলা এবং ফরাসি ঔপনিবেশিকগণ এই রেফারেন্ডাম বর্জন করে। ইত্যবসরে, আলজিরিয় ফ্রন্টের লিবারেশন আর্মি ১৯৬১ সালের ২২শে এপ্রিল আলজিরিয়ার্সে ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু চার দিন পর তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। বাধ্য হয়ে দ্যা গল ২০শে মে গেরিলাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থ হয় কারণ ফরাসিগণ আলজিয়ার্সের ফরাসি নৌ-বহরের ঘাঁটি রাখতে চায়। এ ছাড়া ফরাসি সরকার সাহারা মরুভূমিতে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। অবশেষে ৫ই সেপ্টেম্বর দ্যা গল পুনরায় আলোচনার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং অস্থায়ী আলজিরিয় সরকার প্রধান ইউসুফ বিন খেদ্দা এই আলোচনাকে স্বাগত জানান। ১১ই সেপ্টেম্বর দ্যা গল আলজিরিয়া থেকে ফরাসি ঔপনিবেশিক এবং ফরাসি মুসলিম নাগরিকদের অপসারণের অঙ্গীকার করেন। FLN-এর দীর্ঘ দিন যাবত সংগ্রামের ফলে আলজিরিয়ায় স্বাধীনতার পথ সুগম হয়। অস্থায়ী আলজিরিয় সরকার প্রধান ইউসুফ ফরাসি সরকারের নিকট পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দাবী করেন এবং আলজিরিয়া এবং ফরাসি সরকারের মধ্যে সহযোগিতা কামনা করেন। বেন বেল্লা বহু দিন কারারুদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়। ১৯৬২ সালের ১২ থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আলজিরিয়া ও ফরাসি মন্ত্রীদের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে আলজিরিয়াকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই যৌথ সভার সিদ্ধান্ত ফরাসি মন্ত্রীপরিষদ এবং আলজিরিয়া বিপ্লবী জাতীয় কাউন্সিলের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। এই প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আলজিরিয়াকে ফরাসি সরকার স্বীকৃতি দান করে।

একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে FLN এবং ALN অনন্য ভূমিকা পালন করে।

৫. সাউদী আরব : আব্দুল আজীজ ইবনে সাউদ

পটভূমি ঃ আরবি ভাষাভাষী দেশসমূহের বিস্তৃতি পশ্চিমে মরক্কো থেকে পূর্বে ওমান পর্যন্ত। অন্য কথায়, ইরানকে বাদ দিলে সমগ্র মধ্য, নিকট প্রাচ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার বিশাল অঞ্চল নিয়ে আরব ভাষাভাষী দেশের বিস্তৃতি। এই বিশাল অঞ্চলে বহু যুগ দরে আরবগণ রাজত্ব করেন এবং ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে সহায়তা করেন।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর মধ্যে সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, আরব ভূখণ্ড, প্যালেস্টাইন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে বিশাল অটমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। সুদীর্ঘ চারশত বছর যাবৎ তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনে থেকেও আরবগণ তাদের নিজস্ব ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদের স্পৃহা হারায়নি।

তুর্কি আধিপত্য ঃ ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সুলতান সেলিম মিশর অধিকার করেন এবং মামলুকদের পতনে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে অটমান আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। সেলিম সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর জয় করে হেজাজের দিকে সৈন্য পাঠান। পবিত্র মক্কা ও মদিনাসহ সমগ্র হেজাজ তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর ইয়েমেনও অধিকৃত হয়। ক্রীড়ানক খলিফা মোতাওয়াক্কিলকে অপসারণ করে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে সেলিম নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। হেজাজের শাসনভার অর্পিত হয় তুর্কি সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত মিশরের পাশাদের উপর। মিশরের শাসনকর্তা মোহাম্মদ আলী পাশা (১৮০৫-১৮৪৯) এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে তুর্কীদের সঙ্গে হেজাজের বিরোধ বাধে। উল্লেখ্য, মধ্য আরবের নেজদ্ অঞ্চল স্বাধীন ছিল।

ওয়াহাবী আন্দোলন ঃ আধুনিক তেলসমৃদ্ধ সাউদী আরবের অভ্যুত্থানের গোড়াপত্তন হয় ওয়াহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে। মধ্য-আরবের নেজদ্ অঞ্চলে উযাইনা নামক স্থানে মুহম্মদ ইবনে আবদ-আল-ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৯২) আরবদেশে সর্বপ্রথম একটি শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, গোঁড়াপন্থী ও অনমনীয় মনোভাবাপন্ন। ধর্মীয় সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইসলামের পবিত্রতা ও প্রকৃত মূল্যবোধ রক্ষার্থে সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ করেন। তিনি সকল প্রকার ব্যক্তিপূজা ও কবর পূজার বিরোধী ছিলেন। তিনি বানু তা'মীম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব, আইনতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বাগদাদে গমন করে উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন। তিনি আহমদ ইবনে হাম্বল এবং আহম্মদ ইবনে তায়মিয়ার ভাবধারা ও মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তিনি হেজাজ, ইরাক ও সিরিয়া ভ্রমণ করে মুসলমানদের মধ্যে অনৈসলামিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও নীতি হতে তাদের বিচ্যুতিতে ব্যথিত হন।

ইবনে সাউদের ওয়াহাবী মতবাদ গ্রহণ ঃ মুহম্মদ ইবনে আল-ওয়াহাব স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও ভাবধারার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তিনি পবিত্র কুর'আনের ব্যাখ্যাকে অধিক গুরুত্ব দেন এবং 'জেনা'র শাস্তিস্বরূপ পাথর নিক্ষেপ করে দোষী ব্যক্তির প্রাণনাশের ফতোয়া দেন। কিন্তু স্থানীয় শেখগণ এর বিরোধিতা করে তাকে তার নিজ শহর থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি কবরপূজা, পীরপূজা, মানত প্রথার তীব্র নিন্দা করে ইসলামের মৌলিক অনুশাসনের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর আন্দোলন 'ওয়াহাবী আন্দোলন' নামে পরিচিত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নৈতিকভাবে অধঃপতিত মুসলমানগণ যখন বিপথগামী, তখন তিনি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত পথে তাদের পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পান। মতান্তরে 'ওয়াহাবী আন্দোলন' 'মুহম্মদী আন্দোলন' নামে পরিচিত। তাঁর মতবাদ

www.pathagar.com

বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাব আল-তৌহিদ"-এ সন্নিবেশিত রয়েছে। মুহম্মদ ইবনে আবদ আল-ওয়াহাবের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল দারিয়ার আন-আযা গোত্রের দলপতি মুহম্মদ ইবনে সাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎ তাঁর জীবন ও মতাদর্শের জন্য ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ একদিকে যেমন আল-ওয়াহাব তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য একজন পৃষ্ঠপোষক লাভ করেন অন্য দিকে মুহম্মদ ইবনে সাউদ আল-ওয়াহাবের সমর্থন লাভ করে তাঁর শত্রুদের বিশেষ করে উযাইনার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন।

প্রথম সাউদী রাজবংশ ঃ বর্তমান আরব দেশের সাউদী রাজবংশের পূর্ব পুরুষ ছিলেন মানী ইবনে রাবীয়া আল-মুরাইদী। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি হাসা অঞ্চল থেকে ওয়াদী হানিফায় এসে বসবাস শুরু করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর বংশধরেরা মধ্য আরবের দারিয়ায় একটি ক্ষুদ্র আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭২০ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে সাউদী ইবনে মুহাম্মদ শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার নাম হতেই সাউদী রাজবংশের নামকরণ হয়। তিনি ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র মুহম্মদ ইবনে সাউদ আমীর হন।

মুহম্মদ ইবনে সাউদ (প্রথম) (১৭২৫-১৭৬৩) ঃ সাউদী রাজবংশের প্রথম আমীর ছিলেন নেজ্‌দের দারিয়ার দলনেতা মুহম্মদ ইবনে সাউদ। তিনি ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় দক্ষতা, যুদ্ধকৌশল ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৭২৫ সালে আমিরাত লাভ করেন। এই সময়ে নেজ্‌দ অঞ্চলে মুহম্মদ আল-ওয়াহাবের শুদ্ধি ইসলামে (puritan) তিনি আকৃষ্ট হন এবং ওয়াহাবী আন্দোলন সমর্থন ও ওয়াহাবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উপরন্তু, তিনি ওয়াহাবের কন্যাকে বিবাহ করে ওয়াহাবী মতবাদ সম্প্রচার এবং স্বীয় রাজ্য বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করেন। বস্তুতপক্ষে শুদ্ধি আন্দোলনের শুরুতে আল-ওয়াহাব যখন স্বীয় নগরী আল-উযাইনা থেকে নির্যাতিত অবস্থায় বিতাড়িত হন তখন মুহম্মদ ইবনে সাউদ তাকে আশ্রয় দেন। তিনি মুহম্মদ আল-ওয়াহাবকে কেবলমাত্র তার মতবাদ প্রচার করার জন্যই সুযোগ সুবিধা দিলেন না, বরং এর স্থায়িত্বের জন্য একটি রাজনৈতিক পরিমন্ডল সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেন। মুহম্মদ আসাদের ভাষায়, "It was an alliance of the spirit and the sword : an alliance which was destined to change the entire history of Arabia." আল-ওয়াহাবের ধর্মীয় চেতনাবোধে বেদুইনগণ যেমন উদ্বুদ্ধ হয়, অপরদিকে মুহম্মদ ইবনে সাউদের তেজদীপ্ত ও বলিষ্ঠ যুদ্ধস্পৃহার ফলে আরব ভূখণ্ডের মধ্য এবং পূর্বাঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্র ও শহর সাউদী রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। মাত্র দশ বছরে দারিয়ার ক্ষুদ্র আমিরাত ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নীতির ব্যাপক প্রয়োগে ত্রিশ বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। প্রথমে ইবনে সাউদ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে হাসার নৃপতিকে পরাজিত করেন। এর ফলে সাউদী রাজ্য পশ্চিম দিকেও বিস্তার লাভ করতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাউদী রাজবংশ নেজ্‌দে এবং ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রিয়াদে তাদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে আল-ওয়াহাবের মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য, সাউদী রাষ্ট্রের ধর্মীয় ভিত্তি ছিল ইবনে তায়মিয়ার ভাবাদর্শে উদ্ভাবিত 'শুদ্ধি' ইসলাম।

www.pathagar.com

প্রথম আবদুল আজীজ (১৭৬৩-১৮০৩) ঃ মুহম্মদ ইবনে সাউদ ১৭৬৩ সালে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র আবদুল আজীজ ১৭৬৫ সালে আমিরাত লাভ করে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় এবং শৌর্যবীর্যের ফলে সাউদী রাজ্য ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে কুয়েতে বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি আল-ওয়াহাবের সমর্থন লাভ করেন। তিনি স্বীয় পুত্র সাউদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। সাউদী রাজবংশ নেজ্দে বংশগতভাবে রাজত্ব করার অধিকার লাভ করে। ওয়াহাবী মতবাদ এবং সাউদী রাজবংশের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলে অ-ওয়াহাবী পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও শেখতন্ত্রগুলো শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ইসলামের পবিত্র স্থান এবং প্রাণকেন্দ্র মক্কার শরিফ গালিবের সঙ্গে বিরোধ বাধে। শরিফ গালিব আবদুল আজীজের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু মক্কার বাহিনী ১৭৯০ সালে পরাস্ত হয়। আবদুল আজীজের সঙ্গে শরিফ একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। কিন্তু ওয়াহাবী শাসক স্বীয় আধিপত্য বিস্তার দ্বারা ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য ১৮০১ সালে কারবালা দখল করেন। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কা শরীফ সাউদী রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেখানে পীর-পয়গম্বরদের মাজারের উপর নির্মিত সমাধি-সৌধ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কারবালায় শিয়া সম্প্রদায়ের নেতা ইমাম হোসেনের সমাধি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ওয়াহাবী-সাউদী রাজত্বের প্রতি গোঁড়াপন্থী শিয়াগোষ্ঠী চরম ষড়যন্ত্র ও বৈরিতা শুরু করে। এর ফলে একজন শিয়া ঘাতকের হাতে আবদুল আজীজ ১৮০৩ সালে নিহত হন।

দ্বিতীয় ইবনে সাউদ (১৮০৩-১৪) ঃ আবদুল আজীজের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র দ্বিতীয় ইবনে সাউদ ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে সাউদী সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি মক্কার শরিফ গালিবকে তাঁর অধীনে শাসনের অধিকার দেন। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে মহান ইবনে সউদ মদিনা দখল করেন। মদিনা হতে তুর্কী নাগরিকদের বিতাড়িত করা হয়। অল্প দিনের মধ্যে সাউদের ক্ষমতা ওমান হতে পালমিরা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এতে তুর্কী সুলতান খুবই বিচলিত হলেন এবং সাউদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপ বন্ধের জন্য মিশরের মোহাম্মদ আলী পাশাকে নির্দেশ দেন। কিন্তু ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পাশার পক্ষে কোন অভিযান প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে সউদের আধিপত্য নাজাফ, আলেপ্পো এবং দামস্কের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওয়াহাবীদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তুর্কী সুলতান বিচলিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর নির্দেশে মোহাম্মদ আলী পাশা তাঁর পুত্র তুসুনকে একটি বিশাল বাহিনীসহ আরব দেশে পাঠান। সেই সঙ্গে একটি নৌ-বহরও প্রেরিত হয়। সম্মিলিত তুর্কী বাহিনী ওয়াহাবীদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণকরে বিপর্যস্ত করে এবং ঐতিহাসিক বদরের প্রান্তরে শোচনীয়ভাবে ওয়াহাবীগণ পরাজিত হয়। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীগণ মদিনা দখল করে এবং পরবর্তী বছর মক্কা ও তায়েফ তুর্কি শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে মোহাম্মদ আলী স্বয়ং অভিযান করে তুসুনের মিশরীয়দের বিরুদ্ধাচারণ করে ওয়াহাবীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এর ফলে তাকে বন্দী করা হয়। তারাবায় তুসুন পরাজিত হলে

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আলী নেজ্দ হতে দক্ষিণে অভিযান করেন। তিনি উত্তর বাসালে ওয়াহাবীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

মহামতি দ্বিতীয় ইবনে সাউদ একজন বিচক্ষণ ও বীরশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সনাতনী আরব শেখ তন্ত্রের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং একজন মহান আরব শেখ হিসেবে দেশ শাসন করেন। তিনি খুবই সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। তাঁর আমলে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। পবিত্র কুর'আনের আলোকে বেতনভুক্ত বিচারকগণ বিচারকার্য সমাধা করতেন। বিচারের জন্য তাদের কারও ফি (Fee) গ্রহণ করার কোন সুযোগ ছিল না। ওয়াহাবীদের কোন প্রকার কর দিতে হত না। কেবলমাত্র যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল। তাদের ধর্মযুদ্ধে নিজ ব্যয়ের অংশগ্রহণ করতে হত। যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ তাদের মধ্যে বিতরণ করা হত।

আবদুল্লাহ (১৮১৪-১৯১৮) ঃ ইবনে সাউদের পুত্র আবদুল্লাহ ১৮১৪ সালে শাসনভার গ্রহণ করলে ওয়াহাবীদের সঙ্গে মিশরীয়দের বিরোধ পুনরায় শুরু হয়। মোহাম্মদ আলী পাশা স্বীয় পুত্র ইব্রাহিমের উপর সামরিক অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করে মিশরে চলে যান। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম ওয়াহাবী রাজকুমার কাসিমের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। কাসিম পৈতৃক আবাসস্থল দারিয়ায় পলায়ন করতে বাধ্য হন। ওয়াহাবী শাসক আবদুল্লাহ ইব্রাহিমের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এর ফলে ওয়াহাবী ভাবধারায় পুষ্ট মুহম্মদ ইবনে সাউদ যে রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করেন তা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আবদুল্লাহকে পদচ্যুত করে ইস্তাম্বুলে বন্দী হিসেবে নিয়ে গিয়ে তাকে সেখানে হত্যা করা হয়। ওয়াহাবীদের রাজধানী দারিয়া ধুলিস্যাৎ করা হয় এবং একজন তুর্কী সামরিক কর্মচারী নেজ্দের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইব্রাহিম মাদিনায় প্রত্যাগমন করেন। নেজ্দ তুর্কি সুলতানের অধীনস্থ মিশরের পাশার দখলে থাকলেও দক্ষিণ আরবের আসীর অঞ্চলে ১৮২৫ থেকে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশরীয় অভিযান ব্যাহত হয়। মোহাম্মদ আলী পাশা মিশর ও সিরিয়ায় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যস্ত থাকায় আরব দেশে যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। তিনি আরব দেশের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা দখলের কোন চেষ্টা করেননি। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে এডন ব্রিটিশ কর্তৃক অধিকৃত হবার পর পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনায় উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তুর্কি সুলতানের উপর সরাসরি ন্যস্ত হয়। আরব দেশে মোহাম্মদ আলী পাশার অভিযানের ফলে দু'টি উদ্দেশ্য কার্যকর হয়– ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রসারতা স্তিমিত হয় এবং তুর্কি সাম্রাজ্যে আরব দেশের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়; পবিত্র মক্কা ও মদিনায় তুর্কি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় সাউদী রাজবংশ (১৮৭২) ঃ তুর্কি-মিশরীয় অভিযানের ফলে ওয়াহাবী আন্দোলন নেজদে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই আন্দোলন পুনরায় ব্যাপক আকার ধারণ করে। মোহাম্মদ আলী এবং তাঁর পুত্র ইব্রাহিম পাশা আরব দেশ হতে প্রত্যাগমন করলে ওয়াহাবীগণ তাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করতে থাকে। মিশরীয় বাহিনী কর্তৃক দারিয়া বিধ্বস্ত হলে তুর্কি নামে আবদুল্লাহর একজন আত্মীয় রিয়াদে আত্মগোপন করেন। তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে রিয়াদে স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করে স্বাধীনভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তুর্কি দ্বিতীয় সাউদী রাজবংশের সূচনা করেন। ১৮৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিহত হলে তাঁর পুত্র ফয়সল রাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্ষমতা লাভ করেন কিন্তু মিশরের মোহাম্মদ আলী পাশা পুনরায় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নেজ্‌দে অভিযান চালিয়ে ফয়সলকে বন্দী করেন। তিনি ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশরে বন্দী জীবনযাপন করার পর কৌশলে পলায়ন করে সাউদী রাজবংশের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হাইলের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে রশীদের সহযোগিতায় মিশরীয়দের পরাস্ত করে তাদের নেজ্‌দ হতে বিতাড়িত করেন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর সাউদী রাজপরিবারের মধ্যে কোন্দল ও বিভেদ দেখা দেয়। ফয়সলের দুই পুত্র আবদুল্লাহ এবং সউদের মধ্যে এই বিরোধ মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই সুযোগ তুর্কিগণ হাসা দখল করে এবং উচ্চাভিলাষী হাইলের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে রশীদ ওয়াহাবী সাউদী রাজ পরিবারের দুর্বলতার সুযোগে মদিনায় তুর্কি শাসনকর্তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র লিপ্ত থেকে স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। ইবনে রশীদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং রিয়াদে সাউদী বংশের প্রাধান্য লোপ পেতে থাকে। নেজ্‌দের দুই ওয়াহাবী বংশ রিয়াদের আমিরাত এবং হাইলের আমিরাতের মধ্যে বহুদিন ব্যাপী দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্ষমতার লড়াইয়ে রিয়াদের সাউদী বংশ হাইলের রশীদী বংশের নিকট পরাজিত হয়। তারা কুয়েতে নির্বাসিত হয়। তুর্কিদের সাহায্যে রশীদী বংশের আমীর মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে রশীদ (১৮৭২-৯৭) ফয়সালের তৃতীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী আবদুর রহমানকে রিয়াদ থেকে সপরিবারে বিতাড়িত করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ হতে তিনি কুয়েতে বসবাস করতে থাকেন।

তৃতীয় সাউদী রাজবংশ

দ্বিতীয় আবদুল আজীজ (১৮৮০-১৯৫৩) নির্বাসিত জীবনযাপন করলেও আবদুর রহমান স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনি মহামতি সউদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাউদী রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ওয়াহাবী মতাদর্শকে সার্বজনীন করার প্রয়াস পান। তার এই অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করেন তার সুযোগ্য পুত্র আবদুল আজীজ। সাধারণভাবে 'ইবনে সউদ' নামে পরিচিত আবদুল আজীজ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল আজীজ ছিলেন খুবই ধার্মিক এবং উদার। তিনি যুদ্ধবিদ্যায়ও খুবই পারদর্শী ছিলেন।

সামরিক বিজয় ঃ রশীদী বংশের শাসনকর্তা মোহাম্মদ ইবনে রশীদ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে সাউদী বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ আসে। আবদুল আজীজ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রিয়াদ দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরবর্তী পর্যায়ে রশীদী রাজবংশের শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়লে তিনি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের রাত্রির অন্ধকারে কতিপয় বেদুইনসহ রিয়াদ আক্রমণ ও দখল করেন। তাঁর পিতা আবদুর রহমান তাঁকে নেজ্‌দের আমীর এবং

www.pathagar.com

ওয়াহাবীদের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তিনি রশীদী পরিবারের শাসক আবদুল্লাহ আল-আজীজ ইবনে মি'তাবকে পরাজিত করে রিয়াদ দখল করেন এবং সাউদী বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাকে পরপর কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। রশীদী সেনাবাহিনীকে তিনি পরাস্ত করতে সমর্থ হন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত তুর্কি ও রশীদী সেনাবাহিনী পরাজিত হয় এবং ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মক্কার শরিফ ও আবদুল আজীজ ইবনে মি'তাবের সম্মিলিত বাহিনীকে রিয়াদ থেকে বহিষ্কৃত করে সাউদী আধিপত্য পুনরুদ্ধার করেন। ইবনে মি'তাব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ওয়াহাবী আন্দোলন এবং সাউদী রাজক্ষমতা সুদূরপ্রসারী হয়।

আল-ইখওয়ান ঃ ১৯০২ হতে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আবদুল আজীজ ইবনে সউদকে রশীদী রাজপরিবার, মক্কার শরিফ এবং তুর্কি সুলতানের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা নিরসনের জন্য তিনি 'আল-ইখওয়ান' অথবা 'ব্রাদার হুড' আন্দোলনের সূচনা করেন। আরব উপজাতীয়দের বিরোধিতা বন্ধ করে আরবদের মধ্যে একটি জাতীয় চেতনাবোধের সৃষ্টিই ছিল এই গোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য। 'ইখওয়ান' সৃষ্টি দ্বারা শুধু দুর্ধর্ষ বেদুইন গোত্রের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণেই তিনি সমর্থন হননি, বরং আরব বেদুইনদের একতাবদ্ধ করে একটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। ইমামুদ্দীন যথার্থই বলেন, "Like the Sannusi order of Cyrenaica this Ikhwan movement was more of practical nature than of mystical ideas." মূলতঃ 'ইখওয়ান' ছিল সামরিক শক্তিভিত্তিক একটি সংঘ। এর দ্বারা এক দিকে যেমন ওয়াহাবী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে, অপরদিকে শত্রুর মোকাবেলা করে সাউদী রাজবংশকে সুদৃঢ় করা সম্ভবপর হয়। এই সংঘের সদস্যদের সামরিক ছাউনি বা 'হিজবা'তে বসবাস করতে হত। তাদের বেদুইন জীবন ত্যাগ করে কৃষি ও সামরিক জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম এই ধরনের ছাউনি প্রতিষ্ঠিত হয় আবতাউইয়ায়। সর্বমোট কতটি 'হিজবা' প্রতিষ্ঠিত হয় তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও মনে করা হয় যে, প্রায় দু'শত সামরিক ছাউনি আবদুল আজীজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত ছাউনিতে সর্বমোট দশ হাজার যোদ্ধা বসবাস করত। তিনি অসীম দূরদর্শিতার সঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সঙ্গে একটি বিশাল বাহিনী দ্বারা তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস পান।

রাজ্য বিস্তার ঃ ১৯০১ হতে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আবদুল আজীজ সাউদী রাজবংশের মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। ১৯০৮ হতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি স্বীয় রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় দ্বারা নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা কায়েমের প্রয়াস পান। কিন্তু তার পরম শত্রু মক্কার শরিফ হোসেন রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকেন; নব্য তুর্কিগণ তুর্কি সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন; কুয়েতের আমীর শেখ মোবারক আবদুল আজীজ ক্রমবর্ধমান শক্তিতে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এর ফলে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত রিয়াদের সাউদী রাজবংশ বিচলিত হয়ে পড়ে। আব্দুল আজীজ ১৯১৩

www.pathagar.com

খ্রিস্টাব্দে পারস্য উপসাগরের তুর্কি অধিকৃত অঞ্চল আল-হাসা আক্রমণ করে দখল করেন। এর ফলে স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ তাঁর অধিকারে আসে। তুর্কি সুলতান বলকান যুদ্ধে জড়িত হবার ফলে আরব দেশে সৈন্য পাঠাতে ব্যর্থ হন। উপরন্তু, তিনি আবদুল আজীজকে তুর্কির স্বাধীন গভর্নর হিসেবে স্বীকার করেন। এরপর বীরশ্রেষ্ঠ আবদুল আজীজ তাঁর বিশাল বাহিনীসহ জুবাইল, কাতিফ, দাম্মান এবং কুয়েতে কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম দখল করেন। তিনি জার্মানীর সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেলমের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ কুয়েতে সম্প্রসারিত করার জন্য উইলহেলমকে তিনি উৎসাহিত করেন। তাঁর ক্ষমতা স্বীকার করে ব্রিটিশ সরকার একটি চুক্তি সম্পাদিত করে ১৯১৫ এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। এর ফলে প্রথম মহাসমরের পূর্বে নেজ্দ, হাসা, কাতিফ, জুবাইল প্রভৃতি অঞ্চলে আবদুল আজীজ স্বীয় প্রভুত্ব (De facto, De-jure) সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করেন।

মক্কার শরিফ হোসেন ঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। তুর্কি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ইয়েমেন এবং আসীরে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিভিন্ন স্থানে সংঘ স্থাপন করে তুর্কি শাসনের অবসানের জন্য প্রচারণা শুরু হয়। ত্রিপোলি ও বলকান যুদ্ধে আরবগণ তুরস্কের বিরোধিতা না করলেও আরব ভূখণ্ডে তুর্কি আধিপত্য আরব জাতীয়বাদী আন্দোলনের অন্তরায় ছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগদান করলে সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ আরবদেশ তুরস্কবিরোধী মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ করে। অপরদিকে আরব দেশের তুর্কি প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইস্তাম্বুলে নির্বাসিত শরিফ হোসেনকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে নব্য-তুর্কি সরকার পুনরায় মক্কায় প্রেরণ করেন। কিন্তু শরিফ হোসেন তুর্কি আধিপত্য সহ্য করতেন না। তিনি গোপনে মিশরের ব্রিটিশ শাসনকর্তা লর্ড কিচেনারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। ব্রিটেনের সঙ্গে তুরস্কের সদ্ভাব থাকায় তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু মিশরের হাই কমিশনার শরিফ হোসেনের সঙ্গে ম্যাকমোহনের পত্রালাপ Sherif-MacMohan correspondence নামে পরিচিত। উভয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯১৫-১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। এই চুক্তির ফলে আরবদের সমর্থনের পরিবর্তে যুদ্ধ শেষে আরব ভূখণ্ডকে বৈদেশিক শক্তি হতে মুক্ত রাখা হবে, এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অবশ্য শর্ত থাকে যে, উত্তর মিশর ব্রিটিশ এবং লেবানন ফরাসি প্রভাবাধীনে থাকবে। মক্কার শরিফকে মাসিক ভাতা দেওয়া হয় এবং যুদ্ধে তাঁর দুই পুত্র ফয়সল এবং আবদুল্লাহকে প্রেরণ করা হয়। এভাবে সমগ্র হেজাজে শরিফ হোসেন স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করে ১৯১৭ সালে 'বাদশাহ' উপাধি ধারণ করেন। ইংরেজদের প্ররোচনায় আরবগণ তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এটা ছিল তুর্কি আধিপত্যের মূলে কুঠারঘাত স্বরূপ। এর ফলে আরব ভূখণ্ড হতে তুর্কিদের বিতাড়িত করা সম্ভবপর হলেও বিজাতীয় ইউরোপীয়দের তারা প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের চুক্তি মোতাবেক তুরস্ক মদিনা এবং ইয়েমেন থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র আরব ভূখণ্ডে তুর্কি প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়।

www.pathagar.com

ইবনে সাউদের বিজয় ঃ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে মক্কার শরিফ হোসেনের সমর্থন লাভ যত সহজে সম্ভবপর হয়, নেজ্‌দের আমীর ইবনে সাউদের পক্ষ হতে তা সম্ভবপর হয়নি। বার্ষিক ভাতা ৫০০০ পাউন্ড স্টারলিং প্রদান করেও অন্যান্য আরব দলপতির মত ব্রিটিশ সরকার ইবনে সউদের সমর্থন লাভ করতে পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য শক্তির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রসারে আরব দেশসমূহে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। মিত্রশক্তি আরব দেশসমূহের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উপেক্ষা করে ম্যান্ডেটরী (Mandatory) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলে প্রায় সকল আরব রাষ্ট্রই ইউরোপীয় শক্তির আশ্রিত রাজ্যে পরিনত হয়। আরব জাতির এই দুরবস্থা লক্ষ্য করে আবদুল আজীজ প্রকৃত স্বাধীনতা এবং পবিত্র মক্কা ও মদিনাসহ আরব ভূখণ্ড হতে বিজাতীয় প্রভাব দূরীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শরিফ হোসেনের ধৃষ্টতায় আরব রাজ্যসমূহে তাঁর কোন সুনাম ছিল না। ইবনে সাউদ হেজাজে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এক বিশাল বাহিনী নিয়ে শরিফ হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তায়েফের নিকট তোরাবায় সংঘটিত যুদ্ধে শরিফ হোসেন পরাজিত হন এবং তার সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত হয়। যা হোক, আবদুল আজীজ মধ্য-আরব ভূখণ্ড স্বীয় দখলে আনতে সক্ষম হন। তুর্কি প্রাধান্য বিনষ্ট হওয়ায় জবল সামার সহজেই আবদুল আজীজের করতলগত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রশীদের পরিবারবর্গ রিয়াদে অন্তরীণ হন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি রুয়ালা গোত্রকে দমন এবং জাওফ মরূদ্যান দখল করেন। ক্রমশ আবদুল আজীজ তাঁর রাজ্যের সীমানা ট্রান্সজর্ডান, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত বিস্তার করতে সক্ষম হন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এক চুক্তির ফলে কুয়েতের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী স্থাপিত হয়। ব্রিটেনের সঙ্গেও আবদুল আজীজের সখ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু মক্কার শরিফ হোসেনকে তখনও তাঁর পক্ষে দমন করা সম্ভবপর হয়নি।

শরিফ হোসেনের পতন ঃ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন মক্কার শরিফ হোসেন এবং নেজ্‌দের ইবনে সাউদকে ভাতা প্রদান বন্ধ করলে শরিফ হোসেন মক্কা ও মদিনার উপর কর চাপান। ইতিপূর্বে এই দু'টি পবিত্র নগরী করমুক্ত ছিল। এর ফলে মক্কা ও মদিনার অধিবাসীগণ শরিফ হোসেনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করে এবং ইবনে সাউদকে আক্রমণের জন্য আহ্বান জানায়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কে খিলাফত বিলুপ্ত হলে তিন দিন পরেই শরিফ হোসেন নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। এর ফলে ইবনে সাউদ বিশাল সৈন্যসহ হেজাজে অভিযান করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এই আক্রমণ পরিচালিত হয়। সর্বপ্রথম তায়েফ অধিকৃত হয়। হোসেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তাঁর পুত্র আলীকে ক্ষমতা প্রদান করে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সাইপ্রাসে আত্মগোপন করেন। তায়েফ বিজয়ের পর ওয়াহাবীগণ প্রবল বিক্রমে অভিযান করে ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে পবিত্র মক্কা নগরী দখল করে। উল্লেখ্য, এক'শ বিশ বছর পূর্বে তাঁর পূর্বপুরুষ প্রথম আবদুল আজীজ সর্বপ্রথম মক্কা জয় করেন ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে। ইবনে সাউদ ক্রমশ মদিনা ও জেদ্দা দখল করেন। ১৯২৬ সালে তাঁকে হেজাজের 'বাদশাহ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি একই সঙ্গে হেজাজ ও নেজ্‌দের

www.pathagar.com

একচ্ছত্র বাদশাহর সম্মান লাভ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি আরব ভূখণ্ডের নামকরণ করেন 'সাউদী আরব।'

কৃতিত্ব ঃ

প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ঃ আবদুল আজীজ ইবনে সউদ বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বিত্তশালী দেশ সাউদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শুধু দক্ষ ও কুশলী যোদ্ধাই ছিলেন না, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদও ছিলেন। নেজ্‌দ ও হেজাজে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে ওয়াহ্‌হাবী বিরোধী সকল চক্র ও গোষ্ঠী ধূলিস্যাৎ করার সংকল্প করেন। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেন। ইয়েমেনের শাসনকর্তা ইমাম ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধে তিনি সমরাভিযান করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আসীর দখল করার পর তিনি ইয়েমেনে সাউদী রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা করেন। এর ফলে সীমান্ত প্রশ্নে ইমাম ইয়াহইয়ার সঙ্গে বিরোধ শুরু হয় এবং ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে আবদুল আজীজ ইয়াহইয়াকে পরাজিত করেন। উভয়ের মধ্যে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হলে বৈরিতার নিরসন হয়।

বিচক্ষণ শাসক ঃ আবদুল আজীজ ইবনে সউদ একজন বিচক্ষণ শাসক ও প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি মধ্যযুগীয় আরবের সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। বিশৃঙ্খল এবং অরাজকতাপূর্ণ আরব দেশে তিনি সর্বপ্রথম শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধান করেন। চুরি, রাহাজানি বন্ধ করার জন্য শরীয়তের কঠোর বিধান জারি করেন। চুরির জন্য হাত কেটে ফেলার আইন প্রবর্তনের ফলে লুণ্ঠন ও অরাকজতা কমে যায়। হত্যার পরিবর্তে হত্যা এবং ইসলামে বর্জিত অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য যেমন জেল, কোড়া এবং পাথর দ্বারা হত্যার বিধান কঠোর হস্তে পালন করা হয়।

রাষ্ট্রনায়ক ঃ আবদুল আজীজ রাষ্ট্র পরিচালনায় দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিনাস করেন। তাঁর একটি মন্ত্রিসভা ছিল এবং এর পরামর্শ ও সহযোগিতায় তাঁর শাসন সুদৃঢ় হয়। সমগ্র সাউদী আরবকে চারটি বিভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগের শাসনভার ন্যস্ত হয় একজন শাসনকর্তার উপর। এই বিভাগগুলো হচ্ছে নেজ্‌দে, হেজাজ, হাসা এবং আসীর। বিভাগের শাসনকর্তাকে বলা হয় আমীর। বিভাগগুলোকে কয়েকটি জেলায় এবং জেলাগুলোকে শহরভিত্তিক প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত করা হয়। ডেপুটি গভর্নর জেলার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। আমীরকে সাহায্য করেন কাজী এবং উলামা শ্রেণী।

আধুনিকীকরণ ঃ আবদুল আজীজ গোত্রগুলোর মধ্যে পরস্পর সম্প্রতি রক্ষার জন্য রাহাজানি ও লুটতরাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। যাযাবরদের জমি বণ্টন এবং তাদের কৃষিকাজে নিয়োজিত করা হয়। রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের জন্য রাস্তা নির্মিত হয়। যন্ত্রচালিত যানের প্রবর্তনের ফলে দ্রুত যাতায়াত সম্ভব হয়। মোটর গাড়ি আমদানি করা হয়। এর ফলে হজ্জ মৌসুমে হাজীদের যাতায়াত সহজতর হয়। যোগাযোগমন্ত্রী আবদুল্লাহ সোলায়মান যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। রেডিও, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রচলন করা হয়। প্রাথমিক অবস্থার চৌদ্দটি বেতার কেন্দ্র চালু করা হয়। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানি করে কৃষিক্ষেত্রে আমূল

www.pathagar.com

পরিবর্তন সাধিত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি আবদুল আজীজ বিশেষ নজর দেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ভ্রাম্যমান দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। তিনি প্রাচীন আরব শেখতন্ত্র হতে সউদী আরবকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তর করার প্রয়াস পান।

সামরিক ব্যবস্থা ও কূটনীতি ঃ আবদুল আজীজ সাউদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে একটি সুশৃঙ্খল এবং বিশাল সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত একটি সেনাবাহিনী গঠিত হয়। প্রথমে তুর্কি সেনাধ্যক্ষ এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পর ব্রিটিশ অফিসারদের দ্বারা এই বাহিনী গঠিত হয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের পর ব্রিটিশ কারিগর ও বৈমানিক নিযুক্ত হয়। ক্রমশ সাউদী বাহিনী সাউদী নাগরিকদের দ্বারা গঠিত হতে থাকে। আবদুল আজীজ উপলব্ধি করেন যে, প্রশাসন ও সমর বাহিনীতে বিদেশী কারিগর ও উপদেষ্টার প্রয়োজন। এই কারণে তিনি সিরিয়, লেবাননী, দ্রুজ মিশরীয় কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। কূটনীতি ক্ষেত্রে আবদুল আজীজ বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে ওয়াহাবী মতবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আরব ভাবধারার সমন্বয় সাধনে সমর্থ হন। সাউদী আরবকে একটি প্রগতিশীল এবং বিত্তশালী আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি যে উল্লেখযোগ্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হচ্ছে পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য আমেরিকান এক তেল কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন। পরবর্তী পর্যায়ে এই তেল কোম্পানির নামকরণ হয় আরামকো (Aramco) অর্থাৎ আরাবীয়ান-আমেরিকান অয়েল কোম্পানি। তিনি সংবাদপত্র প্রকাশের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর উৎসাহে "বারিদ-আল-হেজাজ" নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা ঃ আবদুল আজীজ শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মক্কা এবং মদিনা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী আবদুল আজীজ তাঁর পুত্রদের ইউরোপ এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রেরণ করেন। ইরান, তুরস্ক ও মিশরের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপিত হয়। সাউদী আরবকে মুসলিম বিশ্বে একটি প্রধান ও প্রভাবশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মক্কা শরীফে একটি প্যান-ইসলামিক কনফারেন্সের আয়োজন করেন। আবদুল আজীজ "বাদশাহ" উপাধি ধারণ করে কৃতিত্বের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইবনে সাউদ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে ইন্তেকাল করেন।

ডেভিড হাওয়ার্থ তার বিখ্যাত জীবনচরিত "The Desert King" (The Life of Ibn Saud) গ্রন্থে যথার্থই বলেন, "His kingdom was still his personal estate, his rule was patriarchal, his God was all-knowing and his law was the seventh century law of the Prophet; and the study of the Koran and Sunna was still the only teaching or learning he approved."

www.pathagar.com

৬. আধুনিক ইরাক : সাদ্দাম হোসেন

পটভূমি ঃ আরব ভূ-খণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ইরাক ছিল মেসোপটেমিয় সভ্যতার লীলাভূমি। এ দেশ পারস্য ও আরব শাসনামলে শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সেলিম ইরাক দখল করে তুর্কি সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করেন। মামলুকগণ তুর্কি সুলতানে অধীনে ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনকার্য নির্বাহ করতেন। ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে ইরাকে তুরস্কের প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে। তুর্কি পাশা এবং মামলুকগণ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ইরাকের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার সুন্নী শাসকগোষ্ঠী এবং শিয়াদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে সংঘর্ষ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাত্মক আকার ধারণ করে। এমনকি বাগদাদ ১৬২৩ এবং ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে পারস্য বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। তুর্কি-পারস্য যুদ্ধের ফলে ইরাকের অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে তুর্কি আধিপত্য লোপ পেতে থাকলে মামলুক শাসনকর্তা সোলায়মান আগা ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য নির্বাহ করতে থাকেন। পরবর্তী পর্যায়ে দাউদ পাশা (১৮১৭-৩২) সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত এবং মামলুক আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর (১৮৫৩-৫৬) তুরস্ক স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করে এবং বাগদাদে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। রশীদ পাশার (১৮৫৩-৬৮) আমলে নদীপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। মিদাত পাশা ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের ভাইসরয় নিযুক্ত হন। মিদাত একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে আবদুল হামিদ কর্তৃক বাতিলকৃত সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন করেন। তাঁর শাসনকালে ইরাকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। প্রশাসনিক কাঠামোর সুষ্ঠ বিন্যাস দ্বারা তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায়ের প্রয়াস পান।

জাতীয় আন্দোলন ঃ বলকান উপদ্বীপে তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসনের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয় তার প্রভাব তুর্কি শাসিত আরব অঞ্চলসমূহেও পড়ে। দুর্বল ও স্বৈরাচারী তুর্কি শাসন এবং আধুনিক ভাবধারায় প্রভাবান্বিত প্রভাবশালী মিদাত পাশার নেতৃত্বে ইরাকে একটি নব যুগের সূচনা হয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাব ইরাকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রবেশ হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইরাকের আরব সুন্নী সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হতে থাকে। প্রগতিশীল কতিপয় ইরাকী কনস্টান্টিনোপলে গমন করে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন। মধ্যপ্রাচ্যে ইরাকের ভৌগোলিক অবস্থানের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে এটি একটি যোগসূত্র স্থাপন করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হতে এই কারণে ইরাকের অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মক্কার শরিফ হোসেনের নেতৃত্বে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় এবং তিনি ইরাক, আরব-ভূখণ্ড, ট্রান্সজর্ডান ও কতিপয় আরব দেশসহ স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। হোসেনের তৃতীয় পুত্র ফয়সল কনস্টান্টিনোপলে পিতার সঙ্গে অবস্থানকালে নব্য তুর্কি আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মিত্র বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং দামেস্ক অধিকার

www.pathagar.com

করেন। এর ফলে তাঁকে সিরিয়ার জাতীয় নেতা হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু যুদ্ধের পর ম্যান্ডেটরী ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সিরিয়ায় ফরাসিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফয়সল এর ঘোর বিরোধীতা করলে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বাহিনীর সঙ্গে ময়সানুন প্রান্তরে সংঘটিত সংঘর্ষে তার পরাজয় ঘটে। অতঃপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ইরাকের বাদশাহ হিসেবে স্বীকৃতি দান করে।

ফয়সল ইরাকের বাদশাহ ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইরাক থেকে তুর্কিদের বিতাড়িত করা হয়। ১৯২০ সালে ইরাকে সামরিক শাসন জারি করা হয়। ব্রিটিশ সরকার স্যার পার্সি কক্সকে অবশেষে হাই কমিশনার হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি একটি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন। বাগদাদের নকীবের নেতৃত্বে একটি আরব মন্ত্রিসভাও গঠিত হয়। সামরিক ও বৈদেশিক বিষয় ব্যতীত যাবতীয় শাসনভার মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত থাকে। প্রত্যেক মন্ত্রীর সঙ্গে একজন ব্রিটিশ উপদেষ্টা থাকেন। ইরাকী জাতীয়তাবাদীরা এরূপে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তারা তালিব পাশার নেতৃত্বে একটি স্বাধীন ইরাকী রাষ্ট্রে গঠনের প্রচেষ্টা করেন। তালিব পাশা মন্ত্রিসভার একজন সদস্য হলেও বিরোধী কার্যকলাপের জন্য ব্রিটেন তার উপর বিরূপ ছিল। তাকে কৌশলে বন্দী করে সিংহলে নির্বাসিত করা হয়। ১৯২১ সালে কায়রোতে চার্চিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে শরিফ হোসেনের পুত্র ফয়সলকে ইরাকের বাদশাহ হিসেবে অভিষিক্ত করা হয়। ফয়সল ম্যান্ডেটের আওতায় ইরাকের বাদশাহের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হননি; কিন্তু ইরাকের জাতীয়তাবাদীরা যখন এর সমর্থন করল এবং একটি রেফারেন্ডামে ফয়সলকে বাদশাহ হিসেবে স্বীকার করল তখন তিনি ইরাকের শাসনভার গ্রহণ করলেন।

জাতীয়তাবাদীদের বিরোধিতা ঃ ইরাকের বাদশাহ ফয়সল ক্ষমতা লাভ করলেও জাতীয়তাবাদীরা ম্যান্ডেট ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেন। তারা এর বিলুপ্তি দ্বারা ইরাকের পুর্ন স্বাধীনতা দাবী করে। জাতীয়তাবাদীরা ফয়সলের সমালোচনা করেন এবং জাতীয় সংসদের নির্বাচন বর্জন করেন। ব্রিটিশ সরকার জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাদের কার্যালয় বন্ধ করে দেয়; সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও খর্ব করা হয় এবং 'প্যাট্রিয়টিক পার্টি' এবং 'হিজব আল-ওয়াতানা' দলগুলোর কার্যকলাপের উপর কঠোর দৃষ্টি দেওয়া হয়। তীব্র বিক্ষোভের মুখে নকীব সরকারের পতন হয়। অতঃপর ১৯২২ সালে ব্রিটিশ-ইরাক সম্মেলন আহ্বান করা হয় এবং একটি খসড়া সন্ধি প্রণীত হয়। এই খসড়ায় বলা হয়, "ইরাকের মহামান্য বাদশাহ ইরাকী শাসনতান্ত্রিক পরিষদে উত্থাপনের জন্য একটি সাংগঠনিক আইন প্রণয়ন করবেন, যা ইরাকের সকল শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ, আকাঙ্ক্ষা ও অধিকারকে বাস্তবে রূপ দিবে।" কিন্তু ইরাকী জাতীয়তাবাদীরা এতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, কারণ এতে "সার্বভৌম রাষ্ট্রের" উল্লেখ ছিল না। ফলে, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। দমননীতি চলতে থাকে। প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে ব্রিটিশ সরকার বাদশাহ ফয়সলকে সিংহাসনে এবং তাবেদার মন্ত্রিসভাকে বজায় রাখেন। অতঃপর ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ

www.pathagar.com

হাইকমিশনার স্যার পার্সি কক্স এবং ইরাকী মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে একটি নতুন চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিতে মূল প্রথম চুক্তির 'প্রোটোকল' বলা হয় এবং এর শর্তানুযায়ী ম্যান্ডেটের মেয়াদ বিশ বছর হতে চার বছর কমিয়ে আনা হয়। এই চুক্তি বাদশাহ ফয়সল ও কতিপয় রাজনীতিবিদ গ্রহণ করলেও জাতীয়তাবাদী ইরাকীরা এটি প্রত্যাখান করে।

চুক্তি অনুমোদন ঃ ১৯২৪ সালে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নতুন পরিষদ ইরাক-ব্রিটিশ চুক্তি অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। এর ফলে ব্রিটিশ সরকার বলপূর্বক ১৯২৪ সালের জুন মাসে এই চুক্তি অনুমোদন করতে পার্লামেন্টকে বাধ্য করে। এই চুক্তির শর্তাবলি দ্বারা ব্রিটিশ সরকার ইরাক সরকারকে পরামর্শ দান এবং বাদশাহ ফয়সলের স্বার্থ রক্ষার অধিকার লাভ করল; ইংরেজ ব্যতীত অন্যান্য বিদেশীকে ইরাকে কর্মচারী নিযুক্ত করা যাবেনা এবং অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক বিষয়াদি ব্রিটিশ হাইকমিশনার নিয়ন্ত্রণ করবেন। মসুলকে কেন্দ্র করে ইরাক এবং তুরস্কের মধ্যে বিরোধ বাধে। লীগ অব নেশনস-এ মসুল প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মসুলকে ইরাকের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের ক্ষমতা আরও সুদৃঢ় হয়। ১৯২৮ সালে ব্রিটেন ইরাক থেকে 'ম্যান্ডেট' প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৯৩২ সালে এটি উঠিয়ে নিতে সম্মত হয়। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয়তাবাদীরা আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

১৯৩০ সালের ইরাক-ব্রিটিশ সন্ধি ঃ ১৯৩০ সালে উভয় পক্ষের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ইরাক ও ব্রিটিশ পাঁচ বছরের জন্য একটি সন্ধি সম্পাদন করে। এই সন্ধিতে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ইরাককে স্বীকার করে নেওয়া হয়; এমনকি উভয় দেশের মধ্যে দূত বিনিময়ের ব্যবস্থাও থাকে; প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও উভয় দেশ একে অন্যকে সাহায্য করবে। ইরাকের নৌপথ, বিমানপথ ও রেলপথ ব্যবহারের অধিকার ব্রিটেনের থাকবে; ব্রিটেন ইরাককে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়ের অঙ্গীকার করে। জাতীয়তাবাদীরা এই ঘৃণ্য চুক্তিকে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির আত্মপ্রকাশ বলে চিহ্নিত করে। এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও বাদশাহ ফয়সল এবং প্রধানমন্ত্রী নূরী আল-সাঈদের চেষ্টায় ইরাকী সংসদ ১৯৩২ এবং ১৯৩০ সালের সন্ধি অনুমোদন করে।

ইরাকের স্বাধীনতা লাভ ঃ ইরাক ১৯৩২ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং লীগ অব নেশনস্ এর সদস্যপদ লাভ করে। তবে এর পরিবর্তে ইরাককে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ম্যান্ডেটরী কর্তৃপক্ষের সম্পাদিত চুক্তি মেনে চলার অঙ্গীকার করতে হয়। বলা বাহুল্য যে, বাদশাহ ফয়সল ছিলেন একজন দক্ষ শাসক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও কূটনীতিতে ইরাক স্বাধীনতা অর্জন করে। তিনি ইরাকের জাতীয় নেতার মর্যাদা লাভ করেন। ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় ফয়সাল ঃ প্রথম ফয়সলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গাজী ইরাকের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মত তিনি যোগ্য শাসক না হলেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

www.pathagar.com

কায়েমের চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বৈরাচারী নীতি প্রবর্তনের ফলে তিনি জনপ্রিয়তা হারান। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মোটর দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র দ্বিতীয় ফয়সল উপাধি ধারণ করে সিংহাসন উপবেশন করেন। আমীর আবদুল্লাহ তাঁর রাজপ্রতিনিধি (Regent) নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে ইরাক এক্সিস (Axis) শক্তি বার্লিন, টোকিও ও রোমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এর ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯৪২ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রশীদ আলী সামরিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা একটি শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেন। এর ফলে রিজেন্ট আবদুল্লাহ্ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন শরিফ শারাফ। একটি সামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করে রশীদ আলী ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন। সামরিক আদালত রশীদ আলী এবং তাঁর ছয়জন সঙ্গীর উপর ফাঁসির আদেশ জারি করে (১৯৪২ খ্রি.)। আবার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রকাশ্য গণবিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়। ইরাকী জনগণ হাশেম বংশীয় সরকারকে একটি ব্রিটিশ তাঁবেদারি সরকার মনে করে। পুনরায় ইরাক ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইরাকী জাতীয়তাবাদীরা এই চুক্তি বিরোধিতা করে। ফলে প্রধানমন্ত্রী সালিহ্ জাবর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সমগ্র ইরাকে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ ও গণবিদ্রোহ্ শুরু হলে সামরিক আইন জারি করা হয়।

সামরিক অভ্যুত্থান ঃ ১৯৫২ সালের পর পুনরায় বেসামরিক সরকার ক্ষমতা লাভ করে। এই মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব দেন ফাজিল জামালী। কিন্তু রক্ষণশীল ও প্রভাবশালী নেতা নূরী আল-সাঈদের বিরোধিতায় ফাজিল পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সংসদের নতুন নির্বাচনে নূরী ক্ষমতা লাভ করেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করে বামপন্থীদের কঠোর হস্তে শাস্তি দেন। নূরী সরকারের স্বৈরাচারী নীতির ফলে একটি প্রচণ্ড গণআন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫৮ সালে পুনরায় সামরিক আইনজারি করা হয়। নূরী আত্মগোপন করেন। কিন্তু ধরা পড়ে প্রানদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনজন বিশিষ্ট নেতার সমন্বয়ে একটি 'সার্বভৌমত্ব পরিষদ' গঠিত হয়। করিম কাশেমের নেতৃত্বে ১৩ জন সদস্য নিয়ে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু তিনি ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক গোলযোগ দূর করতে পারেননি। দেশে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করে এবং করিম কাশেম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জেনারেল কাসেম (১৯৫৮-৬৩) ঃ ১৯৫৮ সালের ১৪ই জুলাই ইরাকের সামরিক অভ্যুত্থানের (coup detal) নায়েক ছিলেন ইরাকী সামরিক বাহিনীর বিশতম বিগ্রেডিয়ারের অধিনায়ক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আবদুল করিম কাসেম। ইরাকের রাজা দ্বিতীয় ফয়সাল এবং যুবরাজ আবদুল ইলাহ্ সামরিক অভ্যুত্থানের সময় নিহত হন। সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারী করা হয়। এই বিপ্লবে ব্রিটিশ দূতাবাস অগ্নিদগ্ধ হয় এবং ব্রিটিশ ও আমেরিকান নাগরিকদের বিতাড়িত করা হয়। তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রেসিডেন্সিয়াম কাউন্সিল গঠিত হয়। জেনারেল কাসেম সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, রাষ্ট্রপ্রধান এবং মন্ত্রী পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর সহযোগী

www.pathagar.com

কর্নেল আবদুস সালাম মোহাম্মদ আরিফকে উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং উপ-সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন। কাসেম-আরিফ চক্রের বিরোধী সামরিক অফিসারদের অবসর দেওয়া হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আর্মি চিফ অব স্টাফ এবং বিমানবাহিনীর প্রধান। জেনারেল কাসেম ক্ষমতা গ্রহণ করেই শুদ্ধিকরণ নীতি অনুসরণ করেন এবং প্রশাসনের দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি ইরাকে অবস্থিত বিদেশী সম্পত্তি জাতীয়করণ করেন। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তিনি জোট নিরপেক্ষতাকে প্রাধান্য দেন। তিনি সকল মুসলিম ও আরব রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুসুলভ ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ইরাকে সামরিক অভ্যুত্থান বাগদাদ চুক্তির (Baghdad Pact) পরিপন্থী ছিল এবং এই কারণে ১৯৫৮ সালের ১৪ই জুলাই ইস্তাম্বুলে বাগদাদ চুক্তিতে স্বাক্ষরদানকারী মুসলিম দেশসমূহ কূটনৈতিক সঙ্কটে পড়ে। কারণ ইরাক, তুরস্ক এবং পরে পাকিস্তান ইরাকের সামরিক হস্তক্ষেপকে সুনজরে দেখেনি। ব্রিটেনও এই চুক্তির স্বাক্ষরদানকারী থাকায় ২৮-২৯শে জুলাই লন্ডনে বাগদাদ চুক্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি মন্ত্রী পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বাগদাদ চুক্তি বলবৎ রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও উক্ত সভায় ইরাকের কোন প্রতিনিধি ছিল না। ১৯৫৯ সালে ২৪শে মার্চ একতরফাভাবে ইরাক বাগদাদ চুক্তি বাতিল করে এবং হাববানিয়া থেকে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর সদস্যদের বহিষ্কার করে।

কূটনীতি ঃ মহান জুলাই বিপ্লবের পর ইরানে নির্বাসিত ইরাকী রাজনীতিবিদেরা প্রত্যাগমন করতে থাকেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য রশিদ আলী আল-কিলানী ও মোল্লা মোস্তফা বারজানী। কতিপয় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দও যারা নুরী আস-সাঈদের আমলে দেশান্তরিত হয়েছিলেন, তারা স্বদেশে ফিরে আসেন। কাসেম ছিলেন একজন কট্টরপন্থী পশ্চিমা বিরোধী রাষ্ট্রনায়ক এবং তিনি URA (United Arab Republic) -এর সমর্থক ছিলেন। মিশরের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার তিনি চেষ্টা করেন। তাঁর উপ-প্রধানমন্ত্রী কর্নেল আরিফ ১৯৫৯ সালের ১৯শে জুলাই দামেস্কে জামাল আবদুল নাসেরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। উভয়ের সাক্ষাতের পর এক যৌথ ইস্তেহারে ইরাকে বিদেশী আগ্রাসনের প্রতিরোধ এবং আরব লীগের প্রতি সমর্থন দেন। উল্লেখ যে, ইরাক জর্দানের সাথে UAR-এর বিপরীত একটি আরব ফেডারেশন গঠন করে কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে জর্দান এই ফেডারেশন পরিত্যাগ করে। ইরাক সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং বামপন্থী রাজনীতির ফলে অতি শীঘ্র চীন ও রাশিয়া ইরাককে স্বীকৃতি দেয়। জেনারেল কাসেমের সরকারকে খুব জনপ্রিয় সরকার বলা যাবেনা। যদিও তিনি ভূমিসংস্কার করে জোতদারী বন্ধ করার চেষ্টা করেন। বিপ্লবী সরকার নাগরিকদের দ্বারা একটি মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করে, যা Popular Resistance Forces নামে পরিচিত ছিল।

কাসেম-আরিফ দ্বন্দ্ব ঃ ১৯৫৮ সালের জুলাই বিপ্লব সুষ্ঠুভাবে সমাধা হলেও এই অভ্যুত্থানের নায়ক কাসেমের সাথে তাঁর ডেপুটি আরিফের দ্বন্দ্ব বাধে। যদিও উভয়ে সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন তবুও কাসেম অপেক্ষা আরিফ ছিলেন উদারপন্থী। তিনি

www.pathagar.com

UAR-এর সঙ্গে ইরাকের সংযুক্তিকরণ সমর্থন করেন কিন্তু কাসেম ইরাককে একটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান। উপরন্তু আরিফ ছিলেন আরব বাথ (রেনেসাঁ) পার্টির ইরাকী শাখার সমর্থক। উল্লেখ্য যে, সমাজতান্ত্রিক, বামপন্থী রাজনীতিক মতবাদে পুষ্ট এই বাথ পার্টি অত্যন্ত ক্ষমতা ও প্রভাবশালী ছিল। দেওয়ান বেরীন্দ্রনাথ বলেন, "The Baathists played a leading and a glorious role in bringing about the 14th July Revolution in Iraq which finally overthrew monarchy and struck a severe blow to imperialism through the rejection of the system of military alliance like the notorious Baghdad pact" সন্দেহপরায়ণ এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী কাসেমের সঙ্গে আরিফের বিরোধ বাধে। বেরীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেন যে, "due to a variety of factors including lack of experience of the progressive forces and continued hold of reactionary elements inside the power structure of Iraq the 14th July Revolution soon degenerated into a despicable type of dictatorial rule with all the worst aspects of a right wing dictatorship." কাসেম তাঁর বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য স্বৈরাচারী নীতি অবলম্বন করেন এবং একটি ত্রাসের রাজ্য (reign of terror) কায়েম হয়। কাসেম তাঁর উপ-প্রধানমন্ত্রী আরিফকে সন্দেহবশতঃ উপ-সামরিক সর্বাধিনায়ক এবং উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করেন। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে স্বেচ্ছাচারী কাসেম তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আরিফকে মৃত্যুদন্ড দেন। ১৯৫৮ সালের ১০ই আগস্টে দুর্নীতি এবং ষড়যন্ত্র নিরসনের জন্য জারীকৃত আইন বলে অসংখ্য রাজনীতিবিদদের, এমন কি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের সন্দেহবশে গ্রেফতার এবং বিচারের পর কারারুদ্ধ ও মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। ১৯৫৯ সালের মার্চের মধ্যে কোন মৃত্যুদন্ড কার্যকরী করা হয়নি। আরিফ এবং কিলানীকে প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড ৭ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করা হয়। এই মৃত্যুদন্ডের প্রতিবাদে এবং কাসেমের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরোধিতা করে মন্ত্রী সভার ছয়জন সদস্য পদত্যাগ করেন। ফলে কাসেম পাঁচজন ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক (National Democratic), ছয় জন 'ফ্রি' অফিসার এবং তিনজন স্বতন্ত্র সদস্যদের নিয়ে একটি নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। এই সময় ইরাকের রাজনীতিতে দু'টি ধারা পরিলক্ষিত হয়; একটি নাসেরপন্থী, যারা প্যান-আরব জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী ছিল এবং অপরটি সমাজতন্ত্র-বামপন্থী রাজনৈতিক দল। দ্বিতীয় দলকে বাথ সোসালিস্ট পার্টি হিসেবে ইরাকে তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ, সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও সুশৃঙ্খল কর্মধারার জন্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

আরব বাথ সোসালিস্ট পার্টি ঃ আরব বাথ (রেনেসাঁ) সোসালিষ্ট (socialist) পার্টির প্রবক্তা ছিলেন মাইকেল আফলাক এবং সালাহ্-আল-বেতাব। ১৯৪০ সালে এই পার্টি কার্যক্রম শুরু করে এবং জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ

www.pathagar.com

করে। এই বাথ পার্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি– (১) আরব দেশ আরবদের জন্য অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ; (২) আরব রাষ্ট্রসমূহ একই ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের অধিকারী এবং গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ; (৩) সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ এবং ঔপনিবেশবাদ নির্মূল করে সকল আরব দেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করবে। প্রফেসর শিবলীর ভাষায়, "In its goal it is the Nationalist Arab humanist party and in its approach it is scientic and democratic, attached to a doctrine and to a revolutionary, militant and popular moral structure."। এই বাথ পার্টি সমাজতন্ত্রী ও বামপন্থী রাজনীতিকে প্রেরণা দেয় এবং শ্রমিক লীগ, ছাত্র সংগঠনসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে এর প্রভাব বিস্তার ঘটে। ১৯৫৯ সালের ৮ই মার্চ মসুলে একটি কমিউনিস্টদের দ্বারা আহুত র‍্যালী নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বিদ্রোহী গভর্নর কর্নেল আবদুল ওয়াহাব সাওয়াফে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং একটি বিদ্রোহী সরকার গঠন করেন। মসুলের সামরিক বিগ্রেডের জেনারেল নাদিম তাবাকচালী নিরপেক্ষ থাকেন। জেনারেল কাসেম মসুলে বোমা বর্ষণ করে কমিউনিস্টিদের দমন করেন এবং সাওয়াফ মৃত্যুবরণ করেন। জেনারেল তাবাকচালীসহ চারজন সামরিক অফিসারকে সামরিক আদালতে বিচার করা হয় এবং তাদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। কাসেমের স্বৈরাচারী নীতিতে ইরাকী জনগণ এবং বিশ্বের শক্তিবর্গ ব্রিটেন ও আমেরিকা ও UAR ইরাকী সরকারের উপর আস্থাহীন হয়ে পড়ে। ক্ষমতালাভ করে কাসেম নাসেরপন্থী এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং তাঁর স্বৈরাচারী একনায়কত্বের ফলে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেরা বুর্জোয়া, ছাত্র সমাজ, বুদ্ধিজীবী, বণিক, কৃষক তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। কাসেম UAR থেকে ইরাককে বিচ্ছিন্ন করেন এবং ১৯৫৯ সালের ১১ মার্চ বাগদাদের UAR-এর দূতাবাস বন্ধ করে কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের বহিষ্কার করেন। এর ফলে নাসের কাসেমকে কমিউনিস্টদের সমর্থক বলে আখ্যায়িত করেন।

কুর্দি সমস্যা ঃ জেনারেল আবদুল করিমের শাসনামলে ইরাককে মারাত্মক কুর্দী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কুর্দীগণ ১৯৫৯ সালের ১৪ই জুলাই কিরকুক আক্রমণ করে লুটতরাজ ও হত্যাকান্ড সংগঠিত করে। ইরাকী সেনাবাহিনী এবং Peoples Resistance Force-এর কুর্দি সদস্যগণ এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এবং সরকারি বাহিনী তাদের কঠোর হস্তে দমন করে। ৭ই অক্টোবর কুর্দীগণ কাসেমকে হত্যার চেষ্টা করে এবং তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। কাসেম রাজনৈতিক অসন্তোষ দূর করার জন্য ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। ফলে জাতীয় গণতান্ত্রিক দল (National Democratic Party) কুর্দিস্থান গণতান্ত্রিক দল (Kurdish Democratic Party)। স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি এবং ইরাকী ইসলামী পার্টি রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা শুরু করলেও রক্ষণশীল এবং লিবারেল পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আগস্ট মাসে ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টিও রাজনীতি শুরু করে। জেনারেল কাসেম কুর্দী সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হন; কুর্দি গণতন্ত্রী পার্টির প্রধান

www.pathagar.com

মোল্লা মোস্তফা বারজানীর নেতৃত্বে ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে কুর্দীগণ বিদ্রোহ করে এবং কেন্দ্রীয় বাগদাদ সরকারকে অস্বীকার করে মাহাবাদে একটি কুর্দী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কাসেমের সেনাবাহিনী তাদের বিধ্বস্ত করে দেয়। ১৯৬৩ সালে কাসেমের মৃত্যুর পর আরিফ ক্ষমতালাভ করেন।

১৯৬৩ সালের ৮ মার্চ তারিখে ইরাকের সোসালিষ্ট বার্থ পার্টির এক গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আব্দুল করিম কাসেমকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তাকে হত্যা করা হয়। এরপর ক্ষমতাশীন হন আব্দুল সালেম আরিফ। তিনি ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে বার্থ পার্টির সদস্যদের রেভলুশনারী (Revolutionary) কাউন্সিল থেকে বহিষ্কার করেন। ১৯৬৪ সালে একটি নতুন সংবিধান প্রণীত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৬৬ সালে তিনি মন্ত্রিপরিষদের দু'জন সদস্যসহ দুর্ঘটনায় নিহত হন। এরপর আব্দুল সালেম আরিফের ভাই আব্দুল রহমান আরিফ ইরাকের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তার বিরোধী দলকে দমিত করে তার শাসনকাল ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বর্দ্ধিত করেন। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে আরিফকে ক্ষমতাচ্যুত করেন মেজর জেনারেল আহম্মদ হাসান আল-বকর। আল-বকর প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও রেভলুশনারী (Revolutionary) কমান্ড কাউন্সিলের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন সাদ্দাম হোসেন। আল-বকরকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯৭৯ সালে সাদ্দাম হোসেন ইরাকের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন লৌহমানব এবং দৃঢ়তার সাথে সকল শিয়া ও কুর্দী বিদ্রোহ দমন করেন। সংখ্যালঘিষ্ট সুন্নীদের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সাদ্দাম হোসেন রক্তপাত ও কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। তার সময়ে ১৯৮০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সাত আল-আরবের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য ইরাকের সাথে ইরানের সংঘর্ষ বাধে। সাদ্দামের বাহিনী ইরানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পশ্চিমাঞ্চল দখল করে তেল সমৃদ্ধ এলাকায় কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ইরাক বাহিনী আবাদান এবং খুরাম শহর দখল করে।

সাদ্দাম হোসেনের উত্থান ও পতন

ইরাকের এক সময়ের লৌহ মানব এবং মুসলিম বিশ্বের পাশ্চাত্য আধিপত্যের প্রতিবাদী স্বর সাদ্দাম হোসেনের উত্থান ও পতন রূপকথার গল্পকেও হার মানাবে। ১৯৩৭ সালের ২৮ শে এপ্রিল উত্তর ইরাকের তিকরিতে তার জন্ম হয়। তার গ্রামের আসল নাম আওজা। তিনি এক দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের পূর্বেই তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। এ কারণে দারিদ্রপীড়িত তার পরিবার সাদ্দামকে তার মামার কাছে লালন পালনের জন্য পাঠান। তার মামার নাম খয়রুল্লাহ তালফান। সাদ্দামের জীবনে তার মামার অভূতপূর্ব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কথিত আছে যে, মামার নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও দুরন্ত সাদ্দাম শৈশবে উৎশৃঙ্খল হয়ে উঠেন। তথ্য সূত্র অনুযায়ী তিনি তার জনৈক স্কুল শিক্ষক এমন কি তার মামাত ভাইকে হত্যা করেন।

১৯৫৭ সালে অর্থাৎ বিশ বছর বয়সে সাদ্দাম হোসেন ইরাকের শাসন পরিচালনায় বাথ পার্টির সদস্য হন। তিনি এ সময় সামরিক প্রশিক্ষণ লাভের জন্য বাগদাদের

www.pathagar.com

সামরিক একাডেমীতে যোগদানের চেষ্টা করেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন। এর মূল কারণ ছিল যে, তিনি স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করেননি। যাহোক, অবশ্য পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালে প্রেসিডেন্ট আবু বকর সাদ্দামকে জেনারেলের পদবীতে ভূষিত করেন। ১৯৯৫ সালে সাদ্দাম ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করিম কাশেমকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। এ ঘটনাটি ঘটে ১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর। সাদ্দাম এ সময় আত্মরক্ষার জন্য ইরাক থেকে মিশরে চলে যান। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত চার বছরে তিনি মিশরে অবস্থান করেন এবং সেখানে হাইস্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি ইরাকে ফিরে আসেন। এ সময়ে ১৯৬৩ সালে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ইরাকে প্রথম বার্থ পার্টির কর্তৃত্ব ছিল। সাদ্দাম তখন একজন অপরিচিত কর্মী ছিলেন এবং সামরিক অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেননি। সামরিক অভ্যুত্থানে বার্থ পার্টি বিলুপ্ত হলে সাদ্দাম বার্থ পার্টির প্রতিরক্ষা ব্যূহ বা 'জিহাদ হানীন'কে সংগঠিত করেন। ১৯৬৮ সালের ১৭-৩০ জুলাই দ্বিতীয় বার্থ পার্টি সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময়ে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানে বার্থ পার্টির সুদক্ষ তরুণ সামরিক কর্মকর্তাগণ প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান আরিফের শাসন উৎখাত করে। এ সময়ে সাদ্দাম ছিলেন বার্থ পার্টির ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল। এরপর আহম্মদ হোসেন আল-বকর নামে সাদ্দামের এক আত্মীয় প্রেসিডেন্ট এবং রেভলুশনারী কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন। ১৯৬৮ সালের ৩০ জুলাই সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতা হরণের জন্য চক্রান্ত করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইব্রাহিম দাউদকে জর্দানে এবং প্রধানমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক নায়েককে মরক্কোতে নির্বাসিত করেন। ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে সামরিক ও বেসামরিক পদ থেকে সকল অ-বার্থ পার্টির সদস্যদের বহিষ্কার করা হয়। এভাবে সাদ্দাম ক্রমশ ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। ১৯৬৯ সালে নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট আল-বকর সাদ্দামকে রেভলুশনারী কমান্ড কাউন্সিল ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। এর ফলে সাদ্দাম আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা সংস্থার উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন।

১৯৬৯ সালে ইরাকে অনেক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং ইহুদি ও কুর্দিগণ এই হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। এমনকি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আবদুর রহমান আল-রাজ্জাককে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৫ বছর কারাদন্ড দেয়া হয়। অনুরূপভাবে ১৯৭০ সালের ১৫ মার্চে সন্দেহজনক শত শত কমিউনিষ্টদের গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হয়। ১৯৭০ সালের ১৫ অক্টোবর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হারদান আল-তিকরিটিকে পদচ্যুত করা হয়। তিনি পরে ১৯৫১ সালে ৩০ মার্চ কুয়েতে আততায়ীর হাতে নিহত হন। এভাবে উৎপীড়ন চলতে থাকে এবং সাদ্দাম ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে থাকেন। কুর্দি বিদ্রোহ দমনের জন্য কুর্দি নেতা মোল্লা মোস্তফা বারজানীর সাথে ইরাকী সরকারের একট চুক্তিতে কুর্দিস্থানে স্বায়ত্ব-শাসন প্রদানের অঙ্গিকার করা হয়। কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। কুর্দি বিদ্রোহ চরমে দেখা দেয় ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে। তখন তাদের উপর অগ্নি নির্গমন সূচক বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এর ফলে অসংখ্য কুর্দি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। ধারণা করা হয় যে, কুর্দিস্থানের জাখো এবং কালাত দিজা শহরে এ ধরনের বোমা নিক্ষেপের ফলে ৮০০০

www.pathagar.com

কুর্দি মারা যায়। ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাদ্দাম হোসেন সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ আলজিয়ার্সে ইরানের শাহের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে ইরাক ও ইরানের সীমান্ত নির্ধারিত হয় এবং ইরান কুর্দিদের কোন সমর্থন দিবে না বলে অঙ্গিকার করে। কুর্দিদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলে ১৯৭৫ সালে মার্চ এপ্রিল মাসে হাজার হাজার কুর্দি প্রাণ রক্ষার জন্য ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের মধ্যে কুর্দি নেতা মোল্লা মোস্তাফা বারজানী ছিলেন।

ইরাক সুন্নী অধ্যুষিত দেশ হলেও জনসংখ্যার মধ্যে শিয়ারা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এ কারণে সাদ্দাম ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বলপূর্বক অসংখ্য শিয়াকে ইরাক থেকে ইরানে বিতাড়িত করেন। শুধু তাই নয় ইরাকে শিয়াদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাদের সংখ্যা ১৯৮০ সালে ২,০০,০০০-তে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত আল-বকর প্রেসিডেন্ট থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল সাদ্দাম হোসেনের হাতে। ১৯৭৮ সালের অক্টোবরে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের অবিসংবাদী নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী ইরাকের নাজাফে বসবাস করতেন। কিন্তু ইরাক সরকার তাকে বিতাড়িত করে। খোমেনীকে ইরানের শাহ্ ইরান থেকে ইরাকে বসবাসে বাধ্য করেন।

১৯৭৯ সালের ১৬ জুলাই ৪২ বছর বয়সে লৌহমানব সাদ্দাম হোসেন প্রেসিডেন্ট আল-বকরকে অবসরে যেতে বাধ্য করে বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ইরাক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। ফলে সাদ্দাম একাধারে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদ একসঙ্গে দখল করেন, যেমন প্রেসিডেন্ট, রেভলুশনারী (Revolutionary) কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, প্রধানমন্ত্রী, বাথ পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সাদ্দাম স্টাফ ফিল্ড মার্শালের পদ মর্যাদায় সমাসীন হন। একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী সাদ্দাম সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তার বিরোধীদের নির্মমভাবে হত্যা করেন। ১৯৮০ সালের এপ্রিলে তিনি শিয়া ধর্মীয় নেতা সাঈদ মুহম্মদ বাকির আল-সদর এবং তার ভগ্নী বিনতি আল-হুদাকে হত্যা করেন। এর ফলে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মারাত্মক আকার ধারণ করে। ১৯৮০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ইরান ইরাকের মধ্যে সম্পাদিত আলজিয়ার্স চুক্তি বাতিল করে সাদ্দাম হোসেন ইরানের বিরুদ্ধে উস্কানীর অভিযোগ আনেন। ইরাকের সার্বভৌমত্ব্য লঙ্ঘনের অভিযোগে সাদ্দাম হোসেনের নির্দেশে ইরাকী বিমান বহর ইরানের সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায় এবং সে সাথে সাঁজোয়া বাহিনী ইরানে অভিযান করে। ১৯৮৭ সালে সাদ্দাম কুর্দিদের দমন করার জন্য আনফালে অভিযান পাঠান। এ অভিযানে ৪০০০ কুর্দি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং ১,৮০,০০০ কুর্দি নিহত হয়। ১৯৮৮ সালের মার্চে কুর্দি শহর হালারজায় গ্যাস বোমা মেরে অসংখ্য লোককে হত্যা করা হয়। আট বছর যুদ্ধ চলার পর ১৯৮৮ সালে ইরান ও ইরাকের মধ্যে যুদ্ধ স্থগিত হয়।

সাদ্দাম হোসেন ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট পার্শ্ববর্তী কুয়েতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। কুয়েতে অভিযান ব্যর্থ হয় কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (প্রথম)

www.pathagar.com

মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রেরণ করে সাদ্দামের আগ্রাসনকে প্রতিহত করেন এবং কুয়েত মুক্ত করেন। কিন্তু মার্কিন বাহিনী কুয়েতে অবস্থান গ্রহণ করলেও ইরাক থেকে তারা চলে আসে।

সাদ্দাম হোসেনের জীবনের শেষ অধ্যায় শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। পশ্চিমা দেশসমূহ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন ইরাকের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে যে ইরাক বহু যুগ ধরে মানুষ ধ্বংসের অস্ত্র (কেমিক্যাল ও মেক্যানিক্যাল) বা weapons of mass destruction যা পারমাণবিক ধরনের (nuclear) মজুদ করে রেখেছে। আন্তর্জাতিক এটমিক কমিশন ইরাকে সন্ধান করে এ ধরনের কোন অস্ত্রশস্ত্র খুজে পায়নি। তবুও গোঁয়াতুমী করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (দ্বিতীয়) ইরাকের উপর ব্রিটেনের সহায়তায় যৌথভাবে বোমারু বিমান দিয়ে আক্রমণের নির্দেশ দেন। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একদিকে আকাশ থেকে বোমারু বিমান ইরাকের উপর ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকে, অন্যদিকে Operation Desest Fox নামে মার্কিন, ব্রিটিশ যৌথ সামরিক অভিযান পরিচালনা করে কুয়েত থেকে। চার দিনের এই আগ্রাসনে সাদ্দাম হোসেনের পতন হয়। ২০০৩ সালে মার্চ মাসে প্রকৃতপক্ষে ইরাকে আগ্রাসন পরিচালিত হয় সাদ্দাম হোসেনকে তিকরিতের একটি খামার বাড়ীর মাটির গর্তের মধ্য থেকে উদ্ধার করে গ্রেফতার করা হয়। তার বিচার শুরু হয় ২০০৫ সালের অক্টোবরে। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিবাদে তা বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। যাহোক, ১৯৮২ সালে কুর্দিস্তানের দুজাইল এবং ১৯৮৮ সালে আনফালে কুর্দিদের গণহত্যার অভিযোগে তাকে আদালত দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির হুকুম দেয়। পরিশেষে সাদ্দামের জীবনের যবনিকাপাত হয় ২০০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বরে তখন তাকে গলায় ফাঁসী দিয়ে হত্যা করা হয়।

৭. তিউনিসিয়া

পটপ্রেক্ষিত ঃ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে খলিফা মু'য়াবিয়ার রাজত্বে সর্বপ্রথম আফ্রিকায় মুসলিম অভিযান প্রেরিত হয় এবং ওকবা-ইবন-নাফী বার্বারদের পরাজিত করে তিউনিসিয়া দখল করেন এবং কায়রোয়ানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে এই অঞ্চল এক জনবহুল মুসলিম অধ্যুসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। এরপর অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আগলাভিদ এবং হাফসীদ বংশ রাজত্ব করে। এরপর উত্তর আফ্রিকায় তিনটি প্রদেশ বা অজাক (Ojak) ছিল–তিউনিয়া, ত্রিপলী এবং আলজিরিয়া। ক্রীটবাসী একজন তুর্কী জেনাসারী বাহিনীর আগা মুরাদ পরিবারকে পরাজিত করে ১৭০৫ সালে 'বে' উপাধী ধারণ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনিই হোসেনিদ রাজবংশের (১৫৭৪-১৮৩৭) প্রতিষ্ঠাতা। এই হোসেনিদ পরিবার ১৯৫৬ সালে তিউনিসের স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হবার পূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করে, তবে সেটা নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বাধীন হলেও তিনি প্রথম দিকে তুর্কী সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করতেন; ইব্রাহিম আল-শরিফই প্রথম পাশা যিনি 'বে' এবং 'ডে'র অফিস একত্রিভূত করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনি ১৭০৫ সাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি আলজিরিয়ার আগা হোসেন ইবন আকি তুর্কি কর্তৃক বন্দী হন। যাহোক তাকে পরে আগা নিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৭৩৫ সালে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলী পাশা কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ১৭৪৮ সালে নিহত হন। আলী পাশা দশ বছর শাসন করেন এবং পরে হোসেনের পুত্র কর্তৃক নিহত হন। হোসেনি বংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করে এবং ১৮৫৮ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত বে মোহাম্মদ আল-সাদিক ইবন হোসেন (দ্বিতীয়) শাসন করেন। তিনি ১৮৮২ সালে ফরাসিদের সাথে বার্দো চুক্তি সম্পাদনা করতে বাধ্য হন এবং এর ফলে তিউনিসিয়া ফরাসি প্রটেকটরেটে পরিণত হয়।

ফরাসি প্রটেকটরেট (১৮৮৩-১৯৪৩) ঃ ১৮৮১ সালের এপ্রিলে ফরাসি দখলদার বাহিনী তিউনিসে আগমন করে এবং ১২ই মে মোহম্মদ আল-সাদিকের সঙ্গে বার্দো চুক্তি সম্পাদন করে। সাদিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বহাল থাকেন এবং ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীগণ তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব ফরাসিরা গ্রহণ করল। সাদেক পল কামব (Paul Cambon)-কে তিউনিসে রেসিডেন্ট জেনারেল নিযুক্ত করেন। পল কামবর রেসিডেন্সিকালে ফ্রান্সের সাথে তিউনিসিয়ার protectorate de jure ছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৮৩ সালে তাঁর পুত্র আলী বে ফ্রান্সের সঙ্গে আল-মারসা কনভেনসন (Al-Marsa convention) স্বাক্ষরিত করেন। এর ফলে তিউনিসিয়ায় ফরাসি প্রটেকটরেট স্থায়ী হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে এক সমঝোতার মাধ্যমে ফ্রান্স ১৮৭৮ সালে তিউনিসিয়া এবং বৃটেন সাইপ্রাস লাভ করে। এরপর ধীরে ধীরে ফরাসি আধিপত্যবাদ ও ঔপনিবেশিকবাদ সমগ্র তিউনিসিয়াকে গ্রাস করে। পররাষ্ট্র ও অর্থনীতি ফরাসি রেসিডেন্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং অভ্যন্তরীণ প্রশাসন হোসেনী বংশধরদের উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৮৮৪ সালে আল-মারসা চুক্তি অনুমোদিত হলে ফরাসি আধিপত্য সুদৃঢ় হয়। আল-মারসা কনভেনসনে ফরাসি রেসিডেন্ট জেনারেলকে সমগ্র দেশের প্রকৃত শাসকের ক্ষমতা দান করে। তাঁর বিচার, আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অসামান্য প্রভাব ছিল। 'বে' কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। রেসিডেন্ট জেনারেল মন্ত্রীসভা এবং বে কর্তৃক জারীকৃত আদেশে অনুমোদন করতেন। তিনি সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করতেন। তিউনিসিয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ফরাসিদের অবদান ছিল। এম. দিপেনী (M. Depiennni) অর্থ মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক নিযুক্ত হন।

প্রশাসনিক কাঠামো ঃ ফরাসি প্রটেকটরেটের আওতায় তিউনিসিয়ায় প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাস হয়। লক্ষণীয় যে, অন্যান্য আরব দেশের মত যেমন মরক্কো তিউনিসিয়ায় কোন সামন্ততন্ত্র ছিল না। প্রাদেশিক প্রশাসনে প্রাচীন ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। প্রদেশে একজন কায়েদ (Qaid) বা গভর্নর এবং একজন ডেপুটি কায়েদ খলিফা (Khalifa) নিযুক্ত করা হয়। তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতেন ফরাসি অফিসার বা Controleurs Civils। বিচার, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরামর্শের জন্য মহা কাউন্সিল (Grand Conseil) গঠন করা হয়। নীতিগতভাবে তিউনিসিয়া একটি

www.pathagar.com

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র মনে হলেও ফরাসি উপনিবেশিকগণ প্যারিস থেকে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ফরাসি উপনিবেশ ঃ জামিল এম. আবদুল নসর বলেন, "The protectorate opened Tunisia for French colonization by creating a suitable political and legal framework for the acquisition of land by the settlers"। ফরাসি ঔপনবেশিকগণ জমি ক্রয় করে স্থায়ীভাবে বসবাসই করেনি বরং তাদের নিজস্ব পত্রিকা ছিল; তারা নিজস্ব অঞ্চল গঠন করে যা কোলন (Colon) নামে পরিচিত। সরকারি চাকরির দুই-তৃতীয়াংশ ফরাসিরা দখল করে। এই সমস্ত কোলনে ১৬০,০০০ ফরাসিসহ বিদেশীদের বসবাস ছিল এবং ৪০,০০০ বিদেশী সৈন্য মোতায়েন করা হয়। এমনকি ডাক পিয়নও ছিল ফরাসি। তিউনিসিয়াকে একটি ইউরোপীয় কলোনীতে পরিণত করার জন্য ১৮৮৭ সালে একটি আইন জারী করা হয়। এই আইনের বলে তিউনিসিয়ায় তিন বছর বসবাসবাসী যে কোন ইউরোপীয়কে ফরাসি নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। ইউরোপীয় ঔপনিবেশ সুদৃঢ় করার জন্য ১৮৯৭ সালে উপনিবেশ ফান্ড সৃষ্টি করা হয়। এই ফান্ড থেকে অর্থ ঋণ মঞ্জুরী করা হয় যাতে ফরাসি, ইতালি বা অন্য কোন ইউরোপীয় জমি ক্রয় করতে পারে। কৃষিকাজের সুবিধার্থে একটি কৃষি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঃ তিউনিসিয়ায় ফরাসি প্রটেকটরেট থেকে ঔপনিবেশবাদের উত্তরণে স্বাধীনচেতা, জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, দেশপ্রেমিক, বুদ্ধিজীবী এবং প্রগতিবাদী তিউনিসিয়াবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। বস্তুতঃ প্রশাসন, কৃষি ব্যবস্থা, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং স্থানীয় সরকারে কেবলমাত্র তিউনিসিয়গণ অংশ গ্রহণ করে। ফলে স্বাধীনতা ছিল প্রহসন (semblance of power)। ফরাসি বিরোধী তিউনিসিয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলে বিশেষ কতকগুলো কারণ ছিল। যেমন–

(১) প্রটেকটরেট ও ঔপনিবেশবাদ ঃ ১৮৭৮ সালে ফরাসি আধিপত্য তিউনিসিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক নিষ্পেষণ শুরু হয়। 'বে'-র ক্ষমতা ফরাসি রেসিডেন্ট জেনারেল হরণ করেন (usurped)। প্রাদেশিক সরকারে কিছুটা অংশদারিত্ব থাকলেও কেন্দ্রীয় শাসন ছিল রেসিডেন্ট জেনারেলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ফলে প্রটেকটরেট এবং ঔপনিবেশবাদকে তিউনিসিয় জাতীয়তাবাদীরা মনে প্রাণে গ্রহণ করেনি।

(২) প্রশাসনিক বৈষম্য ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ পদ ফরাসিগণ দখল করে এক মারাত্মক প্রশাসনিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় শাসনের উপর রেসিডেন্ট জেনারেলের অসামান্য কর্তৃত্বই ছিলনা, প্রাদেশিক সরকারের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্যও ফরাসি বেসরকারি নিয়ন্ত্রণক (Controleurs Civils) নিযুক্ত করা হয়। ফরাসি কোর্ট, ফরাসি কোলন স্থাপন, ফরাসি ভাষা, ফরাসি ভাবধারা প্রচলন মুসলিম অধ্যুষিত তিউনিসিয়া বৈষম্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে, এমন কি ডাক পিওনও ফরাসিবাসী ছিল।

www.pathagar.com

(৩) **সামাজিক বৈষম্য ঃ** ফরাসি সরকার তিউনিসিয়ায় ইউরোপীয়দের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কৃষি ফান্ড সৃষ্টি করে ফরাসিদের জমি ক্রয় করতে উৎসাহিত করা হয় এবং এভাবে তিউনিসিয়ার একটি বিরাট অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে উঠে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ১৯১১ সালে ৭১,০০০ ইতালি এবং ২৪,০০০ ফরাসি নাগরিক বসবাস করত। ফরাসিদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ১৮৯৭ সালে কৃষি ঋণ দেওয়া হয় এবং অসংখ্য কোলন গঠিত হয়। ফলে ১৯৩০ সালে ইতালিয়দের তুলনায় ফরাসিদের সংখ্যা অধিক ছিল। তিন বছর তিউনিসিয়ায় বসবাস করলে (residency) যে কোন বিদেশীদের ফরাসি নাগরিকত্ব দেওয়া হত। এতদসত্ত্বেও পাঁচ বছরে মাত্র ১৫০ জন বিদেশী ফরাসি নাগরিকত্ব লাভ করে। এর ফলে তিউনিসিয়ার সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকত্বের প্রশ্নে জটিলতা দেখা দেয়।

(৪) **অর্থনৈতিক বৈষম্য ঃ** তিউনিসিয় 'বে' নামে মাত্র সুলতান ছিলেন। কারণ পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। তিউনিসিয়বাসীদের মধ্যে আর্থিক দৈন্য ছিল, অপর দিকে শোষণনীতির ফলে ফরাসিগণ ছিল ক্ষমতাবান ও বিত্তশালী।

(৫) **জনগোষ্ঠীর বৈষম্য ঃ** তিউনিসিয়ার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ছিল। মোট ৩,৬০০,০০০ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৪০,০০০ ইউরোপীয় ছিল এবং এর মধ্যে ফরাসি ব্যতীত ইতালীয় ও ইহুদীদের পৃথক কলোনী ছিল। প্রতি কলোনীতে ৮০,০০০ জনের বসবাস ছিল। ফরাসি-তিউনিসিয় যৌথ সার্বভৌমত্ব তিউনিসিয় অপেক্ষা ইউরোপীয়দের অধিকতর সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। এর ফলে তিউনিসিয়গণ ফরাসি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।

নব্য-তিউনিসিয় গোষ্ঠী ঃ ফরাসি দখলদার বাহিনীর আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে তিউনিসিয়ায় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়। তিউনিসিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে স্বাধীনচেতা উপজাতীয়গণ ফরাসি প্রটেকটরেটের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্র ধারণ করে। ১৮৮১ সালের মাঝামাঝি তারা দক্ষিণে আধিপত্য বিস্তারে বাধা দেয় এবং ফরাসি বাহিনীকে প্রতিহত করে। ১৮৮২ সালের মে মাসে ওয়াদী আল ফার্সিতে উপজাতীয়গণ ফরাসি বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে। এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়াও প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বে রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। এর প্রধান কারণ ফরাসিগণ মুসলিম জনগোষ্ঠীয় সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেনি। শারিয়া কোর্ট মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরন্তু, ফরাসি উপনিবেশবাদ স্বৈরাচারী ছিল না, জনমঙ্গলকর স্বেচ্ছাচারিতা ছিল। আবদুল নাসরের ভাষায়, "Paternalistic nature of the protectorate system" তিউনিসিয়ায় বসবাসকারী ফরাসিগণ প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠান এবং গণভোটে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবী করে। এর ফলে ১৮৯১ সালে Consultative conference-এর সৃষ্টি হয়। এই 'Conference উপনিবেশিকদের জন্য 'চেম্বাস অব কমার্স' এবং 'চেম্বার অফ এগ্রিকালচার' স্থাপন হয়। ১৯৮৬ সালের সাধারণ সভার দু'টি পরিষদে ফরাসিগণ প্রতিনিধিত্ব দাবী করে। উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এই কনফারেন্সে কোন

www.pathagar.com

তিউনিসিয় ছিল না। ফরাসি বিরোধী আন্দোলন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে দানা বাঁধেনি কারন, ধর্মীয় নেতা খায়েরউদ্দীনের অনুসারীগণ ফরাসি শাসনকে মঙ্গলজনক বলে মনে করেন এবং আধুনিকীকরণের (Modernization) প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করেন। খায়ের উদ্দীনের শীষ্য বশির সাফর (Bashir Safar) ১৮৮৮ সালে 'আল-হাদিরা' (capital) নামে আরবি ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করে আধুনিক ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা করেন। বশির একটি সংঘ সৃষ্টি করে খায়েরউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত সাদেকীয় কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্নাতকদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের জন্য ফরাসি কর্তৃপক্ষকে চাপ দেন।

আধুনিক শিক্ষা ঃ বশির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা ১৮৯৬ সালে খালদুনীয়া স্কুল প্রতিষ্ঠা করে গতানুগতিক ধর্মীয় বিষয় ছাড়া আধুনিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তিউনিসিয়গণ নব্য-তুর্কীদের মত যুব তিউনিসিয় হিসেবে পরিচয় দেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই সমস্ত সংস্কারপন্থী বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের যুব তিউনিসিয় হিসেবে দাবী করে। তারা ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতায় একটি আধুনিক উদারপন্থী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য সোচ্চার হয়। আরবি ভাষার পাশাপাশি তারা La Tunisien নামে ফরাসি ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করে এবং এর মাধ্যমে তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি ফরাসি জনগণের সমর্থন কামনা করে।

রাজনৈতিক দল ঃ তিউনিসিয়ার রাজনৈতিক আন্দোলনের পথিকৃত ছিলেন 'নব্য তিউনিসিয়গণ'। ১৯০৭ সালে আলী বাসর হামবাহ এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রধান শ্লোগান ছিল তিউনিসিয়দের জন্য তিউনিসিয়া। প্রেসিডেন্ট উইলসনের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি প্রতিষ্ঠায় গৃহীত হয় এবং তিউনিসিয়গণ এই নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীকার ও স্বাধীনতা লাভের আশায় আন্দোলন গড়ে তোলে। শেখ থালাবী ১৯২০ সালে 'দস্তুর' (Dastur) বা 'তিউনিসিয় সংবিধান দল' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন। দস্তুর পার্টি ফরাসি প্রতিরোধ দমন করে স্বাধীকার সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি করে। চল্লিশ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল রেসিডেন্ট জেনারেল লুসিয়ান সেন্ট (Lucien Saint)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'বে' অনুমোদিত সাংবিধানিক সংস্কার দাবী করে। 'বে' মোহাম্মদ আল-নাসির ইবন মোহাম্মদ ইবন হোসেন (১৯০৬-২২) ফরাসি সরকারের নিকট দাবী করেন যে, যদি দস্তুরকে সাংবিধানিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া না হয় তা হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং জনবিক্ষোভ ও হরতাল পরিচালিত হয়। কিন্তু দখলদার ফরাসি কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্দ্ধমান সাংবিধানিক আন্দোলনের ফলে শঙ্কিত হলে নব্য-তিউনিসিয় পার্টির নেতা আলী বাসার হানবা এবং আবদুল আজীজ আল-থালাবীকে গ্রেফতার করে নির্বাসিত করেন। যা হোক দস্তুর পার্টি সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালিত করে এবং রেসিডেন্ট জেনারেল সেন্ট উদারনীতি গ্রহণ করে সংস্কার প্রবর্তন করেন। ফরাসি ঔপনিবেশিকগণ দস্তুর ও নব্য-তিউনিসিয় দলের কার্যকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য একটি পাল্টা রাজনৈতিক দল গঠন করে। 'রেড হ্যান্ড' (Red Hand) নামে কোলনসমূহের জাতীয়তাবিরোধী সংগঠন সন্ত্রাসী

www.pathagar.com

তৎপরতা শুরু করে। এতদসত্ত্বেও ১৯৩৩ সালের মে মাসে আল-জাবাল-এ অনুষ্ঠিত সভায় দস্তুর পার্টি তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। ফলে দস্তুর পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে ১৯৩৩ সালে এর দফতর বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মুখপত্রের ছাড়পত্র বাতিল করা হয়।

হাবীব বরগুইবা ঃ ১৯৩৩ সালে পুরাতন দস্তুর পার্টি বিলুপ্ত হলে তিউনিসিয়ার বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদেরা একটি নতুন দল গঠনের চিন্তা ভাবনা করেন। ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে নতুন দস্তুর পার্টি গঠিত হয়। হাবীব বরগুইবা এবং তাঁর সহযোগী ড. মাহমুদ মাতেরী পূর্বের দস্তুর দল ত্যাগ করে নতুন দস্তুর সংঘ গঠন করেন। লক্ষ্যণীয় যে, পুরাতন দস্তুর দল ছিল গতানুগতিক ধ্যান-ধারণা পুষ্ট (old-fashioned) বুর্জোয়া দল, অন্যদিকে নতুন দস্তুর পার্টি পশ্চিমা ভাবধারায় অনুপ্রাণিত একটি জাতীয় দল। আব্দুল নাসির বলেন, "The Neo-Dastur Party was the political expression of the new elite"। এই দলের প্রধান বরগুইবা ও মাতেরী সাহেল অঞ্চল থেকে আসেন এবং এই দল সাহেলীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। সাহেলের কাসর হোল্লাতে এই নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে হাবীব বরগুইবার অবদান ছিল অসামান্য। তিনি ধর্মীয় ভিত্তিক রাজনীতির স্থলে ধর্মনিরপেক্ষ (secular) রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনউনিসিয়াকে পশ্চিমা রাষ্ট্রের অনুরূপ একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস পান। সাহেলের মুনাসতিরে বরগুইবা জন্মগ্রহণ করেন এবং সাদেকীয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাল্যশিক্ষা লাভ করে পরবর্তী পর্যায়ে কলেজে অধ্যায়ন করেন। Lycee cornot থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য প্যারিসে যান। যেখানে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ১৯২৭ সালে তিউনিসে প্রত্যাবর্তন করে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত থাকেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বরগুইবা তিউনিসিয়ার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সমাজের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারেননি। অপরদিকে তাঁর ফরাসি প্রশিক্ষণ থাকলেও তিনি ফরাসিবাসিদের নিকট সমাদর লাভ করেননি। অতঃপর ১৯২২ সালে তিনি দস্তুর পার্টিতে যোগদান করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি পুরাতন দস্তুর পার্টির নেতিবাচক রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়নি। অতঃপর ১৯৩৬ সালে এই পার্টি বিলুপ্ত হয়ে বরগুইবা ও মাতেরী একটি নতুন দস্তুর পার্টি গঠন করেন। নব গঠিত দস্তুর পার্টি সমগ্র তিউনিসিয়ায় বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে ফরাসি দখলদারী আধিপত্যের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে এবং বরগুইবা এক্ষেত্রে বিশেষ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে নতুন দস্তুর পার্টি স্থাপিত হবার ছয় মাসের মেধ্য এই দলটি ফরাসি সরকার কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হয় এবং বরগুইবাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সাহারার প্রান্তরে Bordi Le Boeuf-এ নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। এরপর ফরাসি 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকার ক্ষমতায় আসার পর বরগুইবা মুক্তি লাভ করেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বরগুইবা নতুন দস্তুর পার্টিকে সুসংবদ্ধ করেন। এই পার্টি গণতান্ত্রিক এবং কেন্দ্রীয় কাঠামোর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শাখা স্থাপিত হয়। এই সমস্ত শাখাগুলো একত্রিত হয়ে একটি ফেডারেশন সৃষ্টি করে। এই ফেডারেশনের পরিচালনার

www.pathagar.com

জন্য একটি নির্বাহী কমিটি ছিল এবং সদস্যবৃন্দ শাখাগুলো কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি রাজনৈতিক ব্যুরো (Political Bureau) নামে পরিচিত ছিল। এই ব্যুরোর সদস্যদের জাতীয় কংগ্রেস নির্বাচিত করত। পলিটিক্যাল ব্যুরোর কার্যক্রম নিরীক্ষণের জন্য একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়। বরগুইবার সাংগঠনিক ক্ষমতা, দক্ষতা ও রাজনৈতিক মেধা ছিল অপরিসীম। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত নতুন দস্তুর পার্টির প্রেসিডেন্ট ছিলেন ড. মাহমুদ মাতেরী এবং বরগুইবা ছিলেন মহাসচিব। বরগুইবার অক্লান্ত পরিশ্রমে নতুন দস্তুর পার্টির সদস্য সংখ্যা ১৯৩৭ সালে ১০০,০০০-তে দাঁড়ায় এবং সমগ্র দেশে এই পার্টির শাখা ছিল ৪৮০টি। বরগুইবা পুরাতন দস্তুর পার্টির কার্যক্রম নির্মূল করার চেষ্টা করলে ড. মাতেরীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয় এবং তিনি পার্টির প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দস্তুর পার্টির সর্বেসর্বা নেতৃত্ব লাভ করেন বরগুইবা। দস্তুর পার্টির সাংগঠনিক বিন্যাস এমনই সুষ্ঠু ছিল যে ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বরগুইবা অন্তরীণ অথবা নির্বাসিত জীবনযাপন করলেও পার্টির কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

রাজনৈতিক সঙ্কট ঃ ১৯৩৮ সালে নতুন ও পুরাতন দস্তুর পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও হানাহানি শুরু হয়। ১৯৩৮ সালের ৯ই এপ্রিল তিউনিসে দাঙ্গা হয় এবং নতুন দস্তুর পার্টির একজন প্রভাবশালী সদস্য আলী আল-বালহাওয়ানকে গ্রেফতার করা হয়। পরের দিন তাকে আদালতে চালান দেওয়ার সময় দস্তুর পার্টির সদস্যগণ তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করে কিন্তু পুলিশের গুলিতে ১১২ জন নিহত হয় ও ৬২ জন আহত হয়। তিউনিসিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই প্রথম রক্তপাত ঘটে। ১৯৩৮ সালে বরগুইবাকে গ্রেফতার করে প্যারিসে নির্বাসিত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়। ১৯৪২ সালে মুনসিফ বে সিংহাসনে আরোহণ করে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ফরাসি সরকারের নিকট প্রটেকটরেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ তিউনিসিয় সদস্যদের নিয়ে একটি পরামর্শ পরিষদ (Consultative Assembly) গঠনের জন্য চাপ দেন। ১৯৪২ সালে নভেম্বরে জার্মান ও ইতালি সেনাবাহিনী উত্তর আফ্রিকার বিশেষ করে আলজিরিয়া এবং মরক্কোতে অবতরণ করে। তখন তিউনিসিয়ার ফরাসি সরকারের পতন হয় এবং মুনসিফ বে একটি জাতীয় সরকার গঠন করেন। তিনি তাঁর মন্ত্রী সভায় ড. মাতেরী এবং সালাহ্ ফারহাদকে অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু ১৯৪৩ সালে মিত্র বাহিনী তিউনিসে প্রবেশ করলে ফরাসি আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুনসিফ বে-কে পদচ্যুত করে ফ্রান্সে নির্বাসিত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বরগুইবার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। তিনি প্রথমে মার্শেতে এবং পরে রোমে বন্দী জীবনযাপন করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি মুক্তি লাভ করে তিউনিসে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি প্রয়োজনের খাতিরে নাযী জার্মানীর সমর্থন করলেও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ফ্রান্সের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিউনিসিয়ায় শাসকের পরিবর্তন হয় এবং মোহাম্মদ মুনসিফ বে-কে নির্বাসিত করে তার স্থলে ১৯৪৩ সালে সাঈদ মোহাম্মদ আল-আমীন বে

www.pathagar.com

অভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল এবং স্বাধীনতা বিরোধী। এর ফলে জাতীয় সরকারের পরিবর্তে ফরাসি সমর্থন পুষ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভার নেতৃত্ব দেন সেনিক সালাহউদ্দিন বাকাউচি (Shenik Salah-al-Din Baccouche) এবং নতুন রেসিডেন্ট জেনারেল মাস্ট (Mast) তিউনিসিয়ায় ফরাসি আধিপত্য সুদৃঢ় করেন। যাহোক, একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে বরগুইবার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তিউনিসিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সুদূরপ্রসারী হয়। ইমামউদ্দিন দস্তুর পার্টির সম্বন্ধে বলেন, "The New Dastur Party of Bourguiba was neither pan-Islamic, nor pan-Arabic; it followed the western pattern in political organisation and handled the situation having a thoroughly French way of understanding"।

স্বাধীনতা আন্দোলন ঃ ১৯৪৩ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বরগুইবা ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক সংগঠন, আন্দোলন ও তৎপরতার মধ্যে কাটান। ১৯৪৫ সালে তিনি গোপনীয়ভাবে দেশ ত্যাগ করে তিউনিসিয়ার স্বাধীনতার জন্য সমর্থন লাভের আশায় বিদেশ সফর করেন। তিনি সর্বপ্রথম মিশরে গমন করেন এবং সেখানে আরব লীগের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেন। এরপর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষসহ এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকায় ভ্রমণ করে তিউনিসিয়ার স্বাধীনতার স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। স্বদেশে নতুন দস্তুর পার্টির মহাসচিব সালাহ্ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ইত্যবসরে নতুন দস্তুর পার্টি ছাড়াও কতিপয় শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা স্বাধীনতা সংগ্রামে দস্তুর পার্টির সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, যেমন Union generale Tunistenne du Travail (UGTT) এবং Confederation generale des Travailleurs (C. G. T)। ১৯৪৬ সালের ২৩শে আগস্ট তারিখে যে সর্বদলীয় ফ্রন্টের সভা আহ্বান করা হয় তাতে UGT T, CGT এবং দস্তর পার্টি ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলও যোগদান করে। এই সভা ফরাসি পুলিশ বাহিনী ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু আন্দোলন অব্যহত থাকে এবং উদারপন্থী নতুন রেসিডেন্ট জেনারেল এম. জ্যা মন (M. Jean Mons) জাতীয়তাবাদী নেতা মোস্তফা কা'ক (Mustafa Ka'ak)-কে প্রধানমন্ত্রী করে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রী সভায় ফরাসি এবং তিউনিসির মন্ত্রীদের সংখ্যা ছিল সমান। বে-র প্রশাসনিক এবং সাংবিধানিক অবস্থান ছিল এই যে, তিনি রাষ্ট্র প্রধান (sovereign) ছিলেন কিন্তু প্রকৃত শাসক (ruler) ছিলেন না। অবশ্য প্রটেকটরেটের আওতায় বে-র সার্বভৌমত্তকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে, তিউনিসিয়ার যৌথ সার্বভৌমত্তের (co-sovereignty) প্রশ্ন দেখা দেয়। এর ফলে, ফরাসি ঔপনিবেশিক এবং তিউনিসিয়ার জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিরোধ বাধে। যা হোক, ১৯৫০ সালে ফ্রান্সে সরকার পরিবর্তন হলে প্রধানমন্ত্রী রবার্ট শুম্যান (Robert Schuman) তিউনিসিয়ার রেসিডেন্ট জেনারেলকে বে-এর নেতৃত্বে একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকার গঠনের লক্ষ্যে অনুমোদন প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন। মোহাম্মদ চেনিকের (Muhmmad Chenik)-এর নেতৃত্বে মন্ত্রী সভা গঠিত হয়

www.pathagar.com

এবং পুরাতন দস্তুর পার্টি থেকে সালাহ ফরহাদকে এবং নতুন দস্তুর পার্টির সালাহ বিন ইউসুফকে এই মন্ত্রী পরিষদে স্থান দেওয়া হয়। চেনিক ১৯৫২ সালে মন্ত্রী পরিষদের তিনজন সদস্যসহ প্যারিসে গমন করেন এবং তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা দাবী করেন। এই পদক্ষেপে ফরাসি ঔপনিবেশিকগণ বিচলিত হয়ে পড়ে এবং তাদের সন্ত্রাসী দল 'রেড হ্যান্ড' দাঙ্গা বিক্ষোভ দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনকে বানচাল করার চেষ্টা করেন। এই ফরাসি সন্ত্রাসীগণ UGT T-এর নেতা ফরহাদকে হত্যা করে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রভাবে রেসিডেন্ট, দমন নীতি গ্রহণ করেন এবং বরগুইবা নতুন দস্তুর দলের সাত দফা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। চেনিক সরকারের পতন হয় এবং ১৯৫২ সালের ১৮ই জানুয়ারি বরগুইবাকে গ্রেফতার করা হয়। চেনিক মন্ত্রী পরিষদের পতনের পর তিউনিসিয়ায় আরও দু'টি মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয় ১৯৫২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। কিন্তু এই মন্ত্রী পরিষদ স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি, কারণ তারা যৌথ ফরাসি তিউনিসিয় সার্বভৌমত্বের পক্ষপাতী ছিল। এই সময়ে জাতিসংঘে তিউনিসিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু আমেরিকার ও মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর চাপ সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। নির্যাতন, নিপীড়ন ও রাজনৈতিক নিষ্পেষণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে সমগ্র তিউনিসিয়ায় বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, সন্ত্রাসী আন্দোলন শুরু হয় এবং তিউনিসিয়গণ ফরাসি পুলিশ ফাঁড়ি, ঘরবাড়ি, সংস্থা আক্রমণ করে। উৎপীড়ক রেসিডেন্ট de Hautecloque কে প্রত্যাহার করা হয় এবং তার স্থলে M Pierre Voigard-কে নিযুক্ত করা হয়। নতুন রেসিডেন্ট বে এবং রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সহযোগিতা করে একটি নতুন মন্ত্রী সভা গঠনের চেষ্টা করেন ও সংস্কার সুদূরপ্রসারী করেন। সরকারি চাকরিতে তিউনিসিয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ সালে মোহম্মদ সালাহ মাজলী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করে। তিউনিসিয় আইন পরিষদে তিউনিসিয়দের সংখ্যা ৪৫ তে বৃদ্ধি পায়।

স্বায়ত্ব শাসন ঃ ১৯৫৪ সালে তিউনিসিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতি হতে থাকে। দমন নীতি তিউনিসিয়দের বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ফরাসি উপনিবেশিকবাদের সন্ত্রাসী দল 'রেড হ্যান্ডের' বিপরীতে তিউনিসিয় গেরিলা বাহিনী (fellaga) গঠন হয়। তাদের সংখ্যা ৩০০০-এ পৌঁছায় এবং ফরাসি উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে পাহাড়ী অঞ্চল থেকে তারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে। অধিকাংশ নেতাদের অন্তরীণ করা হয়; এমন কি UGTT-এর নেতা ফরহাদ হাসাদকে হত্যা করা হয়। ১৯৫৪ সালে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ৩০শে জুলাই ফরাসি সরকার পিয়ে মেনডে ফ্রান্স (Pierre mendes-France) বাধ্য হয়ে নতুন দস্তুর পার্টিকে বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকার করেন এবং তিউনিসিয়াকে নীতিগতভাবে স্বায়ত্তশাসন প্রদানে বাধ্য হন। পিয়ে তিউনিসিয়ায় আসেন এবং বরগুইবাকে মুক্তি দান করেন। তাহির বিন আম্মারের নেতৃত্বে একটি নতুন সরকার গঠিত হয়। কিন্তু ৫ই ফেব্রুয়ারি পিয়ের সরকারের পতন হলে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রশ্ন

www.pathagar.com

অমীমাংসিত রয়ে যায়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি বরগুইবা প্যারিস থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ফ্রাঙ্কো তিউনিসিয়া কনভেনশনের সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি তিউনিসিয়া দলের নেতৃত্ব দেন। সন্ত্রাসী দল রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং ফরাসি সরকার ১৯৫৫ সালের ২২শে এপ্রিল বরগুইবার স্বাধীকার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সম্মত হলে তার নতুন দস্তুর পার্টির উগ্রপন্থী সদস্য সালাহ বিন ইউসুফ এই চুক্তিকে অগ্রাহ্য করেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন। যাহোক ১৭ই নভেম্বর নতুন দস্তুর পার্টির সর্বোচ্চ কাউন্সিল বরগুইবাকে আলাপ-আলোচনার জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান করে। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য বরগুইবা স্বায়ত্তশাসনের প্রটোকল গ্রহণ করেন। ফরাসি সরকার ১৯৫৫ সালের ৬ই নভেম্বর মরক্কোতে স্বাধীনতা দান করলে পার্শ্ববর্তী ফরাসি শামি-তিউনিসিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়। বরগুইবা নব গঠিত ফরাসি সমাজতান্ত্রিক সরকারের নিকট স্বাধীনতা প্রদানের দাবী জানান। প্রধানমন্ত্রী এম. এডগার ফরে (M. Adgar Faure) ১৯৫৬ সালের ২০শে মার্চ তারিখে তিউনিসিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেন। তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে হাবীব বরগুইবার অসামান্য অবদান রয়েছে।

তিউনিসিয় প্রজাতন্ত্র ঃ দীর্ঘ ২৫০ বছরের স্বৈরাচারী সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র এবং ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের পর ১৯৫৬ সালের ২০শে মার্চ ফ্রান্স তিউনিসিয়াকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। অদ্যাবধি এই দিনটি তিউনিসিয়ানদের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। মার্চ মাসে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বরগুইবা কর্তৃক প্রস্তাবিত সকল সদস্য নির্বাচিত হন। এদের মধ্যে নতুন দস্তুর পার্টির উদারপন্থী সদস্য, স্বতন্ত্র এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি ছিল। বিভিন্ন মতবাদ ও গোষ্ঠীর সদস্যগণ বরগুইবার নেতৃত্বে একটি সুসংঘবদ্ধ সংসদ গঠনকরে এবং বরগুইবাকে মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব দেয়। বরগুইবার মনোনীত সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় নতুন দস্তুর পার্টির সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের নেতা সালাহ ইবন ইউসুফকে তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত করা হয়। ফ্রান্সের সমর্থনে তিউনিসিয়া জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিউনিসিয়বাসী প্রাধান্য লাভ করে। অবশ্য প্রশাসনিক শূন্যতা যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য ফরাসি কর্মচারীদের এক-তৃতীয়াংশ সরকারি পদে বহাল রাখা হয়। তিউনিসিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বরগুইবা সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং আরবীর পাশাপাশি ফরাসি ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেননি। তিনি যেমন ফরাসি আদালত বাতিল করেন তেমনি শারিয়া কোর্টও উচ্ছেদ করেন। বরগুইবা তিউনিসিয়াকে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। তিউনিসিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং নতুন দস্তুর পার্টির রাজনৈতিক বিজয়ের ফলে দুর্বর ও প্রাচীন হোসেনি রাজবংশের উচ্ছেদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ('Thus the logical outcome of the Neo Dastur victory was the abolition of the monarchy'—

www.pathagar.com

Nasr) বরগুইবার নেতৃত্বে সংসদে ভোটের মাধ্যমে ১৯৫৭ সালের ২৫শে জুলাই রাজতন্ত্র বাতিল করা হয়। আমীন বে সিংহাসনচ্যুত হন এবং নব প্রতিষ্ঠিত তিউনিসিয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে বরগুইবা শপথ গ্রহণ করেন।

তিউনিসিয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হাবীব বরগুইবার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৮. লিবিয়া

পটভূমি ঃ আধুনিক লিবিয়ার লৌহ মানব মুয়াম্মের গাদ্দাফী ছিলেন মজ্জাগতভাবে একজন বিপ্লবী নেতা। ১৯৬৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর থেকে অদ্যাবধি তিনি লিবিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বি, প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ক। ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫১০) স্পেনীশ ঔপনিবেশিকদের দখলে প্রথম তিউনিস পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় এবং ১৫০০ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত লিবিয়ার ইতিহাস শোষণের ইতিহাস। লিবিয়ার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে ভৌগোলিক অবস্থান এবং কৌশলগত দিক থেকে লিবিয়া সব সময় বিদেশী শক্তির প্রলোভনে পড়ে। ১৫১০ থেকে ১৫৫১ সাল পর্যন্ত স্পেন এবং সেন্ট জনের লাইট হসপিটালিয়ার্সদের দখলে থাকার পর অটমান তুর্কিগণ এই দেশ ১৫৫১ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত শাসন করে। এরপর ইতালিয়রাই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা লিবিয়াকে একটি কলোনীতে পরিনত করে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত শাসন করে। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিবিয়াই ছিল মিত্রবাহিনী এবং এক্সিস শক্তিবর্গের সংঘর্ষ স্থল। ১৯৪২ সালের ২৩শে অক্টোবর জেনারেল মন্টোগোমারী, যিনি Desert Fox নামে পরিচিত ছিলেন, ইতালি ও জার্মান যৌথ বাহিনীকে আল-আমেনের যুদ্ধে পরাজিত করে লিবিয়ায় ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিপলী ব্রিটেনের অধিকার আসে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯০৭ সালে হেগ কনভেনশন অনুযায়ী লিবিয়ায় ফরাসি ও ব্রিটিশ যৌথ আধিপত্য কায়েম হয়। এই সময়ে সাঈদ ইদ্রিস আল-সানুসী লিবিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি ১৯৫১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ট্রিপলিটানিয়া, সাইরিনায়ইকা এবং ফোজান নিয়ে গঠিত সংযুক্ত লিবিয়া রাজ্যের আমীর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এই মর্মে ইতিপূর্বেই জাতিসংঘে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫১ সালে একটি সংবিধানও প্রণীত হয় এবং ইদ্রিসী বংশ ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করে। এই রাজবংশ স্বৈরাচারী নয়, সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ছিল। সংবিধান প্রণীত হলে প্রথম নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ফেডারেল পদ্ধতির প্রশ্নে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিরোধ বাধে। ফলে, লিবিয়ায় চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সাংবিধানিক সঙ্কটের সূচনা হয়।

রাজনৈতিক অচলাবস্থা ঃ ১৯৫১ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত লিবিয়ায় প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক নৈরাজ্য বিরাজ করে। পরপর কয়েকটি মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়, যেমন মাহমুদ আল-মুনতাসির (২৯ শে চার্চ, ১৯৫১-১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪ সাল)। মোহাম্মদ আল-সাকীয়লী (১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪-১১ই এপ্রিল, ১৯৫৪), মোস্তফা বিন হালিম

www.pathagar.com

(১২ই এপ্রিল ১৯৫৪-২৩শে মে, ১৯৫৭), আবদুল মজিদ কুবরে (২৬শে মে, ১৯৫৭-১৬ই অক্টোবর ১৯৬০), মোহাম্মদ বিন ওসমান বিন সাঈদ (১৬ই অক্টোবর, ১৯৬০-২১শে মার্চ, ১৯৬৩), ড. মহিউদ্দীন ফেকীনী (২১শে মার্চ, ১৯৬৩-২৪শে জানুয়ারি, ১৯৬৪), মাহমুদ আল-মুনতাসির (২৪ই জানুয়ারি, ১৯৬৪-২১শে মার্চ, ১৯৬৫); হোসেন মায়েক (২১শ মার্চ, ১৯৬৪-২৮শে জুন, ১৯৬৭), আবদুল কাদির বদরী (জুন, ১৯৬৭-অক্টোবর, ১৯৬৭), আব্দুল হামিদ বাক্কুস (অক্টোবর ১৯৬৭-সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮), ওয়াননীস গাদ্দাফী (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮-সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯)। গাদ্দাফীই ছিলেন ইদ্রিসী রাজবংশের সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী।

বিপ্লবের কারণ ঃ লিবিয়ার বিপ্লব-পূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিই সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি বিপ্লবী আন্দোলনে সহায়ক ছিল। বলাই বাহুল্য, সমস্ত বিপ্লবের পশ্চাতে থাকে রাজনৈতিক শূন্যতা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। লিবিয়া বিপ্লবের কর্ণধার ছিলেন কর্নেল গাদ্দাফী এবং তিনিই রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। হেনরী হাবীব বলেন, "The story of the Libyan revolution is an expression of what the people of Libya had long desired"। গাদ্দাফীও বলতেন যে, বিপ্লব সামরিক বাহিনী দ্বারা সংঘটিত হয় না, জনগণের দ্বারাই এটি সম্ভব। সামরিক বাহিনী কেবল এই বিপ্লবে সহযোগিতা (vanguard) করে। লিবিয়ার বিপ্লবের মূলে বিবিধ কারণ ছিল ঃ

(১) উপনিবেশবাদ (colonialism) ঃ লিবিয়া ১৫১০ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল বিদেশী দখলদার বাহিনীর করতলগত ছিল। ইদ্রিসী বংশের রাজা নামে মাত্র শাসক (Sovereign de jure) ছিলেন। ফলে লিবিয় জনগণের স্বাধীকার, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা সুদূর পরাহত হয়।

(২) রাজতন্ত্রের বিরোধিতা ঃ দখলদার বাহিনীর করায়ত্ত হয়ে লিবিয়ায় রাজতন্ত্র ইউরোপীয় ও আমেরিকার প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। জনগণ উপলব্ধি করে যে, ইদ্রিস চুক্তি ও মিত্রতার মাধ্যমে লিবিয়াকে ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ করে তোলেন। এই দুই পরাশক্তির সামরিক ঘাঁটি ছিল লিবিয়াতে।

(৩) ফেডারেল ব্যবস্থা ঃ লিবিয়াকে মিত্রশক্তি তিনভাগে ভাগ করে ঃ (১) ট্রিপলিটানিয়া (২) সাইরিনায়ইকা (cyrenaica) এবং (৩) ফেজান। সাইরিনায়ইকায় ব্রিটিশ এবং ফেজানে ফরাসি আধিপত্য অক্ষুণ্ন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন সময়ে লিবিয়া একটি সংযুক্ত লিবিয় রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৫১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর সাঈদ মোহাম্মদ ইদ্রিস আল-সানুসী এই সংযুক্ত রাজ্যের আমির বা প্রধান নিযুক্ত হলেও লিবিয়ার স্বাধীনতা প্রশ্নে রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতবিরোধ হয়। বিশেষ করে ট্রিপলিটান ন্যাশনাল কংগ্রেস সানুসীর ফেডারেল ব্যবস্থার বিরোধিতা করে। এ ছাড়া সাইরিনায়কাদের সঙ্গে ফেজানদের বহু দিনের শত্রুতা ছিল। প্রথম অঞ্চলটি ব্রিটিশ এবং দ্বিতীয় অঞ্চলটি ফরাসি শাসনাধীন ছিল। ফেজান পরিবারের সদস্য প্রভাবশালী আহমদ সাঈফ আল-নসর ফরাসিদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

www.pathagar.com

(৪) বিদেশী ঋণ ঃ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে লিবিয়া বিদেশী ঋণের উপর প্রকটভাবে নির্ভরশীল ছিল। ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-লিবিয় চুক্তির ফলে লিবিয়া বৃটেন থেকে ৩.৭৫ মিলিয়ন লিবিয় পাউন্ড সাহায্য লাভ করে এবং এর পরিবর্তে লিবিয়ায় ব্রিটেন সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ লাভ করে। আমেরিকাও ত্রিপলীর নিকট হুইলাস ফিল্ডে (Wheelus field) বিমান ঘাঁটি স্থাপন করে। এর জন্য আমেরিকা লিবিয়াকে ১৯৫৪ সালে ৪,০০০,০০০ মার্কিন ডলার দান করে। এ ছাড়া point four programme অনুযায়ী অর্থাৎ শিক্ষা, কৃষি, জনস্বাস্থ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমেরিকা ১৯৫১-৫২ সালে ২,২৭০,০০০ ডলার ব্যয় করে। শুধুমাত্র ব্রিটেন ও আমেরিকায় নয় ফ্রান্স, ইতালি, মিশর ও তুরস্কও লিবিয়ার উন্নয়নে বার্ষিক ঋণ দান করে। এর ফলে লিবিয়া তার স্বকীয়তা, স্বাধীকার ও সার্বভৌমত্ব হারিয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

বিপ্লবের ধারা ঃ ১৯৬৯ সালে লিবিয়ায় যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তার ফলে দেশের ভাগ্য পরিবর্তন হয়। উল্লেখ্য যে, এই অভ্যুত্থান দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, বিদ্বেষ ও প্রতিরোধের ফল। ১৯৫৬ সালে প্রথম গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয় এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৬৯ সালে। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ইতালিয় ফরাসিদের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ১৯৫৬ সালে প্রথম জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে ইঙ্গ-ফরাসিদের সহযোগিতায় ইসরাইল মিশরের উপর হামলা করে। লিবিয়ার ক্ষোভের প্রধান কারণ এই যে, ইসরাইলী আগ্রাসনে বৃটেন লিবিয়ার ঘাঁটি থেকে পার্শ্ববর্তী একটি ভ্রাতৃপ্রতিম আরব দেশ বিমান আক্রমণ চালায়। বিদেশী শক্তির লিবিয়ার ঘাঁটি ব্যবহার স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। জনগণ তিনটি দাবী করে ঃ (১) লিবিয়ার সমস্ত ঘাঁটি থেকে বিদেশীদের প্রত্যাহার করতে হবে এবং কোন বিদেশী ঘাঁটি থাকবে না; (২) ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত সকল আরবদেশকে সামরিক সাহায্য দিতে হবে; (৩) ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধে পেট্রোলিয়ামকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ১৯৬৪ সালের লিবিয়াকে বিদেশী সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ শুরু হয় এবং মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের অনেকে নিহত হয়। জনগণের চাপে প্রধানমন্ত্রী মুনতাসির ঘোষণা করেন যে, অতি শীঘ্র ইউ. কে. এবং ইউ.এস. এ.র সামরিক ঘাঁটি প্রত্যাহার করবে। ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের নিকট মিশরের পরাজয়ে সমগ্র আরব বিশ্বে এক শোকের ছায়া নেমে পড়ে এবং zionist সরকারের মদদদানকারী ইউ. কে. এবং ইউ. এস. এ-এর উইলাস ঘাঁটি বিরুদ্ধে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। কিন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশী দখলদার বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের যখন কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখন কতিপয় লিবিয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ তেলকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য চাপ দেয়। এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ছিলেন ইব্রাহিম আল–গেয়ুইল (Ibrahim al-Gheweil), আলী ওয়ারিথ (Ali Warth), ইয়্যুদ্দীন আল-গাদামসী (Izzedine al Ghadamsi), শেখ মাহমুদ সোভী (Sheaik Mahmud Sobhi)। এই ব্যক্তিবর্গ ত্রিপলী কমিটি গঠন করে বেনগাজীর

www.pathagar.com

নেতৃবর্গের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়। তারা প্রধানমন্ত্রী মুনতাসিরের উপর তেল অবরোধের দাবী জানায় এবং শ্রমিক ইউনিয়ন হরতাল এবং কর্মবিরতি পালন করে। এর ফলে ১৯৬৭ সালের ১৯শে জুন থেকে ৩রা জুলাই পর্যন্ত তেল উত্তোলন বন্ধ ও সরবরাহ স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল প্রধানমন্ত্রী বদবী এই বিক্ষোভ ও আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করেন এবং তেল উৎপাদন শুরু করেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন, গণ বিক্ষোভ, হরতাল ও কর্মবিরতির মাধ্যমে লিবিয়াকে স্বাধীন করার প্রয়াস চলে কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতা ও নেতৃত্বের অভাবে বেসরকারি পর্যায়ে এই আন্দোলন কার্যকরী হয়নি। লিবিয়ার দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনী রাজনৈতিক গতিধারা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে এবং তারাই পরবর্তীকালে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৭ সালের ৮ই জুন হোসেন আল-ফাদইকী দুই ডিভিশন সেনাবাহিনী সহ মিশরে চলে যান (defect)। এই বাহিনী মিশরীয় বাহিনীর সাথে একত্রে ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। দেশত্যাগী সৈন্যগণ লিবিয়ায় অবস্থানরত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। ইতিমধ্যে 'লিবিয় ফ্রি ইউনিয়নিস্ট অফিসারস' (Libyan Free Unionist Officers) নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করা হয়। এই ফ্রি অফিসারবৃন্দ তাৎক্ষণিকভাবে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। ১৯৬৯ সালের ৯ই আগস্ট বিপ্লবের দিন ধার্য হয়।

সামরিক বিপ্লব ঃ ১৯৬৭ সালের ৮ই অক্টোবর মুফতাহ আল-শরিফ এবং ফাতেহ আল-তাহার নামে দু'জন লিবিয় বৈমানিক লিবিয়া থেকে তাদের বিমান নিয়ে বিদ্রোহ করে পার্শ্ববর্তী কোন আরব দেশে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে তাদের সামরিক আদালতে বিচার হয় এবং ছয় মাস কারাদন্ড দেওয়া হয়। ফ্রি অফিসার্স গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাবশালী ছিলেন কর্নেল গাদ্দাফী, জালাউদ, মোস্তফা আল-সারুবী, আল-মুকাররাফ এবং আবদুল ফাতাহ ইউনুস। সামরিক অফিসারদের উদ্দেশ্য ছিল সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্বে গণ-আন্দোলন পরিচালনা করা। তারা বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং নূরী নজম ও মোহাম্মদ নজম এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সামরিক বাহিনীর সমর্থনে গণ বিক্ষোভ শুরু হয় এবং বিদেশী ঘাঁট আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়। এমন সময় কর্নেল গাদ্দাফীকে, যিনি সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন, বেনগাজীর কার ইউনুস থেকে ত্রিপলীর ক্যাম্প ফিরনাজে বদলী করা হয়। হেনরী হাবীব যথার্থই বলেন যে, রাজা ইদ্রিসের শাসনামলে কোন কার্যকরী রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি হয়নি। এমন কি রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাও ছিলনা। তিনি কোন প্রকারের রাজনৈতিক দলও সৃষ্টি করেননি, যার মাধ্যমে তিনি সাংবিধানিক পদ্ধতিতে দেশ শাসন করতে পারেন। কর্নেল গাদ্দাফীর ভাষায়, "বিপ্লব জাতীয়, গণতান্ত্রিক এবং মানবিক প্রয়োজনেই সংঘটিত হয়। দারিদ্র্য, অত্যাচার, অবিচার এবং জনগণের সুখ-সুবিধার অভাব ও বিপ্লবের কারণ লিবিয়ায় শতকরা নব্বই ভাগই ছিল অশিক্ষিত এবং গণস্বাস্থ্য এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায় যে প্রায় ৩৫,০০০ জন লোক যক্ষায় মারা যায়। শাসক গোষ্ঠী জাঁকজমকভাবে আরাম-আয়েসে

www.pathagar.com

দিন যাপন করত এবং জনসাধারণের মৌলিক অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান প্রতি ভ্রূক্ষেপ করত না। রাজা ইদ্রিসের সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন ছিলনা। লিবিয়ার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ তেল উত্তোলন এবং বাজারজাতকরণ বিদেশী প্রকৌশলী ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। বিভিন্ন কারণে লিবিয়ার জনগণ সামরিক ফ্রি অফিসারদের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত করে।

মুয়াম্মার গাদ্দাফীর নেতৃত্ব ঃ ১৯৫৯ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন মুয়াম্মার আল-গাদ্দাফী। লিবিয়ার বিপ্লবের ধারাবাহিক ইতিহাস গাদ্দাফী রচিত The Story of the Revolution (unpublished) এ লিপিবদ্ধ আছে। লিবিয়ার বিপ্লবের সূত্রপাত হয় সেবার (sebha) কতিপয় স্বাধীনচেতা ছাত্রদের প্রচেষ্টায় পঞ্চাশ দশকের শেষার্দ্ধে। এদের মধ্যে প্রভাবশালী নেতা ছিলেন মোয়াম্মার আল-গাদ্দাফী। ১৯৫৯ সালে তারা একটি গুপ্ত সংঘ স্থাপন করে বিভিন্ন সময়ে সভা আহ্বান করে দেশের পরিস্থিতি আলোচনা করত। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল জাতীয়করণের ফলে নাসের আরব বিশ্বে এক অসাধারণ প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। লিবিয়াবাসী নাসেরকে তাদের আদর্শ নেতা হিসেবে সমাদর করতেন। ১৯৬১ সালে ২৯শে অক্টোবর স্কুল ছাত্ররা মিছিল করে লিবিযার স্বাধীনতা দাবী করে। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন গাদ্দাফী। ফেজানের গভর্নর (Wali) সাইফ আল-নসর এই আন্দোলনে বিচলিত হয়ে গাদ্দাফীকে তার স্কুল থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। ফলে গাদ্দাফী মুসবাতায় গমন করে স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এখানে তাঁর সহযোগিদের নিয়ে তিনি বিপ্লবের চিন্তা ভাবনা করতেন। ১৯৬৩ সালে গাদ্দাফী সামরিক কলেজে যোগদান করেন। সামরিক শিক্ষা লাভ করার সময় তিনি সমমনা অফিসারদের সাথে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনের প্রয়াস পান। তারা একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে এবং নিজেদের 'ফ্রি ইউনিটারী অফিসার্স' হিসেবে ঘোষণা করে। এই কমিটির সদস্যগণ বিপ্লবী ভাবধারা প্রচারের জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারণা চালাতে থাকে। সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে ১৯৬৬ সালে গাদ্দাফীকে বৃটেনে নয় মাসের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান এবং বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল Relutionary কাউন্সিল Relutionary command council–R.C.C) গঠন করেন। তাঁর দেশ প্রেম, সংগঠনিক ক্ষমতা, প্রজ্ঞা ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্য অচিরেই তিনি এই কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সেপ্টেম্বর বিপ্লব ঃ একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, লিবিয়া সামরিক বাহিনীর কতিপয় স্বাধীনতাকামী নবীন অফিসারদের প্রচেষ্টায় লিবিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হয়। উচ্চ পদস্থ ও বয়োঃজ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের বাধা সত্ত্বেও অভ্যুত্থান হয়। ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারি ক্যাম্প কার ইউনুস থেকে গুপ্ত বুলেটিনের মাধ্যমে ফ্রি অফিসারগণ সামরিক বাহিনীর অন্যান্য ইউনিটে তাদের কার্যকলাপ অবহিত করতে থাকেন। কর্নেল গাদ্দাফী ৪৫ দিন ছুটি গ্রহণ করে সভা, সমিতির মাধ্যমে প্রচারণা শুরু করেন। বিপ্লবী অফিসারগণ প্রথমে ১৯৬৯ সালের ১২ই মার্চ বিপ্লবের দিন ধার্য করে। কিন্তু মিশরের

www.pathagar.com

তথা আরব বিশ্বের প্রখ্যাত গায়িকা উম্মে কুলসুমের অনুষ্ঠান ঐ তারিখে নির্ধারিত হলে বিপ্লবের তারিখ পরিবর্তন করা হয়। তিনি বেনগাজী এবং ত্রিপলীতে প্রচারনা শুরু করেন এবং সামিরক গোয়েন্দা বিভাগের কড়া নজর এড়িয়ে তিনি ২৪ শে মার্চ বিপ্লবের দিন ধার্য করেন। কিন্তু রাজা ইদ্রিস এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ত্রিপীল থেকে তবরুকে চলে গেলে এই তারিখ পরিবর্তিত হয়। এরপর ১৩ই আগস্ট ফ্রি অফিসারদের একটি সভা বেনগাজীতে অনুষ্টিত হয় এবং উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের গ্রেফতার করে তাৎক্ষণিকভাবে অভ্যুত্থান সংঘটিত করার চিন্তা-ভাবনা করা হয়; কিন্তু উপযুক্ত সময় বিবেচিত না হওয়ায় গাদ্দাফী বিপ্লবকে স্থগিত করেন। এরপর ১লা সেপ্টেম্বর বিপ্লবের তারিখ ধার্য করা হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গাদ্দাফী বেনগাজীর বেতার-টেলিভিশন ভবন দখল করবেন এবং ফ্রি অফিসারগণ অন্যান্য ইউনিটে অভ্যুত্থান পরিচালনা করবেন। কর্মসূচি অনুযায়ী গাদ্দাফী রেডিও-টেলিভিশন ভবন দখল করে বিপ্লবী বাণী প্রচার করেন। এভাবে লিবিয়ায় ফ্রি আর্মি অফিসারদের রক্তপাতহীন বিপ্লব সংঘটিত হয়। বেনগাজী তবরুক, ট্রিপলী, সেবা প্রভৃতি শহরেও ফ্রি আর্মি ইউনিট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করে। ৭ই সেপ্টেম্বর যুবরাজ তাঁর সমস্ত অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং বিপ্লবকে সমর্থন করেন। ৮ই সেপ্টেম্বর নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি সরকার গঠিত হয়। ড. মাহমুদ সোলায়মান আল-মাগরীবীর প্রধানমন্ত্রীত্বে একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি পরবর্তীকালে বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলে রূপান্তরিত হয়। বার সদস্য বিশিষ্ট এই কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন গাদ্দাফী। কর্নেল গাদ্দাফী অদ্যবধি লিবিয়ার রাষ্ট্র প্রধান।

সংস্কারসমূহ

কৃষি সংস্কার ঃ কর্নেল গাদ্দাফী প্রবর্তিত সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে লিবিয়ার যে পদক্ষেপটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত করে তা হচ্ছে কৃষি। কৃষি বিপ্লবের শুরুতে ১৯৭২ সালে কৃষি উন্নয়ন কাউন্সিল গঠিত হয়। এছাড়া কৃষি সংস্কার (Agrarian reform) এর জন্য একটি সাধারণ কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। কৃষি নীতি বাস্তবায়িত করার জন্য লিবিয়াকে পাঁচটি প্রজেক্ট অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, যথা কুয়ারা, জাফারা, জাবাল আল-আখদার, ফেজান এবং আলসুলু আল-খুদর। গাদ্দাফীর সরকারের কৃষি নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ঃ

(১) কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নতির জন্য সর্বনিম্ন আয় নির্ধারণ;

(২) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন;

(৩) আমদানি এবং রপ্তানির মাধ্যমে দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ;

উপরোক্ত তিনটি লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কৃষি উন্নয়ন কাউন্সির নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে; (১) ভূমি বণ্টন; (২) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির মালিকানা একত্রিকরণ; (৩) উদ্বৃত্ত শস্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা; (৪) ভূগর্ভস্থ পানির উৎস সন্ধান এবং ব্যবহার দ্বারা নতুন নতুন কৃষি খামার সৃষ্টি। কৃষি মন্ত্রণালয়ে উদ্যোগে কৃষি কার্যের বৈপ্লবিক উন্নয়ন দ্বারা সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়। যেমন– কৃষি

www.pathagar.com

গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি প্রশাসন এবং প্রশিক্ষণ। ১৯৭৩ সালের মে মাসের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তৃতাধীন কৃষিবিদ্যালয় এবং উচ্চতর গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলোকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। ১৯১১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ইতালিদের মালিকানায় লিবিয়ার সর্বাধিক পরিমাণ জমি চাষাবাদ হত। ১৯৭০ সালে ইতালিয়গণই সর্ববৃহৎ জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হয়। তারা মোট ৩৭,০০০ হেক্টর জমি ভোগ দখল করত। ১৯৭০ সালে আইন জারী করে ইতালিদের নিকট থেকে জমি অধীগ্রহণ করা হয় এবং ভূমিহীন কৃষক পরিবারের মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে কৃষি উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের ঋণ এবং কীটনাশক দ্রব্যাদি দেওয়া হত। কৃষি মন্ত্রণালয় প্রতি কৃষককে ২১ হেক্টর জমি প্রদান করে। কৃষি বিপ্লবের ফলে লিবিয়ার বার্লি, গম, বাদাম, জৈতুন তেল, খেজুর এবং লেবু জাতীয় ফসল উৎপাদিত হয়। জলসেচের ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। এভাবেই গাদ্দাফী সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেন।

বিচার ঃ লিবিয়াসহ অপরাপর আরব মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহের প্রশাসনিক কাঠামো প্রাচীন তুর্কি সাম্রাজ্যের মিল্লাত অব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। মিল্লাত ব্যবস্থায় সকল সম্প্রায়ের লোকেরা তাদের নিজস্ব আইন ও বিচার ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। মুসলিম সম্প্রদায় শরিয়ত দ্বারা পরিচালিত হত। উল্লেখ্য যে, মালিকী মতবাদ লিবিয়ায় প্রচলিত ছিল যদিও অধিকাংশ জনগোষ্ঠী হানাফী ছিল। ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ তাদের নিজস্ব আইন দ্বারা শাসিত হত এবং বিচার কাজও তাদের ধর্মীয় বিধানে অনুযায়ী সম্পাদিত হত। উত্তর আফ্রিকার বিচার ব্যবস্থা পরবর্তী পর্যায়ে নেপোলিয়নীয় কোর্ড দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করলে আলজিরিয়া, মরক্কো ও তিউনিসিয়া ফরাসি এবং লিবিয়া, ইতালি ও ব্রিটিশ আইন ব্যবস্থার প্রভাবাধীনে থাকে। বেসামরিক প্রশাসনে এই আইনের প্রচলন থাকলেও শারিয়া আদালত অব্যহত ছিল। ১৯৫৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর এক আইন বলে শারিয়া এবং বেসরকারি আদালতগুলোকে সংযুক্ত করে একটি আইন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কিন্তু চার বছর পর ১৯৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বরে পৃথকভাবে শারিয়া কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৯ সালের বিপ্লবের পর RCC পাশ্চাত্য আইনকে উচ্ছেদ করে ইসলামি আইন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য Legislative Review এবং সংশোধনী কমিটি গঠন করে। ১৯৭৩ সালে শারিয়া এবং বেসরকারি কোর্ট একত্রীভূত করা হয়। লিবিয়ার আইন ব্যবসা ছিল ইসলাম অর্থাৎ শরিয়ত ভিত্তিক। লিবিয়ার আইন ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সুসংহত করা। যেমন ১৯৭০ সালের ৫ই মে ৫৬ নম্বর আইন জারী করা হয়, যা "on the protection of morality in public places" নামে পরিচিত। এই দন্ডবিধি আইনে (penal code) "Pornography" বা অশ্লীল এবং যৌন উদ্দীপক প্রকাশনা এবং অশোভন নাচ-গান, শব্দ, ইঙ্গিত এবং অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা 'জেনা' নিষিদ্ধ হয়। লিবিয়ার বিচার ব্যবস্থায়–চারটি স্তর ছিল সামারী কোর্ট, কোর্ট অব ফার্স্ট ইনসটান্স, আপীল কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়া দেশদ্রোহিতার জন্য সামরিক আদালত বা military court ছিল।

www.pathagar.com

শিক্ষা : RCC-র অন্যতম প্রধান সংস্কার ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। বিগত ৪০০ বছরের ঔপনিবেশিক ইতিহাসে লিবিয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল। ধর্মীয় শিক্ষা, মালিকী মতবাদ, মাদ্রাসা-মক্তব, কুর'আন স্কুল প্রাধান্য লাভ করে। ১৮০৪ সালে ইহুদীদের একটি স্কুল ছিল। ফরাসি ঔপনিবেশিকগণ রোমান ক্যাথলিক মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এমন কি ইতালিয় স্কুলও ছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশী প্রভাব দূরীকরণের জন্য ১৮৪৩ সালে সানুসী আন্দোলন শুরু হয়। যাহোক, স্বাধীনতা ঘোষণার পর যে সংবিধান প্রণীত হয় তাতে এবং ১৯৫২ সালে জারীকৃত শিক্ষা বিষয়ক অডিন্যান্সে সকল লিবিয়াবাসীদের জন্য ইসলামি তালিকা অনুযায়ী অবৈতনিক শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় অনৈসলামিক ও পাশ্চাত্য ভাবধারা নির্মূল করার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালে লিবিয়ায় অবস্থিত সকল বিদেশী শিক্ষায়াতনের সকল মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরবি, ধর্ম ও সমাজবিজ্ঞান বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচি করা হয়। শিক্ষা সংস্কারের পূর্ব মুহূর্তে বিপ্লব পূর্ব যুগে লিবিয়ার নিরক্ষরতার হার ছিল ৯০%। মেয়েদের জন্য কোন পৃথক স্কুল বা প্রাইমারী বিদ্যালয় ছিল না। মাত্র ২৫টি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ছিল এবং মাত্র ১৪ জন লিবিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ছিল। উল্লেখ্য যে, লিবিয়ার শিক্ষায়তনে মিশরীয়, পালেস্টাইন, তিউনিসিয় শিক্ষক শিক্ষাদান করতেন। ১৯৭২ সালে লিবিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রসমূহ থেকে শিক্ষক আনার জন্য প্রোটোকল স্বাক্ষরিত করে। কর্নেল গাদ্দাফী শিক্ষাকে জাতীর মেরুদন্ড হিসেবে গণ্য করে ১৯৬৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর Educational ordinance law জারী করেন। ১৯৭০ সালে শিক্ষা সংক্রান্ত আইনে প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি গৃহীত হয়। লিবিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে ইব্রাহিম আল-ফালাহের অবদান ছিল অপরিসীম। ১৯৭১ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারী হিসেবে তিনি বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য ট্রিপলী ও বেনগাজীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

সমাজকল্যাণ : সকল লিবিয়বাসীর মানমর্যাদা উন্নয়নের জন্য সামাজিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়। কর্নেল গাদ্দাফী ছিলেন এক সমাজসেবী উদারপন্থী রাষ্ট্র প্রধান। ১৯৫৭ সাল লিবিয়াতে প্রথম Social Insurance Act প্রণীত হয়। এই আইনে অবসর ভাতা, বেকারভাতা, পঙ্গুভাতাসহ সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়। গাদ্দাফী ১৯৭৩ সালে এই আইনকে পুনর্বিন্যাস করে লিবিয়াকে একটি সমাজ উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রের (welfare state) পরিনত করার চেষ্টা করেন। লিবিয়ার নাগরিককে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বেকার, অবসর ও বৃদ্ধদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। এই সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য যুব ও সমার্জ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। সমাজ কল্যাণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন general corporation of the social security সহ বিভিন্ন সংস্থা গঠিত হয়। লিবিয়ার বিপ্লবী নেতা গাদ্দাফী জনকল্যাণকর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীগণ তাদের সর্বশেষ বেতনের ৫০% ভাগ ভাতা পেতেন।

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ঃ শিক্ষার পরে সমাজ উন্নয়নে স্বাস্থ্যের স্থান রয়েছে এবং গাদ্দাফী লিবিয়ায় জন স্বাস্থ্য উন্নয়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিপ্লব-উত্তর লিবিয়ার সংবিধানে সকল লিবিয়াবাসীদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয় এবং সুচিকিৎসার জন্য সাধারণ হাসপাতাল স্থাপিত হয়। সরকার পরিচালিত গণ ক্লিনিক ও হাসপাতালে বিনা মূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালও ছিল এবং বেসরকারি চিকিৎসকদের ফি নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। ১৯৬৯ সালে RCC একটি আইনজারী করে বাধ্যতামূলক টিকা দানের কর্মসূচি গ্রহণ করে। রোগ মুক্তির জন্য টিকা ও প্রতিশোধক (Immunization) দেওয়া হয়। সরকার ভ্রাম্যমান ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে চিকিৎসা দানের জন্য বিভিন্ন X-Ray সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়। ১৯৭৩ সালের মধ্যে লিবিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে ১১টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেনগাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সাথে নার্সিং স্কুল। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক স্তরে লিবিয় অপেক্ষা বিদেশী নার্স ও ডাক্তারের সংখ্যা ছিল তুলনামূলক ভাবে অধিক।

ড. হেনরী হাবীব গাদ্দাফী সম্বন্ধে বলেন, "Qadhafi is not the Revolution, the people are, but he is its symbol. He symbolizes the new Libya more than any other single person. He represents the true Arab of the desert by his courage, kindness, hospitality and justice."

৯. লেবানন

তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির পর সিরিয়ার মা'ন, আসাফ এবং বানু সাইফা অঞ্চলসমূহ সামন্তপ্রভুদের দ্বারা শাসিত হত। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে লেবাননে ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসস্থান হিসেবে অঞ্চলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দ্রুজ, খ্রিস্টান, ম্যারিয়নাইট ছাড়াও মুসলিম অধ্যুষিত লেবানন তুর্কি আমলে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ছিল। দামেস্কের তুর্কি গভর্নর লেবাননের সামন্তপ্রভু এবং তুর্কি সুলতানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। মা'নি সম্প্রদায়ের নেতা ফখরুদ্দিন লেবাননে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তুর্কিদের সঙ্গে লেবাননিদের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ফখরুদ্দিন ক্ষমতালাভ করে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার এবং স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসনের প্রয়াস পান। তিনি ত্রিপলি, বালাবেক, বৈরুত ও সিডন দখল করেন। তিনি একটি সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি স্থাপন করেন। এর ফলে তুর্কি সরকার তাঁকে বিতাড়িত করে এবং দীর্ঘ সাত বছর নির্বাসনে থাকার পর তিনি লেবাননে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বীয় ক্ষমতা এবং দক্ষতার বলে তিনি আলেপ্পো থেকে মিশরীয় সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চলে একজন আরব শাসকের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন, কিন্তু ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সুলতানের নির্দেশে দামেস্ক থেকে তুর্কিবাহিনী লেবাননে প্রবেশ করে

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ফখরুদ্দিনকে আটক করে কনস্টান্টিনোপলে প্রেরণ করে। সেখানে ফখরুদ্দিন এবং তার পুত্রসন্তানের শিরশ্ছেদ করে হত্যাকরা হয়। ফখরুদ্দিনের মৃত্যুর পর মা'ন পরিবার ক্ষমতাচ্যুত হয়।

মা'ন বংশের অধঃপতনে লেবাননে শিহাবি খ্রিস্টানের আবির্ভাব ঘটে। তারা কুরাইশি বংশোদ্ভূত বলে দাবি করে। ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ফখরুদ্দিনের মৃত্যু হলে লেবাননে রাজনৈতিক অরাজকতা শুরু হয় এবং তা একশত পঞ্চাশ বছর স্থায়ী হয়। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বশির আল-শিহাবি লেবাননের গভর্নর হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর পূর্বে লেবাননের গভর্নর ছিলেন ইউসুফ। প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার অধিপতি আহমদ আর-জাজ্জাবের নির্দেশে ইউসুফকে এক্রে শহরে হত্যা করা হয়। কিন্তু ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন যখন মিশর আক্রমণ করেন তখন আমির বশির আহমদ আল-জাজ্জারের সাহায্যে সৈন্য পাঠাননি। এ কারণে আহমদ আল-জাজ্জারের সাথে আমির বশিরের বিরোধ বাধে। উপরন্তু ইউসুফের সন্তানেরা আমির বশিরের বিরোধিতা করে। এ জন্য লেবানন থেকে আমির বশির মিশরে পালিয়ে যান এবং ব্রিটিশদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার অধিপতি আল-জাজ্জারের মৃত্যুর পর আমির বশির লেবাননে ফিরে আসেন এবং ইউসুফের সন্তানদের ক্ষমতা নির্মূল করেন। তিনি তুর্কি সুলতানের বন্ধুত্ব কামনা করে ১৫,০০০ লেবাননি সৈন্য তাঁর সাহায্যে পাঠান। এ সমস্ত সৈন্যগণ ওয়াহাবি যোদ্ধাদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। আমির বশির সিরিয়ায় তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। তিনি দামেস্ক ও ত্রিপলির গভর্নরদের (ওয়ালি) মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ মেটানো, সিরিয়ার আল-সিরিয়া অঞ্চল লেবাননের অন্তর্ভুক্তি এবং সিরীয় রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের ফলে তুর্কি সুলতান আমির বশিরের ওপর অসন্তুষ্ট হন। এর ফলে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে বশির দ্বিতীয়বারের মতো মিশরে আত্মগোপন করেন। মিশরের শাসক (খদিভ) মুহম্মদ আলি পাশার সাহচর্য লাভ করেন।

মুহম্মদ আলি পাশার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইব্রাহিম পাশা মিশরের খদিভ হলে আমির বশির পুনরায় লেবাননে ফিরে যান। তিনি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিমের সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং এক্রে দখলের সময় লেবাননি সৈন্যদল দিয়ে সাহায্য করেন। ইব্রাহিম পাশা দামেস্ক এবং হিমস দখল করে তুরস্ক পর্বতমালার কাছে সেনাবাহিনী নিয়ে শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সমর্থন লাভ করে তুর্কি সুলতান তার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে ইব্রাহিম পাশা তাঁর বাহিনী নিয়ে মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। ইব্রাহিম পাশার শাসনামলে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের বৈষম্য দূর হয়। সিরিয়ার গভর্নরগণ পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করেন। লেবানন ও প্যালেস্টাইন কৃষকদের ওপর তিনগুণ করা বৃদ্ধি করা হলে তারা ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ সমগ্র সিরিয়ায় বিস্তার লাভ করে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কৃষক বিদ্রোহ লেবাননে মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে তুরস্কের সুলতান মাহমুদ সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজ্জির নামক এক যুদ্ধক্ষেত্রে মিশরীয় বাহিনীর নিকট তুর্কিবাহিনী পরাজিত হয়। এর ফলে ইউরোপীয়

www.pathagar.com

শক্তিবর্গ, বিশেষ করে তুরস্কের মিত্র ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংল্যান্ডের মধ্যস্থতায় শান্তিপূর্ণভাবে ইবরাহিম পাশা সিরিয়া ত্যাগ করে মিশরে চলে যান। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বরে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ইবরাহিম পাশা মিশরে প্রত্যাবর্তন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। তিনি নয় বছর সিরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করলেও সেখানে আরবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন। এর ফলে সিরিয়ায় তুর্কি রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল এবং লেবাননকে দুটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে এই প্রশাসনিক সংস্কার করে এক অংশ দ্রুজদের অধীন এবং অপর অংশ ম্যারিওনাইট গভর্নরের অধীনে দেওয়া হয়। এর ফলে লেবাননে প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংকট শুরু হয়, যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজ প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইব্রাহিম পাশা সিরিয়া থেকে সেনাবাহিনী মিশরে প্রত্যাহার করলে লেবাননের এককালীন গভর্নর দ্বিতীয় আমির বশিরকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মাল্টায় নির্বাসিত করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে তুর্কি রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয় বশির ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় বশির লেবাননে কৃতিত্বের সাথে শাসন করেন। তাঁর সময়ে লেবানন একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীকে পূর্ণ মর্যাদা এবং রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়। তাঁর সময়ে লেবাননে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। শিহাবি শাসকদের আমলে দ্রুজদের মধ্যে অন্তঃর্দ্বন্দ বৃদ্ধি পায় এবং ম্যারিওনাইট কৃষকগণ দক্ষিণ থেকে উত্তরে যেতে শুরু করে।

ক্যাথলিক আরব জাতীয়তাবাদীগণ

লেবাননে আরব ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় এবং তাদের সাথে লেবাননের আমেরিকা মিশনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই জাতীযতাবাদী খ্রিস্টান আরবদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন ইয়াজিজি এবং বুস্তানি।

নাসিফ ইয়াজিজি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লেবাননের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে স্থানীয় এক পাদরির কাছে লেখাপড়া শেখেন। তিনি গির্জার গ্রন্থাগারে গিয়ে পড়াশোনা করতেন। তখন ছাপার বই পাওয়া যেতনা, সেজন্য পাণ্ডুলিপি পাঠ করে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর এবং তিনি যা পড়তেন তা মনে রাখতে পারতেন। ইয়াজিজি পাণ্ডুলিপির অনুলিপি তৈরি করেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজের একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। তিনি খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও জাতিতে আরব ছিলেন এবং আরবি পাণ্ডুলিপি থেকে ক্ল্যাসিক্যাল আরব সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে জানতে পারেন। ইয়াজিজি অবলুপ্ত আরব ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পান। তিনি প্রথম জীবনে একজন ধর্মযাজকের সচিব হিসেবে কাজ করেন প্রায় তিন বছর। তাঁর বয়স যখন বিশ বছর তখন তিনি লেবাননের গভর্নর আমির বশিরের অধীনে কাজ করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে আমির বশিরের নির্বাসন পর্যন্ত ইয়াজিজি তাঁর অধীনে কর্মরত ছিলেন। তিনি আরবি ভাষায় কবিতা রচনা করে প্রকাশ করেন এবং পাশাপাশি অনেক গ্রন্থও

www.pathagar.com

প্রকাশ করেন। তিনি আরবি ভাষায় তর্কবিদ্যা, ব্যাকরণ, অলংকারবিদ্যার ওপর টেক্সট বই রচনা করেন। এ সমস্ত গ্রন্থ ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকান মিশনারি স্কুলে পাঠ্য ছিল। তিনি বৈরুতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁর গৃহ আরব পণ্ডিতদের মিলনস্থলে পরিনত হল। খ্রিস্টান ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ সেখানে আরবি ভাষায় সাহিত্যের চর্চা করতেন। তিনি এ সমস্ত আরবি ভাষাভাষী বুদ্ধিজীবী ও যুবকদের আরব জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

নাসিফ ইয়াজিজির মতো ভুটরুস বুস্তানিও একজন আরব জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তিনি ইয়াজিজির চেয়ে বয়সে উনিশ বছরের ছোট ছিলেন। আমিন ওয়ারাকার গির্জা কলেজে ভুটরুস আরবি ও ল্যাটিন ভাষা শেখেন। তা ছাড়া সিরায়েক ভাষায় তাঁর বেশ দখল ছিল। এরপর ইংরেজি ভাষা শিখে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ভূটরুস বৈরুতে ডা. কর্নেনিয়াস ভ্যানআইক নামে একজন আমেরিকান মিশনারি চিকিৎসকের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি আবার এ শিক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আরবি পড়তেন। পাশাপাশি নাসিফ ইয়াজিজির মতো আরবিতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ভুটরুস ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি আরবি, ইংরেজি, ল্যাটিন ছাড়াও অ্যারামাইক, হিব্রু, গ্রিক ভাষা শেখেন। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব হচ্ছে দশ বছর পরিশ্রম করে এলি স্মিথের সাথে যৌথভাবে বাইবেলের আরবি অনুবাদ সম্পন্ন করেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি দুটি আরবি বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন, যা মুহিত আল-মুহিত এবং কুতব-আল-মুহিত নামে পরিচিত। কিন্তু ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি মাত্র ছয়খণ্ড সম্পাদন করতে পারেন।

ভুটরুস বুস্তানি একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী এবং সেইসঙ্গে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদও ছিলেন। তিনি একটি রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, এটি ছিল সাপ্তাহিক 'Clarion of Syria'। এ ছাড়া তিনি বৈরুত থেকে একটি পাক্ষিক প্রকাশ করেন ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। এ সমস্ত পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ভুটরুস লেবাননের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান বিভেদ দূর করে একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানান। তিনি জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রচারের জন্য জাতীয় স্কুল (National School) প্রতিষ্ঠা করেন।

তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের (১৮০৮-১৮৩৯ খ্রিঃ) শাসনামলে সংস্কারের আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণ। যার ফলে স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠী লেবাননে বিদ্রোহ করে। সুলতান দ্রুজ ও ম্যারিওনাইটদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে গোত্রীয় সংঘর্ষে উসকানি দেন। ম্যারিওনাইটগণ ফরাসি সরকারের এবং দ্রুজগণ ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। দ্বিতীয় মাহমুদের মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রথম আবদুল মজিদ (১৮৩৯-১৮৬১ খ্রিঃ) তুরস্কের সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনামলে লেবাননে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয় তাতে ১১,০০০ খ্রিস্টান নিহত হয়। শুধু তা-ই নয়, ১৪০টি গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হয়। এরপর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে দাউদ পাশা (১৮৬১-৬৮ খ্রিঃ) নামে

www.pathagar.com

একজন ক্যাথলিক গভর্নর জেনারেলের শাসনামলে লেবাননে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ–ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও ইতালি এই সরকারকে সমর্থন জানায়। ফরাসি গভর্নর জেনারেলের নিয়োগে ম্যারিওনাইটসগণ আপত্তি জানায় সুষ্ঠ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য লেবাননকে সাতটি জেলায় ভাগ করা হয়। বৈরুত ও সিডনের শাসনভার একজন ডেপুটি গভর্নরের ওপর ন্যস্ত হয়। গভর্নর জেনারেলের চাকরির মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর। প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিন্যাসে একটি উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই উপদেষ্টা কমিটি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে বারোজন প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয়। দক্ষিণের সমস্ত ভূস্বামীগণ এবং উত্তরের ধর্মযাজক সম্প্রদায় সরকারের সাথে পূর্ণসহযোগিতা করে। সমগ্র লেবাননে একটি সমৃদ্ধিশালী শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। এর ফলে দলে দলে খ্রিস্টানগণ এখানে এসে বসবাস করতে থাকে। জনসংখ্যা মাত্রাধিকভাবে বৃদ্ধি পেলে লেবানিগণ–মুসলিম ও খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায় আমেরিকা, মিশর ও অস্ট্রিয়ায় গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। মিলারের মতে, তুর্কি প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে লেবানন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে। এই স্বায়ত্তশাসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। যুদ্ধের পর লেবানন তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। যুদ্ধের সময় সিরিয়া অপেক্ষা লেবাননের অবস্থা খুব ভালো ছিলনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মিত্র তুরস্ক পরাজিত হলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ইঙ্গ-ফরাসি ম্যান্ডেটের আওতায় আসে। লেবানন ফরাসি ম্যান্ডেটের আওতাধীন হয়। যুদ্ধের পর লেবাননের ফরাসি সামরিক শাসনের বিরোধীতার ফলে এই ম্যান্ডেট কার্যকর করা হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বারো সদস্যবিশিষ্ট প্রশাসনিক কাউন্সিল লেবাননের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। তারা সিরিয়ার সাথে মিত্রতার জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু ফরাসি কর্তৃপক্ষ তাদের আটক করে নির্বাসিত করে। পূর্বের প্রশাসনিক কাউন্সিল বাতিল করে ফরাসি কমিশনার জেনারেল গোরা (Gouraud) একটি নতুন কমিশন গঠন করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী স্বায়ত্তশাসিত লেবানন প্রদেশ, ত্রিপলি, সিডনের সমুদ্র উপকূল, সৈকত এবং আল-রিকা ও আর-বালবেকের মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে বৃহত্তর লেবানন গঠিত হয়। একজন ফরাসি গভর্নর এবং কয়েকজন ফরাসি উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে লেবানিজ সংবিধান লেবাননকে একটি প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সেনাবাহিনীকে সীমিত করা হয় এবং লেবানন থেকে বিদেশীদের বিতাড়িত করা হয়। কালক্রমে লেবানন লীগ অব নেশনস-এর সদস্য হয় এবং ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে লেবানন পৃথিবীর মানচিত্রে একটি প্রজাতন্ত্ররূপে আবির্ভূত হয়।

১০. প্যালেস্টাইন

জেরুজালেমসহ বিভিন্ন পবিত্র স্থান-সম্বলিত প্যালেস্টাইন মধ্যপ্রাচ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের নিকট এটি পবিত্র ভূখণ্ড এবং এই

www.pathagar.com

প্যালেস্টাইনকে উপলক্ষ করে পূর্বে ক্রুসেড হয়েছে। তুর্কি সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের (১৫৬৬-৭৬ খ্রিঃ) রাজত্বকালে প্যালেস্টাইন অটোমান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তখন থেকে প্যালেস্টাইনকে তুর্কি প্রদেশ হিসেবে গণ্য করা হত। কিন্তু প্যালেস্টাইনবাসী এই পরাধীনতাকে অপমানজনক মনে করত। সিরিয়া, মিশর ও আরব ভূখণ্ডে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হলে প্যালেস্টাইনবাসী স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হলে লেবাননে ও মিশরে আবার জাতীয়তাবাদীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি প্যালেস্টাইনে ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিবর্গের চক্রান্তে মুসলমানদের কোণঠাসা করার জন্যে ইহুদি জিওনিস্ট আন্দোলন শুরু হয়। বিশ্বে ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য কোনো নিজস্ব রাষ্ট্র না থাকায় প্যালেস্টাইনে একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স চক্রান্ত করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে থিয়োডোর হারজেলের নেতৃত্বে ইহুদি জিওনিস্ট আন্দোলন জোরদার হয়। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ইহুদিদের জন্য একটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন। এই সংগঠন পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে ইহুদিরা বাস করছে তাদের প্যালেস্টাইনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য তাগিদ দেয়। এভাবে ইহুদিগণ প্যালেস্টাইনে এসে আবাসভূমি সৃষ্টি করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে দলে দলে ইহুদিগণ প্যালেস্টাইনে আসতে থাকে। এভাবে ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগদান করলে মিত্রশক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রভাববিস্তারের জন্যে মক্কার শরিফ হোসেনের সাহায্য কামনা করে। মক্কার শরিফ হোসেনের সাথে মিশরের ব্রিটিশ হাইকমিশনারের যে পত্রালাপ হয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তাতে মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইন নামে এক আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এদিকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ-পরবর্তী শান্তি সম্মেলনে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালফোর মধ্যপ্রাচ্যে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। 'বালফোর ঘোষনীয়' ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনগণ তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে প্যালেস্টাইনকে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এর ফলে স্বাভাবিক কারণে প্যালেস্টাইনদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতালাভের আশা ক্ষীন হয়ে যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের ছত্রছায়ায় দলে দলে ইহুদিগণ প্যালেস্টাইনে এসে হিব্রু রাষ্ট্র গঠন করে। ব্রিটিশ সরকারের বৈরী মনোভাবের ফলে ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্য সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯২১, ১৯২৯ ও ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে আরব-ইহুদি দাঙ্গায় অনেক লোক প্রাণ হারায়। ব্রিটিশ সরকার সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এ সমস্ত দাঙ্গা বন্ধ করলেও প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান হয়নি।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি রয়াল কমিশন নিয়োগ করে আরব ইহুদিদের বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করে। এই কমিশন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্যালেস্টাইনকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়– ব্রিটিশ, আরব ও ইহুদি অঞ্চল। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবটি ছিল

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রতিফলন। এ কারণে আরব সম্প্রদায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিরিয়ার বুলদান শহরে আরব জাতীয় সম্মেলন সীমান্তে গৃহীত হয় যে আরবগণ স্বাধীনতালাভের জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালিত করবে। তাদের লক্ষ্য একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অনেক ইহুদি, ব্রিটিশ ও আরব নিহত হয়। এর ফলে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় কমিশনে প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা বর্জন করা হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আরব ও ইহুদি প্রতিনিধিদের সাথে ব্রিটিশ সরকার বৈঠক করে যখন কোনো সমস্যার সমাধান হলনা তখন ব্রিটিশ সরকার একটি পত্র প্রচার করে বলে যে, দশ বছরের মধ্যে (১৯৪৯ খ্রিঃ) একটি প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে যা আজও হয়নি। এই ঘোষণায় ইহুদিদের আরবভূমি ক্রয় নিষিদ্ধ করা হয় এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের আগমন সীমাবদ্ধ করা হয়। ইহুদিগণ ব্রিটিশ নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে আমেরিকার সমর্থনলাভের চেষ্টা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে ইহুদিদের এই সুযোগ আসে। আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রভাববিস্তারের জন্য ইহুদিদের সমর্থন দিতে থাকে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ড. ওয়াইৎসম্যান ও আরও কয়েকজন ইহুদি নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে দেন-দরবার (লবিং) শুরু করেন। নিউইয়র্কে একটি জিওনিস্ট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিটমোর প্রোগ্রাম (Bitmore Programme) নামে একটি প্রস্তাব পাশ হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে যে বিশ্ব জিওনিস্ট সম্মেলন (World Zionist Conference) অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সমর্থন চাওয়া হয়। ট্রুম্যান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিকে প্যালেস্টাইনে এক লাখ ইহুদিকে অভিবাসনের প্রস্তাব দেন। অ্যাটলি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। পরবর্তীকালে ইঙ্গ-আমেরিকান কমিটি গঠিত হয় সঠিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা নিরসনের জন্য। এই কমিটি ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে আগমন এবং প্যালেস্টাইনকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই ঘৃণ্য প্রস্তাব আরব বিশ্ব প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে আরব লীগ গঠিত হয় ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্যে। আমেরিকা ও ব্রিটেন তাদের স্বার্থ না দেখে ইহুদিদের সমর্থন করে। আরব লীগ ঘোষণা দেয় যে প্যালেস্টাইনে আরবস্বার্থ রক্ষা করা হবে। এই মর্মে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আরব লীগ একটি স্মারকলিপি পাঠায়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে আরব ও ইহুদিদের এক সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলন চলাকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইহুদিদের পৃথক আবাসভূমি সৃষ্টির দাবিকে সমর্থন করে ইশতাহার জারি করেন। একতরফাভাবে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমেরিকার ভূমিকায় আরব বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এর ফলে লন্ডন সম্মেলন ব্যর্থ হয় এবং আরবগণ প্যালেস্টাইনিদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিসংঘে পেশ করে। জাতিসংঘ বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে।

www.pathagar.com

এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্যালেস্টাইন বিভক্তকরণের পক্ষে রায় দেয়। প্যালেস্টাইনকে তিন খণ্ডে বিভক্তির প্রস্তাব করা হল– আরব রাষ্ট্র, ইহুদি রাষ্ট্র ও জেরুজালেম রাষ্ট্র। ইহুদিগণ এই প্রস্তাব মেনে নিলেও আরব; স্বার্থের হানি হওয়ায় আরবগণ অস্ত্র ধারণ করল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আরবদের বিজয় যখন সুনিশ্চিত তখন ইহুদিদের স্বার্থরক্ষার জন্য জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। এই যুদ্ধবিরতিকালে ইহুদিগণ আমেরিকা ও রাশিয়া থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে। এর ফলে আরবগণ ইহুদিদের কাছে পরাজিত হয়। ইহুদিগণ প্যালেস্টাইনের একটি অংশ দখল করে তেলআবিবে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে ইহুদি রাষ্ট্র কায়েম করে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের মদদে আরব ভূখণ্ডে জিওনিস্ট ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে আরব রাষ্ট্রসমূহের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতিসংঘ ইহুদি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিল। প্যালেস্টাইনের আরব অঞ্চলসমূহ জর্দানের অধীনে চলে গেল।

১১. ট্রান্সজর্ডান

বাইবেলে বর্ণিত ট্রান্সজর্ডান কোনো দিনই রাষ্ট্র ছিল না–সিরিয়ার একটি অংশ ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতো ট্রান্সজর্ডান একসময় অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এই এলাকায় বেদুইনদের বসবাস ছিল। জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে জেরুজালেমে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কন্সালের দফতর ছিল। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে হাওরান, জাওলান, আম্মান আল-সালাত ও কেরক–এই পাঁচটি জেলা নিয়ে জর্ডান গঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মক্কার শরিফ হোসেন অটোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহ করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ট্রান্সজর্ডানে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট চাপানো হয়। এ সময় ২০০,০০০ বেদুইনদের বসবাস ছিল ট্রান্সজর্ডানে। ব্রিটিশ সরকার মক্কার শরিফ হোসেনের পুত্র আমির আবদুল্লাহকে ট্রান্সজর্ডানের শাসক নিযুক্ত করে। এই ব্যবস্থার অন্তরালে ব্রিটিশদের স্বার্থ ছিল। ট্রান্সজর্ডান রাষ্ট্রসৃষ্টির প্রয়োজন ছিল–প্রথমত একদিকে সাউদি রাজ্যের এবং সিরিয়ার মধ্যে মধ্যবর্তী (Buffer) রাষ্ট্র হিসেবে ব্যবহার করা। দ্বিতীয়ত, বেদুইনদের আক্রমণ থেকে প্যালেস্টাইনকে রক্ষা করা; তৃতীয়ত, ইরাকের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখা। প্যালেস্টাইনের ব্রিটিশ হাইকমিশনারের অধীন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আম্মানে একজন ব্রিটিশ এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ এজেন্ট আম্মান থেকে ট্রান্সজর্ডানের উপর ব্রিটিশ প্রভাব বজায় রাখেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ট্রান্সজর্ডান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ট্রান্সজর্ডান রাষ্ট্র কায়েম করা হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে আমির আবদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আম্মানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নব-প্রতিষ্ঠিত জর্ডানের সীমানা ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে হেজাজের মা'ন এবং লোহিত সাগরে আকাবা বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। রাজ্যবিস্তারের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি : আম্মান ও আল-জিজায় বিমানঘাঁটি স্থাপন, যার ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতবর্ষের

www.pathagar.com

যোগাযোগ আকাশপথে অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয়ত, আকাবা বন্দর ব্রিটিশ দখলে থাকার ফলে ভারতসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে সামুদ্রিক বাণিজ্য অব্যাহত থাকে। ম্যান্ডেটের সীমাবদ্ধতার ফলে ট্রান্সজর্ডানে ব্রিটিশবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী আবদুল্লাহর কোনো প্রকৃত ক্ষমতা ছিলনা, এবং ব্রিটিশ আধিপত্য অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু গণআন্দোলনের ফলে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ট্রান্সজর্ডান স্বাধীনতা লাভ করে এবং আবদুল্লাহ 'বাদশাহ' উপাধি ধারণ করেন। আবদুল্লা অপরাপর আরব রাষ্ট্রের বিশেষ সমর্থন লাভ করেননি। কারণ, প্যালেস্টাইনিগণ তাঁকে ব্রিটেনের একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রনায়ক মনে করে। অপরদিকে লেবাননিগণও রাজতন্ত্র মানতে প্রস্তুত ছিল না। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আবদুল হুদা নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ এজেন্ট স্যার অ্যারেক কাকব্রাইডের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ট্রান্সজর্ডানে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃত্ব হ্রাস পায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ট্রান্সজর্ডানের আরব বাহিনী জুড়া, সামারিয়া ও পুরাতন জেরুজালেম প্রভৃতি যে সমস্ত অঞ্চল দখল করে সে সমস্ত এলাকার সমন্বয়ে একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু বাদশাহ আবদুল্লাহ আনি আল-হুসাইনির নেতৃত্বে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধিতা করেন। পক্ষান্তরে, তিনি এই অঞ্চলসমূহ ট্রান্সজর্ডানের অন্তর্ভুক্ত করে জর্ডানে 'হাশেমীয় রাজ্য' কায়েম করেন।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে একটি সংসদ গঠিত হয় এবং এই সংসদে বাজেট অনুমোদনকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ দেখা দেয়। এর ফলে স্বৈরাচারী আবদুল্লাহ সংসদ বাতিল করেন; এর কিছুদিন পরে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। আবদুল্লাহর পুত্র তালাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার মানসিক ভারসাম্য লোপ পেলে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে হোসেন জর্ডানের বাদশাহ হন।

বাদশাহ হোসেন বিন তালাল (১৯৫২–১৯৯৯)

১৯৫১ সালের ২০ শে জুলাই রাজা প্রথম আবদুল্লাহ আততায়ীর বুলেটে নিহত হলে তার জ্যেষ্ঠপুত্র তালাল জর্দানের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি মানসিক রোগগ্রস্থ হওয়ায় এক বছরের মধ্যে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর ফলে তালালের পুত্র যুবরাজ হোসেনকে সিংহাসনে বসানো হয়। তখন তার বয়স ছিল ষোল বছর। তার জন্ম হয় ১৯৩৫ সালের ১৪ই নভেম্বর। হোসেন ১৯৯৯ সালের ১১ আগস্ট জর্দানের সিংহাসনে বসে শাসন কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। জর্দানকে পশ্চিম ঘেষা দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। হোসেন স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। তার শাসনামলে প্যালেস্টাইন থেকে ইসরাইল কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে বহু প্যালেস্টাইন জর্দানে এসে বসবাস করতে থাকে। বিশেষ করে এ সময়ে জর্দান প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের ঘাঁটি ছিল। প্যালেস্টাইনগণ জর্দানে একটি গণ-অভ্যুত্থানের চেষ্ট করলে বাদশাহ হোসেন কঠোর হস্তে তা দমন করেন এবং প্যালেস্টাইনদের তার দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। এর ফলে আরব বিশ্বে তাঁর বহু সমালোচনা হয়। কুয়েত ও ইরাকের মধ্যে সংঘর্ষে যে গালফ ওয়ার

www.pathagar.com

শুরু হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুয়েতের সাহায্যে এগিয়ে আসলে হোসেন মার্কিন আগ্রাসনের নিন্দা করেন এবং সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন দেন। এর মূল কারণ অবশ্য ১৯৮৮ সালে মা'ন শহরে গণ অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানে হোসেন সিংহাসনচ্যুত হবার উপক্রম হয়। সাদ্দামের আগ্রাসন নীতি সমর্থন করলে আরব রাষ্ট্রসমূহের সাথে জর্দানের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়। উপরন্তু আরবদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে হোসেন ১৯৯৪ সালে বৈরী ভাবাপন্ন ইসরাইলী রাষ্ট্রের সাথে একটি কূটনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেন। এটি Israil Jordan Treaty of Peace নামে পরিচিত। তৎকালীন ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবীনের সাথে তিনি সখ্যতা গড়ে তোলেন। মিশর ছাড়া একমাত্র জর্দানের সাথে ইসরাইলী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। ইসরাইলী জর্দানের চুক্তির সামরিক ভিত্তি ছিল। কারণ সিরিয়া অথবা ইরাক কর্তৃক জর্দান আক্রান্ত হলে ইসরাইল সামরিক বাহিনী দিয়ে হোসেনের রাজ্য রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

বাদশাহ হোসেন বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৪৭ বছর দক্ষতার সাথে জর্দান শাসন করেন। তিনি ছয় দিনের আরব ইসরাইলী যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হননি। তার দূরদর্শিতায় জর্দানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখা দেয় ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত সময়কালে জর্দানের অর্থনৈতিক উন্নতি চরমে উঠে। তিনি সমাজসেবা মূলক কাজকে অধিক প্রাধান্য দেন। তাঁর সময়ে বিদ্যুৎ ও জলসেচ ব্যবস্থা সুসংহত হয়। তিনি জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। তার সময়ে পয়ঃপ্রণালী শতকরা নব্বই ভাগে উন্নীত হয়। যেখানে শিক্ষার হার ছিল ৩৩ শতাংশ সেখানে তার নেতৃত্বে শিক্ষার হার ১৯৬৬ সালে ৮৫.৫ ভাগে উন্নীত হয়। বাদশাহ হোসেনের শাসনকালে তার ভাই যুবরাজ হাসান উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি উইল পরিবর্তন করে তার জ্যেষ্ঠ সন্তান দ্বিতীয় আবদুল্লাহকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। বাদশাহ হোসেন বহুদিন থেকে দুরারোগ্য ও জটিল রোগে অসুস্থ ছিলেন। তিনি ১৯৯৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি পর পর চারবার বিবাহ করেন। তার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে যে জ্যেষ্ঠ সন্তান ভূমিষ্ট হয় তিনি দ্বিতীয় আবদুল্লাহ উপাধি নিয়ে জর্দানের সিংহাসনে বসেন।

www.pathagar.com

গ্রন্থতালিকা

Turkey

1. Eversely, The Turkish Empire (its growth and dceay)
2. Price, History of Turkey (From Empire to Republic)
3. Miller. E. The Ottoman Empire and its successor (1801-1927)
4. Lewis, G. Turkey.
5. রহমান, হাবিবুর (অনুবাদ), আতাতুর্ক।
6. খান, আলী আসগর, আধুনিক তুরস্কের ইতিহাস।
7. জোয়ারদার, সফিউদ্দীন, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)
8. হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস।

Iran

1. Avery, P., Modern Iran.
2. Banani, A, Modernization of Iran (1921-44)
3. Markham, History of Persia.
4. হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস।
5. —, ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব।

Afghanistan

1. Fraser Tytler, Afghanistan.
2. Sykes, Afghanistan, Vols. I-II.
3. Muhammad, A Guide to Afghanistan.
4. Dupiree, L, Afghanistan.
5. Tate, G. P., The Kingdom of Afghanistan.
6. Coll, Steve, Ghost Wars.
7. দেবাশীষ চক্রবর্তী, (স) আফগানিস্তান ও সমসাময়িক বিশ্ব।
8. বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অ) সাখাওয়াত হোসেন, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিহাস ঃ আফগানিস্তান হতে আমেরিকা।
9. আশরাফুল আলম, আফগানিস্তান ঃ হাজার বছরের কথা।
10. বদরুদ্দীন উমর, প্যালেস্টাইন, আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।
11. Olafaroe, The Pathans.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

9 789848 601129